সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭

ভাদ্র, ১৩

সূচীপত্র

বর্ষ ৩৭ / সংখ্যা ২
সেপ্টেম্বর '৬৭ / ভাদ্র '৭৪

সম্পাদক
সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত। ফোন: ৩৪-৬০০৩

প্রচ্ছদলিপি ও চিত্র: রঘুনাথ গোস্বামী

প্রতি সংখ্যা ১৲ ॥ বার্ষিক ১০৲ ॥ ষাণ্মাসিক ৫৷০

সুলেখা
প্রতিদিনের প্রয়োজনে
সুলেখা
ড্রইং এর
কালি
অ্যাডসল
অফিস
পেস্ট
ও গাম
সুলেখা
ফাউন্টেন পেন-এর
কালি
সিক্যুরিটি
সিলিং
ওয়াক্স
সুলেখা
স্ট্যাম্প প্যাড
সুলেখা
ওয়ার্কস
লিমিটেড
পার্ক, কলিকাতা—৩২

মানুষ, বর্ষধারা, জীবন

মৃত্যুর কয়েকদিন আগের কথা। নোভোস্তি প্রেস এজেন্সির ইন্না ভাসিলকোভা গেছেন ইলিয়া এরেনবুর্গের মস্কোর বাড়িতে দেখা করতে। তাঁর সঙ্গে ব্রাজিলের এক সাংবাদিক বন্ধু। এরেনবুর্গ তাঁর পড়বার ঘরে আরামচেয়ারে গা ডুবিয়ে বসে ছিলেন। তাঁর চারপাশে টেবিল থেকে মেঝে অবধি স্তূপাকারে বই। পরনে তাঁর ধূসর রঙের গরম মোটা পোশাক—নীলরঙের শার্ট আর টাই। ইদানীং দেখলে বোঝা যেত বয়স হয়েছে। শরীরটাও ভেঙে পড়েছিল। মাথার চুল সাদা। চলাফেরায় আগেকার সেই চনমনে ভাব আর নেই। কিন্তু চোখদুটো ছিল আশ্চর্য তাজা—আর তাতে ছিল এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। পড়বার ঘর থেকে অতিথিদের তিনি নিয়ে গেলেন বসবার ঘরে। সে যেন এক জাদুঘর। সে ঘরে সারা দুনিয়ার কত যে জিনিস। এরেনবুর্গ সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। বললেন, 'এগুলো পিকাসোর আঁকা।

আমার কাছে আছে তাঁর নিজের আঁকা পঁয়ত্রিশটি ছবি—আমি পিকাসোর পরম ভক্ত। এগুলো এঁকেছেন স্প্যানিশ চিত্রকর ওর্টেগো। আর এ ছবিগুলো আমাদের শিল্পী শাগাল, লেন্তুলভ, মাশকভ আর তাইশলারের আঁকা। এই মূর্তিগুলো বাইজান্টাইন থেকে আনা আর এই গালচেটা পোল্যাণ্ডে তৈরি।' বৈঠকখানা জুড়ে নানাদেশের রংচঙে লেবেল-আঁটা মদের বোতল আর হরেক রকমের পুতুল। চীনে মাটির জিনিস, রুশদেশী খেলনা আর নানা রকম কাঠের কাজ—এসব সংগ্রহ করা ছিল তাঁর বাতিক। তাঁর পাইপ সংগ্রহের কথা সারা মস্কোর লোক জানত। গোলটেবিলটা ঘিরে তাঁরা বসলেন। টেবিলের ওপর ফুটন্ত অর্কিড ফুল, তার পাশে কিছু ওষুধের শিশি আর বাক্স। ব্রাজিলের সাংবাদিককে প্রথম প্রশ্ন এরেনবুর্গ ই করে বসলেন, 'আমার পুরনো দোস্ত জর্জ আমাদু এখন কেমন আছেন? তাঁর নতুন কী বই বেরিয়েছে? মস্কোয় আসছেন কবে?' তারপর আমাদুর সঙ্গে তাঁর কবে কোথায় দেখা হয়েছে তার গল্প বললেন। রুশভাষায় আমাদুর যা কিছু তর্জমা বেরিয়েছে সমস্তই তিনি পড়েছেন। তাঁর মতে, আমাদুর সাম্প্রতিক লেখাগুলো ঢের ভালো হচ্ছে—অনেক বেশি দিলখোলা এবং হালকা। বলে আলমারি থেকে সুন্দর কারুকার্য করা একটা বড় কাঠের বাক্স বার করলেন। তাতে ভর্তি চুরুট; আর প্রত্যেকটা চুরুটের গায়ে ছাপার হরফে লেখা 'ইলিয়া এরেনবুর্গ'। তাঁকে দেওয়া আমাদুর উপহার। চুরুট, পাইপ আর মাঝে মাঝে সিগারেট—একটা না একটা সব সময়ই তিনি টানতেন। আর ভালবাসতেন কড়া কালো কফি। কড়া কফি আর কড়া সিগারেট—এই দুটোতেই যেন এরেনবুর্গকে চেনা যায়। 'শরীর কেমন?' প্রশ্নের উত্তরে এরেনবুর্গ বললেন, 'ছিয়াত্তর বছর বয়সে মানুষ যেমন থাকে। তার চেয়ে ভালোও নয়, খারাপও নয়। সে তোমরা এখন বুঝবে না—আমার বয়স পেতে তোমাদের ঢের দেরি।' 'এখন কী লিখছেন?' এরেনবুর্গ বললেন, 'স্মৃতিকথার সপ্তম খণ্ড। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৪ সালের কথা এতে থাকবে।' নানা প্রশ্নের জবাবে এরেনবুর্গ বললেন দিনের বেলায় লিখে রাত্রে ঘুমনো তিনি পছন্দ করেন; হাতের লেখা ভালো নয় বলে টাইপরাইটারে লেখেন আর তাতেই কাটাকুটি করেন। কিছুদিন আগেও নোটবুকে রোজকার ঘটনাগুলো লিখে রাখতেন। এরেনবুর্গ অসাধারণ পরিশ্রম করতে

পারতেন। তাঁর অনেক লেখা বাদছাদ দিয়েও সম্প্রতি দশখণ্ডের একটি গ্রন্থাবলী বেরিয়েছে। উপন্যাস গল্প কবিতা প্রবন্ধ সব বিভাগেই তাঁর প্রায় একশো বই আছে। নিজেকে তিনি মাঝারি-দরের লেখক বলে মনে করতেন। পশ্চিমের লেখকদের মধ্যে স্তাঁদাল, এলুয়ার, জয়েস, হেমিংওয়ে আর স্টাইনবেক ছিলেন তাঁর প্রিয়। ভিয়েতনামে গিয়ে স্টাইনবেক যা করেছেন সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে এরেনবুর্গ বললেন, 'সত্যি বলতে, তাঁর সম্বন্ধে পড়ে খুব দুঃখ পেয়েছি। আশ্চর্যও হয়েছি। আমি স্টাইনবেকের লেখার খুব ভক্ত, কিন্তু আমার মনে হয় তিনি যা করছেন আর যা লিখছেন দুটোর মধ্যে একেবারেই খাপ খাচ্ছে না।' লেখা ছাড়াও তাঁকে আন্তর্জাতিক সংগঠনে কাজ করতে হত। সোভিয়েট পার্লামেন্টের তিনি ছিলেন ডেপুটি। তাছাড়া চিঠি পেতেন দৈনিক প্রায় তিরিশটি। অধিকাংশ চিঠিরই তিনি উত্তর দিতেন। এরেনবুর্গ স্বীকার করলেন যে, এই জনপ্রিয়তায় তাঁর খুবই মুশকিল হয়। 'আমার এই বয়সে খ্যাতি জিনিসটা বোঝার মত। প্রথমত এতে অনেক সময় যায়। অনেক সময় এমন কি নিজেই নিজের সুনামের ফাঁদে পড়েছি।' তিনি সারা পৃথিবী ঘুরে গাছপালা এনে গ্রামে নিজের বাড়ির বাগানে লাগিয়েছেন। জনশ্রুতি অনুযায়ী নিজেকে তিনি সত্যিই 'গোলমেলে' লোক বলে মনে করেন কিনা জিগ্গেস করা হলে, এরেনবুর্গ বললেন, 'গোলমেলে মানে? আমার স্বভাবটাই যা খারাপ। কিন্তু লোক খারাপ হয়েও দু চারটে ভালো কাজ করা থেকে কেউ আমাকে ঠেকাতে পারে নি।' 'আপনি আসলে ঔপন্যাসিক, না সাংবাদিক, না কবি?' 'আমি নিছক মানুষ—আর সেইসঙ্গে একটা ছেঁদো কথা না বলে পারছি না—মানবিক কোন কিছুই আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়।'

প্রত্যক্ষের শেষ সাক্ষাৎকার এখানেই শেষ হয়েছে। কিন্তু বইয়ের পাতায় এরেনবুর্গের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার কখনও শেষ হবে না।

একটি সাক্ষাৎকার

অন্নদাশঙ্কর রায়

দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই সেই পরিচিত গলার সম্ভাষণ শোনা গেল, 'আরে। এসো, এসো!' খদ্দরের পাজামা-পাঞ্জাবি, চোখে চশমা, কথায়-ব্যবহারে সুভদ্র ঘনিষ্ঠ অন্নদাশঙ্কর রায় একটি ইজিচেয়ারে অর্ধশয়ান অবস্থায় আমাদের তিনজনের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। মনে পড়ল, শান্তিনিকেতনেব বাড়িতে সামনের বাগানে এই ইজিচেয়ারে দুপুরে বা বিকেলে হয় কিছু পড়ছেন. কিংবা লেখাব খশড়া করছেন। পায়ের কাছে গুটিকয়েক বেড়াল খেলা করছে, বেশি বিরক্ত করলে মাঝে মাঝে তাদের 'আচ্ছা, আচ্ছা' বলে পিঠ চাপড়ে দিচ্ছেন। গভীর রাতেও দেখা যেত দূব থেকে, ঘরের জানলায় পরিচিত মুখের প্রোফাইল—দীর্ঘায়ত মুখ, দীর্ঘ নাসা একাগ্রমনা অন্নদাশঙ্কর টেবিল ল্যাম্পের আলোয় বই পড়ছেন কিংবা টাইপ করছেন। এই ছবিগুলিই মনে আছে—পাঠ বা রচনামগ্ন অন্নদাশঙ্কর কিন্তু আত্মভোলা নন। প্রতিদিন দাড়ি কামাবেন, খবরের কাগজ কিংবা ডাকে-আসা পত্রপত্রিকা খুঁটিয়ে পড়বেন, প্রতিটি চিঠির উত্তর লিখবেন, লেখার প্রুফ দেখবেন, বিকেলে টেনিস খেলবেন, সন্ধ্যায় ভ্রমণে বেরোবেন, সকালে-বিকালে তাবৎ ফেরিওয়ালার কাছ থেকে তাদের খুশি করবার জন্যই দরকারি-অদরকারি সওদা কববেন, চিঠিপত্র নিজেই পোস্ট করবেন, ইলেকট্রিক বিল ঠিক তারিখে মিটিয়ে দিতে যাবেন। প্রতিদিন পরিচিত-অপরিচিত অভ্যাগতের সঙ্গে সুদীর্ঘ সময় আলাপ-আলোচনা করবেন। তবু সবার উপরে, তিনি যাকে বলেছেন তাঁর 'সাযুজ্য' 'সালোক্য'—সেই সাহিত্য-সাধনার জন্য কিছুটা সময় রাখবেন। সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, সামাজিক যেকোন বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলেছে—প্রতিপক্ষের কথাবার্তা শুনেছেন, প্রশ্ন করে করে জেনেছেন তারপর ধীর, গম্ভীর স্বরে অন্নদাশঙ্কর নিজের মন্তব্য স্পষ্ট

ভাষায় বলেছেন। শ্রোতা এবং কথক হিশেবে অন্নদাশঙ্কর অদ্বিতীয়। শান্তিনিকেতনে তাঁরই প্রতিবেশী বন্ধু অমিয় চক্রবর্তীর বাগ্‌বৈদগ্ধ্যও তুলনারহিত, কিন্তু শ্রোতা হিশেবে নয়। রাজনৈতিক প্রবন্ধ তৈরির সময়ে বা উপন্যাসরচনার সময় অন্নদাশঙ্কর আরেক মানুষ। সর্বক্ষণ চিন্তিত তখন। খাবার সময়ে বা বেড়াবার সময়েও অন্যমনা বা একই বিষয়ের কথা; আলোচনার আসরেও তখন ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন আর, হাঁটুর উপর তর্জনী বুলিয়ে ক্রমাগত ছক কেটে চলেছেন।

শান্তিনিকেতনের বাড়িতে একসঙ্গে বহুদিন থেকেছি। একত্র বাসে অনেক মহৎজনেরও দুর্বলতা ধরা পড়ে কিন্তু এ ব্যাপারেও অন্নদাশঙ্কর অবিস্মরণীয় ব্যতিক্রম। পরিবারের অন্য সকলে হয়ত কলকাতায়, কিন্তু তাঁর নিয়মনিষ্ঠ প্রাত্যহিক জীবনধারায়, মেজাজে, রুচিতে বিন্দুমাত্র টোল খেতে দেখি নি। অন্যের জীবনে বা রুচিতে কখনও হস্তক্ষেপ করতেন না অথচ সকলের স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁর সতর্ক নজর ছিল। শান্তিনিকেতনবাসের সময়ে বহুদিন দুপুরে বা রাতে ফিরতে দেরি হয়েছে, অপেক্ষা করে আছেন একসঙ্গে খাবেন বলে; কিন্তু প্রশ্নটি করতেন না, বিরক্ত হয়েছেন কিনা জানা যেত না। বিতর্কমূলক প্রবন্ধ প্রকাশের পর অন্নদাশঙ্করের কাছে বহু কটূক্তিপূর্ণ চিঠি এসেছে—বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি তিনি। যেমন সহজে কারো মতবাদে প্রভাবিত হন না, আবার বহু অবাঞ্ছিত ব্যাপারেও সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন। শান্তিনিকেতনের প্রতিটি উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন, উপাচার্য থেকে শুরু করে সাঁওতাল প্রতিবেশীদের সঙ্গে সমান হৃদ্যতা বজায় রাখতেন। প্রতিটি কাজ অন্নদাশঙ্কর নিপুণভাবে সম্পন্ন করবেন, স্নেহভাজনদের কেউ ধূমপান করলে পছন্দ করবেন না, প্রিয়জনদের অসুস্থতা বা দুর্দশায় ব্যস্ত হলেও বিহ্বল হবেন না। মনেপ্রাণে উদারপন্থী এবং আন্তর্জাতিক, কথায় -লেখায় সাবধানী অথচ স্পষ্ট অন্নদাশঙ্কর রায় বহুদিন পরে কলকাতায় বাস করতে এসেছেন। বয়সের ছাপ পড়েছে চুলে, আর কোথাও নয়। কিন্তু মনে হল ক্লান্ত—হয়ত উপন্যাস রচনায় ব্যস্ত বলেই কিংবা বাসাবদলের মানসিক পরিশ্রমে। চকিতে মনে হল শান্তিনিকেতনে তিনি হয়ত আরও দীপ্ত ছিলেন, হয়ত শহর কলকাতা কোন সাধককেই উজ্জ্বলন্ত রাখতে পারে না।

অপ্রতিম বসু

কার জন্যে লেখা

প্রশ্ন

আপনার বহু প্রবন্ধেই আপনি বারবার একটা প্রশ্ন তুলেছেন—কার জন্য লেখা ? অল্পসংখ্যক রসজ্ঞ পাঠকের জন্য, না বৃহত্তর পাঠকসমাজের জন্য, না একই সঙ্গে দুয়েরই জন্য ? আর্টের জাত ও মান বাঁচিয়ে আপামর সাধারণের গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার যে সমস্যা তার সমাধানের কথা কি ভেবেছেন ?

উত্তর

বহুকাল আগে থেকে—ছাত্র বয়স থেকেই এই সমস্যা নিয়ে ভাবছি। রলাঁর 'পিপ্‌ল্‌স্ থিয়েটার', টলস্টয়ের 'হোয়াট ইজ আর্ট' পড়ে ভেবেছি। পিপ্‌ল্‌কে বাদ দিয়ে উপরের তলার লোকই আর্ট-এর রস আস্বাদন করবে এটা ঠিক নয়। এটা অস্বাভাবিক। আর্ট এমনভাবে বইয়ে দিতে হবে—যেন গঙ্গার স্রোত। ইতর ভদ্র সবাই পাচ্ছে। জনতাও যেন সেটা পায়। কেবলমাত্র এক বিশেষ শ্রেণীর লোকই আর্টকে উপভোগ করবে কেন ? এটা বিশেষভাবে চোখে পড়ত যখন দেখতাম উপরের তলার লোক থিয়েটার দেখছে। পিপ্‌ল্‌-এর জন্য সাব্‌ স্ট্যাণ্ডার্ড যাত্রা। মনে হয়েছে থিয়েটারও ছড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু আমার শিল্পীসত্তা বিদ্রোহ করল। যে জিনিশ যেমন তেমনভাবেই তাকে পরিবেশন করব। জল মেশানো চলবে না, তাতে আর্ট নষ্ট হয়। এমন দোটানায় যখন পড়ি তখন ঠিক করি আমি পিপ্‌ল্‌-এর দিকে খানিকটা এগিয়ে যাব। তারাও আমার দিকে খানিকটা এগিয়ে আসবে। তাদের তৈরি হয়ে আসতে হবে। পিপ্‌ল্‌-এর উপরও যথেষ্ট দাবি থাকা দরকার—তারা লেখাপড়া শিখবে। রসজ্ঞ হবে। না হলে আর্ট-কে অনেক নেমে আসতে হয়।

কোন উঁচুদরের শিল্পী রাজি হবেন না লোকের সুবিধার জন্য আর্টকে জোলো করতে, সহজ করতে, শিশুবোধ্য করতে। তাহলে একদিন লোকেই তাকে দায়ী করবে। বলবে, কেন নামালে ? এটা অবশ্য মিস্‌প্লেস্‌ড্‌ ফিলানথ্‌পি—'এসো কিছু শিখিয়ে দিই'। এটা আমি পারব না।

সমাজে সর্বক্ষেত্রেই কিছু অ্যাডভান্সড্‌ লোক আছে। ধর্ম, আর্ট, রাজনীতি — সবক্ষেত্রেই। সিনেমার বেলায়ও এটা সত্য। সেখানে শতকরা নব্বই জন হয়ত খুশি হচ্ছে, দশজন হচ্ছে না। হিন্দী ফিল্‌মে বাঁদরামো আছে ঠিকই

আবার বাংলা ফিল্মেও আপোশ হচ্ছে। কারণ অ্যাডভান্সড্ লোকের জন্যে করলে টাকা উঠবে না। লোকে বলবে হাইব্রাউ। বলবে অ্যারিস্টোক্র্যাটদের কথাই ভাবছ। আমাদের কথা ভাবছ না।

এটা একটা সমস্যা। আর্টকে আর্ট হতে হবে। আবার লোকেরও বোধ্য হওয়া চাই। এই দ্বৈত দাবি মেটানোয় অসুবিধা রয়েছে। হয়ত শেক্সপিয়র বা রবীন্দ্রনাথ এটা পারতেন। প্রমথ চৌধুরী ভাষার দিক দিয়ে চেষ্টা করলেও চিন্তার ক্ষেত্রে পারেন নি। খুব একটা উঁচু স্ট্যাণ্ডার্ড রেখে হাজার হাজার লোকের জন্য প্রবন্ধ লেখা রীতিমত শক্ত—গল্প, নাটক, কাব্য সবই রীতিমত শক্ত। আমি চেষ্টা করেছি। এখনও করি। ভাষার দিক দিয়ে আমি সহজ করব, কিন্তু যা দিতে চাই তা খাটো বিকলাঙ্গ করব না। দরকার হলে দশ বছর অপেক্ষা করব। তাদের রুচির উন্নতি করতে হবে, পরিপাকশক্তি বাড়াতে হবে—সেজন্য আমি দুধে জল মেশাব না। এ কাজ আমি পারি নি। শিক্ষকেরা পারেন, অধ্যাপকেরা পারেন। গড়ে পিটে যোগ্য করে নেওয়া—যেমন আগেকার দিনে স্বামীদের করতে হত—লেখকের পক্ষে তা সম্ভব নয়। নিরক্ষর বুদ্ধিবিহীনকে তৈরি করে উচ্চমানের সাহিত্য বোধগম্য করানো লেখকের কাজ নয়। যাই হোক, শুধু এলিট-এর জন্যই লেখা নয়, সাধারণও যাতে রস পায়, তা সম্ভব করতে হবে। কিন্তু অসুবিধা আছেই। সরল করতে হবে সব সময় এ কথা মাথায় রেখে বেশি দূর এগোনো সম্ভব নয়। অনেক সমস্যা আছে—সামাজিক ঈস্থেটিক নৈতিক মনস্তাত্ত্বিক—যা সহজ, সরল বা ঝরঝরে করা যায় না।

এজন্যই হয়ত এসব লেখার পাঠকসংখ্যা কমে যায়—হয়ত এলিট-ই পড়ছে। কিন্তু আমার তা উদ্দেশ্য নয়। চেয়েছি সবার জন্যই লিখতে। বিদগ্ধমণ্ডলী না থাকলে আবার শিল্প সাহিত্য হয়ও না। রাশিয়ায় গর্কি, চেখভ বিদগ্ধজনের প্রিয়, বিশেষ করে চেখভ। আবার পিপ্‌লও তাঁকে অগ্রাহ্য করে নি। মাঝে অবশ্য অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। বিপ্লবের পরে অনেকে বলেন চেখভ কেন পড়ব। রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়া যান তখন জিজ্ঞাসা করেন, চেখভ পড় না কেন? এখন আবার চেখভ পড়া হচ্ছে। দস্তয়েভ্‌স্কিও তাই। এখন তাঁর বইও প্রকাশিত হচ্ছে।

লেখকের জীবনের কাজ লিখে যাওয়া। যা তাকে বিচলিত করেছে,

যা নিয়ে সে ভুগছে যা নিযে সে তন্নতন্ন করে ভেবেছে তাই নিয়েই লেখা উচিত। হয়ত প্রথমে এলিট-ই পড়বে। পরবর্তীকালে পিপ্‌ল্‌ উন্নত হযে লেখাপড়া করবে। তখন লেখক কোন্‌ শ্রেণী থেকে এসেছে, নাযক-নায়িকা কোন্‌ শ্রেণী বা বংশ বা পরিবার থেকে এসেছে এসব বিষয় গৌণ হয়ে যাবে। কী লেখা হয়েছে সেটাই আসল সেটাই হবে। ব্যাস বাল্মীকি শুধু রাজাদের নিযেই লিখেছেন কি সাধারণকে নিয়ে লিখেছেন এটা আসল কথা নয়। এ হচ্ছে শুধু বাইরের ব্যাপার, কাঠামো।—আসলে এর মধ্যে দিয়ে যে রস পরিবেশন করা হচ্ছে তা শাশ্বত, বিশ্বজনীন। কেউ ভাবে না রবীন্দ্রনাথ হিন্দু, বাঙালী, মধ্যবিত্ত। তাঁর থেকে আইসল্যাণ্ডের লোকও রসাস্বাদন করে, পাকিস্তানের লোকেও।

পাঠকে লেখকে

প্রশ্ন

পাঠক ও লেখক—উভয় পক্ষেরই খানিকটা এগিয়ে আসার কথা বলছেন। এলিয়ট 'মার্ডার ইন দ ক্যাথিড্রাল' লেখবার সময এই কথা ভেবেই কাব্যনাটিকার কমিউনিকেশনের ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। লোরকাও নাটকে ঝুঁকেছিলেন এই কারণে। মায়াকভ্‌স্কি, ডিলান টমাস ও ফরাসি কবিরা কাব্যপাঠের আসরে দাঁড়িয়ে পাঠকদের কাছে কবিতা পড়ে শুনিয়েছেন। লেখকের দিক থেকে এ ধরনের কোন চেষ্টাকে আপনি কতটা দাম দেবেন?

উত্তর

উদাহরণটা ঠিক হল না বোধহয়। এলিয়টের উদ্দেশ্য জনতাকে আকৃষ্ট করা নয়। ধর্ম ও আর্টকে এক করা। ধর্মেব দিকে থেকে চিন্তা করে ব্যাপারটা গড়ে উঠেছে।

কাব্যনাট্যে মেলবন্ধন

প্রশ্ন

'মার্ডার ইন দ ক্যাথিড্রাল' লেখবার সময় এলিয়টের অ্যাংলো ক্যাথলিক ভাবধারা থেকে আর্ট ও ধর্মের মেলবন্ধনের চেষ্টা হযত ছিল। কিন্তু কমিউনিকেশনের বিস্তার ঘটাবাব সাধই ছিল প্রধান। তাঁর পরবর্তী

কাব্যনাটিকায় ধর্মচিন্তা প্রচ্ছন্নই থেকেছে, ভাষা ক্রমশ দৈনন্দিনের ভাষা হয়ে এসেছে।

উত্তর

কাব্যনাটিকার চেয়ে গদ্যনাটক হলে লোক আকৃষ্ট হত বেশি। বিভিন্নরকম আঙ্গিকের মধ্যে মেলবন্ধন করা চাই। এটা যে পিপ্‌লের কথা মনে রেখে করা হয়েছে তা নয়। হয়ত মেঘনাদবধের মত কাব্যরচনা আবার শুরু হতে পারে। ভার্স ড্রামা না হোক ব্ল্যাঙ্ক ভার্স ড্রামা হবে। কবিতা মনে রাখা সহজ—গদ্য হলে তা মনে রাখা সম্ভব নয়। সেজন্যই অনেকে বলছেন ভার্স ড্রামা লিখতে হবে। তাই বোধহয় একটি চিঠিতে লিখেছিলাম 'কাব্যনাট্য হবে আমার প্রধান বাহন।' প্রোজ ড্রামাতে আমি খুব উৎসাহী হই নি। ভার্স ড্রামাকে এক্সপেরিমেণ্টের জন্যই হয়ত নিতে চেয়েছি।

সাহিত্যপাঠ

প্রশ্ন

আপনি বলছেন কাব্যনাটিকা রচনা প্রধানত এক্সপেরিমেণ্টালেব অঙ্গ, সেখানে লেখক ও পাঠকের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার কথাটা মুখ্য নয়। কিন্তু সাহিত্য-পাঠের ক্ষেত্রে তো এই সম্পর্কেরই প্রসার ঘটে?

উত্তর

তা ঠিক বলতে পাবি না। সেটা সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার উপর, পরীক্ষার উপর নির্ভর কবে। ক্রিয়েটিভ রাইটাব হয়ত ভাল আবৃত্তিকার বা পাঠনকারী নয়। কলম নিয়ে বসলে সে রাজা—সে এঞ্জেল। অথচ লোকের সামনে দাঁড়ালেই ফাম্ব‌্‌ল্ করে। সবাই রবীন্দ্রনাথের মত সব্যসাচী নয়। তাব বন্ধুরা, অধ্যাপক প্রভৃতিরা তার লেখা লোকের কাছে নিয়ে যাবার কাজে সাহায্য করতে পারেন।

লেখক ও ইডিওলজি

প্রশ্ন

আজ পৃথিবী এত দ্রুত বদলাচ্ছে, এত ভাঙাচোরা চলেছে যে একজন লেখকের জীবনেই এমন অনেকগুলো সময় আসে যখন তাকে একটা বাইরের সমস্যা নিয়ে লিখতেই হয় বা বলতেই হয়। এইভাবে প্রত্যেকটা সমস্যায়

স্ট্যাণ্ড নিতে গেলে তার আর্টের দশা কী দাঁড়াবে? তাতে কি আর্ট ক্ষুণ্ণ হবে না সমৃদ্ধ হবে?

উত্তর

একজন লেখক হয়ত একটা সমস্যা নিয়েই ভাববেন। একজনই সব সমস্যা নিয়ে কেন ভাবতে যাবেন? এটা খুব বড একটা তাগিদ নয়। এখন অনেকে চাইছেন একটা কোনো নির্দিষ্ট ইডিওলজি মেনে চলতে মার্কসিস্ট অথবা অন্য কিছু। কিন্তু এটা সকলের কাছে প্রত্যাশা করা বোধহয় ঠিক নয়। সাহিত্যিক এক জটিল মানুষ। মার্কসিস্ট হলে তাকে একটা লাইন ধরে এগোতে হবে। তাতে জটিলতা থাকবে না—সেল্‌ফ্‌ কনট্রাডিকশন থাকবে না। সমস্ত চরিত্রই আদর্শ চরিত্র হবে। টাইপ সৃষ্টি হবে। দীনেশ সেনের সময়কার উপন্যাসে যেমন সবাই আদর্শ—আদর্শ স্বামী আদর্শ স্ত্রী আদর্শ পুত্র ইত্যাদি। অথচ দেখবেন বাল্মীকির রামায়ণে তা নেই। মহাভারতেও নেই।

সাহিত্যিক ও নাগরিক

প্রশ্ন

সম্প্রতিকালের আন্তর্জাতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে সাহিত্যিকের অংশগ্রহণ কি তাহলে সীমাবদ্ধ? অথচ সাহিত্যিকও তো নাগরিক।

উত্তর

সাহিত্যিক নিশ্চয়ই নাগরিক। কিন্তু সাহিত্যিক হিশেবে একটু স্বাতন্ত্র্য, একটু তফাৎ রাখা প্রয়োজন। নাগরিক হিশেবে আমিও র‍্যাশন ব্যবস্থা, ফুড প্রবলেম, ঘেরাও ইত্যাদি নিয়ে কথা বলছি, কিন্তু যখন আমি সাহিত্যিক হিশাবে লিখব তখন তো সেভাবে লিখব না। সাহিত্যিকদের তাদের খুশির উপর ছেড়ে দিতে হবে। কত কী হয়ে গেল সারা দেশে। গান্ধী, সুভাষ, টেররিস্ট মুভমেণ্ট, এমন যে উদ্বাস্তু সমস্যা—এ নিয়ে সাহিত্যিকরা খুব ভেবেছেন কি? কোন ভাল উপন্যাস তৈরি হয়েছে এ সবের উপর?

ভিয়েতনাম প্রসঙ্গে

প্রশ্ন

কিন্তু সমস্যার মানবিক দিকগুলি নিয়ে সাহিত্যিক কী করবেন? যেমন,

ভিয়েৎনাম সমস্যা। আমাদের কিছুটা অবাক লাগে ভেবে যে ভিয়েৎনাম সমস্যা নিয়ে আপনার কোনো মতপ্রকাশ দেখতে পাই না।

উত্তর

আপাতত যা ঘটছে, সব কিছু নিয়েই ভাবি। ইস্রায়েল আরব নিয়ে ভাবি। ভিয়েৎনাম নিয়ে ভাবি। আমেরিকার রেস্-রায়ট নিয়েও ভাবি। কিন্তু এ সম্পর্কে কিছু লিখি নি কারণ এসবের উপর আমার যথেষ্ট গ্রিপ্ নেই। যেটা ভাল জানি না সে সম্পর্কে লিখতে পারি না। যা লিখব তা দু'পক্ষকেই নাড়া দেওয়ার মত হওয়া চাই। যা লিখব তাতে যদি আমেরিকানরা বলে ঠিক লিখেছে আবার ভিয়েৎনামও বলে ঠিক লিখেছে তবেই লিখে লাভ আছে—এ না হলে লিখে লাভ কী। আসলে এটা ইকনমিক ওয়ার—পলিটিক্যাল নয়। ভিয়েৎনাম যুদ্ধ থেমে গেলে অন্য কোথাও লাগবে। ওয়ার ইকনমির এই পরিণতি অনিবার্য। রেস-রায়টও তাই। নিগ্রোরা এখন আর ক্রীতদাস না হলেও আমাদের অস্পৃশ্যদের মতো অত্যন্ত গরিব—শিক্ষা, চাকরি, ব্যাবসা কোন কিছুর সুযোগ-সুবিধা তাদের নেই। একদল দেখতে পাচ্ছে প্রাচুর্যের পাশে দারিদ্র্য। সেজন্য ইকনমিক ট্রাবলকে সোশ্যাল ট্রাবলে পরিণত করা হচ্ছে। আমেরিকার ধনী নিগ্রোও কিছু আছে, তারা কিন্তু এসব গোলমালে তেমনভাবে জড়িত নয়। অবশ্য তার সঙ্গে রেসিয়াল ট্রাবলও আছে।

উপন্যাস

প্রশ্ন

আপনি যে উপন্যাসে সম্প্রতি হাত দিয়েছেন তার প্লট কি আগের উপন্যাসগুলির কাছাকাছি? যেমন 'সুখ' বা 'বস্ত্র ও শ্রীমতী'?

উত্তর

না। এটা সম্পূর্ণ আলাদা। 'সুখ' তো রূপকথা। এখানে অ্যালিগরিকাল কিছু আছে—নাম থেকেই বুঝতে পারবে, 'তৃষ্ণার জল'। এর ব্যাকগ্রাউণ্ড সত্যাগ্রহ আন্দোলন, আসলে পার্সোনাল প্রবলেম—প্রেমে পড়ার কাহিনী।

প্রশ্ন

উপন্যাস বা গল্পরচনার সময় কি আপনি আগেই ছক করে নেন কিংবা আদ্যোপান্ত ভেবে পরিণতিটাও ঠিক করা থাকে?

উত্তর

আগে ঠিক করতাম না। এখন কিছু কিছু করি। এই উপন্যাসটার বেলা আগে একটা খশড়া করে নিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত সেই খশড়া অনুসরণ করছি না বটে, তবে মোটামুটি কোন পথে যাব তা ভেবে রেখেছি।

প্রশ্ন

শান্তিনিকেতন কি একেবারেই ছেড়ে এলেন ?

উত্তর

শান্তিনিকেতন একেবারে ছাড়িনি। বলা যায়, একটা খুঁটি পোঁতা আছে। মাঝে মাঝে যাব। অনেক দিনের সম্পর্ক। ষোল বছর এক জায়গায় ছিলাম। এখানে লেখার ব্যাপারে খুব অসুবিধে হচ্ছে না, তবে মানসিক দিক দিয়ে ঠিক এখনও স্থিতি পাই নি। গৃহিণী অবশ্য খুবই খুশি। আমিও অখুশি নই।

প্রশ্ন

অনেকদিন পর কলকাতার জীবনে এলেন। এখানে অনেক কিছু পরিবর্তন নিশ্চয় আপনার চোখে পড়েছে ?

উত্তর

কলকাতার উপরে আগে প্রেজুডিস ছিল সে সমস্ত বাংলাদেশকে শোষণ করে ফুলে ফেঁপে উঠছে বলে এখন তা নেই। কলকাতার জীবনে আনরেস্ট বড় বেশি। সেটা কোথায় নেই ? পাড়াগাঁয়েও রয়েছে। শান্তিনিকেতনেও। সে অন্যভাবে এখন বিল্ড আপ হচ্ছে। আরেক কলকাতা গড়ে উঠছে। কোথায় যাবে তুমি ? তবে এখানে বৈচিত্র্য আছে। ফুল অফ লাইফ।

প্রশ্ন

কলকাতার সংস্কৃতি-জীবনের সঙ্গে কি এখন সংযোগ রয়েছে ?

উত্তর

ঠিক এখনও রাখতে পারছি না। লেখা নিয়েই ব্যস্ত থাকি। পড়াশুনোও করি। আধুনিক নাটক, গানের জলসায় যাবার ইচ্ছে থাকে, কিন্তু এখানে থেকে যাওয়াটা দুষ্কর। ট্যাক্সির ভাড়া বেশি, বাড়ি ভাড়াও অনেক। অথচ বাসে যাতায়াত আমার পক্ষে মুশকিল। সময়সাপেক্ষও বটে, এখনকার দিনের নাটক ইত্যাদি দেখবার ইচ্ছে প্রবল। হয়ত পরে কখনো এসব

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যেতে পারব কিছু কিছু। তবে এখনো জীবনের ধারা নিয়মিত হয় নি।

প্রশ্ন

আপনার এখানে এসে কি মনে হচ্ছে না আজকের সাহিত্যিককে নেসেসারিলি নাগরিক হতে হবে?

উত্তর

সেটা মনে হয় না। তবে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ তো সর্বত্রই হতে পারে। বরং আমার কথা বলতে পারি—সাহিত্যিকের জন্য নির্জনতার দরকার।

প্রশ্ন

প্রবন্ধরচনার কথা কিছু ভাবছেন কি?

উত্তর

রাজনীতি নিয়ে আর কিছু লিখতে অ্যালার্জিক বোধ হয়। লিখবও না। ও পথ আমার নয়। জাতীয় জীবনও এত জটিল হয়ে পড়ছে যে তা নিয়ে লেখাও সাহিত্যিকের কর্ম নয়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হচ্ছে না, নইলে তা নিয়ে লিখতেই হত। ঐ একটা সমস্যা আমার কাছে সবচেয়ে গুরুতর। কেউ ভিয়েৎনামের জন্য বা কাশ্মীরের ব্যাপারে প্রাণ দিতে পারে। হিন্দু-মুসলিম সমস্যার ব্যাপারে আমি প্রাণ না দিতে পারি, তার কাছাকাছি যেতে পারি।

আমার কাছে সেজন্যই বড় সমস্যা দুই বাঙলার সম্পর্ক। দুই বাঙলাকে মনের দিক থেকে কাছাকাছি আনা বড় দরকার। যাঁরা আশা করেন এখনও যে দুই বাঙলা অদূর ভবিষ্যতে ফিজিক্যালি মিলে যাবে আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। পুনঃপুনঃ দাঙ্গাহাঙ্গামা, লোকবিনিময়, ঠাণ্ডা লড়াই, গরম লড়াই ইত্যাদির ফলে মাঝখানকার খাদ এত গভীর হয়েছে যে জোড়া লাগা সম্ভব নয়। কিন্তু কোনদিন বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হবে ১৯৪৭ পর্যন্ত একই খণ্ডে, তারপর দুই খণ্ডে ভাগ হয়ে যাবে—এক খণ্ডে আমাদের নাম, অন্য খণ্ডে পুব বাঙলার লেখকদের নাম তারপর দুই খণ্ডই ক্রমশ মোটা হবে—এ আমি ভাবতে পারি না। এটা যেন না হয়। এজন্য যদি কিছু করা হয়, একটা সাহিত্যমেলা বা ঐ ধরনের কিছু, আমি তার জন্য যথাসাধ্য করতে পারি। ভাষা ও সাহিত্যের ভাগ বাঁটোয়ারা আমি মেনে নিতে অক্ষম। আমি সব বাঙালী পাঠকের জন্যেই লিখি। পাঠকদের ধর্মভঙ্গ বা রাষ্ট্রভেদ আমাকে প্রভাবিত করে না। অন্যান্য লেখকরা যদি এই নীতিতে বিশ্বাস করেন তবে দুই বাঙলার মানসিক ব্যবধান ক্রমশ দূর হবে। কায়িক ব্যবধান দূর হওয়া অবশ্য আমাদের হাতে নয়।

অসীম রায়

আ মরি বাংলাভাষা

শীতেব রোদ্দুরে মাঠভর্তি হাজারখানেক মেয়েপুরুষ দাঁড়িয়ে আছে উৎকণ্ঠায়, কেউ উৎকণ্ঠা চাপার হাই তুলছে, কেউ উল বুনছে, ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে কেউ, কারুর সখেদ উক্তি · সব বুজরুকি, টপ্ টু বটম্ করাপশান, ওদের মিশনারি ফাণ্ডে পাঁচশো টাকা দিয়ে দিন, দেখবেন আপনার ছেলে ভর্তি ; 'আমাদের কিছু হবে না জানেন, ছেলেদের যে ভাল শিক্ষা দেব সে গুড়েও বালি। শেষ পর্যন্ত বাঙলা স্কুলের গোয়ালেই···'

প্রতি বছর এই উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগেব নাটক। কলকাতাব কয়েকটি ইংরেজি স্কুলে তাদের ছেলেমেয়েদের পডানোর জন্যে শিক্ষিত বাঙালী বাপ-মায়ের ক্ষোভ, ঈর্ষ্যা ও ব্যর্থতার গ্লানি। তাঁদের চোখে এই পশ্চিম বাঙলা দু ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, এক ভাগে ইংরেজি স্কুলে পড়া ছেলেমেয়ে আর অন্য ভাগে যাবা সে সব স্কুলে পড়ে নি, শিক্ষাদীক্ষা সমৃদ্ধিতে উচ্চমধ্যবিত্ত এবং অর্ধশিক্ষা দারিদ্র্যে কোণঠাসা এবং সমস্ত সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত ক্ষয়িষ্ণু নিম্ন-মধ্যবিত্ত। বস্তুত এই সব অভিভাবকের কাছে ইংরেজি এক আলাদীনের প্রদীপ। এই ইংরেজির ম্যাজিকে সমস্ত দেশের চেহারাটা পাল্টে দেওয়া যায়, খেতের ফসল বাড়ে, দিকে দিকে কাবখানা গজায়, চাকরির সম্ভাবনা দু হাত বাড়ায় আর শিল্প বাণিজ্যে সব বাধা কাটিয়ে আমাদের সন্তান-সন্ততি তরতর করে এগিয়ে চলে।

কথাটা কেবল ব্যঙ্গের বস্তু নয় যখন দেখা যায় অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ মোটামুটি জ্ঞানীজনও এ প্রমাদ থেকে খুব দূরে নন। বেশ কয়েক বছর আগে ইংরেজি স্কুলে বাঙালী অভিভাবকদের দৌড়াদৌড়ির প্রসঙ্গ তোলা হলে তিনি এক আশ্চর্য অর্থহীন জবাব দিয়েছিলেন, 'কিছু মডেল স্কুল তো থাকবেই।' অর্থাৎ গত বিশ-পঁচিশ বছরে দেশের এবং আ'বিশ্ব সংস্কৃতির পবিবর্তনের পরিবেশে এডেনে নয়, হংকং-এ নয়, টোকিও কিংবা পিকিং-এ তো নযই, কেবল আমাদের কলকাতায় ইয়োরোপীয় কয়েকজন মিশনারি পরিচালিত এবং তাদেরই কযেকটি নকল স্কুল 'মডেল স্কুল' বলে মেনে নিতে হবে। নাটকটি তাই শুধু ব্যঙ্গের নয়, আত্মদর্শনের। মাতৃভাষায যেখানে মায়েদের উৎসাহ ফিকে, যেখানে বেশ কিছুটা শিক্ষিত মহলে পরিচিত ইংরেজি অ্যাকসেন্ট কতখানি ইংরেজি এ নিয়ে নিরন্তর ভাবনা, যে দেশে অ্যাসেম্ব্লিতে দাঁড়িয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায ঘোষণা করেছিলেন মাত্র কয়েক বছর আগেই যে বাঙলায় হুকুম দিতে তাঁর অসুবিধে হয়, বিশ্ববিদ্যালযের পণ্ডিতগুলো সেনেটে বছরেব পর বছর সমস্যাটা ধামা চাপা দিয়ে প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার গৌরবে গৌরব বোধ করেন, ছাত্রদের পরীক্ষায অনুমতি দেওয়া হয় বাঙলায লিখতে এবং পড়তে, যদিও প্রশ্নপত্র অবশ্যম্ভাবীরূপে ইংরেজি বই থেকেই করার রেওয়াজ চালু থাকে, যেখানে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো পণ্ডিত লোকও 'বয়লার' 'বাষ্পীয় হাণ্ডি' হবে কি না এই ভেবেই অর্থাৎ পা'বিভাষিক শব্দবিলাসেই আকুল, যেখানে বাঙলা ভাষার মাথায কাঁঠাল ভেঙে যে সব কাগজ করে খাচ্ছেন তাঁরা একবারও ভাষা আরও কালোপযোগী সমৃদ্ধ কবার ব্যাপারে উদাসীন, সেখানে বাঙলা ভাষার বেকাযদা সন্দেহাতীত।

দেশের হাওয়া পাল্টানোব চাপে এডুকেশন কমিশন যা নিঃশ্বাসের মতো স্বাভাবিক সেই মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার প্রস্তাব মেনে নিযেছেন। কিন্তু এই কাগজের দলিল মৃত, এ দলিলে প্রাণসঞ্চার একমাত্র সম্ভব যদি দেশের বেশির ভাগ মানুষের মেজাজেব হাওয়া পাল্টায, চীন জাপানের মতো নিজেদের দেশের ভাষা সম্পর্কে বোধ জাগে, আর নিজেদের অভিজ্ঞতার দুর্নিবার শিক্ষায এ বোধও সঙ্গে সঙ্গে আসে যে ইংবেজি ভাষা মাত্র, আলাদীনের প্রদীপ নয়।

নীলাক্রান্ত

সমর সেনের এক পুরনো লেখায় 'কলকাতার কবিতায়' ভোরবেলার গঙ্গা দৃশ্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু উত্তর কলকাতার কিছু সংখ্যক অধিবাসী বাদ দিলে ভোরবেলার গঙ্গা বেশির ভাগ শহরের মানুষের কাছে লোহিত সাগরে সূর্যাস্ত। আরও অনেকের কাছে যা পৌঁছায় তা হল আকাশ ভরা শাদা-নীলের কবিতা। মাঠভর্তি সবুজ ধানের ওপর নীল শাদা মেঘের যাতায়াত অনেক কবিতায় গানে স্থান পেয়েছেন। কিন্তু চৌ-মাথায ট্যাফিক পুলিশের মাথার ওপর এই আশ্চর্য স্বচ্ছ নীলের অভিযান, কিংবা ছাদের আল্‌শেতে রাখা টবে সদ্য বৃষ্টি স্নাত দোপাটির চারা শুদ্ধ এক চিলতে আকাশে এ নীল বেশ একটা চ্যালেঞ্জ। এ নীল যৌবনের রঙ। বস্তির মাথায়, খোলা ড্রেনের দুপাশে স্তূপ করা ময়লার গাদির ওপর, স্কাই স্ক্র্যাপারের গায়ে, গুঁড়িতে দাদের মলম আর 'লাভ্‌ ইন টোকিও'র বিজ্ঞাপনে ঢাকা শিরীষের ডালে, দোতলা বাসের মাথার এ নীল শহরের ভাস্বর দীপ্তি।

কবিতায় আঁটানো

কবিদের মনে কি এ প্রশ্ন জাগে যে কবিতায চারপাশের জীবনের অভিজ্ঞতা ধরা পড়ছে না? বাস্তবের শুধু থাপছাড়া চরিত্রের জন্যে নয়, এমন এক একটা অভিজ্ঞতার ধাক্কা, এমন তীব্র ঘটনার গতিময়তা, এমন হঠাৎ মোড ফেরা, চলতে চলতে থম্‌কে দাঁড়ানো আবার দাঁড়িয়েই তৎক্ষণাৎ ধাবমান হবার বেগ সঞ্চয়—এগুলো প্রকাশের বাহন আলাদা হতে পারে? অন্তত পাস্তেরনাকের এ রকম মনে হযেছিল, বোধহয় কিছু পরিমাণে নাট্যকার এলিয়টেরও। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে পাস্তেরনাক বলেছিলেন, 'ভাবছি, লিরিক কবিতার পক্ষে আমাদের অভিজ্ঞতার প্রচণ্ডতা প্রকাশ আর সম্ভব না। জীবনটা বড্ড জ্যাব্‌ডা, বড্ড জটিল হযে দাঁড়িয়েছে। আমরা এমন সব মূল্যবোধ অর্জন করেছি যার সার্থক প্রকাশ গদ্যে।' আর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, 'আমি বিশ্বাস করি গদ্যই এ কালের মাধ্যম, যে গদ্য ফক্‌নাবের মতো জটিল সমৃদ্ধ। আজকের লেখায় ফুটে উঠবে জীবনের বিভিন্ন স্তর। সেই চেষ্টাই করছি আমার নতুন নাটকে।'

প্রজাপতির নির্বন্ধ

চা শ্রমিকের বিবাহপ্রথা বিষয়ক সমীক্ষা

দীনেশ রায়

সমাজের নখদর্পণে বিবাহপ্রথা কোনো চিরস্থির ছবি নয়। অর্থনীতির সামান্য দোলানিতেও এর নড়চড় হয়। তাই বিবাহ-প্রথার বিচারে অর্থনীতির রঞ্জনরশ্মি ছাড়া গত্যন্তর নেই।

জীববিজ্ঞানে যাকে উভচর বলে, নৃতত্ত্বে তারই নাম প্রান্তিক। চা-শ্রমিকরা সেই অর্থে প্রান্তিক। এই শিল্পের শ্রমিকরা পিতৃপ্রধান কৃষিসমাজ ত্যাগ করে চা-উৎপাদনে যোগ দিয়েছে। চা-শ্রমিকদের মধ্যে তাদের সেই ছেড়ে আসা সমাজের প্রভাব কিছু কিছু পাওয়া যায়। এই কারণেই 'সরোরারি', 'লেভিরেট' এবং 'পলিগামি'র প্রচলন এ সমাজে এখনও খুব স্পষ্ট।

নানা গোষ্ঠী, উপগোষ্ঠী এবং অনুগোষ্ঠী ছাড়াও চা-শ্রমিকরা—সাদাং এবং সনাতনী—এই দু ভাগে বিভক্ত। তাদের পুরাতন সমাজে কৃষি অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ প্রধানত সনাতনীদের হাতে ছিল, সাদাংরা মেহনত করত মাত্র। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মেহনতি মানুষরাই প্রথম উন্নততর জটিল উৎপাদন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে। সুতরাং সাদাংরা কৃষিনীতির জাঁতা থেকে বেরিয়ে এল এবং বৃহৎ যান্ত্রিক শিল্পোদ্যোগে যোগ দিল। সনাতনীদের গর্ভবাস শেষ হতে বিলম্ব হল। সাদাংরা যেন প্রথম ফেরিতে পার হল আর শেষ নৌকোটা ছাড়বার ঠিক আগে সনাতনীরা তাতে উঠে বসল।

এই সমীক্ষাভুক্ত সমস্ত উপজাতিই অ্যাণ্ডোগ্যামাস, ট্যাবু ভাঙার ক্ষেত্রে এক্সোগ্যামির নিদর্শন মেলে। কোন কোন অনুগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যা চা-বাগান তল্লাটে একে কম, তায় স্ত্রী-পুরুষের জন্মহারের ভারসাম্যের অভাব থাকায় হাইপারগ্যামির প্রচলনও স্পষ্ট।

১. পুরুষের ক্ষেত্রে বহু-বিবাহ সীমাবদ্ধভাবে বেঁচে আছে।

বছর	স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু কিংবা বিবাহ-বিচ্ছেদের পর পুনর্বিবাহিতার সংখ্যা	বিধবা বা স্বামীপরিত্যক্তা স্ত্রীলোককে প্রথম বিয়ে করা পুরুষের সংখ্যা	অন্য স্ত্রী থাকা অবস্থায় কোন পুরুষকে প্রথম বিয়ে করা স্ত্রী-লোকের সংখ্যা
১৯৬০	৩০	২০	১০
১৯৬১	৪০	২২	১০
১৯৬২	৬৫	২৫	৭

উপজাতি-জীবনে কন্যা গরবিনী ও সোহাগিনী।

২. বিবাহযোগ্যা কন্যা যে কোন পরিবারে গর্বের বস্তু। পাত্রপক্ষই এগিয়ে এসে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে থাকে। ছেলের মা পাত্রী ঠিক করার জন্য ঘটক নিয়োগ করে। এই ঘটকদের আগুয়া বলে। যারা প্রস্তাবিত পাত্র-পাত্রীপক্ষকে চেনে তারাই আলাপ-আলোচনা চালাবার জন্য আগুয়া হিসাবে নিযুক্ত হতে অনুরুদ্ধ হয়। এটা কোন ব্যবসায়িক ব্যাপার নয় এবং আগুয়ারা সামাজিক কর্তব্য পালনের জন্য কোন পুরস্কার গ্রহণ করে না। যে কেউ যখন তখন আগুয়া হওয়ার জন্যে অনুরুদ্ধ হতে পারে।

উপরোক্ত প্রথা ১৯৩৫-৪০ সাল পর্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, এখন কমে আসছে।

আদিম সমাজে যে কোন স্বাস্থ্যবান যুবক অথবা স্বাস্থ্যবতী যুবতীকেই সুন্দর বলে গণ্য করা হয়। সুতরাং পাত্রপাত্রীর ব্যক্তিগত উপার্জনক্ষমতা ছাড়া আর কিছু বিচার করার ব্যাপার নেই।

বিবাহ যে কোন দিন এবং পাত্র বা পাত্রীর যে কারো বাড়িতে হতে পারে। প্রকৃত বিবাহের দিন অপেক্ষা পাকা-কথার দিন আমোদফূর্তি বেশি হয়। কথা পাকা হওয়ার দিন কন্যার পিতা একটি সুরাপাত্রে কিছু টাকা কিংবা পয়সা ফেলে দিয়ে হবু জামাইকে কোলে বসিয়ে সেই পাত্র থেকে সুরা পান করায়। সুরাপাত্রের টাকা পাত্র পায়। পাত্রপক্ষ নতুন পরিচ্ছদ দিয়ে আশীর্বাদ করে, এই অনুষ্ঠানের নাম 'পান-লগন।' বিয়েব ক'দিন আগে থেকেই দুই বাড়িতে হলুদ মাখামাখি চলে।

বিয়েব জন্যে যে আসর বানানো হয়, তার নাম 'মারোয়া।' মারোয়াতে

মাটিতে লেপা একটা খুঁটি পোঁতা থাকবেই থাকবে। বিয়ের আসরে সিঁদুর লাগানোই আসল ব্যাপার। বিবাহের কোন মন্ত্র নেই। কোন পুরোহিতেরও প্রয়োজন নেই। সিঁদুর লাগানোর পর পাত্রপাত্রী উভয় পক্ষের তরুণতরুণীরা (বরবধূসহ) কোন নদীর পাড়ে গিয়ে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলে। যে খেলাতে বালিকারা হারবেই হারবে। মারোয়াতে বিয়ের আসরে বসার আগে বরের সঙ্গে আশপাশের কোন গাছের (বিশেষ করে আমগাছের) বিয়ে হয়; একে বলে 'আম্বা-বিযা।'

ক্রমসঙ্কুচিত আদিম সমাজের পক্ষে এই অতি দীর্ঘ বিবাহপ্রথা একেবারেই বেমানান। তাছাড়া মজুরি অর্থনীতিতে নারীরা নতুন প্রাধান্য পেয়েছে। পিতৃশাসনের শক্ত মুঠো একেবারে আলগা হয়ে গেছে। বর্তমানে ছেলে-মেয়েরা তাদের ইচ্ছেমত বিয়ে করছে। ফলে, শাস্ত্রীয় বিয়েব সংখ্যা কমে আসছে।

বছর	মা-বাবার স্থিরীকৃত শাস্ত্রীয় বিয়ের সংখ্যা	ট্যাবু ভেঙে বিবাহপূর্ব যৌন-মিলন-জনিত বিয়ের সংখ্যা
১৯৬০	৬২	৮০
১৯৬১	৬৮	১০০
১৯৬২	৫৬	১৪৫
সমীক্ষার বছর ১৯৬২		সমীক্ষাভুক্ত জনসংখ্যা ৫০০০

শাস্ত্রীয় বিবাহ ছাড়া আরও চারটি বিবাহরীতি চা-শ্রমিকদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ১. স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের সম্মতিতে বিবাহপূর্বে বা বিবাহগণ্ডির বাইরে যৌনমিলনের ফলে বিবাহ ২. নারীর কোন সম্মতি বা অসম্মতির অপেক্ষা না রেখে গায়ের জোরে পুরুষ তাকে বিয়ে করে ৩. নারীও জোর করে পুরুষেব পাণিপীড়ন করে ৪. ধাঙ্গড়-খাটা অথবা মাতৃকেন্দ্রিক বিবাহ।

বছর	পুরুষের জোর করে বিয়ের সংখ্যা	নারীর জোর করে বিয়ের সংখ্যা
১৯৬০	৫	×
১৯৬১	৮	২
১৯৬২	৭	×
	মোট জনসংখ্যা ৫০০০	

আদিম সমাজের বিবাহপূর্বে যৌনমিলন আর অগ্রসর সমাজের প্রেমজনিত বিবাহ গুণগতভাবে আলাদা। আদিম সমাজে প্রেমেব কোন নিদর্শন নেই। প্রকৃতপক্ষে 'প্রেম' অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল একটা মানসিক প্রবণতা মাত্র। এটা ভাববার কোন কারণ নেই যে, প্রেম আদিম ও প্রাকৃত। বৈষয়িক ব্যবস্থার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যৌনস্বাধীনতায় ভাঁটা পড়েছিল। চা-শ্রমিকদের মধ্যেও বিবাহপূর্বে প্রেম দেখা যায় না, কিন্তু বিয়েব আগে যৌনমিলন অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে, যৌনমিলন এবং বিবাহ একে অন্যকে অনুসরণ করে না। এই ধরনের বিয়ে কোন অনুষ্ঠান দিয়ে পাকা করা হয় না। স্ত্রীপুরুষ একত্রে বসবাস করার বহুদিন পরে কেউ কেউ শাস্ত্রীয় রীতিতে বিয়ে পাকা করে। অবশ্য নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ে হলেই এই প্রশ্ন ওঠে। স্বামী-স্ত্রী বিভিন্ন গোষ্ঠী বা জাতির হলে এই প্রশ্ন ওঠে না। তবে বিয়ে হওয়া আর না-হওয়ার মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ কমে আসছে। নিরবচ্ছিন্ন সহবাসকেই বিবাহের পরিপূরক হিসাবে সবাই গ্রহণ করেছে। হিন্দু প্যানথিয়নের ছত্রছায়া থেকে এটা এক পা বেরিয়ে যাওয়া।

ম্যাট্রিলোকাল (জননী-কেন্দ্রিক) বিবাহ প্রথার এখনও কিছু কিছু নিদর্শন পাওযা যায। নিজের কন্যার জন্য পাত্র নির্বাচন কবে তাকে বাড়িতে নিয়ে এসে রাখা হয। বিয়ের আগে অন্তত এক থেকে দু বছর বেচারাকে বরের শিক্ষানবিশি করতে হয। এই সময়ে হবু-জামাইযের উপার্জনের ওপর শ্বশুর-বাড়ির পুরোপুরি নিযন্ত্রণ থাকে। তাকে দেখেশুনে খুশি হলে জামাইকে শাস্ত্রীয বিয়ে দিযে পাকাপোক্ত জামাই করা হয, অখুশি হলে তাড়িয়ে দেওয়া হয। কিন্তু বিয়ে না হলেও (জামাইয়ের শিক্ষানবিশির কালে) হবু বরবধূর যৌন-মিলনের কোন বাধা নেই। দু একটি সন্তান হওযার পরও শিক্ষানবিশ জামাইকে তাড়িযে দেওয়া হয়েছে এমন নিদর্শন পাওযা যায়।

স্ত্রী স্বামীব চেয়ে ৭-১৫ বছরের বড়	স্বামী স্ত্রীর চেয়ে ১০-৮ বছরের বড়	স্বামী স্ত্রীর চেয়ে ৩-৯ বছরের বড়	মোট দম্পতির সংখ্যা
১২৫	২২১	৬৫০	১০০০

সমীক্ষার বছর ১৯৬২ মোট জনসংখ্যা ৫০০০

স্বামী-স্ত্রীর বয়স নিয়ে চা-শ্রমিকরা একটুও মাথা ঘামায় না। প্রথম বিয়ে করবার বয়স ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। ছেলেরা বিশ-বাইশ আর মেয়েরা আঠারো থেকে বিশের মতো বয়সে বিয়ে করে। মূল পরিবার যতদিন সম্ভব অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের উপার্জন ভোগ করতে চায়।

বড় ভাইয়ের স্ত্রী এবং স্ত্রীর ছোট বোনকে বিয়ে করা খুব সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু বড় শ্যালিকাকে বা ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে বিয়ে করার একটি উদাহরণও এই সমীক্ষাতে পাওয়া যায় নি। ইনসেস্ট বা নিজের রক্ত সম্পর্কের মধ্যে যৌনসংযোগ সাধারণত হয় না। একমাত্র আপন ভাইবোন ও খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাইবোনে ছাড়া সম্পর্কিত অন্য ভাইবোনে (কাজিন) বিবাহ চলে। একটি ক্ষেত্রে মামিমাকে এবং অন্য আরেকটি ক্ষেত্রে কাকিমাকে স্ত্রী হিসাবে রাখারও নিদর্শন পাওয়া গেছে।

আদিম জীবনে টোটেম সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনশীল প্রতীক। এই প্রতীকের বিবর্তনের মধ্যে প্রাচীন শ্রেণীসংগ্রামের নিদর্শন পাওয়া যায়। একই টোটেম আছে এমন স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ হওয়া ট্যাবু। ট্যাবু আর টোটেম শ্যামদেশীয় যমজ, একজন অন্যজন ছাড়া বাঁচতে পারে না। বর্তমান আলোচনার জন্য খুব বেশি প্রয়োজন না হলেও টোটেম নিয়ে সামান্য আলোচনার দরকার আছে।

'যেসব জীবজন্তুর ওপর আদিম মানুষ তার খাদ্যের জন্যে নির্ভর করত, সে সম্পর্কে তাদের মৌল কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক এবং এটাই তার টোটেম।' রবার্ট ব্রিফল্ট/দি মাদার (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)/পৃ ২৫৯।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিমদের মতো র‍্যাড্‌ক্লিপ্‌ ব্রাউন উপরোক্ত অনুমানের প্রমাণ পেয়েছেন র‍্যাডক্লিপ ব্রাউন ('মেথড ইন সোশ্যাল অ্যানথ্রোপোলজি', পৃ ১৭-১৮)। কিন্তু কোন এক সময়ে টোটেমকে গোত্র হিসাবে উপজাতিরা গণ্য করতে থাকে—যাতে ভূমির মালিকানা বংশানুক্রমে বর্তায়। আদিম কৃষির নিয়ামকরা মূল টোটেম গ্রহণ করল। আদিম সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠী, উপগোষ্ঠী এবং অনুগোষ্ঠীরা নতুন টোটেমচিহ্ন বেছে নিল। কৃষির কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের যে যত কাছে, তার টোটেম তত মানবিক এবং বোধগম্য হল আর যে যত দূরে, তার টোটেমচিহ্ন তত কিম্ভূতকিমাকার, বিমূর্ত এবং অবোধ্য হল। আমি চা-শ্রমিকদের মধ্যে যত টোটেম সংগ্রহ করেছি, তার মধ্যে বিমূর্ত

টোটেমের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। আদি চিত্রকল্প এবং বিমূর্ত ভাবের প্রকাশ টোটেমের মধ্যে মানুষ প্রথমে আবিষ্কার করে, এটা অনুমান করা সহজ।

কিন্তু চা-শিল্পে উপজাতীয় শ্রমিকরা একশো দেড়শো বছর কাজ করছে, তবু এমন কোন টোটেম পাওয়া যায় নি যা চা-শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তার কারণ, উপজাতিরা যখন এই শিল্পে আসেন তখন টোটেমের অবক্ষয়িত মূল্যবোধের কোন প্রভাব শ্রমিকজীবনে ছিল না। টোটেম তখন লিজেণ্ড বা লোককথায় পরিণত হয়েছে।

ট্যাবু পলিনেশীয় শব্দ। ট্যাবুর বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এই প্রবন্ধে নেই। এক জাতের (ক্ল্যান) সঙ্গে আরেক জাতের বিয়ে হওয়া ট্যাবু। এ ব্যাপারে বিস্তৃত তালিকা সংক্ষিপ্তকরণের জন্যে বাদ দেওয়া হল।

ট্যাবু ভেঙে বিয়ে হলে (অনুলোম বা প্রতিলোম যাই হোক না কেন) চা-বাগানে এখন তুলকালাম কাণ্ড হয়। তবে এখন যত গর্জন তত বর্ষণ হয় না। আগে এই ট্যাবু ভাঙলে নিষ্ঠুরতম আদিম বিচার হত। মাত্র ক'বছর আগের একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ডুয়ার্সের একটি বাগানে একটি উচ্চবর্ণের ছেলে নিম্নবর্ণের একটি মেয়েকে বিয়ে করে। মেয়ের দলের লোকজন বেশি ছিল, সুতরাং তারা পঞ্চায়েত বসাল। পঞ্চায়েতে ছেলেটিকে অভিযুক্ত করে মোটা জরিমানা করা হল। অভিযুক্তের পক্ষে সেই জরিমানা দেওয়া একেবারেই সাধ্যের অতীত, সুতরাং সে দিতে পারবে না একথা পঞ্চায়েতের মাননীয় সদস্যদের জানাল। সারাদিন সেই অভিযুক্তকে আটকে রাখা হল এবং সন্ধ্যার পর বহু লোকের সামনে এবার মেয়েটিকে আনা হল এবং তাকে উলঙ্গ করে তার যোনিতে দই রেখে ছেলেটিকে সেই জায়গা থেকে দই চেটে খেতে বাধ্য করা হল। এ ঘটনার জন্যে একটা উত্তেজনাপূর্ণ মামলা হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। ঘটনা ঘটে ১৯৫৯ সালে। ওপরের এই শাস্তিদানের পদ্ধতির নাম 'দধি চাটোয়া।' চা-বাগানে ট্যাবু ভেঙে যারা যৌন অপরাধ করে, সেখানে অপরাধী যদি প্রচুর কন্যাপণ দিতে অশক্ত হয় তবে তাকে প্রথমে শারীরিক নির্যাতন করার পর 'দধি চাটোয়া' হয়। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত দধি চাটানোর রীতি চা-বাগানে প্রচুর দেখা যেত। বর্তমানে দু' একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া এই প্রথা প্রায় লুপ্ত হয়েছে।

সর্দার-শ্রেণীর কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূদের নিয়ে পঞ্চায়েত গঠন করা হয়।

পঞ্চায়েতের বিচারের ব্যাপারটা প্রহসন। পুরুষপক্ষকে আগে থেকেই দোষী ভেবে রাখা হয়। কন্যাপণ আদায় করা এবং যতটা সম্ভব বেশি আদায় করা এই পঞ্চায়েতের একমাত্র উদ্দেশ্য। কন্যাপক্ষের ভাগ কন্যাপক্ষ ছাড়া 'পঞ্চ'রাও পায়, সেজন্যে এই জরিমানার অঙ্কবৃদ্ধিতে তাদের স্বার্থ আছে। জরিমানার পরিমাণ পঞ্চাশ টাকা থেকে চারশো টাকায় সীমাবদ্ধ থাকে।

পঞ্চায়েতের নিষ্ঠুর বিচারপদ্ধতি ও অতিরিক্ত খবরদারি আজকাল কেউ পছন্দ করে না। তাই ট্যাবু ভেঙে বিয়ে করার আগে তরুণতরুণীরা গির্জাতে গিয়ে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে, তারপর খ্রীষ্টানমতে বিয়ে করে। খ্রীষ্টান হলে আদিম সমাজের কোন এক্তিয়ার তাদের ওপর থাকে না। ডুয়ার্সের চা-বাগানে এই কারণে বিপুলসংখ্যক তরুণতরুণী খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নিচ্ছে।

এই আদিম মানব মানবীদের যৌনজীবন সুস্থ। ১. এদের মধ্যে সমকামিতা একেবারেই নেই ২. যৌনমিলনের আগে শৃঙ্গারের ভাগ খুব কম। চুম্বন ইত্যাদির প্রচলন প্রায় নেই ৩. স্বমৈথুনের নিদর্শন পাওয়া যায় না ৪. নির্বিচারে যৌন আচরণ প্রচুর এবং ব্যাপক; ৫. গণিকাবৃত্তি নেই।

বিবাদ-বিচ্ছেদ সংবাদ

সমীক্ষার বছর ১৯৬২

মোট নারীর সংখ্যা ১০০০	মোট পুরুষের সংখ্যা ১০০০	
	নারীর সংখ্যা	পুরুষের সংখ্যা
এক বিবাহে স্থিতা / স্থিত	৪৩৫	৫০০
দুই বিবাহে " "	৩৬৫	২৮৫
তিন " " "	১৭০	১৬০
চার " " "	৩০	৫৫
	১০০০	১০০০

চা-শ্রমিকদের বিবাহ এবং বিচ্ছেদ দুটোই ঘন ঘন হয়। বিবাহ-বিচ্ছেদের মূল কারণগুলো নিচে দেওয়া হল: ১. স্বামী বা স্ত্রীর অলসতা ও কায়িক শ্রমে বিমুখতা। ২. পুরুষের ক্লীবত্ব এবং নারীর বন্ধ্যাত্ব। ৩. স্বামী বা স্ত্রীর অত্যধিক পান-দোষ এবং অত্যাচার করার প্রবণতা। ৪. স্বামী বা স্ত্রীর অনুপস্থিতি।

চা-শিল্পের মজুরি অর্থনীতিতে নারীপ্রাধান্যের যে সূচনা হয়েছে, তার প্রভাবে বিবাহ জননী-কেন্দ্রিক হওয়ার দিকে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। আদিম উপজাতীয় জীবনের অবক্ষয়ের মতো বিবাহরীতি নতুন পরিবর্তন লাভ করবার জন্যে যে কোন নৃবিজ্ঞানীকে অসীম ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে।

মানুষের একটাই রাস্তা

দিলীপ সেন

যে রাস্তা
শুধু আমার সঙ্গে সঙ্গে—
দুবেলা হাঁটে :
যাব দুচোখে আমার চোখ রেখে
আমি আমার পাযেব শব্দ
দিনরাত মিলিযে নিচ্ছি।
যার বুকের মধ্যে
আমি শুধু শুনতে পাচ্ছি
জলের প্রচণ্ড ধারার মত
আমার জীবনের স্পন্দন
নিয়তই বাজছে।
যে আমাকে বলত সারাদিন :
আকাশের এক উজ্জ্বল গ্রহ
গভীর অন্ধকারে সে দেখেছে ;
সে নাকি দেখেছে
তার শেষপ্রান্তে এক নদী
ঘাসপাতার সবুজ মাঠে
ঢেউয়ের তালি বাজাতে বাজাতে
চারপাশে ছুটছে।

গোটা পৃথিবীর জন্যেই
কে নাকি লিখেছিল এই গল্পটা
এক আকাশেব নিচে
মানুষের একটাই রাস্তা।
তারপর থেকেই—
যেন এই গল্পটা
খাওয়া-পরার এক নেশার মতই
লোকের মুখে মুখে
ছড়াতে লাগল ক্রমশ।

সময়টা ঠিক কখন মনে পড়ে না :
শুধু—
সারি সারি নদীর মত কারা
গল্পটা শোনাতে শোনাতে
এক অন্ধকার গর্তের মুখোমুখি এসে
আমাকে বলেছিল—
আলোর তরঙ্গ হতে।
সেদিন থেকেই—
এই রাস্তার ধুলোমাটি আঁকড়ে
আমি রেখে আসছি
ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্রের ধ্বনিতে
কি ভীষণ এক একটা ক্ষুধার্ত বছর।
আমি জানি
এই সব ভাঙা মাটির ভগ্নস্তূপগুলো
আগুনের অসহ্য দাহ নিয়ে
জাজ্জ্বল্যমান স্মৃতির মতই
জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে পেছনে।
যে জায়গাটায় আমি এখন দাঁড়িয়ে :
তার পাশেই—
গড়িয়ে যাওয়া এক অন্ধকার খাদ
থমথম করছে চারপাশ নিয়ে।
আকাশে এখন মেঘ
হয়ত ঝড় উঠবে :
এই ভেবেই
রাস্তার দুধারে আমি যখন
ইট কাঠ পাথরের সংকল্প গড়ছি,
হুবহু আমার মতন কে যেন
আমাকেই ভেংচে
মাঠ গাছ আলো হাওয়া হাট শূন্য করা
আটকাট বন্ধের দেয়াল থেকে
কি ভীষণ চিৎকার করে—
আকাশে গাল পাড়ছে।

ভারশূন্যতায়

অমিয়কুমার সরকার

অনেক খুঁজে-পেতে মোসাদেক মিঞা নয়া-আস্তানায় এসে ঢুকল। এমন পাকাপোক্ত-মাথা-ছাউনি সুদৃশ্য দুর্ভেদ্য আশ্রয় আর কোথায় মিলবে এই কলকাতা শহরে। এ তো খোদাকা মঞ্জিল। কোথায় মোমিনপুরের ছেঁদো বটতলা আর মৌলালির এই কর্মব্যস্ত জমজমাট ট্যাঁস-ফিরিঙ্গি-মুসলমানের পাড়া—বলতে গেলে সোজা দোজখ্ থেকে বেহেস্তে।

হাঁ-করা ড্রেনপাইপে ঢোকবার মুখে ছেঁড়া চটখানা ফুরফুরে হাওয়ায় কেমন দোল খাচ্ছে—মোসাদেক ভেতর থেকে শুয়ে শুয়ে দেখে। দিবানিদ্রার নিশ্চিন্ত আরামের আমেজটুকু আজও লেগে রয়েছে চোখেমুখে। আড়ামোড়া ভাঙল।—হাই তুলে বিড়ি ধরিয়ে নিরিখ করলে পাইপের ভেতরটা, একদম নীরেট লোহা। এমন নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে ত বাপের জন্মে থাকে নি।

কখন-খাওয়া পানের ছিব্‌ড়ের কয়েকটি জিভের ডগা দিয়ে দাঁতের তলায় পিষতে লাগল আপন মনে। বাইরে চোখে পড়ল ট্রামগাড়ির গড় গড় করে চলে যাওয়া, কানে ভেসে এল একা গাড়ির চক্ চক্ আওয়াজ।

নীল আশমানের দিকে চেয়ে চেয়ে মিঞা খোশমেজাজে বিড়ি টানতে লাগল। টানের ধোঁয়া ফুরোতে দিল্‌টা চিড় খেয়ে গেল অল্পেতে। পাশ ফিরে রসুনবিবির দিকে নজর পড়তে মুখের স্বাদটা তেতো-তেতো লাগল। মনে পড়ল বিবির জিদের কথা, গোঁসার কথা।

শ্যালির বিটি দোজখের কীট—দোজখ ছেড়ে নড়বে কোথা? জন্মের-শোধ ওর মোমিনপুরে—এখানে বেহেস্তের হাওয়া সইবে কেন? আসা ইস্তক

ছোঁক্ ছোঁক্। ঝকমারি আর কারে বলে? বিবির মন ভরে না, ভরতে চায় না। না হলে, এমন আস্তানা শালা কজনের নসিবে ছিকে ছেঁড়ে? জান থাকতে মিঞা এখান থেকে নড়ছে না, হুঁ।

নিবু-বিড়িটা দুবার ফালতু টেনে মাজার লুঙ্গির গেরোটা মজবুত করে বেঁধে উঠে বসলে মিঞা।

পাইপের মধ্যে এদিক-ওদিক চাইলে। ঘাড়ে হাতের আঙুল দিয়ে ঘসর্ ঘসর্ করে দাদ চুলকাতে বিবির ঘুম চটে গেল। মুখে বিরক্তি দেখিয়ে, পাশ ঘুরে আবার শুলে বিবি।

মিঞা চটে লাল। মুখে কিছু বললে না। মনে মনে ভাবলে, খোদার খাসি, চৌপর-আরাম কদিন আগে কোথায় ছিল, হারামজাদী।

মোমিনপুরের বটতলা থেকে সব টেনে টেনে আনতে হয়েছে মোসাদেককে, গোটা সংসারটা। ধুধ্বুড়ি কম্বল, ভাঙা-কলাই-চটা দুটি পান্তার পাত্তর, ধুকড়ি মাদুর, ভিক্ষের কৌটো, বিবির টিনের ভাঙা স্যুটকেশ—এমন কি টাঙানো আশমানের-তারা-দেখা শতচ্ছিন্ন-তেরপলটা—সব কিছু টেনে টেনে বয়ে এনেছে মোসাদেক। ফকিরি করে সংসার চলত—ঝাড়ফুঁকের তাবিজ, মাদুলি, ঘুন্সি, কড়ি—খুঁটে খুঁটে তুলে একদিন মগরেবের নমাজের সময় চলে এল মৌলালির আস্তানায়। পেছন পেছন গোঁ-ধরে রসুনবিবি।

মিঞা হাঁপাতে লাগল এতখানি হাঁটাপথে এসে। একপাশে বিবিকে বসিয়ে রেখে কাঁধের নোঙ্গা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খেলে—দমটা তবু ত যেন হঠাৎ অল্পেতে 'ফুইরে' যাচ্ছে। শালার হাঁপানিটা সুযোগ বুঝে ফাওটার মতো লেগে রইল।

পড়ে রইল ঘর-সংসার। মিঞা গুটি গুটি পাইপের মধ্যে ছেঁড়া মাদুর-খানায় শুয়ে পড়ল। চোখে-কম-দেখা রসুনবিবি ব্যাপারটি মালুম পেলে, জলদি পুঁটলি খুলে ছোট একটা শিশি থেকে কয়েক ফোঁটা তেল ডানহাতের তেলোয় নিয়ে নিচু হয়ে পাইপে ঢুকল মিঞার কাছে। মুখে থুথু ছিটিয়ে বললে, 'ফকিরের শখ দেখে বাঁচিনে, নবাব হবেন কলকাতায় এসে—ব্যাটা মর, মরণ হয় না?'

কাঁচা-পাকা নুরের গুচ্ছ সরিয়ে মাদুলিটা একপাশে রেখে মিঞার বুকটায় মালিশ করতে লাগল টেনে টেনে। মিঞা জন্তুর মতো খানিকটা গোঁ গোঁ

করলে। বিবির হাতের মালিশে ফয়দা হল। কলজের হাওয়া সরেস হয়ে মিঞা বাঁচল।

ফকিরের জান্, একটু পরে উঠে ছিটানো জিনিসপত্তর টানাটানি করতে বিবি কুত্তীর মতো খেঁকিয়ে উঠল, 'আমার পযগম্বর এ্যালেন, মরদগিরি ফলাতে এযেছিস্ ব্যাটা—দূব হ সামনে থেকে।'

মিঞা আমতা আমতা করে কেটে পড়ল।

নিজের হাতে রসুনবিবি ছড়ানো জিনিসপত্তরগুলো একে একে জড়ো করে পাইপের মধ্যে ঢোকালে। একে কম-দেখা-চোখ, তায় বার্ধক্যে-নুযে-পড়া-তসবির, একটুতে এলিয়ে পড়ল। বিবি পাইপের মধ্যে হাঁপাতে লাগল। তবুও একহাতে সাতি-ছিরকুটি সংসাবটা গোছ করে নিলে ফুস্-মন্তরে।

মোসাদেক ফিরে মুখ টিপে টিপে হাসে আর দেখে। নিশ্চিন্ত মনে ফুঁ দিযে বিড়িব মুখ উল্টে দাঁতের ফাঁকে চেপে দেশলাই ঠুকে একগাল পরিতৃপ্তির ধেঁায়া ছাড়লে। এখানে পালিযে আসা সার্থক হয়েছে তবে! মুখে খুশির ঝলক খেলে গেল মিঞার।

উঁকি মেরে দেখলে পাইপের ভেতরটা—মোমের বাতিতে বিবির মুখটা দেখা যাচ্ছে—বাস্‌রে, একদম তেলো হাঁড়ি, ভেতরের প্রাণডায়. খচ্ খচ্ করছে অবুঝেব কাঁটাটি।

মিঞা অস্ফুট আর্তনাদ করলে, 'তেনার আস্তানাটা তবে পছন্দের লয়।' ফুর্তির-ফোলা-মনটি মিইযে গেল মোসাদেকের দেখামাত্তর।

পাইপে আর ঢোকা হল না, উল্টো মুখে ঘেয়ো পাঁচিলটার দিকে তাকিয়ে মনে করতে লাগল মোমিনপুরের বিচ্ছিরি ছবিটা।

পরদিন সন্ধ্যায পাইপ থেকে হামাগুড়ি মেরে বেরিযে এল মোসাদেক বাঁচার ফন্দি-ফিকির খুঁজতে। নজর করে দেখলে বাইরের অবস্থাটা—এধার-ওধার ছোটবড সংসারে রাতেব খানা চডেছে। ধোঁযায় কিছু আর দেখা যায় না। মিঞা চোখ দুটি রগড়ালে, জ্বালা করছে।

রাতের মতো খানকতক পোড়াকটি আর পাদরিদের দেওয়া গমের খিচুড়ি রাখা আছে, বিবির পেটেব জ্বালা মিটবে। মিঞা প্রায়-অন্ধকারে ধোঁয়ার মধ্যে ওযেলেস্‌লির পথে পা বাডালে তাড়ির খোঁজে। কদিন না পেটে

পড়ে এ্যাইস্যা ফুলে রয়েছে, সেই সঙ্গে শালার মনটা ম্যাজ ম্যাজ করছে—এক ঢোঁক না গিললে নয়।

এঁদো-গলির ভাঙা দরজায় টোকা দিতে বেরিয়ে এল মকবুল—পুরনো দোস্ত, মিঞাকে নিয়ে চলল তাড়ি গেলাতে।

শুঁড়িখানায় ট্যাঁক ফাঁক করে টল্‌তে টল্‌তে ফিরে এল মোসাদেক আস্তানার কাছে। অন্ধকারে দেখলে কালো কালো পাইপগুলো মড়ার মতো পড়ে, ভেতরের আদমিগুলোর শান্ আছে কিনা বোঝা শক্ত বাইরে থেকে। মিঞা কেমন হক্‌চকিয়ে গেল। দু একটা পাইপের কাছে মুখ নিয়ে দেখলে, কী মনে করে ঢাকা চট্‌টি এক ঝটকায় টানতেই একদম বুরবাক্ বনে গেল।

'স্‌চু স্‌চু'—নিমেষে মিঞার মুখে আওয়াজটি বেরিয়ে এল। তাড়ির ঘোরে বুঝি আবোল-তাবোল দেখছে।

পাইপের ভেতর থেকে হেঁড়ে গলায় কে বলে উঠল—বেল্লিক কাহাঁকা···ভাগ্, শালা শূয়ার কা বাচ্চা···

মাথাটা ঘুরে গেল মোসাদেকের—বেহুঁসের মতো হেঁটে হেঁটে বহুৎ কষ্টে নিজের আস্তানাটা খুঁজে বের করলে।

ভেতরে ঢুকে টের পেলে মুখে ভক্ ভক্ করে গন্ধ ছাড়ছে। রসুনবিবি নাক সিঁটকালে, গায়ের আঁচলটা ভালো করে টেনে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে পড়ল। মিঞা আপন খেয়ালে বক্‌বক্ করে ছেঁড়া মাদুরখানায় দেহ এলিয়ে দিল রাতের মতো।

ঘুম ভাঙতে দেখলে চারিদিক রোদে ঝক্‌ঝক্ করছে। রাতের ভূতো ভূতো পাইপগুলো এখন তেল চুক্‌চুকে—ভেতর থেকে কলর-বলর আওয়াজ বেরুচ্ছে। মিঞা পাইপ থেকে বেরিয়ে এল, হাত দুটো টান্‌টান করে গায়ের ব্যথায় একটু আরামের প্রলেপ দিয়ে সোজা রাস্তার কলে চোখেমুখে পানির ছিটে দিয়ে নিলে।

এবার রোজগারের ধান্ধা। রসুনবিবিকে পাইপ থেকে নিয়ে বের হল। চাকার গাড়িতে বসিয়ে ঠেলে ঠেলে চলল রাস্তায় রাস্তায়।

প্রচণ্ড রোদ মাথায় করে ইণ্টালি, ফুলবাগান, বেনেপুকুর, সি-আই-টি ঘুরতে লাগল একনাগাড়ে।

উঁচু-মহলের জানলা নিরিখ করে ভাঙা কর্কশ গলায় মিঞা ভিখ্ মাগে। চাকার গাড়ি থেকে রসুনবিবি গলা মিলিয়ে ছুঁড়ে দেয় করুণ একটানা চিৎকার—আল্লাই দেগাঃ, আল্লাই দেগাঃ।

জানলা থেকে কিছু কিছু পয়সা মাটির টানে আল্লার মেহেরবানির মতো নেমে আসে। মিঞা কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড়ো করে বিবির হাতের মুঠোয়।

সন্ধ্যার আগে মোসাদেককে ফিরতে হয় আস্তানায়। সারাদিনের ধকলে রাস্তা ঠেঙানো আর সম্ভব নয়। বিবিকে ঠেলাগাড়ি থেকে নামিয়ে হাত ধরে ঢুকিয়ে দেয় পাইপের মধ্যে। ছেঁড়া মাদুরখানায় বিবি দেহটা এলিয়ে দেয় ধকল সামলাতে। কাঠের বাক্সে একঠাঁই বসে আড়ষ্ট পিঠের শিরদাঁড়াটা টন্‌টন্ করে—বহুৎ তক্‌লিফের কাম্।

মিঞা বাইরে বসে গুনতি করে বিবির হাত থেকে নেওয়া পয়সাগুলো।

এমনি করে কাটে দিনগুলো, রোজগারের কৌটো কোনদিন বিলকুল ফাঁকা, টকাস্ টকাস্ আওয়াজ ফোটে আঙুল বাজালে, কোনদিন বা তাড়ির গেঁজার মতো উপচে ওঠে তামার পয়সাগুলো।

আশমানটা মেঘে ভরে কদিন পানি ঝরতে লাগল কলকাতায়। পাইপের মধ্যে মাথা গুঁজে বিবি আঙুল টিপে টিপে মাথার উকুন বাছে সন্ধে থেকে। সময় আর কাটতে চায় না। মোমের বাতিটা জ্বালল সেঁতো দেশলাই ঘসে ঘসে। মিঞার পাত্তা নেই, কোন চুলোয় গেছে, আল্লাই জানেন। বিবি মালাই-পোড়া লাগালে পায়ের হাজাতে আঙুল ফাঁক করে। জ্বলুনিতে অস্বস্তির ছাপ লেগে রইল মুখখানায়। হাতে কাজ না পেয়ে শুয়ে পড়লে সকাল সকাল।

মিঞার অপেক্ষায় নিস্তব্ধ পাইপে মোমের গা বেয়ে শুধু আঁসুর মতো টস্‌টস্ করে মোম গলে গলে ঝরতে লাগল।

জুয়োর-আড্ডায় আক্কেল-সেলামি দিয়ে মিঞা চুপিচুপি আস্তানায় ঢুকলে। সর্বাঙ্গ ভিজে চপ্ চপ্। ভেতরের নিবু নিবু বাতিতে দেখতে পেলে রসুনবিবি মড়ার মতো পড়ে রয়েছে। বৃষ্টির ছাঁট লাগছে, ভ্রূক্ষেপ নেই।

আশমানটা হঠাৎ বিজলির ঝিলিক মেরে হুড়মুড়িয়ে নামল। মিঞা বাড়িয়ে ছেঁড়া চটখানা জলদি টেনে হাতে নিল বৃষ্টির ছাঁট আটকাতে, বাতিটার

দফা গয়া। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঠাহর পেলে বিবি ঠাণ্ডায় কাঁপছে। ছেঁড়া কাঁথাটা গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে মিঞা বিড়ি ধরালে একটা। দেশলাইয়ের কাঠির আলোয় বিবির দিকে মুখ করে ফিস্ ফিস্ করে বললে, 'তোর ছেঁদো বটতলা নয়, শালা আশমানের পানি ঝরবে টাপুস্ টপুস্।'

ওদিক থেকে বিবির সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, ঘুমিয়ে একেবারে কাদা। ভিজে বিড়িটা বেমক্কা নিভে গেল। বিরক্তিকর মুখে ছুড়ে ফেললে মিঞা। হামাগুড়ি মেরে পাইপের মুখে উঠে চটের পর্দা ফাঁক করে বাইরেটা একবার দেখলে। সব পরিবার বিলকুল সেঁধিয়ে গেছে নিজের নিজের গর্তে, কোনদিক থেকে কোন রা-টি নেই। শুধু আথার ছাইতে পানি পড়ে বজ্ বজ্ করছে।

সি-আই-টি রোড ধরে দোতলা বাসগুলো দৈত্যের মতো গোঁ গোঁ করে রাত দুপুর পর্যন্ত একটানা চলে। চোখ বুঁজে কান পেতে মিঞা সময় মালুম পায় ঠিকঠিক।

দূরের নিওন-বাতিগুলো কেমন লকলক্ করছে, ছেঁড়া চটের বরফি-ফুটো দিয়ে জ্বলা-নেভার খেলাটুকু উপভোগ করতে করতে চাদরটা মাথা পর্যন্ত টেনে দিলে মিঞা।

রসুনবিবির নাক ডাকছে আপনা থেকে, গলা থেকে বেরুচ্ছে ঘড় ঘড় আওয়াজ। চোখের ঠাহর নেই বিবির···ঠেলাগাড়িটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ চিল্লায়, তেল লাগাতে হবে···নানান চিন্তার জট পাকাতে লাগল মিঞার চাদর-ঢাকা মাথায়। চোখ দুটো আস্তে আস্তে অসাড় হয়ে, জটগুলো হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

পাইপের বাইরে রাতভোর একটানা বর্ষণ চলল আপন খেয়ালে।

'ও মিঞা, মিঞা—এ যে মাঝদরিয়ার পানি,' খুনখুনে গলায় বিবি মিঞার গায়ে হাত দিয়ে ডাকছে—'কিছু তো দেখতে লারি, মলাম ডুবে।'

মিঞা ধড়ফড় করে উঠে বসলে। মাজার খুঁট থেকে দেশলাই জ্বেলে দেখলে সর্বাঙ্গ পানিতে চপ্ চপ্ করছে। মাথা নিচু করে হামাগুড়ি মেরে পাইপের বাইরে চোখ তুলে চাইলে, চারিদিক থৈ থৈ—ফিস্ ফিস্ করে বৃষ্টি ঝরছে! ঘুমধরা চোখে আঙুলে তুড়ি মেরে হাই তুলে বললে—'তোবা তোবা, শালার কলকাতা পেসাব করলে ভেসে যায়।'

মিঞা ঘুরে পাইপে ঢুকলে—কাঁধের ওপর বিবিকে বসিয়ে হামাগুড়ি মেরে

বাইরে নিয়ে এল। পাইপের ওপর-মাথায় বসিয়ে, নিচের-তোলা শুকনো কাঁথাখানা গায়ে জড়িয়ে দিতে দিতে বললে, 'রাত্‌ডার মতো কাটিয়ে দে, মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করবি তো ভালো হবে না, হুঁ।'

ভোরেব আবছা আলো ফুটতেই মৌলালির মোড মনে হোল ইচ্ছেমতীর মোহনা, কালো পাইপগুলো যেন ছোটবড ছৈওয়ালা নৌকো—ভিডেছে গঞ্জের ঘাটে।

রাস্তার পানিতে স্টেটবাসের চাকায় স্রোত খেলে—ঢেউ এসে লাগল মিঞার সাধেব আস্তানায়। মনটা চল্‌কে উঠল, নৌকোয় লাগা পানিব মতো। কতকগুলো ছোঁড়া পানি-পাযে কাগজের নৌকো ভাসাচ্ছে এই সাতসকালে। মজা পেয়েছে। মনে মনে হাসলে মিঞা ন্যাংটা বয়সের কথা ভেবে।

বেলা বাডতে রাস্তার পানি শুষে নিলে হাঁ-করা ম্যানহোলগুলো। মিঞা নোঙ্গাটি কাঁধে ফেলে বেকল খাবার ধান্ধায।

ফিরতেই পাইপেব ওপর থেকে রসুনবিবি ঘেয়ো কুত্তীর মতো কুঁই কুঁই করতে লাগল। মিঞা কাঁধ বাডিয়ে হাতদুটি জডিয়ে, পা দুখানা বুকের সামনে ঝুলিয়ে এক হ্যাঁচকায বিবিকে কাঁধের ওপর চডালে। শুয়োরের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললে, 'লে চল—ভিখ্ মেগে আসি, নসিবে আজ একদম ফক্কা।'

মিঞার কাঁধে চডে চলল রসুনবিবি। তালতলা পেরিয়ে ওয়েলেস্‌লিতে। মিঞার মুখটা বিবির ভারে দেখা যায না—নতুন-জবাগ্রস্ত মাথাটা এক নাগাডে ভিক্ষে চাইতে চাইতে চলল মিঞার পায়ে পায়ে।

মিঞা হাঁপিয়ে উঠতে রসুনবিবি টিক্‌টিক করতে লাগল। রোখ চেপে গেল মিঞার একটুতে। নোঙ্গা দিয়ে গালের ঘাম শুষে নিয়ে বললে, 'জান থাকতে কে তোরে লামায। কপচাস্ নে মেলা, হারামজাদী।'

পানিব-ছিটেয়-নিকানো কালো পিচের চক্‌চকে রাস্তার আর্শিতে কাঁধের ওপব বিবিব তসবিরটা দেখে, একটু নাচিয়ে নিলে মিঞা।

ভিক্ষের মতলবটা এদ্দিনে ঠিক যুতসই হয়েছে তবে। মিঞা হুট্ হুট্ করে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটতে লাগল জোর কদমে।

মিঞার কাঁধে চড়ে বিবির পাঁচ বছর কেটে গেল ভিখ্ মেগে। বয়স এখন বেড়েছে, চোখের মণির শাদা ছানিদুটি আলোর খাদ বুজিয়ে দিয়েছে এর মধ্যে। মুখটা তালগোল লোলচর্ম—মিঞার ভিক্ষে মাংবার অঙ্গ, দু পা বুকের সামনে ঝুলিয়ে কাঁধ থেকে কলের পুতুলের মতো এক নাগাড়ে আর্তনাদ করে—এ বাবু অন্ধজন ভিখ্ মাংছে, আপলোক কৃপা করিয়ে, মেহেরবানি করিয়ে, খোদা আপনার মঙ্গল করবে।

কাঁধের বাড়তি হাতখানা থরথর করে কাঁপে পয়সা নেবার জন্যে, মিঞা না দেখে মালুম পায় কত পড়ল ঐ হাতের গব্বায়।

ঈদ-মুবারকের দিন লাঠি ঠক্ঠক্ করে মিঞা বেরুল রসুনবিবিকে কাঁধে নিয়ে। বোঝা মাথাটা উঁচু করে রাস্তার দিকে নজর করে দেখলে—নয়া জামাকাপড় পরে বালবাচ্চারা সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছে, পিল্পিল্ করে মোল্লারা ছুটছে ময়দানের দিকে নামাজের জন্যে।

তসবিরে আজকাল যুত নেই বিবির, কাঁধের ওপর কখন ঘুমিয়ে পড়ে—মিঞা ঝটপট এদিক-ওদিক পা চালিয়ে নেয় বাড়তি রোজগারের নেশায়।

বেলা বাড়তে শেয়ালদা স্টেশন প্ল্যাটফরমে এসে উঠল।

ট্রেনের কামরায় হাত পাততে থাকল বিবি কাঁধের ওপর থেকে। মুখে একটানা পুরনো বুলি কপ্চে গেল কিছুক্ষণ।

মিঞা সারাদিন জান্ দিয়ে লড়লে।

বিকেলের রোদ নিভ্তে, ঘরে-ফেরা গরুর মতো ল্যাজ তুলে আস্তানায় ছুটল, কল্জে ফুলিয়ে মকবুলের ওখানে গিয়ে মোলাকাত করতে। গোস্ত-ভাত আর একটু ফুর্তিটুর্তির আয়োজন রেখেছে ঈদের দিন।

বিবিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে, ঘুরে দাঁড়াতেই চম্কে উঠলে মিঞা।

'ইয়া আল্লাঃ'—চিৎকার করে উঠলে ভূত দেখার মতো। বিবির হাতের মুঠো আকাঠ, হিম-ঠাণ্ডা—মরা লাশটা ঠকাস্ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মিঞা দু কদম পিছু হটে এল।

পয়সা কোথায় মুঠোর গব্বায়—বিবির প্রাণটা বেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ, কাঁধের ওপরে মিঞা মালুম পায় নি একদম, ভিখ মেগেছে মর্জিমতো লাশটা ঘাড়ে নিয়ে।

মিঞার আর্তনাদে পাইপের ভেতর থেকে পিলপিল করে লোকজন বেরিয়ে

এসে জটলা করলে। দেখলে বিবির লাশটা ছুঁয়ে মোসাদেক মাথা চাপড়াচ্ছে। দু-একজনের ফরমানে উঠে এল মিঞা।

কয়েকজনে ধরাধরি করে মোসাদেকের ভিক্ষে মাংবার অঙ্গটিকে যুতসই করে বেঁধে দিলে মাদুর আর ছেঁড়া চট দিয়ে। দলবল চলল গোরস্থানে। মাথায় হাত দিয়ে নির্বাক, হতবাক্ মিঞা চুপিসাড়ে নিঃশব্দে পা ফেলে ফেলে চলল সকলের পেছনে।

'খোদা হাফিজ্',—বিবির কবরের ওপর শেষ মাটিটুকু ফেলে মিঞা ফিরে এল পাইপের আস্তানায় ভয়ে ভয়ে।

সন্ধের বাতি জ্বালল না, অন্ধকারে পাইপে কনুইতে মাথা গুঁজে গুম্ মেরে বসে রইল। নিঃস্পৃহ ভাবে চোখ দুটো বড় বড় করে খানিকক্ষণ রাস্তার আলোয় দেখলে বিবির ফেলে-রাখা জিনিসপত্তরগুলো। সরাইয়ের খানিকটা ঠাণ্ডা পানি ঢক ঢক করে গিলে, ছেঁড়া মাদুরখানায় দেহটা এলিয়ে দিলে আপনা থেকে।

পরদিন ভোরের লালচে রোদটা সবে পাইপে ঢুকছে, স্টেটবাসের গোঁ গোঁ আওয়াজে মিঞা ঘুম ছেড়ে ধড়ফড় করে উঠে, চোখ দুটি রগড়ালে। আস্তানাটা ফাঁকা ফাঁকা লাগতে বাইরে তাকালে।

হোস্‌পাইপের পানি পিচ্‌কিরি দিয়ে পিছলে পড়ছে পাইপের গা বেয়ে—মিঞা বুঝলে বেরুতে হবে।

হামাগুড়ি মেরে উঠে দাঁড়াতেই দেহটা কেমন হাল্কা মনে হল। মিঞা আর চলতে পারছে না। একটা ভারের অভাবে, ভারসাম্য হারিয়ে কেমন যেন টলছে। দাঁড়াতে পারছে না নিজের পায়ে। কাঁধটায় বার বার হাত দিয়ে অনুভব করলে—একটা অঙ্গচ্ছেদ হয়ে গেছে। মিঞার অসহ্য লাগল, চোখ দিয়ে নামল চাপা আঁসু হু হু করে। লুঙ্গির খুঁট দিয়ে চাপলেও বাগ মানল না।

বিবি তার বইবার বোঝা ছিল না, ছিল তার রুটি রোজগারের, জিন্দেগীর বোঝা। পঙ্গু দেহটা এখন হোঁচট খেতে খেতে চলবে কিনা খোদাই জানেন।

বিপ্লবী খোকার প্রতি

সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমি এই জ্ব'লে ওঠ, কালই তুমি নিভে যেতে পার
জ্ব'লতে পারি না আমি নিভতে পারি না—
আমি এক ক্লিষ্ট ক্লিন্ন দূরবর্তী আলো
নিভন্ত কি আমি ?
আমাকে আগুন দাও কটি টুকরো, হে শুভ্র বালক
অবুঝ খোকার মত একদিন উঠতাম জ্ব'লে
সামান্য কারণে জ্বলা সরল পেট্রল
এখন ভিড়ের মধ্যে আমি
চিনতে পারি কোন চোখ শিয়ালের চোখ
এখন চিনতে পারি সে চোখের নিচে কার দাঁত
এখন আলোর রেখা মনে হয় না সরল তেমন
আমার বয়সের সব নধর হাঁসেরা
পরপব ধূতামির খোড়লের মধ্যে চলে গেছে
আমি তো সিঁড়ির নিচে যথাপূর্ব স্থানে পড়ে আছি
পাশ দিয়ে টপকে টপকে সিঁড়ি ভেঙে চলে গেল নানান লোকেরা
ষাঁড়ের একরোখা শিঙে সরাসরি ল'ড়ে ল'ড়ে ক্লান্ত হয়ে গেছি
ছুঁচের ভেতর থেকে পিছুপথে হাতি গ'লে যায়
পিঁপড়েও পারে না গ'লতে সম্মুখের সিংহদরোজায়
এ অন্যায় দেখে আমি এলোমেলো চেঁচিয়েছি তোমারই মতন
এখন বুঝেছি আমি কী দারুণ কুকুরের লেজের অন্যায়
তোমারও জন্মের লগ্নে ঋজুতার শনি ছিল, ওই স্বর শুনে বুঝি আমি
জীবন-অধীপ যারা অপ্রীতিভাজন তুমি হতে চাও সে শক্তিধরের ?
মুখে মুখে তর্ক করা, এই এক নিদারুণ ব্যাধি
তুমিও গিয়েছ পেয়ে
তুমিও আমার মত স্ব-তন্ত্রের স্ব-গহ্বরে মাথা ভরে দিয়ে
জীবনের সর্বস্ব খোয়াবে ?

তবু অন্য এক কথা জলতে জলতে মরতে পারে না
আমি তো গিয়েছি ম'রে তুমিও না হয় যাবে ম'রে
তবু যদি পৃথিবীর রকম পাল্টায়
চিৎ করে ফেলে রাখা পৃথিবীর বাহক কচ্ছপ
কোনমতে মোড ফিরে উল্টে পড়তে পারে একটিবার
সময়ের রাধাচক্র ক্রীডা
আর একটু দ্রুত পায়, এ শতকে পূর্ণ করে সময়ের অর্ধচক্রপাক
মার্কস সাহেবের তত্ত্ব অংশত সফল যদি হয়
বিষম গোলমাল। তাই আমি চোখ ফিরাই তোমাদের দিকে
তুমি বেশ মজা করে একটি কথা বল, খোকা, দুর্নীতির
মূলোৎপাটন করে দেবে
উৎকোচ মরসুমে বেঁচে আমি তো রেখেছি হাত মুঠো করে
একটি গোটা কর্মজীবনে
শহরের কটা বাডি ফাঁকির ভিতরে আছে এ হিসাব করে যদি কেউ
আমি তো দারুণ খুশি হই
এ শরীরে অগ্নি ছিল আজ তাতে কডা জমে কঠিন খোলস পড়ে
ব্যবহারিকের
আমার তো শক্তি নেই সে খোলস ঠেলে ফেলতে পারি
যতক্ষণ শ্বাস বুকে ততক্ষণ আশ পুষি মনে
সেই শীর্ণ আশ
নিরন্তর ঊর্ধ্বগত অম্লব্যাধি ঝাঁঝের মতন
বানিযেছে খোলসের পিঠে কটি ছিদ্রপথ আলোকের মুখ
আমার হাঁটবার কথা আজ ম্লান সন্ধ্যার আলোকে
তাপরিক্ত বৈকালীন আলো
বিধর্মীর মন নিয়ে হাঁটি আমি অতিতাপী দুপুরের দিকে
তাপপায়ী ভোরের আলোয়
বন্য শিশুদের মুখে আপন আদল পেয়ে স্মৃতিদগ্ধ নিধল শ্রীরাম ॥

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য

সংগ্রহ ও বণ্টনের সমস্যা

পতঞ্জলি রায়

এদেশের কোনো কোনো সমস্যা এতই পুরনো যে, আলোচনার পক্ষেও ক্লান্তিকর। কারণ, সমাধানের পথ সবই বহুবার বর্ণিত ও আলোচিত হয়েছে। অথচ, সে পথ ধরে চলার মতন দৃঢ়তা অর্জন করতে আমরা আজ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছি। তবে এবারে চতুর্থ নির্বাচনোত্তর পশ্চিম বাংলায়, আবার এ আলোচনার তাৎপর্যের এইটুকু অভিনবত্ব আছে যে, এবারেও যদি পশ্চিমবঙ্গের সরকার ও সমাজ এই সমস্যার সমাধানে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হতে ব্যর্থ হয়, তবে ব্যাপারটা ঠিক 'পুনর্মূষিকো ভব'-র মতন ঘটবে না। খাদ্যসমস্যার ব্যাপারে এবারের ব্যর্থতা দেশের সমাজ ও রাজনীতিতে এমন একটা ক্ষিপ্রগতি উল্টোরথযাত্রার সূচনা করবে যাতে 'পুনর্মূষিক নয়' মূষিকেতর কোনো অবস্থাই আমাদের ললাটের লিখন হয়ে দাঁড়াবে।

পশ্চিমবঙ্গের আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ও বণ্টন সমস্যার আলোচনার সূত্রপাতে কয়েকটি অলঙ্ঘ্য ব্যাপক শর্ত স্মরণীয় :

(ক) ভারতবর্ষের আর্থিক ও সামাজিক বিকাশের বর্তমান নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে খাদ্যের উৎপাদন, সংগ্রহ ও বণ্টনের তীব্র সংকটেই সমগ্র সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির কাঠামোর মৌল অন্তর্বিরোধ প্রকাশ পাচ্ছে। এই সংকটের ভেতর দিয়েই সামন্ততন্ত্র ও বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের অতীত দায়ভাগের সঙ্গে অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের অন্তর্লীন বিরোধ সূচিত হচ্ছে। এর ভেতর দিয়েই বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্রের নব অনুপ্রবেশের পথ তৈরি হচ্ছে। সর্বোপরি, উল্লিখিত সামন্ত ও বাণিজ্যিক শক্তিসমূহের পুনরুত্থানের ফলশ্রুতি হিসেবেই স্বতন্ত্র-জনসংঘ-কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক কাঠামোর অস্তিত্ব বিপন্ন করছে।

(খ) পশ্চিমবঙ্গ সমেত ভারতবর্ষের বাজার একটি অখণ্ড বাজার। বাজারের এই অর্থনৈতিক অখণ্ডতাই ভারতীয় রাষ্ট্রের অখণ্ডতার বাস্তব ভিত্তি। অথচ ভারত-রাষ্ট্রের কোনো সর্বভারতীয় খাদ্যনীতি নেই—এক পি. এল. ৪৮০-র আমদানি ছাড়া। সম্প্রতি সর্বভারতীয় খাদ্যনীতির ব্যাপারে গ্যাডগিল কমিটির জাতীয় খাদ্য-বাজেটের সুপারিশ ও কৃষিপণ্যের দর-নিয়ন্ত্রক কমিশনের বাধ্যতামূলক খাদ্যসংগ্রহ নীতির সুপারিশকেও কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তর অগ্রাহ্য করাই স্থির করেছেন। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব এইভাবে সর্বভারতীয় খাদ্যনীতি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে ভারতরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতাকেই বিপন্ন করছেন। এর অনিবার্য এবং মারাত্মক ফলস্বরূপ কোনো কোনো রাজনৈতিক দল রাজ্যসরকার কর্তৃক স্বীয় রাজ্যের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা রাজ্যের প্রয়োজনীয় খাদ্য আমদানির জন্য ব্যবহারের স্বাধীন অধিকার দাবি করছেন। এর একমাত্র অর্থ, ভারতরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার মূলে কুঠারাঘাত করা,—যে সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের কথা মার্কিন বই, গবেষণা ও প্রচারে যথেষ্ট সুলভ।

(গ) পশ্চিমবঙ্গের বাজার সর্বভারতীয় বাজারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, পশ্চিমবঙ্গের বাজারদর বিগত পনেরো বছর সর্বভারতীয় বাজারদরের সঙ্গে একই দিকে ওঠানামা করেছে।

(ঘ) পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, (বিশেষত উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল) মাদ্রাজ, অন্ধ্র প্রভৃতির তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে বিগত দশকে মোট কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির হার নগণ্য। পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, গুজরাট, রাজস্থান, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে মোট কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধির বাৎসরিক হার শতকরা সাড়ে ছয় ভাগ থেকে শতকরা ২½ ভাগের মধ্যে, সর্বভারতীয় বৃদ্ধির হার শতকরা ৩·৫৭, আর পশ্চিমবঙ্গে এই বৃদ্ধিহার মাত্র ০·২১। ভারতবর্ষের অন্য সব রাজ্যের চেয়েই কম। পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের একমাত্র রাজ্য যেখানে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদনের বৃদ্ধিহার বিয়োগ-ধর্মী, অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদী ঝোঁক বৃদ্ধির নয় কমতির। একরপিছু ফলনের ক্ষেত্রে এই কমতির ঝোঁকি, স্বভাবতই আরো বেশি। বিগত দশকে সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে যে ৬৭টি জেলায় মোট কৃষিউৎপাদনের বাৎসরিক বৃদ্ধির হার শতকরা ৭½ ভাগ বা তারও বেশি ছিল এবং এই যে জেলাগুলিরই

সাফল্য সর্বভাবতীয় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রধানত দায়ী, তাদেব মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের জেলা একটিও নেই। এমন কি বীরভূম বা বর্ধমানও—ময়ূরাক্ষী ও দামোদরের সেচব্যবস্থা সত্ত্বেও, এই ৬৭টি জেলার মধ্যে পড়ে না। অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘমেযাদী হিসেবে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির কোনো ভিত্তিই রচিত হয নি।

দুই

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি উল্লিখিত তথ্যসমূহের শর্তাধীন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠন সেমিনারের অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যের সংগ্রহ ও বণ্টন সমস্যার যে আলোচনা হয়েছে, তা উল্লিখিত তথ্যসমূহের পটভূমিতেই বিচার্য। এই আলোচনাচক্রে খাদ্য, বিশেষত চালের সরবরাহ সম্বন্ধে যে সব তথ্য ও বক্তব্য উপস্থিত করা হয়, সেগুলি সংগৃহীত হযেছিল একটি স্টাডি গ্রুপের চেষ্টায। প্রখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ্ ও সমাজবিজ্ঞানী অজিত দাশগুপ্তের নেতৃত্বে গঠিত এই কর্মীদলে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এস পিল্লাই, তারেশ মৈত্র, নিখিলেশ ভট্টাচার্য, সিতাংশু ভট্টাচার্য, অশোক সেন, বৌধাযন চট্টোপাধ্যায ও আরও অনেকে। সবকারি বিভাগে কর্মবত বিশেষজ্ঞদেব মধ্যে অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত, বি. আর গুপ্ত, কেদাব চট্টোপাধ্যায়, এ. কে মিত্র, কে. ডি. গুপ্ত প্রমুখের পরামর্শে এই কর্মীদলটি বিশেষ উপকৃত হয়। এই আলোচনাচক্রে উপনীত সিদ্ধান্তগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করাই এই লেখাটির উদ্দেশ্য।

(ক) ঘাটতির হিসাব

১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৬৬-৬৭ সাল পর্যন্ত ভোগ্যপণ্যের উপর পারিবারিক ব্যযের যে সব নমুনা-সমীক্ষা হযেছে, তার ভিত্তিতে দেখা যায় যে, মাথাপিছু খোরাকি চালের পরিমাণ শহরাঞ্চলে সাড়ে ৬ কেজি থেকে ৮ কেজির মধ্যে এবং গ্রামাঞ্চলে ১১ কেজি থেকে সাড়ে ১৩ কেজিব মধ্যে। যদি ধরে নেওয়া যায, শহরাঞ্চলে মাথাপিছু খোরাকি চাল সাড়ে ৬ কেজির বেশি হবে না (রেশনে সাধারণত ৪ কেজি দেওয়া হয়), এবং গ্রামাঞ্চলে সাড়ে ১১ কেজি হবে, তাহলে চালের মোট প্রযোজন দাঁড়ায় বছরে প্রায় ৫৪ লক্ষ টন। এই রাজ্যে বিগত কযেক বছরের গড় উৎপাদনেব নিরিখে ধরে নেওয়া যায়, চালের মোট বাৎসরিক উৎপাদন ৫০ লক্ষ টন। বীজধান ও ক্ষয়ক্ষতি বাবদ শতকরা ১০

ভাগ বাদ দিলে মোট যোগান দাঁড়ায় ৪৫ লক্ষ টন। অতএব, ঘাটতির পরিমাণ অনূর্ধ ১০ লক্ষ টন। শুধু আলোচনাচক্রেই পঠিত অন্য একটি নিবন্ধে কৃষিরসায়নে প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায় জানান যে, কৃষি উৎপাদনে প্রযোজনীয় সম্পদ এখনই যা আছে তার সম্যক ব্যবহার হলে এই ঘাটতি মেটানো সম্ভব।

(খ) বাজারযোগ্য উদ্বৃত্ত

জাতীয় নমুনা-সমীক্ষার তথ্যাদি থেকে বাধ্যতামূলক সংগ্রহের উপযুক্ত পরিমাণের কয়েকটি বিকল্প হিসাব পাওয়া যায়:

(১) যদি সাড়ে বারো একর পর্যন্ত জোত লেভির আওতা থেকে বাদ দেওয়া যায়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে মোট গ্রামীণ জমির শতকরা ৬ ভাগের মোট উৎপাদন উদ্বৃত্ত হিসেবে সংগ্রহযোগ্য।

(২) বীজধান ইত্যাদি বাবদ একরপিছু ২ সের ও মাথাপিছু খোরাকি ধান বাবদ দৈনিক ১ সের ছাড দেওয়া হলে দেখা যায় যে, একরপিছু মাত্র ১০ মণ উৎপাদন ধরে নিলেও, সাড়ে ৭ একর বা তদূর্ধ জোতেরই উদ্বৃত্ত থাকে। সেই হিসেবে মোট জমির শতকরা ১৩ ভাগের উৎপাদন সংগ্রহযোগ্য উদ্বৃত্ত। একই হিসেবে যদি মাথাপিছু সংবৎসরের খোরাকি বাবদ ১২ মণ ছাড দেওয়া যায়, তাহলে সংগ্রহযোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ মোট জমির শতকরা ৮ ভাগের উৎপাদন।

(৩) উল্লিখিত দুটি হিসাবই মোট জমিব উপর। যেহেতু দেখা যায় যে, কেবলমাত্র ধানজমির বিন্যাস মোট জমির বিন্যাসের তুলনায় বড় জোতের হাতে অধিক কেন্দ্রীভূত, সুতরাং, মোট জমির উপর হিসাব না করে ধানজমিব উপব হিসাব করাটাই বাঞ্ছনীয়।

দেখা যায় যে, ৫ একরের কম জোতে মোট গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭৯ ভাগ এবং মোট ধান জমির শতকরা ৪৩ ভাগ বিদ্যমান। অন্যদিকে ১০ একর বা তদূর্ধ জোতের মোট গ্রামীণ জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ৭ ভাগ ও ধানজমির প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ কেন্দ্রীভূত। সরকারেব খাদ্যনীতির উদ্দেশ্য যদি হয় মাথাপিছু খোরাকি চালের সমান বণ্টন, তাহলে ১০ একর বা তদূর্ধ জোতের হাতে শতকরা (২৫ – ৭=) ১৮ ভাগ ধান জমির উৎপাদনই উদ্বৃত্ত। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, বিভিন্ন আয়তনের জোতেব একরপিছু ফলন সমান,

তাহলে মোট উৎপাদনের শতকরা ১৮ ভাগই উদ্বৃত্ত রূপে ১০ একর বা তদূর্ধ্ব জোতের হাতে থাকে।

এই হিসাবে ভাগচাষের অধীন জমি ধরা হয় নি। একথা সুবিদিত যে, ১০ একর ও তদূর্ধ্ব জোতের মালিকরা ভাগচাষে জমি বন্দোবস্ত দেন যথেষ্ট পরিমাণে। পশ্চিমবঙ্গে ভাগচাষের অধীন জমির অংশ মোট জমির ⅓ ভাগের বেশি। আধাআধি ভাগ ধরলে উক্ত শতকরা ১৮ ভাগের সঙ্গে আরো অন্তত শতকরা ৪ ভাগ যোগ করা যায় ভাগচাষীর কাছ থেকে বড় জোতের পাওনা ভাগ বাবদ।

> মোটের উপর, কেবল মাত্র ১০ একর বা তদূর্ধ্ব জোতের কাছ থেকেই মোট ফসলের শতকরা অন্তত ২০ ভাগ, অর্থাৎ ⅕ অংশ উদ্বৃত্ত হিসেবে আদায় করা উচিত।
>
> সরকারি হিসাবে সাধারণত মোট উৎপাদনের শতকরা ৩০ ভাগ বাজারযোগ্য উদ্বৃত্ত বলে ধরা হয়। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ১০ একর ও তদূর্ধ্ব জোতের উদ্বৃত্ত ধরতে পারলেই, মোট বাজারযোগ্য উদ্বৃত্তের ⅔ অংশ সরকারের হাতে আসতে পারে। এর পরিমাণ প্রায় ১০ লক্ষ টন—যদি মোট উৎপাদন হয় ৫০ লক্ষ টন।

(গ) উদ্বৃত্ত সংগ্রহের উপায়

ঘাটতি যদি নাও থাকত, তবু বাধ্যতামূলক সংগ্রহ ব্যবস্থার প্রয়োজন হত। এর কারণ, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে বিগত যুগে জমি, কাঁচা টাকা ও বাজারের আধিপত্য এমনভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছে যে, কর্জ. দাদন, ভাগ-জমি ইত্যাদি মারফৎ বাজারজাত ফসলকে কুক্ষিগত করার অপরিসীম ক্ষমতা জোতদার-মহাজন-চালকলওয়ালা চক্রের হাতে রয়েছে।

গ্রামীণ অর্থনীতির উপর এই চক্রের আধিপত্য খর্ব না করতে পারলে ধান-চাল সংগ্রহ ব্যবস্থা ব্যর্থ হতে বাধ্য। খর্ব করার উপায় হিসেবে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি আলোচিত হয়.

(১) ব্যাঙ্ক-আগামের উপর প্রথম ক্রয়ের অধিকার প্রয়োগ

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর সমীক্ষার হিসাব অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৭৫ ভাগ কৃষি-পরিবারের উৎপাদন-সম্পর্কিত পুঁজি বাবদ ঋণ প্রয়োজন বছরে প্রায় ১৫

কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গের তপশীলী ব্যাঙ্ক সমূহ জানুয়ারি থেকে জুলাই মাসের মধ্যে খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ে আগাম দেয় মোট প্রায় ১১ কোটি টাকা। ব্যাঙ্ক-জাতীয়করণের অধিকার রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারে নেই। কিন্তু, ব্যাঙ্কের এই আগামের উপর প্রথম ক্রয়ের অধিকার (রাইট অফ প্রি-এম্‌পশন) প্রয়োগ করার অধিকার রাজ্যসরকার দাবি করতে পারেন। এই টাকাটা কৃষকদের বর্তমান আমন মরশুমের দাদনের প্রয়োজন মেটানোর কাজে লাগাতে পারলে ছোট ও মাঝারি কৃষককে জোতদার-মহাজনের কবল থেকে কিছুটা উদ্ধার করা যায়। তার জন্য প্রয়োজন হলে বিশেষ অর্ডিন্যান্স করে ইতিমধ্যেই যে দাদন গরিব ও মাঝারি কৃষক আমনের কাজে নিয়ে ফেলেছে, সেই কর্জের চুক্তিগুলিকে সরকার নির্দিষ্ট সুদে নিয়ে নিতে পারেন। ব্যাঙ্ক-মালিকদের এতে আপত্তি করার কোনো অর্থনৈতিক যুক্তি নেই। কারণ, সুদ তাঁরা যেমন পেতেন তেমনি পাবেন, এবং অধমর্ণ হিসেবে সরকার সম্পূর্ণ নিরাপদ। অন্যদিকে ন্যায্য দরে এই ঋণ পরিশোধ বাবদ কৃষকের ফসল সরকার নিতে পারেন।

এই সঙ্গে ভাগচাষীর উচ্ছেদ সম্পূর্ণ বে-আইনী করে একটি জরুরি আইন পাশ হওয়া দরকার। এই দুটি ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য, গরিব কৃষককে জোতদারের খপ্পর থেকে উদ্ধার করা ও সরকারি খাদ্য সংগ্রহ অভিযানের পক্ষে তাকে জমায়েত করা। গরিব কৃষকের সাহায্য ছাড়া সরকারি খাদ্য সংগ্রহ অভিযান কখনও সফল হতে পারে না।

(৩) চালকল ও ছাঁটাইকলগুলির পরিচালনভার গ্রহণ

তৃতীয় যে ব্যবস্থাটি গ্রহণ করা নিতান্ত প্রয়োজন সেটি হল জাতীয়করণ না করেও, লগ্নীকৃত পুঁজির উপর ধরুন শতকরা ১০ ভাগ মুনাফার প্রতিশ্রুতি মালিকদের দিয়ে ৪৫০টি চালকলের পরিচালনভার সরকারের করায়ত্ত করা। সেই সঙ্গে খাদ্য কমিটিগুলি যেন সব ছাঁটাই কল (হাস্কিং মেশিন) ভাড়া নিতে পারে। এই চালকল ও ছাঁটাইকল পরিচালনায় প্রয়োজনীয় হিসাবরক্ষক বা ম্যানেজার ইত্যাদির কাজ করার জন্য নন-গেজেটেড সরকারি কর্মচারীদের স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার আবেদন জানানো সম্ভব।

(৪) লাইসেন্স ব্যবস্থার কড়াকড়ি

শোনা যায়, ছাঁটাইকলগুলির অর্ধেক নাকি লাইসেন্স ছাড়াই চলে। পশ্চিম-

বঙ্গ ছাড়া অন্যান্য বড বড রাজ্যে নিযন্ত্রিত বাজার আইন (রেগুলেটেড মার্কেট) চালু আছে। এর ফলে, খাদ্যশস্যের বড় বড গঞ্জ-বাজারেব আডতদারদের উপর কিছুটা সরকারি নিযন্ত্রণ চালু করা যায়। নিযন্ত্রণাদেশ অমান্য করলে কঠোর শাস্তির বিধান সমেত লাইসেন্স প্রথা ও নিযন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থা এখনই চালু করা দবকার।

(৫) কর্ডনিং

এ বছর বাজারদর যেখানে উঠে বসে আছে, তাব কাছাকাছি সরকারি সংগ্রহের দর কিছুতেই পৌছুতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে সরকার সংগ্রহের দর বাডিয়ে বাজারদরের কাছাকাছি পৌছুনোর চিন্তাই বাতুলতা। সরকাবি দর বাডালে বাজারদর আরো বাড়বে। মরশুমের সময়ে বাজারদর স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা পডবে। কৃত্রিম উপাযে তাডাতাভি বাজারদর নামিযে আনবার একমাত্র উপায উদ্বৃত্ত অঞ্চলগুলিকে কর্ডন করে ঘিরে ফেলা। জনসাধারণের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাহায্যে কর্ডনিং ব্যবস্থাকে বলবৎ করতে হবে।

উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি একসঙ্গে গ্রহণ করতে হবে, এবং এখনই। নয়তো আগামী আমন ধানও সরকারেব হাতেব বাইরে চলে যাবে।

(৬) আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য

পশ্চিমবঙ্গের আভ্যন্তরীণ খাদ্যসংগ্রহ নীতি উল্লিখিত পন্থায় বিন্যস্ত করার পরও প্রশ্ন থেকে যায়, পশ্চিমবঙ্গের ক্রেতাকে সর্বভারতীয় বাজারের উত্থানপতনেব আঘাত থেকে বাঁচানো যাবে কী করে?

সরিষা, রান্নার মশলা, আলু, সুতোর কাপড, চিনি, সিমেন্ট ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীব ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ একান্তভাবেই অন্যান্য রাজ্য থেকে আমদানির উপর নির্ভরশীল। অন্যান্য রাজ্যেব বাজারের উপর রাজ্য সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণাধিকাব নেই। তেমনিই আবার, কয়লা, পাটজাত দ্রব্য, চা ইত্যাদির জন্য অন্যান্য রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের উপর নির্ভরশীল। ভারতীয় বাজাবের অখণ্ডতার যে কথা গোডাতেই বলা হয়েছে, এই পরস্পর নির্ভরশীলতা তারই প্রমাণ।

এই সমস্যার একটা সমাধানের পথ হল অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেব আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ সরকারি লেনদেন মারফৎ

পরিচালিত করা। এটাও রাজ্যের প্রধান রপ্তানিযোগ্য উৎপাদনের উপর প্রথম ক্রয়ের অধিকার প্রয়োগ করে হাসিল করা যায়। এইভাবে অন্য রাজ্য সরকারগুলিকেও আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য আংশিকভাবে সরকারি লেনদেনের মারফৎ চালু করতে বাধ্য করা যায়, এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তনের দিকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। একটু ভাবলেই বোঝা যাবে, রাজ্যের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা রাজ্য সরকার কর্তৃক ব্যবহারের অবাস্তব ও অরাজক দাবির তুলনায় আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যে এইরকম সরাসরি সরকারি লেনদেনের ব্যবস্থা ফলপ্রসূ ও ভারতীয় রাষ্ট্রের অখণ্ডতার পরিপূরক।

উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করতে হলে সরকারি দায়িত্ব যেমন প্রধান, তেমনিই সে দায়িত্ব পালনে সরকার কখনই সাফল্যলাভ করতে পারেন না, যদি না সমগ্র সমাজে একটা সর্বব্যাপী গণতান্ত্রিক দায়িত্ববোধ ও বিবেকবুদ্ধি সংগঠিত রূপ নেয়। বামপন্থী দলগুলির সামনে এইটাই প্রধানতম চ্যালেঞ্জ।

হাতে-কলমে

লেখা পাঠান

লেখা পেলেই 'পরিচয়ে' নতুন একটি বিভাগ খোলা হবে। নাম · **হাতে-কলমে**। কারখানায়, বাগিচায়, খনিতে, পরিবহনে, আপিস-কাছারিতে, দোকানে, খেতে খামারে যাঁরা মেহনত করেন—তাঁদের কা থেকে লেখা চাই। চিঠির আকারেই হোক কিংবা গল্প কবিতার আকারেই হোক, নিজেদের জীবনের কথা মুখ ফুটে বলুন। ভাসা-ভাসা ভাব, বানানো বানানো কথার বদলে চাই নিজের দেখাশোনা, নিজের প্রাণের কথা। নিজে লিখুন, অন্যদের লিখতে বলুন। সঙ্গে সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দেবেন। সম্পাদক, পরিচয়

দুঃখজয়ের গান

সমীর চৌধুরী

অবশেষে আজকে তুমি তার জবাব দিলে।

যখন এতটা পথ এগিয়ে এসে মৃদু মৃদু সমুদ্রের গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছিলাম ঠিক সেই সময় মনে হল আমার সমস্ত শক্তি ফুরিয়েছে, সবটুকু ধৈর্য নিঃশেষিত হয়েছে। প্রাণেব ভেতরটা হাহাকার করে উঠল। আমি মুক্তি চাইলাম। বল্লাম: অন্তত এই ক'টা দিনের জন্যেও আমায় একলা চলতে দাও।

অথচ সামনেই মহাজীবন। যেখানে আমি মিশব, যাকে লক্ষ্য করে আমি হাঁটতে শুরু কবেছিলাম। এত তীব্র জ্বালা আর যন্ত্রণা সত্বেও যে মহাজীবনের জন্যে আমি এতকাল সৃষ্টিশীল কাজ করবার চেষ্টা করেছি।

যেদিন তুমি প্রথম আমার কাছে এসেছিলে সেদিন আমার বাধা ছিল না, বন্ধনও ছিল না। খরগতি পাহাড়ি নদীর মত উদাস, বেপরোয়া বেগময় ছিলাম আমি। দুচোখে আমার ছিল সৃষ্টিব নেশা। ঠিক এই সময় তুমি এলে। আমি প্রথম বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা অনুভব করলাম। সংগ্রাম শুরু হল তোমার আব আমাব। তারপর থেকে তুমি আমায় আঘাত করেছ। আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত, জর্জরিত করেছ। কিন্তু আমাব অনমনীয় তেজ, সুকঠোর ধৈর্য, অটল আত্মবিশ্বাসের কাছে তোমার সমস্ত শক্তি, কৌশল আর চাতুরি খান খান হয়ে ভেঙে পড়েছিল।

তারপর এতদিন ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমার প্রখরগতি ধীর হল। ধীর থেকে হল মন্থরতর। আর তোমাব আঘাত হানবার শক্তি ও নিপুণতা এক থেকে হল সহস্রগুণ। অবশেষে আমি ক্লান্ত হতে হতে অবসন্নতার সীমারেখা পার হলাম। আমি তোমার কাছে মুক্তি চাইলাম।

আজ তুমি তার জবাব দিলে। বললে: আমার কাছ থেকে তো মুক্তি নেই! মুক্তি চাইলেই পাওয়া যায় না, ছিনিয়ে নিতে হয়। তা যদি চাও, সংগ্রাম কর। তাতে হয় তুমি জিতবে, নয় আমি। মাঝখানে কোনো পথ নেই। বলো, তুমি হেরে গিয়েছ?

ধীরে ধীরে আমার চেতনার দ্বিতীয়বার ঘুম ভাঙল। আমি সিংহবিক্রমে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম: না!

সমুদ্রের শব্দ গান হয়ে বাজছে। মহাজীবনেব গান।

চালচালানীর কড়চা.....

নীলকান্ত বসু

শেষ চৈত্রের দুপুরে রোদ, মাঝে মাঝে গুমোট, তার পরেই একটু বা ঝিঁনঝিনে হাওয়া। গায়ে জ্বালা অথচ ঘাম বিশেষ নেই। হাজিগড় স্টেশনের ধারে নিমগাছটার তলায় পাতলা ছায়ার চাঁদোয়া টাঙানো। অবনীশের দল ক্লান্ত হয়ে সাইকেল থেকে নামল। টো টো করে ঘুরে ঘুরে এখন ওরা বসে ধুঁকছে। কিছুক্ষণ বাদে একটা কুকুরও ঘুরতে ঘুরতে একটু দূরে পাশে বসে জিভ বার করে হাঁফাতে থাকল। দুপাশে বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ। মাটি ফেটে বুড়ো মানুষের ফুলে-ওঠা শিরার মত এদিক সেদিক ছড়িয়ে গেছে। মাঠে হাঁটতে গেলে ধানগাছের কাটা গোছগুলো তখনো পায়ে ফোটে। উদ্দাম মেল ট্রেনগুলো ঝড় তুলে ছুটে যায়। লোকাল ট্রেনগুলো আসে ভারিক্কি চালে। রয়ে সয়ে। স্টেশনে এই সময়েই যা সোরগোল। তারপরই সব নির্জন। নীরব।

অবনীশ একটা শ্রান্ত উদাস দৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে ছিল। দূরে সার বেঁধে একদল মানুষ আসছে দেখা গেল। অধিকাংশই আধবয়সী সধবা-বিধবা স্ত্রীলোক। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের সংখ্যাটিও বেশ। ছোট মেয়েদের পরনে তেলচিটে ইজের আর ফ্রক। ছেঁড়া আর ময়লা। ছেলেদের পরনে ছেঁড়া ইজের আর হাফ শার্ট। ধুলোয় ভর্তি সারাদেহ, জামাকাপড়। সবারই মাথাভর্তি রুক্ষ চুলের জটা। গায়ে বোটকা গন্ধ। এদেরই পাশে পাশে চলেছে যেন ভেড়ার পালের রাখাল,—একটি ছোকরা। মাথায় বাবরী-ছাঁটা ঢেউ-খেলানো, তেল-চকচকে চুল। পেছনে ওলটানো। পরিষ্কার ধুতি-শার্ট পরা। বাঁ কাঁধে ঝোলানো কালো আর খয়েরি রঙের সুতোর ব্যাগ। কোঁচার প্রান্তটি উল্টে কোমরে গোঁজা। চোখে কালো গগ্‌ল্‌স। হাল-ফ্যাশানের ফ্রেম, ডান হাতে একটি ট্রানজিস্টার রেডিও। মাঝে মাঝে

মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে বিড্‌বিড্‌ করে কী গোনে, তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে ওদের পাশে পাশে চলে। পালের ভেতর থেকে বছর-বারো তেরো বয়েসের একটি মেয়ে হঠাৎ ছুটে এসে ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছে রেলের স্লিপারের তলায় উঁকি মেরে কী যেন খুঁজছে।

'দেখলেন, স্যার, দেখলেন?'

'ও কে? কী খুঁজছে বলো তো?' অবনীশ উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করে।

'আমাগোর দুখের কথা আর কমু কারে? শোনেন তবে—।' ময়লা ছেঁড়া কাপড়-জড়ানো প্রৌঢ়ার কণ্ঠস্বরে সবাই সেদিকে ফিরে তাকাল। কখন সে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ খেয়াল করে নি।

'তুমি কে, কী করছ এখানে?' অবনীশ প্রশ্ন করে।

'ঐ বাবু তো ছাখতে কইলো,—আপনারা চাল-ধরা না মদ-ধরা। তা আপনাগো চিন্‌ছি। আমাগোর চোখ সবদিকে ঘোরে। ঐ বাবুর শ্বশুরবাড়ি তো আমাগোর রামমোহন কোলোনীতে।'

সে হরিদাসের দিকে আঙুল মেলে দিল। হরিদাস ঘাড় নিচু করে রইল।

প্রৌঢ়া হাত নেড়ে কী ইশারা করতেই চালচালানীরা সার বেঁধে প্ল্যাটফরমের দিকে এগোতে লাগল। ঠাহর করে দেখা গেল—মেয়েদের কারো তলপেটে, কারো কোমরে, কারো দুই উরুর পাশে সরু লম্বা চালের থলি নানা ছাঁদে বাঁধা। ছোট ছেলেদের হাতে ছোট ছোট ময়লা ন্যাকড়ায় ভরা চালের বালিশ। ছোকরাটি প্ল্যাটফরমের উপর কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে বাঁধানো বেদীটার উপর বসে সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। তারপর বাইরের দিকে তাকিয়ে যেন কতকটা অন্যমনস্কভাবে ট্রানজিস্টারটি খুলে দিল। ওদের দল এতক্ষণে এখানে-সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছে। সহসা ওদের মধ্যে এক আধবয়সী স্ত্রীলোক উবু হয়ে বসে কোলের মেয়েটিকে স্তন পান করাতে গিয়ে কাতরে উঠল। 'ওমা, কী হবে গো।'

'কি হইল রে ইন্দির।' প্রৌঢ়া ব্যস্ত হয়ে জিগ্‌গেস করল।

'কাপড়ডা যে ফাঁইসা গেল। মনির মা যে এখনো চার গণ্ডা পয়সা পাইব। কাইল দুইবার পইরা বারাইছিলাম না।' চোখেমুখে তার আকুল উৎকণ্ঠা।

'থির হ, থির হ। কাঁদস্‌না। কাইন্দা করবি কি?' প্রৌঢ়া প্রবোধ দেয়।

'জানলেন, বাবু মশায়রা'। প্রৌঢ়া যেন গল্পটা শুরু করে একটু হালকা হতে চায়। 'ঐ মুখপুড়ি ঝুমির মা, বিন্দু আর আমি বরিশাল থেইকা ঝুমির বাবার লগে আইতে ছিলাম। শ্যাষ রাতে যশোর টেশনে রেলের কামরায় বাতি নিভাইয়া কি যে কাণ্ড হইয়া গেল, কমু কারে? দাপাদাপি। চিৎকার। কান্নাকাটি। ঝুমিরে বুকে চাইপা ধইরা বিন্দু আর আমি আস্তে আস্তে কামরার বাইরে আইলাম। তারপর ঝোপঝাড় দিয়া কোন্‌হান দিয়া যে কোন্‌হানে আইলাম তার হদিশ নাই। দুই দিন পরে বেনাপোল বডারে আইসা দেখি ঝুমির বাবা আসে নাই। এ কয় দিন কি আর আমাগোর মাথার ঠিক ছিল! আজও ঝুমির বাবার কোন্ খোঁজ নাই। বিন্দু কিন্তু মরার আগেও হাতের শাঁখা ভাঙ্গে নাই। বলত, দিদি ও কোনদিন যদি আইসা পড়ে!

'তারপর তো কত জল ঘোলা হইয়া গেল। ঐ বাবুটিকে দেখছেন না আমাগোর রামমোহন কোলনীতে আইল একদিন। কইলো: বদ্ধমান থে চাউল আনতি হইব,—

'কইলো যাতাযাতের আর একবেলা খাওনের খরচা আমার, ফি-কেজি চারগণ্ডা কইরা পয়সা। সেই আমরা বাবুর লগে জোট বাঁধলাম। দুই দুইডা বছর গেল—বাবুর এক কথা ফি-কেজি চারগণ্ডা পয়সা। জিনিসপত্তর মাগ্‌গী হইছে—'

'তারপর—তারপর?' জিজ্ঞাসা করে অবনীশ।

'শোনেন, শোনেন। আমিও একটু কইয়া হালকা হই। বুকে য্যান জগ্‌দল পাথর চাইপা রইছে। আমরা বদ্ধমানে যাই আসি। শ্যাষে বিন্দু একদিন ঐ বাবুরে কইলো কি, আমাগো ফি-কেজি আটআনা পয়সা দিতে হইব। নইলে তোমার কামে যামু না। মাইয়া বড হইছে। খোরাক-খরচাও তো বাডছে, দিবেন না? বাবু কয়, না। এই নিয়া মন-কষাকষি। শেষ ও একদিন আমাগোর দল ছাইডা দিল। তারপর ও ছেঁড়া কাগজ কুডায় আর ঠোঙ্গা বান্ধে। এইভাবে দুতিন টাকা কইরা একদিন কইলো, দিদি আমি তোমাগোর সাথে চাউল আনতে যামু—নিজে ব্যাবসা করুম্। আমি কই, তাই কর। ও আমাদের লগে লগে চলে—আবার দূরে দূরে থাকে। আমরা এক কামরায় উঠি তো ও ভিন্ কামরায।

'তা বাবু, আপনাগো কমু কি, বিন্দু ছিল ভারি চালাক। যেমন বুদ্ধি, তেমনি হিসেবি। কিন্তু বড জেদী। ঐ হইল তার কাল। আর রঙ-ঢঙ বা জানত কত। একবার তো বদ্ধমান থে আইত্যাছি। আমি দল ছাইডা পডছি গিযা উযার কামরায়। টিকিটবাবু তো ধরছে আমাগো দুজনারে দু কেজি কইরা চাল সমেত, আমি তো পাশের কামরায বাবুকে খবর দিবার লাইগা আকুল। ও কয—দিদি, তুই চুপ কইরা ভাখ, ডরিস কিসে? টিকিটবাবু কয়—চাউল দে, নয টিকিট দে, বিন্দু তো দুম কইরা কইযা বসলো—চলেন জামাইবাবু, আপনার বাসায়ই তো যাইত্যাছি; রুবিদির সাথে অনেক দিন দেখা হয় নাই। রুবি দি যে আমার মাসতুতো বোন্। সেই যে আপনার বিযার সময় কত ঠাট্টা মসকরা করলাম, সবই ভুইল্যা গেলেন? তা তো যাইবেনই, সেটা যে ছিল পদ্মার ওপার। আর এটা যে এপার, তাই না? তা আর আপনারে কিই-বা দোষ দিমু? সবই তো আমাগোর ভাঙ্গা কপালেব দোষ' কয দিনই বা আর আপনাগোরে নিযা নাডাচাডা করতে পারলাম, তারপর কত জন রইযা গেল। চলেন, রুবিদিবে কমু জামাইবাবুরে ধইরা আন্ছি। টিকিটবাবু তো থতমত খায়। ভাবে, ঠিকই কয় যে' শ্যাষে কয—যায়েন, আপনারা যায়েন, আমি হাওডা ঘুইরা আইতেছি। আমরা তো উত্তরপাডায দে লম্বা। ভাগ্যিস বিন্দুর লোকটাকে জানা ছিল, তা গাঁয়ের জামাই, জানবো না। এহানে আর কেডা কারে চেনে? বিন্দু হাসলে গালে টোল পরতো, আব ঐ হাসিই বুঝি বা হইল তার কাল।'

অবনীশরা উস্‌খুস করে ওঠে। ওদের চোখে কপালে অধৈর্যের রেখা কুঁচকে উঠতে দেখেও প্রৌঢা যেন থামতে চায না। বুঝতে চায় না ওদের ব্যগ্রতা, ও আবার মিনতি করে, 'বাবু মশায়রা, আজ তিন দিন যবের আটা আর মুসুরির ডাল খাইযা খাইযা মুখ দিয়া জল উঠত্যাছে, আমাগোর তো হাল হইছে চিনির বলদের মতো, এক চিল্‌তা পান দিবেন খাইতে? বিন্দুর আমার পান খাইলে ঠোঁট দুইডা যা লাল হইয়া উঠতো, যেন টিয়া-ঠোঁট। ঐ ঠোঁট দুইডাই হইল বুঝি বা তার কাল। ধুত্তরি ছাই কোন্‌ডা যে তার কাল হইল কমু বা কারে, বুঝাইমু বা কারে। দিবেন বাবু মশায়রা এক চিল্‌তা পান?'

ট্রেনের সময় এগিয়ে আসছে দেখে একটি ছোকরা পান-বিড়িব ডালি হাতে স্টেশনে হাজির হয়ে এতক্ষণ বুড়ির বকবকানি শুনছিল। এবার সে সাহস করে বলল—

'এই পাগলী, ফের বকতে শুরু করেছিস। আপনারা বুঝি এর বকবকানি শুনছেন? আজ দুদিন ধরে ও শুধু বকেই চলেছে। নে, খা একটা পান। মুখ বন্ধ কর।'

আধখানা আধপচা পানে এক কুচো সুপুরি দিযে ছেলেটা একটু চুন ঘষে ওর হাতে দিতে গেল। প্রৌঢ়া ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'সাত বুড়ি কথা শুনাইলি, তা খয়ের কই? বিনা খয়েরে পান খাইবার মানে আছে নাকি কিছু?'

'বাঃ বুড়ি, শখ কত, নে, খযের নে। সেয়ান পাগল দেখছি যে।' ছেলেটি পান দিয়ে সরে দাঁড়াল।

'হায়, বাবা। সেয়ান-পাগলই বটে। আমার কি আর মাথার ঠিক আছে কিছু। শুনছেন বাবুরা, বিন্দু নিজে ব্যাবসা করছে দেইখ্যা ঐ বাবুর চক্ষু টাটাইয়া উঠলো। ছলেবলে উয়াকে কত মত বুঝাইল উযার দলে আইতে। কিন্তু সে আইলো না। বড্ড জেদী মাইযা ছিল তো। উযাই হইল কাল বুঝি। কি জানি কোনডা কমু। বিন্দুর এক রা—আর তোমাগো গোলামি কর্ম্ম না, নিজেরডা নিজে খামু। এই সেদিন এক ছ্যামড়াকে দিযা বাবু উয়ার চাউলের পুটলিডা কাইড়া নিল। বিন্দুর দুই দিন খাওয়া হয় নাই। তারপর সেদিন তিন কেজি চাউল নিয়া বিন্দুরে পুলিশে ধবাইয়া দিল ঐ বাবু। ঐ একবত্তি মাইয়াডার কানের সোনাডাও চইলা গেল খাতকের ঘরে। বিন্দুব আমার মরার দিন পর্যন্ত আর অন্ন মুখে যায় নাই। পড়শীব কাছে খুদকুঁড়া মাইগা ঝুমিয়ে খাওযাইছে। কিন্তু যে দিন কাল বাবু, কারে কেডা দেয়। অনেক দিন পর চেষ্টা চরিত্তির কইবা পরশু পেথম ট্রেনে দুই কেজি চাউল আনছিল ও মহাজনের ঘর থেইকা ধাব কইরা। হায, হায়।—তাও উয়ার কপালে সইলো না। ঐ বাবুর পোষা এক কুত্তা রাস্তায ছিনাইযা নিযা গেল। কাইল আর কিছুতেই কিছু হয না। শ্যাষ বদ্ধমানে মাহাজনের দোরগোড়ায হত্যা দিয়া পড়লো। মাহাজন তো কিছুতেই রা কাড়ে না। শ্যাষ দুপুরও গড়াইয়া গেল গিয়া। মহাজনের

লোকেরা খাওনদাওনের লাইগা ঘরে গেল গিয়া। বিন্দু দোকানের বারান্দায় পইড়া রইল। দাঁতে বাছা আমার কুটাটি পর্যন্ত কাটে নাই।'

প্রৌঢ়া 'বাছা আমাব' বলে ডুকরে কেঁদে উঠল। অবনীশ অত্যন্ত বিচলিত হযে বলল, 'আহা, কেঁদে আর কী করবে বলো। বলো, তাব কথাই বলো। সে তোমার ছিল কে?"

'বিন্দু আমার ছোট জা আছিল। কিন্তু ও ছিল আমার মাইয়ার চাইতেও বেশি। নারাণীর মার কালা পাইড শাড়িডায় কাইল তার শ্রী যেন খুইলা গেইলো, বাবু। কোঁকড়া রুক্ষু চুল, কিন্তু জট বান্ধে নাই একটুক। দুপুরও গড়াইয়া গেল, মাহাজন কয়, আইজ আমার ঠেঁয়ে থাইকা যাও, কাইল তোমারে চাউল দিমু নিশ্চয়। মাহাজন খপ কইরা বিন্দুর হাত দুইডা চাইপা ধবে। বিন্দু মিনতি কইরা কয়, আইজ না, কালই আমি থাকুম, কাইল থাকুম, আইজ আমারে দুই কেজি চাউল ধার ছ্যান—কাইল সব শোধ কইরা দিমু। ঘরে মাইয়া রইছে, আমারে না আইতে ছাখলে হুতোশে মারা যাইব, দোহাই আইজ আমারে ছাড়ুন। আপনাব গোড ধরি, বাবু, আইজ আমাবে দু কেজি চাউল দিয়া ছ্যান। কাইল যা কইবেন সব শুনুম। আপনি আমারে রোজ ছাখতেছেন না? আইজ অবিশ্বাস করেন কিসের লাইগা। দুই কেজি চাউল নিযা সে গাডিতে আইল। আমার সাথে দেখা গুড়ুপ। স্টেশনডা পুলিশে পুলিশে এক্কেবারে ছাইয়া গেছে। ভয়েডরে ও কামরা থেইকা নাইমা পডলো দেইখা আমিও নাইমা গেলাম। উয়াকে এর আগে এত ভয় পাইতে দেখি নাই, বাবু। লাইন ধইরা হাজিগডের দিকে আইত্যাছি, দুইডা হোমগাড আইসা ধরলো আমাগো। আমরা কতই কাঁদাকাটা কবি। কিন্তু কিছুই হইল না। দূরে মানুষ আসছে দেইখ্যা চাউল নিয়া তারা চম্পট দিল। বিন্দু কয়, দিদি সব কিছু বাঁধা দিয়া চাউল নিলাম—তাও কপালে সইলো না। আইজ আমি মরুম্। তার চোখের দিকে চাইয়া প্রাণডা উইড়া গেল। কেমন জানি পাগলপারা চোখ। কেমন জানি, ঘোলাটে চাউনি। কই, কাঁদ কাঁদ। ও কথা কয়না। আমি উযাকে ধইরা আনত্যাছি, হঠাৎ রেল আসছে দেইখ্যা লাফ দিয়া লাইনে মাথা দিল…''।

প্রৌঢ়া কপালে করাঘাত করে মাথা নিচু কবল।

গগল্‌সপরা ছোকরাবাবুটি এতক্ষণ আড়চোখে সব দেখছিল আর নিরুপায় উপেক্ষায় কালক্ষেপ করছিল। ট্রেনের ঘণ্টা হয়েছে দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, পালের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেল। এবার যে যার বামাল সামলে গাড়ির কামরায় ওঠার জন্য তৈরি। ঝুমি এতক্ষণ হাঁ করে প্রৌঢ়ার কথা শুনছিল। ট্রেন আসতে দেখে তার জলভরা ডাগর চোখদুটো ডিসট্যান্ট সিগন্যালের দিকে ছুটে গিয়ে আটকে গেল। তার পা দুটো যেন আর উঠতে চায় না। মাকে হারিয়ে ঝুমি আজ এই প্রথম একা ট্রেনে উঠবে।

ছোকরাটি চিৎকার করে উঠল : ঝুমি উঠে আয়, উঠে আয়, ট্রেন ছাড়ল।

ঝুমির হাতদুটো ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ট্রেনের কামরায় টেনে তুলে ছোকরাবাবুটি একটি সিগারেট ধরাল।

ট্রেন চলতে শুরু করেছে। অবনীশ তখনও যেন দেখতে পাচ্ছে ঝুমির টলটলে কালো চোখে জল যেন থমকে রয়েছে এক আসন্ন বর্ষণের প্রতীক্ষায়।

দুটি কবিতা

অমিয় ধর

১

ঝরে রক্ত, রক্ত ঝরে,

চতুর্দিকে সর্বনাশী হাঁ!

হাত পেতেছি রিক্ত আমি,

তপ্ত মরু,

বুকে আমার বারুদ!

পা রাখব কোথায় বলো?

কণ্টকে নয়,

সবুজ তৃণ,—

তৃণের উপর পা।

২

পাল্‌টে গিয়ে নতুন হই,

সকাল হই রোজ,

ফুল হই,

নদী হই,

আকাশ হই রোজ!

প্রপেলারে ভোব ভৈয়ি,

সকাল হই রোজ।

যযাতি

দেবেশ রায়

(আষাঢ় সংখ্যার পর)

ইতিহাস জানবার জন্য আমাকে খুব একটা গবেষণা করতে হয় নি। নিজেকে ঐতিহাসিক পুরুষ হিশেবে পরিবারে আর অফিসে গিরিজামোহন প্রতিষ্ঠিত করেছে। সেই ঐতিহাসিক পুরুষের বিকাশ সারা বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে টাঙানো, গিরিজামোহনের অফিসেও। এখন তো ভাবলেও আমার হো হো করে হাসি পায়। অথচ ছোটবেলায় ঐ ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে কী ভয়ই না পেতাম, গিরিজামোহনকে কত দূরের-ই না ভাবতাম। একটা বিরাট ছবি ছিল—হাতে আঁকা, গিরিজামোহনের প্রতিকৃতি প্রায় সবই হাতে আঁকা, আর ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর শুধু আলোকচিত্র, তার সত্যতা সম্পর্কে যাতে কোনো সন্দেহ না থাকে—সেই ছবিতে গিরিজামোহনকে দেখা যেত একটা সিংহাসনের মতো চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে, পায়ের কাছে শাদা জুঁই ফুলের মালার মতো ধুতির কোঁচা, বাঁ কাঁধের ওপর একটা চিত্রবিচিত্র শাল, কোলের ওপর লাঠির বাঁকানো মাথায় এক হাতের ওপর আরেক হাত রাখা। পেছনে ছবির বাঁ কোনায় একটা লম্বা উঁচু টুলের ওপরে সোনার মতো ঝকঝকে টবে তালপাতার মতো পাতাওয়ালা ছোট্ট গাছ, তার পাশ দিয়ে বাড়ির ভেতরে যাবার পথ, ছবির ডান কোনায় গিরিজামোহনের পেছনে দোতলায় উঠে যাবার সিঁড়ি, সিঁড়ির প্রথম বাঁকটাতে দেয়ালে একটা কী ছবি টাঙানো—গিরিজামোহনের মতো আর-কোনো প্রতিকৃতির আভাস। এই ছবি দেখে ছোটবেলায় কত কিছুই না ভেবেছি। ছবিটা খুব চড়া রঙে আঁকা, খুব জলজলে। টাঙানো ছিল বাইরের ঘরে ঢুকলেই ভেতরে যাবার দরজার ওপরে, প্রায় দরজার মাথা থেকে ছাদ পর্যন্ত লম্বা। বাইরের ঘরে ঢুকলেই বসবার টেবিলের

আগে ঐ ছবিটাতে নজর পড়বে। তারপর বসবার টেবিলের মানুষটাকে। যেন মনে হবে দেয়ালের ঐ ছবিটাই মাটিতে নেমে ঐ টেবিলে বসে আছে। ছবিটার নিচে দরজার মাথায় ফ্লুরোসেন্ট বাতি। ফলে সন্ধ্যাবেলায় আলো জ্বালাবার পর থেকে মনে হত যেন ঐ ছবির বিচ্ছুরিত আলোতেই ঘরটা আলোকিত।

জ্যান্ত গিরিজামোহনের চাইতেও ছবির গিরিজামোহন কত প্রবল ছিল আমার কল্পনায়। ঐ বাড়ি যেখানে ওপরে উঠে যাবার সিঁড়ির বাঁকে-বাঁকে পূর্বপুরুষের রাজকীয় স্মৃতি, যেখানে ফুলদানি নয়—ফুলের টবই সাজাবার একমাত্র উপকরণ, ঠুনকো টব নয়, ঝক্‌ঝকে কাঁসার ভারি-ভারি টব—ছোটবেলায় তো সোনারই ভাবতাম, গিরিজামোহনের ধুতির পাড় আর কোঁচা-ই বা কী রাজকীয় আর বাঁকানো লাঠি যেন তলোয়ারের বিকল্পমাত্র, ভেতরে আর ওপরে যে-পথ আর সিঁড়ি চলে গেছে সেখানে না-জানি কত রহস্য। গিরিজামোহনের, সুতরাং আমার, পূর্বপুরুষ, সুতরাং ইতিহাস সম্পর্কে গৌরববোধ সেই শিশুকাল থেকেই আমাতে সঞ্চারিত। আর ঐ ছবির গিরিজামোহনকে আবিষ্কার করতেই তার হাঁটা-চলা-কথাবলা-বসা-শোয়া-ঘুমনো সব কিছুকে এত গভীর লক্ষ করেছি। এ ছবিই ছিল সবচেয়ে বড়। আরো ছোট ছোট নানা তৈলচিত্র সারা বাড়িতে ছড়ান। যেমন মার ঘরে বন্দুক হাতে বাঘের মাথাওয়ালা এক টেবিলের পাশে শিকারীর জুতো-জামাপরা গিরিজামোহনের এক ছবি, বাঁ-হাতের নিচে শোলার হ্যাটশুদ্ধ। আমার ঘরে গিরিজামোহনের বেশ বড় একটা অস্-পেইন্টিঙ—আবক্ষ, অভিজাত টাকটা চকচক করছে, প্রিন্সকোর্ট না পাঞ্জাবি, বোঝা যায় না—গলাবন্ধ চাদরের ভাঁজ বুকের ওপর—যেন বাঁ-কাঁধের ওপর দিয়ে ডান হাতের নিচে নেমে গেছে, অত বড় মুখটাতে একটা ছোট্ট হাসি। খুকুর ঘরের ছবিটাতেও বোধহয় একই হাসি—তবে প্যান্ট-কোট-টাইয়ে হাসিটা অন্যরকম দেখাচ্ছে, সেটাও বুক পর্যন্ত। সিধুর ঘরের ছবি খালি গায়ে, সেখানেও মুখে হাসি, বুকের লোমগুলো স্পষ্ট, গলায় ভাঁজ, বুকে পেশীর রেখা ধরনের দুই একটা টান। ভেতরের বারান্দায় হরিণের শিঙের ওপরে গিরিজামোহন আর মায়ের এক সঙ্গে ছবি, মা একা বড় মতো চেয়ারে এমনভাবে যেন চুরি করে বসেছে আর

গিরিজামোহন সেই সেই চেয়ারটার উঁচু পিঠের মাথায় এমনভাবে হাত রেখেছে যেন সে রাখতে চাইছিল তার স্ত্রীর কাঁধে কিন্তু ঐ পিঠের মাথার নিচে আর হাতটা নামল-ই না। বাইরের ঘরের দরজা দিয়ে বেরোতে দরজাব ডানপাল্লার পাশে দেয়ালে রাশি-রাশি ফোটো বাঁধান। দেখতে না চাইলেও বসবাব টেবিল থেকে দরজা পর্যন্ত এলেই নজরে পডবে, নজরে না পডে উপায নেই। কোনোটাতে গিবিজামোহনের কোম্পানির ডিরেক্টব বোর্ডদের মিটিঙ, কোনোটাতে কোম্পানির শিল্পক্ষেত্রের ফুলের বাগানে বেতের চেযারে এলিযে গিরিজামোহন, একটাতে শ্রমিকদের স্পোর্টসে প্রাইজ দেযার ও দৌডনোর, দু-চারটে গ্রুপ—যাতে ফুলের মালা বা স্তবক সবসময়ই গিরিজামোহনের হাতে বা কোলে। শুধু একটা ফোটোতে গিরিজামোহন মাঝখানে না থেকে এক কোনায। সেটা তিনজনের একটা দাঁডিযে থাকা গ্রুপ। বাকি দুজন হলেন তখনকার বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী আর কংগ্রেসের চাঁই। বেহারা আর রাজনীতিতে কংগ্রেসি নেতাটির সব জাযগাতেই মধ্যমণির পদ। সুতরাং গিরিজামোহন তো দূরেব কথা, স্বযং বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রীও ঐ ছবিটিতে মাঝখানে দাঁডাতে পারেন না। আব একটা ফোটোতে কোনো ডিনার বা লাঞ্চ পার্টির ছবি, টেবিলের এক জায়গায় মুখ বাডিযে, সেই মুখের দিকেই ক্যামেবা, গিরিজামোহন একটু দূরে বসা ডাঃ বিধানচন্দ্র বায়কে কিছু বলছে, ক্যামেরায় ডাঃ বায়ের প্রোফাইল।

এখন ভাবতেও হো হো হাসি পাচ্ছে। সারা বাডিতে কোনো মহাপুরুষের বা পূর্বপুরুষের ছবি না টাঙিযে নিজেই নিজের একমাত্র পূর্বপুরুষ আর মহাপুরুষোত্তম হযে বিরাজ করার কী শিশুসুলভ বাসনা। ও, এখন মনে পডছে। গিরিজামোহনের ছবি ছাডা আর মাত্র চারটি তৈলচিত্র বাডিতে আছে, সেগুলোব তিনটে দোতলায বসবার ঘরে আর একটা গিরিজামোহনের শোবার ঘরে। প্রথম তিনটে হচ্ছে গিরিজামোহনেব বাবা, মা আর-এক পিশিমা। তিনটে ছবি একই মাপেব, একই ঢঙের—একদিকের দেয়ালের মাঝখানে আটফুট মতো বিস্তার দখল কবে আছে। তিনটি পোর্ট্রেট-ই আবক্ষ। গিরিজামোহনের পিশিমার মুখটাতে যেন তৈলচিত্রের বিষয হওযাতে একটা ভয় ধরা পডেছে। আর গিরিজামোহনেব বাবা আবক্ষ দাডি নিয়ে সারা বুক চাদরে ঢেকে যেন আধ্যাত্মিক চিন্তায়

মগ্ন। গিরিজামোহনের মায়ের চেহারাটা দেখলেই গিরিজামোহনের চেহারা মনে পড়ে যায়—মুখটা আরো নমনীয়। গিরিজামোহন মাতৃমুখী পুত্র—তাই সে সুখী। আমি পিতৃমুখী পুত্র—তাই আমি দুঃখী। গিরিজামোহনের শোবার ঘরে চতুর্থ যে-প্রতিকৃতিটি ঝুলছে সেটি আমার মা-র। মার মতো আমার চেহারা নয় বলে মার মুখটা অনেক দুঃখিত হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু চুলে সেকেলে মডার্ন মেয়েদের মতো পাতা কেটে আর কাঁধে কী-রকম কুঁচি-টুঁচি দিয়ে আমার মার চেহারাটাই বদলে দিয়েছে গিরিজামোহন। কী-রকম থিয়েটারের মতো মিথ্যা মনে হয় যাকে। ও প্রতিকৃতি গিরিজামোহনের স্ত্রীর, তাই তার শোবার ঘরে। আমার মায়ের নয়।

আসলে গিরিজামোহন যে-অতীত থেকে বঞ্চিত, সেই অতীতকে দেয়ালে-দেয়ালে টাঙিয়ে নিজের কাছে ও সবার কাছে সত্য করে তুলতে চেয়েছিল। গিরিজামোহন তো জানে না উত্তরাধিকারের কী জ্বালা। গিরিজামোহন কি জানে না? আমাকে দেখেও কি গিরিজামোহন বুঝতে পারে নি? উত্তরাধিকার, যা বদলাবার কোনো ক্ষমতা তোমার নেই, যা স্বীকার-অস্বীকার করা তোমার ইচ্ছার উপর রাখাই হয় নি, এই পৃথিবীতে জন্মে জল-হাওয়া-মাটির অধিকারের মতোই যা তোমার শরীর আর আত্মা অধিকার করে। হায় গিরিজামোহন, তোমার উত্তাধিকার অস্বীকার করতে নিজের শরীরের সমস্ত রক্ত বের করে দিলে আমি আশ্বস্ত হতে পারতাম, আর সেই উত্তরাধিকার তুমি দেয়ালে-দেয়ালে রচনা করেছ।

আমি তো আমাদের দেশের বাড়িতে গিয়েছি। সাতজন্মেও সেখানে দোতলা বাড়ি তো ছিলই না, টিনের চালের ঘরও ছিল মোটে একখানা। খালি গা আর হাঁটুর ওপরে কাপড়-তোলা মধ্যবিত্ত জীবন সেখানে ইতিহাসের নথি হয়ে পড়ে আছে। আমাদের যে সমৃদ্ধ জমিদারি অতীত বাইরের ঘরে গিরিজামোহনের প্রতিকৃতির পটভূমি হয়ে আছে তা মিথ্যে, বানানো। অথচ মিথ্যে যে নয় প্রমাণ করতে কত তৈলচিত্রেরই না আয়োজন। প্রথমত তৈলচিত্রেই প্রাচীনতা আছে। দ্বিতীয়ত ভঙ্গিগুলি সব আরো প্রাচীন। এখন তো সব ইতিহাসই আমার জানা। ঐ সব ছবিগুলো তো আঁকা হয়েছে নতুন বাড়িতে উঠবার পর, অর্থাৎ আজ থেকে বছর বিশেক আগে, অর্থাৎ ইংরেজি চল্লিশ সনের পর। তখন কি ঐ সব গিলে-করা

কুঁচি-দেয়া জমিদাররা বাংলাদেশের গ্রামে ছিল? তখন কি ঐ রকম হাইবুট পরে দুইদিকে পকেটওয়ালা শার্টের ওপর মালার মতো কার্তুজ নিয়ে। গোঁফ বাগিয়ে দেশীয় রাজাদের মতো কেউ শিকারে যেত? বরঞ্চ আমার আর খুকুর ঘরের ছবিটাতে তাও খানিকটা আধুনিকতা ছিল। তৈলচিত্রের প্রাচীন ফর্মে প্রাচীন ভঙ্গিতে নিজেকে প্রাচীন চরিত্রে পরিণত করার প্রয়াস করেছিল গিরিজামোহন। আমি গিরিজামোহনের বাবাকে দেখেছি। শিশু বয়সের স্মৃতি, সুতরাং সহজে ভুল হবার নয়। সারাজীবন চাকরি করা টিপিক্যাল সেই বাঙালি মধ্যবিত্ত মর-মর মানুষটি তৈলচিত্রে কেবল উনিশ শতকী ব্রাহ্ম আদর্শবাদী হযে গেছে। আর গিরিজামোহনের মাকে দেখেই মনে হয যেন সে গিরিজামোহনের জন্মের আগেই বুঝেছিল যে তার গর্ভে দিক্‌পাল এসেছে।

সংশয় তো সহজে যায় না। তাই দেয়ালে-দেয়ালে নিজের প্রাচীনতা অক্ষয় করে গিরিজামোহন ফোটোতে ফোটোতে নিজের কর্মজীবনের ডকুমেণ্টারি তৈরি করে রেখেছে।

গিরিজামোহনের ফাঁকি যখন আমি সবটুকু ধরে ফেলেছি অথচ সেই প্রচণ্ড ফাঁকি দেবার ক্ষমতার প্রতি যখন আমার অসামান্য বিশ্বাস—আসলে পিতা হিশেবে গিরিজামোহন আমার মতো বড হিরো ছিল, ভিলেইন হিশেবে গিরিজামোহন ছিল আমাব তার চাইতেও বড হিরো—তখন আমি ভাবতাম বর্তমানকে তো অনেক কৃতী মানুষই বানাতে পারে, কিন্তু এমন অকৃত্রিম অতীত বানাতে পারে কে, এক ঈশ্বর ছাড়া—যিনি কালের রাখাল? তখন আমি ভাবতাম—বেছে বেছে তৈলচিত্রের ফর্মটাই গিরিজামোহন গ্রহণ করেছে, বেছে বেছে মুখগুলিতে প্রাচীনতা এনেছে, বেছে বেছে নিজে চল্লিশের সালে একশো বছর আগের পোশাক-আশাকে থিয়েটার করেছে। তখন আমি কল্পনা করতাম, যেন শিল্পী তার তুলি আর রঙ নিযে ক্রীতদাসের মতো অপেক্ষা করে আছে আর গিরিজামোহন, চিত্রের বিষয় হিশেবে দাঁড়িয়ে থেকে-ই নির্দেশ দিচ্ছে কী ভাবে কী রঙ দিয়ে আঁকতে হবে। সে নিজেই বিষয় বলে নেহাত তুলিটা ধরতে পারছে না। কিন্তু শিল্পী তারই দ্বারা সম্পূর্ণ চালিত। ফোটোর ব্যাপারেও হয় গিরিজামোহনের সেই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ছিল যাতে সে সেকেণ্ডের কোন্‌

ভগ্নাংশটিতে ভঙ্গিটি নিতে হবে বুঝত অথবা তার নিজের মাইনে করা ফোটোগ্রাফার ছিল। এবং ঐ যে বাড়িময় নিজেকে টাঙিয়ে রাখা, নিজেকে স্মৃতি করে রাখা—আর সত্যি, যে-কোনো নতুন লোক বাড়িতে ঢুকে ঘরে ঘরে গেলে, সে যদি গিরিজামোহনকে আগে থাকতে না চেনে, ভাববে, এ-বাড়ির কর্তা, এ-বংশের শ্রেষ্ঠ মানুষ গত হয়েছেন—তার মধ্যে যেন একটা এমন দম্ভ ছিল যা প্রদর্শনের বর্বরতাকে তুচ্ছ করে দিত। আর জ্যান্ত গিরিজামোহনের সুস্মিত চেহারার দিকে চাইলে বিশ্বাসই হতে চাইত না যে এইরকম শান্তশিষ্ট লোকটি গর্বভরে নিজেকে দেখায়। প্রতিকৃতিতে চিত্রিত দাম্ভিক অতীত আর জীবনে আচরিত বিনয়—এই দুইটি পরস্পরবিরোধী উপাদান ইচ্ছে করেই গিরিজামোহন দর্শকের সামনে ছড়িয়ে রাখত—আমি ভাবতাম।

পরে আমি বুঝতে পেরেছি—সব ফাঁকি। যতদিন তা বুঝতে পারি নি, ততদিন আমার ঘর থেকে বেরোতে পারি নি, ততদিন শয়তান হিশেবে গিরিজামোহনকে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়ে এসেছি, ভেবেছি, গিরিজামোহনের সঙ্গে লড়তে গেলে আমার লেঙটির একটি সুতোও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ফুস্‌স্‌। এ-সবও একদিন ভেবেছি মনে পড়লে নিজেকেই ঘেন্না হয়। ওটা একটা মনিষ্যিই নয়। ছিঁচকে চোর, উদরাময়ের রুগির মতো লোভী, কামুক বৃদ্ধের মতো প্রচলিত উৎপাত—একটা মাছি বই কিছু নয়।

আমাদের শহরে ছিলেন এক ড্রয়িঙ মাস্টার মশাই। তিনি পোর্ট্রেট আঁকতেন। কোনো বাড়িতে কেউ মারা গেলেই নিশ্চিতরূপেই ওঁর আবির্ভাব হত—শ্রাদ্ধ মিটে যাবার কিছুদিন পর অথচ শোক শুকিয়ে যাবার আগে। আমাদের শহরটায় কোনো এক শিল্পের হেড-অফিসগুলোর ভিড়। সেই সমস্ত অফিসে ঐ সব কোম্পানির বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ডিরেক্টরের তৈলচিত্রও তিনি এঁকেছেন ও আঁকেন। এক-একটি তৈলচিত্রের জন্য তাঁকে বড় জোর দুশো-তিনশো টাকা দেয়া হত। এত কম মজুরিতে এত বড় বড় সব মহাপুরুষ বানানো কখনোই সম্ভব নয়। সেজন্য তিনি কোনো কোনো ফোটো স্টুডিয়োর সঙ্গে ব্যবস্থা করে নিতেন—তাঁরা ফোটো থেকে খুব বড় বড় এনলার্জড প্রিন্ট তৈরি করে দিত আর তিনি সেগুলোকে আরো বড় কার্ডবোর্ডের সঙ্গে সেঁটে নানারকম রঙ লাগিয়ে,

নানারকম পটভূমি জুড়ে তৈলচিত্র করে দিতেন। যখন এই শিল্পে গিরিজামোহন প্রবেশ করল, মনোমোহন বসুর সাগরেদ হিশেবে কিন্তু স্বনামে, স্বনামেই বা বলা যায় কি করে, আমার মায়ের নামে, তার কিছুদিন পরই গিরিজামোহনের কাছে সেই শিল্পীর অবধারিত আগমন ঘটল। তখন গিরিজামোহনের প্রয়োজন শিল্পপতি হিশেবে তার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করা। কোনোদিন তো ভাবেও নি যে শিল্পপতি হবে। তার জন্য প্রস্তুতি-ও ছিল না। মনোমোহন বসুর মালিকানা বাঁচাবার জন্য মনোমোহন বসুরই ব্যবস্থামতো চুরির পয়সায় মায়ের নামে শেয়ার কিনে যে-মালিকানাটা পাওয়া গেছে তার উপযুক্ত হতে তো কিছু আয়োজন দরকার। একটা অবিশ্যি বাঁচোয়া ছিল যে বাড়িটা আগেই তৈরি করা হয়েছে। ফলে ভাঙা ভাড়া বাড়িতে থেকে ডিরেক্টরি করার লজ্জাটুকু আর পোহাতে হয় নি। সুতরাং সেই শিল্পী গিরিজামোহনের কাছ থেকে তাঁর ফোটো নিয়ে তাকে ইচ্ছেরকম সাজিয়ে বানিয়ে এনে এনে দিয়ে গেছে আর মূর্খ গিরিজামোহন সেইসব ছবিতে তার যে-যে রূপ ফোটানো হয়েছে তাকেই নেহাত সত্য ভেবে আহ্লাদে ডগমগ হয়ে দেয়ালে দেয়ালে টাঙিয়ে নিজের বাড়ির লোকের কাছেই নিজেকে মহাপুরুষ বানিয়ে তুলেছে। সেই শিল্পীর হাতে তৈরি অতীতের উত্তরাধিকার বেশ হাসিখুশি মনেই গিরিজামোহন স্বীকার করে নিয়েছে। লোকজনের কাছে তো দূরের কথা, বোধহয় গিরিজামোহনের নিজের কাছেই নিজের একটা চরিত্র বানিয়ে তোলা দরকার ছিল, নিজের জন্যই একটা অতীত। এই ব্যাপারে সেই শিল্পী ভদ্রলোক সত্যিই যথেষ্ট কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। শুধু আজকাল মাঝেমধ্যে আমার মনে হয়, আর-একবার ভালো করে ছবিগুলো দেখতে পেলে ঠিক বুঝতে পারতাম, ও গুলো বেশ দামি ব্যঙ্গচিত্র কিনা। মনে মনে যদ্দূর দেখতে পাই, তাতে তো ব্যঙ্গচিত্র বলেই ঠাহর হয়। নইলে সাতপুরুষে যার কেউ কোনোদিন বন্দুকের ঘোড়া টেপে নি তার অমন হাইল্যাণ্ডি বুট আর কার্তুজের মালাপরা ছবি কেন। শুধুই কি তাই। নিজের এক-একটা মূর্তিতে যত বিমোহিত হয়েছে গিরিজামোহন, তত গভীর ব্যঙ্গের নতুন নতুন ছবি এঁকেছেন শিল্পী ভদ্রলোক। নইলে একই লোকের অত ছবি কোনোদিন একই বাড়ি থাকে। শিল্পীর সবচেয়ে বড় রসিকতাটা ছিল বোধহয় ছবিতে-ছবিতে

গিরিজামোহনকে অতীত আর মৃত করে তারই তলায় জ্যান্ত গিরিজামোহনটাকে বসিয়ে রাখা। যখন থেকে এই সব রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন থেকেই আমি মনে মনে সেই শিল্পী ভদ্রলোককে বাহবা দিই।

ফটোর বেলাতেও তাই। যে-ফটোগ্রাফাবরা ছবি তুলতেন তাঁদের নিশ্চয়ই সম্ভাব্য খদ্দেরের দিকে নজর থাকত। সুতরাং গিবিজামোহনের গলা না বের হওযা পর্যন্ত শাটার টিপতেন না। আর যেখানে-সেখানে, নানা লোকের ভিড়ে গিরিজামোহন নিজেব বেঁটেখাটো গলাটা বাড়িযে দিযে একটা ভাঁড়ের ছবি তৈরি করত। পারলে আমি জানতাম, ঐ কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী আর নেতার পাশে নিজের ছবিটি কি করে তোলালো গিরিজামোহন। অনেক লক্ষ করে দেখেছি পাশাপাশি কাউকে দেখা যায না, সুতরাং কোনো গ্রুপছবি থেকে ঐ তিনটি ফিগার আলাদা করা নয়। কত কাঠখড় গিরিজামোহন পুড়িয়েছে ঐ জায়গাটি পেতে। ঐ ছবিটিতে হয়তো গিরিজামোহনকে গলা বাড়াতে হয নি কিন্তু এমন একটা আত্মতৃপ্তির সামান্য হাসি মুখে লেগে আছে যে আলোকচিত্রটির ক্যাজুয়াল ভাবটা নষ্ট হযে গেছে। হায রে, চারপাশে নিজের কার্টুন আঁকিযে আব তুলিযে গিবিজামোহন শিবসদাগর হয়ে বসে আছে।

অথচ কত অনাযাসেই না বিষযটাকে অন্যভাবে দেখা যায়। গিরিজামোহন নিজে তো সেইভাবেই দেখেছে ও চেযেছে অপরেও দেখুক। দেখুক গিরিজামোহনের মুখমণ্ডলের রেখাগুলি এত বাঙ্ময় আর এত বিচিত্র যে তার প্রতি শিল্পীর আকর্ষণের শেষ নেই। দেখুক মুখমণ্ডলের চোয়ালেব হাড় সিংদরজার মতো, যখন বন্ধ হয তখন একটু বাতাস গলবার ফাঁকও থাকে না, আবাব যখন খোলে তখন হা হা কবে প্রাণ উজাড় করে দেয। দেখুক গিবিজামোহন স্ত্রীর কাঁধে হাত দিতে গিয়ে চেয়ারের কাঁধে দিয়ে ফেলে, আবার খালি গাযে নিজেকে উজাড় করে দিতে পারে। দেখুক যে গিরিজামোহনের যেমন আছে ভারতীযতা তেমনি আছে য়ুরোপীয়তা। দেখুক সমুদ্রের মতো বিরাট, অরণ্যের মতো রহস্যময়, রোদের মতো উদার, বৃষ্টির ফোঁটার মতো কোমল গিরিজামোহনকে। এত বড একটা শিল্পের অধিকর্তা, কাঁচামালের জন্য কৃষিদ্রব্যের বাণিজ্য থেকে শুরু করে যন্ত্রপাতির জন্য এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ও উৎপাদিত দ্রব্যের

বাজার পর্যন্ত নখাগ্রে রাখতে হয়, হাজার শ্রমিকের ভাতা আর মজুরি-সংক্রান্ত মানসিক সমস্যা থেকে শুরু করে শেয়ার বাজারের ওঠানামার অমূর্ত সমস্যা পর্যন্ত দৃষ্টিতে রাখতে হয়—তদুপরি আছে পরিবার পরিজন সামাজিকতা লৌকিকতা। গিরিজামোহনের ব্যক্তিত্ব তো সত্যিই অসাধারণ। এই অসাধারণত্বে-ই তো আমার মা মজেছে, আমার মায়ের বাবা মজেছিল—কিন্তু মায়ের বিয়ের সময় তো গিরিজামোহন এত গণ্যমান্য হয় নি—, গিরিজামোহনের চারপাশের লোক মজেছে, আমি মজেছিলাম আর গিরিজামোহন স্বয়ং মজে আছে। থাকুক। মজে থাকতে পারলে সব সমস্যার সমাধান। আমি যদি মজে থাকতে পারতাম! জন্মের পর থেকে যাকে হিরো দেখেছিলাম, সে যদি তেমনি হিরোই থাকতে পারত। আমি বেঁচে যেতাম। উত্তরাধিকার বিসর্জন দেবার এই প্রচণ্ড কঠিন সাধনা আমায় করতে হত না। আমার শরীরের রক্ত নিষ্কাশিত করে দেবার আর্তি বোধ করতাম না। আমার ঈশ্বর গিরিজামোহনের কাছে সর্বধর্মসমর্পণ করতে পারতাম। স্বধর্মে নিধনের এই যন্ত্রণা আমায় আর সইতে হত না।

কিন্তু আমি করব। আমি তো চোখবুঁজে থাকতেই চেয়েছিলাম। আমি তো দেয়ালে দেয়ালে আমার হিরোকেই দেখতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সময় যে বাধ সাধল। সময়ে যে আমার রক্তে নতুন তরঙ্গ এল। সময়ে যে সেই রক্ত মাথায় নতুন করে ঘা দিতে লাগল। সময়ে যে সেই শিল্পীর কৃত্রিম তৈলচিত্র থেকে রঙগুলো মুছে মুছে যাচ্ছিল, ভেতরের ব্রোমাইড কাগজ উঠে উঠে আসছিল, আর আমার গিরিজামোহনের শরীর থেকে আমার ঈশ্বরের খোলস খুলে খুলে আসছিল।

হায় রে! শিল্পের বিষয় হবার ক্ষমতাই যার নেই, তাকে কিনা ভেবেছিলাম শিল্পের বিধাতা।

(পরের কিস্তি কার্তিক সংখ্যায়)

আমার বুকের মধ্যে

বিনোদ বেরা

প্রত্যুষের পদ্মমেঘ দেখে
মনে পড়ে স্নিগ্ধ চাষবাস
ছিলো আন্তরিকতায় ভরা
একদিন আকাশে আমার।

বহুদিন ওখানে যাই নি
শস্য সব পাখিরা খেয়েছে
কিংবা ঝরে নষ্ট হয়ে গেছে
বিপুল অমনোযোগিতায়।

এখন ওখানে কে বা কারা
হাল কবে, বীজ বোনে, জল
ঢালে চারাগাছের গোড়ায়
আশাতীত ফলায় ফসল।

জানি না ওদের নাম, শুধু
দেখি ফলফুলেব সম্ভার
রৌদ্র ও জ্যোৎস্নায় মাখামাখি
আমার বুকের মধ্যে বাড়ে॥

ডোরাকাটার অভিসারে

শের জঙ্গ

(শ্রাবণ সংখ্যার পর)

মারতে পারলে কিংবা মরা জিনিস পেলে কোনো মাংসেই বাঘের অরুচি নেই। ভ্যাদভেদে পচা মরা জন্তু, তার গায়ে পোকা কিলবিল করলেও—বাঘ সে মাংস খাবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরো জন্তুটার আপাদমস্তক বিলকুল খেয়ে ফেলবে—গায়ের চামড়া বা কুচো কুচো হাড় অবধি ফেলবে না। ভাল্লুক, চিতা, এমন কি স্বজাতি মেরে খাওয়ার কথাও বাঘ সম্পর্কে শোনা গেছে। তরাই এলাকার লালঢাং জঙ্গলমহালের একটা ঘটনার কথা তো আমি নিজেই জানি। একবার একটা মরা বুনো শুয়োরের দখল নিয়ে ধাড়ি আর বাচ্চা দুই বাঘের লড়াইতে বাচ্চা বাঘ মারা পড়ে, ধাড়ি বাঘটা তখন মরা শুয়োর ফেলে বাচ্চা বাঘের মাংস খায়। এটা ঘটেছিল ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, আমি সেবার আমার বন্ধু ডক্টর প্রসাদের সঙ্গে গিয়েছিলাম শিকারে। তরাই জঙ্গলেরই আরো একটা ঘটনার কথা আমি জানি, দুটো বাঘের মারামারিতে জেতা বাঘ হারা বাঘের মৃতদেহটা চর্ব্যচোষ্য করে খেয়েছিল। অবশ্য এসব ঘটনা খুবই বিরল।

আমাদের খেতখামারের একটা অংশে আমাদের নিজস্ব কিছু জন্তুজানোয়ার সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। কাঁটাঝোপে ভর্তি সেই প্রকাণ্ড জায়গাটা গিয়ে পড়েছে একটা পাহাড়ী ঝোরার উঁচু পাড়ে। একটা কাঁটাগাছের ঘন জঙ্গল থাকায় ছোট ছোট জানোয়ার ছাড়াও সেটা ছিল চিতা, মায়াহরিণ আর বুনো শুয়োরের থাকবার খুব ভালো জায়গা।

এই জায়গাটাতে একবার একটা চিতা একটা গরু মেরেছিল। আমার ভাই জগদীপ সেই মরা গরুর টোপে শিকারে বসেছিল। তার তখন বছর ষোল বয়েস। আমার বোন বিদ্যা ছিল জগদীপের চেয়ে বছর কয়েকের

বড়। দিদিগিরি ফলিয়ে বিদ্যা জগদীপকে বাধ্য কবে শিকারে বিদ্যাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। এও ঠিক হয় যে, প্রথম গুলিটা বিদ্যাকেই ছুঁড়তে দেওয়া হবে। একটা ঝোপের আডালে ওরা ঘাপ্‌টি মেবে বসে থাকে। লোক দুজন, কিন্তু বন্দুক একটাই—বারো বোরের একনলা।

অন্ধকার হয়ে আসতে টোপের প্রায হাত তিরিশেক দূরে জগদীপ সাদা সাদা কী একটা দেখতে পেল। সাদা দাগটা আগে সেখানে ছিল না। কিছুক্ষণ ঠায় তাকিযে থেকে জগদীপ বুঝতে পারল, সাদা দাগটা নড়ছে। আসলে ওটা ছিল চিতাবাঘ। কুকুরের মত উবু হযে বসে ছিল। তার বুকের সাদা ছোপটাতে টিপ করে জগদীপ গুলি করতেই বাঘটা ঢলে পডল।

পরদিন সকালে মরা চিতার খোঁজে গিয়ে দেখল চিতাবাঘটা যেখানে ছিল সেখানেই আছে, কিন্তু মবা গরুটা নিখোঁজ হয়েছে। জগদীপ খোঁজ নিয়ে জানতে পারল, অন্য একটা চিতা এসে গরুটাকে প্রায় একশো হাত দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে পাহাডের গায়ের ছোট একটা গর্তের খাঁজের ওপর খেয়ে রেখেছে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় জগদীপ মরা গরুটাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার ক'রে নৈশভোজনের ঠিক আগে দ্বিতীয় চিতাবাঘটাকে মেরে ফিরে এল।

পরদিন সকালে লোকলস্কর সঙ্গে নিয়ে চিতাটাকে বাড়ি আনতে গিয়ে দেখে·· রাম বলো, চিতা কোথায়? আশেপাশে মরা চিতাটাব চিহ্নমাত্র নেই। মাটিতে টানাহেঁচডানোব দাগ লক্ষ্য ক'রে জগদীপ এগোতে লাগল। দাগ বরাবর এগোতে এগোতে হাত চল্লিশেক দূরে জগদীপ একটা ঝোপের কাছে সেই মরা চিতাবাঘটাকে পডে থাকতে দেখতে পেল। তৃতীয একটা চিতাবাঘে তার খানিকটা মাংস খুবলে খেযেছে।

জগদীপ এবার এক আজব টোপ সামনে নিযে আবার শিকারে বসে গেল। সূর্য অস্ত যাওয়াব আগেই স্বজাতিখাদক সেই চিতাবাঘটাকে সে মারল। পর পর তিন সন্ধ্যায় একই জায়গায ব'সে জগদীপ প্রায় একই টোপে তিন তিনটে চিতাবাঘ গাঁথল। সচরাচর এমন হয়ত ঘটে না এবং শিকারীর পক্ষে এটা যে একটা দুর্লভ ভাগ্য, তাতে সন্দেহ নেই।

লোকের বিশ্বাস, বাঘ নাকি শিকাবকে মারবার পর নখ দিয়ে তার গলা ফুটো ক'রে রক্ত পান করে। এটা যে আদৌ সত্যি নয়, যাঁরা বাঘকে

জন্তুজানোয়ার মারতে দেখেছেন, অথবা বাঘের হাতে মরা টোপ যাঁরা ভালো ক'রে খুঁটিয়ে দেখেছেন—তাঁরাই স্বীকার করবেন।

আমার মতে, দেখার ভুলের জন্যেই এই রকম ভুল ধারণা গড়ে উঠেছে। কেননা বাঘেরা সাধারণত জীবজন্তুর ঘাড়ে দাঁত বসিয়ে দিয়ে মারে। তারপর শিকারটাকে মাটিতে পেড়ে ফেলবার পরেও ঘাড়টা কামড়ে ধরে থাকে যতক্ষণ না জানোয়ারটা একদম মরে।

বাঘ কেন যে সব সময় তার শিকারের পেছন দিক থেকে খেতে শুরু করে, তার কোনো ব্যাখ্যা মেলে না। তবে খাওয়া শুরু করবার আগে শিকারের পেট চিরে অন্ত্র বার করে ফেলবে—প্রথম চোটে খাবে সাধারণত হৃদ্‌যন্ত্র, ফুসফুস, যকৃৎ আর নাড়িভুঁড়ি। খুব ক্বচিৎ কদাচিৎ বড় বড় চিতাদের ঠিক বাঘেরই মতন শিকারের পেছনের অংশ থেকে খাওয়া শুরু করতে দেখা গেছে।

বাঘেরা খুব শব্দ ক'রে খায়। তাদের জিভে জল টানার একটা বিশ্রী হুস্‌হাস আওয়াজ অনেক দূর থেকে শোনা যায়। সন্তর্পণে নিঃশব্দে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়াই তাদের নিয়ম। তবে মুস্কিলে পড়লে শিকারকে ভয়ে তটস্থ করার জন্যে কখনও কখনও গাঁক গাঁক ক'রে প্রচণ্ড আওয়াজও করে।

বাঘ সব সময়ই গর্জে উঠে আক্রমণ করে এবং আত্মরক্ষার জন্যে লড়ে। অবশ্য এ নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। বাইরের কেউ এলে, নৃশংস বাঘ কখনও কখনও ঘাপ্‌টি মেরে পড়ে থাকে এবং অতর্কিতে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

চালচলন আর হাবভাব

বাঘেরও ঠিক মানুষের মতই হাবভাব আর চালচলনে যে যেমন সে তেমন ভাব। শুনতে অদ্ভুত ঠেকলেও ঘটনার দিক থেকে এটা সত্যি যে, প্রত্যেকটা বাঘেরই আলাদা আলাদা ধাত। আশেপাশের গাঁয়ের লোক এটা জানে। কেউ বেজায় ডানপিটে আর কাঠগোঁয়ার ; কেউ ভারি চালাক, কিছুতেই তাকে সহজে ফাঁদে ফেলা যাবে না , কেউ দারুণ নৃশংস, সব সময় মুখ হাঁড়ি করে থাকে ; কেউ আবার শান্ত গোবেচারী।

বাঘদের খামখেয়ালিপণাও দেখা যায়। চোখে পড়ে একেকটা বাঘের

একেক রকমের স্বভাব। কিছু কিছু বাঘ, বিশেষ ক'রে যারা বুড়ো—মানুষের সামনাসামনি হলে গব্‌ব্ গব্‌ব্ আওয়াজ ক'রে রাস্তা আটকাবে; কেউ কেউ আছে, এমন কি বীরত্ব প্রকাশ ক'রে খানিকটা লম্ফঝম্ফও করবে। তবে তাদের বেশির ভাগই মানুষ দেখলে পিট্টান দেবে।

খাদ্যাভ্যাসের দিক থেকেও বাঘে বাঘে বিস্তর তফাত, তারা কেউ কেউ জঙ্গলে শিকার ক'রে পেট চালায়, অন্যেরা গৃহস্থদের হাঁস-মুর্গি গরু-ছাগল মেরে ধরে খায়। কিছু বাঘ মানুষখেকো হয়ে যায়। এরা স্বভাবতই হিংস্র প্রকৃতির হয়, এবং যারা একবার মানুষ মেরেছে, একবার নরমাংসে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করেছে—মানুষ খাওয়া তাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কেউ কেউ পঙ্গু কিংবা জখম হওয়ার পর মানুষখেকো হয়। তবে প্রায়ই ফন্দিবাজ বুড়ো বাঘবাঘিনীরাই হয় মানুষখেকো—গাঁয়ের আশেপাশে শিকার ঢুঁড়তে গিয়ে হয়ত জঙ্গলে কোন পোড়াকপালী কাঠকুড়ুনী বা ঘেসুড়ে মেয়েকে সে পেয়ে গেছে—হয়ত দেখেছে জঙ্গলে দুষ্প্রাপ্য জন্তুজানোয়ার শিকার করার চেয়ে মানুষ মারা ঢের সহজ কাজ।

পাকাপোক্ত মানুষখেকোরা জানোয়ারদের মধ্যে সবচেয়ে ধূর্ত; শয়তানী বুদ্ধি আর সদাসতর্কতার জন্যে এদের মারা বেশ শক্ত হয়।

ঘাসবনের বাঘ

যেসব বাঘের বাস গাছের জঙ্গলে, তাদের চেয়ে ঢের বিপজ্জনক প্রাণী ঘাসবনে-থাকা বাঘ। তার কারণও খুব পরিষ্কার, ঘাসবনে-থাকা বাঘ নিজেও যেমন দেখতে পায় না, তেমনি অন্যেরাও তাকে দেখতে পায় না—কেউ প্রায় ঘাড়ে এসে পড়লে তবে দুপক্ষে দেখা হয়। তখন আর তার ভাবনাচিন্তা করবার সময় থাকে না; তখন তাকে ঝোঁকের মাথায় কিছু একটা করে বসতে হয়—আত্মরক্ষার জন্যে হয় ঝাঁপিয়ে পড়া, নয় পালিয়ে যাওয়া। সেই একই বাঘ যদি কোনো খোলামেলা জঙ্গলে থাকত, তাহলে কেউ তার দিকে এলে আগেভাগে সে দেখতে পেত কিংবা আসন্ন বিপদের আওয়াজ পেত এবং আগে থেকে সজাগ হতে পারলে পালাবে কিনা ঠিক করবার সময় পেত।

কিন্তু কেউই যখন কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, তখন উভয়পক্ষকেই ভারি গোলমেলে অবস্থায় পড়তে হয়। চারপেয়ে প্রাণীকে এতটা দুরবস্থায় পড়তে হয় না, কেননা তাদের বেশির ভাগেরই ঘ্রাণশক্তি খুব প্রবল—বাঘের

গায়ের এতটুকু গন্ধ পেলে হয়, অমনি তারা ছুটে নাগালেব বাইরে পালিয়ে যাবে। কিন্তু চারপেযে না হয়ে যদি দু-পেয়ে প্রাণী হয, তাহলে তার না থাকবে তেমন ঘ্রাণশক্তি—না থাকবে তেমন শ্রবণশক্তি। সেক্ষেত্রে হয়ত দুপক্ষেরই লডে যাওযা ছাডা গত্যন্তর থাকবে না।

এই রকম বিপদে একবার আমাকে পডতে হযেছিল। কাজ নেই আমার আর তেমন অভিজ্ঞতায়। জাযগাটা ছিল বডহাপুর ফরেস্ট রেঞ্জের ঢোলখণ্ড সোঁতা, সেখানে আচমকা একটা বাঘের মুখে পডে আমার প্রাণ খাঁচাছাডা হওয়ার দাখিল। সূর্যোদয়ের আগে বেশ ভোর-ভোর থাকতেই নদীব ধার বরাবর জাযগাটা ঘুরে দেখবার জন্যে আমি হেঁটে হেঁটে চলেছি। ঢোলখণ্ড সোঁতা বেশ চওডা নদী, জায়গায জায়গায় একশো হাত্ত প্রশস্ত—বর্ষায ছাডা বছরে বারোমাসই শুক্নো এবং আগাগোড়া বালি চডা পডে থাকে। নদীর দুপাড়েই লম্বা লম্বা তীক্ষ্ণধার ঘাসের জঙ্গল। আমি বাঘের থাবা আর পাযের দাগ খুঁজে বেডাচ্ছিলাম, সর্বক্ষণ আমার মন পডে থাকছিল সেইদিকে। এমন সময় নদীর এপারেব ঘাসের মধ্যে হঠাৎ কিসের যেন একটা আওয়াজ পেলাম।

কৌতূহলী হয়ে পাড বেযে আমি ওপরে উঠলাম। উঠে দেখি চোখের দৃষ্টি আডাল ক'রে দাঁডিযে রয়েছে ঘনবদ্ধ ঘাসের দেয়াল—অতি লম্বা হাতিরও সাধ্যি নেই মুখ বাডিযে দেখে সেই দেয়ালের ওপারে কী আছে না আছে। তাব ভেতর নিজেকে চালিয়ে দিযে যথাসম্ভব নিঃশব্দে গুটিসুঁটি মেবে আমি এগোতে লাগলাম। ঘাসগুলো চারদিক থেকে এসে আমাকে ছেঁকে ধরছিল এবং ডুবন্ত মানুষকে জল যেভাবে ঠেসে ধরে তেমনিভাবে আমাকে ঠেসে ধরছিল। আমি তা সত্ত্বেও ঠেলেঠুলে এগিয়ে একটা ফাঁকা জাযগার মধ্যে এসে পডলাম। জাযগাটা ছিল দৈর্ঘ্যে বিশ ফুট আর প্রস্থে পনেরো ফুট। দম নিকৃলে গিয়ে আমার এদিকে ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। জাযগাটার একধারে দাঁডিয়ে আমি ঠাহর করার চেষ্টা করলাম সেই আওয়াজটা ঠিক কোথা থেকে আসছে। মনে হল, আওযাজটা যেন এই ফাঁকা জাযগাটাব দিকেই এগিয়ে আসছে। আমার হাতে '৪৭০ ডবল্ রাইফেল; সেফটি ক্যাচ খুলে রেখেছি যাতে যেকোনো মুহূর্তে রাইফেলের ঘোডা টিপতে পারি।

হঠাৎ আওয়াজটা থেমে গেল। প্রায় হাত দুয়েক তফাতে ঘাসগুলো ফাঁক হয়ে হয়ে আমার সামনে বেরিয়ে এল একটা গোলাকার ব্যাঘ্রমুণ্ড।

বাঘ আর আমি, আমাদের চার চোখের মিলন হল। পলকের দেখায় আমরা দুপক্ষই আচমকা ভয় পেলাম। হঠাৎ লক্ষ করলাম বাঘটা তার কানদুটো চিতিয়ে দিচ্ছে। তার সামনের পা দুটো ততক্ষণে প্রায় নুইয়ে ফেলেছে—এরপরই লাফিয়ে পড়বে। তখন আর টিপ ক'রে বন্দুক ছোঁড়ার প্রশ্নই ওঠে না; বন্দুকের কুঁদোটা ঘাড়ের ওপর ঝট্‌কা মেরে তুলবারও সময় নেই—কেননা ততক্ষণে বাঘ নির্ঘাত আমার ওপর ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়বে। আমার কোমরের কাছটাতে রাইফেলটা তুলে মাত্র কয়েক ফুট দূর থেকে আমি বন্দুকের ঘোড়া টিপলাম। আমার কপাল ভালো, তাই গুলিটা গিয়ে ঢুকে গেল বাঘের চোখে। একে ৫০০-গ্রেন '৪১০ ক্যালিবার বুলেট, তায় অত কাছ থেকে ছুঁড়েছি—গুলি খেয়ে বাঘটা কমপক্ষে চার হাত দূরে ঘাসের মধ্যে ছিটকে পড়ল, দু একবার আছড়াআছড়ি ক'রে তারপর একেবারে স্থির হয়ে গেল।

ঝোপের মধ্যে বাঘটা যখন নেচেকুঁদে বেড়াচ্ছিল, তখনই সে ঘাসের ভেতর হাঁটাচলার আওয়াজ পায়। খোঁজখবর নেবার জন্যে বাঘটা তখন সটান আমার দিকে নিঃসাড়ে এগিয়ে আসে। তার মতলব ছিল আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার। ভাগ্যিস, ঝোপের ভেতর একটা ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম, তার ফলে, ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার আগে বাঘ পরিষ্কার দেখতে পেল—তার সামনে দাঁড়িয়ে চতুষ্পদ কোথায়, এক দ্বিপদ প্রাণী। এ রকমটা সে আশাই করে নি। আর তার এই আচমকা ভাবের সুযোগ নিয়ে আমি বন্দুকের ঘোড়া টিপতে পেরেছিলাম বলেই সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলাম।

যূথবদ্ধ হয়ে থাকা বাঘের স্বভাব নয়। বাঘ একা একা ঘুরে বেড়ায় এবং কখনই তাকে দল বেঁধে থাকতে দেখা যায় না। কারো কারো মুখে শোনা যায়, একত্রে দু-পাঁচটি বাঘের ঘুরে বেড়ানোর কথা; আসলে তারা একই পরিবারের—যে যার আলাদা হয়ে যাওয়ার আগে কচি বাচ্চারা যখন মায়ের কাছে থাকে, সেই সময়কার দল।

গ্রীষ্মের কড়া রোদে প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়া বাঘের স্বভাবের একটা বড় দিক। গরমকালটা বাঘের খুবই কষ্টে কাটে। এমনিতেই বাঘের শরীরে তেষ্টা একটু বেশি। রোদ্দুরে একটুতেই সে হাঁপিয়ে পড়ে। মাটি তেতে থাকায় তার

পায়ের নরম অংশে ছ্যাঁকা লাগে। জল ছাড়া চলে না ব'লে গরমকালে বাঘের গতিবিধি খুবই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে—জঙ্গলে তখন জলের জায়গা খুব বেশি থাকে না, বার বাব জল খাওয়ার প্রয়োজনে বাঘকে তাই জলের জায়গা বেছে তার কাছেপিঠে থাকতে হয়।

বাঘ বিড়ালগোষ্ঠীর জীব হলেও, বিড়ালের সঙ্গে একটা ব্যাপারে তার মিল নেই—কম জলে লুটোপুটি খেতে বাঘ বেজায় আনন্দ পায়। সাঁতারে রীতিমত দড়! বাঘ তার নৈশবিহারে বড় বড় নদী হেলায় পাবাপার করে। এটা দেখা গেছে, বাঘ যখন নদী পার হয়—ওপারের একটা বিশেষ জায়গা তার লক্ষ্যস্থল হিসেবে থাকে। স্রোতের টানে ভেসে যাওয়ায় বা অন্য কোন কারণে যদি সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তাহলে স্বস্থানে ফিরে এসে নতুন ক'রে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুবার চেষ্টা করবে সেও ভালো—তবু সাঁতার কেটে ওপারের যত্র তত্র উঠবে না।

একটা যুতসই এলাকা বেছে নিয়ে সেখানে আস্তানা গাড়া—এটাও বাঘের একটা বিশিষ্ট স্বভাব। সেইসঙ্গে বিশেষ বিশেষ জায়গা বেছে খাবার জমিয়ে রেখে কয়েকদিন অন্তর অন্তর সেইসব নিরাপদ ডেরায় ঠিক সে ফিরে আসবে।

বাঘটি যদি মারা পড়ে, কিছুদিনের মধ্যেই একটি নতুন বাঘ এসে তার জায়গা নেবে। দেখা যাবে, পরেব বাঘটিও হুবহু আগের বাঘটির ধাঁত পেয়েছে। সে আর এ কস্মিনকালেও হয়ত একত্রে থাকে নি, এ বাঘটিকে এর আগে হয়ত কখনও দেখাই যায় নি—তা সত্ত্বেও দেখা যাবে, এও ঠিক তারই মত একই জায়গায় হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে, একই জায়গা থেকে জল খাচ্ছে।

লম্বা চক্কর

একসঙ্গে একদিন বা দুদিনের বেশি কোন ছোট জায়গায় থেকে যাওয়া বাঘের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ, বাঘ যখনই কোথাও গিয়ে হাজির হবে, সঙ্গে সঙ্গে সে জায়গা ছেড়ে তার শিকারের দল চলে যেতে থাকবে। বাঘের গায়ে এমন একটা মার্কামারা বোটকা গন্ধ আছে যে জন্তুজানোয়ারেরা অনেক দূর থেকেই তার উপস্থিতি অনায়াসে টের পায়। তাছাড়া বাঘ যখন শিকার ধরে, তখন গোলমালও কম হয় না—যেমন, বুনো শুয়োরের চিলচিৎকার—ফলে সবাই আগে থেকে জেনে যায়।

এই কারণে, নিজস্ব শিকারের এলাকার মধ্যে বাঘদের অনবরত চরকির মত পাক খেয়ে বেড়াতে হয়। এদের পক্ষে এক রাতে দশ থেকে পনেরো মাইল চক্কর দেওয়া প্রায় রোজকার ব্যাপার।

বাঘদের গতিবিধি—বিশেষ করে, যে সব বাঘ গরুখেকো বা মানুষখেকো—যদি বেশ কয়েকমাস ধ'রে ছকে ফেলা যায়, তাতে বিশেষ কতকগুলো ধরনধারণ চোখে পড়বে। সবচেয়ে বেশি দেখা যাবে মোটামুটি একটা ত্রিকোণের মত ছাঁদ—সাধারণত ছয় থেকে দশ মাইলের ব্যবধানে মিলবে তিনটি বিন্দু। ত্রিকোণের একটি বিন্দুতে শিকার জোটানোর পর সব খাবার খেয়ে শেষ করা অবধি বাঘ দুই থেকে তিন রাত সেখানে থেকে যেতে পারে। তারপর সে দ্বিতীয় বিন্দুতে চলে গিয়ে সেখানে দুতিন রাত কাটাবে। তারপর তৃতীয় বিন্দুতে কিছু সময় থেকে আবার তার আরম্ভের জায়গায় ধারেকাছে ফিরে আসবে।

কখনও কখনও বাঘ তার নিত্যনৈমিত্তিক শিকারের এলাকা ছেড়ে দূর পাল্লায় পাড়ি দেয়—মাসের পর মাস তার আর কোন পাত্তা পাওয়া যায় না। অনেক সময় আর ফিরেও আসে না। তবে তেমন ঘটনা খুবই কম ঘটে।

লড়াই

বাঘ একবার কোন এলাকা যদি নিজের ক'রে নেয়, তাহলে তার জমিদারিতে আর কোন বাঘ শিকারে দন্তস্ফুট করতে এলে প্রাণপণে সে বাধা দেবে। যখন এ ধরনের ব্যাপার ঘটে, তখন বিবাদী রাজ্যে কে থাকবে তাই নিয়ে দুই বাঘের সাধারণত লড়াই বাধে। আমার ধারণা, বাঘিনী নিয়ে মারপিট বাদ দিলে এই হল একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে বাঘে বাঘে লড়াই হয়।

শুধু বাঘ কেন, অন্য বন্য জানোয়ারেরাও মারামারি করে বটে—তবে তারা নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করে খুবই কম। এক প্রজাতির দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জানোয়ারে যখনই লড়াই হয়, সাধারণত কেউ না কেউ লড়াইতে হার মানে—তখন আর কোনরকম সাজা না দিয়ে তাকে সেই রণক্ষেত্র থেকে চলে যেতে দেওয়া হয়।

আমি একাধিকবার বাঘে বাঘে লড়াই দেখেছি। অন্য জন্তুজানোয়ার,

যেমন সম্বর, চিতল, শুয়োর, হাতি আর সাপের লড়াই কত যে দেখেছি তার হিসেব নেই—প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই বিজিতের প্রতি বিজয়ীর এইরকম বীরোচিত ব্যবহার দেখেছি।

কোট্‌রি দক্ষিণ ব্লকে একবার দুটো বাঘকে আমি লড়তে দেখেছিলাম। আমি বসেছিলাম একটা 'মড়ি'র (কিল্) ওপর নজর রেখে। আগের দিন সন্ধ্যেবেলা এক গরিব চাষীর একটা মোষ বাঘের হাতে খুন হয়। মাটিতে থাবার দাগ দেখে বুঝেছিলাম বাঘটার বয়স বেশি নয়। অন্ধকার হওয়ার আগেই বাঘমশাই দেখা দিলেন। এ দেখি, রীতিমত কেঁদোবাঘ—মড়ির কাছে পায়ের যে দাগ দেখেছিলাম, এ বাঘ তার চেয়ে ধাড়ি। গুলি ছুঁড়তে যাচ্ছি, এমন সময় নজরে পড়ল বাঘের কোল বরাবর দুটো বাঘের বাচ্চাও ছুটছে। গুলি ছোঁড়ার মতলব ত্যাগ করে আমি ওদের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলাম। ভোজের পাতে নিঃসন্দেহে ওরা ছিল একেবারেই রেয়োভাট—হঠাৎ এসে পড়ে দেখে সামনে এলাহী খাবার। ওরা তো মহাউৎসাহে হুমহাম করে খেতে শুরু করে দিল।

সবে ওদের আধ-খাওয়া হয়েছে, এমন সময় হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে এসে একটা ক্রুদ্ধ বাঘ সগর্জনে ওদের আহারে ব্যাঘাত ঘটাল। বাঘিনীও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে নবাগত বাঘের মুখোমুখি হল। এক মুহূর্ত তারা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ভয়ঙ্করভাবে ফুঁসতে ফুঁসতে কার কত মুরোদ পরখ করে নিল। তারপরই এ ওর দিকে তেড়ে গেল। সংঘর্ষের পর নিজেদের তারা ছাড়িয়ে নিল। তারপর মাথাদুটো তেরচা ক'রে গজরাতে গজরাতে আর ফোঁসফাঁস করতে করতে আবার তারা পরস্পরের মহড়া নিল। কখনও পিছিয়ে গিয়ে, কখনও পাশে সরে গিয়ে, চোখে চোখ রেখে আর থাবা ছুঁড়ে ছুঁড়ে তারা এ ওকে কাটান দিচ্ছিল। আর তারপর বাঘিনীটি বিদ্যুদ্‌বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘটাকে মাটিতে পেড়ে ফেলল।

মোষের মৃতদেহে কতকটা আড়াল পড়ে যাওয়ায়, এরপর কী ঘটেছিল আমি স্পষ্টাস্পষ্টি দেখতে পাই নি। খানিক পরে বাঘিনীটি যখন উঠে দাঁড়াল, তখন দেখলাম তার নিচে পরাজিত বাঘ থাবা উব্‌দো ক'রে মাটিতে পিঠ দিয়ে চিৎপটাং হয়ে পড়ে রয়েছে। ওরা দু-মিনিটেরও বেশি ঠায় ঐ অবস্থায় ছিল। এই ছোটখাটো মল্লযুদ্ধে যবনিকা পড়বার পর বাঘিনী শেষবারের মত একবার

ফুঁসিয়ে উঠে একপাশে সরে দাঁড়াল; আর পরাস্ত বাঘটি তখন অরণ্যের ঘনায়মান ছায়ান্ধকারে তাড়াতাড়ি গা ঢাকা দিল।

যদি কোন বাঘিনী, বিশেষ ক'রে সঙ্গে কচি বাচ্চা নিয়ে, কোন বাঘের রাজত্বে এসে পড়ে—বাঘ তেমন আপত্তি করে ব'লে মনে হয় না, তবে বাঘিনীকে সে তাব সঙ্গিনী করবে না, নিজের মারা শিকারে ভাগ বসাতেও দেবে না—যে যার আলাদাভাবে থাকুক, এটাই সে চাইবে।

বাঘের ডাক

বাঘেরা মুখে হরেক রকমের আওয়াজ করতে পারে। ফুস্‌ফাস্ আর ফোঁস্‌ফাঁস্ থেকে শুরু ক'রে পুবোদমে গাঁকগাঁক। বাঘেরা ঘোঁতঘোঁত করে। থক-থকানোর মত কবে গজরায এবং নানাভাবে দাঁতখিঁচানোর শব্দ করে। আচমকা কেউ সামনে এসে গেলে 'উফ্' শব্দে হুঙ্কার ছেড়ে বাঘ লাফিয়ে ওঠে, বেগে গেলে গাঁক গাঁক আওয়াজ করে। একেবারে আলাদা ধরনের একটা ঘড ঘড আওযাজ হয় বাঘ যখন তেড়ে যায—তার এই ক্ষণস্থাযী ক্ষিপ্ত আক্রমণের মুখে এই আওযাজ হয দুবার কি তিনবার।

বাঘেরা কখনও কখনও আস্তে টেনে গোঙানোব মত আওয়াজ কবে। মাঝে মাঝে চাপা গলায় তাদের অসন্তোষের ভাব ফুটে ওঠে। সম্বর ধরতে না পেরে একটা বাচ্চা বাঘকে একবার এই রকমের আওয়াজ করতে শুনেছিলাম। বাঘের গন্ধ পেয়ে সম্বরটি চোঁ চাঁ দৌড দেওয়ায় এই বাঘটি তার কাছে এসে ঘাডে লাফিয়ে পডতে পারে নি। বাঘ বেচারা তখন রাস্তার ওপর দাঁড়িযে এই রকম অস্ফুট আওয়াজ করেছিল।

বাঘেব যখন খোশমেজাজ, তার পেট যখন ভর্তি—চলতে চলতে সে তখন হাঁক ছাড়ে। এক পর্দায চডা দরাজ গলায় তার এই হুঙ্কার তিন চার মিনিট অন্তব অন্তর শোনা যায। বাঘ যখন বাঘিনীকে খোঁজে, বাঘিনী যখন তাব হারানো বাচ্চাকে খোঁজে—ডেকে ডেকে ফেরা তাদের সেই তখনকার গর্জন ভাষায বর্ণনা কবা অসম্ভব। কেননা সে যে কী উচ্চগ্রামে তখন তাদের গলা ওঠে, তাদের প্রচণ্ড স্পর্ধার সঙ্গে মিশে থাকে কী যে খেদ, মাবমূর্তির সঙ্গে কী যে একটা মহিমান্বিত ভাব।

বাডিব বেড়ালদের মত ওরাও গবৃব্ গবৃব্ শব্দ করে, তবে ওদেব আওযাজটা আরও কর্কশ। নিজের বাচ্চাদের সঙ্গে ব'সে খেলা করবার সময একটা

বাঘিনীকে আমি একবার এইরকম শব্দ করতে শুনেছিলাম। আরেকবার বাঘ-বাঘিনীর জোড় বাঁধবার সময়ও আমি এই একই শব্দ শুনেছিলাম। বনে তখন নিকষ কালো অন্ধকার থাকায় আমি সেই প্রেমিকযুগলকে দেখতে পাই নি।

মাঝে মাঝে বাঘের গলায় আরেক রকমের অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যায়। ভয় পেয়ে সম্বর ঠিক যেভাবে ডাকে—'পু-উ-উ-ক'—অবিকল ঠিক সেইরকম কাটা কাটা, চাপা, তীক্ষ্ণ স্বর। এক পাখিকে অন্য পাখির ডাক নকল করতে আমি শুনেছি। কিন্তু নিজের কানে এবং একাধিকবার না শুনলে আমি বিশ্বাসই করতাম না যে, বাঘ তার অভিপ্রেত শিকারের ত্রাহি ত্রাহি রব নকল করে। তার শিকার কোথায় আছে জানবার জন্যে সে এটা করে থাকে। কারণ, এই বিপদ্জ্ঞাপক ধ্বনি শুনে ধারেকাছে যত জন্তু লুকিয়ে আছে—সম্বর, চিতল আর কাকর—সবাই একের পর এক নিজের নিজের ডাক ডেকে একে অন্যকে জানিয়ে দেবে। এইভাবে বাঘের জানা হয়ে যাবে তারা কে কোথায় আছে না আছে।

বাঘ স্বভাবভীরু

প্রকৃতির কোলে যে বাঘ স্বাভাবিক পরিবেশে থাকে, বেশির ভাগ বিড়াল জাতীয় প্রাণীর তুলনায় সে স্বভাবতই কিছুটা ভীরু। অথচ লোকের চোখে বাঘ হল হিংস্রতা, নির্মম বন্যতা আর নিষ্করুণ নিষ্ঠুরতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। এ ছবি সত্যি নয়।

কখনও কখনও ভারবাহী পশু এবং মাঝেমধ্যে মানুষজন তারা শিকার করে বটে, তবে বাঘের এই বিপথগামিতার জন্যে মানুষই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। বনে জন্তুজানোয়ার দুষ্প্রাপ্য হয়েছে মানুষেরই জন্যে। স্বাভাবিক শিকার থেকে বঞ্চিত করে বাঘকে মানুষ বাধ্য করেছে অন্যত্র খাবারের খোঁজে যেতে। বনেজঙ্গলে যারা কাজ করে, যারা রাখালি করে এবং প্রায় দৈনন্দিন যারা বাঘের সংস্পর্শে আসে—বাঘের এই ভীরুতার কথা তারা বিলক্ষণ জানে। ঘরে বসে বাঘের ডাক শুনতে পায় যেসব জংলী আদিবাসীরা, যারা মাঝেমধ্যে বাঘের গরু মুখে করে নিয়ে যাবার দৃশ্য দেখে, বনের ডোরাকাটা রাজাধিরাজ শরীরে কতটা শক্তি রাখে যারা জানে—স্বাভাবিক বাঘ তাদের ওপর নাহক হামলা করবে, এ ভয় তারা করে না।

শিকারীমাত্রই এ কথা জানে যে, মনেপ্রাণে সমস্ত বুনো জানোয়ারই মানুষকে শতহস্ত দূরে রেখে চলতে চায়। যে বনে শিকারের ছড়াছড়ি, সেখানে কেউ হয়ত সপ্তাহের পর সপ্তাহ ঠেঙিয়ে বেড়ালেও শিকারের তেমন টিকি দেখতে পাবে না। কোন জঙ্গলে বাঘের বাস আছে জানবার পরেও বাঘের সঙ্গে দেখা হওয়াটা নিতান্তই ভাগ্যের কথা—যদি না রীতিমতভাবে তার সন্ধান করা যায়। যদি দৈবাৎ বাঘে মানুষে দেখা হয়ে যায়, মানুষ দেখলেই সাধারণত বাঘ হাওয়া হয়ে যাবে—বিশেষ করে, দিনের বেলায়।

আমি অনেকবার বাঘের সামনাসামনি গিয়ে পড়েছি, প্রত্যেকবারই বাঘ আমাকে দেখে সটকান দিয়েছে। একবার এক বাঘ যখন মড়ির ওপর বসেছিল, আমি আলটপকা গিয়ে পড়েছিলাম। তাও আবার কি, খালি হাতে একেবারে নিরস্ত্র অবস্থায়।

ঘটনাটা ঘটেছিল বছর কয়েক আগে। হিমাচল প্রদেশে আমাদের গাঁয়ের কাছে। আমাদের গাঁ থেকে মাইল চারেক দূরে ঝীল একটা ছোট্ট গ্রাম। সেখানকার এক রোগা লিকলিকে লোক, সুন্দর সিং তার নাম—আমাকে এসে খবর দিল আগের দিন রাত্রে বাঘে তার ঘোড়া মেরেছে। তাদের ও জায়গা থেকে মাইলখানেক দূরে জলের সোঁতার ধারে সেই যে বিশাল এক ভালাবান গাছ আছে, বাঘ ঘোড়ার মড়িটা সেখানে ফেলে রেখে গেছে।

তখন বেলা দশটা এবং গরমকালে দিন বড় হয়। আমি আমার শিকারী পরিচারক মাংতাকে আমার বন্দুকটা দিয়ে আগে আগে পাঠিয়ে দিলাম। ঘোড়ার পিঠে আমি নিজে রওনা হলাম ঘণ্টাখানেক বাদে। রাস্তায় যেতে যেতে মাংতার সঙ্গে দেখা হল, ওকে বললাম মোড়লের বাড়িতে আমি থাকব, ও যেন সেখানে আসে। মোড়লের ভারি মিষ্টি এক মেয়ে ছিল, ও অঞ্চলের মধ্যে সে ছিল সবচেয়ে প্রিয়দর্শিনী। মোড়লের বাড়িতে অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর শেষকালে অধৈর্য হয়ে ঘোড়া রেখে আমি একাই পায়ে হেঁটে 'মড়ি' দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। যাবার সময় মোড়লের মেয়েকে বলে গেলাম সে যেন মাংতা এলেই তাকে পাঠিয়ে দেয়।

আমি যখন তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, তখন দুপুর দুটো বেজে গেছে। 'মড়ি'টা পড়ে ছিল আধ মাইলটাক দূরে, একটা সোঁতার মধ্যে। আমি সেই জলস্রোতের আঁকাবাঁকা ধার বরাবর উজানমুখো হাঁটতে হাঁটতে

একটা জায়গায় এসে পড়লাম—সেখানে দেখি একপাল কাক আর শকুন গাছের ওপর বসে আছে। এই মড়াখেকোদের দেখে বুঝলাম 'মড়ি'টা কাছেপিঠে কোথাও আছে।

দিনের বেলায় তখন এমন একটা সময়, যখন 'মড়ি'র কাছে বাঘ থাকার সম্ভাবনার কথা কোনো পাকা শিকারীরও মাথায় আসবে না। শকুনদের হাবভাবে কী প্রকাশ পাচ্ছিল না পাচ্ছিল, আমি অত লক্ষ্য করে দেখি নি—আমি ওদের দিকে তাকিয়েছিলাম শুধু জায়গাটা চেনবার জন্যে। 'মড়ি'র খোঁজে আমি সম্পূর্ণ খালি হাতে এগিয়ে গেলাম।

জঙ্গলে নিঃশব্দে হাঁটা এখন আমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। খাত বরাবর প্রথম বাঁকটা পেরিয়ে দ্বিতীয় বাঁকটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম—ওপারে গাছে গাছে সার দিয়ে বসে আছে কাক আর শকুন।

শেষ বাঁকটা পেরোতেই একটা ঘাসজমির ধারে এসে পড়লাম; আর আমার ঠিক হাত ছয়েক দূরেই দেখি মড়ির ওপর বসে প্রকাণ্ড এক বাঘ। আমরা পরস্পর পরস্পরকে যুগপৎ দেখে সমান স্তম্ভিত হয়েছিলাম। মাটিতে আমার পা দুটো যেন জমে গিয়েছিল, সোনালি আর কালো সেই ডোরাকাটার সবুজ, অকরুণ অথচ মনোমোহিনী চোখের দিকে আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। পিছু হটবার কথা আমার মনে উদয় হওয়ার আগেই বীরপুঙ্গব বাঘ ঘাসের ওপর লাফ দিয়ে নেমে সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেল। আমি যেন দেখলাম এক ঝলকে মিলিয়ে গেল একগুচ্ছ রং।

আমি আগেই বলেছি, বাঘেরা এমনিতে ভীরু, তারা সচরাচর মানুষের ওপর হামলা করে না। সেই কারণে গাঁয়ের লোকেরা তো বারোমাসই অরক্ষিত অবস্থায় জঙ্গলে আনাগোনা করে—তার মধ্যে কটা লোক বাঘের হাতে মরে? দেখবেন বাঘের হাতে খুনজখমের হার খুবই নগণ্য। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। এমন বাঘের সঙ্গেও কারো দেখা হয়ে যেতে পারে, যার মেজাজ বেজায় তিরিক্ষে—মানুষখেকো না হয়েও সে নিরীহ গ্রামবাসীদের মোক্ষম মার মারতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে সে মানুষের মাংস খাবে না এবং মড়ার কাছে পরে ফিরেও আসবে না।

এক বদ্‌রাগী বাঘ

আমার তিরিশ বছরের শিকারী জীবনে, তেমন বাঘ মাত্র একবারই আমার

চোখে পড়েছে। তাও এমন এক জায়গায়, যেখানে বলবার মত বনজঙ্গল নেই এবং ধূসর রঙের তিতির আর এখানে সেখানে দুচারটে নীলগাই ছাড়া কোন বন্য জীবজানোয়ারও নেই।

দিল্লী থেকে মাইল কুড়ি দূরে একটা গ্রাম আছে। নাম দমদমা। দিল্লী-আলওয়ার পূবমুখো সড়ক ছেড়ে তিন মাইল ভেতরে। কয়েকটা পর্ণকুটির আর ইতস্তত কয়েকটা আখাম্বা মেটে ঘর নিয়ে ছোট গ্রাম; খোয়াই অঞ্চল বলে কয়েকটা ক্ষয়াখর্বুটে বাবলা আর ছড়ানো ছিটানো কাঁটাঝোপ ছাড়া অন্য কোন গাছ নেই।

ওটা আমার তিতির শিকারের মনোমত জায়গা ছিল বলে এলাকাটা ছিল আমার নখদর্পণে। অমন মরুভূমিগোছের জায়গায়, অন্য প্রাণীর কথা ছেড়েই দিলাম, কখনও কোন বাঘ আসতে পারে—এটা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।

অথচ এক বন্ধুর কাছে শুনলাম বাঘের হাতে ঐ গ্রামেই এক স্ত্রীলোক নাকি মারা পড়েছে। দিন দুই পরে আমার আরেক বন্ধু এসে জানাল খবরটা সত্যি এবং বলল, ঐ ঘটনার পর আরও পাঁচজন লোক মারা পড়েছে, তাছাড়া আরও চারজন লোক মুমূর্ষু অবস্থায় বরগাঁও হাসপাতালে আছে।

পত্রপাঠ আমি সেই গ্রামে রওনা হয়ে গেলাম। গ্রামের চৌকিদারের সঙ্গে আমার দেখা হল, বাঘের যে কী মেজাজ তা সে নিজেই হাড়ে হাড়ে জানে। বাঘ তার পিঠে গোটা কয়েক নখের আঁচড় বসালেও প্রাণ নিয়ে কোনরকমে সে পালাতে পেরেছিল। সেই চৌকিদারের মুখে আমি প্রত্যক্ষদর্শীর খবর পেলাম।

গ্রামের এক বুড়িকে মারার পর থেকেই বাঘটা এইরকম বেযাড়া ধরনের কাণ্ডকারখানা শুরু করে দেয়। বুড়ির গরু মেরে বাঘটা যখন খাচ্ছিল, বুড়ি তখন সেখানে গিয়ে পড়ে। বাঘটা নিশ্চয় খুবই ক্ষুধার্ত ছিল; নইলে প্রকাশ্য দিবালোকে গরু ধরতেই বা যাবে কেন—বাঘ গরুটাকে যেখান থেকে ধরে, বুড়ি তার অল্প কিছু দূরে মাঠে কাজ করছিল। মাঠের এককোণে একটা ঝোপ ছিল, বুড়ি হঠাৎ শুনতে পায় সেই ঝোপের আড়াল থেকে তার গরুটা পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। বুড়ি হেঁটে গিয়ে দেখে মরা গরুর কাছে বাঘটা দাঁড়িয়ে। ঝোপে যাবার একমাত্র খোলা দিকটা দিয়ে বুড়ি এসেছিল।

বাঘ তখন বুড়ির ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে কাঁধের ওপব দাঁত বসিয়ে বুক পিঠ ঝাঁঝরা করে দিয়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে।

ও এলাকা থেকে মাইল ছযেক দূরে জেলার সদর গুরগাঁও। খবরটা যথাসময়ে সেখানে জানিয়ে দেওযা হয়। বাঘ মারবার জন্যে গাঁযে একদল পুলিশ পাঠানো হয়। পথে রাজপুতদেব একটা গ্রাম পড়ে। তার নাম ভুঁডসি। প্রথম মহাযুদ্ধে নিহত এ গাঁয়েব বীবযোদ্ধাদের নামে একটা স্মৃতিস্তম্ভ আছে। পুলিশরা যাবার পথে এ গ্রাম থেকে জনদশেক লোককে সঙ্গে নেয়।

পুলিশের এই দলবল বেলাবেলি দমদমায পৌছেই বাঘ তল্লাসি শুরু করে দেয়। গাঁযেব একটি লোক পুলিশের দলকে বাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে একটি ঝোপের কাছে বাঘের পাযের ছাপ দেখায়। ঝোপটা খুব কিছু বড নয, দৈর্ঘ্যে তিবিশ হাত আব প্রস্থে চব্বিশ হাত হবে—তবে খুব ঘন আর নিচু এবং তার আডালে বেশ চওডা একটি গর্ত। ঝোপে ঢোকবার একটা সুডঙ্গ ধরনেব প্রবেশপথ ছিল; বাঘ যে সেই পথ দিয়েই ঝোপের ভেতর ঢুকেছে, মাটিতে নভ্য তার স্পষ্ট পায়ের ছাপ।

বাঘকে ঝোপের বাইবে আনবার জন্যে পুলিশের দল যত রকমে পারে হৈ হট্টগোল করল। হাঁকডাক কবল, ঝোপের মধ্যে ইটপাটকেল ছুঁড়ে মারল, এমন কি বার দুই গুলিও ছুঁডল। কিন্তু ঝোপ থেকে কিছুই বেরিয়ে এল না। বাঘ ঝোপের মধ্যে নেই, এটাই সবাই সাব্যস্ত করল।

ওরা তখন ঝোপের ওপাশে ঢুঁড়ে দেখতে লাগল ঠিক কোন্‌দিকে বাঘ বেবিযে গেছে। জমিতে বালি থাকলেও ঝোপেব ওপাশে বাঘের পায়ের কোন চিহ্ন নেই। ভুঁডসি থেকে আসা বাজপুতদের একজন ঝোপের প্রবেশপথে ফিরে এসে ঝোপের ভেতর উঁকি দিযে দেখবার চেষ্টা করল। তার সঙ্গে বন্দুক ছিল। যাতে ভালোভাবে দেখতে পায় তার জন্যে গুঁড়ি মেরে শরীবেব অর্ধেকটা সে সুডঙ্গপথের ভেতর চালিযে দিয়েছিল। তাঁর পা দুটো তখনও ছিল বাইরে। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড হুঙ্কার; সঙ্গে সঙ্গে যে যেখানে ছিল, পুলিশবাহিনী সুদ্ধ, প্রাণভয়ে পালাতে লাগল। লম্বা দৌড দেবার পর চাষের ক্ষেতে এসে পুলিশ বীরপুরুষেরা ফিরে দাঁডিযে তাদের সার্ভিস রাইফেল বাগিযে ধরে দমাদ্দম দমাদ্দম গুলি ছুঁডতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর ভুঁডসিব দেহাতীরা তাদের গাঁয়ের লোকটিকে দেখতে না

পেয়ে মহা দুশ্চিন্তায় পড়ল। তারা পুলিশদের ধরল লোকটিকে খুঁজে আনবার জন্যে তাদের সঙ্গে যেতে। কিন্তু তাদের অনুরোধে পুলিশ কান দিল না। পুলিশের কাছ থেকে তারা তখন একটা বন্দুক ধার চাইল। পুলিশ তাতেও যখন রাজী হল না, তখন তারা খালি হাতেই সেই জায়গায় চলে গেল—যেখানে তারা সঙ্গের লোকটিকে ঝোপের মধ্যে শরীরের অর্ধাংশ ঢুকিয়ে দিয়ে মাটিতে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে থাকতে দেখেছিল।

ওরা গিয়ে দেখল লোকটা মাটিতে একভাবে সাষ্টাঙ্গেই শুয়ে আছে। পা দুটো তার তখনও বাইরে, কিন্তু শরীরের বাকি অংশ ঝোপের সুড়ঙ্গ পথে গোঁজা রয়েছে। লোকটার ধড়ে প্রাণ ছিল না। তার পিঠের ওপর একদলা রক্ত আর মাথাটা কেউ যেন হাতুড়ি দিয়ে ছেঁচে রেখেছে।

তারা যখন মৃতদেহটা ওঠাবার চেষ্টা করছে, ঝোপটা ফুঁড়ে বাঘ ছিট্‌কে বেরিয়ে এসে প্রচণ্ড হিংস্রতায় তাদের ধরাশায়ী করে ফের সেই কাঁটাঝোপের ভেতর গা ঢাকা দিল। আট জনের মধ্যে ওরা পাঁচ জন লোকই মৃত্যুযন্ত্রণায় মাটিতে আছাড়ি পিছাড়ি খেতে লাগল। বাঘ তাদের গায়ে দাঁত বসিয়ে নখ দিয়ে ফালা ফালা করে কেটেছে। দুজন অকুস্থলেই মারা গেল, একজন মারা গেল হাসপাতালে। দুজন শেষ পর্যন্ত প্রাণে বাঁচলেও তাদের বুক আর পিঠের মাংসে বাঘের দন্তখত গভীরভাবে খোদাই হয়ে থাকল।

এই বাঘ মানুষ মেরেছে বটে, কিন্তু নরমাংস কখনও খায় নি। বাঘটি সেই মাসে ঐ এলাকার আরও দুটি লোকের প্রাণ হরণ করে। তারপর তাকে ঢিট করা হয়।

সতর্ক এবং ধূর্ত প্রাণী

বাঘের মত এমন হুঁশিয়ার প্রাণী খুব কম আছে, যেখানে কোনরকম বিপদের ঝুঁকি আছে, সেখানে বাঘ সহজে মাথা গলায় না। মড়ির কাছাকাছি এসে বাঘ আগে চারদিক তন্ন তন্ন করে দেখে নেবে, তারপর খেতে আরম্ভ করবে। এমনি কি নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশ্বস্ত হওয়ার পরেও, মড়ি যেখানে পড়ে আছে সেখানে বসে কদাচিৎ খাবে—মড়ির টুঁটি ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাবে, অনেক সময় অনেক দূরে।

বাঘ ঠিক ছায়ার মত এই আছে এই নেই। খানিকটা মাটি ঘেঁষে ঘাড় নুইয়ে চলা তার স্বভাব, চলন্ত প্রাণী বা মানুষের হাঁটার ক্ষীণতম শব্দও

সে বহু দূর থেকে শুনতে পায়। বাঘের কানের ভেতরকার শ্রবণযন্ত্র তার সমান সাইজের অন্য যেকোন প্রাণীর চেয়ে বৃহত্তম—বাঘের শ্রবণশক্তি সেইজন্যে সবচেয়ে প্রখর। (এই সূত্রে বলে বাখি, শ্রবণযন্ত্র ক্ষুদ্রতম হওয়ায় ভাল্লুকেরা প্রায় বধির।)

মজাব ব্যাপার এই যে, বাঘেব শ্রবণযন্ত্র মানুষের কানের চেয়েও সম্ভবত আরও নিচু পর্দায বাঁধা আছে। মানুষেব কানে ধরা পড়ে ধ্বনির মাত্র সপ্তস্বর—তার দৌড় মিনিটে তিরিশ থেকে তিরিশ হাজার পর্যন্ত কম্পন। বাঘের কানে ধরা পড়ে সপ্তস্বরের চেয়েও বেশি। বাঘের শ্রবণযন্ত্রে খুব চড়া শব্দ খুব সম্ভবত ধরা পডবে না, কিন্তু যেসব নিম্নস্বর মানুষ কানে শুনতে পায না—বাঘ কিন্তু মানুষের অশ্রুত সেসব শব্দ আশ্চর্য নিখুঁতভাবে শুনতে পায়। যেমন ধরুন, হুইসেলে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ আওযাজ করলে বাঘের কোনরকম ভাবান্তর দেখতে পাবেন না—কিন্তু পায়ের আঙুল দিযে ভেতর থেকে জুতোর চামডায় একটু মোচড দিলেই দেখবেন সেদিকে বাঘেব ঠিক চোখ পডেছে।

বাঘেব সহজাত ধূর্ততা এত বেশি যে, সেটা প্রায যুক্তিসিদ্ধিব স্তরে উঠে যায়। পাতা ফাঁদ সম্পর্কে বাঘের চেয়ে বেশি সন্দিহান আর কোন প্রাণীই নয। সত্যি বলতে কি, বাঘের এই অতিসতর্কতা প্রায ভীরুতার সমপর্যাযে পড়ে।

কুমাযুন জেলার হাতিকুণ্ড ফরেস্ট ব্লকে বাঘের এই দিকটা একবার আমার নজরে এসেছিল। বাঘ সেবার দিনের পর দিন এমনভাবে আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছিল যে, তার কাছে আমি একেবারে বেকুব বনে গিযেছিলাম।

আমি যখন এক বন্ধুব সঙ্গে ঐ ব্লকে ছিলাম, তখন সেখানকার বনে দুটো জানা বাঘ ছিল। একটা ছিল জখম হওয়া বাঘ, মোটা-শাল-সোঁতায় এক মারকৈলাস বন্দুকধারী এসে বাঘটির ঐ হাল করে রেখে গিযেছিল। অন্য বাঘটি ছিল, রেঞ্জ অফিসাব শ্রীভূথণ্ডীর ভাষায, 'এক বিলাইতী শিকারী পার্টির নাকপঁচাশির দৌলতে বহুৎ এলেমদাব আদমী।'

বাঘ আর বাঘশিকার সম্পর্কে সাগরপারের এই শিকারী পার্টির নিজস্ব ধারণাগুলো ছিল একটু কেমন যেন। তাঁরা মনে করতেন, বাঘের পেছনে ছুটে এবং সুযোগের অপেক্ষায থেকে বাঘকে ধরাশায়ী করা তাঁদের কাজ

নয়—বরং তাঁরা যখন যেখানে চাইবেন সেইমত হাজির হয়ে গুলি খাওয়ার জন্যে বাঘই বুক পেতে দেবে।

এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা মনে করলেন, বাঘের সন্ধানে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকলে তাঁদের মান খোয়া যাবে (নাকি তাতে বিপদের ভয় ছিল ?)। অতএব তাঁরা চাইলেন বাঘ বেরিয়ে আসুক বনের বাঁধা সড়কে—সেখানে জমি থেকে চল্লিশ ফুট উঁচুতে এক শালগাছের মগডালে নিজেদের জন্যে তাঁরা মাচা বেঁধে রেখেছিলেন।

তাঁরা মাচার কাছাকাছি টোপ হিসেবে একটা মোষ বেঁধে রেখেছিলেন পয়লা দিনেই। বাঘ বেটার এমনি আস্পর্ধা যে, মোষটাকে সে কিনা জঙ্গলে টেনে নিয়ে গেল। পরদিন ঐ একই জায়গায় আবার একটা টোপ বাঁধা হল—মোষটাকে এবার একটা শক্ত দড়ি দিয়ে কষে বাঁধার ব্যবস্থা হল। বাঘ বেটা আবার সেই মোষটাকে মেরে শক্ত দড়িটা ছিঁড়ে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। বাঘের এই ধার্ষ্টামো দেখে শিকারীদের আত্মসম্মানে ঘা লাগল। তবু এবারেও তাঁরা ঐ একই জায়গায় আবার একটা টোপ বাঁধলেন—তবে এবার আর দড়ি দিয়ে নয়, লোহার মোটা তার দিয়ে। বাঘ এসে মোষটাকে মেরে, তারের দড়ি দাঁত দিয়ে কেটে—এতদূর আস্পর্ধা, মোষটাকে কিনা টেনে নিয়ে চলে গেল।

কিছুদিন এইরকম চলল। শেষ পর্যন্ত অনেক মাথা ঘামিয়ে শিকারী মশাইরা একটা উপায় বার করলেন। একটা জোরদার ডিজেল ইঞ্জিনের চোট সামলাতে পারে, এইরকম একটা শক্ত তারের দড়ি তাঁরা অর্ডার দিয়ে আনালেন। সেই দড়ি দিয়ে এবার তাঁরা মোষ বাঁধলেন। কিন্তু বাঘ বেটা মোষটাকে মেরে দড়ি থেকে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল, দড়ির শেষ প্রান্তে শুধু ঝুলে রইল মোষের একটা ঠ্যাং।

ওদের পক্ষে এরপর আর তিষ্ঠানো সম্ভব হয় নি। বিদেশাগত শিকারীরা চলে যাবার ঠিক একমাস পরে আমি সেই ব্লকে যাই এবং ঠিক একই জায়গায় টোপ বাঁধি। তবে টোপটাকে খালি ফেলে না রেখে আমি তার কাছাকাছি একটা ঝোপের ভেতর আর কারো কোটরে বসে জেগে রইলাম। বাঘ এল বটে, তবে টোপের কাছে ঘেঁষল না। আমার চোখের আড়ালে থেকে চারপাশে একবার ঘোরাফেরা করে শেষ পর্যন্ত হাওয়া

হযে গেল। পরদিন জ্যান্ত টোপ বেঁধে আবার আমি বসে থাকলাম এবং বাঘ আবার এসে কাছেপিঠে না ঘেঁষে চলে গেল। এক সপ্তাহ ধরে সমানে আমি এইবকম করে চললাম আর বাঘও রোজ তার খেলা সমানে চালিয়ে গেল।

একদিন আমি আমার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এলাম সে যাতে সোঁতাব দ্বিতীয মুখটা আগ্‌লে রাখতে পারে। আগের সপ্তাহে প্রথম যে মুখটাতে বসে আমি নজর রেখেছিলাম, বাঘ সে জায়গাটা ঘুবে দ্বিতীয় মুখটা দিয়ে চলে যেত। সেদিন আমরা একটু আগেই বিকেল তিনটে নাগাদ চলে এসেছিলাম, মোষটাকে আর আমার জিনিসপত্রগুলো আমার লুকোবার জাযগাব কাছে রেখে আমার বন্ধুটির জন্যে মাচা বাঁধতে চলে গিযেছিলাম। প্রথম মুখ থেকে দ্বিতীয় মুখের দূরত্ব পুরো দুশো হাতও হবে না। বন্ধুব মাচা বেঁধে আধ ঘণ্টাব মধ্যেই আমি আমার আশ্রয়স্থলে ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু এসে দেখলাম মোষটা নিখোঁজ।

মোষটাকে আমি একটা চারাগাছের সঙ্গে সরু দড়ি দিয়ে হালকাভাবে বেঁধে রেখে গিয়েছিলাম। আর তার কাছেই যে জায়গায আমি আমার কম্বল, কোট, হ্যাভারস্যাক আব থার্মোফ্লাস্ক রেখে গিয়েছিলাম, দেখলাম সব যেখানে ছিল সেখানেই আছে। আমি ভাবলাম মোষটা বোধহয় দড়ি খুলে ঝোপের মধ্যে চরতে চলে গেছে। খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই গাঁধাল ঝোপের তলায় ঘুপ্‌চির মধ্যে গুঁজে রাখা অবস্থায মরা মোষটাকে দেখতে পেলাম।

বাঘ কী তুখোড জানোয়ার! টোপের কাছে ও নিশ্চয় রোজ আমাকে লুকোতে দেখেছে। বার বার জাযগা বদলে লুকিযে থাকা সত্ত্বেও বাঘটা সেইজন্যেই কখনও টোপের কাছে ঘেঁষে নি এবং কখনই সে আমার বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসে নি। কিন্তু ঐ দিন মোষটাকে একা ফেলে রেখে আমাকে চলে যেতে দেখেছিল। আমি যাওয়ামাত্র সে বেরিযে এসে টোপটা হস্তগত করেছিল।

নিষ্ঠুর প্রাণী নয়

নিষ্ঠুর প্রাণী ব'লে বাঘের যে দুর্নাম, সেটা ঠিক নয়। বাঘের বাচ্চারাই যা একটু আধটু শিকার নিয়ে খেলে, নইলে বাঘ যাদেব ওপর চডাও হয় তাদের

অধিকাংশকেই সে তৎক্ষণাৎ মেরে ফেলে। যতক্ষণ তার খাওয়ার মত সংস্থান থাকে, ততক্ষণ নতুন জীব-কখনও সে হত্যা করে না। অনর্থক প্রাণহননের ব্যাপারটা ঘটে বিশেষ বিশেষ অবস্থায়। এটা দেখা গেছে যে, ছোকরা বাঘ বিশেষত যখন তার প্রিয়বান্ধবীর সান্নিধ্যে থাকে—তখন মাঝে মাঝে এক রাত্রে গণ্ডায় গণ্ডায় জানোয়ার মেরে ফেলে ; নিজেকে ঘটা ক'রে জাহির করবার ইচ্ছেয় অথবা নবলব্ধ শক্তিসামর্থ্যের মদমত্ততায় তারা এটা করে থাকে।

কী হচ্ছে বোঝবার আগেই, সম্ভবত প্রায় বিনা যন্ত্রণায়, বাঘের হাতে ঝট্ ক'রে পরিষ্কার মৃত্যু হয়। টিপে টিপে নিষ্ঠুরভাবে মারা বাঘের স্বভাব নয়। লিপিবদ্ধ একটি জবানবন্দীতে আমার কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

মিঃ এ. ডব্লু. স্ট্র্যাচান (যিনি যমের দুয়োর থেকে ফিরে এসে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন) এক বাঘিনীর কবলে পড়ে তাঁর 'মলড্ বাই এ টাইগার' বইতে লিখেছেন :

'বাঘিনী যখন আমার পায়ের পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছিল, আমার ভয়ও হচ্ছিল না, খুব তেমন যন্ত্রণাও হচ্ছিল না ; আমার তখনকার অনুভূতিগুলো যদি বেড়ালের হাতে পড়া ইঁদুরের মত হয়ে থাকে, তাহলে দুর্বলচেতারা একথা জেনে নিরুদ্বিগ্ন হতে পারেন যে, আক্রান্ত ব্যক্তিকে অযথা কষ্ট পেতে হয় না।'

মিঃ স্ট্র্যাচান যা বলেছেন সে সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান টনটনে ; কারণ, একটি আহত মুমূর্ষু বাঘিনীর কবলে দীর্ঘসময় তাঁকে থাকতে হয়েছিল। ডান হাত আর বাঁ পা হারানো সত্ত্বেও এবং বাঘের হাতে প্রায় সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হলেও মিঃ স্ট্র্যাচান বেঁচে গিয়েছিলেন। আশ্চর্য বুকের পাটা তাঁর ; এরপর তিনি শিল্পচর্চা শুরু করেন এবং জন্তু জানোয়ারের, বিশেষ ক'রে বাঘের, ছবি আঁকায় সিদ্ধহস্ত হন। হাতির দাঁতের মিনিয়েচারে তাঁর আঁকা বাঘের বিভিন্ন মেজাজ এবং ভঙ্গির ছবি রয়াল অ্যাকাডেমি অব আর্ট্স্-এ সাদরে গৃহীত হয়েছে।

(পরের কিস্তি কার্তিক সংখ্যায়)

অনুঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ছেলেটার জন্যে

প্রফুল্লকুমার দত্ত

জনতার ভিড়েব ভিতরে
ভিড়েছে সে। যেকোন সময়
গুলি এসে বুকের ভিতরে
ঢুকতে পারে, যে কোন সময়।

দুটো দশকের সত্য দেখে
তৃতীয় দশকে পদক্ষেপ
দুটো বুক ফুটো হল, দেখে
সম্মুখে তৃতীয় পদক্ষেপ।

পরিপূর্ণতার পরে ক্ষয়—
হিসেবের নিয়ম জানে সে।
প্রত্যহ অনেক ক্ষতি, ক্ষয়,
তবু জয় হবেই, জানে সে।

এবং জানে সে—ক্রমাগত
কার গুলি ঢোকে কার বুকে,
না-মেরে যে মরে, ক্রমাগত
তার গুলি ঢোকে কার বুকে॥

কয়েকটি ওড়িয়া আধুনিক কবিতা

কিরণময় রাহা

সাধারণত ওড়িয়া আধুনিক কাব্যসাহিত্যের স্থচনা ধরা হয় 'সবুজ' সাহিত্যিক গোষ্ঠির রচনা থেকে। অন্নদাশঙ্কর রায়, কালিন্দীচরণ পানিগ্রাহী, বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক প্রমুখ তৎকালীন তরুণ কবিদের রচনার কাল বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক এবং মূল স্থর হল স্বাতন্ত্র্যাভিলাষ, অন্তর্মুখিনতা ও রোমান্টিক। ওড়িয়া কাব্যসাহিত্যের ধারায় 'সবুজ' সাহিত্যিকরা আনেন এক নতুন স্রোত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতি অভিজ্ঞতানির্ভর আনুগত্য, গুরুভাষিত কাব্যিক সত্যে অনাস্থা, অন্যান্য ভাষার সাহিত্যিক ভাবনার সঙ্গে যোগস্থাপন ও তা থেকে রসগ্রহণ ইত্যাদি যেসব লক্ষণ এ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে নানা ভারতীয় ভাষায় দেখা যায়, তার নিদর্শন ওড়িয়া সাহিত্যে এঁদের লেখাতেই প্রথম পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগের ও একালীন ওড়িয়া আধুনিক কবিরা 'সবুজ' সাহিত্যিকদের উত্তরাধিকার অবশ্য সরবে অস্বীকার করেন। বস্তুত এঁদের ভাবাবেগ, প্রকাশভঙ্গী ও কাব্যাদর্শ আলাদা, এমন কি বহুলাংশে বিপরীত, কিন্তু তবু মনে রাখা দরকার, অগ্রজ 'সবুজ' কবিদের কবিতায় আধুনিকতার যুগোপযোগী প্রতিধ্বনি সৃষ্টি ও নব্যরীতি এ কালের ওড়িয়া কবিদের পথ প্রশস্ত করেছে।

যুদ্ধোত্তর জগতে প্রথাগত জীবনযাত্রায় যে পরিবর্তন ও মূল্যবোধের যে ভাঙন নানা জায়গায় লক্ষিত হয় আর যার ফলে অবিশ্বাস, আশাহীনতা ও বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা আধুনিক কাব্যে এত প্রতিফলিত, ওড়িয়ার জনজীবনে তা হয়ত ব্যাপকভাবে ও তুলনীয় দ্রুতগতিতে হয় নি; কিন্তু তার পূর্বাভাষ ও লক্ষণ আজকে নানাভাবে ও জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে বিদ্যমান। সমকালীন

জীবনমানসে পরিবর্তন, অবক্ষয় ও জটিলতার লক্ষণ বহু নবীন কবিকে প্রভাবিত, চিন্তিত ও বিদ্রোহী করে তোলে। সেইসঙ্গে যুক্ত হয় বহির্বিশ্বের কাব্যানুশীলনের সঙ্গে ব্যাপকতর পরিচয়। এই দুইয়ের প্রভাবই আধুনিক ওড়িয়া কাব্যসৃষ্টিতে সর্বাধিক সক্রিয়।

শৈলীতে ও বক্তব্যে ওড়িয়া আধুনিক কবিতা পূর্বগামী কাব্যধারা থেকে শব্দচয়নে, রূপকল্প নির্বাচনে, ছন্দগত উদ্ভাবনে ও প্রতিবাদী ঘোষণায় মূলত পৃথক। এই পার্থক্যই আবার আধুনিক ওড়িয়া কবিতাকে সমকালীন অন্যান্য ভাষায় কাব্যসৃষ্টির সঙ্গে সমানধর্মী করে তুলতে সাহায্য করেছে। একটা কথা অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, ওড়িয়া প্রাচীন ও ধ্রুপদী কাব্যসাহিত্যের সমৃদ্ধি ও সম্ভাব সমধিক। তা থেকে আধুনিক কাব্যের (স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও) রসপুষ্টি নিশ্চয়ই ঘটেছে, কিন্তু সেইসঙ্গে ট্র্যাডিশনের ভার আধুনিক কাব্যপ্রচেষ্টাকে কিছুটা বাধাগ্রস্ত করে থাকবে। ওড়িয়া আধুনিক সাহিত্যে মার্কসীয় ভাবধারার অপেক্ষাকৃত অনুপস্থিতিও লক্ষণীয়। এই কারণেই হয়ত সমাজসচেতনতার নিদর্শন ওড়িয়া আধুনিক কবিতায় ততটা স্পষ্ট হয় না, যতটা দেখা যায় কিছু অন্যান্য ভাষার আধুনিক কাব্যসৃষ্টিতে।

আধুনিক ওড়িয়া কবিতার মূল্যায়নের সময় এখনও আসে নি। উত্তরসূরীদের উপর এর স্থায়ী ও সার্থক প্রভাব কতটা ও কিভাবে হবে তা বলা যায় না। এটা কিন্তু নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এমন অনেক কবিতার সাক্ষাৎ আজকাল পাওয়া যায় যা আধুনিক কবিতা হিসাবে সার্থকতায় চিহ্নিত। ওড়িয়া আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে।

এ যুগের পাঁচজন ওড়িয়া কবির পাঁচটি সাম্প্রতিক কবিতার বাংলা অনুবাদ দেওয়া হল। পাঁচটি অনুবাদই কবি ভানুজী রাও কৃত।

বর্গী

কালো ঘোড়া, ধল ঘোড়া, কপিশ ঘোড়ায়
সংক্ষিপ্ত কদমে কিংবা হঠাৎ চক্করে
অসংখ্য বর্গীর সারি যাওয়া আসা করে
আমার মনের সমতলের অতল প্রান্তরে।

কেতকী পাঁপড়ির মত হলুদ পাণ্ডাশ রোদে
সমকোণ প্রান্তরের ধারে,
বর্শা সব চক্‌চক্ করে।
নানান দেশের মুদ্রা সোনাব, তামার
কত কত বাজত্বেব চিহ্ন অপার
বড় বড় মুক্তাখণ্ড তাদের থলিতে।

লম্বা লম্বা উষ্ণীষ ও ঝোপ ঝোপ গোঁফ,
মোর মনের মানচিত্রে কাঁপে।
অনেক বিপণি আর নারীর চিকুরে
হাত তাদের করে চিক্ চিক্
বর্গী আসে, বর্গী যায় ফিবে।

এখানে
ফোঁটা ফোঁটা নক্ষত্রের পাটকিলে হবিণ সায়াহ্নে
বর্শা সব উঠেছিল জ্বলে
যুগ যুগ অন্ধকারে যেন এক ক্ষীণ দেশলাই।

এখানে জলাশয়ে, হে লুণ্ঠনকারী
বলো তৃষ্ণা মিটেছিল তোমাদের ?

সচ্চি রাউতরায়

হেমন্ত

হেমন্ত এসেছে আজ
আম, জাম, জারুলের বনে
সবুজ পাতার ভিড়ে, চুপিসাড়ে বড় সঙ্গোপনে।
হিজলের গলি বেয়ে
হেমন্ত এসেছে পৃথিবীতে,
জীর্ণ শীর্ণ বুড়ি যেন নদীটা শুয়েছে বালিতে।

হেমন্ত দিয়েছে লেপে গোধূলিতে রিক্ত নীরবতা
সব যেন চুপচাপ, ছায়া ছায়া, সন্ধ্যায় অনেক শিশির।
মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে হেমন্ত আমার,
বাতাসে নেই দন্তুরতা,
দূরে শুনি শীতের চিৎকার
সে মোদের নগ্নতাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে
নখ আর দাঁতে দিতেছে শান
গাভীন ধানক্ষেত নিমজ্জিত কুয়াশায় ম্লান।

হেমন্ত এসেছে ফিরে
চিলের বিষণ্ণ ডানা
হতে ম্লান ধূসরতা ঝরে,
ধূলো, ধোঁয়া, কুয়াশায় বিমর্ষ পাখির মত
ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যা ফেরে পৃথিবীর ঘরে।

বালিয়াড়ির ধারে ধারে
কিংবা কেয়াবনের আঁধারে
হেমন্ত শুয়েছে দেখ
মৃত এক শালিখের মত
মুড়ি দিয়ে শ্রান্ত পাণ্ডুরতা
মাংস তার এলায়েছে ঘাসে।

ভানুজী রাও

অন্বেষণ

পৃথিবীর দয়া, ক্ষমা, স্বপ্ন আর আশা ও বিস্ময়,
তার মধ্যে তুমি ছিলে, ফাল্গুনে ছিল কৃষ্ণচূড়া,
শান্তি ছিল, সুখ ছিল, দেহ আর মনের শ্রাবণ
পৃথিবীর দেহ ঘিরে ছিল দিন, রাতের শিশির।

অস্তগামী তারা আর অস্তমিত মেঘের তিমিরে
মিলায়ে গিয়েছে মেঘ, দৈন্য আর শূন্যতার দেশ,
দিনের উত্তাপ আছে, উত্তরের শীত ও শূন্যতা
বিবর্ণ প্রকৃতির পাশে এক বিদীর্ণ পুরুষ।

তোমায় খুঁজেছি আমি দয়া, ক্ষমা, আশা ও স্বপনে
স্বপ্ন নেই, ক্ষমা নেই, সময়ের বিবর্ণ বিস্তৃতি
রূপ নেই, রেখা নেই, চিত্র বা এ শুধু মনের
তোমার দেহে বা কোথা যুগ যুগ মানুষের স্মৃতি ?

মোর আজ মৃত্যু হোক ; পৃথিবীর জরাজীর্ণ দেহ
তোমাকে মিশায়ে দেবে তুমি ভালবাসিয়াছ যদি।

গুরুপ্রসাদ মহান্তি

লণ্ঠন

কেরোসিন, কিছু ধোঁয়া, আগুনের শিখা এবং কিছু কীট
এ সমস্ত একাকার এ ধাতব পরিবেষ্টনীতে
এই জলুশহীন টিনের পেটে এক আগ্নেয় সমুদ্র
ঢেউ ভেঙে জ্বলিতেছে ভয়াল এ কৃষ্ণ রজনীতে।

আগুন মেনেছে পোষ,
এই টিনের পরিধিকে করেছে স্বীকার
সার্কাসের বাঘ যেন, এ আগুন শান্ত নির্বিকার।
সত্যি বুঝি এই কালো টিনটার
সাথে নেই পরিচয় তার
সত্যি যেন জানেই না লণ্ঠন আজ তেতেছে কি করে।

তুমি মৌসুমীর আলস্যকে চোখের পাতায় চেপে
সঞ্চালন করো চোখ প্রাণপাত পরিশ্রম করে
এবং গভীব চুলের অবণ্যে বন্দী করেছ চম্পক।

কখনও দেখেছ তুমি প্রজ্বলিত অস্তিত্ব আমার ?
জানো কি আমিও জ্বলমান এক তীব্র বেদনায়
মোটা ধুতি এবং ইস্ত্রিকরা হাফশার্টে ?

রমাকান্ত রথ

বাসের আয়নায় সূর্যাস্ত

ডালিয়ার পীতাগ্নি পাঁপড়ি ঝরে,
সূর্য এই অস্ত যায় বাসের আয়নায়
কাঁচের পরিধি জ্বলে, মনীষার গালের মতন।
মসৃণ রূপালি পর্দায় ছায়া পড়ে রক্তগোলাপের।
বাসের আয়নায়
(কনভেয়ার বেল্টের পরে)
গরুর পাল, রাখাল,
মাথায় জ্বালানি কাঠ শ্রমিকের দল
সাইকেল আরোহী ও বাস রাস্তা পদচারী
সমস্ত মাইল খুঁটি
গাছপালা লতা ফুলফল
সব ধাবমান—মিশতে চায় তারা
সেই এক জ্বলমান আগ্নেয় স্থিতিতে।
সব তারি মধ্যে লীন,
বিশ্বরূপদর্শনে কেঁপে ওঠে বিব্রত অর্জুন।

সব গেল সব মিশে গেল
রাশি রাশি এ ব্রহ্মাণ্ড হঠাৎ লুকায়
শুষে নেয় লোমকূপে এ আদিম পিণ্ড
সব ধরে নেয় শেষ রশ্মিজালে অংশুমান।
বাসের আরশিতে এ অগ্নিগোলক
(এ ব্রহ্মলোক না দেবলোক ?)
গিলে খায় কত ছবি কত রূপ কত স্থিতি
ক্ষুধার্ত শহরতলী স্টেশন যেমন
গিলে ফেলে ধোঁয়া ছেড়ে আড়মোড়া ভেঙে,
এঁকে বেঁকে দল দল সাপ
বাসের আয়নায় এ সূর্যাস্ত
দীপ্তিমান জীবনের তরঙ্গ উত্তাল।

সীতাকান্ত মহাপাত্র

শ্রাবণ সংখ্যার ভুল

লেখার নাম	পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
ফুলগুলি	৩১	ছয়	মেলায়	মোথায়
		চব্বিশ	কলসী	কল্মী
ঐ	৩২	ছয়	কেমন	যেমন
		কুড়ি	জঙ্গল	জঙ্গম

এ ছাড়া 'ডোরাকাটার অভিসারে', শ্রাবণ সংখ্যায়, ২৫ পৃষ্ঠায় অনুবাদকের একটি গুরুতর ভুল হয়েছে। দশম পংক্তিতে 'দশমনী' স্থলে হবে 'দশাসই' এবং একাদশ পংক্তিতে 'উনিশ-বিশ থেকে চব্বিশ-পঁচিশ' স্থলে হবে 'পাঁচ-ছয় (চার শো থেকে পাঁচ শো পাউণ্ড)'।

পত্রিকা প্রসঙ্গ

স্নিগ্ধ হলুদে রঙের উপর বিচিত্র ফুল লতাপাতা আর পাখি আঁকা সুন্দর মলাট, ছত্রিশ পাতার টুকটুকে পত্রিকা 'ফোলিও'। আমেরিকার ফ্লাশিং হাই-স্কুলের মুখপত্র। সম্ভবত ঋতুপত্র। উপরে লেখা আছে—বসন্ত, ১৯৬৭।

ফ্লাশিং হাইস্কুল কী ধরনেব স্কুল জানি না। আমেরিকার কোন্ প্রান্তে স্কুলটি অবস্থিত তা আমার পক্ষে অনুমান করাও অসাধ্য। কিন্তু বসন্ত সংখ্যা 'ফোলিও' অন্য আমেরিকা থেকে এক ঝলক বসন্তের হাওয়া নিয়ে এসেছে।

পাতায় পাতায় ছবি, মুক্তোর মতো নিটোল ঝকঝকে লেখা—ছত্রিশটি পাতা কখন যে পড়া হয়ে যায় টেরই পাওয়া যায় না। লেখাগুলি ইস্কুলের ছেলেমেয়েদেরই কিনা জানি না, হলে ছাত্রভাগ্যের জন্যে ইস্কুলটি ঈর্ষা করার মতো। কয়েকটি কবিতা রীতিমতো পরিণত। নিতান্ত অকবি বলেই অন্তত একটি কবিতা মূল ইংবেজিতেই পাঠকদের উপহার দিচ্ছি। কবিতাটির নাম 'হোপ' (আশা)।

In from the cold, chilling outside
Into the warmth of a home
Away from the freezing stares placed from outside
To greet the people you know.

To hope that one day we might reach the peak,
Where friends are both in and out.
To create the warmth of a winter's day
When no one will feel left out.

দুটি চমৎকার প্রবন্ধ আছে। একটির নাম I'm not a Negro, I'm an Afro-American—আমি নিগ্রো নই, আফ্রো-আমেরিকান। লেখক বলছেন নিগ্রো কথাটি অবজ্ঞাসূচক। কালো আমেরিকানদের তাদের পূর্বপুরুষদের

মাতৃভূমি আফ্রিকা ও তার ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার উদ্দেশ্যেই তাদের চিহ্নিত করা হয় নিগ্রো বলে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটি—'সকলের জন্যে স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার' একটি ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী সভার বিবরণ।

দুই বন্ধুতে সপ্তাহব্যাপী তুমুল তর্ক চলেছে—আমেরিকানদের ভিয়েতনামে থাকা উচিত কিনা। তর্কে কোন মীমাংসা হয় না, তখন রফা হয় তার বন্ধুর সঙ্গে যুদ্ধবিরোধী সভায় যাবে এবং বন্ধু তার বিনিময়ে আসবে যুদ্ধের পক্ষে অনুষ্ঠিত কোন সভায়। কিন্তু প্রথমেই ঘটল বিপত্তি। যুদ্ধবিরোধী সভায় যোগ দিতে গিয়ে লেখকের ঠাঁই হল পুলিশের গাড়িতে।

সভায় হাঙ্গামাকারীদের যে বর্ণনা দিয়েছেন লেখক তাতে 'পীকস্কিল, ইউ-এস-এ'র কথা মনে পড়বে।

বর্ণনাটা লেখকের মুখ থেকেই শুনুন: "আমরা মার্ক টোয়েন হাই স্কুলের সমাবেশে গেলাম। স্কুলের সামনে এসে দেখি হাঙ্গামাকারীরা ইতিমধ্যে জমায়েত হয়েছে। তাদের হাতে নানা পোস্টারে লেখা আছে—'ভিয়েতনামে আমাদের ছেলেদের সমর্থন কর', 'স্বাধীনতা বিক্রি করে দিও না' এবং 'ভালো কমিউনিস্ট সেই যে মৃত কমিউনিস্ট' ইত্যাদি। নানা বয়সের ও নানা পেশার লোক আছে তাদের মধ্যে। যদিও মতের দিক থেকে এদের সঙ্গেই আমার মতের মিল বেশি তবু না ভেবে পারলাম না, যদি এদের আরও একটু ভদ্র গোছের চেহারা হত। তাদের মধ্যে এমন কি কেউ কেউ মাতাল ছিল।... কিন্তু একজনকে দেখে আমি সত্যি লজ্জা পেলাম—সকলের থেকে একটু আলাদা হয়ে হাতে একটা বিয়ারের বোতল নিয়ে সে চিৎকার করছিল—'হাইল হিটলার। ভিয়েতনামে আমাদের ছেলেদের সমর্থন কর'।..."

সভায় গোলমাল হবে বোঝাই যাচ্ছিল। পুলিশও উপস্থিত ছিল। পুলিশের একজন ক্যাপটেন মঞ্চের উপর উঠে এসে সভাপতিকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে মাইকে বললও: 'হাঙ্গামাকারীদের আমি বলছি এই গুণ্ডামি বন্ধ করতে। তারা যদি মিটিং-এ গোলমাল করে তাহলে আমাকে তাদের বের করে দিতে বলা হয়েছে।'

কিন্তু হাঙ্গামা যখন পুরোদমে শুরু হল তখন পুলিস কী করল?

"...হাঙ্গামাকারীদের পতাকাবাহী চেঁচিয়ে উঠল: 'অনেক কুৎসা

শুনেছি। আর সহ্য করব না।' হাঙ্গামাকারীরা মঞ্চের দিকে এগোতে লাগল, যারা বাধা দিচ্ছিল তাদের সঙ্গে হাতাহাতি করতে করতে। হঠাৎ দেখলাম আত্মরক্ষা করবার জন্যে আমার দ্বিগুণ চেহারার একটা লোকের সঙ্গে লড়ছি। সাহায্যের জন্যে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পর আমাকে (সম্পূর্ণ নির্দোষ আমি!) টেনে হিঁচড়ে নিয়ে তোলা হল অপেক্ষমান একটা পুলিশভ্যানে।"

কোন্ 'কুৎসা' হাঙ্গামাকারীদের কাছে অসহ্য মনে হয়েছিল, জানেন?

সমাবেশের একজন বক্তা হাঙ্গামাকারীদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন: "আপনারা দাবি করছেন আপনারা আমেরিকান। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আমেরিকানরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে, বক্তৃতার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে— আর আপনারা এসেছেন আমাদের বক্তব্য বলায় বাধা দিতে।"

সত্যি তো, জনসনের গ্রেট সোসাইটির এর চেয়ে বড় কুৎসা আর কী হতে পারে?

'চরৈবেতি' একেবারে ভিন্ন ধরনের পত্রিকা। যদিও 'ইয়ারী বৈঠক' পত্রিকাটির প্রকাশক, 'চরৈবেতি' রীতিমত একটি গুরুগম্ভীর পত্রিকা। ঝকঝকে ছাপা, ছিমছাম চেহারা—পত্রিকাটির সর্বত্র এমন একটা নিষ্ঠার ছাপ আছে যা আজকালকার দিনে সুলভ নয়। সম্পাদকীয় বক্তব্যে বলা হয়েছে: 'এই পত্রিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলেই নিজের বিষয় গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলনে ব্যাপৃত, এবং সেইসঙ্গে জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমবায়িত পদ্ধতিতেও বিশ্বাসী।' এই সম্পাদকীয় দাবি যে অসার নয় 'চরৈবেতি'র প্রতিটি রচনাই তার প্রমাণ। সাকুল্যে সাতটি প্রবন্ধ আছে এই সংকলনে, তার মধ্যে চারটি বিজ্ঞান বিষয়ক। বিজ্ঞানে আমি অনধিকারী, তবু একথা স্বচ্ছন্দে বলতে পারি—অতি-তরল না করেও চারটি প্রবন্ধেই লেখকরা বক্তব্যবিষয় সহজভাবে বলতে পেরেছেন।

শব্দ নিয়ে অল্পবিস্তর নাড়াচাড়া করতে হয়—তাই আমাদের মতো পাঠকদের কাছে 'শব্দের অনাচার' প্রবন্ধটি অনেক বেশি কৌতূহলোদ্দীপক। শব্দের অপপ্রয়োগ সম্পর্কে এ ধরনের আলোচনা যত বেশি হয়, বাঙলা ভাষার পক্ষে ততই মঙ্গল। অপপ্রয়োগের ফলে কত শব্দের যে অর্থভেদ ঘটে যাচ্ছে তার ঠিক নেই। এবং বাঙলা ভাষার জগতে যতটা বিশৃঙ্খলা চলছে, পৃথিবীর আর কোন ভাষার ক্ষেত্রে বোধহয় তা সম্ভবও নয়। 'চরৈবেতি'র কাছ থেকে এ-ধরনের আরও আলোচনা আমরা আশা করব।

প্রদ্যোৎ গুহ

"নো"
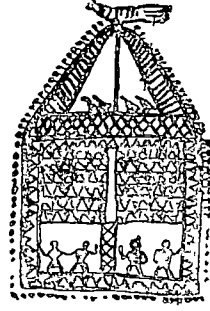
আদিতে গল্পটা ছিল এই ঃ

অনেক, অনেক দিন আগে, চীনদেশের শোকু সামন্তরাজ্যে রোসি নামে এক যুবক বাস করত। বেশ কেটে যাচ্ছিল তার জীবন। কিন্তু একদিন তার রক্তের ভিতরে কী এক খেলা শুরু হল, জীবন ও পৃথিবী সম্পর্কে এক গভীর প্রশ্ন তাকে উতলা করে তুলল। কী করবে সে? কার কাছে পাবে এই প্রশ্নের উত্তর? তার মনে পড়ল 'সো' প্রদেশের এক জ্ঞানী ভিক্ষুর কথা। হ্যাঁ, একমাত্র তিনিই পারেন তার প্রশ্নের উত্তর দিতে।

রোসি ঘর ছেড়ে পথে নামল। দীর্ঘ পথ। রাত হল ক্যাণ্টনে এসে। শ্রান্ত রোসি বিশ্রামের জন্যে এক সরাইখানায় আশ্রয় নিল।

রাত্তিরে যখন তার জন্যে খাবার তৈরি হচ্ছে সেই স্বল্প সময়ে রোসি একটা বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল, তার একটু বা তন্দ্রার মত এসেছে, এমনি সময়ে সে দেখল এক দূত এসে হাজির। কিসের দূত, কার দূত? না, স্বয়ং চীনসম্রাটেব দূত। দূত নমস্কাব করে রোসিকে বলল, 'মহাশয়, সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করেছেন, তাঁর ইচ্ছা আপনি সিংহাসনে আবোহণ কবে রাজ্যশাসন করুন।' দূত রোসিকে রাজকীয় কেদারায় বসিয়ে নিয়ে এল রাজধানীতে। রোসি পরমানন্দে রাজত্ব শুরু করল, তার দরবারের জাঁকজমকের খ্যাতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

কেটে গেল পঞ্চাশ বছর। সিংহাসনে আরোহণের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের রাত্রে একজন পরিচারক রোসিকে সঞ্জীবনী সুধা জাতীয় একরকমের মদ দিল পান করতে। সেই সুধা পান করার সঙ্গে সঙ্গে রোসির তন্দ্রা গেল ছুটে;

রাজদরবার, প্রাসাদ, পাত্র-মিত্র লোকলস্কর নারী মদ সিংহাসন সব মুহূর্তে মিলিয়ে গেল শূন্যে; রোসি সরাইখানার সেই বিছানার উপরে উঠে বসল। চেতনা ফিরে পেয়ে আত্মস্থ হয়ে রোসি উপলব্ধি করল জীবন আসলে একটা স্বপ্ন। সে বুঝল তার প্রশ্নের উত্তর এই জাদু-বালিশই তাকে দিয়ে দিয়েছে, জ্ঞানী ভিক্ষুর কাছে যাবার আর তার প্রয়োজন নেই। সে উঠে বাড়ির পথ ধরল।

বর্তমানে এই গল্প যে-রূপ নিয়েছে তার বাঙলা করলে দাঁড়ায়:

এক বাড়িতে শোভা আর তার স্বামী বাস করে। তাদের কোনও ছেলেমেয়ে নেই। একদিন শোভা কি কেনাকাটা করতে দোকানে গিয়েছে, তার স্বামী সেই সময়ে শোভার লুকিয়ে রাখা একটা বালিশ খুঁজে পেয়ে সেই বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভদ্রলোক বাড়ি ছেড়ে চলে গেল জন্মের মত।

সারা বাড়িতে শোভা এখন একা। মেয়েমানুষ একা থাকলে যা হয়, নানারকম বদলোকের নজর পড়ল তার উপরে। রাত্তিরে শোভার বাড়ির সদর দরজার কড়া নড়ে, শোভা ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকে, পরে অসহ্য হয়ে উঠলে দরজা খুলে লোকটাকে ঘরে নিয়ে আসে। বাইরের ঘরে বিছানা পাতা, যে-বালিশ মাথায় দিয়ে স্বামী বিবাগী হয়ে গিয়েছে কামরূপে-তৈরি-সেই-জাদু-বালিশটি মাথায় দিয়ে লোকটিকে শুতে দেয়। লোকটি ঘুমিয়ে পড়ে, এবং ঘুম থেকে উঠে এমন ভাবে শোভার দিকে তাকায় যেন একটা কৃমিকীট দেখছে; নারী অর্থ যশ সবকিছু অর্থহীন হয়ে যায় তার কাছে, সে নিজের হাতে দরজা খুলে কোথায় না কোথায় চলে যায়।

ঘটনার দিন গভীর রাত্রে তেমনি কড়া নড়ছে; শোভা একসময়ে উঠে গিয়ে দরজা খুলেই বলে ওঠে, 'একি ছোটবাবু! তুমি! এস, এস, ভেতরে এস, কত বড়টি হয়ে গিয়েছ, চেনা-ই যায় না।'

সুটকেস হাতে যে বিষণ্ণ যুবকটি প্রবেশ করে, ধরা যাক, তার নাম বিনয়, বয়স আঠারো। বহরমপুরে ছিল তাদের বাড়ি, শোভা বিনয়ের আয়ার কাজ করত। বিনয়ের বয়স যখন মাত্র আট তখন তাদের বাড়ি পুড়ে যায়, তার মা-বাবা তাকে নিয়ে অন্যত্র চলে যায়, শোভা চলে আসে এখানে, তার নিজের বাড়িতে। চলে এলেও সন্তানহীনা শোভাকে বিয়ের স্মৃতি রেহাই দেয় না।

সে সেই পড়ে যাওয়া বাড়িতে ছোট্ট বিনয়ের ঘরটি যেমন ছিল ঠিক তেমনি এক ঘর তার নিজের বাড়িতেও গড়ে সাজিয়ে রাখে। সেই দোলনা, সেই খেলনা, সব ঠিক আগের মত।

আঠারো বছরের বিনয় তার শৈশবের হারিয়ে যাওযা ঘরটি এ-বাড়িতে আবিষ্কার করে ভারি অবাক হয়, তার মনেও যেন শৈশবের রঙ লাগে। কিন্তু আঠারো বছর বয়সেই তার জীবনে এসেছে বিতৃষ্ণা ; জীবনে তার কিছু চাইবার নেই, পাবারও নেই কিছু। সব শুনে শোভা তাকে বলে, 'একদিন না একদিন তুমি আমারই কাছে ফিরে আসবে, আমি জানতাম।'

বিনয় তুমি কি ভেবেছ শুধু দেখা করার জন্যে আমি এতটা পথ ভেঙে এসেছি?

শোভা তুমি এসেছ, তাতেই আমার আনন্দ, কবে থেকে পথ চেয়ে বসে আছি।

বিনয় সব জিনিশেরই শেষ আছে, তোমার পথ চাওয়ারও। দেখ না, জীবনও তো শেষ হয়ে এল।

শোভা কী যা-তা বলছ? আঠারো বছর বয়সেই সব শেষ!

বিনয় আঠারো বছর হতে পারে, কিন্তু আমি জানি আমি আর বেশিদিন নেই।

শোভা হুঁঃ, টাক পড়ে নি, কোমড় ভেঙে পড়ে নি, মুখে বয়সের দাগ অব্দি নেই।

বিনয় তুমি দেখতে পাচ্ছ না তাই। আমার চুল হয়ত কালোই দেখাচ্ছে, আসলে সব শাদা, দাঁত পড়ে গিয়েছে, কোমর সোজা করে দাঁড়াব সে শক্তি নেই…

শোভা বিনয়ের কথা কিছু বুঝতে পারে না। তার সন্দেহ হয় হয়ত ব্যর্থ প্রেমে, বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় অথবা পরীক্ষায় ফেল করে বিনয়ের মনের এই দশা হয়েছে। বিনয় তার আশঙ্কা দূর করে। বলে, 'তোমার কাছে আছে এক জাদু বালিশ, তাতে শুলে স্বপ্ন দেখা যায়। জীবন আমাকে কিছু দেয় নি, আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই স্বপ্ন আমাকে কিছু দিতে পারে কিনা।' পাছে বিনয় বিবাগী হয়ে চলে যায় এই ভয়ে শোভা প্রথমে বালিশ দিতে রাজি হয় না; বিনয় শোভার হাত ধরে মিনতি করে, যেমন করত ছেলেবেলায়

সন্দেশ বা কেকের জন্যে। অগত্যা শোভা বালিশ দিতে রাজি হয়, বলে, 'তুমি যদি বিবাগী হয়ে যাও, আমি তোমার সঙ্গে যাব কিন্তু।'

বিনয় বালিশে মাথা দেবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সেরা সুন্দরী এসে তাকে দেহদান করে, বিনয় কিন্তু সুন্দরীর সুন্দর চামড়ার তলায় শুকনো খটখটে শুধু দেখতে পায়, সে জানে হাড়টাই সত্য, সৌন্দর্য দু'দিনের ব্যাপার, যে কোন ভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পাবে। তাদের এক সুন্দর সন্তান হয়, বিনয় ভয় পায় শিশুর হাসি দেখে, কেননা শিশুর হাসির গভীরে তার চোয়ালেব হাডেব হো-হো রবটাই তার কানে এসে বাজে, সে শিশুটিকে খুন করে। মুহূর্ত পবে বিনয দেশের সেরা পুঁজিপতি হযে ওঠে, তার হাতে পার্লিয়ামেণ্ট ভাঙাগডার ক্ষমতা। তার মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট করে, বিনয় তার কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি দেশের শ্রমিক ইউনিয়নগুলোকে দান করে পাশ ফিরে শোয়, তার প্রাইভেট সেক্রেটারি কাগজে কাগজে এ-খবরটা প্রচার করে দিয়ে জানায় যে বিনয একটা নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করতে উদ্যোগী। বিনয় বিরাট এক পার্টির নেতা হয়ে ওঠে, তার নামে সারাদেশ জযধ্বনি দেয; পরাজিত বাজনীতিকদের একজন বিনয়ের পাশে খানিক বিষ রেখে যায়, কেননা তার বিশ্বাস রাজনীতিকদের দু'টি জিনিশ সম্বল, এক তাব নিজের মুখ, সেটি ফেল করলে বিষ! এ-ছাড়া গতি নেই। এই সময়ে দেশেব সবচেয়ে বড যে ডাক্তার সে এসে সঞ্জীবনী-সুধারূপী সেই বিষই বিনয়ের জন্যে ব্যবস্থা দেয। বিনয জেগে উঠে সেই বিষ খেতে অস্বীকার করে, ডাক্তার তাকে জীবনের নশ্বরতা সম্পর্কে নানা কথা বলে, বিনয মানে না, ডাক্তার জোর করে তাকে বিষ খাওযাতে উদ্যোগী হয়, বিনয় বিষের গ্রাস কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলে, ডাক্তার আর্তনাদ করে মিলিয়ে যায়।

কফি হাতে শোভা এসে বিনয়কে ঘুম থেকে তোলে। এমন ভোর আগে কখনও আসে নি শোভার জীবনে। ভোরের আলোতে চোখ মেলে তাকিয়ে বিনয়ও খুশি হয। মুখ ধোবার জন্যে কুয়োব পাড়ে গিয়ে বিনয অবাক হয়। গত রাত্রে বাগানের যে মরা গাছগুলো অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে ছিল আজ সকালে সেগুলো নানারঙের ফুলে ছেযে গিয়েছে।

জাপানি 'নো' নাটকের প্রাচীন ও আধুনিক রূপ হচ্ছে এই। প্রাচীন

কাহিনীর এই কালোচিত পরিবর্তন নানা সঙ্গত কারণেই আমাদের হৃদয়গ্রাহী।

জাপানের লোকগাথা ও পুরানভিত্তিক এই ধরনের নাটকের উৎপত্তি ও কান'আমি কিয়োৎসুগো (১৩৩৩-৮৪ খ্রী) এবং জি' আমি মটোকিয়ো (১৩৬৩-১৪৪৩ খ্রী) এই দুই পিতাপুত্রের হাতে তার সময় ও কালোচিত পরিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাস আলোচনার প্রচুর সম্ভাবনা থাকলেও আপাতত বর্তমানে লভ্য প্রায় আড়াইশ' নো কাহিনীর প্রতি আমাদের দেশের নাট্যকার ও কাব্য-নাট্যকারদের দৃষ্টি আকর্ষণই এই নিবন্ধের বিনীত লক্ষ্য। বাঙলা দেশের নাটক ইওরোপ ও আমেরিকার নাটক ও নাট্যরীতির দ্বারা সমধিক সমৃদ্ধ, বলতে কি, আজকাল যে সকল আধুনিক নাটক অভিনীত হচ্ছে তার শতকরা পঁচাশিটিই কোনও না কোনও ভাবে পশ্চিমি নাটকের ছায়া বা ভাব অবলম্বনে রচিত; কিন্তু আমাদের সঙ্গে যাদের ঐতিহ্য ও ধর্মগত মিল সব চেয়ে বেশি সেই চীনদেশ ও জাপান প্রায় উপেক্ষিত বললেই হয়। নো নাটকের আধুনিক কাহিনীঅংশ নিয়ে সুন্দর নাটক বা কাব্যনাটক রচিত হতে পারে; বাঙলা রঙ্গমঞ্চে পাশ্চাত্যদেশের নাটক ও নাট্যরীতির তুমুল প্রবাহের সঙ্গে যদি প্রাচ্য দেশীয় এই পরিশীলিত নাট্যরীতির ক্ষীণ ধারাটুকুও সংযোজিত হয় তাহলে এমন কী ক্ষতি। এই নাটকের পাত্রপাত্রী ও মঞ্চসজ্জার বাহুল্য একেবারেই বর্জিত বলে অল্পব্যয়ে সহজেই এর অভিনয়ের ব্যবস্থা হতে পারে।

জাপানের ইতিহাসের 'নারা' আমলে (৬৪৫-৭৯৪ খ্রী) এক ধরনের নাট্যরীতি ভারতবর্ষ থেকে চীন হয়ে জাপানে যায়। সেই আমলে জাপানে এর নাম হয় 'সাংগাকু'। এই নাটকে ভোজবাজি বা ইন্দ্রজালই ছিল প্রধান অবলম্বন। পরে (৭৯৪-১১৮৫ খ্রী) ডেংগাকু নামে স্থানীয় একধরনের কৌতুকাভিনয় মিশে যায় তার সঙ্গে। ডেংগাকুর ফসলসম্পর্কিত অনুষ্ঠানাদি থেকে। এই দুটি মিলে যা দাঁড়াল তাকে বলা হল 'সারাগাকু-নো-নো', সংক্ষেপে 'নো'। স্বয়ং এজরা পাউণ্ড কয়েকটি 'নো' নাটকের অনুবাদ করেছেন; কবি ইয়েট্‌স্ একসময়ে 'নো' নিয়ে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। পাউণ্ড 'নো'-র বানান করেছেন 'এন, ও, এইচ্'; যার বাঙলা উচ্চারণ হতে পারে 'নোহ্'। কিন্তু জাপানি নো-বিশেষজ্ঞ ড. জিমারো টৌকি লিখেছেন 'এন ও'; ও-র মাথায় দীর্ঘলয়সূচক হাইফেন। আমরা 'নো' উচ্চারণই বহাল রাখলাম।

জি'আমি নো-র সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতে প্রতীকের সাহায্যে বলেছেন, 'একটি শাদা রঙের পাখি ঠোঁটে একটি লাল ফুল নিয়ে উড়ে যাচ্ছে।' নো-নাটকে যে গতি, প্রশান্তি, স্নিগ্ধতা, সুষমা ও সারল্য রয়েছে তা বাঙলা নাটকে প্রতিফলিত হলে আমরা লাভবানই হব। প্রাথমিক অপরিচয়ের বাধা কাটিয়ে উঠতে পারলে বিদগ্ধ বাঙালী দর্শকের কাছে নো আদরণীয় হবে সন্দেহ নেই।

স্বপ্নমঙ্গল কথা

একটি স্বপ্ন একজন মানুষকে রাতারাতি কতটা পরিবর্তিত করতে পারে? কৃপণকে দানবীর করতে পারে? পারে নীচকে মহৎ করতে? যাঁদের মতে পারা সম্ভব, তাঁদের কাছে চলাচল গোষ্ঠীর নতুন অবদান 'স্বপ্ন নয়' একটি নিখুঁত আর উপভোগ্য নাটক হবে সন্দেহ নেই।

নাটকের নির্মলবাবু একজন পেশাদার লেখক, যিনি টাকা, যশ আর স্তুতির মোহে নিজের আদর্শকে ভুলে গিয়েছিলেন। একদিন তাঁর আগের জীবনের বিপ্লবসঙ্গী সমর (এখন একজন কমিউনিস্ট নেতা) তাঁকে এই আদর্শচ্যুতি সম্বন্ধে সজাগ করে তুলতে চেষ্টা করল। সে চলে যাবার পর উত্তেজিত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে নির্মলবাবু স্বপ্নে তাঁর দেশের নিপীড়িত দরিদ্রসমাজের একটি ছবি দেখতে পেলেন। ঘুম ভেঙে যখন উঠলেন, তখন সেই স্বপ্নের পরশপাথরের ছোঁয়ায় তিনি একজন খাঁটি গণসাহিত্যিক হয়ে গেছেন আর সমরের নির্দেশিত পথ ধরেই এগিয়ে গেলেন।

কিন্তু সত্যিই কি এটা বিশ্বাসযোগ্য? যে লেখকের অস্থিমজ্জার মধ্যে অর্থ আর স্তুতির মোহ ঢুকে গেছে, একটা স্বপ্নের ধাক্কায় সে কখনও এতটা বদলে যেতে পারে? স্বপ্নের গল্পটিতেও নতুনত্ব কিছু নেই। এই শোষণ আর অত্যাচারের নমুনা আমরা জাগ্রত অবস্থাতেই অহরহ দেখতে পাচ্ছি চারিদিকে। নির্মলবাবুও নিশ্চয়ই সেসব দেখেছিলেন, আর দেখেও নির্বিকার ছিলেন। এ অবস্থায় সেই ধরনের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি স্বপ্নে দেখে রাতারাতি তাঁর এই বিরাট পরিবর্তন, মোটেই বিশ্বাস্য বা বাস্তব বলে মনে হয় নি।

নাট্যকাহিনীর ত্রুটি ভুলে যেতে পারলে নাটকটি উপভোগ করতে কোন

বাধা নেই। নাটক (ভোলা দত্ত রচিত) এবং পরিচালনা (রবি ঘোষ) চমৎকার। অভিনয়ে নির্মলরূপী ভোলা দত্ত ছাড়া কাউকে আলাদা করে ভাল বলবার প্রয়োজন নেই। কারণ, সকলেরই অভিনয় চরিত্রানুগ ও সুন্দর। ব্যতিক্রম উমাপদ ভট্টাচার্য। সবচেয়ে বড কথা, এই নাটকের গুণে আর উচুদরের গোষ্ঠীবদ্ধ অভিনযের ফলে 'স্বপ্ন নয়'-এর প্রথম থেকে শেষ অবধি একটা অনায়াস স্বচ্ছন্দগতি এসেছে, যার ফলে একটি মুহূর্তও দর্শকদের কাছে ক্লান্তিকর মনে হয় না। নাটকের রসিকতাগুলো একটু মোটা আঁচডের হলেও, উপস্থাপনের গুণে যথেষ্ট কৌতুকের সৃষ্টি করেছে। স্বপ্নের দৃশ্যে হঠাৎ এক বাউলকে দিয়ে সেকেলে 'বিবেক' প্যাটার্নের গান গাওয়ানোর কোন প্রয়োজন ছিল না।

আরেকটি কথা বোধহয় বলা দরকার। নাটকের প্রথমার্ধে সমর নির্মলকে বলেছে যে, সে চায না নির্মল রাজনৈতিক দলাদলির ভেতরে আসুক। তার কেবল ইচ্ছে যে, আনন্দ হাইত আর নুরুলের রক্ত যেন নির্মলের কলমকে বিচলিত করে। এটা খুবই উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। কথাটা আমার খুব ভাল লাগল। কিন্তু শেষের দিকে চাকা গেল ঘুরে। দেখা গেল, নির্মল শেষ পর্যন্ত সমরের অঙ্গুলিনির্দেশেই নতুন পথের সন্ধান পেল, নিজের বিবেকবুদ্ধির আলোয় নয়।

'কবি' হচ্ছে নির্মলের অনুরাগীদের মধ্যে একমাত্র যে, নিঃস্বার্থভাবে নির্মলের শিল্পীসত্তাকে শ্রদ্ধা করে (প্রসঙ্গত, সমর এবং কবিকে গেরুয়ারঙের পাঞ্জাবি পরানো হয়েছে—অন্যান্যদের থেকে তাদের পৃথক করার জন্য)। সে পুরো কমিউনিস্ট নয়,—পার্টির মিটিঙে যায় না, 'তবে এবার থেকে যাবে'। নির্মলের পরিবর্তনে সে খুবই খুশি। অথচ নাটকের শেষে পরিবর্তিত নির্মল যখন এক প্রতিবাদসভায় সভাপতিত্ব করতে চলল, তখন কেবল সমরই তার এই নতুন পথের সঙ্গী হল—কবি নয়। এই ছোট ঘটনাটি কিন্তু আমার কাছে বিশেষ এক অর্থ বহন করে এনেছে। আমার মনে হয়েছে, হযত পুরোদস্তুর কমিউনিস্ট নয ব'লে কবিকে নির্মলের সঙ্গী করতে নাট্যকার অস্বস্তি বোধ করেছেন। অর্থাৎ নাট্যকারের প্রথমার্ধের উদারতাটুকু শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে নি।

পরমভট্টারক লাহিড়ী
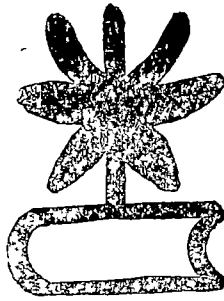
পুস্তক-পরিচয়

The World Revolutionary Movement Of The Working Class.—(মস্কো প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত)

শ্রমিক শ্রেণীব বিশ্ববিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলী নিম্নলিখিত পাঁচটি সিদ্ধান্তে পৌছেচেন: এই সিদ্ধান্তগুলি ইতিহাসেব প্রধান শিক্ষা।

প্রথম শিক্ষা খাঁটি বিপ্লবী হওয়ার অর্থ শ্রমিকের আন্তর্জাতিক সংহতির প্রতি অবিচল আস্থা। শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাব প্রকৃত অর্থ বিশ্বের তিনটি বিপ্লবী শক্তির ঐক্যসাধন (১) বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক সংস্থা, (২) দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী এবং (৩) জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনসমূহ।

দ্বিতীয় শিক্ষা. নিজ নিজ দেশে বিশ্ববিপ্লবের ভাবধারা যথাসম্ভব রূপায়িত করা। বিশ্বজগৎ তিনভাগে বিভক্ত: সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া, ধনতান্ত্রিক অঞ্চল এবং সদ্যস্বাধীন দেশসমূহ। সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজতন্ত্র ও শ্রেণীহীন সমাজ গডে তুলে ধনতান্ত্রিক জগতের ওপর টেক্কা দিয়ে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে হবে।

ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে জনগণের স্বার্থরক্ষাব দৈনন্দিন সংগ্রাম চালাতে হবে আর তৈরি হতে হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য—যে-দেশের যে সামাজিক পবিস্থিতি তদনুযায়ী পথে।

সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতে সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে ধনতন্ত্রকে এডিয়ে সমাজতন্ত্র গডে তুলবার জন্য সর্বাগ্রে সর্ববিধ ঔপনিবেশিকতার উচ্ছেদ সাধন করতে হবে।

তৃতীয় শিক্ষা: বিশ্বযুদ্ধ এড়াবার জন্য জনগণের শান্তি আন্দোলনেব প্রতি সর্ববিধ সাহায্য দান। তার জন্য চাই জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম, বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে ন্যায়যুদ্ধ এবং ধনিক শ্রেণী কর্তৃক সংঘটিত প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধের বিরোধিতা।

চতুর্থ শিক্ষা· প্রতিক্রিযাশীল জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সতত সতর্কতা ব্যতীত কোন বিপ্লবী সংগ্রামই জযযুক্ত হতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদ সর্বদাই প্রতিক্রিয়াশীল জাতিদম্ভের সমর্থক, বিভিন্ন ছদ্মবেশে এই জাতিদম্ভকে হাজির করা হয়।

পঞ্চম শিক্ষা শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার বিশ্ববিজযের সর্বপ্রধান শর্ত বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের একতা। সমগ্র পৃথিবী চলেছে কমিউ-নিজমের দিকে। মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের পতাকাতলে দুনিয়ার শ্রমিক আন্তর্জাতিক কমিউনিস্টআন্দোলনের ঐক্য দ্বারাই তাকে পূর্ণ বিজয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

৪৮৩ পৃষ্ঠা-সমন্বিত গ্রন্থে বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনের ১২০ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করে আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলী অকাট্য যুক্তিব সাহায্যে এই পাঁচটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

গ্রন্থখানিতে শুধু ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ বা আন্দোলনের পবম্পরাগত বিশ্লেষণই নেই, তা ছাড়াও আছে মতাদর্শগত সংঘাতের ইতিবৃত্ত।

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক মতবাদের বিরুদ্ধে একদিকে সংশোধনবাদ এবং অন্যদিকে মতান্ধতা, এই দুয়েরই সঠিক চেহারা নগ্ন করে ধবা হযেছে। অবশ্য ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবরণ অপেক্ষা মতবাদের আলোচনার প্রতিই গ্রন্থকারের ঝোঁক বেশি।

বিশ্ব শ্রমিকের ভূমিকা ছোট করে দেখানোই সর্বপ্রকার সংশোধনবাদের গোড়ার কথা। মার্ক্স দেখিযেছিলেন যে, ধনতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে শ্রমিক শ্রেণীই বর্ধিত ও সংগঠিত হতে হতে একদা ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করবে। মার্ক্স-এর এই সিদ্ধান্ত সংশোধিত ক'রে ধনিক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা দেখাতে চেষ্টা করে যে বর্তমান যুগে শ্রমিক শ্রেণী আর বাড়ছে না, জনসংখ্যার বিভিন্ন শিবিরে বিভিন্ন ধরনের মানুষ ক্রমশ শ্রমিক শ্রেণীকে সমাজের গৌণ অংশে পরিণত করছে।

আলোচ্য গ্রন্থে বিভিন্ন দেশের বিস্তৃত পরিসংখ্যানের সাহায্যে উল্লিখিত সংশোধনবাদী তত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে দেখানো হয়েছে যে, বিশ্বের সমস্ত দেশে শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মানদণ্ডে এই শ্রেণীর বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটেছে এবং এখনও মধ্যবর্তী শ্রেণীসমূহই ক্রমশ শ্রেণীচ্যুত হয়ে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে।

বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নের যে প্রভাব আছে তা বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকা উড়িয়ে দেবার যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার নেতৃত্ব আজ আর তাঁদের প্রভাবাধীন শ্রমিকদেরও তীব্রতর শ্রেণীসংগ্রামের পথ থেকে দূরে রাখতে পারেন না।

বিস্তৃতভাবে ঐতিহাসিক তথ্যের সাহায্যে লেখক দেখিয়েছেন যে, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম এখন শ্রেণীর সীমানা পেরিয়ে অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যেও প্রসারিত হচ্ছে। তাই বর্তমান যুগে বিপ্লবী সংকট ঠিক আগের মত যুদ্ধ অথবা অর্থনৈতিক সংকট ছাড়াও দেখা দিতে পারে। যুদ্ধের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, প্রতিক্রিয়াশীলদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অথবা সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদ থেকেও বিপ্লবী সংকট বিকশিত হতে পারে। এই উপলক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতও আলোচিত হয়েছে।

আধুনিক ইতিহাসের নতুন দিগন্তগুলি তুলে ধরতে গিয়ে অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় শ্রমিক শ্রেণীর ডিক্টেটরশিপ যে নতুন রূপ ধারণ করতে পারে তার প্রতিও গ্রন্থকার অঙ্গুলিসংকেত করেছেন। গ্রন্থকারের মতে, যে সমস্ত দেশে পার্লামেন্টারী বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য এবং শক্তিশালী সোশাল ডেমোক্রাটিক পার্টি ও অন্তর্বর্তী শ্রেণীসমূহের অন্যান্য পার্টি বর্তমান, সে সমস্ত দেশে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সময় শ্রমিক শ্রেণীর একাধিক পার্টির যুক্তফ্রন্ট সমাজতন্ত্রে উত্তরণের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে। এ সমস্ত পার্টির মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা সমাজতন্ত্র গঠনের লক্ষ্য গ্রহণ করে একসঙ্গে চলতে সক্ষম। এটা হবে শ্রমিক শ্রেণীর ডিক্টেটরশিপের একটি নতুন রূপ।

ক্রমবর্ধমান বিশ্বব্যাপী শ্রেণী-সংগ্রামের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে

লেখক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নতুন সুযোগগুলি একে একে তুলে ধরে দেখিয়েছেন, শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক পার্লামেণ্টগুলিকে কিভাবে গণতান্ত্রিক পরিবর্তন দ্বারা সমৃদ্ধ করে নিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ধনিক শ্রেণী এখন পার্লামেণ্টগুলিকে প্রতিক্রিয়াশীল দিকে পরিবর্তিত করছে আর শ্রমিক আন্দোলন লড়ছে তাদের এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে গণতান্ত্রিক পরিবর্তন দ্বারা পার্লামেণ্ট-গুলিকে সমৃদ্ধ করে তুলতে। পার্লামেণ্টকে কেন্দ্র করে এই রাজনৈতিক শ্রেণীসংগ্রামের ভিতর দিয়ে শ্রমিক শ্রেণী সমস্ত মেহনতী জনগণের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম।

• দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মান, ইটালিয়ান এবং জাপানী ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্যবাদ বিধ্বস্ত হওয়ায় পরাধীন জাতির স্বাধীনতা লাভের জোয়ার বয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদীরা এখন আর নিজেদের খুশিমত বিশ্ব ঘটনাপ্রবাহের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। ইতিপূর্বে বিশ্বযুদ্ধের সময় ছাড়া কোন দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে নি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তির সময়েই কিউবা স্বাধীনতা লাভ থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পর্যন্ত সমাধা করেছে। এই হল নতুন যুগের নূতনত্ব।

সদ্যস্বাধীন দেশগুলি সোভিয়েতের সহায়তায় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণ করে সমাজতন্ত্রের পথে পা বাড়াচ্ছে। এই সমস্ত দেশে সোভিয়েত সাহায্যের বিস্তৃত তথ্য এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

বহু সদ্যস্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামে, শিল্পবিস্তারে ও সমাজতন্ত্র গঠনে জাতীয় গণতন্ত্রের ভূমিকা উদ্ঘাটিত করে গ্রন্থকারগণ দেখিয়েছেন যে, এই সমস্ত দেশে জনগণের পুরোভাগে দাঁড়িয়েছেন কমিউনিস্টদের পাশাপাশি 'বিপ্লবী গণতন্ত্রবাদী' নামে নতুন শক্তি। যদিও নানাদেশে ধনিক শ্রেণীর একাংশের ইতিবাচক ভূমিকা একেবারে নষ্ট হয় নি, কিন্তু ধনিকসভ্যতার তথা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দৈন্য দেখে বিপ্লবী গণতন্ত্রবাদীরা সমাজতন্ত্রের দিকে একটু একটু করে অগ্রসর হয়েছেন। এই উপলক্ষে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের বিকাশ দেখানো হয়েছে বিস্তৃতভাবে। মালি, গিনি, ঘানা ও আলজেরিয়ার ঘটনাবলীর মধ্যেও বিপ্লবী-গণতন্ত্রবাদীদের ভূমিকা খুব স্পষ্ট, যদিও প্রতিবিপ্লব ঘানার ইতিহাস পিছন দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে।

রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে গ্রন্থখানি অপরিহার্য। বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের এরকম ইতিহাস এই প্রথম।

ভবানী সেন

এখানে আমি পুষ্কর দাশগুপ্ত ॥ অব্যয়, ৪২ গড়পার রোড, কলিকাতা—৯ ॥ দাম দু টাকা ॥

পুষ্কর দাশগুপ্ত একেবারেই তরুণ কবি। এই দশকেই তাঁর কাব্যচর্চার শুরু এবং 'এখানে আমি' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। বাংলা কবিতায় তিনি নিজস্ব একটি মেজাজ নিয়ে এসেছেন, যে সংজ্ঞায় কবিতাকে ব্যাখ্যা করতে চান সেক্ষেত্রে তিনি সিরিয়াস্। অন্তত এই কারণেই তাঁর কবিতা ভিড়ে হারিয়ে না গিয়ে পাঠকের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

'ট্রামে বাসে শহরে পথের ভিড়ে শহরতলিতে এক রক্তক্ষরণের তীব্র হৈ-হৈ'-র মধ্যে কবির কাছে 'শব্দের সিম্বল ছাড়া কিছু নেই, স্বপ্নের সম্বল ছাড়া কিছু নেই।' কবিতা তাঁর কাছে এই অবচেতনে আবৃত রহস্যের মতো অস্পষ্ট ছায়াশরীর, শব্দ আর ধ্বনির মধ্যে তার মূর্তি—'ঘুমের গভীরে এই আবিষ্ট ভ্রমণ/ছায়ার নিভৃতে আলো/গূঢ় ছায়া আলোর নিবিড়ে…।' যে কলকাতা অথবা যে পারিপার্শ্বিকতা তাঁকে প্রতিমুহূর্তে ক্লিষ্ট করে তার কোন বিশ্লেষণ নয়, তার প্রতি কোন কটাক্ষ বা সমালোচনাও নয়, বরং এই বাস্তবতার গণ্ডীর বাইরে তার আশ্রয় এক রোমান্টিক স্বপ্নময়তায় অথবা অতীত-বিস্ময়ে। বিভিন্ন কবিতার বৌদ্ধ-অনুষঙ্গগুলি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়—

কেউ নেই কেউ নেই কেউ নেই
তিব্বতী ঢোলের শব্দে
গোলসূর্য ভেঙে পড়ে মন্দির চূড়ায়
ঝির ঝির ঝির ঝির
বরফের সাদা টুকরোগুলো
অশ্বত্থের নীলাভ পাতায়
দ্রুত আরো দ্রুত বাজে তীব্র করতাল
বুদ্ধ মন্দিরের গায়ে
জেগে ওঠে সাত শ কিন্নর

অক্ষরবৃত্ত বা ভাঙা-পয়ারে রচিত এই কবিতাগুলিতে বক্তব্যবিষয়ের চেয়ে ফর্মের দিকেই কবির সচেতনতা প্রবল। অথচ কাব্যগ্রন্থের নামকরণের মধ্যে দেশ ও সময়ের পরিচয় সম্বন্ধে যে প্রচ্ছন্ন প্রতিশ্রুতি আছে, কয়েকটি কবিতায় ('এই শহর', 'কাউকে আর', 'এখানে আমি') তার কিছুটা আভাস মেলে। নইলে সর্বত্রই তিনি তাঁর আপন স্বপ্নে নিমগ্ন। এবং এর মধ্যে 'অস্ফুট-তরণী', 'দূরের আঁধার থেকে', 'প্রার্থনা' 'আনন্দ' প্রভৃতি কবিতার স্নিগ্ধ প্রসন্নতা সত্যি তৃপ্তি দেয়। কোনো কোনো কবিতায় কবিতার ভাষাকে ভেঙে ভেঙে একটি একটি শব্দের ধ্বনিতে কবিতার অবয়ব নির্মিত হতে দেখি।

আমি তোমায় আমি তোমায়
আমি তোমায় সেখানে
সেখানে
কোথায়
নিয়ে
কোথায়
বলেছিল
কখন
বলেছিল
কে
বলেছিল আমি তোমায় সেখানে নিয়ে যাব

তরুণ কবি তাঁর কবিতাকে মন্ত্রোচ্চারণের মতো এক গাম্ভীর্যে ঢেকে রাখতে উৎসাহী।

পুষ্কর দাশগুপ্ত কবিতার অপূর্ণতায় বিশ্বাসী। বিভিন্ন 'মুড' বা মেজাজকে কবিতায় ধরতে গিয়ে অনেক কথা বলার পরও শেষ কথা অব্যক্তই থেকে যায়। সেক্ষেত্রে প্রতিটি কবিতা, এমন কি একটি কাব্যগ্রন্থও মূলত অসম্পূর্ণ। 'এখানে আমি'-তে কোথাও কোন যতিচিহ্ন, পূর্ণচ্ছেদ নেই। এবং সর্বশেষ কবিতার শেষ চরণও সম্পূর্ণ নয়।

বলা যায়, পুষ্কর দাশগুপ্ত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি কবিত্বের অধিকারী। আঙ্গিকগত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে বক্তব্য বিষয়ের গভীরতাও একদিন তিনি নিশ্চয় লাভ করবেন।

সবশেষে সযত্নমুদ্রিত এই বইটির প্রচ্ছদের বিশেষ প্রশংসা করতে হয়। প্রচ্ছদশিল্পী শ্রীমানিকলাল।

অমলেন্দু চক্রবর্তী

পাঠকগোষ্ঠী

পত্রিকা পরিচালনার সাধারণ নীতি

মহাশয়,

'পরিচয়ে'র আষাঢ় সংখ্যায় অজিষ্ণু ভট্টাচার্যের লেখা আর শ্রাবণ (অগস্ট) সংখ্যায় তার প্রতিবাদ পড়ে মনে হল আরো কিছু বলার আছে। থাকত না, যদি প্রতিবাদকারীরা শ্রীভট্টাচার্যের দু একটি অসতর্ক মন্তব্যের ত্রুটি দেখিয়েই থামতেন। সমর সেনের সততা বা সাহস 'পরিচয়ে' আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠার কোন কারণ নেই। সেইসঙ্গে পত্রিকা পরিচালনার সাধারণ নীতির প্রশ্ন এসে পড়েছে বলেই আলোচনার দরকার।

প্রথমত, অজিষ্ণু ভট্টাচার্যের একটা রাজনৈতিক বক্তব্য ছিল। 'নাও' পত্রিকায় সোভিয়েট নীতি ও সমাজের সমালোচনা ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে। মতভেদ থাকলে সমালোচনা হওয়াই স্বাভাবিক। 'নাও'-এর কর্তৃপক্ষ কিন্তু ভিয়েতনাম থেকে মিনি-স্কার্ট অবধি অনেকগুলি সীমান্তে রুশীদের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধ চালাচ্ছেন। তাদের বৈদেশিক নীতি বা কিছু কিছু আর্থিক-সামাজিক পরিবর্তনের পক্ষে যেসব যুক্তি আছে তার নিরপেক্ষ বিচারের চেষ্টাও কোনদিন হয় না। আমরা অনেকেই বিশ্বাস করি, এ ধরনের অভিযানে শেষ পর্যন্ত প্রগতি আন্দোলনের শত্রুদের সুবিধা হয়। ঘোর বামপন্থী, মার্কিনবিরোধী মেজাজ নিয়ে লিখলেও তা হতে পারে। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যদি এটাকে রুশভক্ত সাম্যবাদীর গোঁড়ামি ভাবেন, তা হলে তাঁকে বলব, গোঁড়ামির প্রকারভেদ আছে, আর অন্ধ ভক্তির দৃষ্টান্ত আজকাল অন্যরাই বেশি দেখাচ্ছেন।

অমল দাশগুপ্ত এবং সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই বলেছেন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সততার প্রশ্ন তুলে ব্যক্তিগত আক্রমণ অন্যায়। খুব ঠিক কথা। যেকোন পত্রিকার বিচার নিশ্চয় এই একই মানদণ্ডে হবে। 'নাও'-এর পাঠকমাত্রেই জানেন, রাজনীতিতে যাদের অন্যমত তাদের মার্কিনস্তাবক বা কংগ্রেসের দালাল বলা এই পত্রিকার সাধারণ নিয়ম। 'নাও'-এর 'কলকাতা ডায়ারির' লেখক তাই ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সমাজে আমেরিকান সেমিনার তন্ত্রের প্রভাব (আর সেইসূত্রে 'বিকিনি পার্টি' ইত্যাদি) থেকে সোজা চলে আসতে পারেন পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠন সেমিনার ও ঘেরাও-

বিষয়ে প্রবন্ধে (৭ই জুলাই '৬৭, পৃঃ ১৪); অনায়াসে লিখতে পারেন যে, আমেরিকান লাইব্রেরির বই পড়া আর ভিয়েতনামে জেনারাল ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডকে সমর্থন করা প্রায় কাছাকাছি ব্যাপার (২৬শে মে '৬৭, পৃঃ ১৪); তিব্বতে চীনা নীতির যেকোন সমালোচনাকেই মনে করেন 'লামাদরদী' এবং উদ্ধৃতিচিহ্নে 'প্রগতিবাদী' মনের পরিচয় (৩রা জুন '৬৬, পৃঃ ৯)। ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রসদনের বাইরে আলাদা অনুষ্ঠানে যে শিল্পীদের আপত্তি ছিল, তাঁদের একাংশের বিরুদ্ধে কংগ্রেসী দমননীতির নিষ্ক্রিয় বা সক্রিয় সমর্থনের সম্পাদকীয় অভিযোগ উপস্থিত করা যায় (১২ই মে '৬৭, পৃঃ ৬)।

আর সি-আই-এ? অমল দাশগুপ্ত ঠিকই বলেছেন, প্রতিপক্ষকে মার্কিন গোয়েন্দা বলা হালের একটি রাজনৈতিক চাল। এবারে ভিয়েতনাম দিবস পালন প্রসঙ্গে একটি মন্তব্যে 'নাও'-এর সম্পাদকও একই ইঙ্গিত করেন (১৪ই জুলাই '৬৭, পৃঃ ৫)। গত মে মাসে 'নাও'-এর দিল্লীর রাজনৈতিক সংবাদদাতার 'সি-আই-এ এবং ভারতীয় বামপন্থী' রচনাটির কথা তাঁরা সম্ভবত ভুলে গিয়েছিলেন। তাতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সাংবাদিক মহলে সি-আই-এ 'বরাবর বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের বিপক্ষে দল ভারি করার চেষ্টা করত। এটা হল বামপন্থী সমাজপতিদের (লেফ্‌ট্‌ এস্টাব্লিশমেণ্ট) আবির্ভাবের আগের কথা'। নাম না করে এখানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, শান্তি পরিষদ ও তাদের সমর্থকদের কথাই বলা হচ্ছে। 'মেকি' তথা 'মস্কো লাইনে'র বুদ্ধিজীবীদের ভারত সরকার 'কাজে লাগাচ্ছেন' (অতএব সি-আই-এর কাজ কমেছে!)। প্রশ্ন করা হয়েছে: 'বামপন্থী সমাজপতিদের আমেরিকান-বিরোধিতা কতখানি খাঁটি আর কতটা মস্কোর আঁকাবাঁকা দ্বান্দ্বিক নীতির প্রেরণা?' কেবল তাঁরা কেন, দিল্লীর অধ্যাপকরা কার্যসূত্রে অল্পদিনে আমেরিকা ঘুরে এলেও সেটা নাকি 'বিশ্বাসের সংকট' এনে দেবার পক্ষে যথেষ্ট, যতই তাঁদের আন্তর্জাতিক খ্যাতি কিংবা ভারত-মার্কিন শিক্ষা ফাউণ্ডেশনের প্রকাশ্য বিরোধিতা করার সাহস থাক (২৬শে মে, '৬৭, পৃঃ ১১-১২)।

উদ্ধৃতিসহ অনেক উদাহরণ দেওয়া সম্ভব। রুচি দূরের কথা, অর্থই যখন খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন মনে হয়, সমর সেনের পত্রিকায় ঠিক

এই জিনিশ আমরা আশা করি নি। নিজের মতে তিনি অবিচল ঠিকই, কিন্তু অন্যমত সম্পর্কে এই অরাজনৈতিক নির্বোধ মনোভাবের প্রশ্রয় দিচ্ছেন কেন ?

গত সংখ্যাব লেখক দুজনেই 'নাও'-এর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন এই দিকটা একেবারে উপেক্ষা করে। আশা করি, অমল দাশগুপ্ত মানবেন যে 'নাও'-এর 'পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়' যে 'রাজনৈতিক মতের প্রতি সততা' ইত্যাদি দেখা যায় তার প্রকাশভঙ্গী বেশ বিচিত্র ; আর সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায মানবেন যে 'নাও'-এব 'প্রচলিত ,রীতিবহির্ভূত' মত সর্বদাই 'প্রগতিশীল' নয়, সব 'অপ্রিয়' উক্তি 'সত্যভাষণ' নয়। হতে পারে, তাঁরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন , কিন্তু তার সম্ভাবনা কম। কারণ, গত আড়াই বছরে তাঁদের কোন প্রতিবাদ 'নাও'-এর পাতায দেখি নি, অথচ 'পরিচয়ে'র একটিমাত্র লেখা তাঁদের রীতিমত উত্তেজিত করেছে।

শিপ্রা সরকার
কলকাতা ৪৭

'পরিবর্জনে নয়, পরিগ্রহণে'

মহাশয়,

আমার লেখা 'পরিবর্জনে নয, পরিগ্রহণে' প্রবন্ধটিকে স্বতপা ভট্টাচার্য ভালো বলেছেন, সেজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি উত্তর দেবার চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন—'অকবিতা' ব্যাপার কী ?

উত্তর—সেটা তো আমিও ঠিক জানি না। অনেক সময় যাকে অকবিতার ব্যাপার বলা হয, আমি তো দেখি কারো রচনায় দিব্যি সেটা সার্থক কাব্য-অভিজ্ঞতাব রূপ পাচ্ছে। হয়ত 'কবিতা থেকে অকবিতাকে বিসর্জন দেওয়ার থিয়োরি'টা বুঝি, যখন দেখি কেউ কবিতায় অতিবাচন নিয়ে মাতামাতি করছেন কিংবা বলছেন অমুক উল্লেখ বা জ্ঞান বা বিবরণ তমুক কবিতায় তথ্য হিশেবে আছে, কবিতা হয়ে উঠছে না. ইত্যাদি। আমার তো

মনে হয়, কখনো কখনো অতিবাচন কিংবা প্রগল্‌ভতা কিংবা সংবাদ বা তথ্য পরিবেশনও কোন কোন বিশেষ কবির কোন বিশেষ কাব্যঅভিজ্ঞতার পক্ষে অনিবার্যও হয়ে ওঠে। কখনো হয় না—যেমন মন্ত্রোচ্চারণের মতো দু-একটা শব্দ বসালেই অমোঘ কবিতা হয়ে উঠবে, তাও বলা যায় না। আসলে প্রসঙ্গ ছাড়া কবিতা-অকবিতা গদ্য-পদ্য এসবের পার্থক্য কি সত্যিই আছে? নিছক তথ্যেব বিবৃতিকে কেউ যেমন কবিতা বলেও না, তেমনি 'তথ্যের বিবৃতি' এই অজুহাতে, 'অতিবাচন বাদ দিযে নগ্নতার সাধনা' ইত্যাদিব আড়ালে যা করা হয়, তা-ই তো অনেক সময় 'কবিতা থেকে অকবিতাকে বিসর্জন দেওয়ার থিয়োরি'। তথ্য এবং সত্য-বিষযে যে রোমান্টিক ধারণা অতীত হয়ে গেছে, তা-ই কি উঁকি মারছে না এখানে নবরূপে? এ-সম্পর্কে আমার এবং পত্রলেখিকার অর্থাৎ শঙ্খ ঘোষের মতামতের নাকি আশমান-জমিন ফারাক রয়েছে, তা তো থাকতেই পারে। কিন্তু যে গদ্য লেখাটি থেকে আমরা উভয়েই উদ্ধৃতি দিচ্ছি, আসলে সেটি আগাগোড়াই বোধহয এক সংশয়াচ্ছন্ন ও অনিশ্চিত কবিমনের আত্মপ্রকাশ। আর তা ছাড়া আমি আপত্তি জানিয়েছিলাম শঙ্খ ঘোষের সাম্প্রতিক কবিতা-সম্পর্কে (ব্যাখ্যা করার পরিসর অবশ্য ছিল না), গদ্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে কি তা খণ্ডন করা যায়?

প্রশ্ন—'অব্‌জেক্টের রক্তমাংসের সাধনা, যাকে বলা হয় 'জীবন', 'সমাজ' '—কোনো কবির অভিজ্ঞতায় কি এসব বাদ পড়ে?

উত্তর—পড়ে। পত্রলেখিকাও নিশ্চয জানেন, যদি না তিনি শব্দ নিযে অহেতুক মারামারি করেন—অর্থাৎ যদি না মায়াকভস্কির মতো বলেন, যে কবি প্রেমিকাকে বাগানে যেতে বলছে, সেও তো উদ্দেশ্যমূলক, প্রচারমূলক কবিতা লিখছে।

প্রশ্ন—'মিষ্টিসিজমেব একটা সাধারণ অর্থ রহস্যময়তা'—এটা কোন্‌ অভিধানজাত?

উত্তর—অনবধানতাবশত পাণ্ডুলিপিতে নিশ্চয় আমি 'মিষ্টিকে'র বদলে 'মিষ্টিসিজ্‌ম' লিখেছিলাম। কিন্তু কিছু একটা গণ্ডগোল যে আছে বোঝাও যায়—কারণ একটা বাক্য পরেই তো আছে: 'কিন্তু কখন সেটা মিষ্টিসিজ্‌ম এবং কখন আমরা উচ্চারণ করি 'মিষ্টিসিজ্‌ম কবিতার শত্রু'।' আর মিষ্টিকের সাধারণ অর্থে যে রহস্যময়তা, তা সব অভিধানজাত। তদুপরি মিষ্টিক এবং

মিষ্টিসিজমের অর্থের পার্থক্য নিয়ে এক্ষেত্রে মাতামাতি করাও অর্থহীন—অন্তত নলিনীকান্ত গুপ্ত বা শ্রীশচন্দ্র দাশের মতো এতদ্বিষয়ক বাঙালী আলোচকেরা তা করেন নি। আর ডিক্‌শ্‌নরি থেকে কোটেশন চাই পত্রলেখিকার? 'মিষ্টিসিজ্‌ম্‌—পারটেইনিং টু মিষ্টিক্‌স্‌ অর মিষ্টিসিজ্‌ম' (শর্টার অক্সফোর্ড ডিকশনরি) কিংবা 'মিষ্টিসিজ্‌ম্‌—ফগিনেস্‌ অ্যাণ্ড আনরিয়্যালিটি অব থট (উইথ সাজেস্‌শন্‌ অব মিস্ট)' (চেম্বার্স টুয়েন্টিযেথ সেঞ্চুরি ডিক্‌নরি)। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ইত্যাদির সঙ্গে শঙ্খ ঘোষের নাম করাটা মিষ্টিসিজ্‌ম শব্দের অপপ্রয়োগ কিনা, তা বলতে গেলে তো অনেক কথাই তুলতে হয়। 'মানুষের মধ্যে মিষ্টিক যে, তাহার কাছে মধ্যাহ্নের তপন বড রূঢ রুক্ষ—সে ভালোবাসে গোধূলির আলোছায়া-মিশ্রণ': এও তো একটা বিবরণ। 'ইহাদের করো আশীর্বাদ' বা 'রাঙামামিমার গৃহত্যাগে'র মতো শঙ্খ ঘোষের কবিতায় (সাহিত্যপত্র, শারদীয়, ১৩৭২) যেন 'অলক্ষিতে ছাযার মতো' একটা অশরীরী, রহস্যময, অস্পষ্ট জগতের ছবি ফুটে উঠেছে, অন্তত আমার মতো সাধারণ পাঠকের কাছে।

প্রশ্ন—কোনো কবিতার কনটেন্টে মিষ্টিসিজ্‌ম থাকতে পাবে, কিন্তু ফর্ম হিসেবে তার সাধনা—ব্যাপারটা ধারণা করা শক্ত।

উত্তর—আমি তাই বলেছি নাকি? আমার লেখায় তো আছে: 'কখন এই তথাকথিত 'রহস্যময়তা'কে একটি পদ্ধতি হিসেবে, ফর্ম হিসেবে, বহিরঙ্গ সাধনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়' ইত্যাদি। তবে বলতামই যদি 'মিষ্টিসিজ্‌ম', তবে মাবাত্মক দোষ করতাম কি? 'মিষ্টিসিজ্‌ম আরেক জগতের কথা, সত্য বটে—কিন্তু ততখানি আরেক জগতের কথা নয, যতখানি আরেক জগতের ভঙ্গিমায় কথা বলা।...অন্য কথায, মিষ্টিসিজ্‌ম্‌ জিনিশটা ঠিক ঠিক এক মতবাদ নয়, মূলত এটি হইতেছে একটা ভাব, প্রাণের একরম ধাত, দেখিবার এক ভঙ্গি। ইহা নির্ভর করে মানুষের প্রকৃতির স্বভাবের এক বিশেষ গডনেব উপর' ('মিষ্টিক কবি' · নলিনীকান্ত গুপ্ত)।

প্রশ্ন—ক্রমশুদ্ধি জিনিসটা কী?

উত্তর—ভাষার বিবর্তন মানলে ক্রমশুদ্ধি মানতে দোষ কী? আপত্তিটা কোথায, 'ক্রম'তে না 'শুদ্ধি'তে? 'শুদ্ধি' শব্দের মধ্যে আমি কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ততা বা অন্য কোন মূল্যবোধ আরোপ করছি না, উন্নতি বা বিকাশ

বোঝাচ্ছি একজন কবির দিক থেকে স্বদেশ ও স্বকালের প্রয়োজনে নতুন নতুন ভাবে আত্মপ্রকাশ এবং নিজের অভিজ্ঞতার যোগ্য বা অনিবার্য ভাষা আবিষ্কার বোঝাচ্ছি। আর সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে পূর্বের যুগের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে নতুন সম্ভাবনার কথা বোঝাচ্ছি। যেমন, পূর্বের যুগের আবেগ-শৈথিল্য বর্জন করে আধুনিক যুগে কাব্যেব ভাষা হল ঋজু, তীক্ষ্ণ—আমরা বলতে পারি, কাব্যভাষার ক্রমশুদ্ধি হল। এর বেশি কিছু নয়।

শেষ স্তবকের শেষ বাক্য দুটির মানে আমি বুঝি নি, তাই উত্তর দিতে পারলাম না।

অরুণ সেন
কলকাতা ৪৮

বানান বিষয়ে

মহাশয,

শ্রাবণের পরিচয়ে বানান বিষয়ক প্রস্তাব পড়লাম। কোনো পত্রিকার বিশেষ বানানরীতি—যা নিশ্চযই সার্বজনীন বানানরীতির সঙ্গে সঙ্গতিশীল—কতদূর পর্যন্ত অনুসরণ করা যেতে পারে। পত্রিকার নিজের রচনাগুলোতে নিশ্চয়ই, কিন্তু লেখকদের রচনাতেও কি, বিশেষত যখন কোনো লেখক খানিকটা ভাবনাচিন্তা করে বিকল্পগুলোর মধ্যে একটা পছন্দ করে নিয়েছেন। এমন একএক পত্রিকা একএক ধরনের বিকল্প বেছে নিলে বেচারা লেখকেরা খুব মুশকিলে পড়ে যাবেন না? আমার নিজেব কথাই বলতে পারি। পত্রিকাগুলো খুব একটা মাথা ঘামান না আমার বানানটা রাখতে আবার তাঁদের পছন্দের বানানটাও খুব সঙ্গতিপূর্ণ নয় দেখি, আসলে হযতো সবটাই প্রুফরিডারের ব্যাপার। তেমন ক্ষেত্রে আপত্তি করি নি। কিন্তু যদি পত্রিকার বানান মেনে নিতে বলা হয় তাহলে আমার বিচার-বিবেচনান্তে পছন্দের হবে কী?

আপনারা শুক, শাদা, জিনিশ—ইত্যাদি সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নেবেন। গান্ধি? স্ট্রিট?

অতীতক্রিয়ায় অন্ত্য ও-হীন করার প্রস্তাব করেছেন। আমার ধারণা 'বলিল'-র মধ্যবর্তী 'ই উঠে যাবার সময় অন্ত্য 'ও' হয়ে গেছে। সুতরাং বললো, হতো, যেতো—হওয়াই তো উচিত।

সুতরাং কি করবো বলুন।

দেবেশ রায়
জলপাইগুড়ি

জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে

মহাশয়,

শ্রাবণ সংখ্যা 'পরিচয়ে' প্রকাশিত 'বিধুশেখর মন্ত্রী হলেন' রসরচনাটি পড়ে উপকৃত হয়েছি। এই প্রবন্ধটি পড়াব আগে মনে হয় নি আজকের ভারতবর্ষে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যাপারটি ব্যঙ্গের বিষয় হতে পারে।

বর্তমান জেনারেশন নির্বংশ হওয়াব আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন লেখক। ভারতে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এত বেশি সফল হয়েছে বুঝি? নাকি অবিলম্বে হওযার সম্ভাবনা আছে? মাতৃত্বহরণ, পিতৃত্বহরণ এরকম শব্দ ব্যবহারের কারণ কী? অনেক দম্পতিই তো স্বেচ্ছায অপারেশন করাচ্ছেন। সেসব দৃষ্টান্ত উপেক্ষা করে 'হরণ' শব্দের নির্বিচার প্রযোগ কি 'কলঙ্কে বহুবচন?' তাছাড়া গর্ভনাশের বিধান দেওযা মানেই বুঝি 'আদিম নরখাদকের আদিমতম প্রবৃত্তি' দ্বারা চালিত হওযা? সোভিয়েট ইউনিযনে তো গর্ভপাতেব আইনি ব্যবস্থা আছে, সেখানকাব কমিউনিস্ট নেতাবাও তাহলে এই প্রবৃত্তির শিকার?

লেখক উৎসাহভরে বলেছেন যে, দেশেব অধিকাংশ মানুষই এখনও বিধুশেখরের কথা শোনে না: 'বিয়ে-শাদি করে, বাপ-মা হয, যতক্ষণ পারে বাঁচবার চেষ্টা করে, না পারলে হৈ চৈ করে।' বাঁচতে না পারলে শুধু হৈ চৈ করে বুঝি? আর যখন পথে-ঘাটে ছেলেমেযে নিযে না খেতে পেযে মরে, ডাস্টবিনে সদ্যোজাত শিশু ফেলে দিয়ে যায, বাবা-মার মুহূর্তের

খেয়ালে জন্মানো, অবাঞ্ছিত, অস্থিচর্মসার ছেলেপুলেতে ঘর ভরে যায়? তখন রসরচনা লিখতে, না জন্মনিয়ন্ত্রণের উপদেশ দিতে হয়?

এদেশে যে গর্ভনাশ ব্যাপকভাবে প্রচলিত একথা সকলেই জানেন। তাহলে হাতুড়ের হাতে বিপজ্জনকভাবে বে-আইনি গর্ভপাতেব সংখ্যা বাড়িযে লাভ কী? যাঁদের পযসা আছে তাঁরা তো এ ব্যাপারে সুচিকিৎসকের সাহায্য নিতে পারেন এবং নিয়েও থাকেন। গর্ভপাত বে আইনি হওযায় আসল অসুবিধা হচ্ছে দবিদ্র পরিবারের স্বামী-স্ত্রীদের। গর্ভপাত তো খুব খারাপ। লেখক কি চান দেশে কবে শোষণবিরোধী আন্দোলন সফল হবে এই আশায সবাই বসে থাকুক, ইতিমধ্যে ছেলেপুলে হতে থাক এবং ধীরেসুস্থে খেতে না পেযে শুকিয়ে মরুক?

মা হন মেয়েরা—এজন্য অনেক সময়ে স্বাস্থ্য, বাইরের কাজকর্ম ইত্যাদি অনেক কিছুই বিসর্জন দিতে হয়। সুতরাং গর্ভপাত করবেন কি না করবেন সেটা মেয়েরা তাঁদের পরিস্থিতি ও অবস্থা অনুসারে বিবেচনা করলে কি ভালো হয় না? শুধুমাত্র স্বামীব ইচ্ছায় মা হতে চান এরকম মেযের সংখ্যা এদেশে অল্প নয। এ ধরনের মাতৃত্বে মহিমা আবিষ্কার করা ছেলেদেব পক্ষেই সম্ভব। কারণ তাদের কোনো মূল্য দিতে হয না। একজন মহিলা হিশেবে বলছি মা হবার আগে আমি কতকগুলি প্রাথমিক বিবেচনার পক্ষপাতী, যেমন আর্থিক সচ্ছলতা, স্বাস্থ্য, মানসিক অবস্থা। ব্যক্তিভেদে উক্ত বিষয়ে গুরুত্বের তারতম্য হতে পারে। মোটের ওপর ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার সঙ্গে যেন দেশের অবস্থার সঙ্গতি থাকে। জন্মনিরোধক ব্যবহার করে অসফল হলে গর্ভপাতের ব্যবস্থা চাই।

মন্দিরা ঘোষ
কলকাতা ৬

আনন্দময়ীর
আগমনে আনন্দে
গিয়েছে দেশ ছেয়ে

পূজোয়
চাই
নতুন
জুতো
Bata

G.E.C.
আপনার
গ্যারান্টি

মনীষার সাম্প্রতিক প্রকাশন

কলিযুগের গল্প

সোমনাথ লাহিড়ী

বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতার নতুন এক পরিচয় মিলবে এই অসামান্য গল্প সংকলনে। সোমনাথবাবুর শ্লেষের কশা এই বারোটি গল্পে মানুষের প্রতি সহানুভূতিতে কোমল। ৬·০০

গোবিন্দ সামন্ত

লালবেহারী দে

গোবিন্দ সামন্ত ও কাঞ্চনপুর—আমাদের সাহিত্যেও অমর নাম, যদিও বই লেখা হয়েছিল বিদেশীর ভাষায়। শ্রীমন্মথনাথ সরকার কৃত অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ বহুদিন পরে আবার প্রকাশিত হল। ৬·০০

মনীষার অন্যান্য প্রকাশন

মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা—বিষ্ণু দে ৮·০০
মস্তক বিনিময়—টমাস মান (অনুবাদ : ক্ষিতীশ রায়) ৪·০০
ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ—ও. ইয়াখৎ ৩·৫০ পয়সা।
সমাজবিকাশের রূপরেখা, দুই খণ্ড ২·৫০ (প্রতি খণ্ড)
চীন কোন পথে?—রজনীপাম দত্ত ১·৫০

পোড়া ..... কাটা ..... পোকার কামড়
এই সব আকস্মিক দুর্ঘটনায়
এ্যাক্রিমেন্ট
চর্বিবর্জিত এ্যাণ্টিসেপটিক মলম
নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
সংক্রমণ প্রতিরোধক □ সত্বর আরামদায়ক
শিশুদের কোমল ত্বকের
পক্ষেও নিরাপদ □ দাগ লাগে না
হাতের কাছে রাখুন
বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী
POISON
FOR EXTERNAL USE ONLY
ACRIMENT
30 G.

সূচীপত্র

বর্ষ ৩৭ / সংখ্যা ৩
অক্টোবর '৬৭ / আশ্বিন '৭৪

শারদীয় পরিচয়: গল্প-সংখ্যা

ছবি ও স্কেচ

শম্ভু সাহা, এম. পি. রাও,
অরূপ চৌধুরী, শ্যামল দত্তগুপ্ত

প্রচ্ছদপট: রঘুনাথ গোস্বামী

সম্পাদক
সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত। ফোন: ৩৪-৬০০৩

প্রতি সংখ্যা ১৲ ॥ বার্ষিক ১০৲ ॥ ষাণ্মাসিক ৫৷৹

মুখোশ : এম. পি. রাও

শিল্পী : অরূপ চৌধুরী

লিনোকাট : শ্যামল দত্তগুপ্ত

পরিচয়
বর্ষ ৩৭। সংখ্যা ৩

ঘেরাও ও ধরাও

গোপাল হালদার

রায় সাহেবেব মেজাজটা ভালো ছিল না। অবশ্য সে জন্য তিনি আব কতটুকু দাযী? কিন্তু এ কথা কে বুঝবে? জানে অবশ্য কেউ কেউ। হাঁ, বাড়িব বাইবেও জানে—আপিসেব লোকেবা। জানবেই বা না কেন? এমনিতেই তো দেখছে সেক্রেটাবিযেটে সাহেবেব ছুটোছুটি, তাবপব বসতে না বসতেই ফোন বেজে উঠল—চন্দ্রাব গলা। অর্থাৎ গৃহিণী চন্দ্রমুখীব, মানে 'মিসেস চন্দ্রা বাযে'ব। 'ওগো' বললে গৃহিণী ক্ষমা কবেন না মিস্টাব বাযকে, 'মিসেস' বলতে হয বাইবে, গৃহে 'চন্দ্রা'—

কোথায গেছলে? চন্দ্রাব স্ববটা ও সুবটা বেশ তীক্ষ্ণ।

কোথাও তো নয।

কোথাও নয? মিথ্যেটা না বললে হত না?

মিথ্যে নয—সত্যি কথা। একটু বিব্রতভাবেই মিস্টাব গুরুদাস বায বোঝাতে চাইলেন। মিস্টাব গুরুদাস বায়, মানে জি-ডি এণ্টাবপ্রাইজেব 'জিডি', আপিসে 'বডসাহেব।' বন্ধুবান্ধবদেব মহলে জি-ডি। গৃহে 'সাহেব'—এককালে বাবুও ছিলেন। কিন্তু তখন জীপে দিন-বাত ছুটতেন। সে অনেক আগে।

বটে। ফোনেব ওপাবে ফোঁস কবে উঠল একটা সাপ না বেডাল। আমাব কাছে মিথ্যে বলে পাব পাবে, এখনো তোমাব এই বিশ্বাস?

কী যে বলো। 'জি-ডি' শান্ত ভাবেই বলতে চাইলেন—ঘবে ম্যানেজাব বাসুদেব সবকাব আছেন,—সে পুবনো লোক, অল্পবিস্তব চন্দ্রাকেও জানেন, কিন্তু সঙ্গে তাব ছেলে বুদ্ধদেব—সে তো জানে না 'মাসীমা'ব স্বরূপ, দেখে নি তাঁব মেজাজ। তাব জানা উচিতও নয় মিনুব মাযেব মেজাজ। কিন্তু তবু 'জি-ডি'ব স্ববে যে একটা আপত্তি ছেড়ে বিবক্তিব বেশও ফুটছিল, তা তিনি নিজেই বুঝছিলেন। আব বুঝেই আবও সাবধান হলেন। মুখে একটু হাসি টেনে নিযে বললেন—আধ ঘণ্টাব জন্য একবাব বেরুতে হযেছিল—একবাব বেরুতে হযেছিল, মিনিস্টাবকে পেলাম না, তবে সেক্রেটাবিবা তো আছেন এখনো—

থাক্। তোমাব আব গল্প বানাতে হবে না। ঘবে কে ছিল?

কে আবাব—ঘব তো খালি—

ফোনে তবে কথা বললে কে?

হযতো পাশেব ঘব থেকে কেউ। আমি ছিলাম না যখন, পি-এ বা স্টেনো—

মিস্ চৌধুবীকে?—কি, চুপ কবে বইলে যে? যমুনা চৌধুবী—কি এখনো চুপ যে—

যথাসম্ভব হাসি বজায বেখেই বললেন জি-ডি, ওঃ নতুন কোনো লোক,—মানে, সকলেব তো আমি নাম জানি না। তা কী কাজে খুঁজছিলে?

নাম জানো না? প্রেম কবতে জানো তো।

ওপাবে যে কথা ও গর্জন ফেটে পডল, তাতে হাসি বজায বাখা সম্ভব নয। অন্য কোনো মেযেব গন্ধ পেযেছে কি অমনি চন্দ্রাব মাথা খাবাপ হযে যায—কে কী বৃত্তান্ত তাব কৈফিযৎ চাই। তবু ডিসেন্সি বজায বাখতে চান বায সাহেব—বাসু সবকাব যেমন হোক, ছেলেটাও বুঝবে ভাগ্যিস ওবা শুনতে পায না চন্দ্রাব কথা। কথাব এক ফাঁকে মিঃ বায বললেন, আচ্ছা, এখন কাজে বসছি, ওঁবা অপেক্ষা কবছেন, মিস্টাব সবকাব আব তাঁব ছেলে বুদ্ধদেব—এখন একটু তাডাতাডি শেষ কবো। আবাব সেই নিববচ্ছিন্ন বাক্যবাণ।

মিস্টাব বাযেব মুখে-চোখে তাব ফল ফুটে উঠবে না কেন? তবু তিনি পাকা লোক। মেজাজ ঠিক বাখতে পাবলেন শেষ পর্যন্ত। একবাবও সবকাব

বা তাব ছেলে শুনতে পেল না চন্দ্রাব ফোনেব উপলক্ষ কী। কিংবা এদিকে শুনল না মিস্টাব বাযেব মুখে যমুনাব নাম—মেযেটা সবকাবদেব চেনা—বাইবেব ফোন ধবে, অনেকটা বিসেপশ্যনিস্ট। না দেখেই চন্দ্রাব এত অন্যায সন্দেহ জি-ডি'ব উপব—স্ত্রী তো নয, যেন বণচণ্ডী। মিস্টাব রায বলেই চালাতে পাবলেন স্থিব মেজাজে কথা।

আচ্ছা, তুমি অপেক্ষা কবো—এক সঙ্গেই না হয বেরুব। মিনুকে দিযো যা প্রেজেণ্ট কিনতে চায কিনবে—না হয এই বুদ্ধদেবকে পাঠাচ্ছি, ওবা ইযং-ম্যান, সব জানে ভালো। একবাব হেসে বুদ্ধদেব আর বাসুদেবেব দিকেও মিস্টাব বায তাকালেন। কিন্তু হাসি কি ববাবব বাখা সম্ভব! যা শুনছেন তা তো সামান্য নয। শেষ অবধি ফোন বেখে দিযে হেসে বললেন, মেযেব আবদাব। তাব বন্ধুব বিযে, প্রেজেণ্ট কিনতে বাবাকেই যেতে হবে সঙ্গে। আজকালকাব মেযেদেব প্রেজেণ্টেব যা বহব—ফতুব করে ফেলবে—বলে সকৌতুকে হাসলেন, কিন্তু বুঝলেন—কথাটা কেউ সম্পূর্ণ বিশ্বাস কবল না। বুদ্ধদেব ছোঁড়াটাও না। ছোঁড়াটা বুদ্ধিমান, ওস্তাদ। ঠোঁটে একটু দ্ব্যর্থব্যঞ্জক হাসি। অথচ ছেলেটা ঠিক তাঁব এই অবস্থাটা যেন না ধবতে পাবে সে জন্যই মিস্টাব বাযেব এত চেষ্টা। স্বভাবতই মেজাজটা ভিতরে-ভিতবে দ্বিগুণ বিগড়ে বইল তাতে।

বাসুদেব খানিকটা সায দিযে বললেন—তা ফতুব হচ্ছেন বললেই হবে। ওদেবও তো পজিশ্যান্ বাখতে হবে। আব সে তো আপনাবই পজিশ্যান।

দেখুন, বাসুদেববাবু—বাসুদেব কতকটা বন্ধুস্থানীয, তার কর্মদক্ষতা জি-ডি'ব সৌভাগ্যেব একটা বড় কারণ। দুজনেব একটা সহজ সম্পর্ক বহুদিনে গড়ে উঠেছে। তাই জি-ডি বললেন, দেখুন বাসুদেববাবু, পজিশ্যানটা তো দেখছেন—সেক্রেটাবিযেটে গিযে ঠায দুঘণ্টা বসে রইলাম। মিনিস্টাবেব দেখাও মিলল না। প্রাইভেট সেক্রেটাবি বললে, আজ তো মিনিস্টাব এখুনি বেবিযে যাচ্ছেন—ডকে স্ট্রাইক হবো হবো। এদিকে গম নামবে। আবেকদিন আবেকটা অ্যাপযেণ্টমেণ্ট কবে আসুন, মিস্টাব বায।

মিস্টাব দে-ব সঙ্গে দেখা হযেছে তো—হলে ওতেই কাজ হবে। কলকাঠি ওদেবই হাতে।

সেদিন নেই—দে-ই বললেন, 'দেখুন, পুলিশকে ওরা চেপে বসিযে

দিযেছেন। এখন কি কবে আমরা কি কবব বলুন।' তাব ওপরে আমাব গ্রেট বাজপুত্র ওই একটা বড গাডি কিনে চলে গেলেন কাশ্মীর—

সে নতুন বিয়ে কবেছে—

বিযে সকলেই নতুন কবে—তাই বলে গাডিও নতুন কিনতে হবে নাকি ? আপনি কিনেছিলেন. না, আমি কিনেছিলাম ?

সেদিন আব এদ্দিন। কী যে তুলনা কবেন আপনি। আমি ছিলাম যুদ্ধ-ফেবত মানুষ। হাতে কিছু টাকাও ছিল। লবী, জীপ, সব কিছুতে চলতেই অভ্যস্ত হযেছিলাম। তবু ভাবিই নি—বউযেব গাডি চাই। আব দেখুন—আমাব ছেলে—তাব একটা মোটববাইক না হলেই নয—তবু তো বউ হয নি—

বাইক্ তো তোমাকে দিতে হয নি, বাবা। ক্লাব আমায প্রেজেণ্ট কবেছে—বুদ্ধুব স্পষ্ট উত্তব। বাবা জানেনই বা কি। সেও স্পোর্টস্‌ম্যান।

বাসুদেববাবু মানলেন, তা কবেছে। তবে পুবনো ক্লাব ছেডে দেবাব জন্য এ বকম 'প্রেজেণ্ট' মানে তো ঘুষ।

এ তোমাব অন্যায কথা। ঘুষ কেন ? আমি খেলব—আমাব খেলাব দাম নেই ? ওদেবই কি প্রেস্টিজ থাকত না কি আমি ট্রামে-বাসে ঝুলে ঝুলে ক্লাবে গেলে বা আপিসে গেলে ?

জি-ডি থামালেন হেসে, ঠিকই তো। আব খেলে বলে কি ওকে কিছু দিতে হবে না। এ দেশ বলেই তো—না হলে বড বড দেশে খেলা মুফ্‌ত্‌ হয নাকি ? 'এমেচব' ম্যান 'প্রোফেশন্যাল'এব বাবা। সে যাক্, তোমাব ওটাব কি হল 'লর্ড' বুড্‌ঢাব। 'বুড্‌ঢা' স্নেহেব নাম—জিডি আবাব বাডিযে বলেন 'লর্ড বুড্‌ঢা। কি বলছে ওবা—মার্টিনবা ?

আপনাব কথায কাজ হযেছে। পার্সোনেল ম্যানেজমেণ্টে ট্রেনিঙে নিচ্ছে আপাতত এক বছব। আপনাকে কিন্তু আবেকবাব যেতে হবে। ম্যাকগ্রি সাহেব সেই ম্যাঙ্গানিজ খনিব সম্পর্কেও কথা বলতে চান।

কথা বলতে আমিও চাই। কিন্তু জানো তো দিল্লী তখনি ওদেব বলেছে—'বাঙালি কি কববে ? তাবা বেগার্স। মাবোযাডী, ভাটিযাদেব নাও তোমাদেব সঙ্গে'—আমাদেব বাঙালিদেব সে জোব কোথায দিল্লীতে ?

ওবাও জুটিযেছে এক পাঞ্জাবীকে। তাব অন্য রকমেব জোর। আপনাকে

ম্যাকৃগ্রি তবু চায। আব, আপনি গেলে—আমার এটাও হয়ে যাবে—ছ'মাসও আব লাগবে না।

জিডি বললেন, আচ্ছা, যাব। এ সপ্তাহেই যাব, আব যদি পাবি তোমাব ওটা পাকা কবে আসব।

বুদ্ধ বললে, কবে যাবেন ? আমি সঙ্গে থাকতে পাবব ?

তুমি ? সঙ্গে থাকতে চাও, তা থাকলেই বা। হাঁ, থাকবে। আমি তোমাকে জানাব দিনক্ষণ ঠিক হলে।

বুদ্ধ সস্মিত কৃতার্থ মুখে বললে, তা হলে যাই এখন—বিকেল হচ্ছে, ক্লাবে একবাব যাই। না, আজ আমাব খেলা নেই। তবু—

কিন্তু আমাদেব ওখানে সন্ধ্যায একবাব এসো—দেখবে মিনা কি প্রেজেণ্ট কিনল। তোমাদেব পছন্দ হওযা চাই তো—

হেসে বুদ্ধ উঠে দাঁডাল। মিস্টাব বায তাব যাওযাব দিকে একটু তাকিয়ে দেখলেন।

বেশ ছেলে। হি উইল গো ফাব—বুঝলেন, মিস্টাব বাসুদেববাবু—আব ভাববেন না—ওব ভাব আমাব উপব ছেড়ে দিন।

বাসুদেববাবু কৃতজ্ঞ হলেও একটু সঙ্কোচেব সঙ্গেও বললেন, আমি তো দিয়েছিই, মিস্টাব বায—বোঝা গেল সম্পূর্ণত দেনও নি।

জি-ডি বললেন, তবে আব কি—বাডিতে আপত্তি ?

বাসুদেব তাডাতাডি বললেন, না, না, স্যব। ববং বাডিতে এখনো বলিই নি। আপনাব কথায বুঝেছি মিসেস বায এখনো উৎসাহ বোধ কবেন নি। শেষটা বাডিতে বলে ওদেব একটা মিথ্যা আশায নাচিয়ে দিযে হতাশ কবতে চাই না। সে খুব বিশ্রী কাণ্ড হবে। আমি বলি ববং আপনি-আমি প্রথমটা বাইবে থাকি—মেযেবাই প্রথম আবম্ভ করুন। একবাব দম নিযে বাসুদেববাবু বললেন, একবাব মিসেস বাযকেই তা হলে কথাটা পাডতে হয।

হুঁ—জি-ডি যে চিন্তিত বোধ কবলেন তা গোপন বইল না। বললেন, হুঁ, চন্দ্রাকেই তা কবতে হয। একদিন আসুন আপনাবা—এই লেবব ট্রাবলটা চুকে গেলে একদিন আসুন বাডিতে ডিনারে। আব ইতিমধ্যে ওদেবও একটু জানা-শুনা হোক—মিনাতে আব বুদ্ধতে।

বাসুদেব খুব স্বস্তি বোধ কবলেন না—সে কি ঠিক হবে—

বেঠিকটা কি হবে ? আমাব মেয়ে, আপনার ছেলে—অন্যায কিছু কবাব মতো ওবা কেউ নয। তেমন শিক্ষাদীক্ষাই তাদেব নয। তাই না ?

হাঁ। তবে—দুজনেই ইযং।

জি-ডি হাসলেন, তা নয তো একজন ইযং আবেকজন ওল্ড হবে নাকি ? সেদিন গিযেছে, ভাযা। আব ওসব পুবনো দিনই কি বেশি ভালো ছিল ? দেখুন বুঝে,—'ঢাক-ঢাক-গুড গুড'। তাব থেকে এদিনেব এবা অনেক পষ্ট। পষ্ট কবেই বলবে 'চাই', না, 'চাই না'। অন্তত মিনুব সম্বন্ধে আমাব সংশয নেই, একটু জানাবাব সুযোগ ওদেব তো দিতে হবে। না হলে চলে? তাই না ?

দেখুন আপনি ভেবে। আমি বুঝি না ওসব—

আমিই কি বুঝি নাকি ? তবে কি জানেন—সোজা একটা অঙ্ক আছে—দুযে দুযে চাব। ওদেব দুজনেব এখন সেই বযস—একেব সঙ্গে একে দুই হযে যাবাব কথা।

জি-ডি হেসে উঠলেন। বাসুদেববাবুও হাসলেন। একটু চেষ্টা কবে হলেও সত্যিই হাসলেন। যুদ্ধ-ফেবৎ মানুষ। নিজে যাই হোক—দেখেছেন একেব সঙ্গে একে দুই কেন, একেবাবে এগাবোতে গিযে ঠেকে। সে-সব তাঁব চোখে সহ্য হযে গিযেছিল। কিন্তু যুদ্ধেব বাইবে দেশেও তা হবে, সে কল্পনাও কবেন নি তখন। এখন তাও দেখছেন। উদ্বাস্তু হযে এসেছিলেন, যথাসমযে এসেছিলেন, একেবাবে নিঃসম্বল হযেও আসেন নি. তাই বক্ষে। সকলে তা পাবেনি। তাঁবই পবিচিত বন্ধুবান্ধবও তাদেব মধ্যে আছে। অনেক কিছুই আবও তাঁব দেখতে হযেছে—তাঁব শ্বশুবগোষ্ঠিব অবস্থাও দেখেছেন। বেশি দূবেবও নয। ভুঞাদেব মানসম্ভ্রম নিযে তাঁবাও আব মাথা ঘামায না। মেযেপুকুষে খেটে কোনো বকমে এখন বেঁচে বযেছে। যমুনাবও কাজ না কবলে নয। একে-একে যোগ কবেই বোনেবা এক-একজন নিজে নিজেব ব্যবস্থা কবে নিযেছে। তাদেব তিনি দোষ দেন না। তবে একটু কষ্ট হয। ওদেব কি কম সইতে হয—প্রাণও বাখতে হয, মানও বাখতে হয। না, বাসুদেববাবু তবু বোঝেন না ববং তাদেব—যাদেব প্রাণেব দায নেই। মানেব জন্যই কি তাদেব মাথাব্যথা আছে ? তাদেব কাছে সবই মজা, ফান্' তবে

প্রেস্টিজ বোঝে, আব সুখ। বায সাহেব যাই বলুন—তাব বাড়িতেও সেইটাই আসল—প্রেস্টিজ—ফান্।

বাসুদেববাবু একটা চিঠি এগিযে দিযে বললেন, চামাবিষাদেব চিঠি, হাৰুবাবুব চেকটা ডিসঅনার্ড হযে আছে, তাই স্মবণ কবিযে দিযেছেন। হীৰুবাবুব চেকটা অনাব কবা দবকাব এখনি—

হাসি নিবে গেল জি-ডি'ব। তাব মানে? সাত হাজাব টাকাব চেক কেটেছে কেন? আব তা কোম্পানিব কি দায যে দেবে?

কাশ্মীবে যাচ্ছেন, ব্যাঙ্কে নিজেব টাকা ছিল না।

কাশ্মীবে যেতে কে বলেছিল? আমি?

নতুন বিযে কবেছে—

সে কি আমাব সঙ্গে পবামর্শ কবে? না, কোম্পানিব কাজে? মাযে-ছেলেব জেদ্। আমি ওই দেউলে মিত্তিবদেব বাড়িব মেয়েব সঙ্গে ওব বিযে দিতাম? যত চীট আব হাম্‌বাগ।

তা বললে হবে কেন? মিত্তিববা তিন পুরুষ বিলেতফেবতা—কলকাতাব কাযেত অ্যাবিস্টোক্রাসি। না হয টাকা নেই এখন, কিন্তু বংশগৌবব কি ফল্‌স!

জি-ডিও একটু যেন চুপ হযে মাথা নিচু কবলেন। তিনি কলকাতাব লোক নন—অবশ্য প্রায পঞ্চাশ বছব কলকাতায় এসেছেন—জাতেব দিকে ববেন্দ্র দেশে তাঁদেব স্থানটা একটা সৎ ব্যবসাযী জাতেব। নিচু নয, তবে তেমন উঁচুও কেউ বলে না, এখানে কেউ অবশ্য খোঁজ কবে না—তাঁব এখন প্রেস্টিজও সমাজে যথেষ্ট। কলকাতায কাযস্থদেব সঙ্গে কাজ কবতে পাববেন, তবু তা আশাও কবতে পাবতেন না। চন্দ্রমুখীবাও তাই খেপে উঠল ছেলেটাব সঙ্গে সঙ্গে। না হলে ওই মেযে তাঁব নিজেবও তেমন পছন্দ হত না—চালিযাত দেউলে গোষ্ঠীব একটা উড়ুনে মেযে। ছেলেটাকে সেই উস্কে দিযেছে—'কাশ্মীবে চল'—আব 'বাই কাব'। বাড়িতে দু'দুটো গাড়ি, তা নয, নতুন একটা ভকস্‌হল পাওযা যাচ্ছে—চামাবিযাব পাবমিট্ আছে। হাজাব কয তাব জন্য যাবে। এমন-কি? একবাব বলাকওযাও নেই—চামাবিযাদেব চিঠিতে প্রথম জানলেন জি-ডি ক'দিন আগে, আজ তাকে তাড়া দিযেছে। চিঠি দেখেই তাই জি-ডি খেপে গেছলেন। এখন বললেন,

বাসুদেববাবু, আপনি দেখছেন, দু'বছব ধবে ব্যবসাযেব অবস্থা। কারখানা প্রায বন্ধ হতে চলেছে—অর্ডাব নেই, ইম্পোর্টও পাচ্ছি না—মজুবদেব কাজ দিতে পাবছি না। এ সময়ে ওব একটা নতুন গাডি কেনা কেন?

বাসুদেববাবু বললেন, তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু ও যখন কবে ফেলেছে তখন তো উপায নেই। ওব চেক্ এ সময ডিস্‌অনার্ড হলে আপনাব বিজনেস-এব আব ক্রেডিট্ থাকবে?

কিন্তু টাকা পাব কোথায?—জি-ডি বাগ কবে বললেন,—যাক চুলোয যাক, আমি আব পাবি না। কোথাকাব যত ব্যাটা 'লোফাব' হযেছে মিনিস্টাব। দেড ঘণ্টা গিযে তাব সঙ্গে দেখা কববাব জন্য বসে বইলাম, হুজুবের ফুবসুৎ হল না। কী দায পডেছে আমাব? বডকুমাব তো বিলেতে গিযে বসে আছেন—ব্যাবিস্টাব হবেন, দেশে ফেবাব নাম নেই। আব ইনি—ফিনান্‌সিযাল্ এ্যাডভাইসাব। কাজ যা তা আপনিও জানেন। বারো শ' টাকা স্টার্ট চাই, কাব এ্যালাউন্সও আছে। আবাব একটা আন্‌কোবা গাডি আব তাব পাঞ্জাবী ড্রাইভাব।—ওকে কেন তা দেবে কোম্পানি, বলুন।

সে সব ঠিক।

দুটো গাডি আমাব। নিজে তো সেই ছোট পুবনো ফিযাৎ নিযেই চলি, বাডিব ওঁদেব বড গাডি না হলে নয—তাও হল। কিন্তু তাবও ওপব আবাব তিন নম্বব একটা গাডি কোম্পানি থেকে কি ওজুহাতে আদায কবব? আব এ সময়ে—যখন বাজাবেব এ অবস্থা। এই তো দেখুন আপনিও বলছিলেন—একটা পিক-আপ্ ভ্যান হলে ভালো হয। আমি বুঝি ইঞ্জিনিযাব-টেকনিশযান্-এ্যাকাউন্টেন্ট অফিসাব প্রভৃতিব আসা-যাওযাব সুবিধা হত, এ্যাটেণ্ডেন্স ঠিকমতো হত।—তা আমবা দিচ্ছি না, বলি টাকা নেই—

তাতে কিন্তু সত্যিই ভালো হয। তবে এখন তো আবও গোলমাল। অফিসাবদেব সুবিধা থাক লেববকেই সামলানো আগে দবকাব।

তা হলে? কেন বলেন, ও চেক্-এব টাকা দিতে?

না হলে চামাবিযাবা কালই যে আপনাকে পথে বসাবে—ব্যবসাযী মহলে চিঠি দেবে, ব্যাঙ্কে ক্রেডিট্ বন্ধ হযে যাবে। অবশ্য এবাও জানবে—অফিসাববা, লেববরা—কোনো কথাই তো ওদেবও অজানা থাকে না।

আমাকেও বলেছে দু'দুটো গাড়ি ওঁর নিজেব—ড্রাইভাব, তেল, মেবামত, সব দেয কোম্পানি—কেন ?

বলেছে ? তবেই দেখুন—

আমি বলি—চেক তো অনাব করতে হবে না হলে উপায নেই। একটা কাজ কবতে পাবেন—বাড়িব বড গাড়িটা ছাড়িযে দিন—বদলে ববং কাবখানাব জন্যে দুটো টেম্পো নিন—সবাবই মুখ বন্ধ হবে।

মিস্টাব বায চিন্তিত হলেন, বড গাড়িটা ছাড়িযে দেব ? ওঁবা যাওযা-আসা কববেন কি কবে ?

নতুন ভক্স্‌হলটা তো থাকবে—

সে তো বউমাব। তিনি তা ছাডবাব মতো মেযে। তা হলে আপনাকে বলছি কি ?

কিন্তু কিছু তো ছাড়তে হবে—যা বলছিলেন, কোম্পানিব অবস্থাও তো দেখছেন—

কিন্তু কী ছাডব, বলুন তো ? আব কে ছাডবে ? পনেবো বছব আগে একটা যুদ্ধেব ভাঙা জিপই ছিল জি-ডি'ব একমাত্র সম্বল—তাব আগে ট্রাম-বাস। পনেবো বছবে কত কী হযেছে—বাড়ি, বাগান, দুটো ছেড়ে তিনটে গাড়ি—অথচ দু'বছব যা যাচ্ছে তাতে এসব চলতে পাবে না। তা বলবাব জো আছে কাউকে—চন্দ্রাকে, ছেলেমেযেদেব ? জি-ডি প্রকাশ্যে বললেন কাউকে বলবাব জো আছে ? এদিকে বসিযে-বসিযে মজুবদেব খাওযাচ্ছি। যদি বলি কাজ নেই—তোমবা অন্যত্র যাও—ওবা শুনবে সেকথা ? অমনি আগুন জ্বলে উঠবে।

জ্বলবে না ? দেখছেন তো যে দাম জিনিসপত্রেব ?

হ্যাঁ, কিন্তু আমি মাল পাচ্ছি কই যে, কাজ দেব ? কোথায ইম্পোর্ট ? তবু তো বসিযে বেখেছি এতদিন—ওদেব 'লে অফ্' কবতে চাই না। কি বলেন, চেযেছি ?

বাসুদেবও মানলেন, না, চান নি। হাজাব হোক আপনাব পুবনো লোক—কাজ জানে। একবাব চলে গেলে আবাব সব পাওযাও সহজ হত না।

জি-ডি মানলেন, আমি তা জানি। তাই তো ওদেব বসিযে বেখেছি। কিন্তু কতদিন বসিযে বাখব আব ?

বাসুদেববাবু আবাব কাজেব কথায এলেন, তা ওঁবা কী বললেন—দে সাহেববা ?

যেমন বলেন,—আম্‌ডাগাছি। 'হাঁ'-ও, 'না'-ও। 'দেখুন মিস্টাব বায, আগেব অবস্থা তো নেই, একটা গোলমাল হলেই পুলিশ আসবে, কাবখানা তালাবন্ধ কববেন,—সেসব এখন সহজ হবে না।'

তা হলে ?

জি-ডি জানান, তা হলে আব কি ? একবাব তো অবস্থাটার সম্মুখীন হই—নোটিশ তো গিযেছে—সেই প্রথম তালিকাব আঠাবো জন—দেখি ওদেব বি-এ্যাকশ্যন।

বাসুদেব বললেন, ভালো নয, কাবখানা খুব গবম—

জি-ডি খাড়া হযে বসলেন—কেন কী হযেছে ?

ওবা দেখা কবতে আসছে, মানবে না।

মানবে না ? কাজ নেই, আমি বসিযে-বসিযে খাওযাতে—

তা বলছি না—

তবে কী আবাব ?

গুরুদাস উত্তব খুঁজছিলেন।

এক সমযে তো ওবাও কাবখানাব জন্যে অনেক কবেছে—

আব আমি কিছুই কবি নি ? মাইনে দিই নি ? ভাগ্‌গীভাতা দিই নি ? বোনাস্ দিই নি ?—

বাসুদেব বললেন, তা আব বলতে। যা অনেক জাযগায পেত না তা ওবা আমাদেব এখানে পেযেছে।

তবে ? এখন যখন আমবা পাবছি না ওবা কেন তা বুঝবে না ?

বাসুদেব ম্লান হেসে বললেন, তা কি কেউ বুঝতে চায। বিশেষত আপনাব আছে, ওদেব নেই—

জি-ডি ক্ষুব্ধ হলেন আছে। কী আছে আমাদেব আপনি তো জানেন, ছেলে চেক্ কেটেছেন, তাব টাকাও জোগাতে পাবি না, এই তো 'আছে'। আট পার্সেণ্টও যদি না দিতে পাবি তাহলে কি থাকবে ?

ওবাই বা তা শুনবে কেন ? জানলে বলবে—ওদেব তো জোগানো কাজ নয। ঘবে বসে বসে আট পার্সেণ্ট পাওযা নয, হাওযা খেতে কাশ্মীব

যাওয়া নয়। যেই কাজ যাবে, পরদিন পরিবারসুদ্ধ উপোস—সেণ্টপার্সেণ্ট উপোস—আট পার্সেণ্ট নয়।

জি-ডি বললেন, আমিই বা তা কতদিন বন্ধ রাখব? যতদিন সাধ্য দেখলাম তো।

বাসুদেববাবু জানেন কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। প্রায় ছ'মাস জি-ডি আশায় আশায় ছিলেন—অর্ডার পাবেন, কারখানায় আবার পুরো কাজ করবে। কিন্তু অবস্থাটা ক্রমেই মন্দ হল—

তা হলে কী করবেন?. ওরা তো আসছে এখনি—লে-অফ্-এর নোটিশ পেয়ে সবাই গরম। ইউনিয়নের লোকরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছে—জানিয়েছে—পাঁচটার পরে।

কেন? ইউনিয়ন-টিউনিয়ন আমি বুঝি না—তারপরেই সামলে নিলেন জি-ডি নিজেকে, তবে ওরা আমাদের কারখানার মজুর। আসবে বৈকি। আমিও তো চাই ওরা আসুক। কথাবার্তা হোক—

একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলবেন, রাগ করবেন না।

জি-ডি হাসলেন, রাগ করতে আমাকে দেখেছেন? আমার মেজাজ খারাপ?

বাসুদেববাবু বললেন, না, তা নয়। তবু ওদের কথাবার্তায় শ্রী-ছাঁদ নেই তো।

ওদের দোষ কী? আপনার কেরানিবাবুদের আছে? সব তো, চাটুজ্জে-বাঁড়ুজ্জে, কিন্তু কথা শুনলে মনে হয় কি—কোনো পুরুষে ভদ্রলোক দেখেছে?

দু'জনেরই একমত।

পাঁচটার আগেই শৈলী চাটুজ্জে যখন আব্দুল, কালিকেষ্ট- প্রভৃতি আরও জন তিনেক মজুর নিয়ে ঘরে ঢুকল তখন ওদের দেখেই গুরুদাসের কেমন ভালো লাগল না। ওই শৈলীটা ওদের নেতা। ও তো তাঁর কারখানার লোক নয়। কাজে ফাঁকি দিতে শেখানোই ওর আসল কাজ—সবাইকে তাই শেখায়।

জি-ডি তবু সবাইকে ভদ্রভাবে হেসে বসিয়েছিলেন। বাসুদেববাবুকে

বলে চা আনিযে দিলেন। আপ্যাযনও কবেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধৈর্য বাখতে পাবলেন না—ওই শৈলীব কথায।

কোম্পানিব নেই কি বলছেন—কী ছিল এণ্টাবপ্রাইজ? আব কী হযেছে তা কি আমবা দেখছি না? পঞ্চাশ হাজাব ছিল আপনাব মূলধন—আব এখন আঠাবো বছরে আপনাদেব গোটা চাব কাবখানা, কমসে কম এক কোটি টাকাব সম্পত্তি। তাব ওপবে ছেলে-বুড়ো এখানেই আপনাদেব প্রত্যেকেব দেডহাজাব মাইনে, ভাতা, গাড়ি, ফুল পেড লীভ—কত কী। আব এই তো আব্দুল আছে—প্রথম থেকেই কাজ কবছে। বলুন তো ওব কি হযেছে এই আঠাবো বছুবে? কালিকেষ্ট ছেলেটাকে পডাতে পাবে নি—আব বিবিব পাবে নি চিকিৎসা কবাতে আব্দুল—মবে গেল।

সে কি আমাদেব দোষে? সবকাব থেকে চিকিৎসাব ব্যবস্থা কবেছে—আমাদেব তো বেহাই নেই—এখন আদায করুক মেডিকেল সার্ভিস। তবে বুঝে-শুনে না চললে কী হবে। ওই তো ডাক্তাববাবু বলছিলেন—কাব কথা, ঘবে পথ্যি নেই, কিন্তু ট্রানজিস্টাব নিযে ছেলে ঘুবে বেডাচ্ছে পাডাব পার্কে।

সে দেখুন মালিকদেবও আছে—ইনকামট্যাক্সেব বেলা আয নেই. সেলট্যাক্সেব বেলা বিক্রি নেই, আমাদেব মজুবদেব বেলা লাভ নেই, ওদিকে বাড়ি উঠছে। গাড়ি কেনা হচ্ছে, একটা ছেলে কোম্পানিব খবচে সাতটা—

জি-ডি'ব মেজাজ আব ঠাণ্ডা বাখা সম্ভব হল না। চটে গেলেন। বাসুদেববাবু তাঁকে থামাতে গিযে নিজেই থামলেন—এসব মজুবমিস্ত্রীব সামনে মুনিবকে বাধা দেওযাটাও ঠিক হবে না। এমনিতেই তো শৈলীব প্রবোচনায আব্দুলও তখন তেড়ে উঠেছে—ওসব, আমবা মানব না—ছাঁটাই চলবে না। নোটিশ আপনাদেব তুলে নিতে হবে।

দুপক্ষই পবস্পবকে শাসাল—দেখা যাবে।

৩

এমনটা হবে জি-ডি তা চান নি—ভাবেনও নি। নিজেব উপব ক্রমেই বাগটা বাডতে লাগল। ভিতবে-ভিতবে বুঝলেন—একটা ট্যাক্‌ট্‌লেস কাজ

হল। বাসুদেবও অবশ্য তাই বুঝেছেন, তবে বড় সাহেবকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছিলেন—শৈলীটা বেযাড়া—ওব কী সাহস, এসব কথা বলে।

দেখলেন তো? বাগেব একটা উপযুক্ত কাবণ আছে, গুরুদাস তাই শুনতে চাইছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন গাড়িতে গিযে বসলেন তখন নিজেব উপবই আবাব বাগ হল। ট্যাক্টলেস্ কাজ হল। কী কবে এখন সামলানো যায—অনাব বেখে, মীমাংসা না হোক, আপাতত গোলমালটা ধামাচাপা দেওয়া যায কী কবে? বুঝতে পাবছেন না, দেখতে হবে। বাসুদেবকে দিযেই কিছু কবা যাবে—ম্যানেজাব হলেও ওব কথা শোনে। হীরুটাও থাকলে—না, তাকে দিযে কিছু হত না। শেষ পর্যন্ত বন্ধু ধব আছে—বড বেশি গুণ্ডাবাজ। বাসুদেবেব ছেলে বুদ্ধুটা ববং কাজেব হবে। কিন্তু সে খাতাপত্রে পার্সোনেল অফিসাব-ইন্-ট্রেনিং, খেলা নিযেই আছে—মেযেটাব ওকে মনে ধবলে হয—আব চন্দ্রাও আবাব গোঁ না ধবলে বাঁচেন জি-ডি।

জি-ডি প্ল্যানটাই মনে আঁটতে লাগলেন। ভুলতে চাইলেন তাঁব ট্যাক্টলেস্ কাজ। তবু ভুলতে পাবলেন না। সময কবে চেম্বাবেব দু'একজনেব সঙ্গে পবামর্শ কবে এলে হয না? আব সেই সূত্রে—পুলিশেব কর্তাদেব সঙ্গে? অবশ্য পুলিশ পর্যন্ত যাওযা আজকালকাব অবস্থায আবেকটা ট্যাক্টলেস্ কাজ হবে। তবে কথা বলে বাখা ভালো. অন্তত দেখাটা হলেও তেমন-তেমন অবস্থায একটা সূত্র থাকবে—হোক না পুলিশ। ড্রাইভাবকে বললেন, ইণ্ডিযা ক্লাবে চল।

বাড়ি ফিবতে দেবি কবলেন না, বেশি ড্রিংক কবলেন না। এমনিতে চন্দ্রা তো অগ্নিমূর্তি হযে আছে। তবু ক্লাবে কথা বলে—একটু আশ্বস্ত বোধ কবলেন। সকলেই তো সব বুঝছে—নযা দিল্লী পর্যন্ত তাবা মুভ্ও কবছে, এদিকেও তো আছে সার্ভিস-এব বন্ধুবান্ধববা—তাঁদেবও নিজেব চিন্তা তো কম নয। বাসুদেবও বলছিলেন—জি-ডিবই এক পার্সোন্যাল ডিপার্টমেণ্টেব কেবানিব ছেলে—এনফোর্সমেণ্টে সাবইনস্পেক্টব। মাইনে শ' তিনেক। কিন্তু নকুলবাবুব বাড়িব খবচই এখন তিন হাজাব টাকা। এখন নতুন মিনিস্টাব হযেছে বলেই কি বাপব্যাটাব পাঁচ শ' টাকায় ওই সংসাব চলবে? তাঁদেব কর্তাদেবও তাহলে মাইনেব দেড-হাজাব

টাকায় সংসার চালাতে হবে। ওসব হয় না—হবে না। মিনিস্টাররাই বরং যাবে। হাঁ, তাই; আর বেশি দেরিও হবে না। যত শীগ্‌গির সম্ভব—সেণ্টারকে মুভ্‌ করবে ইনডাস্ট্রি, বিজনেস ওয়ার্লড দেখে নেবে—একটু চেপে থাকতে হবে ততদিন এণ্টারপ্রাইজকে।

জি-ডি'র কিন্তু মন্ত্রীদের ওপর রাগ নেই—আগেকার মন্ত্রীরাই বা কী রাজা করে গিয়েছেন? জি-ডি এণ্টারপ্রাইজকে দিল্লী থেকে কিছু আদায় করতে সাহায্য করেন নি তাঁর। যত ইম্পোর্ট লাইসেন্স, ক্যাপিটেল লোন যত কিছু সব বোম্বাই, গুজরাত, পাঞ্জাবের—এখনো অবশ্য বাংলার মন্ত্রীরা কিছু পাবে না দিল্লী থেকে। এই লেবর গোলমাল না বাধালে জি-ডি অন্তত তাতেও আপত্তি করতেন না। নিজের জোরে যা পাবেন, তখন যেমন দিল্লীতে আদায় করেছেন, এখনো তাই করবেন। কিন্তু এরা লেবর ট্রাবল বাড়িয়ে তুলছে, বাঙালি ইন্‌ডাস্ট্রিকে হেল্‌প তো করছেই না—মারতে চাইছে। এদের বাতিল না করলেও নয়—চেম্বার্সের গোবর্ধন দাস বলছেন। জি-ডি'র অত জেদ নেই, আপত্তি-ও নেই—নিজের তালটা সামলে নেবার অবকাশ পেলেই হয়। আর বেশি জড়িয়ে না পড়লেই হল।

বাড়ি পৌঁছে সাহেবের চিন্তা কিন্তু আবার সব ওলট-পালট হতে লাগল। চন্দ্রা যেন খড়্গ হাতে নিয়েই বসেছিলেন।

কী পেয়েছ শুনি—বুড়ো বয়সে শুধু নিজে ঢলাঢলি করা নয়। মেয়েটাকে পর্যন্ত পথে নামাবে—

ব্যাপারটা খানিক পরে বোঝা গেল।

ওই যে তোমার বাস্থ ম্যানেজারের ছেলে বুড্‌ঢা, না, বুদ্ধু,—তাকে পাঠিয়েছ তুমি?

হাঁ, কেন?

এমনিতে, তো যা তোমার মেয়ে, অমনি বলে—বুড্‌ঢা চল, বাইরে ডাইন করব।

জি-ডি হাল্কা করে দেবার জন্য বললেন, তা ওরা ইয়ং এখনো, একটু চ্যান্স দিলে নিজেরাই তা করে নেবে। মানে হোটেলে যাবে—ডিনারে-ড্যান্সে যাবে যাকে পায় তাকে নিয়ে—জি-ডি নিজেকে সমর্থন করতে চাইলেন, তা আমি কি করে জানব মিনু বুড্ডাকে নিয়ে কোথায় যাবে—

না, তুমি জানবে না। তোমার মেয়ে তো তোমার মতো হবে, তাও তুমি জান না।

চেপে যাওযাই ভালো—জি-ডি মুখে হাসি নিযে চুপ কবলেন। দেখতে মিনা বাপেব মতো নয ববং মাযেব মতোই—বাঁধনটা যেমন-তেমন, এখনি ধুমসো হতে চলেছে। চবিত্রটাই কি অন্য রকম? বাপেব মতো? তাও নয়। অন্তত মাথা নিরেট। আসলে মা 'চন্দ্রা'র জেলাসি—বাপকেও ছাডবে না, মেযেকেও ছাডবে না। জি-ডি'ব তা বিলক্ষণ জানা আছে। দু'চাবটে ইযংম্যান যদি ওব কাছে বসে 'মিসেস বায', 'মিসেস বায' কবত, আব 'মাসিমা' না বলে 'চন্দ্রাদি চন্দ্রাদি' করত তা হলেই চন্দ্রাব মাথা ঠাণ্ডা থাকত। তা না, যদিই-বা কিছু ওকে তোযাজ করে কেউ—ছোঁড়া হোক বা ধেড়ে হোক সে শুধু মিনাব জন্যে, 'মিস্ চন্দ্রাব' জন্যে। আব তা না হলে কিছু বাগাতে। জি-ডি এসব জানেন, চন্দ্রাব গাল হজম কবা ছাডা তাঁব উপায কী? ববং হেসে বললেন, আমাব মেযে আমাব মতো হবে না, তবে কি কেসবিলালবাবুব মতো হবে? কেসবিলালবাবু ছিলেন ওব তখনকাব হুণ্ডির মালিক। লোকে তাহলে তোমাকে কি ভাবত?

তোমাকে যা ভাবে, আমাকে তার থেকে মন্দ ভাবত না। বুড়ো বাঁদবেব মতো দাঁত বেব কবলে হবে কী?

এব পবেই কিন্তু আসল গোলমালটা বাধল। দেখ,—জি-ডি বললেন—ছোঁড়াটা তুখোড, মেযেটাও ওকে পছন্দ কবে, তা তুমিও দেখছ। কবছে তো—বুড্ডা স্পোর্টসম্যান তো, এখন ভিডলেই ভালো। ওব আমেবিকা যাওযা প্রায ঠিক হযে গিযেছে। তুমি ববং একদিন ওব মা-বাবাকে ডিনাবে ডাক, আর কথাটা পাড়ো—

চন্দ্রা এবাব চণ্ডী হযে উঠল—তোমাব ওই বাসু সবকাবেব ছেলেব সঙ্গে আমাব মেযেব বিযে—তোমাব মান-অপমান বোধ তো কোনো কালে নেই—কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানও নেই? তোমাব কর্মচাবীব ছেলে, তাব সঙ্গে মেযেব বিযে।

জি-ডি বোঝাতে চাইলেন—কর্মচারী বল যাই বল, বাসুবাবু আমাদেব ম্যানেজাব। ডি-জি এণ্টাবপ্রাইজের কী-ম্যান—নতুন দু-একটা কোম্পানিতে

তিনি আমাদেব ডিবেকটবও। মাথা পবিষ্কাব—অনেস্ট, আব ওব ছেলেটা লিভ্ ওযাব। যেখানেই ফেলে দাও মাটি ফুঁডে উঠবে।

হ্যাঁ, ভুঁইফোঁড বাঙালেব ঝাড—তোমাব মনমতোই—তোমাব ওই তামা-পেতলেব মিস্ত্রিব চোখ—অ্যাবিস্টোক্র্যাসি দেখলেই ভযে পালাও।

সেই পুবনো কথা। জি-ডি জানেন, অ্যাবিস্টোক্র্যাসি তো চন্দ্রাব সেই মিত্তিববা, সান্যালবা, আব তাব আগে ছিল তাও ভালো—মিত্তিবদেব কেসবীলালবাবুবা। বাডি-ঘব ওই মাবোযাডীদেব কাব কাছে বাঁধা। তাদেব অ্যাবিস্টোক্র্যাসিতে বিযে কবতে না কবতেই জি-ডিব ছেলেও শিখেছে ঝুটা চেক কাটতে। কিন্তু এসব বলে লাভ নেই। ববং ভালোভাবে বোঝাতে চাইলেন, সবকাব লোকটা 'সলিড', আব বুড্ঢা ছেলেটা জানে—কী কবে ম্যানেজ কবতে হয। জোগাড কবে ফেলেছে ফাউণ্ডেশেনেব একটা ভালো স্টাইপেণ্ড—অবশ্য মিস্টাব বাযও সাহায্য কবেছেন—তাঁদেব 'মোস্ট প্রমিসিং ট্রেনিং—ইন ইণ্ডাস্ট্রিযাল ম্যানেজমেণ্ট অ্যাণ্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'। কিন্তু চন্দ্রা সেসব কথা কানেই তুললে না—নিমু বোসকেও তো তুমি পাঠাতে পাবতে ওবকম আমেবিকা—তাকে পাঠালে না কেন?

পাঠালে কী হত? সে মিনাকে বিযে কবত? বোসবা তোমাব মেযেকে পছন্দ কবত কিনা ভেবে দেখেছ? অন্য কথা ছেডে দিলাম।

চন্দ্রা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বললে, অন্য কী কথা আবাব?

সে কিছু নয—থাক।

চন্দ্রা জ্বলে উঠল। বুডো ধাডী! বাপ হযে তুমি ওসব কথা বিশ্বাস কববে—আর বলে বেডাবে?

জি-ডি এবাব কষ্ট হলেন, তুমি যা বলেছ আমাকে, তা ছাডা একটা কথাও আমি বিশ্বাস কবি না। আব বলে বেডানো?—তুমিই ববং হন্নে হয়ে আলিপুব থেকে দমদম পর্যন্ত বাঙালি, মাবোযাডী, ভাটিযা, পাঞ্জাবী—যত সব সার্কেলে তখন দৌডদৌড়ি কবলে, আমাব বাধাও মানলে না—মেযে কোথায পালাল।

পালাল? 'পালাল' বলেছি? 'গিযেছে'—মানে পালাল? কাব সঙ্গে মেয়েটা গেল জানতে হবে না?—তোমাব মতো হাত গুটিযে বসে থাকব। দৌলৎচাঁদবাবুব ছেলে মানিকচাঁদেব সঙ্গে বোম্বাইতে গেল শুটিং-এ, আরও

বন্ধুবান্ধব ছিল, দু-দুটো স্টাব। মিনার তো একটা পার্টও ছিল। বাড়িতে বলে যাবে কী? তোমাব মতো বাপ আছে না বাড়িতে? একবাবে যখন ওব ফিল্ম দেখাবে তখন দেখতে পাবে ওব টুইস্ট!

'ওব টুইস্ট'। মিনাব? মিনা নাচতে পাবে?—জি-ডি বিস্মিত হলেন। প্রায মুখে এসে গিযেছিল—'তাহলে তুমিও পাববে'—কিন্তু সামলে গেলেন।

চন্দ্রা মেযেব সমর্থনে তাঁব নৃত্যকলাব অপূর্ব দক্ষতাব কথা বোঝাতে লাগল। একবাবেব মতো চেপে গেল নিজেব জেলাসিও।

জি-ডি বললেন, বেশ। তবে বুড্ঢাকে নিযে মিনা ডিনাবে গিযেছে, ড্যান্সে যাবে, তাতে আপত্তি কী?

আপত্তি নয? একি শুটিং-এব কাজ? নাচ জানি বলে যাকে তাকে নিযে হুল্লোডবাজি কবতে হবে? তোমাব বুড্ঢা ড্যান্সেব কী জানে?

ও স্পোর্টস্‌ম্যান, শিখতে ওব দু-মিনিটও লাগবে না—

সবই ওব শিখতে লাগবে দু-মিনিট!—লাগুক। ওই তোমাব সবকার-হালদাবেব ছেলেব সঙ্গে আমি মেযে দেব না—এ ঠিক জেনো। সমাজে একটা পজিশ্যান হযেছে, তা বাখতে হবে।

•

তখনকাব মতো চন্দ্রা ভুলে গেল যমুনা চৌধুবী কে। অথচ দুপুব থেকে ওই কথাটাই মাথায বেশি ঘুবছিল—বোম্বাইতে দিল্লীতে জি-ডি এণ্টাবপ্রাইজেব হোটেল রুম আছে, ব্যবস্থা আছে। কল গার্ল আছে। এখন ব্যবসাযেব খাতিবে এসব দবকাব। চন্দ্রাও তা বোঝে। কিন্তু এই মেযেটা বাঙালি, যমুনা চৌধুবী। বললে 'আমি নতুন অ্যাপযেণ্টমেণ্ট—বিসেপশ্যানিস্ট।' চন্দ্রাব কালকেব সে কথা মনে পডল। আব তখ্খুনি বললে,

ঘুমুচ্ছ যে! শুনছ?

কী?

যমুনা চৌধুবী কে?

জি-ডি ঘুমন্ত চোখে বললেন, কই? কে এসেছে?

চন্দ্রা ক্রুদ্ধ হল—কই, কে? কাকে খুঁজছ? যমুনা চৌধুবী—যমুনা চৌধুবী—এটা বাড়ি, হোটেলের রুম নয়।

জি-ডিব ঘুম পালিয়ে গেল—যমুনা চৌধুবী—নাম তো জানি না,—আপিসেব নতুন টেলিফোন অপবেটব হতে পাবে ?

অপবেটব—তবে বলল কেন বিসেপশ্যানিস্ট—

জি-ডি হাসল। পজিশ্যান দেখাতে চাইল বোধ হয—

চাইবেই তো—তোমাব ঘবে বসে যখন—

তা কেন ? ওদেব কাজ সুইচবোর্ডে—সিঁডিব পাশে ঘব।

দেখ, মিথ্যে কথায পাব পাবে না। কাল আমি জেবা করে সব বেব কবে নিযেছি। মায বযস কত তাও, তোমাব সঙ্গে কতদিনেব জানাশোনা।

জি-ডি প্রতিবাদ কবলেন—আমাব সঙ্গে জানাশোনা ? আমি তাকে দেখিও নি। ওসব ব্যবস্থা আপিস সুপাবিণ্টেণ্ডেণ্ট আব ম্যানেজাব কবে।

হুঁ, এই কুডি বছবেব গ্র্যাজুযেট ছুঁডিটি তোমাব স্টেনো নয, কী বল তো তবে ?

তোমাকে সে কী বলেছে, স্টেনো, না, বিসেপশ্যানিস্ট ? আমাব স্টেনো আশু বিশ্বাস, বিসেপশ্যানিস্ট মিসেস গুপ্তা—তাকে তুমি চেন—তোমাবই তো সে সিলেকশ্যান—

তাব কথা কে জিগ্যেস কবছে ? তাব চানু নন্দী আছে—বাঁধা খদ্দেব। ওখানে সুবিধে নেই বুঝেই এটিকে জুটিযেছ—কে এটি, যমুনা চৌধুবী ?

আমি দেখিও নি—জোব দিযেই কথাটা বললেন, কাবণ এ কথাটা মিথ্যে। দেখেছেন এবং জি-ডিব ভালোও লেগেছে। সুশ্রী—তবে ছেলেমানুষ। সপ্রতিভ, তবে পাকে নি। টেম্পোবাবি হ্যাণ্ড হবে সবকাব তাকে বলেছিলেন, তাদেব দেশেব মেযে—গুড ফ্যামিলি, এখানে কষ্টে পডছে, একটু সাহায্য হবে ফ্যামিলিব।

জি-ডি জানালেন, বেশ, অত কথায কাজ কি ? তাকে আজই গিযে নোটিশ দিচ্ছি—ছাডিযে দেব ও নামেব যে থাকে আপিসে।

তাবপবে কোথায তাকে বসাবে ? গ্র্যাণ্ড হোটেলেব রুমে ?

জি-ডি আব পাবলেন না—এটা অন্যায সন্দেহ। কলকাতায এসব কবে তিনি নাম ডোবাবাব মতো মানুষ নন। অথচ চন্দ্রাব কিছুতেই এ সন্দেহ যায না। দেখ, ঘুম না হয ভাঙতে লেগেছ, তোমাব এই ইতব কথাবার্তা

আর কত শুনব? আমার মাথার উপরে অথচ খাঁড়া ঝুলছে—কারখানা বন্ধ হয় হয়—

চন্দ্রা ক্ষিপ্ত হয়ে গেল—তবু কলকাতায়ও আর একটা ছুঁড়ি না রাখলে নয়—বোম্বাইতে, দিল্লীতে, কাশ্মীরেও যথেষ্ট হল না—

জি-ডির মেজাজ বিগড়ে গেল। তোমার মতো কালীঠাকরুন যার ঘরে খাঁড়া উঁচিয়ে আছেন তাঁর তা রাখাই উচিত।

আর কথা নেই। এই যেন চন্দ্রমুখী চেয়েছিল। রাসকেল। এটা ভদ্রলোকের বাড়ি, অসহ্য। বেরোও।

বরাবর যা হয় এবারও তাই হল। জি-ডিই রণে ভঙ্গ দিলেন—বাথরুমে ঢুকলেন। আধ ঘণ্টা বসে বসে নিজের আচরণ সমর্থন করলেন, আবার দোষারোপও করলেন। শেষ পর্যন্তও মনে-মনে বিগড়ে রইলেন।

মিস্টার রায় যথানিয়মে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন—চন্দ্রা ঘর থেকেও বেরোয় নি। রেকবার মুখে দেখা হল মিনার সঙ্গে। জানল—রাতে কোথায় গিয়েছিল—সিলভার ফক্স। বুড়্ঢা কিন্তু বেশ টুইস্ট নাচে, ইত্যাদি। ইয়েস, গুড বাই এ্যাণ্ড গুড লাক মিনা ডিয়ার।

বিকেলে চারটের দিকে চন্দ্রার ঘুম ভেঙে গেল—ফোন বাজছে, ধরল। মিসেস্ রায়? চেনা একটা মেয়েলি স্বর।

আমি আপিস থেকে বলছি—যমুনা চৌধুরী।

চন্দ্রা তীক্ষ্ণস্বরে বললে, তুমি এ আপিসে কি কর?

রিসেপশ্যানিস্ট—

মিথ্যে কথা। রিসেপশ্যানিস্ট মিসেস্ গুপ্তা। তুমি কে?

স্বরটা ইতস্তত করতে লাগল, হাঁ, মানে, তিনিই। তবে মিসেস্ গুপ্তা এক মাসের লিভে গিয়েছেন—কাশ্মীরে। হীরু, জুনিয়ার রায় ও মিসেস্ রায়ের সঙ্গে—ওঁরাও গিয়েছেন—

চন্দ্রা চমকে উঠল, তোমাকে তা কে বললে?

শুনেছিলাম বুড়্ঢার কাছ থেকে। মিস্টার বুড়্ঢা সবকার জানেন—

চন্দ্রা একটু চুপ করল, তারপর—বেশ। তে মার বা তার সে খবরে কাজ কি? তুমি কী কর?

সে খবর নয়—আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাই বলছি। আমি মিসেস্ গুপ্তার জায়গায় এখন কাজ করছি—টেলিফোনও দেখছি।

টেলিফোন দেখছ, দেখ। আমাকে ফোন করছ কোন্ স্পর্ধায়?

একটু স্তব্ধতার পরে ওপার থেকে শান্ত উত্তর এল—ক্ষমা করবেন। বড় সাহেবের খবর আপনাকে দেওয়া দরকার—আপিসের এঁরা বললেন।

কেন সাহেব নিজে খবর দিতে পারেন না?

না। তাই তো। তাঁকেও কেউ ফোন করতে পারছে না। ঘেরাও।

ঘেরাও। কী বলছ?

হ্যাঁ, ঘেরাও। সকালে সাহেব প্রথমেই কারখানায় গেলেন, সরকার সাহেবকে নাকি ডাকিয়ে পাঠালেন। তারপরে ওরা, ফ্যাক্টরি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, একজন ইঞ্জিনিয়ার, সবাই ঘেরাও। ঘর থেকে বেরুতে পারছেন না—লাঞ্চও না।

অন্যেরা, তোমরা?

এটা আপিস আমাদের এখানে কোনো ট্রাবল নেই—

বেশ, মজা লোটো—

চন্দ্রা ফোন রেখে দিল। একবার চুপ করে রইল। বলল, বেশ হয়েছে। তারপর ডাকল—মিনা। কিন্তু সে বেরিয়ে গিয়েছে। চন্দ্রা গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম এল না। 'ঘেরাও'। একটা খবরের মতো খবর। চুপ করে থাকা যাক।

একটা কাণ্ড তো। একবার দেখে আসতে ইচ্ছা করে। কিন্তু গাড়ি নিয়ে মিনা বেরিয়ে গিয়েছে। ফোনই তবে করুক। কাকে? মিসেস্ দত্তকে—বীণা চাটুজ্জেকে? না, বরং ছেনি সান্যালকে করবে—ছেনি বুঝবে—

ছেনি সান্যাল শুনে হাসতে লাগল। বাই জোভ—গুড ওলড জি-ডি, আমাদের 'বিড়লাজী'। অত লেবর ম্যানেজমেণ্ট ভালো বোঝেন তাঁর ম্যানেজার—বাসু সরকার। নো ট্রাবল ইন্ সেভেন্ ইয়ার্স। এ্যাণ্ড নাউ ঘেরাওড্। তা তুমি সঙ্গে থাকলেও হত—আমি হব না হব না হব না তাপস যদি না পাই তপস্বিনী—হব না, হব না, হব না, ঘেরাওড্। যদি না পাই চন্দ্রা এজ্ কম্পেনি।

ইয়ার্কি রাখ। বল কী করা যায়।

নাথিং। ববং ভালো না লাগে—ইভনিং শোতে যাও। একটা বণ্ড্-টাইপেব ছবি আছে।

বেযাবা চা আনল। চন্দ্রা বলল, এবাব ছাডছি—চা এসেছে।

সান্যাল বললে, জি-ডিব নাম কবে এক চুমুক খেও—আর আবেক চুমুক, অধীনেব আবজি আমাব নাম কবে।

বাখ বাঁদবামি—কিন্তু চন্দ্রা ফোন ছাডতে পাবল না। ছেনিব তো ওবকমই কথাবার্তা—ওব সঙ্গে আবম্ভ হলে ফোন ছাডা যায না। কিন্তু তবু ছাডতে তো হবে—অন্তদেবও বলতে হয খববটা।

মিসেস্ দত্ত লাফিযে উঠলেন—ঘেবাও। হাউ ওযাণ্ডাবফুল। মানে, অফুল। কতক্ষণ? এগাবোটা থেকে। লাঞ্চ পেযেছেন—চা? কিছু পায নি? চোবা বাযসাহেব—এ্যাণ্ড হি ইজ কোযাইট ওলড নাউ,—কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয, আমি আসছি ভাই, সন্ধ্যায—দত্তকে নিযে আসব। তুমি বাডি থেক।

বীণা চাটুজ্জেও চমৎকৃত, কী কবছে ওবা? চিৎকাব কবছে, স্লোগান দিচ্ছে, হোযাট্ এ ফান্। তুমি গিযেছিলে? গাডি নিযে বেবিযে গিযেছে মীনা? বেশ তো আমি আসছি—দুজনে যাব—নিশ্চয ওবা কিছু কববে না। কববে? কববে? করুক—তবু চল—একটা এক্সাইটিং এক্স্পিবিযেন্স্। মিস্ কবা যায না।

কোনো কথা না শুনে বীণা চ্যাটাজ্জি বললে, আমি আসছি—অপেক্ষা কব।

এসেও পডল। তাবপব নিজেই ফোন কবল আপিসে—তুমি কে? টেলিফোন-ইন্-চার্জ? বেশ, ফ্যাক্টবিতে অবস্থা কী? এখন আণ্ডাব ঘেবাও। লাঞ্চ—টি? তা দিযেছে ওবা। যাক, কী দিযেছে চন্দ্রাকে বললেন বীণা—সন্দেশ, আব ওদেব ক্যান্টিনেব চা, টোস্ট, ওমলেট—গুড ফেলোজ—তাবপব। আবাব ফোনে—পুলিশে খবব দিযেছেন। তাবা কী বললে, মিনিস্টাবকে জানাতে। মিনিস্টাবকে পাওযা যায নি? পি-এ লিখে বেখেছে—বলেছে, দেখুন কাল পর্যন্ত কী দাঁডায।

বীতিমতো জমজমাট ব্যাপাব। বীণাব সঙ্গে মিসেস্ বায দেখতে গেল। দূব থেকেই দেখে আব এগুতে চাইল না। কী চেহাবা মানুষগুলোব। তাদেব

দেখে চিৎকার বেড়ে গেল। আবার বুড়ো মজুরদের মধ্যে দু-চারজন ব্যস্ত হল চিৎকার থামাতে। অনেকে শুনলও তা। চন্দ্রা এগিয়ে গেল তাদের কাছে—কেন এসব বল তো ?

এত লোক এত কথা বলতে লাগল যে কিছু মিসেস্ রায় ভালো করে শুনতে পেল না। শুনলেও বুঝবে না। 'লে-অফ মানব না', 'নোটিশ ফিরিয়ে নাও।' কিসের নোটিশ বীণা জিজ্ঞাসা করে, চন্দ্রা জানে না। কিন্তু 'মানব না' কী ? শুনেই ক্ষেপে যেতে হয়। বীণাকে বলে, 'মানবে না' কী ? আমার কাজে আমি রাখব না, তুমি মানা-না-মানার কে ? বীণা বললে, রাইট্। গবর্নমেণ্ট বলে কিছু নেই নাকি ?

ড্রাইভার এগিয়ে এসে বললে, মেমসাহেব, এসব কথা এখানে থাক— আপনারা বাড়ি চলুন।

একবার দেখা করব না সাহেবের সঙ্গে ?

ড্রাইভার কী জানতে গেল। ফিরে এসে বলল, এখন ওরা দেবে না। 'ঘেরাও' যতক্ষণ আছে।

কতক্ষণ থাকবে ?

সাহেবরা রাজী হলে বেশিক্ষণ নয়।

কী হবে অপেক্ষা করে ? চন্দ্রাবতী বাড়ি ফিরে এল। মিস্টার দত্ত, মিসেস্ দত্ত এসেছেন। কী ব্যাপার, তাঁরাও শুনলেন। তাই তো, হাউ অফুল। লাঞ্চ দিয়েছে, চা-ও। এবার মজুরেরাও যাবে। ডিনারের টাইম হচ্ছে—সকলেরই ঘরবাড়িও আছে।

সত্যিই ডিনারের টাইম। চন্দ্রা একবার ভাবল—খাব ? কিন্তু মিনাও তো এসে খাবে। সে যা মেয়ে—আজও হয়তো ওই বুড়্ঢার সঙ্গে কোথায় হুল্লোড় করছে। যখন যাকে পায়। আর ওরই বা দোষ কী ? বাপই যখন বুড়্ঢাকে জুটিয়ে দিয়েছে। চন্দ্রা খেতেই বসবে,—তবে একটু দেখা যাক মিনা আসে কিনা। মিনা সত্যিই এল—আর তারপরে ডিনার কী ? শুনেই লাফিয়ে উঠল—ডিনার কী ? চল দেখে আসি। মামি গেছল। কিন্তু মামি করবে কী ? তার সে চার্ম কোথায় ? সে বিশেষ অ্যাপীল ? না, মিনা একাই যাবে। না হয় ডিনার খেয়ে নিচ্ছে। গাড়ি তুলে চলে গেল নাকি ?

মকবুল? চলে গিয়েছে। আচ্ছা, মিনাই ড্রাইভ করবে—তাই আরও মজা!

ডিনার শেষ না হতেই বিন্দুবাসিনী সরকার এল—বাসু সরকারের স্ত্রী।

হন্নে হয়ে এসেছেন। হাতে টিফিনক্যারিয়ার।—সঙ্গে বড় জামাতা, বছর চল্লিশ হয় নি এখনও, এককোণে বসল। বিন্দুবাসিনী রাত্রির খাবার দিয়ে এসেছেন—কর্তাকে। নিচ্ছিল না, বললে ওরাই দিচ্ছে—সবাইকেই দিয়েছে। শৈলীটা ওদের ইউনিয়নের সেক্রেটারি। বড় বেয়াড়া, তবে যমুনাদের পাড়ায় থাকে, তাই বিন্দুকে বলে মাসীমা।

চন্দ্রা সচকিত হল,—যমুনা কে?

স্বর শুনে বিন্দু সাবধান হল।—আমাদেরই দেশের মেয়ে।—আমার বাপের বাড়ির দেশের। এখন এখানে। কাজ পেয়েছে নাকি আপিসে—

চন্দ্রার জেরা শুরু হবার আগেই বিন্দুবাসিনী আরম্ভ করে দিলে, সে-ই তো সন্ধ্যায় খবর দিলে—মেসোমশায়, মানে মিস্টার সরকার, বড় সাহেব, কারখানায় ঘেরাও হয়েছেন। বুড্ঢা কোথায়?

বুড্ঢাকে সে জানল কী করে?

বিন্দুবাসিনী আরও সাবধান হল—এক আপিসে কাজ করে।

মিনা হেসে বললে—খবর নিন, মিসেস সরকার, আরও আগে খেলার মাঠে ওর বাইকের পিছনে জুটত—খবর নিন।

বিন্দুবাসিনী বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমরা কি সব শোন, আমরা তো কিছু জানি না। সে তো কালও জানত না—বুড্ঢা কোথায় আজ বাইরে খেলতে গিয়েছে। বললে, 'ওকে আজ ওখানে পাঠাবেন না, শৈলীরা ওর উপর ক্ষ্যাপা।' তবে আমি কী করব?

'আপনি আবার কী করবেন? চুপ করে বসে থাকুন।'

দেখুন মিসেস রায়, তা কেউ থাকতে পারে? তাই জামাইকে নিয়ে খাবার নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার বড় জামাই—সুশীল ঘোষ।

কেউ চন্দ্রার দিকে তাকালও না বিশেষ।

চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করলে, ডিনার পেয়েছে ওরা?

পেয়েছে। শৈলী বলছিল, 'একদিন নয় আমাদের ডিনারই খাবেন মালিকরা—দেখুন মজুররা কী খায়?'

হাউ হবিবল্! খেতে হল তাই ?

বিন্দু জানালেন, না। অন্যেবা তা শুনলে না। আমাদেব বাঁধা খাবাব নিলে, যাব বাড়ি থেকে যা এসেছে সবই নিযেছে। নিজেরাও কিছু আনিযেছিল।

চন্দ্রা বললে, সাহেব কী খেলেন ? শাক-চচ্চড়ি আব আপনাদেব বাঙালদেব লঙ্কাব ঝোল ?

বিন্দু ঘা খেলেও হাসল, ভয় নেই আমি নিজেব হাতেই সব কবেছি—মাছ, ফাউল কাটলেট, দই, আব স্যুইটস্—সাহেব খেতে পাববেন, একবেলা অন্তত।

মিনা বললে, দেখ মামি, আমি বলছিলাম ডিনাব থাক, আগেই এককবব যাই। তাহলে ওব ডিনাব ওকে দিতে পাবতাম।

যাক, চল, এখনই যাই। টুলেট হয নি।

বিন্দু জানালেন, ওঁবা খেযে নিযেছেন। খাওযা হযে গিযেছে ওঁবা নিজেও জানিযেছেন।

তাহলে এখন আব কী কবাব আছে ?

বিন্দু জানালেন, তাই তো এসেছি। ওঁদের বযস হযেছে। বাত্রে ঘুমুবেন না, ঠায চেযাবে বসে বাত কাটাবেন কী কবে ? বললাম, বাবো ঘণ্টা হযে গেল, এবাব তোমবা দুযোব ছাড—ওঁবা বাড়িতে এসে ঘুমিযে নিন। কাল নয আবাব ঘেবাও ক'বো—দিনেব বেলা। তা শুনল না।

তাহলে কী হবে ?

আমিও তো তাই বলছি। কী হবে ? আপনাবা কিছু ভেবেছেন ?

আমবা কী ভাবব ? পুলিশও নাকি কিছু কবছে না।

না। ওদিকে যাবেন না। মজুবেবা খেপে যাবে।

খেপে যাবে মানে ? কী কববে ? মগেব মুল্লুক।

বিন্দু সায দিলেন, তাব আব বাকি কী ?

তাহলে ?

তাহলে ?

কেউ 'তাহলে'ব বেশি আব কিছু ভাবতে পাবে না। বেশি জোব কবতে গেলে মাবামাবি হবে। আব সাহেবদেব পক্ষেই ভযেব কথা—তাঁবাও তো

বন্দী। ওরা যেরকম জাতের মানুষ এক ঘা লাগিয়ে দিতে কতক্ষণ? চুপ করে থাকাই উচিত। রাতটা দেখা যাক। সকলে এক মত।

কেবল মিনা বললে—আমি একবার যাব। সেই ওয়ার্কারদের সঙ্গে কথা বলব। দে কান্ট সে নো টু মি। সে কারও কথা শুনবে না। গাড়ি বার করতে যাচ্ছে।

জামাইবাবু মুখ খুললেন—এত রাত্রে ইয়ং লেডিজদের ওপাড়ায় যাওয়া ঠিক নয়। বিশেষত মিস্ রায়ের, আর ওই গাড়ি নিয়ে। ওদের মুখে শুনছিলাম এসব গাড়িটাড়ির ব্যাপারে কী গোলমাল আছে—এসব নাকি কারখানার।

চন্দ্রা মারমুখো হল: হলই বা। কারখানা কাদের?—গাড়িও তাদের।

মিনা বললে, ঠিক। না হয় কাল আমি ওদের ফ্রি ড্রাইভ্ আর জয় রাইড্ দেব।

কিন্তু গাড়ি বার করতে আর সে গেল না। বলা যায় না, গাড়ি দেখলে যদি ওরা আগুন ধরিয়ে দেয়। আর গাড়ি ছাড়া মিনা যাবেই বা কী করে?

তাহলে রাতটা দেখতেই হয়।

রাতটা দেখতে হল। একুশ ঘণ্টাও গেল। বাইশ ঘণ্টাও।

বুড়্ঢা সরকার বাড়ি পৌঁছতেই চমকিত হল। বিন্দুবাসিনী সারারাত প্রায় জেগে কাটিয়েছেন। মাকে দেখেই বুড্ঢা বুঝল একটা অঘটন কিছু ঘটেছে। বাঁধুনিটা পালিয়েছে নিশ্চয়। শুনে বুঝল হোম ফ্রন্ট অল ক্লিয়ার। কিন্তু বিপদ আরও বড়। মায়ের রিপোর্ট থেকে কিছু বুঝবার উপায় নেই। জামাকাপড় ছেড়ে স্নান-টান করে এখ্খুনি বেরুতে হবে। তার আগে যমুনাকে ডাকিয়ে পাঠাক না মা। আসবে তো? যে ঠ্যাকার ওর। কিন্তু বুড্ঢা নিজে যেতে পারে না। ওটা শৈলীদের পাড়া। তাকে দেখলেই শৈলীরা অপমান করতে ছাড়বে না, যমুনাও তা জানে। এক লাইন নিজের হাতে বুড্ঢা চিঠিতে জুড়ে দিলে—'নিজেই আসতাম, কিন্তু তুমি জানো তো পাড়াটা, তা কি ঠিক?'

স্নান সেরে আসতেই দেখে যমুনা এসে বসে আছে। আসবে তা জানত বুড্ঢা। মা বসেছিলেন—উঠবেন না। বুড্ঢাই বললে, তুমি যাও না। ওর

সঙ্গে আমার গোপন পরামর্শ আছে। অপ্রসন্নচিত্তে বিন্দুবাসিনী চলে গেলেন। বুড্‌ঢাও হাসল। যমুনাকে বলল, দেখলি মজা ?

মজা তোর। আমার পক্ষে অপমান।

বুড়োদের অমনি। ওসব গায়ে মাখিস কেন? যাক, তুই তো ফ্রি—আপিসে খুব মজা এখন, না কেরানিবাবুরা কেচ্ছা চালাচ্ছে, না তোকে 'ঘেরাও' করছে। মানে, বেশ জমেছে তোর চারদিকে, না?

বেশ হয়েছে। অপিসারবাবুদেরই কাছে 'স্তর' 'স্তর' করে তোয়াজ করতে হবে, এমন কথা তো নেই।

'ডিয়ার' 'ডিয়ার' করে যা করবার সে তো আপিসের বাইরে করিস।

যমুনা দাঁড়িয়ে উঠল এজন্য ডাকিয়েছিস?

বুড্‌ঢা বললে, নিশ্চয় না। বোস, বলে হাত ধরে টেনে বসাল, গ্রেট ইস্যুস আর ইন্‌ভল্‌ভড্‌—ঘেরাও। বাট নট গ্রেটার দেন দি ওয়ান দেট বিটুইন ইউ এ্যাণ্ড মি। তুই কতদিন ঘেরাও চালাবি বল।

যমুনা পুলকিত হল—যতদিন পারি—

তুই আর ন্যাকামি করলে আমার পোষাবে না—এইটাই এখন ইস্যু। আমি দু মাসের মধ্যে ফ্লাই করছি স্টেট্‌স্‌-এ।

যমুনা চমকাল। পরে বলল, তাতে আমার কী? আমাকে সঙ্গে নিবি?

আপাতত সম্ভব হবে না—পরে।

তবে যখন সম্ভব হবে তখন বলিস। আপাতত আমার চাকরিটা আমাকে করতে দে। দাদার ছেলেদুটোর নাহলে পড়া হবে না।

তোর দাদা চা-বাগানে কোন্ ভুটানি না লেপচিকে নিয়ে থাকবে, আর তার ছেলেদের মানুষ করতে হবে তোকে? আর ততদিন তুই আমাকে খেলিয়ে বেড়াবি?

আর তুই আমাকে খেলিয়ে বেড়াবি—আমেরিকায় বসেও।

কে তা বলে? আমি তো বলছি—চল রেজিস্ট্রি করে আসি—খেলাটা পাকা হোক, তারপর নয় দু-এক বছর দেরি করবি।

ওদিকে তুই আমেরিকায় যা করবার করবি, আমি এখানে তোর রেজিস্ট্রি-করা ওয়াইফ হয়ে তোর মায়ের ঝাঁটা খাই, আর বাপ-মা সুদ্ধ সবাইকে পথে বসাই, না?

কেন? আমি ডলার পাঠাব। তুই ওপাড়ায় ফ্ল্যাট নিবি, ফ্রি—এখন যেমন ফ্রি, কেরানি কি বলিস, ক্যাবারে রেস্টুরেণ্টে নেচে বেড়াবি।

তুই তো তাই চাস?

তুই চাস না? বল্ তো অনেস্টলি?

যমুনা একটু চুপ করে থেকে বলল, অনেস্টলি চাই-ও, চাই-ও না। তোর সঙ্গে গিয়ে গিয়ে নাচ শিখেছি। এখন ভালোও লাগে। কিন্তু লেট আস হ্যাভ অ্যান অনেস্ট হোম—তুই তা চাস?

বুড্ঢা তৎক্ষণাৎ হেসে বললে—অনেস্টলি। হাঁ-ও, না-ও। হোম—ইয়েস, বাট ফান এনিওয়ে।

একা-একা মজা লুটবি।

তোকে কে বলেছে? একা-একা স্পোর্ট নেই ফান নেই, একা-একা আছে বোরডম। বুঝছিস? এখন বল।

যমুনা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুই তো একাই যাচ্ছিস আমেরিকা, অর্থাৎ আমি একা থাকব। কিন্তু যাচ্ছিস কেন? না গেলে হয় না?

কী যে বলিস, চ্যান্স অব-এ লাইফ টাইম। বুড্ঢা হয়তো আরও একটু অগ্রসর হবার জন্য দাঁড়াচ্ছিল—কিন্তু যমুনা দাঁড়িয়ে উঠে বলল, এসব কথার জন্য ডেকেছিলি? আমি ভাবলাম মাসীমা কাল থেকে রাত জেগে বসে আছেন—মেসোমশায়রা ঘেরাও কারখানায়। অথচ তুই চাস লভ মেকিং—অন দি স্লাই।

তার জন্যে তোকে কে ডাকে? শোন্ তুই শৈলীকে বলে দেখ না—ঘেরাও ছেড়ে দিক। তোর কথা শুনবে—একটু ভাব দেখাস না হয়।

'ভাব দেখাব'—তাতেই হবে? দেখছি তো তার দাম। তুই তোর 'চ্যান্স অব-এ লাইফ টাইম' ছাড়তে পারিস না তবে শৈলী কেন ছাড়বে—ওরও তো চ্যান্স অব-এ লাইফ টাইম। ওর তো চান্স নয়—ওয়ার্ক।

ওকে অন্য রকম চ্যান্স করিয়ে দেওয়াব।

ও ক্লাব বদলাবে—বাইক প্রেজেণ্ট পাবে, না?

বুড্ঢা অপমানিত বোধ করলে, তুই আমাকে আর শৈলীকে এক ক্যাটাগোরির মনে করিস?

যমুনা মাথা নেড়ে জানাল—না। তারপর বলল, তোকে 'না' বলতে চাই—

পাবি না। কিন্তু ওদেব কাছে এগুবাব কথাও ভাবতে পাবি না। আমাব চাকবি কবে খেতে হয—ওবা কাছে এলে সব জ্বলে-পুড়ে যাবে।

তবে তো বুঝিস—শৈলীবও খেতে-পবতে হবে। ও ভালো লেবব অফিসব হতে পাবে।

বন্ধু ধবেব কাজ দিবি? না। কেন, আমেবিকা পাঠাতে পাববি না?

হতে পাবে, পবে—

তখন না হয আমাকে কথা বলতে বলিস, এখন এ 'ঘেবাও' ওবা তুলবে কিনা, তুই-ই তাব চেষ্টা দেখ। যাই, আপিসেব বেলা হযে যাচ্ছে।

যমুনা উঠে দাঁড়াল।

বুড্ঢা বললে, তোবও কিন্তু বড দেমাক হযেছে—

চান্স অব-এ লাইফ টাইম ছাডছি—না? যমুনা বাইবে যাবাব জন্য এগিযে গেল।

বুড্ঢা উঠল না। বলল, তোব বাঙালেব গোঁ—

তুই তো বাঙাল—

সে বাবা-মা। না, বাবা। আমি কিন্তু ফ্রি—ফ্রি টু লিভ মাই লাইফ।

বেশ। গুড বাই—

নো। আসছি—আপিসে দেখা হবে।

আপিসে সমস্ত দিনই উত্তেজনা—চব্বিশ ঘণ্টা হযে গেল, ছাব্বিশ ঘণ্টা হল, সাতাশ ঘণ্টা। আটাশ ঘণ্টাও—আবাব লাঞ্চ টাইম-ও।

কে? মিস্ বায? আফটাবনুন—ইযেস, মিস্ বায, 'ভেবি হবিবল পিওপল'—মিসেস বাযকে বলুন বড সাহেবেব লাঞ্চ পাঠিযে দিতে,—না, না, আপনাবা যাবেন না। ওবা সব বাফস এ্যাণ্ড বাউডিস। আপনি দেখতে চান—একসাইটিং? হোযাট ইজ ফান ফব দেম, নট ফান ফব ইউ অ্যাণ্ড মি। আমি কবছি—সামথিং হ্যাজ টুবি ডান—না, না, পুলিশ-টুলিশ নয। গুলি। সর্বনাশ হবে। কী কবা যায, তাই তো দেখছি।—মিসেস বায কথা বলবেন? বেশ, এই যে আফটাবনুন, বলুন? কিছু কবতেই হবে। এ তো দিনেব পব দিন চলে না। কবতেই হবে। হাঁ, কবব। আমি প্রোমিস দিচ্ছি—একটা বুদ্ধি, একটা কৌশল কিছু কবতে হবে।

ফোন ছেড়ে বুড়্ঢা সরকার বসল। সত্যিই করতে হবে, বুড়ো বাবা, মিস্টার রায়, এমনভাবে থাকতে পারেন? বাবা'র ডায়েবিটিস—মরে যাবেন তিনি। কিছু করতেই হবে। ওয়েলফেয়ার অফিসর বঙ্কু ধর নাকি গুণ্ডাবাজির কথাই বোঝে—ওটা বেপরোয়া—কিন্তু ও ফাউল গেম। না, আমার ভালো লাগে না। তবে দেখুক কী করতে পারে—আমি যাব না তাতে। কিন্তু, কী করতে হবে? বুড়্ঢা বুঝতে পারছে না। শৈলীটাকে বাগানো যাবে না। কিন্তু শৈলীর বিরুদ্ধে কি ইউনিয়নে কেউ নেই। দু-একটা এসিস্টেণ্ট সেক্রেটারি। এক-আধটা জোয়ান মাতব্বর—সর্দার নয়—সর্দার নেইও এ কারখানায়, থাকলে এখন মন্দ হত না। কিন্তু এই এক-আধটা অ্যাম্বিশাস জোয়ান মিস্ত্রী পাওয়া যায় না? মিঃ সরকার হয়তো চেনে, বুড়্ঢাকে তারা চেনেও না। বঙ্কু ধরের সাধ্য নেই তাদের কাছে ঘেঁসে, এজেণ্ট প্রোভেকেটার পায়। তা হলে, তা হলে কি? যাই হোক—উপস্থিত যা অবস্থা তার থেকেই খুঁজে বের করতে হবে ব্যবস্থা, তাই স্পোর্টস-এর কৌশল, যুদ্ধের কৌশল, এ্যাণ্ড এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ এ্যাণ্ড ওয়ার। ওয়ারই তো এটা, ওয়ার—দেখা যা'ক না কে জেতে—বুড়্ঢাই বা হার মানবে কেন? খেলার কৌশল সে জানে না বলে? একবার ওই পাড়াটায় যেতে হয়—ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করতে হয়—মজদুর বস্তি দেখতে হয়—বঙ্কুর চেনা ডেন নিশ্চয় আছে—পানের দোকান, চোলাইর জায়গা, গুণ্ডাদের আড্ডাখানা। অন্তত কী জিনিস বুড়্ঢা দেখতে চায়।

বুড়্ঢা সরকার বেরিয়ে পড়ল—নামবার সময় একবার যমুনার দিকে চোখ পড়ল। যমুনা তার অপেক্ষাতেই যেন বসে ছিল, কিন্তু অমনি চোখ ফিরিয়ে টেলিফোনের কী-বোর্ডে হাত দিল। বুড়্ঢা একবার ঘাড়টা কুঁচকাল। যমুনাটা বুঝল না—চ্যান্স ছিল। অনেস্ট চ্যান্স টু প্লিজ কর্তাদের, বুঝবে না। ওয়েল নো হেলপ।

পঁয়ত্রিশ ঘণ্টা, মানে রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। বুড়্ঢা সরকার মিস্টার রায়ের কুঠিতে বাইক থেকে লাফিয়ে নামল। দ্রুত ড্রয়িংরুমে ঢুকল। আরও লোক ছিল। কিন্তু প্রথমেই মিনাকে হ্যাণ্ডশেক করে বললে, নাউ, মিনা, সুসংবাদ। ওঁরা এলেন বলে—

মিনা তাকে জড়িয়ে ধরলে—কি—কি—

কিন্তু তাকে ছাড়িয়ে মিসেস নিজের কাছে বুড়োকে টেনে নিলেন—কি, সংবাদ বল তো ডিয়ার ?

যা চাইছেন, তাই। কিন্তু বড় ডার্টি—আমি বুঝিও নি ওর মতলব।

ত্রিশ ঘণ্টা, বত্রিশ ঘণ্টা, মানে সন্ধ্যা ছ'টা—রথের মেলার লোক বেরিয়েছে। ছোট ছোট রথও আছে, ছেলেরা টানছে। বাজনা বাজছে। হৈ-হৈ করছে। 'ঘেরাও' দেখে খুশিও হচ্ছে—চিৎকারও করছে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'—'ঘেরাও জিন্দাবাদ'—'আমাদের দাবি মানতে হবে'।

তেত্রিশ, চৌত্রিশ। কেমন একটা সোরগোল শোনা যাচ্ছে। কী ব্যাপার ? রথের হৈ-রৈ। না, শুধু তা নয়। রথ নিয়ে একটা গোলমাল হয়েছে কোথায় ? ওই খালাসিবাগানে। সেটা তো মুসলমানদের পাড়া, হিন্দুও আছে এখন। একটা তাড়িখানা থেকে কয়েকটা মাতাল বেরিয়ে একটা রথ ভেঙে দিয়েছে। তাই ওখানে গোলমাল। বঙ্কু ধর ওপাড়ায় ঘুরছিল এজন্যই ? হাঁ, গোলমাল—শুধু খালাসিবাগানে নয়, গোয়ালা মহলে। সেখানে কী ? চোরা চোলাইর ব্যবসা নিয়ে দু'পার্টিতে সোডার বোতল, বোমা ছোঁড়াছুঁড়ি হচ্ছে। একটু চুপচাপ 'ঘেরাও'। কে বলে এ সব ? বঙ্কু ধর নাকি দেখে এসেছে—শালা দালাল। জোর স্লোগান শৈলীর, আব্দুলের, কালিকেষ্টর—'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। 'দুনিয়াকী মজদুর এক হো'—'দালালকে হালাল কর'।

কে বললে বঙ্কু ধর বোমা খেয়ে মর-মর—শৈলী বললে—মরুক।

তারপর 'এক হো'—'এক হো'—'এক হো'—কারা ছুটে পালাচ্ছে। পালাক—'এক হো', 'এক হো'—আরও বোমা ফাটছে। হঠাৎ কে বললে আগুন—

আগুন ?

সব শুদ্ধ। খালাসি পাড়াতে ? হাঁ। না, ওদিকে গোয়ালা মহল্লায়ও। দুদিকেই।

আব্দুল বললে, দাঁড়াও, খবর নিচ্ছি।

কালিকেষ্ট বললে, মিথ্যে কথা।

না, তারা নড়বে না। শৈলী, আব্দুল, কালিকেষ্ট।

কিন্তু ধাঁ করে মোটররাইক নিয়ে ওই বুড়ো সরকার ছুটল কেন ওদিকে? আগুন। বস্তি জ্বলছে। নেবাতে? কিন্তু বস্তির এদিককার এরা দাঁড়িয়ে থাকবে? হাঁ। শৈলী, আব্দুল বলে, হাঁ। কালিকেষ্ট বোঝে না।

তারা নড়ল না। কিন্তু সবাই আব্দুল নয়—ঘরে স্ত্রী আছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে—কী হচ্ছে মহল্লায় কে জানে। যাচ্ছে, একবার খোঁজ নিয়ে আসতে।

রাত্তির দশটায় আর কেউ নেই—শুধু শৈলী, আব্দুল, কালিকেষ্ট।

সরকার সাহেব প্রথম বেরিয়ে এলেন, তারপর কারখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ওয়ার্কস ম্যানেজার, তারপর বড় সাহেব।

সরকার সাহেব বললেন, আব্দুল, কাল তোমরা বিকেলে আপিসে এস। একটা ফয়সলা তো করতেই হবে। আর এই যে 'ঘেরাও' ফুরুল—মানে, তোমরা আমাদের ছেড়ে দিলে, দুদিন খাওয়ালে-দাওয়ালে—ভদ্র ব্যবহার করলে, কিছুই কোম্পানি ভুলবে না। আমাদের ধন্যবাদ নাও—আদাব।

কেউ কথা বলতে পারল না।

গেট খোলা। বুড়ো ফিরে এসে বলল—একটা ফাউল গেম—

একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল—সকলে তার মধ্যে তাড়াতাড়ি গাদাগাদি করে উঠে বসল।

পরদিন বিকেলে আপিসে তারা কেউ এল না। কারখানায়ও তারা যায় নি। কোম্পানি নোটিশ দিলে—আমরা এখন লে-অফ স্থগিত রাখছি—ওয়ার্কারদের প্রতিনিধি ও লেবর ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে একসঙ্গে বসে তার শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

কেরানিরা বললে—গ্রেট ভিকটরি ফর দি ওয়ার্কারস।

চেম্বারে সবাই জি-ডিকে ঘিরে ধরলে—ম্যান ইউ হ্যাভ গাটস এ্যাণ্ড উইট। কী করে ম্যানেজ করলে—

জি-ডি বললেন, জাস্ট এ গড সেণ্ড—

বাড়িতে মিসেসকে বললেন, গড সেণ্ড—তাঁর ইচ্ছা না হলে হত? একি বন্ধুর কাজ। বাজে কথা। তাঁরই ইচ্ছা—বন্ধু ধরটার মাথা খারাপ হয়ে

গেছে। বুড্ঢাকে অ্যাকসেপ্ট কবো—মিনাও তাই চায। সে পাকা জেনাবেল—

মিসেস বায বললেন, তা ঠিক। কেমন কবে কী ঘটে গেল। বুড্ঢা বাহাছুব বটে। একি বক্কুব সাধ্য হত।

বুড্ঢা যত বলে, না আমি কিছু জানি না—ববং গোযালা মহল্লায থামাতে গিযেছিলাম। ঘন বস্তি—আগুন লাগলে বক্ষা আছে।

মিস্টাব বায হাসেন। থাক—ওসব কথা। এসব কে শুনবে, আব টানাটানি কববে। এমনিতেই বক্কুটা হাসপাতালে আবোল-তাবোল বকছে—আণ্ডাব এ্যাবেস্ট।

মিসেস বাযেব প্রস্তাব শুনে বিন্দুবাসিনী প্রায আহ্লাদে আটখানা। তবু, হ্যাংলামি কববেন নাকি—বিশেষত ছেলেব বিযেব ব্যাপাবে।

মানে, আমাদেব তো মন জানেনই—এব চেযে ভালো আব কী হতে পাবে? ওদেব জ্ঞাতিকুটুম্বদেব জিজ্ঞাসা কবতে হয। তা না কবলেও চলে। কিন্তু বুড্ঢাকে বাজী কবাতে পাবলে হয।

চন্দ্রা বললে, সে ভাব আমি নিচ্ছি। অথবা, বলেই দিচ্ছি—তোমাদেব ভাবতে হবে না— মিনাব জন্যেই সে পাগল।

পাগল?

পাগল বৈকি—খেলতে যাবে, তা মিনাকে পিছনে বসিযে নিতে হবে। আমি বলি কেন, আমাদেব কাব আছে—নিযে যাক। কিন্তু, না, স্পোর্টস-ম্যানদেব নাকি মোটববাইকে যাওযাই ঠিক। ম্যানলি।

হাসল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চন্দ্রা বায।

বিন্দুবাসিনীও হাসলেন, ওব তো ওবকমই। কিন্তু বল তো বোন, কাব না হলে তোমাব মেযেব পজিশ্যান থাকে?

বিন্দুবাসিনী প্রায ঠিক কবে ফেললেন পুবনো কাবটা সে নেবে না। কেন, একটা বড ভক্স্হল দেবে না কেন? হীরু তো তা কিনেছে, গাডি থাকতেও। হ্যাঁ, বড গাডি। আব একটা বাডি—সে হবে ক্রমে। বাডি কেন—একটা শেযাবও জি-ডি এণ্টাবপ্রাইজে দেওযা উচিত। অন্তত তিন-ভাগেব একভাগ—উনি তো চিবজীবন কেবল ভূতেব মতো খাটলেন। অথচ, কী? না, সেই ম্যানেজাব—চ'কবে—

এসব কোন বিষয়ে আটকাচ্ছিল না—এমনকি, বাসুদেববাবু যখন বললেন স্ত্রীকে—তুমি পুরনো তালুকদার বাড়ির মেয়ে, এসব উড়ুনে মেয়েকে সামলাতে পারবে—এমন কুটুম্বদের।

কেন, তুমি পার—তোমার বড় সাহেবকে সামলাতে, আমি তার স্ত্রীকে সামলাতে পারব না। দেখবে—

সাহেবকে সামলানো যায়—কিন্তু মেমসাহেব। ওই বেয়ান। আর তাঁর ওই মেয়ে। আমার কিন্তু মন সায় দিচ্ছে না।

তুমি তো বিয়ে করছ না, বিয়ে করছে বুড্ঢা। তোমার মনোমতো বেয়ান দেখে তবে ছেলের বিয়ে দিতে হবে—এই চাও নাকি ?

কিছুই আটকাল না। এনগেজমেণ্ট এ্যানাউন্সড হল। 'বুড্ঢা সরকার—স্পোর্টসম্যান এ্যাণ্ড ট্রেনী, জি-ডি এণ্টারপ্রাইজের সঙ্গে বাগ্‌দত্তা হলেন মন্দা রায়, ডটার অব মিস্টার এ্যাণ্ড মিসেস জি-ডি রায়। আপিসে অজস্র কনগ্র্যাচুলেশন বুড্ঢা পেল। ক্লাবে বান্ধবী মহলেও মিনা-বুড্ঢা দুজনে। লাঞ্চ, ডিনার, ড্যান্স—ফুরোয় না আর।

কিন্তু একটা পাল্টা ঘেরাওই যে গোল বাধাল।

বুড্ঢার জুনিয়রের কার বিয়ে। সেখানে গিয়ে শেষে মুখোমুখি হয়ে গেল দুজনের—বুড্ঢা আর যমুনা চৌধুরীর।

আর পালাতে পারলি না—বুড্ঢা রায় খপ করে হাত ধরে ফেলল। পরক্ষণেই ছেড়েও দিল।

যমুনা চৌধুরী অপ্রস্তুত হল। কিন্তু বেশি না।—পালাব কেন ?

আপিসে আর তোর দেখাই নেই—

সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে ওঠেন বলে—

ও আবার কী হচ্ছে ? আপনিটা কী ?

মুনিবকে কী বলব তবে ?

স্বর নামিয়ে বুড্ঢা বলল, খুব অভিমান হয়েছে, না ?

অভিমান ? আমাদের সাজে না।

বুড্ঢা বললে, যাক, এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা হবে না। বরং চলে যাস না। আমি ফিরে আসব—ওদিকে একটু সেরে আসি। চল না তুইও—

ওটা বাসুদেবদেব বুকে—আমাদেব ভেতবে, কেবানিবাবুদেব সঙ্গে—

বটন। যাক, আয গে সেবে।

তাড়াতাড়িই ফিবে এসেছিল বুড়ো। তবু ওকে একটা কথা তাকে একটু হাসি—তো এসব কম? আব কনগ্র্যাচুলেশনও আছে—'সামনেই আবও বড একটা ব্যাপাব। কত দেবি আব?' ইত্যাদি। তাই এসে দেখল—যমুনা ইতিমধ্যে এসে গিযেছে—আব একাও নয। তাবও রূপ আছে—বেশ বেশিই আছে। বযসটাও রূপেবই বযস। পোশাকটাও কবতে জানে—না হলে চাকবিও পেত না। কাজেই, দু-একটা আধা-বুড়ো অপিসাব, মাঝাবি কেবানিও আছে—তাকে কম্পেনি দেবাব লোক কম হয নি। বুড়োকে দেখেই ছোটবা দু'জন কেটে পডল। দুজন আধা-বুড়ো নাছোড়বান্দা। যমুনাও 'আপনি'-'আপনি' চালাচ্ছে—আব, বুড়ো?—বেশ তাই সই—মিস চৌধুবী, জমিযে বসেছেন দেখছি—

একজন ফষ্টিনষ্টিতে দক্ষ, বললেন, বলছিলাম, সবকাব, একটা হ্যাপি অকেশন উনিও কেন আমাদেব দেন না—

যমুনা সপ্রতিভভাবে বললে, কপালেব লেখা—চাকবি কবে খাওযা।

বুড়ো বলল, আপনাব চাকবিটাও খুব কঠিন, না? মানুষকে হাসি বিলানো—

আব নিজেব জন্য গাল কুড়োনো—দেখা হবে না কেন? তুমি বলবাব কে? আব ফোনে হলে মিস তোমাকে দেখাচ্ছি—তোমাব নাম বল—

হালকা কথা। যমুনার যেন গবজ নেই। বুড়োই বললে, তাহলে, আসি—যমুনা তবু উঠল না।

বুড়ো নিজেই অগত্যা বলল, বাড়ি যাবেন? তাহলে ববং গাড়িতে আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।—নাছোড়বান্দা দুটি পবস্পবে চোখাচোখি কবল।

যমুনা বললে, গাড়ি?

হ্যাঁ। ট্যাক্সি। অন্যদেব নিবস্ত কবাব জন্য বলল—একবাব দিদিকে তুলে নেব প্রথম—এ পাড়াতেই।

বড সাহেবেব গাড়ি নয, সত্যই ট্যাক্সি। উঠে বসতে-বসতে যমুনা বললে, এ পাড়ায আপনাব কোন্ দিদিব বাড়ি?

তিনি স্বর্গে আছেন। মানে, মর্ত্যে নামেন নি।

তবে ?

তবে, মহাশয়া, আপনার 'আপনি কথাটা' কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে, কবে শেষ হবে ?

যমুনা বললে, সে আমার হাতে নয়।

দেখি হাত।—হাত তুলে নিয়ে বললে, এ বলার শেষ হল তো ?

কেন আপনি এমন করছেন ? আমি দুর্বল বলে ?

বেশ, তবে মেনে নে না কেন তুই দুর্বল—একটু জোর করেই কাছে টানল বুড়ো। জোর করেই দূরে থাকতে চাইল যমুনা—সম্পূর্ণ না হোক, বেশ কিছুটা। বলল, আপনি কবে যাচ্ছেন স্টেটস-এ ?

ঠিকমতো সম্বোধন না করলে জবাব দেব না।

যমুনা চুপ করে রইল। বুড়োই বলতে বাধ্য হল—আরও মাস দুই দেরি হবে।

আশা করি, একা যেতে হবে।

শুনে বুড়োও এবার একটু চুপসে গেল। চুপ করে রইল, পরে বলল, হ্যাঁ সেইরকম ব্যবস্থাই হচ্ছে—[illegible]

ব্যবস্থা কী করে হচ্ছে [illegible]

ফাউণ্ডেশ্যান না দিতে চাইলে মিস্টার বা[illegible] মেয়ের যাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন—আটকাবে না।

কনগ্র্যাচুলেশান—এমন ফাদার-ইন-ল।

সত্যিই আমি তাঁর কাছে গ্রেটফুল।

শুধু তাঁর কাছে ?

মানে, তাঁদের সকলের কাছেই—হ্যাঁ, গ্রেটফুল—

ভালো। গ্রেটফুলনেস খুব ভালো—সব ক্ষেত্রেই ভালো—

হঠাৎ বুড়ো সামলাতে পারল না—তুমি কি বলতে চাও যমুনা ?

গ্রেটফুলনেস একটা গ্রেট ভার্চু—

আর আমার তা নেই—

কে বললে ? এই তো আমাকে গাড়িতে লিফট দিচ্ছেন, আমি কি এত অনগ্রেটফুল—এ দয়া ভুলে যাব ?

দয়া। তারপর বুড়ো তাল হারাল। তুমি কি বলতে চাও। যখন চাইছিলাম তখন তো একবারও বললে না, 'হ্যাঁ।'

আমি অনগ্রেটফুল—

তাই বললাম আমি? না, এটা অন্তত পরিষ্কার করতে হবে—

গাড়ি ময়দানের পাশে চৌরঙ্গিতে এসেছে। বুড়ো বলল, শোন্—তোর সঙ্গে কথা পরিষ্কার না করে আমি যেতে চাই না। হাত ধরে বলল, চল্, ব্লু ফক্সে যাই।

না।—যমুনা আরও একটু দূরে সরে বসল।

মোকাম্বো?

না। বাড়ি ফিরতে দেরি করলে চলবে না। মা-বাবা গিয়েছেন জামাইবাবুকে দেখতে। তাঁর আবার সেই হার্টের গোলমাল। বাচ্চা দুটো না পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে।

একটু ময়দানে ঘুরে যাই না—একদিন, এই সন্ধ্যেটা।

দেরি না করলে।—যমুনা অনিচ্ছায়ও সম্মত হয়।

ময়দানে গাড়ি [illegible] লাগল—যমুনা একটু সরেই বসে আছে। ঘুরতে লাগল গাড়ি—চোখ [illegible] হয়ে এল, হাতেও হাত স্পর্শ করল, যমুনা সরিয়ে [illegible]

বুড়ো বলছে—এই [illegible] মনে রাখতে চাই—

যমুনা [illegible], বললে, তুই কিন্তু পারবি না—মনে রাখা তোর ধাত নয়।

কেন, তুই অমন মনে করছিস—আমাকে বিশ্বাস করিস না?

তোকে বিশ্বাস করি—তোর কথায় বিশ্বাস করি না।

তার মানে?

তার মানে—এই হাত ধরে বসেছি, মিথ্যে নয়। আরও কিছু করতে পারিস—আমি দুর্বল, বলতে পারব না 'না'। মনেও করতে পারব না, তুই ঠকাচ্ছিস। কিন্তু জানি—এ তোর ধাত নয়। তুই ক্লাব বদলাবি—বাইক পাচ্ছিস। কথা ভুলে যাবি—রাইড পেলেই। একবার নয়, বারবার। তোর ধাত ফ্রি থাকা, ফ্রিডম টু লিভ ইওর লাইফ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল বুড়ো, সত্যিই কি মিনাকে পেয়েছে বলে ও যমুনাকে ছাড়ছে? মিনা? তো অমন বুক দিয়ে পিঠে লাগবে নাকি মিনা

'না' বলতে নেই—

আমাকে বলতে দাও—বলতে দাও, 'না' বলতে দাও—

মুখেব কথা ফুবোতে ফুবোতে দুজনেব ঠোঁট একত্র হয়েছিল।

সে আধ মিনিটও না। চোব, চোব চিৎকাব কবে একপাল লোক ছুটে আসতে লাগল। ছুটে যমুনা ঘবেব মধ্যে চলে গেল। ঘবেব দুযোব বন্ধ কবে দিলে। আব, বুড়ো কি বুঝবাব আগেই দেখল তাব দু-হাত, তাব কোমব জড়িয়ে সব ঘিবে দাঁড়িয়েছে।

হাতে-হাতে ধবা পড়েছে, শালা—

দে পেঁদানি।

যমুনা আব পাবল না। দুযোব খুলে বেবিয়ে বলল, তোমবা ওকে কিছু বল না। ওকে যেতে দাও।

কেন এত দবদ তাও জানি—

ও চোব নয়।

কিন্তু ভদ্রলোকেব পাড়ায এসব কববে—আব কিছু বলব না?

হুল্লোড় বেড়ে চলল। কে আসতে একজন চিৎকাব কবে বলল: 'ঘেবাও', শৈলীদা। 'ঘেবাও'।

তুই এত অধঃপাতে গেলি, যমুনা।

যমুনা মুখ নিচু কবে দাঁড়িয়ে বইল।

বুড়ো বললে, যা বলতে হয আমাকে বল—ওব কিছু দোষ নেই।

শৈলী বলল, তোমাবই গুণ তা জানি, দালালেব গোষ্ঠী দালাল। কিন্তু বড় সাহেবেব মেয়েকে বিয়ে কবছিস, কব। এ মেয়েটাকে মজাতে এসেছিলি কেন?—আপিসেব মেয়ে, খাশা মাল—না?

বুড়ো গর্জে উঠল শাট আপ।

শৈলীব একটা ঘুষি পড়ল বুড়োব গালে। বুড়োও খেপে গেল। কিন্তু চেপে ধবেছে তাকে সকলে, হাত বন্ধ। ছাড়াবাব বৃথা চেষ্টায কিল চড় খেতে লাগল।

যমুনা শৈলীব কাছে এগিয়ে বলল, শৈলীদা, আমাকে তোমবা শাস্তি দাও, ওব দোষ নেই—আমিই ওকে বাড়ি ডেকে এনেছি।

শৈলীব দুই চোখে ঘৃণাব আগুন খেলতে লাগল। বেশ, তবে মব

দুজনেই। দলেব ছোকবাদেব বলল—গাযে হাত দিস নে। কি হবে হাত কালো কবে?

শৈলী চলে গেল—পাড়াব লোকেবা না-আসা পর্যন্ত ঘেবাও কবে বাখ। ছাড়তে হয তাঁবা ছাড়বেন।

পাড়াব বুড়োবা দু-একজন কবে এগিযে এসেছিলেন। তা তো হয না—পাড়াব মেযে, তাব কলঙ্ক আমাদেব কলঙ্ক। একটা ভদ্রবকমেব বিহিত কবতে হয। ওব বাবাকে ডাকাও, মাকেও। তোমবা ঘেবাও কবে বাখ ততক্ষণ।

সে একটা কাণ্ড। নতুন বকমেব ঘেবাও। সবকাব সাহেব বাজী হন তো, বিন্দুবাসিনী বাজী হন না—বুড়ডাব বিযে বাযসাহেবেব মেযেব সঙ্গে, তিনি তা ভাঙতে পাববেন না। ভাঙা কি যে-সে কথা?—গাড়ি, বাড়ি, আবও কত কী। বিন্দুবাসিনীব কত কী আশা। ঘাটে এসে ভবাডুবি—কিন্তু সবকাব সাহেবই জোব খাটালেন স্ত্রীব ওপব। অবশ্য তাব আগে বাযসাহেবেব সঙ্গে ফোনে কথা হয—শুনলেন চন্দ্রা হুঙ্কাব দিচ্ছেন, মিনাও কি তড়বড় কবছে। বায সাহেব বললেন, দেখুন ওসব ক্যানসেলড—এনগেজমেণ্ট, মেযেটাব চাকবিও। তোমাব ছেলেটা এত ফুলিশ—

ছিঃ ছিঃ ওকেও বাখতে পাবব না—বাড়িতে এবা শুনবে কেন?

সে দেখা যাবে পবে। সব আপসেট, ওযার্স দেন দেট ঘেবাও।

শ্রীবাসুদেব সবকাব বললেন—বায সাহেব ভেঙে দিযেছেন। ও আঁশা ছাড়ো। এখন তোমাব টুনিদিব মেযেব গতি কি হবে? মানও থাকবে না চাকবিও যাবে।

বিন্দুবাসিনী বলে, ওব ওবকম একটা আবাব জুটোতে কতক্ষণ?

সবকাব বললেন—ওব বাবাব টাকা নেই, পজিশ্যান নেই, কালই চাকবিও যাবে। বোকা দত্ত, খাসীবাম, মানিকচাঁদ—এসব জোটানো ওব সাধ্য হবে না মিনা বাযেব মত।

বিন্দুবাসিনী থামায—কী বল, তোমাব ছেলেব বউ হবে মিনা।

না। ওবা তা চায না। ববং এখানে এবা যা বলছেন তাই ঠিক—বাত তিনটেতেই লগ্ন—

ঘেবাও বাত তিনটেব পবে শেষ হল। তাবপবে বাসবেব ঘেবাওতে কাবও আব ইনটাবেস্ট বইল না।

বুড্‌ঢা বললে, বল্‌ তো, না—বলোতো—তুই আব মানায না, বলোতো কাণ্ডটা কী হল ?

যমুনাও হাসল : কাউণ্টাব ঘেবাও। তুমি তো গ্রেটফুল মানুষ—ওই শাশুড়ি আব তাব কন্যাব হাত থেকে তোমাকে কিন্তু শৈলীদাবাই বক্ষা কবেছে।

কিন্তু তোমাকে বক্ষা কবতে পাবল না। ঘেবাওড ফব লাইফ। আব 'না' বলবে ?

আবাব যদি তুমি ধবাওড হও, তাহলে কিন্তু আমিও বক্ষা কবতে পাবব না—পিঠেব ছাল তুলে দেবে পাডাব ছেলেবা।

দুঁজনেই হাসল। হাত ধবে বসল।

কিন্তু তখনি একটু উন্মনা হল যমুনা—কিন্তু বাবা-মাব কী হবে ? চাকবিটা তো যাবে।

তোমাব চাকবি যাবে কেন ? তোমাব বযফ্রেণ্ড কর্মচাবীবা আপিসে 'ঘেবাও' কববে। চাকবি যাবে ববং আমাব—

তোমাদেব কখনো যায ? অন্তত তোমবা ছোট সাহেববা বড সাহেবকে ধবে পডবে, মানে 'ধবাও' কববে।

বুড্‌ঢাও হাসল—কিন্তু আমেবিকা যাওযা ?—একবাব ঘাড কুঁচকাল। গেল চ্যান্স অব এ লাইফ টাইম—তোমাব জন্যে—বলে হাসল। তাবপবে কী মনে পডল, আচ্ছা, সত্যি কথা বলো তো, সত্যিই, তখন চাযেব চিনি আনতে গিযেছিলে বাইবে, না, ঐ শৈলীদেব খবব দিতে ?

মুখেব হাসি যমুনাব চোখ এডাতে পাবল না। সে বললে, কী মনে হয—অফ সাইডে গোল ? কিন্তু কী কবি, চ্যান্স অব এ লাইফ টাইম যে।

মহাশ্বেতা দেবী

শীতোষ্ণ দরজায় রবার-আঁটা মথপ্রুফ কাপড়ের ঘরে দাঁড়িয়ে এনাক্ষী সেন কিছুক্ষণ চিবুকে আঙুল রেখে ভেবে নিলেন ঠিক কোন কাপড়টা পরা ঠিক হবে। ওদের অবস্থা ভালো না আর খুব দামী কিছু পরাটা ঠিক হবে না। রমার ফ্যাকাশে মুখ, ক্যালসিআম আর ভিটামিন বি-র ঘাটতিতে ফোলা চোখের পাতা, নির্জীব মলিন চোখের কোল মনে পড়ল। কি দরকার ছিল এখন মা হবার, এণাক্ষী সেন রেশমী দড়ি টানলেন। প্রায় নিঃশব্দে, ব্যালেরিনার মতো নেচে রেশমী পর্দা সরে গেল, এই আলমারিতে ওঁর সুতির শাড়ি থাকে।

ঢাকাই, টাঙাইল, ধনেখালি, হাওড়াহাট, এণাক্ষী সেনের বাঘের মতো কটাশে চোখ ঠিক শাড়িটি খুঁজতে লাগল। এ ঘরে একটুও শব্দ আসে না। এখানে একেবারে একলা দাঁড়িয়ে থাকতে খুব ভালো লাগে মিসেস সেনের। নিজেকে যে কি ছোট্ট মনে হয়, কি মিষ্টি আর দুষ্টু। যেন তিনি একটা হলুদ চড়াই পাখি অথবা গাঢ়নীল গঙ্গাফড়িং, ইচ্ছে করলেই উড়ে যেতে পারেন।

এখন শস্তার শাড়ি চাই, শস্তার শাড়ি। চড়াই পাখি হলদে হয় না, নীল গঙ্গাফড়িঙের কথা কে কবে শুনেছে? কিন্তু এণাক্ষী সেনের আজকাল একলা থাকলেই কালো ডালিয়া, সবুজ পিটুনিয়া, বেগ্‌নী বেড়ালের কথা মনে হয়। যেন ফুরফুরে একজোড়া পাখামাত্র পরে উনি ওদের সঙ্গে খেলা করছেন। সেনসাহেব যখন বলেছিলেন এটা মাঝবয়সের বিকৃতি তখন এনাক্ষী সেনের খুব দুঃখ হয়েছিল। ম্যাডোনার মতো মমতাভরা চোখ দিয়ে জল পড়েছিল। বয়স, বিকৃতি। ইটার্নাল ম্যাডোনার কি বয়স থাকে? সেই ছোটবেলাই তো হাত-ভাঙা পুতুল, চাপা-পড়া বেড়াল, ঘুলঘুলি থেকে

আছড়ে পড়ে থেঁতলে-যাওয়া লোমহীন বিতিকিচ্ছিরি চড়াইছানা দেখে উনি শুধু কাঁদতেন। একটু চওড়া কপালের দুদিক থেকে নেমে-আসা সোজাচুল, কালো পাতার নিচে কটাশে চোখে জল, ফোলাঠোঁটের কাঁপুনি দেখে দিব্য রায় বলেছিলেন 'মালা, তোমার মেয়ে একটি ছোট্ট ম্যাডোনা।' দিব্য রায় মার সঙ্গে ব্রিজ খেলতে আসতেন। ওঁর কানের লোম দেখেই বোঝা যেত লুকিয়ে সন্না দিয়ে তোলা হয়।

সেই থেকেই তো এণাক্ষী সেনকে সবাই ম্যাডোনা বলেই জানে। আর ইতালিতে সেই বিখ্যাত আশ্চর্য 'পিয়েতা' যখন দেখলেন তখনই কি এনাক্ষী সেনের বুকের ভেতর লম্বা লম্বা গীর্জের মোমবাতি জ্বলে ওঠে নি? যুবক যীশুর শরীর কোলে নিয়ে যুবতী মা বসে আছেন। আহা, দেখেই এনাক্ষী সেনের মনে হল ওঁর ভেতরের এই মমতাময় করুণার মতো পবিত্র, নিরঞ্জন শাদা আর কিছু নেই। সেন সাহেব যখন বলেছিলেন 'কি বুদ্ধি লোকটার দেখেছ? কাপড়ের ভাঁজগুলো অব্দি অবিকল বানিয়েছে।' তখন এনাক্ষী সেনের মনে হয়েছিল গায়ের ওপর দিয়ে একশোটা গুঁড়িগুঁড়ি পা ফেলে কেন্নো হেঁটে গেল। সেন সাহেব শান্তিনিকেতন দেখেও বলেছিলেন লোকটার বুদ্ধি আছে।

সেইজন্যেই তো সেন সাহেবের কথায় অত দুঃখ পেয়েছিলেন। সাইকোথেরাপিস্ট অশোকবাবু বুঝিয়ে দিলেন, 'সবুজ ফুল আর হলুদ পাখি আর ফুরফুরে ডানা মনে হওয়াটা আর কিছু নয় মিসেস সেন, আপনার মধ্যে কোথায় একটা শৈশবে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে আছে।'

জেনে কী স্বস্তি পেয়েছিলেন মিসেস সেন। শৈশবের মত আর কি আছে। কিন্তু শিশুমঙ্গলে শিশুদের দঙ্গল দেখতে কী খারাপ লাগে। কী লালচে, কি আঁশটে, তাই বল।

শৈশব, শিশু, মনে হয়েছিল উনি যাত্রীদের একজন হয়ে শিশুতীর্থে যাচ্ছেন। 'পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃতরাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো', সেই অরূপ ছেলেটি কি গমগমিয়েই না পড়ত। ওর গলা যতই শুনতেন ততই এনাক্ষী সেনের শরীরের ভেতরে কি যেন কেঁপে উঠত। অরূপ, রানি, ব্রিজ, উনি তো ওদের কাছেও ম্যাডোনা ছিলেন। কিন্তু অরূপের মাথায় হাত বোলাতে, অরূপের কবিতা শুনতে এত গোপন রোমাঞ্চ হত কেন?

যুবতী যীশুব শবীব কোলে নিয়ে পাথবেব মেবীব কি মাঝে মাঝে, ফ্লোবেন্সেব বাতেব নির্জনে নৈঃশব্দ্যে এবকম গোপন বোমাঞ্চ হয়? আহা, হতভাগা গভর্নমেণ্ট এক্সচেঞ্জেব কড়াকড়ি কমালে এণাক্ষী সেন আব বাবো সঙ্গে আবাব ফ্লোবেন্স যাবেন।

'এই তো।'

স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেলে মিসেস সেন বাঁচলেন। পেয়েছেন, সবকাবী বাস্তুহাবা দোকানেব সাতটাকা দামেব কাপড় পেয়েছেন। ভাগ্যে তখন গোটাকুড়ি কিনে এনেছিলেন। নইলে ভোটেব সময়ে বেবিদিব হয়ে ছুটোকথা বলতে গিয়ে কি পবে বলতেন, 'আমিও ভাই আপনাদেবি মত নটি।' শাড়িগুলো পবলে গায়ে একটু-আধটু বেঁধে বটে কিন্তু সাতটাকাব কাপড়ে ওবা আব কত নবম সুতো দেবে বল? এখন তো মিসেস সেনেব এমন হয়েছে, আয়া কাপড় চাইতে সেদিন একখানা কলাক্ষেত্রই দিয়ে দিলেন। কিন্তু এ শাড়িগুলোব একটাও দিতে পাবেন না প্রাণ ধবে। সেদিন তো এবই একখানা ডুবে পবে অ্যাকাডেমিতে ঘুবে এলেন। সেন সাহেবকে বললেন, 'আমাবই দেশেব লোক আমাব দেশেব লোকেব জন্যে কাপড়গুলো বুনেছে। আমি শাড়ি পবলে তুমি যদি লজ্জা পাও তাহলে আমাব সঙ্গে না হয় না গেলে।'

বলতে গিয়ে নিজেকে কী মহান মহীয়ান মনে হচ্ছিল। যেন প্রতিটি কথা মুখ থেকে খসে পড়াব সময়ে জ্যোতিষ্কেব মতো জ্বলে উঠছে। সেন সাহেব কী যেন ভাবছিলেন, তাই জবাব দিলেন না।

এই শাড়িব সঙ্গে তিবিশ টাকাব চটি আব পঞ্চাশ টাকাব ব্যাগটা ঠিক যাবে কি? বঙে যাবে, কিন্তু দামে? এণাক্ষী সেন মাথা নাড়লেন। দামী জিনিসেব একটা সুবিধে এই, চট কবে চোখে পড়ে না। তিন টাকাব চটি পবে পাঁচ টাকাব ব্যাগ নিয়ে বেবিদি যখনই বেরুত, বোদ পড়ে কি জেল্লাই না দিত। শাড়ি জামা পবে এণাক্ষী সেন বেবিয়ে এলেন। কর্পোবেশনেব ভোটে হেবে গিয়ে বেবিদি যখন অন্ধকাব মুখ কবে বসেছিল তখন এণাক্ষী সেন ওব ওপবহাতে হাত বুলিয়েছিলেন বটে কিন্তু মনে মনে খুব একটা কষ্ট পান নি। বেবিয়ে এসেই ওঁব ভুরু কুঁচকে গেল।

শব্দ। একেকটা ঘব থেকে একেকবকম শব্দ। শাড়িব ঘবে এতক্ষণ

কোন শব্দ ছিল না বলেই যেন নীলাক্ষীব হাসিব শব্দটা এত জোবে কানে এসে বাজল। সুন্দব গলা, শিশুব হাসিব সুন্দব শব্দ, কিন্তু এক্ষেত্রে সুন্দব নয়। কেননা নীলাক্ষী, সেন সাযেব আব এণাক্ষীব প্রথম সন্তান এখন আব শিশু নেই। ত্রিশ বছবেব কোন মেযেকে, হলেই বা তাব মন অপবিণত, শবীব পবিণত, শিশু বলা যায কি? ওব শবীব কী বন্যভাবে বাডন্ত, ওদেব নাকি এইবকমই হয, এণাক্ষী সেন পাযে পাযে এগিযে গেলেন। নীলাক্ষীব গলায মস্ত একটা বীব্ দিযে ওব নার্স ওকে চামচ কবে চা খাওযাতে চেষ্টা কবছে। কিন্তু নীলাক্ষীব তো চিবশৈশবে বাস, ও কিছুতে চা খাচ্ছে না। মাথা নাডছে আব হাসছে। একটানা চাব বা ছ' ঘণ্টা হাসলে আবাব ওকে সেডেটিভ্ দিতে হয।

এণাক্ষী সেন দবজায দাঁডিযে একটু দেখলেন। উনি যে শৈশবে ফিবে যেতে যান তাব চেহাবাও অমনি নাকি কে জানে। কাঁচাপাকা চুলে বিবন বাঁধা, গলায বীব্টাকাব, পবনে পেছনে-বোতাম-দেওযা কোণাহাতা জামা? মিসেস সেনেব মমতাভবা চোখ দুটি করুণ হযে গেল। বেবি, আমাব বেবি, এনাক্ষী সেন মনে মনে বললেন। মীনাক্ষী, বজত, নন্দিনী, অরুণাংশু ওবা চাব ভাইবোন হুডমুড কবেই এসেছিল কিন্তু নীলাক্ষীকে ওর মা সবচেযে ভালোবাসেন। সেইজন্যেই তো ওকে কিছুতে চিকিৎসাব জন্যে বাইবে পাঠান নি। ডাক্তাবদেব ইলেকৃট্রিক চিকিৎসাকে মনে হযেছিল কশাইযেব নিষ্ঠুবতা। তা ছাডা, এণাক্ষী সেন প্রাযই বলেন, 'ও আমাব ঈশ্ববেব দান।' হিন্দুব মেযে, হিন্দুব বউ হলেও 'আমাব ঈশ্বব' বলতে এণাক্ষী সেন যীশুখ্রীষ্টকেই বোঝেন আব নীলাক্ষীকে মনে মনে 'আমাব ক্রশ' মনে কবতে ওঁব ভালো লাগে। এই তো, বমা সেদিন বলছিল 'আমাব ঠাকুবঝি-ও ওমনি হ্যাবা ছিল বউদিদি, তা অম্বিকে-কালীবাডিব ঠাকুবেব ওষুধে সেবে গেল।'

এণাক্ষী সেন একটু হেসে চুপ কবে বসেছিলেন। সেন সাযেবেব বমবমাবম ব্যাবসা, যোধপুব পার্কেব এই বাডি, সুস্থসবল চাবচাবটে ছেলে-মেযে, এত বকমেব সুখ পাবার জন্যে ওঁব সবসমযে নিজেকে অপবাধী মনে হয। এই দেশে বাস ক'বে এত সুখী হওযাব কী অধিকাব আছে তাঁব? দুঃখ, একটু দুঃখ, দাঁড়িপাল্লায পাষাণেব মত ও-টুকু চাই বই কি। অরূপকে তো

সেইজন্যে বলেছিলেন 'বেবি আমাব ক্রশ। ওকে দেখলে আমি বুঝতে পাবি বিশ্বসংসাবেব জন্যে আমাকে কবে যেতেই হবে।'

কী ভাগ্যি সংসাব, এ বাড়িব সংসাব ওঁকে একেবাবে ছেড়ে দিযেছে। না হলে কি আব বস্তিতে বস্তিতে, অনাথাশ্রমে. কর্পোবেশনেব নোংবা মাতৃসদনে, এমন কবে বাতদিন উনি হন্যে হযে ঘুবে বেড়াতে পাবতেন? ইদানিং তো হাসপাতালে, বিকেলেব ভিজিটিং আওযাবে, ফ্রি-ওআর্ডে যাওযা ওঁব একটা বাধ্যবাধকতা হযে দাঁড়িযেছে। যাব কেউ নেই,.যে সবচেযে মন্দ রুগী, নাকে অক্সিজেন, কনুইযে স্যালাইন, তাব পাশে গিযে উনি দাঁড়াবেনই। হাসপাতাল মানে নার্স-ডাক্তাববা অতিবিক্ত খেটে এত ভাজাভাজা, ওআর্ডবয-জমাদাব-আযাবা এত উদ্ধত আব বিবক্ত, টাকাপযসাব অবিলিতে ঘবদোবেব চুণকামে এত বং কম, আগাপাছ্‌তলা গণ্ডগোলেব ফলে দুধে জল এত বেশি যে হাসপাতালেব ফ্রি-ওআর্ড দেখলেই মিসেস সেনেব কষ্ট হতে থাকে।

কি কবে ওদেব জীবনকে একটু উজ্জ্বল, একটু বর্ণিল কবে তোলা যায তা নিযে কি উনি কম ভাবেন? বেডিও কিনে হাসপাতালে দিতে ইচ্ছে কবে না, ডাক্তাববা যদিও বলে রুগীবা শুনে আবাম পায। কিন্তু বেডিও মানেই তো কতকগুলো বিকৃত উচ্চাবণে ববীন্দ্রসংগীত, 'আমি ঝড়েব বাতে তোমাব অভিসাব' সেদিন কে যেন গাইছিল। নযতো গাঁক গাঁক গলায বাংলা নাটক। সেইজন্যেই তো মিসেস সেন ফুল, ফল, লুডো, তাস, বই, যু-ডিকোলন নিযে নিযে যান। প্রোস্টেট অপাবেশনেব রুগীটা মবে যাচ্ছে তা কি কবে জানবেন মিসেস সেন? নার্সটা কি অশিষ্ট, বাতজাগা ক্লান্ত চোখ তুলে ওঁকে বললে, 'তানায এখন বৈকুণ্ঠে গিযা লুডো খেলতে আছে।'

খুব বাগ হযেছিল কিন্তু যেই মনে হল ও বেচাবা দেশ ভাগ হযেটযে হযতো একসমযে কতই কষ্ট পেযেছে, তা ছাড়া দিবাবাত্তিব লোকেব শবীবেব অসুখবিসুখ. ঘা-পুঁজ ঘাঁটে, হযতো বিযেও হবে না, নিশ্চয ম্যালঅ্যাডজাস্টেড তখনি ভেতব থেকে ম্যাডোনাব মমতা উছলে বেবিযে এসেছিল।

'বেবি চা খেযেছে?' জিগ্যেস কবলেন। এত টাকা দেন তবু সন্দেহ হয.

বেবিব নার্সটা ওকে ঠিকমত যত্ন কবে না। ঢাকাব নবাববাড়িব বাঁদিবা নাকি দিনবাত ছেলে ট্যাকে বাখতে হত বলে দুধেব সঙ্গে আপিম দিত। কি কবে মানুষ শিশুদেব ওপব নিষ্ঠুব হয ?

'না। খেতে চাইছে না।' নার্সটি ছেলেমানুষ। একটু ভযে ভযে বলল, 'আমাব মনে হচ্ছে ওঁব শবীবে কোথায কষ্ট হচ্ছে।'

'সেডেটিভ্ দাও।'

'ডাক্তাববাবুকে একটু খবব দিলে হয না ?'

'না না, প্রমীলা। ওব মনে সেই ইনজেকশন দেবাব ব্যাপাবটাব সঙ্গে ডাক্তাববাবু জড়ানো আছেন তো, ওঁকে দেখলেই ও কাঁদে।'

'আমাব যে মনে হচ্ছে ওঁব শবীবেব কোথায কষ্ট হচ্ছে ?'

'ওকে উনি-ওঁব-ওঁকে এসব বল কেন, প্রমীলা ?'

প্রমীলা ভ্যাকাচ্যাকা খেল। বযসে সাত বছবেব বড একজন মেযেছেলেকে ও কি কবে তুমি-তুই বলবে ?

'ও যে আমাদেব সবাব চেযে ছোট।' এণাক্ষী সেন এখন বাফাযেলেব ম্যাডোনাব আলো-কবা হাসি হাসলেন।

'কিন্তু '

'আব কথা নয, প্রমীলা। ওব সঙ্গে থাকতে থাকতে তোমাব একটা স্ট্রেইন হয আমি বুঝতে পাবি। মাঝে মাঝে কৌশল্যাকে ডেকে দিযে তুমি বাগানে যাও না কেন ?'

বাগানে কেন, বাইবে পা দিলেই হয তোমাব স্বামী নয তোমাব বডছেলে আমাকে ধাওযা কবে বেড়ায সেজন্যেই যাই না। নইলে এই ছোটদেব খেলাখেলনা দিযে সাজানো ঘবে ফ্রকপবা, পাকাচুল, আধামানুষেব সঙ্গে থাকতে কি আমাবি ভালো লাগে ? প্রমীলা মনে মনে বলল। মুখে কিছুই বলল না, কেননা কাজটা ভালো। দিন আঠেবোটা টাকা, ভাতেব সঙ্গে মাছ, চা-রুটিব সঙ্গে একটা মিষ্টিও দেয।

'টেক ইট ইজি।' এণাক্ষী সেন মিষ্টি হাসলেন। ওদিকেব ঘব থেকে বজতেব বন্ধুদেব ভযঙ্কব তর্ক-বিতর্কেব হল্লা শোনা যাচ্ছে। এত ভালো লাগে এই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছবেব সদ্য ভালো চাকবি-পাওযা ছেলেদেব। মনে হয ওদেব সঙ্গে নিযে কোনো জাদুকবা বাগানে চলে যান, যেখানে গোলাপফুল

কখনো ঝরে না। বসে বসে সারাদিন ওদের কথা শোনেন। কোন-কোন কথা শুনতে এত ভালও লাগে।

সিঁড়ি ধরে নামতে লাগলেন। নামতে নামতে মীনাক্ষীর গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলেন। ঐ এক মেয়ে। নিউরোটিক, ড্রাগ নয়, দিনরাত্তির হন্যে হয়ে ঘোরে। কেন ঘোরে, কেন সাতাশ বছরেই ও এরকম ভেরো, বিরক্ত, শুকনো হয়ে যাচ্ছে এণাক্ষী সেন বোঝেন না। সেন সাহেব যদিও বলেন বিশ্বসংসারকে একটু কম দেখে নিজের সংসারটা একটু বেশি দেখলে ভালো হত, কিন্তু এণাক্ষী সেন সে-কথা কানে নেন না। কালীঘাটের পটের যশোদা বা রত্তিচেল্লীর ম্যাডোনা নিজের সন্তানকেই শুধু দেখেছে এমন কথা কে করে শুনেছে ?

আপাতত রমার কথাই ওঁর বুক জুড়ে আছে। শিশুমঙ্গলের ফ্রি-ওআর্ডে সার-সার প্রসূতির মাঝখানে যে রমাকে পেয়ে যাবেন তা কে জানত। 'বউদিদি।' রমা ফিসফিস করে ডেকেছিল। 'ও রমা।' এণাক্ষী সেন ওর সিজারিয়ানের পর হা-ক্লান্ত হতকুচ্ছিৎ চেহারাটা দেখে বলেছিলেন।

'কেমন আছেন ?' রমার কথা শুনে মনেও হয় নি দু'বছর এণাক্ষী সেনের বাড়িতে নীলাক্ষীর আয়াগিরি করবার পর ও ইলেকট্রিক দোকানের ছোকরার সঙ্গে পালিয়ে যাবার মতো একটা ছি ছি কাজ করেছিল। ছেলে আবার কি, পুরুষ বললেও হয়। মাথায় টাক, বুকে লোম, হাতে মাদুলি। রমারও চেহারা ছিল বাজারের মুরগীর মতো নির্জীব, হতভাগা। যে পয়সা ফেলবে তার হাঁড়িতেই গিয়ে উঠবে এমনি বেহায়া ভাবগতিক।

'তুমি ?'

'আর আমাদের থাকাথাকি।' বিয়ে হয়েছে, আর মা হয়েছে বলেই যেন রমা ওঁর সঙ্গে কোথায় কোথায় সমান সমান হয়ে গেছে। লোকজনের সঙ্গে অবশ্য মিসেস সেন কখনই এ চাকর, ও ঝি, মনে করিয়ে দিয়ে কথা বলেন না। রমার পাশে উনি বসতেই রমা যেন গলে গিয়েছিল। তখনি শুনলেন ওর শরীরের কথা, স্বামীর দুরবস্থার কথা, শাশুড়িটা কী বজ্জাত আর চার টাকা কিলো চাল কিনবার দুঃখ।

'ভের না রমা, আমি আছি।' ম্যাডোনার হাসি মুখে মেখে উনি বেরিয়ে এসেছিলেন। তারপর থেকে প্রত্যেকদিনই ওকে দেখতে যান। আজ তো

ওব স্বামী ওকে নিতে আসবে আব মিসেস সেনেব ইচ্ছে গাড়ি কবেই ওদেব মতিমিস্ত্রী লেন না কি, সেখানে পৌঁছে দেবেন।

'আপনাব বোনাইকে দেখবেন, বউদিদি। একটু বাগিটাগি মানুষ, তবে ভেতবটা ভালো'—বমা বাঁদবমুখো মাংসপিণ্ডটাকে দুধ দিতে দিতে বলেছিল।

'তোমাকে ভালোবাসে তো?'

'তা আবে বাসে না? না জানি এখন কত কষ্ট পাচ্ছে। মা-ব কাছে অত চালাকি নেই বাবা। তুমি মদ খেয়ে আসবে আব মা ভাত নিয়ে বসে থাকবে তেমন মা পাও নি।'

'মদ খায নাকি, বমা?'

'খায না আবাব!'

বমা, বেবিব আযা বমা। ভদ্রঘবেব মেয়ে দেখ তাব কী দুর্ভোগ। বিয়ে, ছেলে, শবীবে ক্যালসিযাম কম অথচ স্বামী মদ খায। বমা চলে গেলে এণাক্ষী সেন কী কববেন? এ ক'দিন ধবে ওব বস্তিব সংসাব, ওব শাশুড়িব স্বার্থপব হিংসে, ওব স্বামীব পুরুষ-পুরুষ বর্ববতা, শুনতে শুনতে ওঁব মনে হয়েছে একেই হয়তো বিধাতাব ইচ্ছে বলে। হঠাৎ বমাব সঙ্গে ওঁবই দেখা হল। কেন হল? কেননা এণাক্ষী সেন মানুষ মাযেব মমতায বিশ্বজননীব ক্ষমতায় ওব জীবনে সুখ এনে দিতে পাবেন। আজই ওকে বলবেন স্বামীব অনুমতি নিয়ে নাও বমা। তারপব চল আমাব কাছেই সুখে আবামে থাকবে। ছোট বাচ্চাটাকে বড কবে নাও, তাবপব না হয স্বামীব কাছে যেও।

'কে?'

দবজা পেবিয়ে গাড়িতে উঠতে গিয়ে হঠাৎ চমকে উঠলেন এণাক্ষী সেন।

'আজ্ঞে, আমি।'

বতন, ওঁব ছোট ছেলে অরুণাংশুব এক সমযেব খেলাব সাথী। অরুণাংশু ওকে পবিচিত কবে দিয়ে ক্যানাডা চলে গিয়েছে ছ'মাস আগে। এই ছ'মাস ধবে বতন ওঁব বাড়িতে প্রত্যহ আসে। সন্ধ্যা হলেই আসে, বাইবে বসে থাকে। ওব ট্যাকেব অবস্থায বেকবাগান থেকে যোধপুব পার্কে বোজ বাসে আসা সম্ভব নয। প্রাযদিনই যে ও হেঁটে আসে তা মিসেস

সেনও জানেন। বি. কম ছেলের চাকরি যে ওঁর চেনাশোনার মধ্যে কারো হাতে থাকে না তাও নয়, কিন্তু কিছুতেই মিসেস সেনের মনে-পড়া, রতনকে খবর দেওয়া, যার দরকার তাকেও বলে রাখা সবগুলো একসঙ্গে হয়ে ওঠে না। সেবার ডানলপের অফিসে হয়তো হয়েই যেত। ওপরে বোথ্‌রা বসেছিল, নিচে গাড়িবারান্দায় রতন, কিন্তু ব্রিজদের ইংরেজি নাটক টেপ করতে গিয়ে আর সব ভুল হয়ে গেল। রতনকে উনি পরদিনই বলেছিলেন, 'একদম ভুলে গিয়েছি, রতন।'

রতনের গলার হাড়টা ক'বার ওঠানামা করেছিল। ও বলেছিল, 'আমি আর আসব না।'

'কেন?'

'কেন!' রতন ওঁর দিকে তাকিয়ে একবার ভেবেছিল যা মনে হচ্ছে তা বলবে, কিন্তু সব গরিবেরই কি আর বড়লোককে গলা তুলে কথা কইবার সাহস থাকে? 'আপনি বুঝবেন না' বলে ঢ্যাঙা, নড়বড়ে রতন আস্তে আস্তে বেরিয়ে গিয়েছিল। এণাক্ষী সেন তখনই মনে মনে এঁচে রেখেছিলেন অরূপকে বলবেন। অরূপ লুথার-ইশ্বর-এ পার্সোনেল অফিসার হয়েছে। ও তো বলে গেল, 'কালকেই ওকে পাঠিয়ে দিন। ভীষণ তাড়াতাড়ি দরকার।' অরূপ যে কী 'শিশুতীর্থ' পড়ত 'পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃতরাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো।'

'রতন!'

'আজ্ঞে!'

'তুমি একটু বোস। আমি ঘুরে এসেই তোমায় চিঠি লিখে দিচ্ছি। কাজটা তোমার হয়ে যাবে বলেই মনে হচ্ছে।' এণাক্ষী সেন ওঁর বিখ্যাত হাসিটি হাসলেন। যদিও ভেতরে অস্বস্তি হতে লাগল। রতন কৃতজ্ঞতায় কী বেঁকেচুরেই দাঁড়িয়ে আছে, দেখ। এই ভিখিরি-ভিখিরি ভাবটা যে কী বিশ্রী লাগে ওঁর। এর চেয়ে যারা তেড়েফুঁড়ে ঘেরাও করে তারা অনেক ভালো। কিন্তু কী আর করা যায়? ম্যাডোনার সন্তানদের মধ্যে সবাই তো রানি অথবা ব্রিজ অথবা অরূপ অথবা রমা হতে পারে না। রতনের মতও কেউ কেউ থাকবে, ম্যাডোনার ক্রুশ। ঘিনঘিনে, গরীবিয়ানা নিয়ে লেপটে লেপটে থাকা, ভীতু। গাড়িতে উঠে

বেতের ব্যাগটা থাবড়ে দেখে নিলেন। বেবি জনসনের পাউডার, সাবান, বুরুশ, পাঁচ কিলোখানেক অলিভ অয়েলের টিন, এতগুলো বাচ্চার জামা, ন্যাপি, তা ছাড়া এতগুলো গোলাপ ফুল। রমা এখানে আসুক বা ওর সেই বস্তিবাড়িতেই যাক, নিরানন্দ ঘরকে উজ্জ্বল করতে ফুলের মত আর কী আছে বল? ঘড়িতে দেখলেন পাঁচটা বাজে।

হাসপাতালে রমার বিছানার পাশে ওর বর বসেছিল। মাথায় টাক, শার্টের ফাঁক দিয়ে বুকের লোম বেরিয়ে আছে, হাতের গুলি এতখানি মোটা, মুখচোখের ভাব রীতিমত উদ্ধত, ঠোঁটে একটা বিশ্রী হাসি। কী বর্বর পুরুষের চেহারা। রমার ছোট কুঁকড়নো শরীর, ঐ পুরুষটার সঙ্গে সম্পর্ক বাধিয়ে মা হওয়ার ব্যাপারটা মনে করতেই এণাক্ষী সেনের শরীর ঘিনঘিনিয়ে উঠল। যেন কারো বমিতে হাত রেখেছেন এমনি ঘেন্না হল। কিন্তু মুখে কিছু বুঝতে দিলেন না এণাক্ষী সেন।

'এই যে রমা '

'এই যে, মা জননী এসেছেন। আস্তেজ্ঞা হোক।' লোকটা ওর মুখের কথা খ্যাঁচ করে কেটে দিল। টুলে বসে বসেই লম্বা একটা নমস্কার করে বললে, 'আসুন, আসুন।'

মুখে গন্ধ। এণাক্ষী সেনের ভেতরে ভীষণ ধপধপাধপ করে কে বাক্স তোরঙ্গ ফেলতে লাগল। উনি জীবনেও ভাবেন নি কতকগুলো দুর্গন্ধ মদ গিলে কেউ ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলবে।

'হ্যাঁ মা জননী, অধম মদ খেয়েছে।'

'ওগো, চুপ কর। বউদিদি, আপনি কিছু ভাববেন না যেন। রোজ খায় না।'

'কেন, চুপ করব কেন? উনির ভাতার খায়, ছেলে খায়, মেজ মেয়েটাও তো লুকিয়ে লুকিয়ে খায়।'

'হোআট?' এণাক্ষী সেনের মাথা ঘুরে গেল। ভাতার! সেনসাহেব ওঁর ভাতার।

'রোজ আমি খাই না।' লোকটা স্বীকার করলে, ঝগড়া করবার আগে খাই। আপনার সঙ্গে মা জননী আজ ঝগড়া করব বলে খেয়ে এসেছি।'

রমা রীতিমত অসহায। কার দলে যাবে? এণাক্ষী সেনের না ঐ লোকটার?

রমা, তোমার ভেতর থেকে শুভবুদ্ধি আসুক।

'রমা, আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি।'

'বা বা, এসব যে সব দামী দামী জিনিস দেখছি' লোকটা তার নোংরা, ম্যাথাচ্যাপটা আঙুল দিয়ে ব্যাগটা উলটে খাটে ঢালল। 'এই যে, সাবান, বুরুশ, জামা, আবার যুসও আছে দেখছি, এসব যে দিব্যি জিনিস, মা জননী।'

'ওগুলো ছুঁযো না, অসভ্য।' এণাক্ষী সেনের চোখ জ্বলে উঠল।

'কে অসভ্য, আমি?' লোকটা কী বিচ্ছিরি স্বরেই না হাসল। তারপর দাঁড়িযে বলল, 'চল রমা, বাড়ি চল।'

রমা তোমার সঙ্গে যাবে না।'

তাই বুঝি? দেখি ও যায কি না যায। চল রমা।'

রমা, যেও না।'

'আপনি আমার বউকে বিগড়োবার কে মশাই?' লোকটা কী বিশ্রী গলায চেঁচিযে উঠল। ভিজিটিং আওযার, বেড়ে বেড়ে ভিজিটর। বাইরে যে নার্সটা বসেছিল সে এগিযে এল, 'কী হযেছে?'

'এই লোকটা। এই লোকটা ' এণাক্ষী সেনের গলা দিয়ে ভাল করে কথা বেরোতে চাইল না, 'এ আমাকে "

'উনি আমার বউকে আজ চারদিন ধরে তালিম দিচ্ছেন তোর স্বামীটা বদমাস, ওর সঙ্গে যাস নি।' লোকটা রীতিমত চেঁচাতে চেঁচাতে জিনিসপত্র গোছাতে লাগল, 'আপনারা খালাস করে দিযেছেন, আমি বউ নিযে যাব, আমার ছেলে নিযে যাব, ইনি তাতে বাধা দেবার কে?'

'স্টপ।'

'স্টপ। ওসব বুকনি তোমার বাড়ি গিযে ঝাড়ো গে, মা জননী। আর তোকেও বলিহারি যাই রমা, ছিলি তো নেরীটার ঝি হযে, উনির কর্তা, উনির ছেলে দিনরাত্তির পেছনে গুড়ের মাছির মত এঁটে থাকত। আমার কাছে ভেনভেন কত্তিস বলেই তো তোকে বে করে আনলাম। বের করে আনলাম। বে-র আগে বলি নি আমি মজুর-মিস্তিরী মানুষ, তাড়িমদ

থাই ? তোকে আমাব সাধ্যিমত যত্নে বাখি নি বলতে চাস ? আব আপনাকেও বলি। নিজেব ভাতাব বদমাস, ছেলেগুলো বাবমুখো, মেজ মেযেটা বিযেব জন্যে হন্যে হযে ঘোবে, নিজেব ঘবসংসাব দেখতে পায না ? নিজেব ঘবসংসাবে আগুন দিযে উনি পবেব ভালো কবছেন। ঝাড়ু মাব অমন ভালোব মুখে।'

বমা লোকটাব সঙ্গে যাবাব জন্যেই উঠে দাঁড়াল। লোকটা বাচ্চাটাকে কোলে নিতে নিতে নার্সকে বলল, 'মহাপাপী মেযেছেলে মশায। বাপ-মা-ব পাপে মেযেটা নেবী হযে আছে, তাকে একবাব দযাবতী উঁকি মেবে দেখেন না। সর্বসমযে দেখবেন হাসপাতালে ঘুবছে শকুনেব মতো। কোন্ রুগীটা মোল, কে দুঃখে আছে, তাই খুঁটোচ্ছে। চলে আয, বমা।'

লোকটা গটমট কবে বেবিযে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ। অন্য বেডেব লোকজন হাসি হাসি মুখে তাকাতে লাগল। এণাক্ষী সেন কী কবে যে টুল ছেড়ে উঠলেন আব কী কবে যে সাবা ঘবটা হেঁটে দবজা অব্দি গেলেন তা তিনিই জানেন। একটা বেড থেকে কে একটা মেযেছেলে বললে, 'উনি ফুল নে'সছিল কেন গো, দি'মা ?'

একটা খনখনে গলা বললে, 'জানি নি বাবু।'

এদেব জন্যে, এদেব জন্যে তিনি তাঁব অমূল্য জীবনেব এতগুলো সময দিযেছেন। মা বাপেব পাপে মেযেটা নেবী জঘন্য জঘন্য কথা। এণাক্ষী সেন সাবাবাস্তা চোখ বুঁজে গদীতে পড়ে বইলেন। বিচ্ছিবি ঘিনঘিনে বৃষ্টি এল। গাড়িব কাচটা অব্দি তুলে দিতে ইচ্ছে কবল না মিসেস সেনেব।

গাড়ি থেকে নেমেই বতনকে দেখতে পেলেন। বিষ্টিব ঝাপটা তিনদিক খোলা গাড়িবাবন্দা ভিজিযে দিচ্ছে। তাবই মধ্যে, সবতে সবতে ও একমাত্র শুকনো জাযগাটিতে দাঁড়িযে আছে। খুবই অপ্রস্তুত অবস্থা। দবোযানও দেখতে পাচ্ছে বতন ভিজছে, অথচ ওকে ভেতবে যেতে বলতে পাবছে না। কেননা এ বাবু যে ছোটখোকাবাবুব বন্ধু তা দবোযান জানে। মাইজী যদি ওকে ভেতবে যেতে বলতে ভুলে গিযে থাকেন, তাহলে দবোযান কোন্ সাহসে ভেতবে বসতে বলে ? অথচ না বললে পবেই বা কেমন দেখায। দবোযান সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই শাদা ইমপালা সোঁ কবে ঢুকে পড়ল।

'কে ?' সন্ত্রস্ত বতনকে দাঁড়িযে উঠতে দেখে এণাক্ষী সেন যেন ভূত দেখল।

'আজ্ঞে, আমি।' রতন ভাবলে উনিই তো আমায় চিঠি লিখে ডেকে আনিয়েছেন।

'ও, তুমি!'

হঠাৎ মিসেস সেনের গত একঘণ্টার অপমানের জ্বালা রতনের ওপরই ফেটে পড়ল, 'কে বলেছে তোমাকে এখানে আসতে?'

'আজ্ঞে, আপনি '

'বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি! ভেবেছ তোমাকে চাকরি করে দেব? কক্ষনো না! তোমাদের মতো গরীব মানেই অকৃতজ্ঞ, নেমকহারাম!' এণাক্ষী সেন হাঁপাতে লাগলেন।

'কী হয়েছে?' সেন সাহেব নেমে এসেছেন। 'তুমি এখানে চেঁচাচ্ছ কেন? রিয়ালি!'

'চেঁচাব না?' মিসেস সেন ঘুরে দাঁড়ালেন। হতভম্ব, ভ্যাবাচ্যাকা রতনের দিকে আঙুল তুলে বললেন 'এরা ভেবেছে কী? আমাকে শুধু শুধু অপমান করবে আর আমি সয়ে যাব? জানো, ওরা দেশী মদ খায়, আর, আর বলে কিনা আমার স্বামী ভাতার! আমার মেয়ে নেরী। রিয়ালি!' উনি ভুলেই গেলেন উনি ম্যাডোনা, ভুলেই গেলেন এসব কথা কত নোংরা। 'ওকে বের করে দাও!' একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার করে প্রায় ছুটে ওপরে উঠে গেলেন। শাড়ির ঘরে যেতে হবে, সেই নিশ্ছিদ্র নৈঃশব্দ্যে বসে বসে একটা নেমবুটাল খেতে না পারলে উনি মরে যাবেন।

প্রেম কাহিনী

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় ছিল আত্মহত্যার সাধ। নিজেকে বড়-বেশি ভালোবাসত কিনা।

ভালোবাসার গায়ে কেউ টুসকি দিলেই ভালোবাসার মান বাঁচাতে মরিয়া হয়ে যেত।

মান বাঁচানো না-গেলে ব্যর্থ আক্রোশটা ফুঁসতে ফুঁসতে শেষ অব্দি নিজেকেই খতম করে টুসকিদাতাকে জন্মের মত জব্দ করার জবরদস্ত একটা সাধ হয়ে মনকে উস্কানি দিত হরদম।

ছেলেবেলার কথা ভাবলে হাসি পায়। কী আহাম্মকই মানুষ থাকে ছেলেবেলায়।

বন্ধুদের সামনে বকুনি দেওয়ায় ধাঁ করে জিতু দিদির গালে চড় কষিয়ে মান বাঁচায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে দাদা চুলের মুঠি ধরে কয়েকটি থাপ্পর হাঁকিয়ে বন্ধুদেরই সামনে মাথাটা তার দিদির পায়ের কাছে ঠেসে ধরলে সেই রাত্তিরে বি-এন-আর বাঁধে গিয়ে শুয়ে থাকে।

ছুটকরো ভাইয়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে দিদি অবিশ্যি দারুণ কান্নাকাটি করে। লাশকাটা ঘরের দেয়ালে কপাল ঠুকে ঠুকে দাদা দস্তুরমত রক্ত ঝরায়।

কিন্তু জিতুর তাতে কিছু যায় আসে নি।

বছর তিরিশেক চুটিয়ে সংসার করে নাতিনাতনীর ভরাট সংসার থেকে ড্যাংডেঙিয়ে দিদি সেদিন স্বর্গে পাড়ি দিল। লাইসেন্স-পারমিট বেচে ঘাড়েগর্দানে হয়ে মর্ত্যে দাদা দিব্যি বহাল।

মাঠে মারা গেল নিজেকে জিতুর টুকরো টুকরো করাটা। স্রেফ মাঠে মারা গেল।

অথচ জিতুর বদলে মেসোমশায়, অর্থাৎ জিতুর বাবা যদি—

সত্যি আজ অফিস যাবে না?

কড়া নজরে স্ত্রীকে ধমকায়। একই কথা কেন বারবার জিগ্‌গেস করা? মানে বোঝো নি, না বিশ্বাস করে নি?

মেঘে আকাশ ছেয়ে এলে 'আজ আর না গেলে গো' বলে এখনও যে খুকিপনা করে, মুখ ফুটে বলা সত্ত্বেও তার আজ অফিসে পাঠাতে এত উৎসাহ।

সাতসকালে দাড়ি কামালে—

অভ্যেস।

স্নান করলে—

অভ্যেস।

নাকেমুখে খেয়ে নিলে—

দাড়ি কামানো স্নান করাকে অভ্যাস বলে চালানো গেলেও সাতসকালে নাকে মুখে খাওয়ার কোন যুক্তি নেই। নাকেমুখে খেয়ে অফিস কামাই করার।

স্বামীর দাড়ি-কামানোর স্নান-করার অভ্যাস চালু থাকায় স্ত্রীর কোন মেহনত নেই। কিন্তু নাকেমুখে খাওয়ার যোগাড় করতে উঠতে হয়েছে শেষ রাতে।

আগে যদি বলতে—

আগে ভেবেছিলাম—

ঘর থেকে স্ত্রী বেরিয়ে যাওয়ায় বর্তে যায়।

আগে ভেবেছিলাম।

অথচ সত্যি কথাটাও বলা চলে না। বলা চলে না যে শ্মশানে কাল আমি ভয়ঙ্কর ভয় পেয়েছিলাম।

শ্মশান থেকে সেই ভয় পিছু নিয়েছে। রাতভর দুঃস্বপ্ন দেখিয়েছে। একই দুঃস্বপ্ন বারবার।

সকালে ভুলে গেলেও জামাকাপড় পরার সময় হঠাৎ সেই দুঃস্বপ্নটা—

কী লাভ বেচারিকে ভড়কে দিয়ে।

দুঃস্বপ্ন কেউ জেগে ছাখে? কেউ ছাখে ইজিচেয়ারে বসে?

জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে রোমাঞ্চিত হয় বলে কি জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখে—

তুই নাকি অফিস যাবি না? কী হয়েছে? মালা-হাতে মা দোটানায় পড়ে। জরজারি হয় নি তো রে? দেখ তো, বৌমা।

আমার কিছুই হয় নি। কেন তোমরা—

কিছু হয় নি অফিস কামাই করছ?

করি না?

হঠাৎ করো?

আঃ, বৌমা। হ্যাঁরে, গা ম্যাজম্যাজ করছে? রাত্তিরে জানলা খুলে শুয়েছিলি? তুই মাথা নাড়লে আমি শুনব? এত করে বলি—তুমিও বৌমা—

এই শুরু হল ঘ্যানর ঘ্যানর। স্নেহমমতা উদ্বেগ উৎকণ্ঠার পাবলিসিটি।

স্নেহমমতা ইত্যাদি খুবই দামী চিজ সন্দেহ কি। কিন্তু কারণটা সে-সবের জেনেবুঝে গেলে এমন অসহ্য লাগে। এমন অকথ্য অসহ্য।

নন্দ ডাক্তারের কাছ থেকে ঘুরে আসবি? যা না। যা বাবা যা।

যাও। এখনও বাড়িতেই আছেন।

কেন তোমরা মিথ্যে—

মিথ্যে নয়। জারজ হলেও নির্ভেজাল এই স্নেহমমতা। নিখাদ উদ্বেগ উৎকণ্ঠা।

মাথার যন্ত্রণাটা বিনুপিসির মনের বানানো রোগ, ডাক্তাররা বলেছে, কিন্তু যন্ত্রণায় তার কষ্ট পাওয়াটা খাঁটি।

চারদিকে যা অসুখ বিসুখ শুরু হয়েছে—যা, ঘুরে আয়।

অসুখ বিসুখ, না ছাঁটাই? ছাঁটাই হয়ে অনাথ দত্তও ছুটির অজুহাত দিয়েছিল।

জরজারি না হলেও 'শরীরটা খারাপ লাগছে' বলতে বলতে পটল তোলে পটল সরকার।

ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠাব ?

তাই ভালো। ভর পেটে এতটা পথ—তুমি বরং খোকাকে পাঠিয়ে দাও, বৌমা।

ভর পেটে রোজ দেড মাইল দাবড়ে স্টেশনে যেতে পারি, রাস্তার মোড়টুকু এখন পারব না ?

সত্যিই জবজারি হলে অবিশ্যি ডাক্তার ডাকার প্রশ্ন উঠত না। তখন টোটকা। রোগ জানা গেলে ডাক্তার দরকার ? কড়কড়ে চারটি টাকা।

কথা বলছ না কেন ?

আমার শরীরটরীর ঠিক আছে। বছর শেষ হতে চলল, ক্যাজুয়াল লীভগুলো পচে যাবে বলে—

ওমা।

তবে বেশ করেছিস বাবা। বেশ করেছিস। বাঁধভাঙা হাসিতে মার মুখ ভরে যায়। পাওনা ছুটি কেন পচাবি। মালা কপালে ঠেকিয়ে পেছন ফেরে।

কথাটা আমাকে বলতে কী হয়েছিল ?

রাগ করছ।

কেন আগে আমায—

অবাক করে দেব বলে।

মানে ?

ওরা ইস্কুলে চলে গেলে সারা দুপুর আজ—

মরণ।

দাঁত-কেলানো রসিকতা। যাক, মনটা তবু বউয়ের খোলসা করে দেওয়া গেল।

ছেলেমেয়েকে ইস্কুলে পাচারের জন্যে এক্ষুনি তোড়জোড় শুরু করে দেবে। মাকে বাড়ি-ছাড়া করার অছিলা খুঁজবে।

দিব্যি আছে।

সিনেমা দেখে দেখে আর সিনেমা পত্রিকা পড়ে পড়ে নিজেকে এখনও নায়িকা ভাবতে পারে। স্বামীকে নায়ক বানিয়ে তার সাথে লদকালদকির সাধ এখনও উথলে উঠতে পারে।

আড়াইবার মা হলেও, স্বামী বাগড়া দেওয়ায় হতে আর না পারলেও এখনও কী অবুঝনাবুঝ।

কিন্তু বাড়ি খালি করে খুশিতে পাছা দোলাতে দোলাতে ঘরে ঢুকে যদি ছ্যাখে স্বামীটা বিছানায় মরে পড়ে আছে? পটল সরকারের মত পটল তুলে আছে?

শরীর খারাপ লাগার কথা বলে আগেভাগে একটা আভাস দেওয়ায় মরাটা পটলের মানিয়ে গেলেও ক্যাজুয়াল লীভ পচানো এড়াতে অফিস কামাই করে ঘরে থাকার কোন মানে নেই?

কিন্তু মন? মন খারাপ?

শরীর খারাপের চেয়ে ডেঞ্জারাস নয় মন খারাপ? মন বিগড়ে গেলে শরীরকে পোয়াতে হয় না তার ধাক্কা?

অরবিন্দবাবুর গাড়িচাপা পড়ে ফৌত হওয়াটা অ্যাকসিডেণ্ট বলেই চলে গেল। কিন্তু বড় মেয়ে বিধবা হয়ে গুচ্ছের কাচ্চাবাচ্চা সমেত বাপের ঘাড়ে এসে পড়ায়, অফিস থেকে রিটায়ারমেণ্টের নোটিশ পাওয়ায় এবং একসটেনশনের আরজি হাতেনাতে খারিজ হয়ে যাওয়ায় মনটা বেয়াড়ারকম বিগড়ে গিয়েছিল বলেই না ধীরস্থির হিসেবী মানুষটা অমন বিতিকিচ্ছিরি এক কাণ্ড বাধিয়ে বসল?

যতই হঠাৎ-ফটাৎ বিশেষণ জোড়ো, সবকিছুর মত সব অ্যাকসিডেণ্টের পেছনেই কারণ থাকে।

ড্রাইভারের বেখেয়ালে অ্যাকসিডেণ্ট, পথচারীর বেখেয়ালে অ্যাকসিডেণ্ট।

ড্রাইভারের ইচ্ছেয় অ্যাকসিডেণ্ট, পথচারীর ইচ্ছেয় অ্যাকসিডেণ্ট।

বেখেয়ালটা কারণ, ইচ্ছেটা কারণ।

অরবিন্দবাবুর কারণ বেখেয়াল, না ইচ্ছে?

সংসারের ঝক্কিঝামেলা থেকে তড়িঘড়ি কেটে পড়ার মতলবে পাকা মাথার কারসাজি নয় তো?

তা যদি হয়, অরবিন্দ একটি হাড় হারামজাদা। সংসারের কাছ থেকে জীবনভর নিজের পাওনাগণ্ডা কড়ায়-ক্রান্তিতে বুঝে নিয়ে এভাবে সংসার ফেলে পালানো বেদম স্বার্থপরতা। অরবিন্দ বাঞ্চোৎটা—

কী লাভ মরা মানুষকে গালাগাল দিয়ে। শোনানো না গেলে গালাগাল দিয়ে।

এবং হার্টফেল করেই হোক কি গাড়ি চাপা পড়েই হোক দুই মৃত্যুরই পরিণাম যখন এক।

জিতুর মৃত্যুতে কয়েক লিটার চোখের জল আর ছটাক খানেক রক্ত ছাড়া বরবাদ কিছু হয় নি। কিন্তু মেসোমশায় অর্থাৎ জিতুর বাবা অর্থাৎ সবেধন রোজগেরে মানুষটা সেদিন কাবার হলে সংসারটি পথে বসত।

যেমন বসেছে পটল সরকার হার্টফেল করতে, অরবিন্দবাবু গাড়িচাপা পড়তে।

আমি মরলেও—

বুকটা ধক করে ওঠে. সেই দুঃস্বপ্ন।

ঘরে গিয়ে অশরীরী হয়ে মাবউছেলেমেয়ের হালহকিকত দেখতে আসার দুঃস্বপ্ন।

আমার ডেডবডির ওপর ওরা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে—দৃশ্যটা মজাদার। সাড়া পাবে না জেনেও আমাকে ডেকে ডেকে গলা চিরে ফেলছে—মজাদার মজাদার। পাড়াপড়শি আমার ডেডবডি কাঁধে নিয়ে চলেছে—কী মজা কী মজা। আমার চোখের সামনে দাউ দাউ করে জ্বলছে আমার ডেডবডি—মজাদারির চরমানন্দ।

কিন্তু তারপর? মাস কয়েক পর? বছর খানেক পর? বছর কয়েক পর?

শুনছ? এ্যাই—এ্যাই—এ্যাই—

ঘরে ঢোকা মাত্র বউকে জাপ্টে ধরে বুকের ধড়ফড়ানি সামলাতে হয়।

চকাচক চুমো খেয়ে নিজের নাটুকেপনা চাপা দিতে হয়।

তুমি না— মা কী ভাবলেন বলো তো।

বেঢপ হাসি হাসতে হয়।

আবার!

চোখ পাকালেও মুখ জিভ দেখানোয় আরও এক কিস্তি সোহাগ করতে হয়।

ঘাম মশলা ক্যান্থারাইডিনের গন্ধ একজোট হয়ে স্নায়ুকে নিস্তেজ করে ফেলে।

ছাড়ো।

একটা কথা মনে পড়ে গেল—

শুনবখন পরে, ওদিকে উনোনে—

ইন্সিওরেন্স আর প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ছাড়াও অফিসে কয়েকজনের কাছে আমার কিছু পাওনা আছে—

পাওনা আছে আদায় করবে। ও নিয়ে—

যেমন ধরো রাখালদা পনেরো, সেনবাবু সাত, অমিয়—

আমি কী করব। তোমার ব্যাপার—

সব মিলিয়ে আশি-র মত। এখুনি লিখে রাখছি। আশি টাকা, বুঝলে, চাট্টিখানি কথা নয়। এক মাসের বাড়ি ভাড়া হয়েও পঁচিশ টাকা বাঁচবে, পঁচিশ টাকায়—

কী যাতা বলছ।

ইন্সিওরেন্স প্রভিডেন্ট ফাণ্ড মিলিয়ে হাজার নয়েক—যেও না। এসব জেনে রাখা ভালো, বুঝলে। নইলে হঠাৎ যদি চোখ বুঁজি—

ছাড়ো। ছাড়ো বলছি।

মানুষের মৃত্যু—ওকি। যাব্‌বাবা।

মেয়েদের এই একটা মস্ত সুবিধে। কান্না পেলেই কাঁদতে পারে।

চোখের জলেই সব সমস্যার ফয়সালা ভাবতে পারে।

পটল সরকারের বউ কাঁদতে কাঁদতে ভিরমি খেয়ে বাকি সবাইকে টেক্কা দিয়েছে। অরবিন্দবাবুর বাড়িতে পা দিলে আজও মরাকান্না ওঠে।

কিন্তু লাভ? কান্নাকাটিতে এনার্জি নষ্ট করে ফয়দা?

সকাল থেকে এইসব ভাবা হচ্ছে।

ভাবনার ওপর কি মানুষের হাত আছে গো।

এই জন্যে অফিস কামাই। এই সব ভাবার জন্যে—

আমি তো না ভাবতেই চাই। এতদিন কিছু ভাবিও নি। কিন্তু কাল শ্মশান থেকে ফিরে—

চোখের জল মুছিয়ে দিতে গিয়ে বউয়ের গালে হাত বুলোয়, পিঠে হাত বুলোয়। গাল বুক পিঠ যাচাই করার জন্যে বুলোয়।

পুরুষের মাথার দাম যত কমেছে, তত বাড়ছে মেয়েমানুষেব মাংসের দাম। দেখুনগে এই মাংস-বেচা টাকায় কত সংসার—

রজতকে ধমকে থামিযে দিযেছিল। অমলের বোনের মুখটা চোখের সামনে ঝলমলিয়ে ওঠায় থামিয়ে দিযেছিল। খুকুর মুখের সঙ্গে অমলের বোনের মুখের আদল আছে বলে থামিযে দিযেছিল।

অথচ ওই বোনের দৌলতেই অমল এখনও হাসপাতালে টিকে আছে, সংসারটা টিকে আছে।

পাশটাস না-কবায় চাকরি পায নি, কিন্তু শরীরে মানানসই মাংস থাকায় যে-কোন চাকরে মেযের ডবল কামাচ্ছে।

আর চোপসানো-গাল শিরদাঁড়া-বেরনো বে-হাওয়া ব্লাডার মাই এই মেয়েছেলেটা—

পেচ্ছাপ করে আসি।

আচমকা বউকে ঠেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আমি মবে গেলে বউটা আমার অমলের বোন হয়ে যাবে? সিনেমার নাযিকা সেজে স্বামীর সাথে খুনসুটি করার সাধ কলকাতাব হোটেলে গিয়ে ভাডা খাটাবে?

নাকি শরীবে গ্রামফেড মাটনেব মত লোভনীয় মাংস না থাকায খুকুর দিকে হাত বাডাবে? বাতিল-বেশ্যা বাড়িউলি যেমন কচিকাঁচা মেযেকে এঁচোড়ে-পাকিয়ে লাইনে নামিয়ে দেয় আমার খুকুকে আমার খুকুমণিকে আমার ছোট্ট মা-মণিকে তেমনি—

—মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে।

আমার খোকা আমার খোকন আমার খোকনসোনা চায়ের দোকানের কাপডিশ দোবে? আমার মা পবের বাড়ি ঝিগিরি করবে?

পেচ্ছাপ মাথায় ওঠে।

আত্মহত্যার সাধেব মধ্যে বোমান্টিক একটা আমেজ ছিল। মৃত্যুভয়ে নিছক আতঙ্ক।

মৃত্যুটা ভয়ঙ্কর লোকসানের।

জবর মুনাফারও।

অরবিন্দবাবুর বিধবা মেয়ে নিজের গয়না বেচে বাপের শ্রাদ্ধের খরচ জোগায়, বাপের শ্রাদ্ধে মজুমদার সাহেব ফুঁকে দিয়েছে কমসে কম ত্রিশ হাজার।

অরবিন্দবাবুর গুষ্টি এখনও শোকের রোমন্থন চালিয়ে পেটের খিদেকে বুঝ দিচ্ছে, হাজার দুয়েক লোককে গণ্ডেপিণ্ডে গিলিয়েও গেস্ট কণ্ট্রোলের জন্যে কী আপসোস মজুমদার সাহেবের।

ভাই মরলে, বুঝলেন, লাখ টাকা খরচা করবে।

খুবই স্বাভাবিক। বাবা মরায় ভাগীদার কমেছে, ভাই মরলে একচেটে মালিক।

বাপের মৃত্যু তাই মজুমদার সাহেবের কাছে উৎসব। ভাইয়ের মৃত্যু হবে মহোৎসব।

আসলে মৃত্যুর নিজস্ব কোন মানে নেই। জিতুর মৃত্যু পটল সরকারের মৃত্যু অরবিন্দবাবুর মৃত্যু মজুমদার সাহেবের বাপের মৃত্যু সবই মৃত্যু—কিন্তু একেক মৃত্যুর মানে একেকরকম, জের একেকরকম।

মোদ্দা কথা হল দাদা, বড়লোক হওয়া। অবিশ্যি সবাই বড়লোক হলে চলবে না। বড়লোকি ফলানোর ব্যবস্থাটা বজায় রেখে—

তুমি বুঝি সেই তালে আছো, রজত?

তালে থাকলেই শুধু হয় না দাদা, ওতে অনেক ঝনঝাট। আমার পোষাবে না। ওপরে উঠে গিয়ে সব ব্যাটাই সততা অধ্যবসায়ের বুকনি ঝাড়ে, কর্মবীর বনে—আসলে কিন্তু পাঁচজনের ঘাড় মটকে কাঁধে পা না দিয়ে ওপরে ওঠা অসম্ভব। চুরি জোচ্চুরি বাটপাড়ি না করলে—

মানুষের বিবেক—

রাসকেল। গেরস্থকে ঘুম পাড়িয়ে চোরকে মওকা করে দেয়। ওই সোয়াইনটা—

রজত।

অবিশ্যি বিবেকের দোষ নেই। মজুমদারদেরই পোষা পয়দা। ওরাই ওকে খাইয়ে পরিয়ে পুষছে। মঠমন্দির ফেঁদে বইকেতাব লিখে লেকচার ঝেড়ে—

লেকচার তুমিও সুযোগ পেলে—

শুনতে খারাপ লাগছে? বেশ, মুখ বন্ধ করলাম।

আহাহা, আমার কথাটা তুমি—

আপনি বেশ আছেন। রবি ঠাকুরের সেই খাওয়ার পর রাঁধা আর রাঁধার পর খাওয়ার মত অফিস আর সংসার নিয়ে তোফা আছেন।

আছেন নয়, ছিলেন।

সত্যিই বেশ ছিলাম। তোফা ছিলাম।

পটল সরকার অরবিন্দবাবুর মৃত্যুর খবর শোনবার পরেও ছিলাম।

রেওয়াজমাফিক 'ইস্। চ্‌ চ্‌ চ্‌ চু।' করে দুদিনই রাত্তিরে বউকে নিয়ে শুয়েছিলাম। দুটো মৃত্যুই শনিবার যে।

অরবিন্দবাবুর মরে যাওয়া মানে এতকাল সামনাসামনি টেবিলে বসে কাজ করত যে-মানুষটা জীবনেও আর তার সাথে দেখা হবে না।

দেখা তো দুমাস পর থেকে হতও না। রিটায়ার করার পর কে আর অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখে।

পটল সরকার পাড়ার লোক, মুখচেনা ছিল মাত্র। সেই চেনামুখই তো চিরতরে হারিয়ে যায়।

দুটো মৃত্যুই ভুলে গিয়েছিলাম।

কিন্তু কাল শ্মশানে চোখের সামনে—

তোমার আগেই আমি মরে যাব, দেখো।

?

আমার দুশ্চিন্তায় অফিস কামাই করলে—

শুধু তোমার নয়। সংসারের একমাত্র রোজগেরে মানুষের মৃত্যু যে কী ভয়ানক—

কারো জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না।

তাহলে কি শুধু বউ নয়, খোকাখুকুও মরে যাবে? মাও মরে যাবে? ফুড পয়জনিং বা কলেরাফলেরায় রাতারাতি রেহাই দিয়ে যাবে?

বাজে বোকো না। বউকে ধমকে মনকে নিজের শায়েস্তা করে।

আমি মরে গেলে আমার মা বউ ছেলেমেয়ের কী গতি হবে ভেবে ভেবে

কাল রাত্তির থেকে যে-মন দিশেহারা, সে-ই এখন ওদের মরণ কামনা করছে? ফুর্তিবাজি করে কাটানোর জন্যে বিলাসের মত ঝাড়া-হাত-পা হতে চাইছে?

বাজে কথা নয়, মশাই। আমার কুষ্ঠিতে আছে সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে মবব, খুকুব কুষ্ঠিতে আছে বড ঘরে বিযে হবে, খোকার—

তুমি ওসবে বিশ্বাস করো?

ওমা! কুষ্ঠিতে বিশ্বাস করব না? ঠাকুরদেবতায বিশ্বাস করব না? ম্লেচ্ছ।

যত্তসব—

ওমা! রাখহরি পণ্ডিতেব কুষ্ঠি—

রাখহরি। পণ্ডিত!

মেজাজ ছরকুটে যায়: মার পেড়াপীড়িতে খোকাখুকুর কুষ্ঠি তৈরি কবতে দিযেছিল। বউয়ের আবদারে মাকে না জানিয়ে তারটাও।

শস্তার লোভে ওই হাডহাভাতেটার কাছে যদি না যেতাম! শস্তার মান বাঁচাতে হাডহাভাতেটার অত গুণগান যদি না করতাম।

কলকাতার গাডিওয়ালা বাড়িওয়ালা তাবড় তাবড সার্টিফিকেটওলা কোন জ্যোতিষীব কুষ্ঠি হলেও না হয় কথা ছিল।

ও সব কুষ্ঠিফুষ্টি আমি বিশ্বাস কবি না।

খুব করো।

না, করি না। বউয়ের মুখটেপা হাসি বোঁজাতে গলা চডায়। সোমেনের কুষ্ঠিও রাখহরি করেছিল, বলেছিল রাজা হবে, তবে কেন সোমেন—কী, কথা বলছ না কেন? মুখে রা নেই কেন?

সোমেন—!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সোমেন। কাল যে—

রাজা তো হযেছি।

রাজা হযেছে। বউয়ের মুখের দিকে চেয়ে চমক খায়। হঠাৎ ডুই চোখ জলে টসটসে হযে উঠেছে, নিচের ঠোঁট কামডে ধরেছে। পঁচিশ বছরের জোয়ান ছেলেটার বেঘোরে মারা যাওয়া রাজা হওয়া?

রাজার মত সবাই ওকে মাথায় তুলে নেয নি? ওকে নিয়ে মিছিল করে নি? ওর জন্যে সবাই—

আচ্ছা! ঘবের বার না হলেও খবরাখবব জানে তাহলে? এমন জানাই জানে যে জানান দিতে গিযে গলা বুঁজে আসে, গাল বেয়ে জল গডায?

তুমি তো শ্মশানে গিয়েছিলে, ছাখ নি?

দেখেছে। সোমেনের জাযগায় নিজেকে। দাউ দাউ করে চিতায় জ্বলছে?

পেটের ছেলে মরলেও মানুষ—

নিজেকে পুডতে দেখে মনে পডেছে নিজের মা বউ ছেলে মেয়ের কথা।

পটল সরকারের সংসারের কথা। অরবিন্দবাবুর সংসাবের কথা।

ভয পেযেছে। মৃত্যুভয়। ভয়ঙ্কর এই ভয়।

বাডি পর্যন্ত সেই ভয ধাওয়া কবেছে। রাতভর দুঃস্বপ্ন দেখিযেছে। আমি মরে গেলে কী হবে আমার মা-বউ-ছেলেমেয়ের।

সবাই পুলিশকে শাপমন্যি করেছে। সোমেনের জন্যে কেঁদে ভাসাচ্ছে।

কাল শ্মশানে দেখেছি। এখন আবার দেখছি। কিন্তু লাভ কি কেঁদে? কান্নার পুলটিশে সোমেনের বুলেট-বেঁধা বুকটা ফের আগেব মত সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে যাবে?

অমন সোনার টুকবো ছেলে—

বড় বড বাত ছেডে দাও। ঈজিচেযারে টান টান হয়ে বসে। ওদের সংসার এখন কী ভাবে চলবে ভেবে দেখেছ? সর্বেশ্বরবাবুর থাকা না-থাকা সমান। পাঁচ-ছটি ভাইবোন, মা-বাবা, পিসি—

ভগবান—

নিকুচি করেছে ভগবানের। ভগবান গিয়ে সোমেনের জাযগায চাকরি করবে? মাস গেলে ওর বাপের হাতে ভগবান মাইনে তুলে দেবে?

ভগবান কি সব নিজে করেন, পরকে দিয়ে করান। টাকা তোলা হচ্ছে—

টাকা তোলা হচ্ছে?

অতক্ষণ শ্মশানে ছিলে, শোনো নি?

হয়ত শুনেছিল, মনে রাখে নি। সারাক্ষণ চেয়েছিল চিতার দিকে সোমেনের জায়গায আমি দাউ দাউ করে পুডছি।

নিজেকে পুডতে দেখে মনে পডেছে নিজের মা-বউ ছেলেমেযের কথা। পটল সরকারের কথা। অরবিন্দবাবুর সংসারের কথা। সোমেনের সংসারের কথা।

টাকা তোলা হচ্ছে। ওর ভাইবোনদেব ইস্কুলে ফ্রি করে দেওযা হচ্ছে। রমেনের চাকরির ব্যবস্থা হচ্ছে। যতদিন না রমেন চাকবি পায় সংসারের সব পাঁচজনে নেবে ভার।

পাঁচজনে নেবে? সোমেনের সংসাবের ভার—

ওমা! নেবে না? নেওয়া উচিত না, পাঁচজনের জন্যেও—

পাঁচজনে যাতে শস্তায় চাল কিনতে পায়, সেই দাবি জানাতে গিয়ে মরেছে যখন নেওযা উচিত বইকি। ঘাড অগত্যা নাডতেই হয়।

আজই দেড়শো টাকা উঠেছে। সবাই মাসে কিছু কিছু দেবে বলেছে—

বটে!

মণিদিকে বলেছি আমিও পাঁচ টাকা করে—

অ্যাঁ!

ভয় নেই। সংসারখরচে হাত দেব না। আমার উপবি উপায় থেকে—

তার মানে সিনেমা দেখা মুলতুবি? চেযে চিন্তে আনা সিনেমা পত্রিকা পড়েই শুধু নিজেকে নায়িকা ভাবার সাধ মেটাতে হবে?

সোমেনেব কী ভাগ্যি।

পাঁচজনের জন্য ও বুক পেতে গুলি খেল, ওর সংসারের জন্যে পাঁচজনে বুক দিয়ে পড়বে না?

'সোমেনের কী ভাগ্যি!' বলে খোঁচা সুতরাং নিরর্থক। সোমেনের ভাগ্যে বুক টাটানো নিরর্থক।

তুমি যদি তোমার ভালবাসাকে সংসারের মধ্যে আটকে বাখো তোমার সংসারই শুধু—

আর তুমি যদি তোমার ভালোবাসাকে পাঁচজনের মধ্যে চাবিয়ে দাও—

দুইযে দুইযে চারের মত এই সহজ সরল শাদামাঠা ব্যাপাবটা শেষে বুঝতে হল বউয়েব কাছ থেকে! নেহাতই মামুলি বউটার কাছ থেকে।

রাতভর ছটফটানি ঝুটমুট! অফিস কামাই তবে ঝুটমুট!

এক গেলাস জল দাও না গো!

প্রাণনাথের সন্তাপ ও শান্তি

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

বড় দুঃখে দিন যায় প্রাণনাথের।

আচমকা তনুকা এসে হাজির। মুখেচোখে রাত্রিজাগরণের ছাপ স্পষ্ট। হাজার মাইল পথ কি নিমেষে পেরিয়ে আসা যায়? পথশ্রমের ক্লান্তি তাই দেহে-মনে সর্বত্র। নজড এড়ায় না। মুখের হাসিটুকু বজায় রেখেছে ঠিক। যা ছিল সেই সাত বছর আগে তনুকার একমাত্র সম্পদ। মুখ তো আয়না, মনের দর্পণ। মুখ দেখেই অনুমান করে নেওয়া যায়, মানুষটা কেমন। ভালো না মন্দ। ভেতরে ভেতবে ঘোর-প্যাঁচ যদিবা লুকিয়ে রেখে থাকে কোথাও, প্রাণের মানুষ তা ধরে ফেলে। নির্দ্বিধায় বলে দিতে পারে, কোথায় ঝড়, কিসের দ্বন্দ্ব, কী নিয়ে গোলমাল, জটিলতা।

'মুশকিলে ফেললি তো।'

চোখমুখ বিবর্ণ করে, চিন্তিত করে তোলে প্রাণনাথ। বোঝা যায়, এতকাল পরে তনুকার মুখোমুখি হতেই যত আপত্তি তার। কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য অস্বস্তি বোধ করে। অধিক রাত্রে গুরুভোজনের ফলে ঘুম না হলে যেমন হয়।

'মুশকিল আবার কিসেব?' ঝংকার দিয়ে ওঠে তনুকা। অভিমানে নীল হয়ে ওঠে। সে যেন কেঁদে ফেলবে এখুনি। বলে, 'আগে মাসে অন্তত একবার চিঠি লিখে খোঁজ-খবর নিতে। ছ'মাস তোমার কোন পাত্তা নেই। কেমন করে নিশ্চিন্ত থাকি বল তো?'

শুনে মায়া হবে কোথায়, তা না। আবো নিষ্ঠুর, আরো নিরাসক্তভঙ্গি এনে প্রায় গুরুর মত কথা বলে প্রাণনাথ, 'সেই পুরনো, পচা ন্যাকামি শুরু করলি তো? কেঁদে বশ করতে চাওয়ার মতলব?'

'কোনদিন তাই পেরেছি কি?' তনুকা যেন পাল্টা অভিযোগ জানায়।

'অ, পারিস নি বুঝি!'

হাল্কা, উদাস হতে চেয়ে আরো গম্ভীর, চিন্তিত হয়ে ওঠে। ক্রমশ মলিন, সুদূর। পুরনো কথা শুনিয়ে খোঁটা দিতে চায়। তার সমস্ত প্ল্যান এক ফুঁয়ে নস্যাৎ করে দিতে চায়।

'তুমিই বল না, কেঁদে-কেটে একটা জেদও কি বজায় রাখতে পেরেছি? একটা আবদারও কি মানিয়ে নিতে পেরেছি তোমাকে দিয়ে?'

যেন ঝগড়া করবে বলেই কোমর বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছে। পথশ্রম, রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তি কিছুই আর কাবু করে না মেয়েটাকে। দেখে বিরক্ত হয় না, খুশিও হয় না প্রাণনাথ। মনে মনে কৌতুক বোধ করার বদলে আফশোস হচ্ছে তার। সাত বছরেও তনুকার মন-মেজাজে ভাঙন ধরে না, সে মচকায় না আদৌ! এটা কেমন করে সম্ভব!

'কী তোর আবদার ছিল রে, তনুকা?'

'অশিক্ষিত গেঁয়ো মেয়েদের মত চিৎকার, চেঁচামেচি করি নি বলেই কি তুমি ধরে নিয়েছিলে আমার নিজস্ব কোনো রুচি নেই, চয়েস্ নেই? যেমন-তেমন বর জুটিয়ে দিয়ে ভাবলে আপদ চুকল, তাই না?'

'আমি তো আর সেভাবে তৈরি করতে চাই নি তোকে যে যখন খুশি ছোট-লোকের মত চুল-ছেঁড়া আবদার শুরু করবি। তাছাড়া ঠিক সময়ে বর জুটিয়ে দিতে না পারলে তুই যে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়তিস না হলফ করে সে কথাই বা কে বলবে? মনের জোর তো তখন ছিল না তোর।'

'বিয়ে যদি নাই করতাম কী হত? মহাভারত অশুদ্ধ হত? সৃষ্টির সমস্ত লীলা আমার মুখ চেয়ে থেমে যেত? ঘরসংসার ছাড়াও তো কত মেয়ে চাকরি করে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। তোমার মতে তারা বুঝি সবাই অসুখী, অসম্পূর্ণ?'

খাটের কিনারে বাজু ধরে তনুকা এবার শক্ত হয়ে বসে। বিচলিত হয়েছে বলে মনে হয় না। সব কথাই যে সাত বছর ধরে মনের মধ্যে উল্টেপাল্টে

গুছিয়ে নিতে হয়েছে, নিজেকে প্রাণনাথের সঙ্গে ষোল আনা পাল্লা দেবার জন্যে তৈরি করে নিতে হয়েছে সেটা বোঝা যায়। ভাব-সাব দেখেই অনুমান করে নেওয়া যায়, আজ আব সহজে হটে যাবার পাত্রী সে নয়। প্রাণনাথ অবশ্য দমে যাবার কারণ খুঁজে পায় না। বরং দুশ্চিন্তা বেড়ে যায় তার। বড় অভিমান ছিল, অন্তত তনুকা তার আদর্শকে কাজে লাগাবে, মনের মত হবে। মনে মনে তৃপ্তিব সীমা ছিল না তার, না হোক একটা মেয়েকে তো গড়ে-পিটে মানুষ করা গেছে। ঊষর, রুক্ষ সংসারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যেকোনদিন ভেঙে পড়ার, গুঁড়িয়ে যাবার আতঙ্কে মলিন হবে না। সোজা, শক্ত মেরুদাঁড়া নিয়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু নিজেকে শস্তা আবেগের বশে মিলিয়ে মিশিয়ে কিছুতেই নিশ্চিহ্ন করে দেবে না। আর সেই ভাবনা-চিন্তা আদর্শের মূলে কি ঘুণ ধরে গেছে তাহলে? পোকায় বাসা বেঁধেছে? তনুকার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সব কিছু না জেনে, না শুনে নিজেকে ধিক্কার দেওযা সমীচীন হবে কিনা ভাবে প্রাণনাথ। পুঁথিপড়া জ্ঞান তার চিরদিনের সম্বল। তাই বলে বাস্তববুদ্ধি কি এককণাও ছিল না কোনদিন?

'তোর কী হযেছে, তনুকা? এমন তো কখনো ছিলি না? আমাকে তুই ভাবিয়ে তুললি দেখছি।' অপলক চেয়ে থাকতে-থাকতে কত কথাই যে মনে পড়ে আজ। এমন বেপরোয়া কাঙালপনা তো ছিল না তনুকার। মুখ-চোখ কাঁচু-মাচু করে তোলে না। তবু তাকে বিচলিত মনে হয়। ভেতরে-ভেতরে নিজেকে শক্ত রাখার চেষ্টার বিরাম নেই। বলে, 'আমাকে বিযে করাব জন্যে তখন অমনভাবে পাগলামি শুরু না করলে তোকে কি আর পর করে দিই?'

'বিযে করো নি বলেই যে পর হযে গেছি কে বললে? ওপরে-ওপরে মালা বদল কবি নি, লোক-দেখানো মন্ত্রও পড়ি নি হয়তো। তাই বলে তোমার বউ হওয়া কে আটকায়? মনে-মনে আমি যে তোমারই। কদিন খবর মেলে নি তাই পাগল হয়ে গেছি। হাজার মাইল পথ দৌড়ে চলে এসেছি। বউ ছাড়া আর কে এতখানি ব্যাকুল হয় বল তো?'

'মৃণালকান্তির জন্যে তোর বুঝি কোনো টান নেই?'

'আছে বইকি।'

'তবুও আমাকে মনে রাখিস কী করে? সংসারে তোকে রান্না রেঁধে, কাপড় কেচে, বাসন মেজে কাটাতে হয় না বলেই বুঝি যা খুশি আবোল-তাবোল ভেবে দিন কাটাবি?'

'তোমাকে মনে রাখা কি আবোল-তাবোল ভাবা? কী বুদ্ধি!'

তনুকা আজ ঠাট্টা করে তাকে। মনের ঝাল মুখে মিটিয়ে হাল্কা হতে চায়।

প্রাণনাথ টের পায়, কী দুরূহ জটিলতার মধ্যে নিজেকে জড়াবার, জড়িয়ে সুখ পাবার অদম্য নেশা তার। ঝাড়া হাত-পা নিয়ে কেউ আর সংসারে থাকতে দেবে না তাকে! অবশ্য সবাইকে এড়িয়ে তনুকার মত একলা একজনকে নিয়ে টিকে থাকার পাগলামিও তার নেই। তাই বলে সেই বিশেষ একজনকে বাদ দিয়ে সংসারে আর সবাইকে নিয়ে বেঁচে থাকাব, সুখে থাকার ভাবনাটাও একজাতীয় হীনমন্যতা। আত্মকেন্দ্রিক ভেবে তনুকাকে অপমান করার, ছোট করার ইচ্ছেটাও যে ভেতরে ভেতরে খুব জোরালো হয়ে ওঠে তা নয়। কারণ, সে তো জানে, সাত বছর আগে সেই অদূর অতীতেও তনুকা ছিল কেমন। তার চেয়ে ভালো কে আর জানে তাকে?

'আমি কিন্তু তোকে ভুলে যেতে চেয়ে খুব যে অসুখী তা নয়, তনুকা।'

'তুমি যে চিরদিনের নিষ্ঠুর গো।'

'আসলে অল্প বয়সে ওপর-ওপর পেকে গিয়েছিলি তুই। ভেতরটাও কিন্তু শৈশব কাটিয়ে উঠতে পারে নি কখনো। এখনো কাঁচাই থেকে গেছিস। নইলে যা কাণ্ড শুরু করেছিলি সেদিন। যদি সত্যিই তোর পাগলামির পেছনে আমার ছিটেফোঁটা সায়ও থাকত, তাহলে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হত বল তো?'

'কী আর হত? পাকাপাকি আমি তোমার বউ হতাম। সাত বছরে অন্তত কয়েকটা ছেলে-মেয়ের মা হবার সুযোগ দিতে আমাকে। জানি তো, তুমি ভীরু নও, কাপুরুষ নও, অবিবেচক নও। আমার প্রয়োজনের দিকে তাকিয়েই একদিন যথাসময়ে বুড়িয়ে যেতে দিতে সাহায্য করতে তুমিই। ভালোবাসার নামে ন্যাকামি যে তামার অসহ্য আমি তা জানি। তাই বলে ভালোবাসতে হলে তোমার ওই জ্ঞানী তপস্বীর উচ্চাসন থেকে যে একটুও নিচে নেমে আসবে না তাই কি বিশ্বাস করে নেব আমি?'

'ওইখানেই তো গলদ।' প্রাণনাথের চোখে সেই পুরনো স্নেহের চাউনি ফুটে ওঠে। মুখে অমায়িক হাসি টেনে বলে, 'ভালোবাসা তোর কাছে অরুচির মুখে টক হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে এখনো অখাদ্য। হৃদয়-ঘিদয় নিয়ে যারা কারবার চালাবার চেষ্টা করে কী লাভ হয় তাদের জানিনে। আমি তো দেখি বড় রকমের উল্লেখযোগ্য লোকসান ঘটানো অবধি মুশকিল। তাহলে কী দরকার, বাজে ফালতু সময় নষ্ট করে?'

'আমাকে বিয়ে করে গোল্লায় যেতে বুঝি তুমি?' অভিমানে চোখের কোণে জল জমে ওঠে তনুকার। সে যেন আঘাত পেয়েছে খুব। সাত বছর পরে এসে সে যেন সেইরকম স্নেহ-প্রীতি ভালোবাসাই কামনা করেছিল যা সে আজীবন চেয়ে এসেছে, আমরণ চায়। তা না, চরম আঘাত করার জন্যে তৈরি হতে থাকে প্রাণনাথ। তাকে সেই আঘাত সইয়ে নেবার জন্যে উপযুক্ত সময় দিতে নারাজ।

'তোকে বিয়ে করলেই কি ভালোবাসতে পারতাম? আর ভালোবাসা না পেলে তুই-ই কি সুখী হতিস কখনো? আমি তো জানি, চিরদিন তুই কিসের কাঙাল। কিন্তু সেটা যে সর্বৈব মিথ্যে সেকথা মন খুলে আলোচনা করে কে বোঝায় তোকে? বরং বোঝাতে গেলেই ভুল বুঝবি। হয়তো বিষ-টিষ খেয়ে বিয়ের চেয়েও আরেকটা কেলেংকারি করে বসতিস। তাই বিয়ে দিয়েই তোকে আসল ব্যাপারটা বোঝানো বরং সহজ মনে হয়েছে আমার।'

'তা তো বটেই। তেষ্টায় বুক শুকিয়ে কাঠ। তুমি তাই নর্দমার জল এনে দিলে। এখন আমি তা খাই বা না খাই।' ক্ষেপে গেলে তনুকার নাকের ডগা কাঁপতে থাকে। সারা মুখে সিঁদুর ছড়িয়ে যায়। দেখে হাসি পায় প্রাণনাথের। তনুকা আরো অবুঝ হয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। জন্ম থেকে অতিরিক্ত আদর আর অশিক্ষার জন্যই কি এমন অবুঝ আর অশান্ত হয় না মেয়েরা? মাথার ভেতরে অসংখ্য চিন্তার ঘোরা-ফেরা শুরু হয়। ইচ্ছে হলেও এখন আর পুরনো কায়দায় ধমকে, কাঁদিয়ে শান্ত, শায়েস্তা করার লোভ সংবরণ করে নিতে হয়। ভোলা কি যায়, তনুকা আজ পরের ঘরের বউ? থাক না কেন এখনো তার বাধ্য, অনুগত, অনুরক্ত।

সহসা গম্ভীর হয়ে যায় প্রাণনাথ। আদেশের সুরে বলে, 'কী বিশ্রী রকমের

পাল্টে গেছিস, তনুকা। আগে আমাকে মান্য করতিস। সব কথাই কান পেতে শুনবার আগ্রহ ছিল তখন। এত অল্প সময়ে এমন অধৈর্য, এমন বাচাল হয়ে গেলি। সংসারে তো ঝামেলা নেই তোর! তবে কি মৃণালকান্তি তোকে অবহেলা দেখিয়ে কম কথা বলাবার চেষ্টা করে সব সময়? আমার চেয়েও তার শাসন বুঝি আরো কড়া?'

'শাসন! ওই ভেজা-ভাত-মার্কা লোকটার কাছ থেকে শাসনের আশা করব আমি?' ভুরু কুঁচকে, চোখ ছোট করে কেমন তেরচা, বাঁকা, কুটিল চাউনি ফুটিয়ে তোলে তনুকা। সর্বাঙ্গে ঘৃণা আর অস্বাচ্ছন্দ্যই প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

চোখ ফেরাতে পারে না প্রাণনাথ। আগে নির্জীব ছিল মেয়েটা। এখন মনটাই রোগা হয়ে গেছে। স্বাস্থ্যের গরবে দেহ ফিরে পেয়েছে। মনটা যে তলিয়ে গেছে কোথায়। ভেতরে অন্ধকার ঘন হয়ে জমাট বেঁধে আছে।

'এখুনি শেষ হবে না। তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে, তনুকা। কবে যাবি?'

উঠে দাঁড়ায় প্রাণনাথ। এখনো তার জুটো ট্যুইশানি বাকি। ট্যুইশানি সেরে, বাজার করে ফিরতে হবে তাকে। বাড়িতে তার পথ চেয়ে থাকে সবাই। সে ফিরে না এলে মুখে ভাত রোচে না কারো। ভাত নামিয়ে উনোনে কয়লা চাপিয়ে বিনতা বাইরে যায়।

শোবার ঘরে তনুকা তখনো বসে। তার চোখে জল দেখে বিনতা অবাক হয় না। টুকিটাকি কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। একবার কাছে এসে বলে, ঠাকুরপো, কথায় রাগ করতে নেই। তুমি তো আজ নতুন দেখছ না ওকে।'

বিনতার কথায় জ্বালা নেই। শ্লেষও নেই। বরং মমতায় স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে সে। প্রিয়নাথ বেঁচে থাকতেও তাকে দেখেছে তনুকা। কিন্তু আজকের মত এমন করে এতখানি ঘনিষ্ঠভাবে দেখে নি। তখন তার কাজ ছিল শুধু প্রাণনাথের সঙ্গেই। বই পড়ে ফেরত দিয়ে গেছে। বসবার ঘরেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা থেকে তর্ক করে উঠে গেছে। বাড়িতে যে আরো মানুষ আছে সে খেয়াল কখনো হয় নি। একবার উঁকি মেরে দেখার ইচ্ছে হয় নি,

আলাপ করার সাধ জাগে নি তনুকার। আজ মনে হয়, প্রাণনাথের চেয়ে বিনতাই যেন অনেকখানি আপনার। বিনতা ছাড়া আর কেউ তার অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারে না।

'তোমার হাতে সময় আছে কি, বৌদি?'

'সব সময়ই আমার সময় ভাই। কাজ করতে-করতেও আমি গল্প করতে পারি। কিন্তু আমার সঙ্গে গল্প করে মন উঠবে তোমার?'

বিনতা কি অনেক দিনের চেপে রাখা অভিমানের কথাটাই সুযোগ পেয়ে বেফাঁস করে দেয়? আসলে তাকে এড়িয়ে প্রাণনাথের সঙ্গে দহরম-মহরমের ব্যাপারটাই কি অসহ্য ঠেকেছে এতদিন? তনুকা ভড়কে গিয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকে খানিক। শেষে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'খুব উঠবে। নিছক কথার কচকচি কাঁহাতক ভালো লাগে মানুষের। আমি কি হাজার মাইল পথ ভেঙে এসেছি কেবল ঝগড়া করার তাগিদে?'

'কেমন করে বুঝব? এসে অবধি যে তর্কই করছ। তর্ক না জানলেও বাড়িতে যে কথা বলার, আলাপ করার মানুষ আছে সে খেয়াল কি আছে?'

'তোমাদের বুঝি তর্ক হয় না কখনো?'

'কেমন করে হবে? ততখানি সময় আর সুযোগ পেলে তো।'

মাস দেড়েক বাদে একদিন তনুকার খোঁজ পড়ে। একা থাকার যন্ত্রণা যে অসহ্য হয়ে উঠেছে চিঠিতে তেমন আভাস কোথাও নেই। নিছক স্বামী হিসেবেই যেন স্ত্রীর অনুসন্ধান কর্তব্য মনে হয়েছে মৃণালকান্তির। সে হয়তো জানে না তনুকা তার কাছেই আসতে পারে। পালিয়ে আর কোথাও যাবার সাহস তার নেই।

'ঝগড়া করে পালিয়ে এসেছিস?'

চিঠিখানা তনুকার হাতে তুলে দিয়ে প্রাণনাথ খেতে বসে। ভুষি-মেশানো আটার রুটি আর আলু-কুমড়োর ঘ্যাঁট। সোনার দামে জল-মেশানো দুধ রাখা হয় একপো। বিনতা আর সে ভাগাভাগি করে নেয়। তনুকার জন্যে আরো খানিকটা জল ঢেলে পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে বিনতা। শাদা জিনিস, ভালো জিনিস কি একলা খেতে আছে কখনো।

বিনতা যেন তনুকার হয়ে ওকালতি করে।

'পালিয়ে আসবে কেন ? না বলে চলে এসেছে।'

'তাই দেড মাসের মধ্যে তাকে এই খবরটা জানাবার গরজ পড়ে নি তোর ? তুই কি ভাবিস, মৃণালকান্তি সহজে ছেড়ে দেবে কখনো ?'

তনুকা আজ তর্ক করতে ভুলে যায়। রুটি চিবোতে-চিবোতে হাসে। কেমন শান্ত, নিস্তেজ হযে গেছে মেয়েটা। অনুশোচনায দগ্ধ হচ্ছে কি তবে ? হওযাই তো স্বাভাবিক। সাত বছব এক নাগাডে যে মানুষটির ঘর করছে দেড মাসের অদর্শনে তার জন্যে মন পোড়ে বৈকি। এখন হয়তো লজ্জায় বলতে পারবে না কথাটা।

মনে মনে তৃপ্তি বোধ করে প্রাণনাথ। আত্মবিশ্বাস জোরালো হযে ওঠে। তার শিক্ষা তো স্রেফ ভাবালুতায় ঠাসা নয় যে ভালো লাগল না বলেই ঘরের মানুষ বনবাসী হবে, লডাই করতে পেছপা হবে কখনো। মাঝে মাঝে বিভ্রান্তি ঘটে বৈকি। মুনিবও মতিভ্রম হয়। ওইটে স্বাভাবিক। কী ভাবে টিকে আছে মানুষ। যুক্তি-তর্কেব পথ ছেড়ে আবেগের বশে বল্গা-ছাডা হযে ছুটে বেডাচ্ছে কেমন। অবস্থার তাপে আর চাপে মাথা যে তবু বিগডে যায় নি সেইটেই আশ্চর্য।

'কতদিন হয়ে গেল এসেছিস। তবু কিছুই বললি নে আমায়। তোর কিসের অভাব, তনুকা ? অমন হুট্ করে চলে আসার দরকার ছিল কি। তেমন অবস্থা দেখলে আমিই তোকে ক'দিনের জন্যে নিয়ে আসতাম। মৃণালকান্তিও হাসিমুখেই ছেড়ে দিত তোকে।' খাওযা থামিযে কথা বলতে শুরু করলে বিনতা আর তনুকাও খেতে ভুলে যায়। বিনতা উশখুশ করছে টের পায। তনুকার হয়ে সে হযতো আরো কিছু বলতে চায়। কিন্তু প্রাণনাথের ইচ্ছে নয় আবোল-তাবোল কথা দিযে আসল প্রসঙ্গটাই চেপে যাবার। ববং সে সচেতন হযে ওঠে আরো। বলে, 'না, ওর হযে তুমি কিছু বলতে চেও না। তনুকা তো ছোট নেই আর। ওকেই ওর কথা ভাবতে দাও প্রাণ খুলে।'

তারপর তনুকার দিকে চেযে বলে, 'আজ তোর সব কথাই শুনতে চাই, তনুকা। জানি, মিথ্যে কথা তোর ধাতে নেই। তাই বলে কিছু গোপন রেখেও নিজেকে অযথা কষ্ট দিবি কেন ? আমি তো তোকে মেরুদণ্ডহীন,

পঙ্গু একটা জরদ্গব বানাতে চাই নি· কোনদিন। তাহলে তুই কেন এত সহজে ভেঙে পড়বি, মিইয়ে যাবি বল ?'

বিনতা সাড়া দেয়। না দিয়ে পারে না বলেই দেয়। বলে, 'চুপ করে থাকতে পারলাম না বলে মাফ চাইছি। তনুকার হয়ে আমাকে দুটো কথা বলতে দাও। ধরে নাও কথাটা একা তনুকারই নয়, হয়তো আমারও।'

দম ফুরিয়ে গেলে বিনতা খানিক থামে। সেই ফাঁকে প্রাণনাথ তাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে। বিনতার চোখেমুখে চাপা অভিমান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। টের পায় যত সুখেই থাক, নিছক খাওয়া-পরার সুখই তো। তাছাড়া স্বাধীনতা কোথায় তার ? একসঙ্গে থাকার দায়ে নিজের সাধ-আহ্লাদের এক কণাও কি বিসর্জন দিতে হয় নি তাকে ?

'তোমার কথা আমার জানা। না শুনেও আমি তার জবাব দিতে পারি।' গুরুগম্ভীর প্রাণনাথ যেন জবাব দিয়ে যায়। বলে, 'তোমার আর তনুকার ব্যাপার ঠিক এক নয়। দুজনের দুরকম সমস্যা, দুরকম রোগ।'

'জানো তাহলে ?'

বিনতা ঝাঁঝের সঙ্গে কথা বলে। ভেতরে-ভেতরে সে যে খুব অস্বস্তি বোধ করছে, হাটে হাঁড়ি ভাঙার ভয়ে কাবু হয়ে পড়েছে তা বোঝার উপায় নেই। বরং আরো অবিচল, কঠিন মনে হয় তাকে।

'অথচ জেনে-শুনে দিব্যি চুপ করে আছ তো ? কেমন মানুষ তুমি বুঝিনে।' ফোঁস করে যেন বুকের সবখানি দূষিত বাতাস বার করে দেয় বিনতা। তাকে আগের চেয়ে ঠাণ্ডা, শীতল মনে হয়। কিন্তু তনুকার মত অতখানি নির্জীব সে নয়।

'চুপ করে থাকতে হয়। চারদিক ভেবে কাজ করতে হয় আমাকে। নইলে এতদিন এক ঘরে বাস করে আমি কি আর বুঝিনে, নিজেকে নিয়ে অহরহ কী কষ্ট পেতে হচ্ছে তোমাকে। লোকনিন্দার ভয়ে নয়। আসলে আমার স্বভাবে ভালোবাসা বলতে বস্তু নেই। প্রেম আমার ধাতে সয় না। আমি কর্তব্য করে যেতেই সুখ পাই। কর্তব্যের বাইরে সব কিছুই বাহুল্য মনে হয় আমার।'

'তোমার ধাতে প্রেম না থাক, আর কেউ ভালোবাসতে চাইলেও তাকে ঠেকিয়ে রাখবে কোন্ অপরাধে ?'

'অপরাধের কথা নয়। ন্যায়-অন্যায বিচারের আগে আমাকে আগুপিছু অনেক কথা ভেবে নিতে হয়। নইলে কলেজে থাকতে তুমি দাদারও বন্ধু ছিলে, আমারও। তোমাকে ভুল বুঝে দাদা আত্মহত্যা করল।'

'থাক, আর তোমাকে বলতে হবে না।'

বিনতা বুঝি লজ্জায আরক্ত হযে ওঠে। তনুকার কাছে অমন খোলাখুলি আলোচনা অবাক মনে হয় তার। সে তাই খাওয়া ফেলে পালিযে যেতে চায়।

প্রাণনাথ বাধা দিযে বলে, 'থাকবে কেন? শোনো। তোমাদের দুজনেরই শোনা দরকার। আমার সঙ্গে জীবন জড়িয়ে তনুকা ভেবেছিল সুখী হবে। তাছাড়া আর কাউকে ভালোবাসতে পারবে না ও। আর তুমি চাইলে দাদার ওপর প্রতিশোধ নিয়ে আমাকেই দেহ-মন বিলিয়ে দিতে। আমার কাছে দুটোই পাগলামি।'

অফিস থেকে সোজা বাড়ি ফেরে না প্রাণনাথ। রত্নার কাছে যেতে হয়।

সুকান্ত তাকে ডেকে বসায়।

অথচ অফিসে হাজারবার তার ঘরে আসা-যাওয়া। মাথা তুলে একবার অকাজের কথা বলার গরজ দেখায না সুকান্ত। মা-মরা কালো, কুৎসিত মেযেটাকে খাতির করে জেনে-ও না। আব এখন বাড়ি বয়ে রত্নার খবর নিতে এসেছে বলেই কি এত আদর? প্রাণনাথ জানে, রত্না ছাড়া সংসারে দ্বিতীয বন্ধন নেই সুকান্তব। আজ কিন্তু সে হা-হুতাশ শুরু করে। রত্না সম্পর্কে তার দুশ্চিন্তার খাঁটি খবরটুকু জানিযে কিছুটা হাল্কা হতে চায।

সুকান্ত বলে, 'তোমাদের ইউনিয়নেব তরফ থেকে স্ট্রাইকের নোটিশ দিয়েছে। কিন্তু আমার সঙ্গে একটা আলোচনার দরকার মনে কবে না তারা। বড় বিশ্রী লাগে ভাবতে, যখন দেখি তোমার মত মানুষকেও ওরা কথার মারপ্যাচে ঘায়েল করে।'

প্রাণনাথ মনে-মনে নিশ্চিন্ত হয়, সুকান্ত তাদের ইউনিয়নেব সংঘবদ্ধ রূপটা দেখেই ঘাবড়ে গিয়ে এত কথা বলে। সে কিন্তু অন্য কথা পাড়ে। একেবাবে ঘরোয়া প্রশ্নে চলে যায়। বলে, 'রত্নার সঙ্গে আমার বড দরকাব। শরীর খারাপ শুনেও আসতে পারি নি কদিন। আজ সময় পেযে ভাবলাম দেখে যাই। ও কোথায়?'

সুকান্ত দমে যায়। আবেগের ঝোঁকে যে কথাগুলি বলতে চেয়েছিল প্রাণনাথের নিরুৎসাহ দেখে সেই কথাগুলিই তার মগজে হাতুড়ির ঘা মারে। তার অফিসে আর পাঁচটা সাধারণ কর্মচারীর বাইরে বিশেষ কোন মর্যাদা দিয়ে পেয়ার করার কথাই ওঠে না। তবু আর পাঁচটা লেখাপড়া জানা মানুষের চেয়ে বেশি বোঝে, বেশি জানে ভেবেই রত্নার পড়াশোনার ব্যাপারে তাকেই নির্বাচন করে। তলে-তলে তার সঙ্গে শত্রুতা করছে জেনেও করে সুকান্ত। আসল উদ্দেশ্য যে তাকে ইউনিয়ন থেকে সরিয়ে একটা আস্ত গবেট দালালে পরিণত করা প্রাণনাথ তা টের পায়। পনেরো মিনিট আলাপের পরেই সে তাগিদ বোধ করে উঠে যাবার। মনে-মনে বোঝাপড়া হয়ে যায়, তারা কেউ কারো কথা শুনে সমস্ত দায়-দাবির ঝামেলা মিটিয়ে নিতে নারাজ। আন্দোলন ছাড়া পথ নেই। আজ কিনা আলাপ-আলোচনার সমস্ত কথাই বেমালুম চেপে গিয়ে আফশোস করে সুকান্ত।

রত্না বলেছিল, 'বাবার টাকা হাত পেতে নিতে ঘেন্না হয় নাকি? আপিসে হয় না কেন তবে?'

'ওখানে তোমার বাবাও যে চাকর। শুধু তাঁকে কিছু আলাদা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নইলে একটা চাপরাশির সঙ্গে কোনো তফাত নেই।'

কথা শুনে থ বনে যায় রত্না। রাগে-অপমানে সমস্ত ভাবনা-চিন্তা গুলিয়ে ফেলে যেন। প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় ঝাঁঝ মিশিয়ে বলে, 'বাবা আপনার এই সব কথা শুনলে কী করবেন জানেন?'

'কিছুই করবেন না। কারণ করার কিছু নেই। হয়তো মনে-মনে আমাকে দেখে জ্বলবেন খানিকটা।'

বেশ নির্বিকারভাবে বলে যায় প্রাণনাথ। তার যেন ভয় নেই, চাকরির মায়া নেই।

তবু কিন্তু কালো, কুৎসিত মেয়েটার দায় তার ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায় সুকান্ত। গরজ বড় বালাই। রোজ আসবে না? মাঝে মাঝে তো আসতে হবেই তাকে? ওইটুকুতেই চলে যাবে। বুদ্ধি খাটিয়ে, মাথা খেলিয়ে ওইটুকুতেই তাকে ক্ষয় করে ইউনিয়নের ভেতরে ভাঙন ধরিয়ে দিতে কতক্ষণ! এই মাথাটার দৌলতেই তো একদিনের ডেসপ্যাচ ক্লার্ক সুকান্ত আজ নৈবেদ্যের কলার মত সকলের ওপরে উঠে বসতে পেরেছে। লোকে তাকে হিংসা

করে। সে ভাবে এই দুর্দিনে কেমন করে চাকরিটা বজায় রাখা যায়। ওপরওয়ালার সুনজরে থাকা যায়।

'টাকা নেবে না? কেন? টাকার দরকার নেই তোমার?'

'টাকা ছাড়া কি চলে?'

'তাহলে?'

সুকান্ত অবাক হয়। বিরক্ত হতে চেয়ে পারে না। আসলে ভেতরে ভেতরে সে হয়তো ভয়ানক ভীরু। অফিসে যার সবাইকে ধমকে দাবিয়ে রাখা স্বভাব, ঘরে ফিরে সেই অফিসের অধীনস্থ লোকের সামনেই এমন করে ঘাবড়ে যেতে হবে তেমন ধারণা যেন ছিল না তার। সে তাই রেগে না গিয়ে প্রায় তোয়াজের সুরে কথা বলে।

'আর কারো ওপরে ভরসা হয় না। শত হোক মেয়ে তো। তাকে পড়াবার জন্যে একটা ভালো মানুষ দরকার।'

তবু যা হোক, তাকেই ভালো মানুষ ঠাউরেছে সুকান্ত। তাকে বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত হতে চায়। ভেতরে ভেতরে হাসি পেলেও প্রাণনাথ যথাসম্ভব গম্ভীর হবার চেষ্টাই করে। বলে, 'কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম মেনে আসা-যাওয়া আমার পক্ষে পোষাবে না। মাঝে-মাঝে আসব, দেখিয়ে দিয়ে যাব—ব্যস। তাছাড়া রত্না তো নিজেই পড়বে। ওষুধ নয় যে আমি গিলিয়ে দিয়ে যাব।'

•

আজ তাকে বসতে হয়।

উপায় কী? ভেতরে দিদিমণি এসেছেন গান শেখাতে।

বসে থাকতে-থাকতে গানের নামে রত্নার প্রাণপণ চিৎকার শুনে কেমন মায়া হয়। বুকের ভেতরে অকারণে জ্বলতে থাকে প্রাণনাথের। বড়লোকের আদুরে মেয়ে হয়েও বুঝি নিস্তার নেই। বিয়ের জন্যে তাকেও তৈরি থাকতে হয়। পরীক্ষার আতঙ্কে তটস্থ হতে হয়। বাপ লাখ টাকার মালিক হলেও চলে না। কালো, কুৎসিত মেয়ের জ্বালা যে অনেক। অথচ রত্নার মুখে জ্বালা-যন্ত্রণার কালো ছাপ নেই। আক্ষেপের একটি কথাও সে শোনায় নি কোনদিন। তনুকার চেয়ে বয়স কত অল্প। তবু ধৈর্যের পরীক্ষায় রত্নাকেই বুঝি বেশি নম্বর দিতে হয়। লড়াই করার এমন অদম্য শক্তি যদি তনুকার থাকত! অথচ তাকে কত ভাবেই না তালিম দিয়েছে প্রাণনাথ।

'অনেকক্ষণ বসে আছেন তো?'

রত্না হাসে না। গম্ভীর মুখে একরাশ উদ্বেগ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়।

প্রাণনাথ তাকে দেখে একটুও বিচলিত হয় না। একটা বিলিতি ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে যেন আপন মনে বলে যায়, 'অনেক কথাই মনে মনে আউড়ে এসেছিলাম। এখন তোমাকে দেখে বলার উৎসাহ আর পাচ্ছিনে, রত্না। গান শেখার নামে যে-ধরনের ব্যায়াম করতে হচ্ছে তোমাকে, তারপরেও কি আলাপ করার, কথা বলার শক্তি পাবে? আমি বরং যাই। সময় বুঝে আবার আসা যাবে। তুমি বিশ্রাম কর।'

রত্না তাকে বাধা দিয়ে ফেরাতে পারবে না জেনেই চুপ করে থাকা সমীচীন বোধ করে। কেবল তনুকার প্রসঙ্গ তুলে খানিক দাঁড় করিয়ে রেখে তাকে এমন করে অকারণ প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ নিতে যেন ভোলে না।

'আপনার সময় হবে না জেনেই তনুকাকে বলেছি। ও-ই আমাকে প্রাণ দিয়ে শেখাতে পারবে সব। সমবয়সী, তার ওপরে মেয়ে। আপনার চেয়ে ওই আমার দুঃখ বুঝবে ভালো। আপনার মত কাঠখোট্টা তো নয়। মগজে একরাশ যুক্তির বাণ্ডিল বয়ে বেড়াতে গেলে ওর চলবে না, আমারও চলবে না।'

কথা শুনে আহত হয় না মোটেই। চাকরি-চাকরি করে প্রায় পাগল করে তুলেছিল তনুকা। আপাতত মৃণালকান্তির কাছে যাবার একদম গরজ নেই দেখে সে-ই আসলে সুকান্তর সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে ঠিক-ঠাক করে। রত্নাকে জানিয়ে করতে গেলে প্রবল বাধা আসতে পাবে জেনেই করে। সেই রত্না কিনা তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছে। মাস-মাইনের বিনিময়ে তনুকার বন্ধুতা কিনে নিয়েছে। সমবয়সী বলে তনুকাও তাকে রেয়াত করে নি! টাকাপয়সার হিশেবটা চুকিয়ে নিয়েছে আগে। বোকা কি কেবল সে একা? পয়সা চেনে না? না, চিনতে চায় না নিজের মান যাবার ভয়ে? মান নিয়ে তো তেমন মাথাব্যথা নেই তার।

কে জানে, কী ভাবে তনুকা।

রত্না কোন্ চোখে দেখে তাকে!

অফিসে সে তার বাপের শত্রুপক্ষের নেতা? বাড়িতে তার নিজের

পরম আপন ভাবে কেমন করে? তাই সেও আজ তাকে প্রত্যাখ্যানের কথাটাই সগর্বে ঘোষণা করে শান্তি পায় হয়তো। না জানি কতদিন ধরে এই সাহসটুকুই সঞ্চয় করতে হয়েছে তাকে! মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে আজ আবার করুণা জাগে। প্রাণনাথ বলে, 'আমার অনেকগুলি টাকার দরকার। তোমাকে এত দীর্ঘদিন ধরে যত বিদ্যা দান করেছি, তার বাবদ কিছু দক্ষিণাও যদি দিতে আজ।'

'কত টাকা চাই?'

'একটা প্রাণের দাম কত, রত্না?'

'লাখ টাকা তো বলে লোকে।'

'কথাটা ভুল বলে। আরো অনেক টাকা যার হিশেব তোমার জানা নেই। আমি সেই লাখ টাকার চেয়ে দামী একটা প্রাণই যদি চেয়ে বসি দেবে? ধর যদি তোমাকেই চাই?'

ইউনিয়নের কর্মীদের ভেতরে অসন্তোষ দেখা দেয়। অফিসে গুঞ্জন ওঠে এই নিয়ে। টাকার জন্যে শেষ পর্যন্ত সুকান্তর কাছে ধর্ণা দিয়েছে প্রাণনাথ! তার মেয়েকেই বিয়ে করে তারই বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে! কেমন খাপছাড়া, উদ্ভট মনে হয় সকলের।

তাই কি হয়। আসলে ভেতরে-ভেতরে ব্যাপারটা গড়িয়েছিল অনেকদূর। এখন উপায়ান্তর নেই দেখে এমন একটা হঠকারী সিদ্ধান্তই মেনে নিতে হয়েছে তাকে। কে জানে তাকে কব্জা করতে চেয়ে কত রকমের ফন্দি-ফিকির আঁটছিল সুকান্ত? শেষে নিজে সরে গিয়ে কালো-কুৎসিত মেয়েটাকে দিয়েই তাকে ঘায়েল করে! ইউনিয়ন কি আর টিকবে? তাদের স্বাভাবিক সঙ্গত দাবিগুলিই আর সহজে মেনে নেবে মালিক? ফাঁকি দিয়ে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিজের কাজই কি তবে এতদিন হাসিল করে নিয়েছে প্রাণনাথ? একেবারে পাকাপাকিভাবে নিজের জন্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত?

ছুটির পরে ইউনিয়নের ঘরোয়া মিটিং ডাকা হয়। আশ্চর্য হয়ে প্রাণনাথ ভাবে, এখনো তাকে সরিয়ে দেওয়া হয় নি। নিজে থেকেও সরে আসে নি সে। অথচ তার সঙ্গে আলোচনা না করেই নবকুমার মিটিং ডেকে বসে! প্রাণনাথ ঠিক করে মিটিঙে সে যাবে। একজন সাধারণ সভ্যের মতই আজকের আলোচনায় যোগ দেবে। তাই নবকুমারের দস্তখত-করা ইউনিয়নের

নোটিশটা সে যত্নসহকারে পকেটে রেখে দেয়। যেন প্রাণনাথের বিরুদ্ধে প্রাণনাথেরই অভিযোগের অন্ত নেই। মুখে-চোখে একটা খুশির ভাব এনে সে একবার বাইরে যায়। দেখে মনে হয় না, ভেতরে-ভেতরে তুমুল আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে তার। জোট পাকিয়ে এতটুকু কাবু করাও যাবে তাকে!

রত্না বলে, 'ঘর মন্দ পর ভালো করে কি শেষ পর্যন্ত সুখী হওয়া যায়?'

'তোমাকে তো বলেছি টাকার জন্যে তোমাকে বিয়ে করছি আমি।' প্রাণনাথ যেন তার কথার প্রতিবাদ করে। বলে, 'কালো-কুচ্ছিৎ বলে যে তোমাকে ঘেন্না করি, তা ভেবো না। তোমার বাবার সঙ্গে আমাদের আদর্শগত লড়াই হয়তো তোমাকে বিয়ে করার পরেও চালিয়ে যেতে হবে। তাই বলে নিজের স্ত্রীকে অবহেলা করব তেমন অমানুষও আমি নই।'

'বুঝলাম, ভালোবাসা তোমার ধাত নয়।'

'সত্যিই নয়। কিন্তু ইট-কাঠ-পাথরও আমি নই। কারণ ক্ষুধা তৃষ্ণার বোধ আমারও আছে। আঘাত পেলে এখনো কষ্ট হয়। ভালোবাসা যখন কর্তব্য মনে হবে তখন হয়তো ভালোবাসব। সেই ভালোবাসার ভেতরে বাড়াবাড়ি থাকবে না কোথাও। আসল কথা কি জানো, প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে আজ পর্যন্ত মানুষ এত বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করেছে যে তার ভেতরে সার পদার্থ খুঁজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। জীবনটাই যেন মাথা বাদ দিয়ে নিছক হৃদয়চর্চা করতে গিয়ে থকে গেছে।'

'কথাগুলি তুমি বিশ্বাস করো তো?'

'করি বলেই তো তোমাকে বিয়ে করতে চাইছি। তোমার সঙ্গে পয়সার প্রয়োজনটাও বোধ করছি জরুরি। মাথার ওপরে মামলা ঝুলছে। এতগুলি মানুষের রুটি-রুজির প্রশ্ন জড়িয়ে আছে আমাদের আন্দোলনের সঙ্গে। তোমার বাবাকে তো জানি। সোজা কথায় বাঁকানো যাবে না তাঁকে। তাই নিজেই বাঁকা পথ ধরেছি। তোমাকে জেনেছি বলেই এই চালাকিটুকুর আশ্রয় নিতে কসুর করি নি।'

'আমিও যদি চালাকি করেই বাবার সঙ্গে যোগ দিই?' ভেতরে-ভেতরে নিজেকে কঠিন করে তোলে রত্না। মেয়ে হয়ে বাপের নিন্দে সহ্য করতে হয় শুকনো প্রেমের তাগিদে। সেই প্রেমে যখন কর্তব্যের প্রেরণা ছাড়া

প্রাণের টান হয় গৌণ, প্রায় অবান্তর, অপ্রয়োজনীয়—তখন স্বাভাবিকভাবেই মনটা বিদ্রোহ করে ওঠে। রত্না কাঁদে না। জন্মের পরে প্রায় জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের শুরু থেকে বাস্তবের সঙ্গে এমন মেশামেশি-ঘেঁষাঘেঁষি সম্পর্ক তার যে, মানুষের ব্যবহারে রূঢ়তা-নিষ্ঠুরতার অসংখ্য প্রকাশ দেখেও বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করে না। বরং তেমন মানুষের সঙ্গে গেলেই নিজেকে স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ বোধ করে সে। বোঝাপড়ার সুযোগ পেয়ে মনে মনে দৃঢ়, সংযত হয়ে ওঠে। তর্ক করার লোক পেয়ে তার তার্কিক মনটাই মুহূর্তে চাঙ্গা হয়েও ওঠে। মানইজ্জৎ বাঁচিয়ে হৃদয় এবং যুক্তি দিয়ে গড়া তার বহুদিন ধরে বহু যত্নে লালিত ভালোবাসার ইচ্ছা এবং বোধগুলিকেই সচেতনভাবে টিকিয়ে রাখার প্রেরণায় আরো দ্বিগুণ উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

এতখানি সাহস কোথায় পাবে তনুকা? স্বাধীন চিন্তা নিয়ে তো তাকে বড় হতে দেয় নি প্রাণনাথ। বরং সে যেন নিজের যুক্তিতর্কের খাঁটিত্ব প্রমাণ করতে চেয়েই তনুকা নামের সেই সবল, সতেজ এবং সম্ভাবনাময় বৃক্ষের মূলে জল আর সার দিয়ে এসেছে এতকাল। অতিরিক্ত জলের সংস্পর্শে সে হয়তো অনিয়মিতভাবে অকালে আগাছার মতই বেড়েছে, কিন্তু নিজের দেহ থেকে উপরন্তু মস্তিষ্ক থেকে সংসারের নিকৃষ্টতম মানুষটিরও যে সৃজন ক্ষমতা থাকে, তলে-তলে নিজের অজান্তেই হয়তো সেই অসীম, উপাদেয় ক্ষমতাই গোপনে অপহরণ করেছে সে নিজে। আজ তাই মায়া হয়, দুঃখ হয় তনুকার জন্যে। অপরাধবোধের সূক্ষ্ম অথচ তীব্র যন্ত্রণায় ভেতরে-ভেতরে রক্তাক্ত, বিক্ষত হতে থাকে প্রাণনাথ। নিজেকে বাস্তবিক অসফল অযোগ্য মনে হয় তার। রত্না কেন? জগতে কোনো মেয়েকেই বিয়ে করার অধিকার তার নেই। কোনো মেয়েরই উচিত নয় তাকে বিয়ে করা। ভুল করে, দয়া দেখিয়েও নয়।

'তোমার স্বাধীন মতামতের মূল্য তুমি পাবে বৈকি, রত্না। বাপের টাকায় বড় হয়েছ তুমি। কিন্তু মনটা গড়ে উঠেছে বাইরের আবহাওয়ায়। নিজের সম্পর্কে এবং অপরের সম্পর্কেও তুমি যে নিষ্ঠুর হতে পারো আমি তা জানি। যেকোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হলে অপরের সাহায্য ছাড়াই নিতে পারো সে বিশ্বাস আমার আছে। মনে-মনে এতখানি শক্তি রাখো বলেই তো

শ্রদ্ধা করি তোমাকে। সাহস করে বিয়ের কথাও পাড়তে পারি। কারণ, জানি বিযেব কথা শুনেই ন্যাকা মেয়ের মত গলে পড়বে না তুমি। বিচার করে দেখবে আমি তোমার উপযুক্ত কিনা। যে জন্যে টাকা চাই সেই চাওয়াটাই বা কতদূর সঙ্গত।'

'তা হলে ধরে নাও আমি বাবার দলে।'

'হলেই বা। বিয়ের ব্যাপারে তাতে বাধা কোথায়? স্ত্রী হিসেবেও তোমার একটা আলাদা নীতি থাকবে তো। আমি সেই নীতিটাকে পোষণ করি চাই না করি। তাহলেও তোমার বিয়ে কবার দরকার আছে তো?'

'আছে বই কি। আইবুড়ো হয়ে কি চিরকাল থাকব ভেবেছ নাকি? আমার স্বামী চাই, সন্তানও চাই। এই চাওয়ার ব্যাপারে সুন্দরী মেয়ে, কুৎসিত মেয়ের কোনো তফাত নেই। তাছাড়া প্রয়োজনেব কথাগুলি গোপন করে মেয়েলিপনা দেখাতেও আমার ঘেন্না হয়।'

আরো কতক্ষণ যে বসে থাকত প্রাণনাথ তা সে নিজেই বলতে পারে না। পাশের ঘরে দেয়ালঘড়ির ঘণ্টা শুনে চটপট উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'আজ উঠি। জরুরি মিটিং ডেকেছে নবকুমার। না গেলেই নয়।'

'ভয় পেযে গেছ খুব?'

প্রাণনাথ হাসে। সে কথার জবাব না দিয়ে অন্য কথা পাড়ে। বলে, 'পরশুদিন মামলা। তিনটে লোককে জোর করে বরখাস্ত করেছে তোমার বাবা। কোর্টে যেতে হবে। হাজারখানেক টাকার জোগাড় রেখো কিন্তু। বিকেলে এসে নিয়ে যাব কাল।'

•

প্রায় আধঘণ্টা পেরিয়ে পাঁচ জনও আসে না। নবকুমার আসে সকলের শেষে। কোরামের অভাবে সভা আর বসে না। নবকুমারকেই মনে হয় সবচেয়ে করুণ, বিপন্ন। অপরাধীর মতই মাথা নিচু করে বসে থাকে সে। ঘণ্টাখানেকের ভেতরে পরপর চারটে সিগারেট নিঃশেষ করে। প্রাণনাথ ডাকে, 'অত দূরে বসে আছ কেন? কাছে এসো।'

নবকুমার বেশ কুণ্ঠাসহকারেই বলে, 'এমন করে কিছু হয়? ভেতরে-ভেতরে গজরাচ্ছে সবাই। আমাকে তাই মিটিং ডাকতে হল। এখন দেখুন,

আপনার কাছে এসে যে জানতে চাইবে, বুঝতে চাইবে আসল ব্যাপারটা কী —সে সাহস কারো নেই।'

'কথাটা তুমিও জিগ্যেস করতে পারতে, নবকুমার।'

'অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু আপনিও একটা পরামর্শ চান নি কারো কাছে। কেন এমন একটা সিদ্ধান্ত নিতে গেলেন বোঝা গেল না। সবাইকে আপনি অবহেলা করছেন। কোন ব্যাপারেই কাউকে আমল দিতে চাইছেন না। এসব দেখে-শুনে অভিমান হয় কিনা বলুন?'

'ছিচকাঁদুনে ব্যারাম তোমারও আছে নাকি?' সে যেন ঠাট্টা করে না। বেশ রাশভারি গলায় উপদেশের মত করে বলে, 'মান-অভিমান মেয়েরাও আর বরদাস্ত করে না, নবকুমার। করে না বলেই তো রত্নাকে বিয়ে করব স্থির করেছি।'

'দিনক্ষণ অবধি স্থির করে ফেলেছেন?'

একেবারে দমআটকানো অবস্থা নবকুমারের। সে যেন এতখানি স্পষ্টাস্পষ্টি আলোচনায় নামতে চায় নি।

'দিনক্ষণ আবার কিসের? যেকোনো দিনই আমার দিন। ফুরসত মেলে নি, তাই বিয়েটা ঠেকে আছে এতদিন। নইলে কত মেয়ে তৈরি হয়ে আছে তা জানো?'

'জানি বলেই তো কথাটা উঠল। শেষে কিনা রত্নার মত মেয়েকেই পছন্দ হল আপনার। বাপের টাকা ছাড়া নিজের বলতে যার কিছু নেই। শুনে আমরা তাজ্জব বনে গেছি, প্রাণনাথবাবু। অমন বাপের মেয়ে! আপনাকে একদিনও শান্তিতে থাকতে দেবে ভেবেছেন? আপনার সমস্ত চিন্তাভাবনা আদর্শকে বানচাল করে দেবে না ওই মেয়ে! সব ব্যাপারেই আপনি এক্সপেরিমেন্ট চালাতে চান। বিয়েব ব্যাপারেও কি তাই?'

'তাই।'

প্রাণনাথ ঝট্ করে উঠে দাঁড়ায়। চলতে শুরু করে বলে, 'চলি। এবার কথাটা সবাইকে সরল সহজ করে বোঝাতে পারবে নিশ্চয়ই? তাছাড়া বিয়েটা তো আমার। রত্নাকে নিয়ে ঘর করব আমিই। আর কেউ নয়। সুতরাং সে এখন থেকেই আমার স্ত্রী এই কথা ধরে নিয়ে কেউ যেন আমাকে উৎপাত আর না করে নবকুমার। আমার কাজে যেন বিঘ্ন না ঘটায়।'

'আজ আপনার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ছিল সকলের।'

'এখনো কি আছে?'

সে যেন পরিহাস করে। বোঝাতে চায়, নাবালকত্বের স্তর পেরিয়ে তারা কেউ একচুল এগোতে পারে নি। সীমাবদ্ধ জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা নিয়ে কি তার মত মানুষের নাগাল পাওয়া যায়? চিন্তায়-ভাবনায় সে সবাইকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে, অনেক উচ্চে উঠে বসে আছে। সভা ডেকে ছেলেমানুষি তাই পোষায় না। তার সময়ের দাম প্রচুর। প্রতিটি মুহূর্তেই প্রসব করে চলেছে চিন্তাভাবনার এক একটি উজ্জ্বল, অমূল্য রত্ন। মনে-মনে এই সব অহংকার নিয়েই কি ঘোরাফেরা করে না প্রাণনাথ?

নবকুমার দেখে আর ঈর্ষ্যায় জ্বলে যায়। এই মানুষের নেতৃত্বই কি তাদের আন্দোলনকে দেবে নতুন রূপ? কথাটা সে বিশ্বাস করতে পারে না। ভাবতে গিয়ে কষ্ট হয় তার। নিজেকে হেয় মনে হয়, ছোট মনে হয়। অথচ কত আশা নিয়ে এসেছিল আজ। মিটিংয়ে বসে তাকে নাস্তানাবুদ করার কত শখ ছিল তার, বহুদিনের শখ। তা আর হল না। হয়তো কোনদিনই তেমন সুযোগ দেবে না প্রাণনাথ।

মামলায় তারা জিতে যায়।

ছাঁটাই নোটিশ জারি হয়েছিল যাদের ওপর তারা আবার কাজ পায়।

অনেকদিন পরে মনে প্রচুর শান্তি নিয়ে ঘরে ফেরে প্রাণনাথ। একটু সকাল করেই ফেরে। তাকে দেখে তাজ্জব বনে যায় বিনতা। ফাটা মাথা থেকে তখনো রক্ত গড়িয়ে পড়ছে দেখে আতঙ্কে শিউরে ওঠে। প্রাণনাথ তাকে থামিয়ে দেয়। আশ্বস্ত করতে চেয়ে বলে, 'ও কিছু নয়। একটু-আধটু কেটে যাওয়া, ছড়ে যাওয়া ভালো।' বলে সে হাসতে হাসতে উঠোনে কলতলায় বসে পড়ে। ট্যাপ খুলে দিয়ে অনেকক্ষণ আর কথা বলে না। ভাব-সাব দেখে বিনতা আজ কেঁদে ফেলে। চেঁচিয়ে কাঁদলে পাছে সে রাগ করে, তাই বিছানায় উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদে। একদিন বন্ধু ছিল তারা দুজন। প্রিয়নাথের চেয়ে প্রাণনাথই ছিল তার নিকটতম আপনার জন। আজ সেই প্রাণনাথই তাকে পর ভাবে। সভয়ে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়।

গায়ে ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া লাগতেই চমকে উঠে বসে বিনতা। গাল থেকে চোখের জলের দাগটুকুও মুছে নেবার কথা ভাবে না।

'ভারি ছেলেমানুষ তো তুমি।'

'আমি ছেলেমানুষ, না তুমি?' সে যেন পাল্টা আক্রমণ করবে বলেই ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলে। বলে, 'আমি সাপ, না বাঘ যে আমাকে দেখলেই তুমি এড়িয়ে যাও? যা পাই নি তা কোনদিন চেয়ে লজ্জা দেব না তোমাকে। চোরের মত পালিয়ে কেন বেড়াও? আমাকে বুঝি বিশ্বাস নেই?'

'তোমাকে বিশ্বাস না করলে বেঁচে আছি কেমন করে, বিনতা? বিশ্বাসই তো আমার বেঁচে থাকার আশ্রয়। অকারণ ভুল বুঝে কষ্ট পাচ্ছ তুমি।'

'কিন্তু আমি যে রক্তমাংসে গড়া মানুষ, প্রাণ। কেমন করে ভুলে যাও, একদিন তোমাকে ভালোবেসেছিলুম? এখনো সেই ভালোবাসার কথা ভুলে থাকা আমার পক্ষে কষ্টকর। এবার তাই ছুটি চাই। দগ্ধে-দগ্ধে মরার চেয়ে সে বরং সহস্রগুণে ভালো। চোখের সামনে তুমি আর কাউকে নিয়ে সংসার পাতবে আমি ভাবতেই পারিনে। যে কারণে তনুকাকে ভেতরে-ভেতরে হিংসে করি আমি। রত্নার কথা ভাবলে জ্বলে যাই। যদি দেখি তুমি ওকে নিয়েই ঘরসংসার পেতেছ তাহলে আমি আত্মহত্যা করব বলে রাখছি।'

ফাটা মাথা থেকে আর এক ফোঁটা রক্তও গড়িয়ে পড়ে না। এমন কি জ্বালাযন্ত্রণার বোধটুকু অবধি লুপ্ত হয়ে যায়। বিনতার কথা শুনতে-শুনতে সে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। এতদিন পরে সে যেন বিনতাকে নতুন করে দেখতে পায়। আর পাঁচটা হেঁসেল-ঠেলা, ছেলে-পেটে-ধরা মেয়ের মত সে-ও সাধারণ, অতিসাধারণ। তুচ্ছ কামনা-বাসনা ছাড়া জীবনে কি আর কোন উচ্চ আদর্শই থাকতে নেই? একদিন ভালো লেগেছিল ঠিক। কথাটা হয়তো তখনকার মত যথারীতি শুনিয়ে দিয়েছে প্রাণনাথ। কারণ প্রাণের কথা চেপে রেখে নিজেকে যাতনা দেবার মত বদ্-অভ্যাস তার বিচারে অশালীন, অসভ্যতা ছাড়া কিছু না। একজনের আড়ালে অন্যজন অজস্র কুৎসিত চিন্তাকেই ক্রমাগত প্রশ্রয় দিয়ে যাবে সে কেমন কথা। বরং মনের কথা নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনাই ভালো লাগে। সে পছন্দ করে খোলাখুলি আলাপ। আজ কিন্তু সত্যিই ভাবতে পারে না

প্রাণনাথ, ভালো সে বেসেছে কিনা বিনতাকে, এখনো বাসে কিনা! ঘটনাচক্রে প্রিয়নাথের সঙ্গে জীবন গাঁথা হয়ে গেলেও সে হযতো ঈর্ষ্যা বোধ কবে নি। প্রিয়নাথ স্বর্গে চলে যাবার পরেও লোভ উন্মত্ত হয়ে ওঠে নি। কিন্তু আজ সে জ্বলতে থাকে। একটা কথা ভেবে নিজেকে বোকা, মূর্খ মনে হয়, বিনতাকে এত কাছে পাবার পরে-ও সে তাকে বোঝার ব্যাপারে আগাগোডা ভুল করেই এসেছে। আজ কি সেই ভুলের খেসারত দেবে চোখের জলে, রক্তে? তাছাডা অনেকদিন পরে হযতো ভুল কবেই পরস্পরকে নাম ধরে ডাকে। অথচ এই ডাকের ভেতরে সেই উন্মাদনা নেই। নেই সেই তৃপ্তি, সেই উত্তেজনা। তাহলে এমন করে বিনতা পাগল হবে কেন?

'আমার বিয়ের ব্যাপারে তোমাব এত আপত্তি থাকবে ভাবি নি। কিন্তু বিয়ে তো করতেই হবে। তাই রত্নাকেই কথা দিয়েছি। ষোলো আনা মতামত অবশ্য এখনো দেয় নি রত্না। ভাববার সময় নিয়েছে কদিন। এখন যদিও এসে সম্মতি জানায়, বিযের ব্যাপারে রাজী হয়ে যায, তুমি বাধা দেবে?'

'দেব বৈকি। আমার মনের মত মেযে ছাডা তোমাকে বিয়ে করতে দেব ভেবেছ নাকি?'

সহজ সুরে কথা শেষ কবে বিনতা এবার হেসে ফেলে। মনেই হয় না একটু আগে এই বিনতা কান্নায ভেঙে পডেছিল। তার মাথাটা বুকের ওপরে টেনে আনে। বুকের কাপড রক্তে লাল হযে ওঠে। সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। সে যেন প্রেমিকের মত না, আপন রক্তেমাংসে গঠিত প্রাণ, প্রাণেব চেযে প্রিয় সন্তানেব মতই তার কাছে পরম যত্নের, স্নেহের বস্তু। এখন আর কোন দ্বিধা, সঙ্কোচ নেই। কেউ এসে যদি এইভাবে তাদের দেখে ফেলে, বিনতা বিচলিত বোধ করবে না। চমকে উঠে বেরিয়ে যাবে না কোথাও। লজ্জায় লাল হযে উঠবে না আদৌ। প্রাণনাথ বাধা না দিয়ে বরং ক্লান্ত শরীর বিনতার কোলের ওপর এলিয়ে দেয। পরম নিশ্চিন্তে চোখের পাতা বুঁজিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করে।

•

রাতদুপুবে রত্না এসে কাঁচা ঘুম থেকে টেনে তোলে। চেহারা দেখে মনে হয না সে প্রকৃতিস্থ। হয়তো সারাটা পথ ছুটতে-ছুটতে এসেছে।

'রত্না যে!'

'হ্যাঁ, এলাম।'

'এত রাত করে যে? কী ব্যাপার?'

'ব্যাপার আবার কী? ওখানে থাকা গেল না।'

'তাই বলে এইভাবে চলে আসতে হয়? দাঁড়াও, তনুকাকে ডাকি। ওই তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। গাড়ি নিয়ে এসেছ তো?'

'কেমন মানুষ তুমি? আমি দাঁড়িয়ে আছি, দেখতে পাও না?' চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে। কণ্ঠস্বর ভেজা-ভেজা। রত্না এখুনি কেঁদে ফেলবে, প্রাণনাথ টের পায়। তবু সে যে তাকে সান্ত্বনার কথা শুনিযে নিরস্ত করবে, ভেতর থেকে তেমন কোন তাগিদ অনুভব করে না আদৌ। বরং ধমকের সুরে তাকে শাসন করে শায়েস্তা করার বাসনাই যেন ধীরে-ধীরে তাকে কঠিন কঠোর হৃদযহীন করে তোলে। এই মুহূর্তে যা অভাবনীয়।

রত্না এসে বিনা দ্বিধায আজ তার বিছানার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে। ভাবখানা এই, দুদিন পরে তো সবই তার হবে। এই ঘব-দোর বিছানার ওপব প্রতিষ্ঠিত হবে পূর্ণ অধিকার। তা দুদিন আগেই দখল করে নিচ্ছে রত্না।

মুখোমুখি চেযার টেনে বসে প্রাণনাথ। বলে, 'কী ব্যাপার খুলে না বললে ঠিক শান্তি পাচ্ছিনে, রত্না।'

রত্না যেন এতক্ষণে স্পষ্ট দেখতে পায় তাকে। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথার দিকে চেয়ে কী অনুমান করে, কে জানে। গম্ভীর গলায বলে, 'আমার আসাটাই তো একটা মস্ত ব্যাপার। খুলে বলার প্রয়োজন আছে কি? এখন থেকেই আমি যদি এ বাড়ির বাসিন্দা হই, তোমার আপত্তি হবে না নিশ্চয়ই?'

'হবে।'

স্বর শুনে চমকে ওঠে রত্না। অনেক কথা বলবে বলেই এসেছিল। কিন্তু প্রাণনাথের কাছে এসে গুলিয়ে যায় সব। সে কি তবে রাতারাতি মত পাল্টে ফেলেছে? তার ওপরে আর কোন টান নেই? এতদিন যা বলেছে সবই মুখের কথা? ছলনা? মনের কথা কি সে কাউকে বলে না, বলবে না কোনদিন?

সদর দরজায় কড়া নড়ে ওঠে। রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে সুকান্ত লোক পাঠায়। নিজে সে আসে না। অগত্যা প্রাণনাথ উঠে যায়। বলে, 'রাগ

কবে চলে এসেছে। আজকের রাতটা থাক। কাল সকালে অফিস যাবার পথে আমিই ওকে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

সুকান্ত রেগে আছে বোঝা যায়। গাড়িতে বসেই যেন আপনমনে হাওয়াকে উদ্দেশ করে বলে, 'আমারই ভুল হয়েছিল। বাইরে বাজে লোকের সঙ্গে মিশতে বারণ করি নি কোনদিন। এবার আর নয়। এখন বিয়ের কথা চলছে মেয়ের। বাইরে রাত কাটিয়ে গেলে বদনাম রটবে।'

'বিয়ের কথা। কার সঙ্গে? ওই নবকুমারের সঙ্গে? আমি তো তোমাকে বলে দিয়েছি, বাবা। বিয়ে আমার হয়ে গেছে। সে যদি কোনদিন আমাকে গ্রহণ না করে, তবু আমি তারই বউ। মিথ্যেবাদী বিশ্বাসঘাতক মানুষ আমার দুচক্ষের বিষ। নিজের দলের প্রতি, নীতির প্রতি যার আস্থা নেই, আনুগত্য নেই, আছে কেবল পদের মোহ, নেতৃত্বের লোভ, স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে সে তার স্ত্রীকে ভালোবাসতে পারবে কোনদিন? আমি তাকে ঘৃণা করি।'

'তাই বলে তুই তোর বাপের সম্মানের দিকে তাকাবিনে? রাগ করে এসে আশ্রয় নিবি তার—যে তোর বাপের চিরদিনের শত্রু? বাড়ি চল। বিয়ে তোকে করতে হবে না। কারো সঙ্গেই বিয়ে হবে না তোর।'

'পাগল নাকি। স্বামীর ঘরে এসে তার অনুমতি ছাড়া কখনো যাওয়া যায়? তাছাড়া আমার স্বামীর যেখানে আদর নেই, সম্মান নেই সেখানে আমিই বা কেমন করে যাই?'

এত বড় অপমানের কথা ভেবে সে এখানে আসে নি। রত্নার মুখের দিকে চেয়ে সে কেমন মিইয়ে যায়। তার কত সাধ, কত আহ্লাদের আশ্রয়। এই মেয়ের মুখের দিকে চেয়েই না কেবল অনাথা, অসহায় বিধবা শালীকে আশ্রয় দিয়েছিল সে? চারদিকে সমস্ত দুর্নাম সহ্য করেই দিয়েছিল। তবু বিয়ে করে নি আরেকবার। মেয়েটা যে তা না হলে ভেসে যেত।

সুকান্ত আক্ষেপের সুরে বলে, 'তাহলে যাবিনে?'

'না।' দৃঢ়কণ্ঠে রত্না জবাব দেয়। একটুও নড়ে না।

বাইরে গণ্ডগোলের আভাস পেয়ে পাশের বাড়ির দোতলার বারান্দায় এসে মেয়েপুরুষেরা রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। ঘুম ভেঙে যায় তনুকার। বিনতা কিন্তু বাইরে আসে না। বিছানায় পড়ে থাকে চুপচাপ। আজ

আর তার কান্না পায় না। বরং ভেতরে-ভেতরে এক অসহ্য জ্বালা বোধ করে।

প্রাণনাথকে আরো শান্ত, আরো কঠোর মনে হয়। সে বলে, 'পাগলামি করে না, রত্না। এমন বেয়াদপি আমার অসহ্য।'

'তুমি আমাকে তাড়িয়ে দেবে, প্রাণ?'

বিস্ময়ে, বেদনায় রত্না বুঝি স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে না। ছেলেমানুষের মত হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলে।

প্রাণনাথ বলে, 'বিয়েতে আমার আর রুচি নেই, রত্না। বউ নিয়ে ঘর করা আমার পোষাবে না। জীবনে কত কাজ।'

'বলো তো, ওকে বুঝিয়ে বলো তো, প্রাণনাথ।' সুকান্ত কেমন হয়ে যায়। মুহূর্তে বিগড়ে যাবার বদলে সে আরো কোমল, সহৃদয় হয়ে ওঠে। হাতে স্বর্গ পাবার মতই অবস্থা তার। দেখে হাসি পায়, মায়া হয় প্রাণনাথের।

'আমাকে কি জেলে পাঠাবার ইচ্ছে? তুমি কি টের পাও নি, পুলিশে খবর না দিয়ে তোমার বাবার পক্ষে আমার এখানে আনা অসম্ভব?'

রত্নার যেন জেদ চেপে বসে। বলে, 'জানি বলেই তো যেতে চাইছিনে।'

'না, রত্না না।'

নরম গালের ওপর পাঁচ আঙুলের স্পষ্ট ছাপ ফুটিয়ে তুলে প্রাণনাথ তাকে ঠেলতে-ঠেলতে গাড়ির কাছে নিয়ে যায়। প্রতিবাদ করে না সুকান্ত। যেন তার মা-মরা বয়স্থা মেয়েটাকে সকল রকমে শাসন করার, শায়েস্তা করার অধিকার আছে প্রাণনাথের।

'রত্না!'

চমকে ওঠে প্রাণনাথ। পেছনে দাঁড়িয়ে বিনতা।

'যাও বললেই যেতে হবে? তোমার কি আক্কেল নেই? তুমি না এবাড়ির বউ? এবাড়ির মানসম্মান তোমাকে দেখতে হবে না? ফিরে এসো।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত রত্না ফিরে আসে। কোনদিকেই ফিরে তাকাবার তাগিদ যেন নেই। গুটি-গুটি পায়ে বিনতার ঘরে ঢুকে তারা দরজায় খিল তুলে দেয়। আর পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকে সবাই। অপমানে, হতাশায় সুকান্ত যেন মাটিতে মিশে যাবে। চুপচাপ গাড়িতে উঠে বসে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ড্রাইভারকে বলে, 'চল।'

রাস্তায় একবার থানা ঘুরে যেতে হয়। কেলেংকারি করে তো লাভ নেই। শূন্যে থুথু ছিটিয়ে কী ফল? ডাইরির ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা দরকার। তাই চোরের মত মাথা নিচু করে সে নিজেই থানায় যায়।

সকালবেলা রত্না নিজেই বাপের কাছে চলে যায়। চা-টুকু খাওযার ইচ্ছে অবধি হয় না। সারা রাত বিনতা তাকে কী বুঝিয়েছে কে বলবে? যাবার সময় প্রাণনাথের সঙ্গে একবার দেখা করার তাগিদ বোধ করে না। যেন আর কোন সম্পর্কই নেই তাদের। যা ছিল, কয়েক ঘণ্টার মানসিক টানাপোড়েনের ধকলে তা চুকেবুকে গিয়েছে। হয়তো আর কোনদিনই পরস্পরের জন্যে বিন্দুমাত্র টান অনুভব করে কষ্ট পাবে না তারা। রাতারাতি রত্না কি তবে সাবালিকা হয়ে যায়? বয়স্কার সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে কেবল বিনতার নিবিড় সাহচর্যে? স্বামী নিয়ে ঘর করার কোন রসই বুঝি খুঁজে পায় না জীবনে? ভাবতে-ভাবতে একসময় পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রাণনাথ। আজ যেন সে অনেকখানি হাল্কা, দায়মুক্ত হতে পেরেছে। যে কারণে খুশির আবেগে ভেতরে-ভেতরে টগবগিয়ে ওঠে।

চা দিয়ে যায় তনুকা।

ফিরে যাচ্ছিল। প্রাণনাথ তাকে ডেকে বসায়। যা কোনদিন করে না তাই করে বসে। আজ সে হাত ধরে তনুকার। বলে, 'তোর মনে খুব দুঃখ, না রে?'

কথা বলতে পারে না। ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলে তনুকা। চিরদিনের চাপা মেয়ে তো নয়। স্বামীর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে যা কোনদিন পায় নি অথচ মনে-মনে তাই পেতে চেয়ে এখানে এসে বোবা হয়ে গেছে। তার রকম-সকম দেখে চাপা হয়ে গেছে। কর্তালি দেখিয়ে নিজেকে তনুকার চেয়ে অভিজ্ঞ আর বুদ্ধিমান প্রমাণ করতে চেয়ে সে যেন গুরু কিংবা ঋষি বনে যেতে চায়, কিন্তু সেই মানুষই আজ সহজ, সরল, অকপট হতে চায় কিসের আবেগে? রত্নার এই নিরভিমান প্রস্থান কি তাকে কঠিন আঘাত হানে?

'ভালো আমি সবাইকেই বাসি রে, তনুকা। তোরা তা বুঝতে পারিসনে, এইটেই দুঃখ। সকলকে তো একইভাবে ভালোবাসা যায় না। যে গুণ তোর আছে, বিনতার হয়তো তা নেই। অথচ বিনতারও গুণ আছে যা

আমার মনের মত। এই কথাটাই কেউ মানতে নারাজ। নইলে যাবার সময় রত্না ছেলেমানুষের মতই আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়ে চলে যায়! অথচ ওকে যে আমার কত প্রয়োজন সে কথা কেমন করে বোঝাই? ও আর না আসুক, হয়তো আমাকেই যেচে ওর কাছে যেতে হবে। ভালোবাসি বলেই যেতে হবে।'

'তোমার কি প্রাণ আছে?'

'আমাকে তোরা সবাই মিলে নির্বিকার পাষাণ ভেবে রেখেছিস নাকি?'

শুনে লজ্জা পায় তনুজা। এত বড় গালি দিতে সে যেন চায় নি। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে কথাটা। সে পাষাণ! কিন্তু মনে-মনে টের পায়, বাস্তবিক ততখানি কঠোর সে নয়। ঘরে-বাইরে তাকেও ভালোবাসার কারবার চালিয়ে যেতে হচ্ছে ইচু-নিচু নির্বিশেষে সর্বত্র সমানভাবে। হৃদয়ের পুঁজি বিনে জীবন যে অচল। পাঁচমিশেলি ঘটনার চাপে সাময়িকভাবে সেই হৃদয় যদি চাপা পড়েই তো উপায় কী? তবু তো নির্ভেজাল মগজের কুস্তি লড়তে হয়। যাবতীয় আবিলতার ঘোর কাটিয়ে হৃদয়কে প্রাণপণে বাঁচাতে হয়।

'তুমি আমাকে মাফ করো। তোমার নাগাল সব সময়ে পাইনে বলেই তো ভুল বুঝি। এখন আমি ধরতে পারছি কোথায় গলদ।'

'তোকে যে আমিই শিখিয়েছি রে। তুই যে আমার হাতে গড়া। তোকে দুঃখ দিলে সে যে আমারই হার।'

মৃণালকান্তি নিজে আর আসে না। চিঠির জবাবে চিঠি লিখে আশ্বস্ত হয়। তনুকার জন্যে অযথা আকুলি-বিকুলি জাহির না করে, মোটা কথায় তার শুভাশুভ জানতে চায়। বন্ধুর জন্যে বন্ধু ঠিক যতখানি ব্যাকুল হয় তার চেয়ে বেশি ব্যস্ত হওয়ার মানে যেন নেই। মৃণাল তা টের পায়। চিঠির ভাষা তাই তরল সোহাগে না মেখে সরল যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার প্রয়াস। ভালো লাগে প্রাণনাথের। নিজে পড়ে সে তনুকার হাতে দেয়। চোখ বুঁজে সে যেন তৃপ্তির, শান্তির আস্বাদ নিতে চেষ্টা করে।

'আগে হলে এই চিঠিটাই কত কদর্য হত, জানো? পড়ে কান গরম হত আমার।'

স্টেশন থেকে সোজা ঘরে যাবার বদলে আজ তারা রত্নার কাছে যায়। বিনতাই জোর করে টেনে নিয়ে যায। প্রাণনাথের যেন মনে পড়ে, অনেকদিন সে রত্নাকে দেখে নি। অথচ অন্তত একবার দেখে আসা উচিত ছিল তাব। তনুকাকে বিদায় দিয়ে মনটা খাঁ-খাঁ করে। হযতো কযেক মুহূর্তের জন্যে ফাঁকা শূন্য ঠেকে সব। রত্নার নাম শুনে ভেতরটা তাই দাউ-দাউ করে ওঠে। সে আজ নবকুমারের ঘরণী। কিভাবে গ্রহণ করবে তাকে কে জানে! তবু সে যায়।

'বিনতা, তোমার সঙ্গে যে আমার অনেক কথা আছে।'

'আমি তা জানি।'

'সময় যে নেই।'

'গোটা জীবন পড়ে আছে, প্রাণ।'

'কথা কি তবু ফুরোবে?'

'তাই কি ফুরোয!'

দেখতে-দেখতে বাস এসে পায়ের কাছে দাঁড়ায়। ছেড়ে দিলে আজ তারা পাশাপাশি ঘনিষ্ঠভাবে বসে। তর্ক শুরু হয় রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য নিযে। বাসভর্তি মানুষ কিছু শুনতে পায কিনা কে জানে। তারা গ্রাহ্য করে না, আমল দেয না কাউকে। বাইরে বৈশাখের দুরন্ত দুপুর। রোদে জ্বলে-পুড়ে খাক হচ্ছে সবাই। বাসের ভেতরে অসহ্য গুমোট। তুমুল গর্জনে বাস তবু এগিয়ে যায়। উর্ধশ্বাসে একরাশ মানুষের সুখ-দুঃখ-বেদনা-সান্ত্বনার বোঝাকেই যেন যথাস্থানে পৌঁছে দিতে চেয়ে তৎপর। সামনে পীচ-গলা দীর্ঘ পথ উদ্ধত তর্জনীর মতই দিগন্ত অবধি স্থির, লম্বমান। নিজের অপরিমাণ দুঃখ কিংবা ব্যর্থতার কথা আর মনে পড়ে না প্রাণনাথের। বিনতাকে বহুকাল আগেকার মতই উজ্জ্বল, সতেজ মনে হয। অধীর আগ্রহে তারা দুজনেই অপেক্ষা করে।

না-হওয়া গল্প

অমল দাশগুপ্ত

অনেক দিন থেকেই আমার ইচ্ছে, একটি সায়েন্স-ফিকশন লিখি। বাংলায় যাকে বলা হয়ে থাকে বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প। গোড়াতেই জানিয়ে রাখি, বাংলা প্রতিশব্দটি আমার ঠিক পছন্দ নয়। কেননা ইংরেজি নামকরণে গল্পের যে বিশেষত্বটি ধরা পড়ে, বাংলা প্রতিশব্দে তার অভাব। তাছাড়া এমন কোন্ গল্প আছে যা বিজ্ঞানভিত্তিক নয়? একসময়ে বাংলা-দেশের একদল তরুণ লেখক চেতনাপ্রবাহের গল্প লিখতেন। নতুন-রীতির গল্প নামে আখ্যাত সেইসব গল্পেও বিজ্ঞান থাকত, যথার্থ অর্থেই। যতদূর জানা আছে, নতুন-রীতির কোনো লেখকও সুইচ টিপে গ্যাসের বাতি জ্বালান নি। নইলে লেখকের অসাধ্য কী। টেলিপ্যাথিও তো কোন কোন সায়েন্স-ফিকশন লেখকের প্রশ্রয় পেয়েছে। লেখক হয়তো নায়ককে হাজির করেছেন গ্যালাকৃটিক বিশ্বজগতের কোন দূরতম লোকে। বলাবাহুল্য, সে-দেশের বিজ্ঞান পৃথিবীর চেয়ে অনেক উন্নত। তাই বলে পৃথিবীর মানুষই বা কম কিসে! ভাষা দুর্বোধ্য? সেটা তার কাছে কোন সমস্যাই নয়। সে অনায়াসে টেলিপ্যাথির আশ্রয় নিয়ে বসল। এ-ঘটনার ওপরে মন্তব্য করতে গিয়ে কিংসলি অ্যামিস যে বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন তার একটু রূঢ় বাংলা করলে দাঁড়ায়—গাঁজা। অন্য একদল লেখক এসব ক্ষেত্রে অনুবাদ-যন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এ-ব্যাপারটাও গাঁজা, পুরোপুরি নয়, খানিকটা। অনুবাদ-যন্ত্র অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু এই যন্ত্রের জন্যে আগে থেকেই একটি প্রোগ্রাম রচনা করার প্রয়োজন আছে। সেজন্যে চাই অনুবাদ্য ও অনুবাদিত

উভয় ভাষাতেই বিশেষজ্ঞ জ্ঞান। সম্পূর্ণ অজানা ভাষায় সাড়া দেওয়া অনুবাদ-যন্ত্রের পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

তবে লেখক যদি বলেন, আমার হাতে কলম, আমার মগজে কল্পনা, আমি যা-খুশি লিখতে পারি, তাহলে নতুন-রীতির যে-লেখক পৃথিবীকে বলেছিলেন উপগ্রহ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে অনুবাদ-যন্ত্রের পক্ষেও যা-খুশি করা সম্ভব। বিজ্ঞানী বড়ো জোর বলবেন, এমনটি হওয়া উচিত নয়। লেখক অনায়াসেই বলতে পারেন, আমি চাই তাই এমনটিই হবে। হেঁজিপেঁজি নয়, বহু প্রথম সারির লেখক নিতান্তই কলমের জোরে না-হওয়াকে হওয়া করে ছেড়েছেন।

তাহলে একটি গল্প বলে নিই। সায়েন্স ফিক্শনের দুজন দিক্পাল লেখক হচ্ছেন জুলে ভার্নে ও এইচ. জি. ওয়েল্স। দুজনেই পৃথিবীর মানুষকে চাঁদে পাঠিয়েছেন। কিন্তু দু-ভাবে। জুলে ভার্নে পাঠিয়েছেন কামান দেগে। এইচ. জি. ওয়েল্স মাধ্যাকর্ষণ-নিরোধী ধাতুনির্মিত ব্যোমযানে। শেষোক্তজনের 'দি ফার্স্ট মেন ইন দি মুন' বইটি পড়ে প্রথমোক্তজন মন্তব্য করেছিলেন, "আমি কাজে লাগিয়েছি পদার্থবিদ্যা। উনি যা করছেন তা নিতান্তই মনগড়া ব্যাপার। আমি চাঁদে গিয়েছি কামান থেকে উৎক্ষিপ্ত গোলায়। এর মধ্যে মনগড়া ব্যাপার কিছু নেই। আর উনি মঙ্গলে (sic) গিয়েছেন বিমানে (sic), যা মাধ্যাকর্ষণের-সূত্র-কার্যকর-নয় এমন বিশেষ ধাতুতে তৈরি। ব্যাপারটি ঘটলে অবশ্য খুবই চমৎকার হয়। কিন্তু আমি এই ধাতুটি দেখতে চাই। উনি বার করুন তো দেখি।" জুলে ভার্নের পরে বহু বহু বছর কেটে গিয়েছে। এখনো পর্যন্ত কিন্তু কেউ এই ধাতুটি বার করতে পারেন নি। অথচ তারপরে আরো কত কি তো ঘটে গেল! রেডার, রকেট, পরমাণু-বোমা, ইলেকট্রনিক কম্পিউটর—কত-কি, কত-কি! কিন্তু কই, মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের তোয়াক্কা করছে না এমন ধাতু আবিষ্কারের জন্যে কেউ গবেষণা করছেন তাও তো শোনা যাচ্ছে না!

জুলে ভার্নের বক্তব্যের উদ্ধৃতিতে আমি দুটি sic বসিয়েছি। এইচ. জি. ওয়েল্স তাঁর নায়ককে পাঠিয়েছিলেন চন্দ্রে—মঙ্গলে নয়। ব্যোমযানে—বিমানে নয়। কিংসলি অ্যামিস বলছেন, জুলে ভার্নে এইচ. জি. ওয়েল্স-এর বইটি পাঠ করেছিলেন "কিউরিঅস্লি"। জুলে ভার্নে বলেই পার পেয়ে গেলেন। এই ইংরেজি শব্দটি না-প্রশংসার, না-নিন্দার। কিংবা ভাবলে প্রশংসার, ভাবলে

নিন্দার। বাংলা 'অদ্ভুত' শব্দটিও তাই।[1] সব ভাষাতেই এমনি কতকগুলো শব্দ আছে। জুলে ভার্নে যদি ভুল বলেন বা সত্যেন্ বোস যদি ভুলে ভর্তি কোন বিজ্ঞানের বইয়ের সপ্রশংস ভূমিকা লেখেন তাহলে এই শব্দগুলো বড় কাজে লাগে।

চন্দ্র যদি মঙ্গল হয় (প্রথমটি উপগ্রহ, দ্বিতীয়টি গ্রহ), তাহলে পৃথিবীও অবশ্যই উপগ্রহ হতে পারে। আমি বলছি, অতএব উপগ্রহ। নয় কেন? রবীন্দ্রনাথ সাক্ষী। আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে। আমি চোখ মেললুম আকাশে, জ্বলে উঠল আলো পুবে পশ্চিমে। গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর', সুন্দর হল সে। এখানে যদি বলি, পৃথিবীর দিকে চেয়ে বললুম 'উপগ্রহ', উপগ্রহ হল সে, তাহলে গোলাপের সৌন্দর্য খোয়া গেলেও বক্তব্যের হেরফের হচ্ছে না। কিন্তু কথাটা কে বলছেন সেই বিচারটা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। জুলে ভার্নে না হয়ে অন্য কেউ হলে কিংস্‌লি অ্যামিস নিশ্চয়ই শুধু 'কিউরিঅস্‌লি' বলে ছেড়ে দিতেন না।

এত কথা উঠছে কেন? খানিকটা প্রলাপের মতো শোনাচ্ছে না কি? আগেই বলেছি, আমি একটি সায়েন্স ফিক্‌শন লিখতে চাই। যেহেতু আমি লিখছি অতএব নিঃসন্দেহে বলতে পারি, চন্দ্র যদি কোন কারণে মঙ্গল হয়, কিংবা ব্যোমযান হয় বিমান, তাহলে আমাকে যে-ভাষায় সম্বোধন করা হবে তা অন্তত কিউরিঅস নয়।

অতএব মহাজনের পথে গমন করাই শ্রেয়।

সমস্যা এখানেই। কাকে মহাজন বলব? যিনি এমন কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছেন যা পরবর্তী কালের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা সমর্থিত? আমার এতে সায় নেই। তাহলে আর গল্প বলার দরকারটা কী। সরাসরি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ লিখলেই হয়। গল্পই যদি হবে তাহলে অবশ্যই তার অবলম্বন হওয়া চাই রক্তমাংসের মানুষ। কতকগুলো বৈজ্ঞানিক সূত্রকে মানুষের মতো চেহারা দেওয়া যেতে পারে, মানুষের মতো নামও, কিন্তু মানুষের প্রাণ যদি তাতে না থাকে তাহলে এতসব কাণ্ডকারখানার অর্থ কী দাঁড়ায়। বিজ্ঞান সায়েন্স ফিক্‌শনের উদ্দেশ্য নয়, অবলম্বন। মূলত ও প্রধানত তা ফিক্‌শন।

তাহলে কাকে মহাজন বলব? আমার তো মনে হয়, এই বিচারে আদর্শ

দৃষ্টান্ত হচ্ছে সুইফ্‌ট্‌-এর গালিভার'স ট্রাভেল্‌স। প্রথমত এটি সত্যিকারের অর্থেই গল্প। দ্বিতীয়ত গল্পটি কল্পনাশ্রয়ী। তৃতীয়ত গল্পের উদ্ভট পরিবেশটি খুঁটিনাটি বিবরণের মধ্যে দিয়ে এমন নিপুণভাবে উপস্থাপিত যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস-যোগ্য। চতুর্থত গল্পে আছে তীব্র সামাজিক শ্লেষ। সার্থক সায়েন্স-ফিক্‌শনের এই চারটিই লক্ষণ।

সুইফ্‌ট্‌ অবশ্যই মহাজন। কিন্তু সুইফ্‌ট্‌ যে লিলিপুটদের কথা লিখে গিয়েছেন তা এখন আব কল্পনার ব্যাপার নয়, অন্তত আমাদের দেশে রূঢ় বাস্তব। গোটা দেশটিই বামন হয়ে গিয়েছে, রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি সমস্ত দিক থেকে, এমনকি ব্যক্তিগত সম্পর্কের দিক থেকেও। আমাদের দেশে এখন আর গালিভাব'স ট্রাভেল্‌স লেখার কোনো সার্থকতা নেই, যদি অবশ্য সায়েন্স-ফিক্‌শন লিখতে হয়।

ধরা যাক, বিশপ হল্‌। তাঁর উপন্যাসেও একটি দ্বীপসদৃশ আশ্চর্য লোকালয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে সংসদ-সদস্যরা সবাই একযোগে অবিরাম কথা কয়ে চলেছেন। বিশপ হল্‌ যদি আরো সাড়ে তিনশো বছর পরে আমাদের দেশে জন্মাতেন তাহলে আর তাঁকে এই ঘটনাটি বর্ণনা করার জন্যে কল্পনার আশ্রয় নিতে হত না। অনেকে বলে থাকেন, সুইফ্‌ট্‌ বিশপ হল্‌কেই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু আমি যদি এ-তুজনের কাউকে অনুসরণ বা অনুকবণ করি তাহলে আর সাযেন্স-ফিক্‌শন হয না।

তাহলে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন কি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত? অন্তত সাযেন্স-ফিক্‌শন লিখতে হলে নয়। আমাদের দেশের মজুতদার ও চোরাকারবারীরা তো ফ্রাঙ্কেনস্টাইনেব চেযেও ভয়াবহ। কল্পনার রাশ যতই ছেড়ে দেওয়া যাক না কেন, আমাদের দেশের আজকের দিনের পরিবেশে মজুতদার ও চোরাকারবারীদের পাশে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনকে নিতান্তই নিরীহ জীব মনে হবে।

ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত জুলে ভার্নেতেই এসে দাঁড়াতে হল। টু থাউজেণ্ড লীগ আণ্ডার দি সী। নটিলাস। পরমাণু-শক্তিচালিত যে ডুবোজাহাজটি উত্তরমেরু পার হয়েছে বরফের তলা দিয়ে সেই 'নটিলাস' নয, জুলে ভার্নের আদি ও অকৃত্রিম নটিলাস। গল্পটিব নাম দেওযা যেতে পারে 'ইনার স্পেস'। মহাশূন্যে অভিযানের এই মাতামাতির দিনে ইনার স্পেস এখনো পর্যন্ত প্রায়

অনাবিষ্কৃত। সমুদ্রের গভীর অন্তর্দেশের বর্ণনায় কল্পনার রাশ অনায়াসেই ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।

প্রথমে জুলে ভার্নের ভাষাতেই একটি দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া যাক।

"কী ভয়ানক দৃশ্য! হতভাগ্য লোকটিকে একটা শুঁড় পেঁচিয়ে ধরেছে, বাতাস টানবার ফুটোয় আটকে রেখেছে। প্রকাণ্ড শুঁড়টার এলোপাথাড়ি আন্দোলনে শূন্যে আন্দোলিত হচ্ছে লোকটি। তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। সে চিৎকার করে উঠল, আ ময়। আ ময়! (বাঁচাও! বাঁচাও!) ফরাসী ভাষায় এই চিৎকার শুনে আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। তাহলে এই জাহাজে আমার স্বদেশবাসীও একজন ছিল! হয়তো আরো কয়েকজন আছে! এই হৃদয়বিদারক চিৎকার সারা জীবনেও আমি ভুলতে পারব না!

"হতভাগ্য লোকটিকে বাঁচানো গেল না। ওই বজ্রআঁটুনি থেকে কে ওকে বাঁচাবে? ক্যাপটেন নিমো অক্টোপাসটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আর হাতের টাঙ্গি দিয়ে আরেকটা শুঁড় কেটে ফেললেন। নটিলাসের গা বেয়ে বেয়ে অন্য যে দৈত্যগুলো উঠে আসবার চেষ্টা করছিল তাদের ঠেকাবার জন্যে প্রচণ্ড বিক্রমে লড়াই করেছিলেন ক্যাপটেন নিমোর ফার্স্ট অফিসার। নাবিকরা লড়াই করছিল টাঙ্গি নিয়ে।

"কানাডীয় কনসাইল ও আমি হাত ঢুকিয়ে দিলাম থলথলে মাংসপিণ্ডের মধ্যে। উগ্র একটা গন্ধে চারদিক ছেয়ে গেল।"

অক্টোপাস তার শুঁড় দিয়ে একটা লোককে পেঁচিয়ে ধরেছে। দৃশ্য হিসেবে মন্দ নয়। চেষ্টা করলে আমি হয়তো জুলে ভার্নের চেয়ে ভালো বর্ণনা দিতে পারব। কিন্তু লোকটিকে আগে খুঁজে বার করা দরকার। না, টেলিপ্যাথি নয়, ঠিক এমনি সময়ে আমার একতলার বাড়ির জানলার পাশ থেকে সেই লোকটির গলার স্বর শুনলাম যেন। 'মরে গেলাম গো বাবু, মরে গেলাম!'

ফরাসী ভাষায় নয়, স্পষ্ট বাংলায়। তবুও মনে হল, নটিলাসের সেই একই লোক, অক্টোপাসের বজ্রআঁটুনি থেকে যাকে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায় নি।

কে তুমি?

জবাবে সে আমার পা জড়িয়ে ধরতে চাইল। আবো কয়েকবার একই প্রশ্ন করার পরে যে জবাব পাওয়া গেল তা থেকে বুঝলাম, মেদিনীপুরের কোন্ এক গাঁয়ের চাষী সে। শহরে এসেছে প্রাণ বাঁচাতে। কেন, ওখানে কি তোমাকে অক্টোপাস পেঁচিয়ে ধরেছিল নাকি? এবারেও অনেক জেরা করে জবাবটা বার করতে হল। হ্যাঁ, তাই। জোতদার আর মহাজন। অক্টোপাসের চেয়েও ভয়ংকর। হাজার হাজার শুঁড় তাদের।

কী আপদ! আমি এমন কিছু দিয়ে শুরু করতে চেয়েছিলাম যেখানে উদ্দাম কল্পনার রাশ ছেড়ে দেওয়া চলে। অক্টোপাসের আক্রমণের বর্ণনায় জুলে ভার্নেকে টেক্কা দিতে পারব আশা ছিল। কিন্তু এই লোকটিব কথা শুনে আমাকে থামতে হল। অক্টোপাসের চেযেও ভয়ংকব হাজার হাজার শুঁড়ওলা জীবেব অস্তিত্ব আমি কল্পনাও করতে পারি না।

এবারে শেষ ভরসা এইচ. জি. ওয়েল্‌স্। না, আইল্যাণ্ড অফ ডক্টর মোরো নয়। একদল পশুকে মানুষ করে তোলার মধ্যে সেযুগে হয়তো নতুনত্ব ছিল। কিন্তু আমাদের দেশে দেখতে পাচ্ছি একদল মানুষই পশু হযে গিয়েছে। ডক্টর মোরোর গল্প আজকের দিনে আমাদের দেশে অচল। তার চেযে বরং ওঅর অফ দি ওয়ার্ল্‌ড্‌স্ ধরা যাক। মহাশূন্যে অভিযান নিয়ে মাতামাতির দিনে এ গল্পেরই এখন বাজারদর।

এইচ. জি. ওয়েল্‌স-এর বর্ণনাটা এই রকমের:

"জীবন্ত মঙ্গলগ্রহবাসীকে যাঁরা কখনো চোখে দেখেন নি, তাঁদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয় জীবটিকে চোখে দেখলে কী ভয়ানক আতঙ্ক হয। V-এর মতো বিশ্রী মুখ, ছুঁচলো ওপরের ঠোঁট, রেখাহীন ভুরু, চিবুকহীন কীলকাকৃতি নিচের ঠোঁট, বিরামহীন কেঁপে-চলা মুখ, রাক্ষসীর মতো শুঁড়, নতুন অপরিচিত আবহাওযায় নিশ্বাস নিতে গিয়ে ফুসফুসের প্রচণ্ড ওঠানামা, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ অধিক হওয়াব দরুন ভারী হাত-পা ও হাত-পা নাড়ার কষ্ট, তারও ওপরে অস্বাভাবিক জ্বলজ্বলে ভাঁটার মতো দুটো চোখ—সব মিলিয়ে প্রচণ্ড, তীব্র, অমানুষিক, ভীতিসঞ্চারকারী, দৈত্যসদৃশ। তেলতেলে বাদামী চামড়ায় ছাতা ধরেছে মনে হয। হাত-পা নাড়ার ক্লান্তিকর ও এলোমেলো ভঙ্গি অবর্ণনীয় রকমের কদর্য। আমার সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাৎ,

কিন্তু একবার তাকিয়েই ভয়ে ও ঘৃণায় আমি মুহ্যমান বোধ করতে লাগলাম।"

তাহলে ঘরের কাছের মঙ্গলই বা কেন, গ্যালাক্‌টিক বিশ্বজগতের দূরতম লোকের কোনো জীব এসে দাঁড়াক না আমাদের এই পৃথিবীতে। আমাদের এই বাংলাদেশে, আমাদের এই কলকাতায়। সম্ভবত এই জীবটির বর্ণনায় এইচ. জি. ওয়েল্‌সকেও আমি টেক্কা দিতে পারি।

বর্ণনাটা কেমন হবে ভাবতে ভাবতে বাইরে আসতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। আমার সামনেই একটি জীব। সে যে কী ভয়ঙ্কর তার বর্ণনা দেবার ভাষা আমার জানা নেই। মানুষের মতোই দেখতে বটে কিন্তু কিছুই তার মানুষের মতো নয়। সম্ভবত অ্যান্টি-ম্যাটার দিয়ে গড়া অন্য কোনো বিপরীত বিশ্ব থেকে এই জীবটি হাজির হয়েছে।

কে তুমি ?

আমি গো বাবু। স্পষ্ট বাংলাভাষায় কথা।

কী চাও তুমি ?

ভাত চাই না গো বাবু, দুখানা রুটি ছ্যান।

না, সায়েন্স-ফিক্‌শন লেখা আমার আর হল না। এ দেশটি সায়েন্স-ফিক্‌শনের জগৎকেও সবদিক থেকে হার মানিয়েছে !

•

একটি ধর্ষণের মামলা

মিহির সেন

সকাল থেকেই শরীরটা খারাপ লাগছিল। একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। দুর্বলতার জন্য ভেবে প্রথমে অতটা গা করি নি। কিন্তু দুপুরের দিকে অস্থিরতাটা বাড়ায় ভয় পেলাম। বড়বাবুকে বলে বাড়ি চলে আসব বলে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, সে পর্যন্ত মনে আছে। কিন্তু তারপর আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান হল, তখন টেবিলের ওপর শুয়ে। চারপাশে সহকর্মীদের ভিড়। ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করছেন।

সব দেখে শুনে তিনি অভয় দিলেন। ভয় পাবার মত্ কিছু নয়। কিন্তু দিন কয়েক কম্প্লিট রেস্টে থাকতে হবে।

ডাক্তারবাবু প্যাড বের করে কিছু ওষুধের নাম লিখে দিলেন। এবং আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মনটাকে খুব হালকা রাখবেন। সবরকম চিন্তা-ভাবনা এড়িয়ে থাকবেন।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। বললাম, বই-টই পড়া যাবে?

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, খুব লাইট ধরনের বই। বাড়িতে সিনেমা-পত্রিকা আছে? অথবা ডিটেক্‌টিভ বই-টই?

সহকর্মী বন্ধুরা যারা পৌঁছে দিতে এসেছিল, তারা রমার কাছে ডাক্তারের নির্দেশটুকুও পৌঁছে দিয়ে গেল। মনের ওপর কোনরকম প্রেশার পড়ে না যেন মনটা সব সময় খুব হালকা রাখবার চেষ্টা করবেন।

ওরা চলে গেলে রমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, এত ভাবছ কী? ডাক্তাররা অমন অনেক উদ্ভট কথাবার্তা বলে থাকে। স্রেফ দিন কয়েক বিশ্রাম নিতে পারলেই দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

রমাও হাসল। হাসির চরিত্র বিশ্লেষণে বুঝলাম, আমার মন হালকা রাখার চেষ্টা।

বিছানায় শুতে শুতে বললাম, সিনেমা পত্রিকা-টত্রিকা কিছু বাড়িতে আছে?

রমা একটু বিব্রত হয়ে বলল, পাড়ায় খোঁজ করে নিয়ে আসব?

রমা দুয়োরে দুয়োরে স্বামীর জন্য সিনেমা-পত্রিকা প্রার্থনা করে বেড়াচ্ছে—দৃশ্যটা কল্পনায় খুব প্রীতিপ্রদ মনে হল না আমার। বললাম, না, না; তার দরকার নেই। তুমি বরং শুক্রবার আর রবিবারের কাগজগুলো দিয়ে যাও। শুয়ে শুয়ে সিনেমা আর সাহিত্যের পাতাগুলোর ওপর চোখ বুলোই।

রমা একটু বাদেই একগাদা পুরনো কাগজ এনে আমার শিয়রে রাখল। তারপর কাউকে দিয়ে আমার ওষুধগুলো আনিয়ে নেবার জন্য বেরিয়ে গেল। আন্দাজেই বুঝলাম, টাকাটাও ওর বাইরে থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে। কারণ আজ সকালেই ওকে জানান দিয়ে রেখেছিলাম যে স্রেফ বাজারের টাকা ক'টা ছাড়া আমার হাতে আর টাকা নেই।

পুরনো কাগজগুলো নাডতে নাডতে হঠাৎ এক জায়গায় আইন ও আদালত বিভাগের ওপর চোখ পডল। একটা ধর্ষণের মামলা।

মেয়েটির বক্তব্য, আসামী মিঃ প্যাটেল ওকে অসহায় অবস্থায় পেয়ে জোর করে ধর্ষণ করে। মেয়েটি প্রথমে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই অবস্থায়ই হঠাৎ পাশের টেবিলের ওপর একটা ফল-কাটা ছুরি পেয়ে সেটা টেনে নেয়। আসামী এতে ভয় পেয়ে দরজা খুলে পালাতে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে এবং আহত হয়। মূলত আত্মরক্ষার জন্যই ও ছুরিটা তুলে নিয়েছিল।

কিন্তু আসামীপক্ষের উকিলের বক্তব্য, এটা আদৌ ধর্ষণের কেস্ নয়। নিছক ব্ল্যাকমেলিং। মেয়েটির ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করা হয়নি। মেয়েটির পূর্ণ সম্মতি ছিল এতে।

উকিল—আপনি মিঃ প্যাটেলকে কতদিন হয় চিনতেন?

ভারতী—দীর্ঘদিন।

উকিল—কী সূত্রে চিনতেন?

ভারতী—প্রতিবেশী হিসেবে।

উকিল—তার বেশি কিছু নয়?

ভারতী—আমার অভিভাবকদের সঙ্গে ওঁদের বন্ধুত্ব ছিল।

উকিল—বন্ধুত্ব, না, নির্ভরতা?

ভারতী—নির্ভরতাও। কিন্তু অনেক পরে সেটা টের পেয়েছিলাম।

উকিল—আপনি প্যাটেল-প্যালেসে মাঝে মাঝে যেতেন?

ভারতী—দু-এক সময় যেতে হত।

উকিল—কেন?

ভারতী—আমার অভিভাবকরা চাইতেন, আমরা যেন মাঝে মাঝে ওঁদের বাড়ি যাই। ওঁদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক রাখি। মাঝে মাঝে ওঁরা নেমন্তন্নও করতেন আমাদের বাড়ির মেয়েদের। কিন্তু আমি সুযোগ পেলেই না যাবার চেষ্টা করতাম। ওঁদের ঐশ্বর্যে আমি কেন যেন শঙ্কিত হতাম।

উকিল—ঘটনার দিন আপনি স্বেচ্ছায়ই গিয়েছিলেন, না, কেউ নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিল?

ভারতী—স্বেচ্ছায় গিয়েছিলাম।

উকিল—কেন?

ভারতী—মিঃ প্যাটেলের সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল।

উকিল—গোপন কথা?

ভারতী—হ্যাঁ, গোপন। কিন্তু—

উকিল—(বাধা দিয়ে) আচ্ছা ঠিক আছে। ও-প্রসঙ্গ পরে আলোচনা করা যাবে। আচ্ছা ভারতী দেবী, আপনি যখন গেলেন তখন মিঃ প্যাটেল কী করছিলেন?

ভারতী—বাগানে বসে চা খাচ্ছিলেন।

উকিল—আপনি ওঁকে সেখান থেকে ইশারায় ডেকে তেতলার ঘরটায় নিয়ে গেলেন?

ভারতী দেবী এতে প্রবল আপত্তি জানান। এবং 'মিথ্যে, মিথ্যে' বলে চিৎকার করে ওঠেন।

উকিল—তাহলে উনিই আপনাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন?

ভারতী—হ্যাঁ। বিদেশ থেকে আসা একটা রেডিওগ্রাম দেখানোর নামে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

উকিল—উনি ঠিক কী কথাটা বলে আপনাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন বলুন তো?

ভারতী—(একটু ইতস্তত করে) উনি আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। হেসে বললেন, কী সুন্দরী, কী সংবাদ ? চলো, তোমাকে একটা দারুণ জিনিশ দেখাচ্ছি।

উকিল—আড়ালে আপনাকে এসব প্রেমসম্বোধন উনি প্রায়ই করতেন, না ?

ভারতী—প্রেম নয়, বয়সের সুযোগ নিয়ে এ ধরনের ঠাট্টা-রসিকতা তিনি মাঝে মাঝে করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু আমাব প্রতিবাদে খুব বেশি সাহস পেতেন না।

উকিল—ঠিক আছে। আপনারা তারপব তেতলায় ওঁর শোবার ঘরে গেলেন। সেখানে গিয়ে কী হল ?

বাদীপক্ষের উকিল এ সময় বাধা দিয়ে বলেন, সে বিবরণ ইতিপূর্বে একাধিকবার প্রদত্ত হয়েছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোন তরুণীর পক্ষে সে বিবরণ সবার সামনে পুনরাবৃত্তি করা যে কতখানি লজ্জা ও গ্লানির বিষয়—আশা করি, মাননীয় বিচারপতি মহাশয় তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

আসামীপক্ষের উকিল—ঠিক আছে, আমিই আপনার বিবরণ অনুযায়ী ঘটনাটিব পুনরুল্লেখ করছি। আপনি শুধু সম্মতি জানিয়ে গেলেই হবে।

আপনি যখন কৌতূহলের সঙ্গে রেডিওগ্রামটা দেখছিলেন, মিঃ প্যাটেল তখন আচমকা আপনাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেন। এবং জোর করে আপনাকে পাশেব চৌকির ওপর শুইয়ে ফেলেন। সেখানে আপনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আপনাকে ধর্ষণ করেন। এই তো ?

ভারতী দেবী মাথা নেড়ে সম্মতি জানান।

উকিল—ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি ছুরিটা তুলে নেন নি ?

ভারতী—না, সেটা আমার চোখে পড়ে নি।

উকিল—আপনি তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বাধা দেন নি ?

ভারতী—দিয়েছিলাম।

উকিল—কী দিয়ে ?

ভারতী—হাত দিয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলাম।

উকিল—আপনি স্বভাবতই চিৎকারও করেছিলেন নিশ্চয়ই ?

ভারতী দেবী এই প্রশ্নের উত্তর দিতে কিছুটা ইতস্তত করেন। নিজের উকিলের দিকে একবার অসহায়দৃষ্টিতে তাকান। পক্ষের উকিল সঙ্গে সঙ্গে

সামান্য উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলে ওঠেন, তুমি যে চিৎকার করেছিলে, সেটা বলো, মা। লজ্জা কী?

ভারতী দেবী হঠাৎ নাটকীয়ভাবে কাঠগড়ার রেলিংয়ের ওপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন, অস্ফুটে বলতে থাকেন—না, না; আমি চিৎকার করি নি। আমি চিৎকার করতে পারি নি।

ভারতী দেবীর নার্ভের ওপর অত্যধিক চাপ পড়ায় ওঁর বিশ্রামের কথা উপলব্ধি করে মাননীয় বিচারপতি মহাশয় সেদিনের মত বিচার মুলতুবি রাখেন।

মেয়েটির সর্বশেষ স্বীকৃতি ঘটনাটাকে কেমন যেন গোলমেলে করে দিল। সত্যিই তো, যদি ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হবে, তাহলে মেয়েটি চিৎকার করল না কেন? পরপুরুষ কেউ হাত ধরে টানলেও যেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মেয়েরা চিৎকার করে ওঠে, সেখানে এই চরম মুহূর্তেই মেয়েটির চিৎকার না করার হেতু কী? তাহলে সত্যিই ও আদৌ কোন বাধা দিয়েছিল কিনা তারই বা প্রমাণ কী?

কী ব্যাপার? বুড়োবয়সে ভিমরতি ধরল নাকি? শুয়ে শুয়ে আইন-আদালত ঘাঁটছ!

রমা কখন মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে টের পাই নি। ফিরে দেখি হাতে খানকয়েক সিনেমা-পত্রিকা। হেসে বলল, ভয় নেই; তোমার সিরিয়াস-নেসের ওপর পাড়াপড়শির আস্থা অটুট রেখেই নিজের নাম করেই নিয়ে এসেছি। বলো তো মলাট দিয়ে দিই।

হেসে বললাম, দরকার নেই। তুমি বরং খুঁজে পেতে এই কেসটার আগের অংশগুলো নিয়ে এস তো।

রমা আমার হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে চোখ বুলিয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, এই কেসটা? এ আবার দেখার কী আছে? এটুকু পড়েই মেয়েটা কী চরিত্তিরের বুঝছ না? ওনাকে আপ্যায়ন করে তেতলায় নিয়ে গিয়ে মালা-চন্দন পরিয়ে ধর্ষণ করা হল, কিন্তু উনি মুখে রা-টি কাড়লেন না। আসলে দর-দামে পোষায় নি, তাই—

ওকে বাধা দিয়ে বললাম, কিন্তু আদালতের রায়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত রায়ের তো গরমিলও হতে পারে। তোমাকে যখন ভালবেসে বিয়ে করি তখন

আমার জ্যেঠিমাদের তো রায় ছিল, তুমি তুকতাক-জানা মেয়ে। না হলে আমার মত এমন হীরের টুকরো ছেলেকে বশ করলে কী করে।

রমা ভুরু কুঁচকে চাপা ধমকের স্বরে বলল, তোমার জিভের কোন লাগাম নেই। ছেলেমেয়েগুলোর ইস্কুল থেকে ফেরার সময় হয়ে গেছে খেয়াল নেই?

রমা কাগজগুলো আনার জন্যই বোধহয় ও-ঘরে গেল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেমেয়েরা হৈহৈ করতে করতে এসে ঘরে ঢুকল। এই অসময়ে আমাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে অবাক হল ওরা। অশুভ কিছুর আশঙ্কায় গম্ভীর হয়ে গেল।

ওদের ভরসা দেবার জন্য হেসে বললাম, কিরে, ভুত দেখার মত সব থ' মেরে গেলি যে? আমার কিছু হয় নি। একটু শরীর খারাপ হওয়ায় বিশ্রাম করছি।

ওরা এসেছে টের পেয়ে রমা তাড়াতাড়ি এ-ঘরে এল গম্ভীরমুখে। ওদের নির্দেশ দিল, তোমরা একদম হৈচৈ মারামারি করবে না কিন্তু। সব লক্ষ্মী হয়ে থাকবে। দেখ না বাবার অসুখ করেছে।

ওরা সবাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ভেতরে চলে গেল। ওদের পদক্ষেপই প্রমাণ করে গেল, সংসারে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ পেয়ে ওরা মনে মনে খুশি হয়েছে।

কিন্তু একটু বাদেই রান্নাঘর থেকে যথারীতি চাপা কলকণ্ঠের আওয়াজ পাওয়া গেল। সবার ওপরে রমার কণ্ঠ, এটা খাব না, ওটা খাব না, তা খাবিটা কী? লোকে একবেলা কোত্থেকে খাবার জোটাবে সেই ধান্ধায় বলে ঘুরে মরছে আর ওনারা কটি খাবেন না। রোজ রোজ এই ঝামেলা পোহাতে পারি না, বাবা। একদিন আমাকে খেয়ে থো, তাহলে সবারই শান্তি হয়।

কিন্তু ছেলেমেয়েগুলোর এই বাক্‌চাতুর্য ধাতস্থ হয়ে গেছে। মা যে ইচ্ছে করলেও নিজেকে আহার্য করে তুলতে পারবে না, সে জ্ঞান ওদের হয়ে গেছে। রমার এই উষ্মাকে ওরা তাই আদৌ আমল দেয় না আজকাল।

আর ছেলেমেয়েগুলোরই বা দোষ কী? ওরা বোঝেই বা কতটুকু? এমন দিনকাল পড়েছে যে আমার মত নিরীহ শান্ত লোকদেরই মাঝে মাঝে কেমন যেন মাথায় খুন চেপে যায়। সবকিছু ভেঙেচুরে তছনছ করে ফেলতে ইচ্ছে করে। আর ওরা একটু বায়নাও ধরবে না?

অগত্যা রমাকে নিরস্ত্র করার জন্য ডাকলাম, শুনেছ, ডাক্তার আমার মনটাকে হালকা রাখতে বলেছে।

রমা গজগজ করতে করতে এ-ঘরে এল। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বলল, ডাক্তারের আর কী? তিনি তো বলেই খালাস। যেদিকে তাকাবে সেদিকেই যদি অশান্তি, কার বাবার সাধ্য আছে মন হাল্কা রাখবে, বলো। মানুষগুলোকে যেন একেবারে পিষে মারতে চায়।

হালকা সুরে বললাম, কে?

রমা বলল, কে নয়? সরকার, ব্যবসায়ী, সবাই।

আপাতগাম্ভীর্য নিয়ে বললাম, তা তোমরাই বা সেধে নিষ্পেষিত হচ্ছ কেন? বাধা দাও।

রমা রাগতভাবে বলল, কী করে বাধা দেব? আমাদের সাধ্য কতটুকু?

আমি হেসে বললাম, সাধ্যটা কম থাকলে অসহায়ভাবে নিষ্পেষিত হওয়া ছাড়া কিছু করার থাকে না তাহলে?

রমা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। তারপর ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে রাগতভাবে বলল, তোমার দেখি মেয়েটার জন্য দরদে বুক ফেটে যাচ্ছে। তা তোমার মুখ চেয়ে তো আর ঘটনা ঘটবে না। কেস্‌টায় প্রায় প্রমাণ হয়ে এসেছে যে, মেয়েটাকে ধর্ষণ করা হয় নি। ও স্বেচ্ছায় দেহ দিতে গিয়েছিল। কাগজগুলো এনে দিচ্ছি, পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে।

রমা একগাদা কাগজ রেখে গেল। এলোমেলো কাগজগুলো খুঁজতে গিয়ে শেষের দিকের একটা কাগজই প্রথমে হাতে পড়ল। সেটা পড়ে মনে হল, বর্তমানে গোটা কেস্‌টাই মেয়েটির চিৎকার করা-না-করার ওপর এসে ঝুলছে। বিপক্ষের উকিল প্রায় প্রমাণ করে এনেছেন যে, মেয়েটির ও-বাড়ি নিয়মিত যাতায়াত ছিল। যাতায়াত না বলে তাকে অভিসারও বলা যেতে পারে। কিন্তু সম্প্রতি স্বার্থান্বেষী কিছু উটকো লোকের উস্কানিতেই ও আসামীকে বিপদে ফেলার জন্য এই মিথ্যা মামলা করেছে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, আসলে চিৎকার চেঁচামেচি শোনা গিয়েছিল কখন? ধর্ষণের সময় নয়, তার পর। মেয়েটি যখন মিঃ প্যাটেলকে আক্রমণ করে তখন। আসলে সঙ্গমের পর মেয়েটির হঠাৎ টেবিলের ওপর, ছুরি নয়, একটা টাকার বাণ্ডিলের ওপর দৃষ্টি পড়ে। হাত বাড়িয়ে সেটাই নিতে

যায় ও। মিঃ প্যাটেল বাধা দেওয়ায় ও চটে গিয়ে ছুরিটা তুলে নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে।

কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে কাগজগুলো যতদূরসম্ভব ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম। মাঝের কতকগুলো অংশ পড়ে বিভিন্ন সাক্ষীর সাক্ষ্য, জেরা ও মেয়েটিব জবানী থেকে যেটুকু জানতে পারা গেল, তা এই :

মেয়েটি একটি প্রাচীন বনেদি পরিবারের মেয়ে। ওর ঠাকুর্দার আমলে সভ্যতা, কৃষ্টি ও সম্পদে এ তল্লাটে বর্ধিষ্ণু পরিবার হিসেবে খ্যাতি ছিল পরিবাবটিব। কিন্তু ক্রমে একান্নবর্তী পরিবারটিতে ক্ষমতা ও দম্ভের লড়াই শুরু হয়।

এই সময় ভিনদেশী জনৈক ব্যবসাযী এ তল্লাটে কিছু জমি ও ব্যবসার সন্ধানে এসেছিলেন। তিনি এই গৃহবিবাদে এক ভাইযের পক্ষ অবলম্বন করে সুকৌশলে বাডির একাংশ ও প্রচুর জমি দখল কবে ফেলেন। সেই থেকেই বেশ বহালতবিয়তে সেই ব্যবসায়ীর বংশধরবা ওদের পৈত্রিক সম্পত্তি ভোগ-দখল করতে থাকে।

কিন্তু সম্প্রতি মেযেটির ভাইরা সাবালক হবাব পর তাঁরা আবার নতুন করে এই পৈত্রিক সম্পত্তি উদ্ধার করার জন্য সচেষ্ট হন। তাঁদের মতে, জমিটা যদি তখন কেউ বিক্রিও করে থাকে, তাহলেও সেটা বেআইনী ছিল। কারণ, সম্পত্তি যৌথ পরিবারের ছিল, একক কারো নয়।

ফলে এই মেয়েটির ভাইদের সঙ্গে সেই ব্যবসায়ীদের প্রচণ্ড বিবাদ শুরু হয়। এবং মামলা-মোকদ্দমা ও নানা বকমের হাঙ্গামা বেধে যায়।

আসামীপক্ষের উকিল—আপনার তখন বয়স কত ?

ভারতী—আমি তখন কিশোরী।

উকিল—এই দাঙ্গাহাঙ্গামায আপনি বেশ তৃপ্তি পেতেন ?

ভারতী—আমি অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়। কিন্তু এটা ছিল আমাদের অধিকারের লডাই। আমরা সেভাবেই দেখতাম এটাকে।

উকিল—আপনাদের পারিবারিক অবস্থা তখন কি রকম ছিল ?

ভারতী—অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে বাস কবতাম আমরা।

উকিল—তাহলে লড়াইটার পেছনে যে আপনার দাদাদের অর্থের বিলাসের লোভ ছিল না, সেটা কি করে বুঝতেন ?

মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। পুরনো স্মৃতির পাতাগুলো খুঁজে দেখার জন্য বোধহয়। তারপর থেমে থেমে বলে, দাদাদের দৃঢ়তা, নিষ্ঠা আর আবেগ দেখে। রাত্রে প্রদীপের আলোয় বসে দাদারা আমাদের ছোটদের কাছে গল্প করতেন, দেখিস, আমাদের ঐ পৈত্রিক সম্পত্তিটা পুনরুদ্ধার করতে পারলে আমাদের আর কোন অভাব থাকবে না, কোন দুঃখযন্ত্রণা থাকবে না। দেহের দিক দিয়ে, মনের দিক দিয়ে সুখ নামে যে শব্দটার অর্থ আমরা উপলব্ধি করতে পারি না, সেই সুখ পোষা-বেড়ালের মত আমাদের পায় পায় ঘুরবে। আমরা অনেকক্ষণ চোখ বুঁজে সেই সুখকে কল্পনায় ছুঁতে চেষ্টা করতাম। সেই সুখ দিয়ে মেঘের গায়ে রূপকথার সৌধ গড়তে গড়তে এক সময় ঘুমিয়ে পড়তাম।

—ইংরেজ আমলে এর চেয়ে কী খারাপ ছিলাম শুনি? স্বাধীনতা পেলে হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা কত সব গালভরা বক্তিমা।

রমার কাংস্যকণ্ঠে মনোযোগ ছিন্ন হয়। রেগে গেলে নিজের মনেই এ রকম বকবক করে রমা। এটা ওর বরাবরের অভ্যেস। আর, একবার এই স্বগতোক্তি শুরু হলে ডান বাম মধ্য কোন দলের নেতাদেরই নিস্কৃতি নেই। তা সে জীবিতই হোক বা মৃতই হোক।

পরবর্তী কাগজটা খুঁজে নিতে নিতে রমাকে ডেকে বললাম—রমা, ডাক্তার আমার মনটাকে হালকা রাখতে বলেছেন।

রমার স্বর এতে খাদে নেমে এল। বলল, তা তো জানি। কিন্তু যা অবস্থা পড়েছে তাতে সব ছেড়েছুড়ে সন্ন্যাসী না হতে পারলে আর মন হালকা রাখার উপায় নেই।

মাঝে মাঝে—

রমা রান্না ঘরের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। বলল, উমাদি এসেছেন। দাঁড়াও, আসছি।

পাশের বাড়ির সাংবাদিক ভদ্রলোকের স্ত্রী উমা-বৌদি। পাড়াপড়শি কাগজে ছাপা হবার আগেই অনেক ফার্স্টহ্যাণ্ড খবর উমা-বৌদির কাছ থেকে পেয়ে থাকে। এজন্য সকলেই কিছুটা সমীহের চোখে দেখে উমা-বৌদিকে।

আমি নিশ্চিন্ত হলাম। অন্তত কিছুক্ষণের মত রমার বকবকানির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল তবু।

উকিল—কিন্তু কিছুদিনের ভেতরই আপনার মোহভঙ্গ হল বলতে চান?

ভারতী—হ্যাঁ।

উকিল—কি করে? একটু খুলে বলবেন?

ভারতী—আমরা শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছিলাম। আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি ফিরে পেয়েছিলাম আমরা। অর্থে বা সামর্থ্যে পরিবারস্থ সকলেরই সেই জয়ের পিছনে কিছু অবদান ছিল। আমার ছোড়দা সেই ব্যবসায়ীদের হাতে প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছিলেন।

কিন্তু কিছুদিনের ভেতরই আমরা লক্ষ্য করলাম, দাদারা আমাদের যে সুখের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তা চোখের পাতা থেকে বাস্তবে নামছে না। আমাদের দারিদ্র্য আগের মতই থেকে গেল। বরং আরো যেন বাড়ল। অথচ তখন আমাদের বাড়ি থেকে কিছু বাড়তি অর্থাগমও হচ্ছিল। দাদারা কিছু ঘর ভাড়া দিয়েছিলেন।

কিছুদিন পর এই নীরব অভিযোগগুলো স্তিমিত স্বরে উচ্চারিত হতে শুরু করল। বড়দা টের পেয়ে হেসে বললেন, এসব ব্যাপারে আমরা নতুন কিনা, তাই প্রথম প্রথম একটু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। দুদিন যাক, দেখিস সব ঠিক হয়ে যাবে। সুখ কাকে বলে তখন দেখবি।

আমরা সেই আশ্বাসে উৎসাহিত হলাম। দারিদ্র্যের সংসার, তাই লোক রাখতাম না আমরা। নিজেরাই সংসারের সব কাজ করতাম। দাদা ছোট্ট একটা প্লাস্টিকের কারখানা করার চেষ্টা করছিলেন। আমরা সেখানে পর্যন্ত কাজ করে দিতাম। জমির পিছনেও যতটা সম্ভব খাটতাম। দাদা আমাদের উৎসাহ দিয়ে বলতেন, এই তো চাই। সব উন্নতির মূলেই আছে নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ শ্রম। আর এ সব কিছুই তো তোদেরই, আমরা আর কদিন।

কিন্তু কিছুদিনের ভেতরই টের পেলাম, বড়দা প্রতিমাসে গোপনে নিজের নামে ব্যাঙ্কে টাকা জমিয়ে যাচ্ছেন। বাড়ির কাউকে সে কথা ঘুণাক্ষরে জানতে দেন নি।

একথা জানাজানি হবার পর পরিবারস্থ লোকদের ভেতর একটা চাপা

বিক্ষোভ দেখা দিল। দাদা টের পেয়ে বললেন, আরে, এটা তো পরিবারেরই টাকা। আমি কি সঙ্গে নিয়ে যাব?

অল্প কিছুদিনের ভেতরই লক্ষ্য করলাম, আমার মেজদা, সেজদারও কথার স্বর কেমন যেন পালটে গেছে। বড়দাকে যেন আড়াল করতে চাচ্ছে ওরা। সজাগ দৃষ্টি রেখে টের পেলাম, বড়দা সুকৌশলে ওদের দলে টেনে নিয়েছেন। ওদের বৌদের নামে ব্যাঙ্কে পাশ-বই খোলা হয়ে গেছে।

—কিন্তু কিছু করতে পারি না পারি, তোমাদের চরিত্তির জানতে তো বাকি নেই, বাবা। উমা-বৌদির স্বর। কৌতূহলে কান সজাগ হল। মাসের শেষে টাকাপয়সা হাতে থাকে না অবশ্য, কিন্তু চরিত্তিরটা তো সারা বছরই ঠিক রাখার চেষ্টা করি।

—এই তো সেদিন একটা কাগজে দেখছিলাম, এ দেশের পুঁজিপতিদের ১৯৪৮ সালে মোট পুঁজি ছিল ৯০০ কোটি টাকা। আর সেটা বেড়ে ১৯৬০ সালে কত হয়েছে, জানো?

উমা-বৌদি বোধহয় একটু সময় দিলেন রমাকে। রমার জন্য মায়া হল আমার। ও জানবে কি, হিশেবটা আমিই জানি না।

উমা বৌদি টেনে টেনে বললেন, তিন হাজার কোটি টাকা। জাতীয় সংকটই যদি হবে, তাহলে এই কুবেরের ভাণ্ডার ওরা গড়ছে কোত্থেকে? আর গড়তে দিচ্ছই বা কেন? রাজ্যশাসনের সব ক্ষমতা তো তোমাদের হাতে। আর এদিকে জয়-মজুর জয়-কিসানদের অবস্থা কী? দেশের শতকরা ষাট জনের দৈনিক আয় বিরোধীদের মতে, তিন আনা আর সরকারের মতে, সাত আনা।

এর পরই চায়ে চুমুকের শব্দ।

উকিল—যদি বলি, আপনার দাদাদের লোভী, স্বার্থপর, নীচ প্রতিপন্ন করতে পারলে তাঁদের বন্ধু হিশেবে মিঃ প্যাটেলকেও হীনচরিত্রের বলে প্রতিপন্ন করা সহজ হয় বলেই, আপনি নিজের দাদাদের, যারা এতদিন নিঃস্বার্থভাবে আপনাদের ভরণপোষণ করেছেন, সেই অভিভাবকদের বিরুদ্ধে এই সব অভিসন্ধিমূলক অভিযোগ করছেন, তাহলে কি ভুল করা হবে?

ভারতী—(উত্তেজিতভাবে) আমার দাদাদের সম্বন্ধে একথা বলতে আমি নিজেও খুব গর্ব বোধ করছি না। ওঁদের নিখুঁত মুখোশের জন্যে সমাজ বহুদিন ওদের স্বার্থপর রূপটাকে চিনতে পারে না। কিন্তু যারা চেনার তারা বেশ অভ্রান্তভাবেই পরস্পর পরস্পরকে চিনে নিতে পারে। তাই ঐ বিদেশী বেনেটি অত সহজে দাদাদের গ্রাস করতে পেরেছিল।

উকিল—আপনি তো তখন সাবালিকা ছিলেন। আপনি কেন বাধা দেন নি ?

ভারতী—দিয়েছিলাম। কিন্তু ওঁরা শোনেন নি। ওঁদের যুক্তি ছিল, বাড়িটা বড করে ফেলতে পারলে ভাডা দিয়ে যে টাকা পাওয়া যাবে, তা দিয়েই ওদের ধার শোধ করা যাবে। কোন বড কাজই ঋণ না নিযে করা যায় না।

উকিল—দাদাদের নিষেধ কবার ক্ষেত্রে আপনার কোন সুনির্দিষ্ট যুক্তি ছিল ?

ভারতী—পুরনো অভিজ্ঞতায় ভিন্‌দেশি বণিকদের অনুপ্রবেশকে আমি সন্দেহের চোখে দেখতাম। ইতিহাসে নিঃস্বার্থ বেনের কোন নজির নেই।

উকিল—কিন্তু আপনি ছাডাও আপনাদের পরিবারে তো আরো অনেক সাবালক মেম্বার ছিল, তারাও কি আপত্তি করেছিল ?

ভারতী—কেউ কেউ করেছিল, কেউ কেউ করে নি। তাছাডা, ঋণ, সুদ, শেযার, ঋণদাতার চরিত্র, পরিবারের দূরবর্তী স্বার্থ—এই সবকিছু জডিয়ে গিযে এমন একটা জটিল আকার ধারণ করেছিল যে, প্রথমদিকে এর আসল ছবিটা অনেকেই ঠিক বুঝতে পারত না।

উকিল—কিন্তু যারা প্রতিবাদ কবত না, তারা সকলেই যে আপনার চেয়ে কম বোঝে বা কম পরিবাব-দরদী, তাই বা আপনি বুঝলেন কি দিয়ে ?

ভারতী—তাদের চরিত্র দেখে। এই নতুন চতুব বেনেটির আইনি বেআইনি নানা রকমের ব্যবসা ছিল। আমাদের পরিবারেব ছেলেমেযেদের অনেককেই তারা নানাভাবে সেই সব ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছিল। এতে ওদেব হাতে বেশ কিছু কাঁচা টাকা আসত। এই কাঁচা টাকার জৌলুসে ওদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। চলায় বলায় ব্যবহারে ওরা কেমন যেন বেপরোয়া হয়ে উঠল। আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের কথা ভুলে গেল ওরা। আমি অসহায়ের মত দাঁডিয়ে দাঁডিয়ে অনুভব করতাম, ঐ

চতুর বেনেটি আমাদের গোটা পরিবারটাকে একটা অদৃশ্য বন্ধনে অক্টোপাশের মত আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে।

তাই মার্কিন কংগ্রেসের রিপাবলিকান সদস্য সিলভিযো কটি এত জোর দিযে বলতে পারেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিশেবে ভারতে যে টাকা জমা আছে তার পরিমাণ ২৫০ কোটি টাকারও বেশি। ইচ্ছা করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের আর্থিক বিলিব্যবস্থা প্রায় নিযন্ত্রণ করতে পারে।

এটা কী হল? এ মামলায় এ প্রসঙ্গ এল কি করে? আমি অবাক হলাম।

কিন্তু দু এক পৃষ্ঠা উল্টেপাল্টেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। শেষ পৃষ্ঠার একটা অর্থনৈতিক প্রবন্ধের শেষ অংশ এটা। ছাপাখানার ভূতের উপদ্রবে এ অংশটার ওপর বন্ধনীভুক্ত 'আট পৃষ্ঠার শেষাংশ' লাইনটা বাদ পড়ে গেছে।

এবং মামলাটার পরবর্তী কয়েকটি লাইন অন্য কলমে গিযে শেষ হয়েছে। সেই কযেক লাইনের ওপর চোখ বুলিয়ে অন্য কাগজগুলো খুঁজতে লাগলাম।

অতঃপর সরকারপক্ষের উকিল ভারতী দেবীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীগণেশ হালদারকে জেরা করেন।

উকিল—মিঃ প্যাটেলের কাছ থেকে আপনি এ পর্যন্ত কত টাকা ঋণ করেছেন?

গণেশ—হিশেব না করে বলতে পারব না।

উকিল—সে ঋণ আপনি শোধ করতে শুরু করেছেন?

গণেশ—আমার অনুরোধে তিনি শোধের সময়সীমা বর্ধিত করেছেন।

উকিল—এই ঋণের সঙ্গে কি কোন শর্ত ছিল?

গণেশ—না।

উকিল—ঋণের টাকায় আপনি যে একতলা বাড়িটাকে চারতলা করছিলেন এবং যে কাচের ফ্যাক্টরি করবেন ভাবছিলেন, তার মেটিরিযাল সাপ্লাই করার কণ্ট্রাক্ট ওদের পরিবারের একজনকে দিতে হবে, এমন কোন শর্ত ছিল না?

গণেশ—ওঁরা সে রকম একটা অনুরোধ জানিয়েছিলেন এবং আমি স্বেচ্ছায় সেটা মেনে নিয়েছিলাম।

উকিল—কিন্তু ওদের রেট্ অন্যান্য কোম্পানির চেয়ে অনেক বেশি ছিল, এ নিযে ওদের সঙ্গে একবাব আপনাব বাগ্‌বিতণ্ডা হয়েছিল কি ?

গণেশ—বাগ্‌বিতণ্ডা নয়, আলোচনা হয়েছিল।

উকিল—কিন্তু আলোচনাব শেষেও আপনি সেই হাইরেট্ মেনে নিয়েছিলেন কেন ?

গণেশ—(উত্তেজিতভাবে) এটা কি আমার ব্যক্তিগত এক্তিয়াবেব মধ্যে পডছে না ?

উকিল—(হেসে) আচ্ছা, মিঃ হালদার, আপনার কি ধারণা, আপনি চাওয়া মাত্র, অথবা বলা যেতে পারে, প্রায স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই মিঃ প্যাটেল এই বিরাট অঙ্কের ঋণ নিঃস্বার্থভাবেই আপনাকে দিযে যাচ্ছেন ?

গণেশ—কোন ঋণই নিঃস্বার্থভাবে দেওযা হয় না। এই ঋণের জন্য তাঁরা সুদ পাচ্ছিলেন। এখনও পাচ্ছেন।

উকিল—সুদ ছাড়া তাঁদের আর কিছু দাবি ছিল না ?

গণেশ—(একটু ইতস্তত করে) আমাদের ব্যবসাব কিছু শেয়ার আমরা স্বেচ্ছায ওদের দিয়েছিলাম।

উকিল—কিন্তু শুরুতে ওদের যে কটা শেয়ার ছিল এখনও কি তাই আছে ? না, ক্রমেই বাড়ছে ?

গণেশ—এটা কি আমার ব্যক্তিগত এক্তিয়ারের ভেতব পডছে না ?

উকিল—(হেসে) ঠিক আছে, এই ব্যক্তিগত প্রশ্নটি আমি মুলতুবি রাখছি। আচ্ছা, মিঃ হালদার, সম্প্রতি প্যাটেল ফ্যামিলি আপনাদেব ধানী জমিতেও কিছু টাকা ইনভেস্ট করেছেন কি ?

গণেশ—আমি স্বেচ্ছায় ওদের সহযোগিতা আহ্বান করেছিলাম।

উকিল—সহযোগিতা, না, রাসায়নিক সার সাপ্লাইয়ের কন্ট্রাক্ট ?

গণেশ—সেটাও সহযোগিতার ভেতরই পডছে।

উকিল—কিন্তু দীর্ঘ-মেয়াদি কিস্তিতে এই সারের দাম শোধ করার সুযোগের বিনিময়ে উৎপন্ন কৃষিজাত পণ্যেব একটা অংশ ওঁদের দিতে স্বীকৃত হয়েছেন কি ?

গণেশ—(উত্তেজিতভাবে) এটা কি আমার ব্যক্তিগত এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ছে না ?

উকিল—(হেসে) আচ্ছা, মিঃ হালদার, আপনাদেব বাড়ির—আশা করি সেটা ঠিক আপনার ব্যক্তিগত এক্তিযার নয়—একটা অংশ কি খুব গোপনে মিঃ প্যাটেলের কাছে আপনি মর্টগেজ দিয়েছেন ?

গণেশ—(উত্তেজিতভাবে) আমি অস্বীকার করছি।

উকিল—সেই দলিলের ফোটোস্টাট্ কপি দেখতে চান ?

গণেশ—(আমতা আমতা করে) দিলেও, পরিবারের স্বার্থের কথা ভেবেই দিয়েছিলাম। একটা সাময়িক প্রয়োজনেই দিয়েছিলাম।

উকিল—কিন্তু এতে, এত কষ্টার্জিত পৈত্রিক সম্পত্তি যে নতুন করে এক বিদেশী বেনের খপ্পরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, এ সন্দেহ কি আপনার একবারও হয় নি ?

গণেশ—আদৌ না। পূর্ণ মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষা কবেই আমরা পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষা করে যাচ্ছি।

উকিল—বেশ, মর্যাদার প্রশ্ন আমি আপাতত তুলছি না। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা কি বক্ষা করতে পারছেন ?

গণেশ—নিশ্চয়ই।

উকিল—তাহলে আপনাদের পতিত জমিটার প্রসঙ্গে বিস্তারিত পরিকল্পনাটা মিঃ প্যাটেলের অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছিলেন কেন ?

গণেশ—অনুমোদন নয়, পরামর্শের জন্য।

উকিল—বেশ; কিন্তু মিঃ প্যাটেল যখন চৌধুরীবাবুদের কাছ থেকে ওঁদের বস্তিটা গোপনে কিনে নিয়ে একদা গভীর রাত্রে গুণ্ডা দিয়ে সেই বস্তি ভেঙে চুরমার করে দিলেন, তখন পাড়ার সমস্ত অধিবাসীরা প্রতিবাদ করলেও আপনারা তা পরোক্ষে সমর্থন করেছিলেন কেন ?

গণেশ—বস্তিবাসীদের পক্ষ থেকেও গুণ্ডামির আশ্রয় নেওযা হযেছিল বলে।

উকিল—এটা অবশ্য আপনার ব্যক্তিগত এক্তিয়ার। কিন্তু প্যাটেল পরিবারের বখাটে ছেলেগুলো পাড়ার মেযেদের বিভিন্নভাবে বিব্রত করায় পাড়ার অভিভাবকরা যখন পুলিশের কাছে গণদরখাস্ত দিলেন, আপনি তাতে স্বাক্ষর করেন নি কেন ?

গণেশ—মিঃ প্যাটেল আমাকে বলেছিলেন, পাড়ার মেয়েরাই অর্থের লোভে ওঁদের পরিবারের ছেলেদের পিছনে ঘুরে বেড়ায়। ইদানীংকার মেয়েদের চালচলন দেখে সেটা আমার অবিশ্বাস্য মনে হয় নি।

উকিল—তাহলে ঐ পরিবারের দুটি যুবকের আপনাদের পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে আচার-আচরণ অশোভন মনে হওয়ায় আপনি আপনার পরিবারের মেয়েদের শাসিয়েছিলেন কেন?

গণেশ—আমাদের পরিবারের সম্ভ্রম আমি কিভাবে রক্ষা করব, সেটা নিশ্চয়ই অন্যের বিচার্য নয়?

উকিল—নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও কি আপনার মেয়েরাও অর্থের লোভেই যুবক প্যাটেলদের পিছনে ঘুরত বলে আপনার মনে হয়েছে?

গণেশ—(উত্তেজিতভাবে) মোস্ট্ অব্জেকশনেবল।

উকিল—(দৃঢ়তার সঙ্গে) ইয়েস, অবজেক্শনেবল। কিন্তু সেটা আমার প্রশ্ন নয়, পরিবারের ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা। গোটা পরিবার তাদের পারিবারিক বংশমর্যাদা, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধির দায়িত্ব সরল অন্ধ বিশ্বাসে আপনার হাতে তুলে দিয়েছিল। কিন্তু তার বিনিময়ে আজ গোটা পরিবারকে আপনি এক চরম বিপর্যয়ের মুখে এনে ফেলেছেন। পরিবারস্থ সাধারণ সদস্যরা ঋণ, সুদ, লগ্নির জটিলতা বুঝতে পারে না, কিন্তু নিজেদের অনুভূতি দিয়ে তারা আজ অনুভব করছে, গোটা পরিবার একটা চরম বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবেশীদের চোখে তাদের সেই পুরনো সম্ভ্রম বা শ্রদ্ধা আজ ক্রমঅপস্রয়মান। একটি বিদেশী বেনের প্রসারিত বা কুঞ্চিত ভুরুর ওপর আজ নির্ভর করছে পারিবারিক বহু সিদ্ধান্ত। ফলে, তাদের পুরনো পারিবারিক মূল্যবোধগুলো পর্যন্ত আজ বিপর্যস্ত। অভিভাবক হিসেবে তাদের চোখে আপনাদের ইমেজ আজ ভগ্নপ্রায়। আর, সেই কারণেই আজ আপনার পরিবারের মেয়েরাই আপনাকে অস্বীকার করে, একটি বাইরের পরিবারের যুবকদের সঙ্গে প্রায় প্রকাশ্যেই অশোভন আচরণে সাহস পায়। যদি তর্কের খাতিরে ধরেই নিই, এ ক্ষেত্রে সেই যুবকরাই দায়ী, সেক্ষেত্রেও আপনাদের প্রতিবাদের রুদ্ধকণ্ঠই কি পরোক্ষে তাদের প্রশ্রয় যোগাচ্ছে না?

শ্রীগণেশ হালদার তীব্র চিৎকার করে এর প্রতিবাদ জানান। এবং

হঠাৎ আদালতের ভেতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় সেদিনের মত মামলা মুলতুবি থাকে।

পরের কাগজগুলো খুঁজতে খুঁজতে রান্নাঘরের দিকে তাকালাম। উমা-বৌদি পিছন ফিরে বসে পান সাজছেন, অবশ্য মুখও চলছে। এমন যে রমা, সেও উমা-বৌদি এলে নীরব শ্রোতা। যেকোন ব্যাপারেই হোক না কেন ভদ্রমহিলা অশ্রান্ত বক্তা।

মাঝের কয়েকটা কাগজ নেই। পরের একটা কাগজেব জেরার অংশটায় চোখ পড়ল।

উকিল—পরিবারের লোকদের আপনি দাদাদের বিরুদ্ধে উস্‌কে দেবার চেষ্টা করতেন কি ?

ভাবতী—না। তাঁদেব সংকটের স্বরূপটা বোঝানোর চেষ্টা করতাম।

উকিল—আপনার কথাবার্তায় আপনাকে তো বেশ সচেতন বলে মনে হয। তাহলে পবিবারেব এই বিপদের সময আপনি দাদাদের পাশে এসে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেন না কেন ?

ভারতী—বৃথা জেনে। আমার সে চেষ্টা বহুবার ব্যর্থ হওযায়। তাছাড়া দাদারা আমাকে কিছুটা ভয়ের চোখে, অবিশ্বাসের চোখে দেখতেন। ওঁরা সন্দেহ করতেন—চরম মুহূর্তে কোন প্রতিরোধ এলে সেটা আমার মাধ্যমেই আসবে। গোপনে অন্যদের কাছে আমাকে তাই ওঁরা স্বেচ্ছাচারী, অবিমৃষ্যকারী, ঐতিহ্যবিরোধী বলে রটনা কবার চেষ্টা করতেন।

উকিল—আচ্ছা, ভারতী দেবী, প্যাটেলদেব সঙ্গে আপনার দাদাদের সংঘর্ষেব কথাটা তো আপনি জানতেন ?

ভারতী—সংঘর্ষ নয়, স্বার্থের গোপন সংঘাত।

উকিল—বেশ, তাও যদি হয়, তবু এই পরিস্থিতিতে আপনি স্বেচ্ছায় কেন মিঃ প্যাটেলদের শত্রুপুরীতে গিযেছিলেন সেদিন ? আপনি যে বলেছিলেন, তাঁর সঙ্গে আপনার কিছু গোপন কথা ছিল, সেই গোপন ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই কি ?

ভারতী—(উত্তেজিতভাবে) হ্যাঁ, ব্যাক্তিগত প্রয়োজনেই। কিন্তু প্রয়োজনটা ছিল পরিবারের পক্ষ থেকে তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া।

উকিল—কিন্তু আপনার কথামত আপনাদের পরিবার তো ছিল মিঃ প্যাটেলদের পক্ষে।

ভারতী—কিন্তু কোন কোন পরিস্থিতিতে একই পরিবারের একই সঙ্গে দুটো পরিচয় থাকতে পারে, সেকথা বোধহয় আপনার জানা নেই। একটি পরিচয় বহন করেন পরিবারের কর্ণধাররা, অন্য পরিচয়টি বহন করে পরিবারস্থ অভাজনরা। আমি সেই দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিনিধি হিশেবে গিয়েছিলাম।

উকিল—কিসের বোঝাপড়া ?

ভারতী—অসম্মানের, অশালীনতার প্রতিবাদে। আমাদের পরিবারের যে মেয়েরা স্বেচ্ছাচারী ছিল তাদের জন্য সহানুভূতি ছিল আমার, কিন্তু শ্রদ্ধা ছিল না। শ্রদ্ধা ছিল আমার ছোট বৌদি, মৃত ছোড়দার বিধবা স্ত্রীর প্রতি। আমার চোখে সে ছিল শহীদের স্ত্রী। সব সময় কেমন যেন একটা অসহায় সঙ্কোচে নিজের ভেতর গুটিয়ে থাকত বৌটি। বৃথাই এ পরিবারের ওপর নিজেকে একটা বোঝা মনে করত ও। তাই বড়দারা ওকে যখন মিঃ প্যাটেলদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের বাঙলা শেখানর জন্য অনুরোধ জানালেন, ও অস্বীকার করতে পারে নি। হয়ত ভেবেছিল, নিজের হাতখরচটা তো অন্তত আসবে। কিন্তু ঘটনার আগের দিন রাত্রে সেই বৌদি যখন মিঃ প্যাটেলের অশোভন আচরণের অভিযোগ এনে আমার দুহাত ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল, আমি তখন স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

উকিল—কিন্তু অভিযোগটি বাড়ির অভিভাবকদের কাছে না এনে হঠাৎ আপনার কাছেই বা আনলেন কেন ?

ভারতী—যথানিয়মে অভিযোগটি বৌদি দাদাদের কাছেই নিবেদন করেছিল। কিন্তু দাদারা নাকি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বৌদি ঠিক বুঝতে পারে নি, মিঃ প্যাটেল নাকি বয়সের দাবিতে বৌদির সঙ্গে সস্নেহ কৌতুক করেছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে দাদাদের জন্য আমি করুণা বোধ করেছিলাম। আর সিদ্ধান্তে এসেছিলাম, আর নয়, এবার প্রতিবাদের পালা শুরু করা প্রয়োজন। পরদিন সকালে তাই সব বিপদ অগ্রাহ্য করে আমি মিঃ প্যাটেলের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গিয়েছিলাম।

উকিল—ভাইদের কাউকে সঙ্গে নিলেন না কেন ?

ভারতী—আমার দুটি ভাইপো যেতে বাজি হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ওরা দাদাদের ভয়ে পিছিয়ে গেল।

উকিল—একা যেতে আপনি ভয় পেলেন না? না, ভয়টা আপনার বরাবরই কম?

ভারতী—বাড়িব বিরাট দেউড়ির সশস্ত্র প্রহরীদুটোকে পেরিয়ে ভেতরে পা দিয়েই আমি কিছুটা ভয় পেয়েছিলাম। বিশাল প্যাটেল-প্যালেসটাকে এতদিন আমার ঐশ্বর্যের ঘোষিত দম্ভ বলে মনে হত, কিন্তু সেদিন হঠাৎ কেন যেন ওকে নির্মম শক্তির প্রতীক বলে মনে হল। সেই ভয়কে ঢাকতে আমি আত্মবিশ্বাসের মুখোশ পরে নিলাম। তাই মিঃ প্যাটেল যখন আমাকে তেতলার ঘরে আহ্বান জানালেন, আমি আপত্তি জানালাম না। অবশ্য, তখনও ওরকম চরম কিছুর আশঙ্কা আমার কল্পনারও বাইরে ছিল।

বাইরে পায়ের শব্দে ফিরে তাকালাম। বিমল ঘরের সামনে দিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। কিছুটা গম্ভীর মনে হল ওকে।

উত্তেজিতভাবে কী যেন বলছিল ও রমাকে। যেটুকু শুনলাম তাতে মনে হল, স্যাকারিন পায় নি, সেটা নাকি হঠাৎ বাজার থেকে উধাও হয়ে গেছে। আর, কী একটা ওষুধ নাকি ব্ল্যাকে ছাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এ নিয়ে বোধহয় কী একটা হাঙ্গামাও করে এসেছে ও।

উমা-বৌদির এতক্ষণের সংবাদপত্রের কাটিংগুলো রমার মানসিক উত্তাপ বাড়িয়েই রেখেছিল, বিমলের বিবৃতিতে এবার আচমকা ফেটে পড়ল ও। আচ্ছা উমাদি, এরা কী পেয়েছে বলতে পারেন? আজ এটা উধাও, কাল ওটা উধাও, যখন যেটার খুশি দাম যা খুশি তাই চড়িয়ে দেওয়া—এরা কি গরুছাগল পেয়েছে আমাদের? ওরা কি চায় মানুষগুলো পাগল হয়ে যাক বা আত্মহত্যা করে মরুক?

উমা-বৌদি শ্লেষের স্বরে বললেন, তা চাইবে কেন? দধীচিব হাড়কে ওদেব ভীষণ ভয়। প্রাণটা দেহের মধ্যে রেখেই ওরা মানুষগুলোকে নিষ্পেষণ করে রক্তটুকু চুষে খেতে চায়।

আমি গলা তুলে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে বললাম, উমা-বৌদি, উইথ ডিউ এপলজি, আমি আপনার কথার প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

উমা-বৌদি ঠিক বুঝতে পারলেন না একটু অবাক হয়ে আমার ঘরে এলেন। সঙ্গে ওরাও। উমা-বৌদি বললেন, কিসের প্রতিবাদ ?

সাজানো গাম্ভীর্যে বললাম, ঐ নিষ্পেষণ শব্দটার। দেশের মানুষগুলোকে দেখে তো আদৌ মনে হয় না তারা কোন নিষ্পেষণের যন্ত্রণা বোধ করছে। তাহলে তো এতদিনে কবে রিভোল্ট করত।

উমা-বৌদি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, রিভোল্ট করছে না সে শক্তি নেই বলে, শিক্ষা নেই বলে।

বললাম, বেশ, রিভোল্ট না করুক, চিৎকার চেঁচামেচি করেও তো চারদিক তোলপাড় করে দিতে পারত ?

উমা-বৌদি বিরক্তির স্বরে বললেন, কী মুশকিল, চারদিকে চিৎকার নেই বলেই নিষ্পেষণও নেই, এ তো একটা অদ্ভুত যুক্তি দেখছি। চিৎকার না থাকলেও আপনি নিষ্পেষণটা অস্বীকার করবেন কী করে ?

আমি ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে রমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললাম, প্লিজ, নোট ডাউন।

রমা তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বলল, এ দুটো মোটেই এক কেস্ নয়।

বলে আর দাঁড়াল না রমা। গজগজ করতে করতে রান্নাঘরে ফিরে গেল আবার।

•

রাজিন্দর

যুবনাশ্ব

মকবুল সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছে—
এসব কাজে সে আর নেই।

অনেক খুন-খারাবি, রাহাজানি করছে ও করিয়েছে। শুধু মোটা ইনাম আর লুটের বখরা ছাড়াও দেমাকের ব্যাপার ছিল সে আমলে। এখন অন্য জমানা। টাকার অঙ্ক বেড়েছে, কিন্তু ইজ্জৎ নেই। আজ যে দোস্ত্, কাল সে দুশমন।

কাম করানেবালা রহিস্ আদ্‌মিও বিলকুল বেপাত্তা। এখনকার সব শালা বানিয়া। আর বানিয়া তো বাঁদীর বাচ্ছা, দুনিয়াসুদ্ধ লোককে পেটে মেরে নিজের ভুঁড়ি বাগাচ্ছে। মকবুলের ইচ্ছে করে ওদেরই ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিতে।

ভাবতে গিয়ে মনে মনে হেসে ফেলে মকবুল। ওই সাতমনি ভুঁড়িওলা থেকে নাড়িভুঁড়ি না বেরিয়ে কেবল হাজার টাকা লাখ টাকার নোট আর তাল তাল সোনা জহরত যদি বেরিয়ে পড়ে।

•

রহিস্ মানে খালি রেস্তদার নয়। দিল্। ইয়া বড়া দিল্ ছিল শাম্‌সু সাহেবের, ঘড়িওয়ালা বাড়ির সেনবাবুর। কাকে পক্ষীতেও জানত না এসব কে করাচ্ছে। টেগার্ট সাহেব জানত, পূর্ণ লাহিড়ী জানত। ওরা তো পুলিশ। পুলিশ মানেই দলের লোক। কিছু বলত না। ছ'মাসে ন'মাসে জেল খাটবার ভেড়ুয়া জনাকতক হুজুর বরাবর পৌঁছে দিলেই হত। দু-চার মাস জেল খাটত তারা, আর পুলিশ বাহবা পেত। তাদের মাগ-বাচ্চারা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকত নিজের ডেরায়, নিজের মুলুকে। নিয়মিত মাসোহারা

চালাত শামুস্থ সাহেবেরা, সেন বাবুরা। পুলিশের সাথে মালিকদের কী ব্যবস্থা ছিল খোঁজ রাখত না মকবুল। আঁচে বুঝত ব্যাপার একটা আছেই। মোটা দাগের। তা থাকুক গে।

কাল রাত দুটোয় শালকের রোলিং মিলের মালিকের দালাল এসে বলে গেছে, দু'শ লোক চাই, আজ বিকেলে কোথায় কি মিটিং আছে ভাঙতে হবে। হামলা করতে হবে। ট্রাম পোড়াতে হবে। স্রেফ্-শুরু করে দিয়ে কেটে পড়তে হবে। সর্দার দু'শো, আর জনপ্রতি দশ। হুজ্জৎ শুরু হলে আপনা থেকেই চলবে। দোকানপাট লুট হবে, অনেক পকেট মারা যাবে, ঘড়ি আংটি ছিনতাই হবে, দু'দশটা কলিজার ধুকধুকিও বন্ধ হয়ে যাবে হয়ত। অমন কত হচ্ছে, কে পরোয়া করে।

গিয়া লড়াইয়ে কত লোক মরেছে দেখতে যায় নি মকবুল, কিন্তু লড়াইয়ের সময় খাস কলকাতায় 'ভাত দাও ফ্যান দাও' করে মরেছে বহুৎ লোক। তারপর জনাব সুরাবর্দির লড়্কে লেঙ্গের দিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অমন কত লাখ খুন-খারাবি হয়ে গেল, এখনো হচ্ছে, কে তার হিশেব রাখে। মকবুল নিজেই জানে না কখন তার মন ভিতর ভিতর বিগড়ে গেছে।

সে রাজী হয় নি।

বলেছে এসব কাম ছেড়ে দিয়েছে সে।

কিন্তু আসলে আরও কথা আছে।

ময়দানে জমায়েত হচ্ছে শালকের কারখানার মজুরেরা। হামিদ আর রাজিন্দরের কাছ থেকে খবর পেয়েছে।

হামিদ আর রাজিন্দর মকবুলের জান পহ্চানের লোক। পাঁচু মামার দোকানের বারান্দায় এক নম্বর পাকা মালের বোতল নিয়ে সন্ধ্যেবেলা বসে ওরা। হামিদ কারখানার আগমিস্তিরি, গন্‌গনে ফার্নিসের মধ্যে বেল্চা হাতে দিন কাটায়। রাজিন্দরটা কেরানি।

দুটিতে জবর দোস্তি, যেন এক মায়ের পেটের ভাই। কারখানায় ওরা দেড়শো আন্দাজ লোক খাটে, ভূতের মতো খাটে। মকবুল শুনেছে মুনফা হয় অঢেল, মালিক নোপচাঁদ মারোয়াড়ি দু'বছরের মধ্যে দ্যাখ্ দ্যাখ্ করতে করতে কলকাতার সাহেব পাড়ায় চার চার খান নয়া মোকাম তুলে ফেলল।

কিন্তু মজুর কেরানির বেতন বাড়ে না। ভাতা বাড়ে না। এদিকে

বাজারে খানাপিনার সব চীজের দাম বাড়ে। ঘরে যাদেব বাচ্চা জরু আছে তাদের ডাগ্‌দবি হয না, স্কুলমক্তবের ব্যবস্থা হয না, ছুটিছাঁটা নেই, ঘরবাডি নেই, বস্তি সম্বল। শুধু আছে কারখানা আর খাটুনি আর মালিকের মোটা মুনফা।

একদল ছোকরা বাবু ওদের সব বুঝিযেছে। বুঝিযেছে যে, চাইতে জানলে আর পারলে সব কিছু পাবে তারা। এই দাবির মিটিং হবে আজ ময়দানে। আরও আশপাশের কয়েকটা কারখানার মজুবরাও আসবে। মজুর ছাডা অন্যেরাও আসবে, যেমন রাজিন্দর। রাজিন্দরটা মজুর নয়, বাবু। কিন্তু ও নিজেকে মজুর বলে। বলে, তপ্ত খোলায ছোলা কডাই একসাথে ভাজা হচ্ছি বে শালা, আমরা সবাই মজুর। বাজিন্দরটা মজাব মানুষ, মজা করে কথা কয। আর হো হো করে হাসে।

দালাল বাবু বুঝিয়েছিল যে দাঙ্গা বাধিয়ে দিলে পুলিশ কিছু বলবে না। মালিক নাকি নয়া জমানার উজীর ওমরাওদের পেয়ারের লোক। উল্‌টে মিটিং-অলাদেরই পেটাবে। তাও মকবুল রাজী হয নি।

কিন্তু একথা মকবুল বেশ জানে যে, সে রাজী না হলেও মিটিং ভাঙবার লোকের অভাব হবে না। আংরেজ যাবার পর বিশ বছরে নাম-না-জানা বহুৎ দল গডে উঠছে শহরে। কুর্তা প্যাণ্ট পরা মাওযালী ছোকরারা সে দলের পাণ্ডা। এই ছোকরাগুলো কোত্থেকে গজিয়ে উঠল ঠাহর করে উঠতে পারে না মকবুল। বেশির ভাগই সিটি-দেওয়া সিনেমা-যাওয়া হাফ্‌ ভদ্দর গোছের কিন্তু হালচালে হাবামির একশেষ। দেখতে পায় ইস্কুল কালিজেও পডে কেউ কেউ। আর সবাই কলকাতারও নয়, বাইরে থেকেও আসে অনেকে। মকবুল দেখেছে, ওদের বাঁধা কোন দলও নেই, কিন্তু একটা কিছু ঘটলেই দু-পাঁচশো ভোজবাজিব মতো হাজিব হয কোত্থেকে। মিটিং হবে কোন্‌ জায়গায খবরটা দিলেই হল, তারপর লডে যাবে ওরা ইচ্ছেমতো দল বেছে। ওদের সাথে ভাডাটে নযা গুণ্ডার দলও জুটে যাবে। ওরা বেশির ভাগই কিন্তু লডবে মজুবদের হয়ে আর ভাডাটেরা মালিকদের পক্ষে। এমনিই হামেশা হচ্ছে আজকাল।

মকবুল ভাবে, ইস্কুল কালিজের ছেলেরা তো আগে এত মারপিটে ভিডত না। কখনো-সখনো নিজেদের খেলাধুলা নিয়ে ঝগডা হলে, আর না হয়,

কোনো বড লীডরকে পুলিশ অ্যারেস্ট করলে ছেলেরা খেপত। এখন পান থেকে চুন খসলেই ওরা সব এগিয়ে আসে।

যাক গে। জমানা পাল্টে গেছে। আর কতদিন খোদা রাখবেন এ ত্বনিয়া, আর কত কি দেখতে পাবে। ষাট ছাড়িয়ে সত্তরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে মকবুল।

এখন তো সকাল আটটা, আজ আর হামিদ রাজিন্দরের সাথে সন্ধ্যেবেলা দেখা হবে কিনা কে জানে। বিকেলে তো ওদের মিটিং, কিন্তু হাঙ্গামার খবরটা দেওযা যায় কী ক'রে।

হামিদ তো থাকে বস্তিতে। তার না আছে জরু, না আছে বালবাচ্চা। রাজিন্দরটা থাকে শালকেতেই, রতনবাবুর গলির এক ভাডাটে বাড়ির একতলার একখানা ঘরে। ওর বৌ আছে, একটা বাচ্চা মেয়ে আছে। একদিন পাঁচুমামার দোকানে বে-এক্তার হযে যাবার পর পৌছে দিয়েছিল, হামিদ পাত্তা বাৎলে দিয়েছিল। ভাবল, সেইখানেই খবরটা দেবে।

কিন্তু তাতেই বা লাভ কী? কারখানা থেকে তো রাতের আগে বাড়ি ফিরবে না রাজিন্দর। খবর দিতে হলে কাবখানাতেই যেতে হয। কারখানারই পথ ধরল সে।

কারখানার ফটকে পাঁচ-সাতটা দরোয়ান বসে গুলতানি করে। তাদের মধ্যে সব চেযে বুডো বামটহল সিং মকবুলের জানা। আজ চল্লিশ বছর মঙ্গলা হাটেব গুণ্ডা দলেব সর্দারি করছে, ওকে চেনে পুরনো লোক সবাই। তাছাড়া চাল বদলায় নি। মকবুল পয়সা বহুৎ কামিয়েছে, উডিযেও দিয়েছে। আমীর হযে ভাই-বেরাদার থেকে ফারাক হযে যায় নি। মঙ্গলবার মঙ্গলবার মস্ত হাট বসে, সেখানকার একদল কুলির সর্দারি করে এখন। প্রায় ত্ব' আডাইশো লোকের পেমেণ্ট হয় ওর হাত দিয়ে, মাস গেলে শ' তিনেক টাকা নিজের থাকে, তাতেই বেশ চলে যায় ওর। বৌ মরেছে তিরিশ সাল আগে, একটা ছেলে ছিল, সেও বছর দশেক আগে মারা গেছে বেমারিতে। ছেলে ওপারে কলকাতার বডবাজাবে চোরাই আপিমের দলে ছিল। এখন নির্ঝঞ্ঝাট মকবুল।

কারখানার ফটকে পৌছে রামটহল দারোয়ানের পাশে বেঞ্চের ওপরে বসে পড়ল মকবুল। মেরজাই থেকে একটা বিডি বার কবে রামটহলকে দিল, একটা নিজে ধরাল।

রামটহল বলল, মর্জি বাৎলাও সর্দার। কী মনে করে ?

—একবার রাজিন্দরকে ডেকে দিতে পারিস, রামটহল ?

—রাজিন্দর ?—ও, ফার্নিসের টালিবাবু। তা, কী কাম আছে, মকবুল ভাই ?

—বাড়িব খবর।

—ঠার যাও। বলছি রাজিন্দরকে।

খবর পেয়ে রাজিন্দর এল। তাকে নিয়ে একটু দূরে হেঁটে গেল মকবুল। বলল—

—তোদের মিটিং কি আজ হবে ?

—হবেই তো। চারটের সময়, মার্টিন স্টেশনের ময়দানে।

—সাবধান থাকিস। মিটিং ভাঙবার ধান্দায দালাল ঘুরছে কাল রাত্ত থেকে। আমি না-কবুল করেছি, কিন্তু লোক পেয়ে যাবে ওরা। ছোরাছুরি খুনখারাবি চলবে।

—বলিস কি মকবুল ?

—সাচ্ বাত। বহুৎ কবুল করেছে মালিক।

—মিটিং সেবে আমাকে তড়িঘড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। বাচ্চা মেয়েটার জ্বর দেখে এসেছি। মামার দোকানে আজ আর যাব না ভেবেছিলাম। কিন্তু মিটিং-এ—

—না গেলেই ভালো হয় রে, রাজিন্দর। তবে হ্যাঁ, না যাওয়াটাও বেইমানি হয়ে যাবে। যাস, তোবা সবাই যাস। খবরটা সবাইকে দিয়ে দিস। বেইমানি করবি না, দল ভাঙবি না।

—তুই তো আচ্ছা মজার মানুষ বে মকবুল। এই বলছিস না গেলে ভালো হয়, আবার বলছিস না গেলে বেইমানি হবে।

—ভালো করে বুঝে লে, রাজিন্দব। তোরা যা চাচ্ছিস্ সে তো একলা-কোন আদ্‌মির নালিশ না, তোর মতো মেহনতি মান্‌ষের হাজার জনের দাবি। তোরা তো লুটতরাজ কবতে যাচ্ছিস না, সবাই মিলে যা চাস্ জানিয়ে দিবি মালিককে। এতে কসুর কোন্‌খানে ? সেরেফ একজন কেটে পড়লেও দাবি কমজোর হয়ে যাবে। তোকে দেখে আর পাঁচজন পিছু হটবে না তুই বলতে

পারিস ? পারিস না। যদি হটে, তোর বেইমানি করা হবে না ? দুনিয়ায় ইমান সব্ সে ভারী চীজ্। ভুলিস না, রাজিন্দর।

—আরে, আমরা তো যাবই। তুইই তো বলতে এসেছিস হাঙ্গামা হবে। আমরা তো আর লাঠি-সড়কি নিয়ে লড়াই করতে যাচ্ছি না, হাঙ্গামা যদি বাধেই, খুন-জখম এক আধটা হওয়া আর আশ্চর্য কী ?

—সেইটাই তো মুশকিল কি বাত।

—ধর, যদি আমার কিছু হয়ই, তোরা আছিস্, হামিদ ভাই আছে, আমার পরিবার কিছু ভেসে যাবে না।

—সাবাস। রাজিন্দর বেটা, সাবাস। বে-ফিকির চলে যা মিটিং-এ। বালবাচ্চার জন্যে ভাবতে হবে না তোকে।

—তোর ছেলে ইয়াসিন মরে গেছে, তুই আছিস। পট্লীর বাপের যদি কিছু হয়ই, তুই থাকবি। কেমন কিনা ?

বলে হো হো করে হেসে উঠল রাজিন্দর।

মকবুলের চোখে কী মৎলব ঝিলিক দিয়ে গেল ঠাহর করে নি রাজিন্দর। মকবুল বলল,—যা, কারখানায় যা। আমি যাই, অনেক ধান্দা আছে।

রাজিন্দর ফিরে গেল। মকবুল রতনবাবুর গলির পথ ধরল, রাজিন্দরের বাচ্চি পট্লীকে একবার চোখের দেখা দেখে যাবে সে। ইয়াসিন—তার জোয়ান ছেলে ইয়াসিনের কথা তুলেছে রাজিন্দর। মকবুলের বুকের মধ্যে কোন্ এক জায়গায় খচ্ খচ্ করে বেদনা বিঁধছে মনে হল মকবুলের। সাবাস রাজিন্দর। দল ছাড়বে না বলেছে সে। জান্ গেলেও না।

রাজিন্দরের বাসায় ডাক-হাঁক করে পট্লীকে বার করল। মকবুল ন'দশ বছরের রোগা পটকা মেয়েটা, মুখটা খুব মায়ায় ভরা। মকবুল বলল—

—আমি কে জানিস, বিটিয়া ?

—না তো।

—তোর বাপের বড়া ভাই আছি আমি।

বাপের হাসির ধাত পেয়ে গেছে মেয়েটা। খিল খিল করে হেসে ওঠে। বলে—

—তাহলে তো তুমি জ্যেঠা।

—হাঁ হাঁ, জেঠা। আমরা বলি চাচা। তুই আমাকে মকবুল চাচা বলবি,

বুঝলি। তোর বাপের সাথে আমার দোস্তি বহুৎ দিনের। তোর মাকে ডাকতে হবে না, জানালা থেকে দেখছে টের পেয়েছি আমি। সেলাম বহুজি। তুমিও ভি আমার লেড়কির মতো, বুঝলে ?

—বাবা এলে কী বলব, পটলী বলে।

—আরে, তোর বাবার সাথে এখনি কত বাতচিত হল, তবে তো আমি আসছি। তোর বাবার ফিরতে আজ রাত হতে পারে, বলেছে সে।

—তা হোক, রোজই তো রাত নটা হয়।

—আচ্ছা, আমি চলছি তা হলে। আবার দেখা হবে।

বলে মকবুল নিজেব ডেরার দিকে ফিরল।

তার এখন অনেক কাজ। দুশো লোক তৈবি রাখতে হবে, দরকাব হলে অস্ত্রবিস্তর হাতিয়ার সমেত। মালিকরা কী হামলা করবে জানা নেই, তবে পাল্টা হামলার জন্যে ইন্তাজাম যা কিছু, এখনি সেরে ফেলতে হবে। দল তার তৈরিই আছে, নামকরা দল। নামেও অনেক কাটে। পুলিশের সাথেও থোডাবহুৎ সমঝোতা আছে। তবে দালালটা বলে গেছে যে, মালিক হল উজীরদের লোক। আর পুলিশরা উজীবদের তাঁবেদার। দেখা যাক।

বিকেল চারটেয় মার্টিন কোম্পানীর হাওড়া আমতা লাইনের স্টেশনেব ময়দানের সভা প্রথমদিকে বেশ চলেছিল, দাবিদাওয়া সব পেশ হয়েছিল, কে যেন লিখেও নিচ্ছিল সব। কিন্তু গোলমাল বাধল শেষ দিকটায়। মজুর জমায়েতের ভেতব কে একটা হাত বোমা ফুটিয়ে দিতেই লণ্ডভণ্ড কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। মার-মার কাট-কাট পুলিশ-পুলিশ আওয়াজ উঠল।

মজুরেরা জন কতক ঘায়েল হল, মারও খেল প্রচুর। তার পরেই হামলাকারীরা হঠতে শুরু করল। পুলিশ নয়, আর যেন কারা। রব উঠল, ওরে, মকবুল সর্দাবেব দল—পালা, পালা।

ধারেকাছে মকবুলকে দেখা গেল না।

কিন্তু কোথা থেকে ভারী গলার হুকুম শোনা গেল—

—ওরে, জানে মারবি না কাউকে। হটিয়ে দে, হটিয়ে দে।

পুলিশ এল অনেক পরে। তখন মজুরদের ওপর যারা হামলা করতে এসেছিল তারা সব ভেগেছে। মজুরদের মধ্যে ঘায়েল হয়ে পড়ে আছে জনা-চারেক। একটা লোক মিটিং-এর দাবিদাওয়ার কাগজপত্র হাতের মুঠোয়

ধরে পড়ে আছে। সে মরে গেছে। সোডার বোতলের ঘায়ে মাথাটা তার দু'-ফাঁক হয়ে গেছে।

মজুরদের মধ্যে আবার চাঞ্চল্য দেখা গেল। যারা পালাচ্ছিল, তারা সব ফিরে এল। কোন সোরগোল চেঁচামেচি নেই, সবাই এসে চুপচাপ জমায়েত হতে লাগল। হাজার মেহনতি মানুষে আবার মাঠ ভরে গেল।

মরা লোকটার ফাটা মাথা কোলে করে বসে দাবির কাগজগুলো জনতাকে দেখিয়ে হামিদ বলল—

—ভাইসব, সব ঠিক আছে। এই আমাদের দাবি। এগুলো না মিটলে কারখানা অচল করে দেব আমরা। এর নকল সব কারখানায় ঠিক ঠিক পৌঁছে যাবে। জান দিয়ে রাজিন্দর আমাদের জান বাঁচানোর রাস্তা করে দিয়ে গেছে। বলো সব, রাজিন্দর ভাই জিন্দাবাদ—

হাজারো লোকের গলায় জয়ধ্বনি উঠল।

অলক্ষিতে বুড়া মকবুল রতনবাবুর গলির পথ ধরেছে ততক্ষণ। চোখের দু ফোঁটা জল চক্ চক্ করছে। মনে মনে বলছে, সাবাস্! রাজিন্দর বেটা, সাবাস্!

একালের বিকাল

আশুতোষ সরকার

যাঃ সশালা।

ঃ রাস্তাটা আট্‌কে গেল। বিরক্ত হল শুকলাল। আর এ যা আট্‌কেছে। ময়লা ন্যাকড়াটা শূন্যে ঝেড়ে কাঁধে ফেলতে ফেলতে বিড়বিড়িয়ে বাপ-মা তুলল মিছিলটার।

তুলবে না? রোজ রোজ এক জ্বালাতন ভালো লাগে? তাও কিনা যখন দু-পয়সা কামাবার মৌকা, ঠিক সেই অফিস-ছুটির টাইমটাতেই জুত্‌ বুঝে ভিড়িয়ে দেবে মিছিল। রাস্তা যাবে আট্‌কে—গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ। শুকলালকে করবে বেকার। ছোটখাটো হয়, এক কথা। দু-পাঁচ মিনিটে বেরিয়ে গেলে রাস্তাটা আবার চালু হতে পায়। এ সময়টুকু বিশ্রাম নিয়ে শুকলালও আবার জীবিকার ধান্দায় ছুট লাগাতে পারে।—কোথায় যাবেন, বাবু? বালিগঞ্জ? দাঁড়ান এখানে, এক্ষুনি ধরে দিচ্ছি ট্যাক্সি।

শুকলাল ছুটবে। ছুটবে যাত্রীবাহী একটা ট্যাক্সির দরজা চেপে ধরবে। কাছাকাছি খালি হবে। মেট্রো কি নিউ সিনেমার সামনে। খালি হতেই শুকলাল টেনে ধরে নিয়ে আসবে ট্যাক্সিটা। একখানা ট্যাক্সির জন্যে এতক্ষণ ধরে হা-পিত্যেশে হন্যে হয়ে মরছিলেন যে বাবুটি, শুকলাল তাঁকে নির্ঝঞ্ঝাটে চাপিয়ে দেবে টেনে আনা গাড়িটায়। চাপিয়ে দিয়ে সেলাম ঠুকে হাত পাতবে জানলায়। বাবুটি যদি সাহেবসুবো কি সে রকম দিলদরিয়া লোক হন তো দেবেন একটা সিকি। এমন কি শুকলালের নসিবে থাকলে আস্ত একটা আধুলিও উঠে আসতে পাবে। ঘামে শুধু ভেজা নয়, ভাসতে থাকা চিকচিকে মুখের গোটাটাই আনন্দে বিকীর্ণ করে যথাসাধ্য হেঁট হয়ে আরো একটা সেলাম দেবে শুকলাল। আর বাবু যদি বাবুই হন তো দশটা পয়সা ঠেকিয়ে দিয়ে কেটে পড়তে চাইবেন। তাও এমনি ভঙ্গিতে যেন

শুকলালের পরিশ্রমটা কিছু নয়, দয়া করে ভিক্ষা দিচ্ছেন বাবু। তখন শুকলাল ভিখিরির মতোই কাঁচুমাচু মুখ করে হেঁট-করা কপালে আঙুল ঠেকাবে —আর কিছু দিন, বাবু।

দয়াবান বাবু হলে দেবেন আরো পাঁচটা পয়সা। মনমেজাজ শরিফ হলে আরো একটা দশ পয়সাও দিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু কোনোটাই যদি না হয় তো 'ভাগ। ভাগ।' বলে মুখ ভেংচে কেটে পড়বেন। শুকলালও কেটে-পড়া ট্যাক্সিটার দিকে ঘেন্নায় থুথু ফেলার ভঙ্গিতে মুখটা বিকৃত করে গাল দেবে একটা। তারপরই আবার বিনয়ে সজুত করবে মুখ। টেনে আনা ট্যাক্সিটার লোভে পিছন পিছন ছুটে আসা বাবু কি সাহেবটিকে হতাশায় থমকে থাকতে দেখেই জিগ্গেস করবে—কোথায় যাবেন, বাবু? দমদম? আচ্ছা দাঁড়ান, ধরে দিচ্ছি এখুনি।

আবার ছুটবে শুকলাল।

এমন কাড়াকাড়ি—ছুটোছুটির মওকা এক অফিস ছুটির পরই। সংসার জুড়ে সকলের তখন তাড়া। ঘরে ফেরার তাড়া—জরুরি কাজের তাড়া। কারু জন্যে হোটেলের সামনে সঙ্গী দাঁড়িয়ে আছে। কারু সঙ্গী হাসপাতালে পড়ে থেকে ছটফট করছে তার পৌঁছুবার আশায়। একখানা ট্যাক্সির পিছনে পঞ্চাশ জনে মিলে তাড়িয়ে বেড়ায় তখন। কিন্তু শুধু তাড়িয়ে বেড়ালেই কি আর ধরতে পারা যাবে? ধরতে হলে কায়দা জানতে হয়। সে বড়ো কঠিন। সেই কায়দায়ই হাত পাকিয়েছে শুকলাল। সে জানে—চেহারা দেখেই জানতে পারে কার দৌড় কদ্দূর। যেমন ট্যাক্সির, তেমনি বাবুদেরও। ধরে দিতে পারলে কার থেকে কী নাগাদ বকশিস পাওয়া যাবে, সে পর্যন্ত মুখ দেখেই তার জানা হয়ে যায়! কেউ দেবে কম, কেউ বা বেশি। তা কিই বা এমন কম-বেশি! কম দেবে তো দশ পয়সা—বেশি দিলেও ওই পয়সা দশেকেরই মামলা। তার বেশি আশা করে না শুকলাল। কপালগুণে জুটে গেলে খুশি হয়, না জুটলে মুখখানা যে বেজুত করে, সে কেবল মুখটাই। মনটা তার দুঃখে কিছু কাঁদতে বসে না। সেও জানে—ধরেই নিয়েছে ছোটটা তার বেমক্কা। ওর কোনো মজুরি নেই। ট্যাক্সি পেয়ে বাবু যেটুকু দেন, সে তাঁর দয়া। না দিলে শুকলালের পেট চলত কী করে?

তাও ওই দম্নাটুকু কুড়োবার মওকাই বা আর কত সময়? বড জোর ঘণ্টা তুই। হুড়োহুড়িটা কেটে যাবার পরই তো শুকলাল বেকার।

তখন কত খালি ট্যাক্সিই মাথার ওপর আলো জ্বেলে খদ্দের খুঁজে মরবে। এই ঘণ্টা তুয়েক ছুটোছুটি করতে পারলে টাকা দেডেক রোজগার হবে শুকলালের। সে তো শুধু একা নয়। ছটু আছে, মুন্না আছে—শুকলালের সহকর্মী। ওরাও ওস্তাদ কিছু কম নয় তার চেয়ে। তবু তু' ঘণ্টা ছুটতে পারলে টাকা দেড-তুই কামাতে পারে শুকলাল। টাকা তিনেকও হয়ে যায় একেক দিন। আবার একেক দিন এমনও হয যে তুখানা রুটি আর চানার ডালের দামটুকু তুলতেও জিব বেরিয়ে যায়। তবে সে ক্বচিৎ। যেমন ক্বচিৎ টাকা তিনেক কামানো। মোটমাট টাকা দেডেকের আশাতেই শুকলাল ছোটে। বেশি হলে খুশি। সারা গাযে হাওয়া খেলে সেদিন। পাখির মতো উডতে ইচ্ছে করে। যেদিন কম হয়, মন বড় বেজার ঠেকে সেদিন। চৌদ্দ বছরের শরীরটাকেই তখন এত ভারী মনে হয়—কার্জন পার্কের পশ্চিমধাবে যে একটু ঘাস টিকে আছে এখনো, তার ওপর গিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে শুকলাল।

—ক্যায়া বে স্সালা! বিমর্ষ শুকলাল কাঁধের ওপর চাপড খেয়ে চমকে ওঠে হঠাৎ। ঘাড ঘুরিয়ে দেখে বংশী। পিত্তিটা জ্বলে গেল শুকলালের। মিছিল এসে পথ আটকেছে—শুকলালের পেটের রুটিব পথ—সেই চিন্তায় সে যখন কাহিল, তখন উনি এলেন কিনা দিল্লাগি করতে।

—যাঃ স্সালা! ঝটকা মেরে বংশীর কাছ থেকে সবে গেল শুকলাল। ফুটপাথে উঠে গিয়ে উঁকি দিয়ে দাঁডিয়ে মিছিলের শেষ প্রান্তটা দেখবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোথায় শেষ? যতখানি দেখা যায়, আসছেই—আসছেই। পিঁপড়েব মতো কাতার বেঁধে আসছে। না, পিঁপড়ে নয়। পিঁপডেরা তো একের পর এক সার বেঁধে আসে। ওরা আসছে গাদাগাদি করে। ময়দান থেকে চরিয়ে আনা ছাগল-ভেডার পালকে রাজাবাজারের দিকে তাডিয়ে নিয়ে যাবার বেলায় এই ধরমতলার মোডে পৌছে যেমন গাদাগাদি করে এগোয়, ঠিক তেমনি। মাঝে মাঝে একেকটা ম্যা-ম্যা করে দঙ্গলের ওপর যেরকম লাফ দিয়ে ওঠে, মিছিলের মধ্যেও তেমনি করেই হঠাৎ একেকজন লাফিয়ে উঠে হাঁক দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ছাগল-ভেড়ার

দঙ্গলের মতোই মিছিলেব মানুষগুলোও হৈ হৈ করে জবাব দিচ্ছে সেই হাঁকের। কী যে হাঁকছে আর কী জবাব দিচ্ছে, শুনবার মতো মন আজ শুকলালের নেই। যে মিছিল তার রুটির রাস্তা বন্ধ করে ছুটেছে, তার ওপর বিরক্তিতে শুকলাল আজ জ্বলছে। না হলে সে শুনত। শুনত, 'আমাদের দাবি মানতে হবে, খাওয়া-পরা দিতে হবে' ইত্যাদি। শুনত আর ছট্টু কি মুন্নার চোখে চোখ রেখে এক অদ্ভুত রকমের হাসি হাসত দুজনে। হাসত শুকলাল, কিন্তু বন্ধু হয়েও ছট্টু কি মুন্না জানতেও পারত না যে সে হাসিটা হাসতে হাসতে শুকলালের বুকের মধ্যে তখন কী এক গৌরব যে ফুলে ফেঁপে উঠছে। অবিশ্যি খবরটা তাদেরও জানা। প্রাথমিক পরিচয়েই জেনেছিল শুকলালের যে বাপকে চোখেও দেখে নি শুকলাল, শুকলাল মায়ের পেটে থাকতেই সে বাপ এমনি এক মিছিলে সামিল হয়ে—

—মুন্না কাঁহা রে, মুন্না?

—হাম ক্যায়া জান্‌তা? বিরক্ত শুকলাল বংশীকে এড়িযে যেতে চাইল। কিন্তু পারল না। বংশী চেপে ধরল—বোল না, ইযার।

কিন্তু শুকলাল কেমন করে বলবে? সে ছিল রাস্তার এপারে, মুন্না ওপারে। মাঝখানে মিছিল এসে পড়ায় এখন মুন্না কোথায আছে জানে নাকি সে যে বল্‌বে? তবু বলল, ওর হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যেই আন্দাজে বলে দিল, দ্যাখ যাকে সিনেমাকা সামনে।

বলে আবার মিছিলটার দিকে বিরক্ত এবং উদ্বিগ্ন চোখে তাকাবে শুকলাল, বংশী হাত দিল কাঁধে। বলল, একটা রুপিয়া দেতো, ইয়ার।

মিছিল থেকে চোখ সরিয়ে এনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শুকলাল বংশীর চোখে চাইল। ওর সুর্মা-টানা চোখের লে-লে করা চাউনিটা সর্বাঙ্গ জ্বালিয়ে দিল তার। তার ওপর পান কি খেযেছে। যেন দু-ঠোঁটের কষ বেয়ে খুন গড়াচ্ছে শালার। বাবুগিরিব বাহাব দেখ না। ধপধপে পাজামার ওপর কলিদার পাঞ্জাবি। গলায় পেঁচিয়েছে রেশমি রুমাল। আতর মাখা তুলো গুঁজেছে কানে। যেন কোন্ না নবাবের বাচ্চা। অথচ এক টাকা ধার চাইছে ট্যাক্সি-ধরা শুকলালের কাছে। কাঁধ থেকে বংশীর হাতটা ঠেলে দিয়ে শুকলাল জবাব দিল, রুপিয়া কাঁহাসে আযগা?

—দো না। রাত মে দু রুপিয়া লে লেনা হাম্‌সে। বংশী লোভ দেখায়।

অর্থাৎ একটাকা সুদ। কিন্তু সে লোভে ভুলবার পাত্র শুকলাল নয়। সে জানে সুদ কেন, ইয়ে দেবে বংশী। অবিশ্যি এক টাকা ছেড়ে একশো টাকা সুদ পাওয়া গেলেও উপস্থিত পুরো একটা টাকা তাব পকেটেই নেই। সকালবেলায তো এ তল্লাটে ট্যাক্সির কোনো কাড়াকাড়ি থাকে না। তখন শুকলাল বেকার। তবে বেকার বলে কি একেবারেই বেকার? তাহলে পেটের দাবি মানাত সে কেমন করে?

এই একটা কথা বটে। শুকলাল কোন মিছিলে নেই। দাবি করবার মতো এ দুনিযায় তার কোথাও কিছু নেই। দিতে হবে বলে চিৎকার করলে শুনবে, তেমন একটা মানুষ নেই তার সংসারে। কিন্তু উল্টোটা রযেছে। এবং সে দাবিদার দিবারাত্র তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। তার নাম পেট। সকাল—দুপুর—সন্ধ্যে, তিনবার কবে চেঁচিয়ে ওঠে, দিতে হবে—মানতে হবে। সুতরাং বেকার বসে থাকলে শুকলালের চলবে কেন? সকালে গাড়ি মোছে শুকলাল। স্ট্যাণ্ডে দাঁড়ানো ট্যাক্সি কি পার্ক করা প্রাইভেট। হাতের ন্যাকড়াটা তো দিনরাত হাতেই আছে। হাতেই থাকে। কখনো বা কাঁধে কি কোমরে পেঁচানো। মালিকেব আদেশের অপেক্ষা করে না। ময়লা গাড়ি দেখতে পেলেই হামলে গিযে পড়ে। ঝেড়ে পুঁছে সাফা করে গাড়ি। ঘেমো মুখ বিনয়ে বিকীর্ণ করে হাত পেতে দাঁড়ায। মজুরি নয, বকশিস। করুণা।

হয় না কি একটা-আধটা টাকা? হয়। কিছু কম কি কিছু বেশি। শুকলালের চলে যায। দুপুরে পাঞ্জাবীর হোটেলে গিয়ে পেটের দাবি একরকম করে মিটিয়ে দেয়। আজ সে দাবি মিটিয়ে বেশ কিছু বেঁচেও গেছে তার। একটা দু পযসা দামের সিগারেট আর পাঁচ পয়সার পান খেতে খেতে হাফ-প্যান্টের পকেট গুনে দেখেছে 'আরো তেতাল্লিশটা পয়সা রযে গেছে তখনো। বংশী টের পেলে কেড়ে নিযে যাবে। সুতরাং ভেংচে উঠল শুকলাল হ্যায় নেহি তো দেয়গা কাঁহাসে?

কিন্তু নেই বললেই কি বিশ্বাস করে বংশী? করে না। কেননা সে পয়সা চাইলে—নেই ছাড়া আছে কেউ বলে না। শুধু কি শুকলালরা? ধরমতলার মোড়ে কজি-রোজগারের ধান্দা কবে যাবা, সেই পালিশওলা—ফেরিওলা—কেউ-ই অচেনা নয় বংশীব। এবং সময়ে অসময়ে সবার কাছেই

তাকে পয়সা চাইতে হয়। নেই নেই যতোই করুক, যথাসাধ্য আদায় করেই বংশী। প্রথম প্রথম দিতে হত ভয়ে। বংশী ভয় দেখায়। কোমর থেকে ছোরাটা বার করে, যেটা সব সময় তার কোমরেই থাকে, চোখ রাঙিয়ে বলে, নেহি দেয়গা তো জান্‌সে মার দেয়গা।

শুকলাল বিশ্বাস করত। কারণ যেসব সঙ্গী আর কাণ্ডকারখানা দেখত, ভয় করত শুকলালের। সবচেয়ে বেশি ভয় করত সন্ধ্যেবেলার মেয়েছেলেগুলোকে। বংশীর নির্দেশে যারা পার্কের রেলিং ধরে দাঁড়ায় এবং বংশীর জোটানো লোকের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে গঙ্গার দিকে চলে যায়। কিন্তু দিনে দিনে বংশীকে চিনে ফেলেছে শুকলাল। ছোরাটাও ওর দেখে নিয়েছে অনেকবারই। তাই এখন আর ভয় করে না ওকে। একেক দিন তো এমন জোয়ান মানুষটাকেও ধমকে ওঠে শুকলাল। বলে, রোজ রোজ পয়সা চাস—তোর শরম লাগে না?

—শরম ক্যাযা? বংশী তেড়ে ওঠে, তোব কাছে ভিখ চাইছি রে, স্‌সালা? ধার দিবি, সুদ নিবি। নাফা তোর না আমার? দে একটা রুপিয়া।

—বলছি নেই। বিরক্ত শুকলাল পালিয়ে যাবার রাস্তা খোঁজে। কিন্তু পালাবে কোথায়? দাবির মিছিল যে তার পথ আটকে দিয়েছে।

—ঝুট বলিস না, শুকলাল। আচ্ছা, এক টাকা না থাকে বারো আনা দে। রাত্তিরে তুই নিয়ে নিস আমার থেকে। তোর যত লাগে। বিশ্বাস কর।

ভড়কিতে যখন কাজ হবার উপায় নেই, বংশী কাকুতি মিনতি করে। মাঝ-বয়সী মানুষটা তখন চোদ্দ বছরের ছোকরার কাছে ইয়ার সাজার ভান করে। বলে, আজ যা একটা ছোক্‌রি আনছি, দেখিস্ শালীর সুরত্। দে না।

—বিশ্‌ওয়াস নেহি হোতা? ইয়ে দেখ্। প্যান্টের শূন্য পকেট উল্টে দেখায় শুকলাল। কিন্তু বংশী কি তার চেয়ে কম চালাক নাকি? একদম শূন্য যখন পকেট, তখন সে বুঝতে পারল ও-পকেটে পয়সা শুকলাল রাখেই নি। না হলে একেবারে শূন্য পকেট থাকে নাকি কখনো? গুপ্ত পকেটের সন্ধানে বংশী শুকলালের কোমর চেপে ধরল। এবং জোরজবরদস্তি আবিষ্কার করেই ফেলল তার নাভির পাশে ভিতরের পকেটে রাখা তেতাল্লিশটা পয়সা। আর উপায় কী? ধরা যখন পড়ে গেছেই, সিকিটা হাতছাড়া করতেই

হোল শুকলালকে। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, রাত্তিরে আমাকে দিতে হবে কিন্তু।

—জরুর দেয়গা।

চারআনা পয়সা নিয়ে বংশী সরে পড়ল। দেবে না আরো কিছু। শুকলাল জানে। এবং মুখে দিতে হবে বললেও ওটা গেছে বলেই ধরে নিল সে। পকেটে আর রইল কত? যে হিশেব মনে মনেই করা যায়, বেকার শুকলাল তাই করতে বাকি পয়সাগুলো এক এক করে গুনতে শুরু করল। মুঠোর মধ্যে আঠারোটা পয়সা ধবে নিযে মিছিলটার দিকে তাকিয়ে দু-চোখে জ্বালা বোধ করল শুকলাল। মিছিলটা যদি আট্‌কেই বাখে রাস্তা, রাত্তিরে সে পেটের দাবি কেমন করে মেটাবে?

মনে মনে গাল দিল মিছিলটাকে বিড়বিড় করে বাপ-মা তুলল মিছিলের। চলেছে যে চলেছেই। যেন আর শেষ হবে না কোনদিন।

এখন শুকলাল কী করে?

আঠারোটা পয়সা মোটে পকেটে।

রাস্তা থেকে উঠে পড়ল শুকলাল।

কাঁধের ন্যাকড়াটা টেনে এনে কোমরে জড়াল। আজ যে কতক্ষণে আবার কাজে লাগবে ন্যাকড়াটা, শুকলাল আন্দাজ করতেও পারছে না।

মিছিলটা মন্থর হয়ে এল। হবে না? এগোবে আর কদ্দুর? ওধারে ডাণ্ডা নিযে দাঁড়িয়ে আছে না পুলিশ? যতই না কেন নেচে-কুঁদে এগোও, তোমার দৌড় জানা আছে শুকলালের। যদিও নিশানা লাটসাহেবের ফটকটা, কিন্তু রেলের বাড়িটার কাছাকাছিও না পৌছুতেই সিপাইবা সব আট্‌কে দাঁড়াবে পথ। তারপরও যদি তেড়িমেড়ি কর, তবে ঘাড়টি ধরে পিঁজরা গাড়িতে ঢুকিয়ে কোথায় যে নিয়ে গিয়ে তোমাদের খাওযা-পরার দাবি কী কায়দায় মেটাবে, শুকলাল সঠিক না জানলেও আন্দাজ করতে পারে। সুতরাং এগোবে আর কদ্দুর?

একি! হঠাৎ মিছিলটার এক অদ্ভুত ধরনের কায়দা দেখে শুকলাল চম্‌কে উঠল। মানুষগুলো সব পথের ওপর বসে পড়ছে কেন? এরকম তো হবার কথা নয়। এগোবার পথ না পেলে কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে প্রাণপণে হাঁক ছাড়বে—তারপর গলার জোর কমে গেলে মিছিল ভেঙে যে যার

বাড়ির পথ ধরবে—এই তো নিয়ম। কিন্তু আজ যে দেখি রাস্তার ওপর বসে পডল সব! তার মানে!!

মানে আব যাই থাক, বসে যখন পড়েছে তখন যে শুকলালের রুজি আজকের মতো মাটি করতেই বসেছে, তাতে আর সন্দেহ রইল না তার।

মোটে আঠারোটা পযসা পকেটে। কী করবে শুকলাল? আঠারো পযসায কী কাযদায় যে পেট ভরানো যায়, সে শুকলাল জানে না। অথচ—

মুন্না কোথায়? ছট্টু? ওপারে গিয়ে যে ওদের সামিল হয়ে একটা কিছু পরামর্শ করবে, তারও কোন উপায় রাখল না শালার মিছিল।

ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল সন্ধ্যা। এবং সেটা এতই ধীরে ধীরে মিলাল যে শুকলাল ছটফট করল অনেকক্ষণ। অস্থির পায়ে এদিক-ওদিক করার সময়ে পানের দোকানটা চোখে পডতেই একটা ভীষণরকমের আক্রোশে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল তার। কেন যে তখন এমন পান-সিগারেট খাওয়ার শখ হয়েছিল! নাহলে আঠারো কেন, পঁচিশটা পয়সাই তো থাকত পকেটে। পঁচিশই বা কেন, পুবো পঞ্চাশ মানে আট আনা পয়সাই তো থাকত। স্সালা শুয়াব কা বাচ্চা বন্সী।

একই সঙ্গে বংশী এবং নিজের ওপর জ্বলতে লাগল শুকলাল। জ্বলতে লাগল আক্রোশে। কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পেল আরো একটা জ্বালা জেগে উঠেছে তার দেহে। সে বডো ভয়ঙ্কর। যে জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে মিছিল করে মানুষ, সেই জ্বলুনি চিডবিডিয়ে উঠল শুকলালেরও পেটে। অথচ মিছিলটা নড়বার নাম করছে না। রাস্তার ওপর বসে পডে চেঁচাচ্ছে যে চেঁচাচ্ছেই।

কিন্তু শুকলালের তো চেঁচাবারও উপায় নেই। সে কোন মিছিলে নেই যে চেঁচালে কেউ শুনবে। অগত্যা শুকলাল এদিক-ওদিক ছটফট করতে লাগল।

হঠাৎ রুটির দোকানটার সামনে এসে পডতেই বুদ্ধি এল মাথায়। ছোট একটা পাঁউরুটি তো কিনতে পারে সে। পনেরো পয়সা নেবে। আরো থাকবে তিন পযসা। তিন পয়সার বাতাসা?

শুকলাল কিনে ফেলল। পকেটটা একেবারে খালি হয়ে গেল। এক কাপ চায়ের পয়সাও যদি থাকত! না থাক, মুন্না কি ছট্টুকে পেলে হয়ে যাবে চা।

রুটি আর বাতাসা কিনতে তবে যেন পেটটা ঠাণ্ডা হল শুকলালেব। এই এক তাজ্জব ব্যাপার। শুকলাল দেখেছে, যখন থাকে না তখন শালার পেট খাই-খাই করে মরে। আর যখন রেস্ত থাকে পকেটে, তখন কোন কাঁইমাই নেই শালার। জোগাড় যখন সঙ্গে আছে, তখন তার ধীরেসুস্থে হলেও অসুবিধে নেই কোন।

বেকার এবং নিরুপায় শুকলাল রাস্তা ছেড়ে পার্কটায় গিয়ে ঢুকল। এদিকটায় তো ট্রামলাইনের কুণ্ডলী। পশ্চিমধারে যে একটু ঘাস টিকে আছে এখনো, শুকলালরা কাজেব ফাঁকে বিশ্রাম করে সেখানে। ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে—গা ছড়িয়ে শোয। দৌড়-ঝাঁপ করে। একটি দুটি তো নয, শুকলালের বন্ধুবান্ধব মেলাই। বুট পালিশ, ফেরিওলা, কাগজবেচা ইত্যাদি নানান ধান্দার ছেলেছোক্‌রা ঘিরে আছে কার্জন পার্ক। তাদের অনেকের সঙ্গেই শুকলালের বন্ধুত্ব। যে যার মতো কামাই করে, যে যার মতো খায়। কিন্তু শোবার বেলায এক বিছানা—অবকাশের বিশ্রামও তাদের এক সঙ্গেই।

কিন্তু না, শুকলাল আজ একা। ভেবেছিল রুজির রাস্তা বন্ধ হওয়ায় ছট্টু আর মুন্নাও এসে থাকবে পার্কে। আসে নি। পা ছড়িয়ে বসে পড়ল শুকলাল। রুটিটা হাতেই ছিল। পকেট থেকে বার করল বাতাসার ঠোঙাটা। আব যখন করবার কিছুই নেই, তখন ওই না হয চিবানো যাক বসে বসে।

—আমাদের দাবি···

—মানতে হবে।

—খাওয়া-পরা···

—দিতে হবে।

উঃ, কি চেঁচানোই না চেঁচাতে পারে! রুটিটা ছিঁড়তে গিয়ে যে দুঃখটা ভুলে এসেছিল শুকলাল, চিৎকারের চোটে আবার তা মনে পড়ে গেল। এবং অল্পদূরেই এস্‌প্লানেডের ওপর পুলিশের ডাণ্ডার সামনে রাস্তা কামড়ে বসে পড়া মিছিলটার দিকে তাকাল। তাকিয়ে দেখে মিছিলের সামনে সিপাইগুলোর নাকেব ডগায় দাঁড়িযে—দাঁড়িয়ে কী, লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁক দিচ্ছে একজন আর বসে থাকা সকলে একসঙ্গে মিলে জবাব দিচ্ছে সেই হাঁকের।

উঃ, কী সাহস। সেপাইগুলো যদি এখন লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে পিটাতে লেগে যায়?

একা একা পার্কে বসে শুকলালের ভয় করতে লাগল। মনে পড়ে গেল মার মুখে শোনা সেই গল্পটা, আর মামাব দোকানঘরে টাঙিয়ে রাখা সেই একটা ফটো। একটা মানুষ চোখ বুঁজে শুয়ে আছে, বিছানাটা ফুল দিয়ে ঢাকা। মানুষটার পেটের ওপর পেতে রেখেছে এমনি একটা নিশান, যে নিশানটা নাড়তে নাড়তে এখনো চিৎকার করছে লোকটা, আমাদের দাবি মানতে হবে।

শুকলালের মা বলত ফটোটা তার বাবার। সেই বদমাশ লোকটার সঙ্গে পালিয়ে যাবার আগে কত যত্ন করেই না মা ফটোটাকে মুছত। মামা তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবার বেলায় ও দশজনকে শুনিয়ে বলেছিল, দেখ কেমন বাপের কেমন ব্যাটা। মিছিলে সামিল হয়ে বাপ পুলিশকে পরোয়া করে নি। বুক পেতে গুলি খেয়ে শহীদ হয়ে গেল। আর তারই ব্যাটা কিনা—

শুকলাল চোখে দেখে নি। দেখেছে ফটোটা। তবু এই মুহূর্তে ওই হাঁক পিটতে থাকা মানুষটাব দিকে চেয়ে সে যেন দেখতে পাচ্ছে সেই না-দেখা একজনকেই—যে নাকি ছিল তার বাবা।

দেখতে দেখতে মনটা কেমন উদাস হয়ে পড়ছিল শুকলালের। হঠাৎ কাছেই কিঁউ কিঁউ শব্দ শুনে চমক ভাঙল তার। দেখে সামনেই আর দুটি বন্ধু। কাল্লু আর লাল্লু। শুকলালের মতোই পথের প্রাণী দুটি। তেমনি করেই পথে পথে খুঁটে খেয়ে পেট ভরায় এবং শুকলাল যখন বেলের অফিসটার পৈঠায় শুয়ে ঘুমোয় মুন্না আর ছট্টুর সঙ্গে, ওরাও তখন ওদের কাছাকাছিই কুণ্ডলী পাকিয়ে শোয়। কুকুরদুটোকে আদর করে শুকলাল। ওরা নাড়ে লেজ। লাল্লুটাই বেশি। কাল্লুটা একটু বেয়াড়া। লাল্লুর মতো যখন তখন পায় তো পড়েই না, বরং শুকলালের হাতে খাবার দেখলে লাল্লু যখন আহ্লাদে গলে পড়ে কিঁউ কিঁউ করতে থাকে, কালু তখন পিছনের পায়ের ওপর বসে নীরবে চোখ রাঙায়। লাল্লুকে দেয় আদর করে। কাল্লুকে দিতে হয় ভয়ে ভয়ে।

—ক্যায়া রে? বৈঠা কাঁহে?

রেলিঙের ধাবে দাঁড়ানো মেয়েমানুষটা জিগ্‌গেস করল শুকলালকে। শুকলাল ওর চেনা। শুকলালও ওকে চেনে। বংশীরই জোটানো। তবে বড় খাবাপ মেয়েমানুষ ওটা। দেখতে খুব খারাপ নয়। কিন্তু ওর মুখ বড খারাপ। খিস্তি যা দিতে পারে। তার ওপর পান খেয়ে মুখটাকে করে বাখে রাক্ষুসীর মতো।

জিজ্ঞেস করে বটে, কিন্তু জবাবের অপেক্ষা করে না। অপেক্ষা কবার মতো সময় আছে নাকি তার? কোন্ ফাঁকে পালিয়ে যায় খদ্দের, নজর রাখতে হবে না? শুকলাল জানে সব কায়দা। দেখে শুনে জেনেছে। হঠাৎ তার মনে পডল বংশী বলেছিল আজ নাকি ভারী খুপসুরৎ ছোকবি একটা আনবে। শুকলাল যেন দেখে।

আহা! দেখে শুকলাল করবে কী? খুপসুরৎ ছোক্‌রি কি সে কম দেখে নাকি? পথে পথে কম ছোক্‌রি ঘুরে নাকি যে দেখবার জন্যে বংশীকে পয়সা দিতে হবে?

রেলিং ধরে দাঁড়ানো মেয়েমানুষটাকে দেখতে দেখতে শুকলালের শরীরটা হঠাৎ কেমন শিরশির করে উঠল। ভারী একটা মজাব কথা মনে এল হঠাৎ। এবং মনে আসতেই তার কালিঝুলি মাখা চৌদ্দ বছরের দেহ জুড়ে নেচে উঠল অদ্ভুত এক শিহরন। মনে মনে ঠিক করল বংশীকে সে বলবে। আজ নয়। যেদিন অনেক টাকা রোজগার হবে তার—পাঁচ টাকা, ছ টাকা, দশ টাকা—হবে নাকি কোনদিন? সেদিন বংশীকে সে বলবে। ওরকম নয়। এটা তো একটা ধাডী। মুটকি। বেশ সুন্দর দেখে একটি মেয়ে—ওই যে 'লাভ-ইন-হংকং' ছবিটাতে যে রকম ছিল, ওই রকম একটি মেয়ে এনে দিতে বংশীকে সে বলবে। এনে দেবে না বংশী? কেন দেবে না? সেদিন শুকলাল ওকে পুরো একটা টাকা দেবে। একটা কেন? দুটো—তিনটে—যা চাইবে বংশী, শুকলাল দেবে। সব কটা টাকাই যদি খরচা হয়ে যায়, তাই কববে শুকলাল। তবু সে করবে। এবং সেই মেয়েটাকে নিযে ঘোড়ার গাড়িতে চডে সেও যাবে গঙ্গাজীর হাওয়া খেতে। আঃ কী ঠাণ্ডাই না গঙ্গাজীর হাওয়া! শুকলালের সারা গা জুড়িযে যাবে সেদিন। —কিঁউ—কিঁউ—লাল্লু কাঁদে। শুকলাল ছুঁডে দিল এক টুকরো রুটি। কিন্তু লাল্লুর মুখের সামনে মাটিতে পডতে না পডতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে কেড়ে নিল কাল্লু। এবং লাল্লু যাতে

লোভ করে না নোলা বাড়ায়, সেই জন্যেই হয়তো আবার গড়গড় আওয়াজ করল। যেন ভয় দেখাচ্ছে লাল্লুকে। রাগ হল শুকলালের। শালা কেড়ে খাবার যম। কেন? শুকলাল কি দিত না নাকি ওকে? তবু যখন কেড়েই খেয়েছিস, ভাগ স্‌সালা, ভাগ।

দেখ দেখ, কাকে ভাগাতে চাইল শুকলাল আর ভেগে যাচ্ছে কে। হুম্‌কি দেখে কাল্লু একটু নড়ল বটে, কিন্তু লাল্লু একেবারে লেজটা দু' পায়ের ফাঁকে গুঁজে পিছিয়ে গেল পাঁচ হাত। গিয়ে বলে, কিঁউ—কিঁউ—

আরো এক টুকরো রুটি ছুঁড়ে দিল শুকলাল। ছুঁড়ল ঠিক লাল্লুর মুখেরই সামনে। কিন্তু ভীতুটা ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়াবার আগেই গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাল্লু। শুকলালের ইচ্ছে হল দুটোকেই ধরে ঠ্যাঙায়। একটা অপদার্থ, আরেকটা ডাকাত। না, ওদের কাউকেই আর খেতে দেবে না শুকলাল। ছোট্ট একটা ইটের টুকরো কুড়িয়ে পেয়ে ছুঁড়ে মারল। যা স্‌সালার কুত্তা, ভাগ।

—ক্যাযারে, ক্যাযা হোতা?

বংশী এল। পা ছড়িয়ে বসে পড়ল শুকলালেব সামনে। মনে মনে জ্বলে গেল শুকলাল। দুটোকে তাড়িয়েছে, এখন আবার আরেকটা এসে জুটল। আব যা ছ্যাঁচ্‌ড়া বংশী, মুখের এইটুকু গ্রাস ও না কেড়ে নিয়ে যায়।

কিন্তু না, শুকলালের রুটির দিকে লক্ষ্যও করল বংশী। একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, কাম বড়ি গড়বড় হো গিয়া রে শুকলাল।

—ক্যায়া হোয়া? সংসারে বংশীর এমন কী কাজ যা গড়বড় হয়ে গেলে নিশ্বাস ফেলতে হয়, শুকলাল জানে না। তাই সে ওর কথায় এতটুকুও গুরুত্ব না দিয়ে নেহাত ভদ্রতা করেই জিগ্‌গেস করল। বংশী নিশ্বাস ফেলল আরো একটা। বলল, ছোক্‌রি কো নেহি মিলা।

—কিঁউ?

বংশী বলল,—ছোক্‌রিটার বোনাই—যে নাকি তাকে এনে দেবে কথা ছিল এবং সেই কথার ওপর নির্ভর করে বংশী একটি মালদার বাবু পর্যন্ত ঠিক করে রেখেছিল, সে শালাকে খুঁজে পায নি বংশী। সেও নাকি সামিল হয়েছে ওই মিছিলে। ইস্, মিছিলে গিয়ে তো দিতে হবে বলে চেঁচাচ্ছে, অথচ তা না করে শালীটাকে যদি এনে দিতে পারত, কম পয়সা পেত নাকি শালা? আছে

তো ওই মিছিলেই, কিন্তু গাদাগাদির মধ্যে কোথায় যে রয়েছে, খুঁজে পাবে' না কি বংশী। পেলে একবার—

না, পাবো না ভেবে বসে থাকলে চলবে কেন? খুঁজে পেতে দেখতে হবে।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল বংশী। এবং রেলিং টপ্‌কে সোজা ঢুকে গেল মিছিলে।

হঠাৎ কী হয়ে গেল, মাটি কামড়ে বসে থাকা মিছিলটা চঞ্চল হয়ে উঠল। হৈ চৈ কবে উঠল। শুকলাল চেয়ে দেখে সবাব সামনে দাঁড়িয়ে যে লোকটা হাঁক পিটছিল এতক্ষণ, দুটো-তিনটে সেপাই মিলে তার টুঁটি টিপে ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে ওঠা মিছিলটা হৈ হৈ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনে। সেপাইগুলোর ঘাড়ের ওপর একেবারে। কিন্তু সেপাই কি আর ওই দুটো তিনটেই? একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিল যে লরি-বোঝাই পুলিশ, ডাণ্ডা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারাও। সে কী লাঠির কোপ! রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল যে মেয়েমানুষটা, চোঁ-চা দৌড় মারল সোজা দক্ষিণে। নযতো, আরে ব্বাবা, মিছিলের ভিতর থেকে যা একখানা আধলা ইট সেপাইগুলোর মাথা ডিঙিয়ে এধারে এসে পড়ল, ওর ঘায়ে মারা পড়ত মেয়েটা।

দেখ দেখ, একটা নাকি ইট। ওধার থেকে কত ইট সেপাইগুলোকে তাক করে ছুটে আসছে। উঃ, কী লাঠিই না হাঁকড়েছে রে বাবা। লোকটা নির্ঘাত মরবে।

তারপরই ছুটল গ্যাস। গ্যাসে গ্যাসে অন্ধকার হয়ে গেল গোটা এসপ্লানেড। তখন কী করতে হয়, শুকলাল জানে। এ অঞ্চলে এ রকম হাঙ্গামা কম দেখে নি সে। মেয়েমানুষটার মত ছুটে পালাতে গেলে কোন্ ধার থেকে কিসের চোট এসে যে বুকে-মাথায় লাগবে তার ঠিক নেই। গ্যাসের ধোঁযা চোখে লাগলে কাঁদতে কাঁদতে জান যাবে। বাঁচতে হলে এখন একমাত্র উপায়—লড়াইর সময় বোমা পড়ার ভয়ে কাছেই পার্কের মাটিতে যে আঁকা-বাঁকা গর্তটা খোঁড়া হয়েছিল, তার মধ্যে ঢুকে পড়ে কোমরে প্যাঁচানো ন্যাকড়াটা দিয়ে চোখমুখ ঢাকা।

গর্তেব মধ্যে ঢুকতে গিয়ে বংশীর কথা মনে পড়ল শুকলালের। না জানি এই হুলুস্থুলের মধ্যে পড়ে বংশী এখন মরে। বংশী, এই হাঙ্গামাব মধ্যে পড়া তার একমাত্র পরিচিত মানুষটা।

৫

কিন্তু কী করবে শুকলাল? সম্ভব হলে এর ভিতর থেকে বংশীকে সে টেনে নিযে আসত। কিন্তু তার উপায় কই? অগত্যা আগে নিজের প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে গর্তের মধ্যে ঢুকতে যাবে শুকলাল, গুলির শব্দে থমকে গেল সে। এক গুলি—দুই গুলি—তিন গুলি—

শুকলাল গডিযে পডল গর্তটায়। সঙ্গে সঙ্গে গুলির শব্দকেও ছাপিয়ে গেল একটা মানুষের আর্তনাদ। মাই গো মাই!

চেনা গলার আওয়াজ পেয়ে শুকলাল মাথা উঁচিয়ে দেখে পার্কের রেলিং টপ্‌কে গডিযে পডছে বংশী। ওর ধবধবে ফর্সা কলিদার পাঞ্জাবীটার বুক লাল হয়ে গেছে রক্তে।

—বন্‌সী ভাইযা! শুকলাল চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু ছুটে যাবার সাহস পেল না। ততক্ষণে গ্যাসের ধোঁযা ঢুকে পডেছে পার্কে। অন্ধকারে তলিয়ে গেছে বংশী। অগত্যা গর্তের ভিতর মুখ গুঁজল শুকলাল। ওদিকে তখন যে পুলিশে আর মানুষে কী তাণ্ডব চলেছে, তার পক্ষে আর দেখবার উপায় রইল না।

এরপর বাকি রাতটা যে কোথায কেমন করে কেটেছিল, আজ আর শুকলাল মনে করতেও পারবে না। পরের দিন অর্থাৎ গতকাল সারাদিন উপোস গেছে শুকলালেব। শহর জুডে হরতাল থাকায় এক পযসাও উপায় হয় নি তার। অবশ্যি খিদে-তেষ্টা টেরও পায় নি সে। সারাদিন চোখের সামনে ভেসে বেডিয়েছে বংশীর রক্তাক্ত দেহটা। আর মনেব ওপর ভেসেছিল মামার দোকানে টাঙিযে রাখা সেই ছবিটা।

আজ সকালে দুখানা গাডি মুছে চার আনা পযসা রোজগার হতেই খিদে পেল শুকলালের। কিনল ছোট একটা রুটি আর তিন পযসার বাতাসা। বাকি সাত পযসা গুনে গুনে কোমরের কাছের গোপন পকেটে ঢোকাল। ছোট ভাঁডের এক ভাঁড চা-ও হয়ে যাবে ওতে।

এল পার্কটায়। ঘাসের ওপর বসল।

—কিঁউ—কিঁউ—কিঁউ!

লাল্লু এসেছে। এসেছে কাল্লুও, কিন্তু ওর গলায় কাকুতি-মিনতির শব্দ নেই। থাকেও না। রুটি ছিঁডে ছুঁডে দিল শুকলাল। লাল্লুব কাছেই পডল, কিন্তু তুলে নিতে পারল না। কাল্লু ঘাড় বেঁকাতেই মুখ গুটিয়ে সরে

গেল। আবারো ওর মুখের সামনে আরো এক টুকরো ছুঁড়ে দিল শুকলাল। কিন্তু খেয়ে নিল কাল্লুই।

রাগে শরীরটা জ্বলে গেল শুকলালের। হাতের কাছে পেল যে আধলা ইটটা, তাই তুলে ছুঁড়ে মারল লাল্লুকে। ভাগ স্সালা, ভাগ। নিজের ভাগের রুটি টেনে খাবার মুরোদ নেই যে কুত্তার, তাকে শুকলাল দেবে না আর খেতে। কেবল দাও দাও বলে কান্না? ভাগ। তার চেয়ে কাল্লুকেই সে খাওয়াবে।

—শুকলাল।

কোথা থেকে ছুটে এল মুন্না। সঙ্গে ছট্টুও। এসে বলল, তুই এখনো বসে আছিস?

—কী করব?

—মাটিয়া কলেজ যাবি না?

—কিঁউ?

—কিঁউ কী রে। বংশী যে শহীদ হয়েছে। কত ফুল দিয়ে সাজিয়েছে বংশীকে। মিছিল করে নিয়ে যাবে নিমতলা। চল, দেখে আসি গিয়ে।

মুন্না আর ছট্টু মিলে টেনে ধরে নিয়ে চলল শুকলালকে। কিন্তু পার্ক থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়েই হঠাৎ কেন বেঁকে দাঁড়াল শুকলাল। বলল, নেহি।

—নেহি ক্যায়া।

—হাম নেহি যায়গা।

—কিঁউ নেহি যাওগে? তাজ্জব হয়ে যায় ছট্টু আর মুন্না।

—বোল্‌তা হ্যায় নেহি যায়গা। ছোড়ো হামকো। হাম নেহি যায়গা— নেহি যায়গা।

মুন্না আর ছট্টুকে অবাক করে দিয়ে গায়ের জোরে ওদের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শুকলাল আবার ঢুকে পড়ল পার্কে। এবং সামনেই লাল্লুকে দেখে আরো একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে ভীষণ রাগে জ্বলতে জ্বলতে ছুঁড়ে মারল।

কেঁউ কেঁউ করে ছুট লাগাল লাল্লু। শুকলাল ছুঁড়ে মারা ইটটা কুড়িয়ে নিয়ে আবারো ছুঁড়বে বলে ওর পিছু ধাওয়া করল।

ছট্টু আর মুন্না অবাক হয়ে দেখতে লাগল ওর কাণ্ড। কিন্তু কিছুই ঠাহর করতে পারল না যে, কী কারণে হঠাৎ এমন খেপে গেল শুকলাল।

ধর্না

দেবেশ রায়

বিকেল নাগাদ-ই রওনা হতে হল। শেষে রাত করে গিয়ে হয়তো গাছতলায় কাটাতে হবে। যদিও চার চারটে অঞ্চল-প্রধান আর সেই অঞ্চলের গ্রামসেবকদের জানানো আছে আজ রাতে কিচেন পার্টি পৌঁছবে—তবু তাদের ভরসায় না থেকে বেলা থাকতে থাকতে যাওযাই নিরাপদ। ভাগের মা গঙ্গা পায না। চার প্রধান আর চার গ্রামসেবক পরস্পরের ওপর দোষারোপ করে নিষ্কৃতি পেতে পারে কিন্তু সারারাত মশার কামড় খেতে বা তেমন হলে বৃষ্টি-বাদলে ভিজতে তো তুহিনকেই হবে। তারপর আর কাল সকালে রান্না না চড়িয়ে তাকেই গাড়ি চেপে হাসপাতালে আসতে হবে। সুতরাং অন্ধকার হবার আগে আগেই পৌঁছে জায়গাটা দেখে-টেখে নিজের থাকার ব্যবস্থা করে নেওয়া দরকার। বি-ডি-ও সাহেবও সেই পরামর্শই দিলেন। জিপের পেছনে কড়াইটা আঁটলো না, বি-ডি-ও সাহেবের পাখা টানে যে ছোকরা সে রসিকতাও করল—"স্যার, কড়াইটার ভিতরই গাড়িটাকে নেন।" শেষে গাড়ির মাথায় কড়াইটাকে উল্টে আংটার সঙ্গে দড়ি বেঁধে, দড়িটাকে বডির স্ট্যাণ্ডের সঙ্গেই গিঁঠ দেওয়া হল। লোহার খুন্তি আর হাতা পেছনে রাখা, সেগুলোর হাতলটা গাড়ি ছেড়ে বর্শার ফলার মতো বাইরে বেরিযে। ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল। একতাড়া ফাইল আর কাগজ নিয়ে গাড়িতে উঠতে উঠতে তুহিন অফিসের বারান্দায় দাঁড়ানো বিডিও সাহেবকে—"স্যার, হাতা-কড়াই দেখে আমাকে যদি ঘেরাও করে তাহলে কি এই কাগজগুলোই খেতে দেব?" সিঁড়িতে-বারান্দায় দাঁড়ানো অফিসের কর্মচারীরা আর বিডিও সাহেব স্বয়ং হয়তো স্মিত হেসেই তুহিনকে

বিদায় জানাতেন—এই কথার সুযোগে সে হাসিটাকে উচ্চকিত করলেন, যাতে গাড়ির স্টার্টের শব্দের সঙ্গে মিলে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য খানিকটা বিদায়ী কলরব তৈরি হল। বিডিও অফিস থেকে গাড়িটা রাস্তায় নামল। তুহিন বলল—"ডানদিক দিয়েই চলো, লোহার ব্রিজ দিয়ে স্টেশনের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাও। বাঁ দিক দিয়ে গেলে আবার মাসকলাইবাড়ি কলোনিতে কড়াই-খুন্তি দেখে গাড়ি আটকাতে পারে।" গাড়ি ডানদিক দিয়ে বেঁকলো।

এক সংবাদে প্রকাশ, এবারের খাদ্যাবস্থা এত সঙ্কটজনক এমন কি যে-জলপাইগুড়ি জিলায় ইতিপূর্বে কোনদিন, এমন কি পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সময়ও কোনো লঙ্গরখানা খোলা হয় নি, সেখানেও দশটি লঙ্গরখানা খোলার সিদ্ধান্ত সরকার করেছেন। জেলা খাদ্য ও ত্রাণ কমিটি এই লঙ্গরখানা সম্পর্কিত আলোচনা করতে গিয়ে স্থির করেন যে, লঙ্গরখানা নামের পরিবর্তে রিলিফ কিচেন নাম ব্যবহার করা হবে, যেহেতু লঙ্গরখানা নামধেয় কোনো স্থানে গ্রামবাসীদের কারো কারো আত্মসম্মানে লাগতে পারে। নাম-পরিবর্তন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত। অতঃপর দুটি মহকুমাবিশিষ্ট এই জেলায় চারটি আলিপুর দুয়ার মহকুমার জন্য ও ছয়টি সদর মহকুমার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে বরাদ্দ করা হয়। এই ছয়টির মধ্যে কোন্ ব্লকে কটি হবে মোটামুটি তাও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু সদর ব্লকের জন্য নির্ধারিত ত্রিশটি কোথায় কোথায় হবে তা নিয়ে জেলা কমিটিতে তীব্র মতবিরোধ দেখা যায়। যেহেতু বিভিন্ন পার্টির নেতাগণ শহরেই থাকেন এবং শহরের সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ নিয়মিত, সেই কারণেই স্থান-নির্বাচনের প্রশ্নে এক বা দুই মাইল উত্তর বা দক্ষিণ, পূর্ব বা পশ্চিম-ও বিতর্কের সৃষ্টি করে। কারণ সামান্য এই পরিমাণ হেরফেরেই একেকটি পার্টির প্রভাবাধীন এলাকা উপকৃত হয় বা বাদ পড়ে। এই সময় সরকারি টাকা এসে পড়ায় সিদ্ধান্ত হয়, স্থান-নির্বাচনের বিষয়টি ব্লক কমিটির উপর ছেড়ে দেওয়া হোক। ব্লক কমিটিও এ বিষয়ে তিনদিন ধরে প্রচণ্ড আলোচনার পরও কোন সিদ্ধান্তে আসতে না পেরে বিডিও সাহেবের ওপর দায়িত্ব দেয় যে নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে নিজের পছন্দমতো একেকটা স্থান তিনি নির্বাচন করবেন। একেকটা কিচেনে পাঁচ শো লোককে খাওয়ানো হবে। সুতরাং এমন-এমন জায়গা স্থির করা হল যাতে এই পাঁচ শো সংখ্যা অপরিবর্তিত রেখেও বেশি সংখ্যক

অঞ্চল থেকে লোক আসতে পারে। যদিও জেলা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিস্তার বন্যাঅধ্যুষিত এলাকাতেই প্রধানত রিলিফ কিচেন খোলা হবে, তবুও বন্যার প্রত্যক্ষে কবলে পড়ে নি অথচ বানভাসা এলাকার পাশাপাশি এমন-এমন অঞ্চলের খানিকটা কাছাকাছি রিলিফ কিচেনগুলিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। যে যে অঞ্চলের লোক ঐ বিশেষ কিচেনটিতে আসতে পারে, সেই সেই অঞ্চলের খাদ্য ও ত্রাণ কমিটি একত্রে বসে একটি তালিকা প্রস্তুত করবে—কোন্ পাঁচ শো জন ঐ কিচেনে রোজ খাবে। এতেও আরো একমাস কেটে যায়। এবং তারপর টেণ্ডার ডেকে কণ্ট্রাকটার স্থির করে রিলিফ কিচেনগুলি খোলার ব্যবস্থা হয়েছে।

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকে সর্বমোট লোকসংখ্যা অন্যূন দেড় লক্ষ। এই দেড় লক্ষের মধ্যে কমপক্ষে দেড় মাস ধরে ক্ষুধা মেটে নি এমন লোকের সংখ্যা অন্যূন এক লক্ষ চল্লিশ হাজার। এই এক লক্ষ চল্লিশ হাজারের মধ্যে মাত্র দেড় হাজার লোককে বিকেলে রিলিফ কিচেনে খাওয়ানো হবে। সদর ব্লকের অন্তর্গত তেরোটি অঞ্চলেই। এই কিচেন তাদের এলাকায় খোলার দাবিতে গত মাস দুই প্রচণ্ড আন্দোলন হয়। সেই বারপটিয়া নূতনবাস থেকে দক্ষিণ বেরুবাড়ি পর্যন্ত প্রত্যেক অঞ্চলই দাবি উত্থাপন করে। প্রধানত গ্রামের হালুয়া আধিয়ার বেটিছোযার স্বার্থে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করে, ভোট-দুর্গাপূজার মতোই, দেউনিযা মহাজন জোতদার। যুক্তফ্রণ্টের শরিক লোকজনও সামিল হয় বটে, কিন্তু বুঝে উঠতে পারে না সামিল হওয়াটা ঠিক কিনা। দাবি আদায়ের জন্য গণদরখাস্ত, প্রতিনিধিদল প্রেরণ ও ঘেরাও প্রভৃতি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। এক লক্ষ চল্লিশ হাজার ক্ষুধার্তের মধ্যে মাত্র দেড়হাজার জনকে একবেলা গম-ডাল-তরকারি মেশানো খিচুড়ি খাওয়ানো হবে। এই দেড় হাজারের মধ্যে কে থাকবে ও কে থাকবে না তাই নিযে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। এমনও সংবাদ পাওয়া যায় যে, কোন অঞ্চল-প্রধান ক্ষুধার্তের তালিকায় নাম তুলে দেওযার জন্য নামপিছু একটা বেট ধার্য করেছেন। অবশেষে কিচেনের স্থান পাকাপাকি স্থির হয়ে যাবার পর ও কিচেন খোলার অন্যান্য ব্যবস্থা সম্পন্ন হবার পর যুক্তফ্রণ্টের নেতারা বিভিন্ন অঞ্চলে যান। সেই-সব অঞ্চলে সভা ডেকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে জনসাধারণকে বোঝাতে সমর্থ

হন কেন তাঁদের অঞ্চল অপেক্ষা যে অঞ্চলে লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে তাঁদের ক্ষুধা বেশি। এ-জেলায় ইতিপূর্বে কোনদিন লঙ্গরখানা খোলা হয় নি বলে এ-বিষযে জনসাধারণের অভিজ্ঞতা কম। সেই কারণে তাঁরা এই প্রকার বোঝাতে সমর্থ হন পেটের ক্ষুধা আর লঙ্গরখানার ক্ষুধা একপ্রকার নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, যদিও সভায প্রস্তাব গ্রহণ করে এতদঞ্চলে লঙ্গরখানা নামের বদলে রিলিফ কিচেন নামটি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হয় তবু যে-সব অঞ্চলে রিলিফ কিচেন খোলা যায় নি সে-সব অঞ্চলের বক্তৃতায় যুক্তফ্রন্ট নেতারা লঙ্গরখানা শব্দটিই ব্যবহার করেন। এতে প্রমাণিত হয যে, জনসাধারণের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট নেতাদের যোগাযোগ এত ঘনিষ্ঠ যে কোন্ শব্দে জনসাধারণের ঘৃণা আর কোন্ শব্দে প্রত্যাশা জাগে তাও তাঁরা জানেন। এইসব সভার শেষে জনসাধারণ বুঝতে পারেন কেন রিলিফ কিচেনের জন্য বা পেট ভরে খাওযার জন্য যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে মিলিতভাবে কেন্দ্রীয সরকার এবং কংগ্রেস-জোতদার জোটের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করতে হবে, ও জনসাধারণের সঙ্গে এই প্রত্যক্ষ যোগাযোগই যুক্তফ্রন্টের প্রাণশক্তি। প্রতিটি সভার শেষেই যুক্তফ্রন্টের জিন্দাবাদ ধ্বনি দেওয়া হয।

সুতরাং তুহিন চলেছে হাতা-খুন্তি-কড়াই নিয়ে মণ্ডলঘাট স্টেশন থেকে মাইলখানেক উত্তরে দুই নম্বর গুমটির বটতলায রিলিফ কিচেন খুলতে। সেই বটতলায পাশাপাশি এসে মিলেছে নয়-নম্বর মণ্ডলঘাট অঞ্চল, দশ-নম্বর বোয়ালমারি-নাদনপুর অঞ্চল আর বারো-নম্বর খারিজা-বেরুবাড়ি অঞ্চল। ইউনিয়ন বোর্ডের আমলে এগুলোর নম্বর ছিল যথাক্রমে নয, দশ ও বারো নম্বর ইউনিয়ন।—অঞ্চল পঞ্চাযেত গঠিত হবার পরও নম্বরটা থেকেই গেছে, প্রধানত এই কারণে যে নম্বরটা খাতাপত্রে আর বদলায় নি। হাতা-খুন্তি-কড়াই নিয়ে তুহিন যখন চলেইছে তখন সে এ-অঞ্চলের ক্ষুধার মানচিত্রটাও জানে ভালো। বাঁদিক দিযে বেঁকে ন্যাশন্যাল হাইওয়েতে উঠলে মাসকলাইবাড়ি কলোনির পাশ দিয়ে যেতে হবে। সেখানে মানুষের বসতি অনেক ঘন, ফলে পরিবার অনেক বেশি, ফলে মহিলা ও শিশু অনেক বেশি, ফলে ক্ষুধা অনেক বেশি। সুতরাং গাড়ির মাথায় উল্টোনো নৌকোর মতো কড়াই আর গাড়ির ভেতরে উদ্যত বর্শার মতো হাতা-খুন্তি সেখানে উনুন, আগুন, হাঁড়ি, ভাত—এই চিত্র তৈরি করবে। সেই চিত্র ভেবে তুহিনের গাড়ি

আটকাতে পারে। আর ডান দিকে শহরের মধ্য দিয়ে রাযকত পাড়ার পর অফিসারদের পাড়া পেরিয়ে বড় লোহার ব্রিজ পেরিযে তিন নম্বর গুমটি দিয়ে যদি গিয়ে হাইওয়েতে পড়ে তবে ক্ষুধার সীমানা এড়িযে যাওযা যায়। ঘেরাও হতে তুহিনের অবিশ্যি আপত্তি ছিল না। এমন কি গাড়িতে যদি গম ডাল ইত্যাদি থাকত তাহলে নন্দনপুরের বটতলার বদলে অন্য কোথাও রেঁধে খাইয়ে দিতেও তার আপত্তি নেই। মুশকিল হল, তার সঙ্গে তাড়া-খানেক কাগজ আর ঐ কড়াই-হাতা-খুন্তি ব্যতীত আর কিছুই নেই। অঞ্চল ও ব্লক অফিসের শিলমোহর আঁকা, অঞ্চল-প্রধান ও বিডিও সাহেবেব স্বাক্ষরিত সেই তাড়া-খানেক কাগজে আছে তার কিচেনে খেতে পাবে এমন আইন-অনুমোদিত ক্ষুধার্তদের তালিকা। সুতরাং যে পথে ক্ষুধা নেই তুহিন সেই পথে গাড়ি ঘোরাতে বলল।

দূর থেকে যে-ভিড়টাকে মিটিঙ ঠাহর হয়, গাড়ি দেখে সেদিকেই সবাই ফেরায় সেটাকে সন্দেহ হয ঘেরাও-টেবাওয়ের ব্যাপাব। সুতরাং গাড়িটাকে মাঠেব মধ্যে আর না এগিয়ে দাঁড়াতে বলল। স্টার্ট বন্ধ না করে গাড়িটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িযে কাঁপতে লাগল। তুহিন গাড়ি থেকে নেমে প্যান্টটা টানতে-টানতে চারপাশে তাকিয়ে বুঝতে পারল গাড়ি থেকে যেটাকে কোনো সংঘবদ্ধ ভিড় মনে হয়েছিল, আসলে সেটা সারাটা মাঠে ছড়ানো-ছিটোনো জটলা। তখন বিকেল। বিকেলে মাঠে আলো ছড়িযে থাকে। বৃষ্টি-বাদলার দিনে সেই নরম আলো আবাব প্রতিফলিত হয়। তুহিন ভাবল, বিকেলে এরা মাঠে বেড়াতে এসেছে। তুহিনেব এই ভাবনার পেছনে কি দুশো বৎসরের ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্তেব শহুরে রক্ত কাজ করল—যারা বিকেলে মাঠে বেড়াতেন। সেই বিচ্ছিন্ন জটলাকে তার কাছে এগিযে আসার সময দিতেই চাবপাশে তাকিয়ে তুহিন ধান-কাটা মাঠের প্রসিদ্ধ রিক্ততা ও ধান-বোনা মাঠের বিখ্যাত কৈশোর দেখল। এখনো সব ক্ষেতের পাট কাটা হয নি। নাকি এরা আর এবার পাট ক্ষেত থেকে কাটা, জলে ভেজানোর মেহনতটুকুও করবে না। গেল বাব পাটের যা দর ছিল তাতে অনেকেই আরো দামের লোভে পাট বাজারে ছাড়ে নি, বিশেষত শেষের দিকে যখন পাটের দামটা কমে গেল তখন বড় জোতদাররা পাট আটকে ফেলল। এবারও ধান চাল সার্চ করতে গিয়ে কত গোলা ভর্তি পাট

দেখেছে তুহিন। ফলে এবারের পাটের দামই নেই। পাট কেটে ভিজিয়ে বেচার মেহনতটুকু ভিক্ষেতে দিলে বেশি টাকা পাওয়া যাবে। সুতরাং ক্ষেতের পাট ক্ষেতেই পচছে। তবু পাটক্ষেতের, পাকা ধানের, বীজধানের, ভেজামাটির গন্ধ মিশে, প্রান্তর, নরম আলো, বটগাছ মিলে যখন তুহিনের কাছে চিরন্তন বাংলাদেশের পরিচিত অভিধা প্রায় এনে ফেলেছে, তখুনি, নেহাতই সেই সাবেকি বনেদি বাঙালি আবেগে, হাতের দশ আঙুল দিয়ে মাথার চুল পেছনে ঠেলে আকাশ হেরতেই নজরে পড়ল জিপগাড়ির ওপর ওল্টানো কড়াই যেন একটা বৌদ্ধস্তূপের আভাস বচছে। মাঠে ছড়ানো-ছিটোনো জটলার মধ্যে কেউ কেউ উঠে দাঁড়িয়ে যেন অপেক্ষায—তুহিনই এগিয়ে যাবে, না তারাই এগিয়ে আসবে। বাকি সবাই শুয়ে বসেই। জিপের ওপাশ থেকে একজন হঠাৎ বেরিয়ে এসে নমস্কার করে তুহিনের সামনে দাঁড়াল। এ-অঞ্চলের গ্রামসেবক।

"স্যার, আপনার তো এখন আসবার কথা ছিল না?"

"না, শেষে ঠিক করলাম তাড়াতাড়িই চলে আসি, আপনারা আবার এদিকে সব ঠিকঠাক—"

"সব ঠিকঠাক আছে স্যার, এ মাঠটাতে তো দুর্গাপূজা হয়, ঐ চালাটাতে ভোগ রান্না হয়, ভাঙা-চোরা উনুনও আছে। আমি চৌকিদার দিয়ে ইট-টিঁট বসিয়ে উনুন ঠিক করে রেখেছি।"

"এরা কারা?" দুর্গাপূজার ভোগের ঘর দেখতে যে-দিকে আঙুল দেখিয়ে দিল গ্রামসেবক, তার উল্টোদিকে আঙুল দেখিয়ে তুহিন জটলার মানুষগুলিকে নির্দেশ করল, ততক্ষণে সে-জটলা থেকে দু-চারজন তুহিনের দিকে আসতে শুরু করেছে।

"আর বলেন কেন স্যার, সেই দুপুর থেকেই শুরু হয়েছে। নয়-নম্বর আর বারো-নম্বরের যাদের নাম লিষ্টি হয়েছে তারা দুপুর থেকে এসেই জোট হচ্ছে, পাছে কাল সকালে এলে আর না পায়, হেঁটে আসতে তো হয় প্রায় মাইল তিন-চার, তা একেকজনের লাগে প্রায় ঘণ্টাখানেক। কাল সকালে এসে পৌঁছুনোর আগেই যদি খাওয়া-দাওয়া চুকে যায়—" গ্রামসেবক হাসল। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক নমস্কার করলেন। "আমি বারো-নম্বরের প্রধান—আচ্ছা যে লিষ্টিটা বানাইলেন, উয়তে কোনো নতুন নাম লেখান যাবে না, বাবু?"

"না, আমি ও-সব কিছু জানি না, আমাব কাছে এই সীল-দেওয়া নাম আছে—এর বাইরে আমি কাউকে দিতে পারব না।" বলে তুহিন গ্রাম-সেবককে নির্দেশ দিল—"কড়াই-খুন্তি নামাতে বলুন—আর আমার থাকার জায়গা কোথায় করেছেন ?"

পেছন থেকে একজন এগিয়ে এসে গ্রামসেবককে বললেন—"আপনি ওগুলা আমার বাড়িতে পাঠায়ে দেন, আর আপনি চলেন—আমার ওখানেই আপনার থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা হইযেসে।"

তুহিন প্রশ্নচোখে গ্রামসেবকের দিকে তাকাতে উত্তর পেল—"আমি তো আপনার থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা অঞ্চল-অফিসেই করেছিলাম স্যার—কিন্তু যোগেনবাবু কিছুতেই ছাড়লেন না।"

যোগেনবাবু হাতজোড় করলেন—"সেটা হবার নয়, আপুনি এসেছেন হামরালার ক্ষুধার্ত মানষিলার খাওয়াবাব তালে, ত্যালায আপুনি সাগাই (কুটুম্ব) আমাদের—"

সিগারেটের প্যাকেট এগিযে দিতে দিতে বাবো-নম্বরের প্রধান বললেন—"সিটা তো ঠিকই—আপুনি যোগেন্দ্রের বাড়ি যান, হাত মুখ ধোন, বিশ্রাম নেন, তারপর কথাবার্তা কহা যাবে।"

"আপনার বাড়ি কোথায় ?"

"ঐ তো"—মাঠের উত্তর-পশ্চিম কোণায় একটা টিনের চালের বাড়ির দিকে হাত দেখাল যোগেনবাবু। ততক্ষণে গ্রামসেবক কড়াই-খুন্তি নিযে রওনা দিয়েছে। তুহিন ড্রাইভারকে বলল—"তাহলে তুমি যাও," ড্রাইভার গাড়ি ঘোরাতে লাগল আর যোগেন্দ্রবাবু, বারো-নম্বরের প্রধান, তুহিনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। চলতে-চলতে তুহিন বটগাছতলার দিকে তাকিয়ে দেখল লোকগুলো নড়াচড়াও করছে না। জিপগাড়ি আব তুহিনকে দেখেও না। কড়াই আর খুন্তি দেখেও না। কাল খিচুড়ি দেখে ওরা নড়াচড়া করবে তো ?

কেমন একটা অস্বস্তি নিয়ে তুহিন চোখ মেলে চাইল। মশারি ভেদ কবেও বেড়ার বাইরে জ্যোৎস্নার আভাস। কোণায় লণ্ঠন জ্বালানো আছে। যোগেন্দ্রবাবুর রেডিয়োতে সাড়ে সাতটার বাংলা সংবাদ শোনার পর,

রাজস্থানে মেদিনীপুরে বন্যা, এগারোই সেপ্টেম্বর ধর্মঘট হবে না, মোরারজি দেশাই লণ্ডনে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, আটটা নাগাদ খেয়ে-দেয়ে শুয়েছে, কটা বাজে, খুব বেশিক্ষণ তো ঘুমিয়েছে মনে হয় না—বালিশের তলা থেকে ঘড়িটা বের করে,—নজর দিয়ে দেখে রাত সাড়ে দশ, মাত্র, মানে মাত্র ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়েছে। কিন্তু ঘুমটা একটা অস্বস্তি নিয়ে ভাঙল কেন, ঘরে কি কেউ ঢুকেছে। মশারি তুলে বেরিয়ে লণ্ঠনটা বাড়িয়ে উঁচিয়ে দেখে—না, কিছু নেই, শুধু লণ্ঠনের আলোর উজ্জ্বলতায় বেড়ার ফাঁকের জ্যোৎস্না হারিয়ে গেল। ঘরের একটামাত্র চেয়ারের পেছনে জামাটা ঝোলানো—তার পকেট থেকে সিগারেট-দেশলাইটা বের করল, না ধরিয়ে কাঁসার ঘটি তুলে জল খেল ঢকঢক করে, যোগেন্দ্রবাবু খাসির মাংস খাইয়েছেন, হাজার হোক সরকারি অফিসার তো, একটা ঢেকুর তুলল, মাংসের ঝোল খানিকটা উঠল, সুতরাং আবার একটু জল খেলো, তারপর সিগারেটটা ধরিয়ে দেশলাইটা ছুঁড়ে চেয়ারের ওপর ফেলল, তাতে খুব একটা শব্দ হতেই তুহিনের অনুভবে আসে এতক্ষণ নানারকম শব্দ করে করে সে চারপাশের নিথর নিস্তব্ধতা টুকরো টুকরো করছে। সন্ধ্যাবেলার পর থেকেই চারপাশ কী রকম নিঃসাড়। যোগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে বসে গল্প করার সময় কথা বলতে বলতে মনে হচ্ছিল যেন মিটিঙে বক্তৃতা করছে। অথচ যোগেন্দ্রবাবুর গল্পটা শুকনো পাতার মতো খস্‌খসে। চারমিনার খাঁন না, লেক্স খান। হাফশার্ট পরেন না। ফুলশার্ট পরেন। বাইরের নিস্তব্ধতাটা দেখতে দরজার খিলে হাত দিতেই "বাবু" বলে বাইরের অন্ধকার থেকে একটা প্রায় নিঃশব্দ ডাক, প্রায় ঝিঁঝির ডাকের মতো অনবরত বেজে যাওয়ার একঘেয়ে স্বরে উঠে মিলিয়ে যেতেই তুহিনের সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। ঘুমের মধ্যে এই ডাক শুনেই সে জেগে উঠেছে।

ডাকটা যেন আবার উঠবেই এমন অপেক্ষা নিয়ে দরজার খিল ধরে তুহিন দাঁড়িয়ে থাকল। দরজার খিলে তার দুটি হাতই, সে কারণেই ঠোঁটের সিগারেটের ধোঁয়া নাকেচোখে ঢুকে জ্বালা করছিল, কিন্তু তবু তুহিন সেটা নামাতে খিল থেকে হাত সরায় না। "বাবু" ডাকটা আবার উঠল। মিলিয়ে যাবার পর তুহিনের মনে হল, না, কেউ ডাকে নি, বাইরে থেকে কোন কিছুর আওয়াজ এসেছে। কিন্তু এবার সে ঠোঁট থেকে সিগারেটটা

নামিয়ে, প্রায় নিজের সঙ্গে কথা বলার স্বরে শুধোল—"কে"। তুহিনের মনে ভয়—যদি কেউ জবাব না দেয়, অথচ যদি আবার ডাকটা ওঠে। তাই সে আবারও প্রশ্ন করে, "কে?" "আমি বাবু, ফান্দাইভপাড়ার অতীশ্বর"। "কী চাও"? বাইরে অন্ধকার থেকে জবাব এল—"হামার নামটা বাবু উঠে নাই"—তুহিন এবাব দরজা খুলে বেরোল, লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে। বাইরে অর্ধ-স্পষ্ট আলো, কৃষ্ণপক্ষ, দিগন্তে চাঁদ, দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু খুব মৃদু আলো ছড়িয়ে। ঘরটার কোনো বারান্দা নেই, দবজা খুললেই একটা গাছেব গুঁড়ি পাতা। তারপর মাটি। নেমে তুহিন আলোটা তুলে দেখল আর একটা গুঁড়ির মতোই লোকটা দাওয়ার নিচে বসে, লণ্ঠনের আলোতে তার দাড়ি-গোঁফভর্তি মুখটাব ভেতর চোখটা চকচক করছে। "বাবু, আমার নামটা নাই"—"নেই তো আমি কী করব, তাই বলে তুমি আমাকে ঘুম থেকে তুলে নাম লেখাবে?"

"আজি নাম না লিখালে তো কালি ভাত পাম না"।

"আজি আর লিখানো যায না, যখন নামের লিষ্টি তৈরি হয়েছিল তখন কী করেছ?

"হামরালার টাড়িত নামের লিষ্টি তৈরি হয় নাই বাবু—"

"কেন?"

"হামরালার উতি বানার জল যায় নাই।"

"তাহলে তো তুমি পাবেই না, তবে এসেছ কেন?"

"ভাত না খাসি দশ দিন, না দেখস্থ চার দিন।"

লণ্ঠনের আলোয় লোকটার দুই ঠোঁটের ফেনাগুলো দেখা যাচ্ছে। লণ্ঠনের আলোয লোকটার চোখের মণি দুটো জ্বলজ্বল করছে। লণ্ঠনের আলোও লোকটার পক্ষে যথেষ্টর বেশি। শিখা কমিয়ে ঘরের ভেতর লণ্ঠনটা রেখে দিয়ে তুহিন চৌকাঠের ওপর পা ঝুলিয়ে বসল, গুঁড়ির ওপর পা রেখে। এ-রকমটাই তার ইচ্ছে ছিল, যখন দরজায় হাত দেয়। ডাকটা ভয় ধরিয়ে দিযেছিল, লোকটা ভয কাটিযে দিয়েছে।

"বাবু"—কণ্ঠস্বরের দিকে তাকাতে তুহিন দেখল লোকটাও এগিযে এসেছে, তার পায়ের কাছেই একটু দূরে, মাটির ওপব হুমড়ি খেযে। লোকটা কি দাঁড়িয়ে হেঁটে এল, নাকি হামাগুড়ি দিয়ে। লণ্ঠনের আলোটাকে আড়াল

করেই তুহিন বসে, বাইরে চাঁদের আলোতে একটা কুয়াশা সৃষ্টি হয়েছে মাত্র। ভাগ্যিস, লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না,—চাঁদের আলোও ওর পক্ষে যথেষ্টর বেশি। সিগারেটে টান দিল তুহিন।

"বাবু—হামরালার নাম অতীশ্বর"—তার মানে রতীশ্বর, এদের নাম শুনে মূল অনুসন্ধান করা রীতিমতো গবেষণার ব্যাপার।

"বাবু—হামরালার বাপাটা মরি গিসে—"

"তুমিই তো সাত ছেলের বাপা হতে পারো, তোমার আবার বাপার দরকার কি"—রসিকতা কবার লোভ সামলাতে না পেরে তুহিন ক্ষণেকের জন্য ভাবে আলো লোকটার মুখে যখন ফেলেছিল তখন দাড়িটা কাঁচা না কাঁচাপাকা, দেখেছিল কি।

"বাপার নাম তো নাগিবে, বাবু—লিষ্টিতে—' লোকটার কথাগুলো ধীরে অথচ স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসছে। এত আস্তে কথাগুলো সে বলছে মনে হয় যে-মাটির কাছাকাছি হুমড়ি খেয়ে সে বসে, সেই মাটি থেকেই কথাগুলি উঠে আসছে গাছ বা লতাপাতার মতো। তুহিনের আবার মনে হল—লণ্ঠনের আলোতে কি লোকটাব দাঁতের পাটি ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল, ধব্‌ধবে ফর্সা, মাংস খাবার উপযুক্ত, করাতির করাতের দাঁতের মতো তাজা ঝকঝকে দু পাটি দাঁতের সাবি।

"এখন লিষ্টিতে নাম লেখা যাবে না, আর তোমার ঘরে তো তিস্তার জল যায় নি, তুমি ভাত পাবে না—"

"হামরালার তো ভুখটা পাইসে বাবু," বলে লোকটা এতক্ষণ চুপ করে থাকল যে মনে হতে পারে সে চলে গেছে। অথবা চারপাশের শব্দহীনতা বা অন্ধকার বা তাৎপর্যহীন ঝিঁঝিব ডাক বা বাঁশবনের মর্‌মর্‌ বা দূরে সেই বটগাছের পাতার সর্‌সর্‌ ধ্বনিপুঞ্জে যে-কোন শব্দই উচ্চারিত হয়ে ডুবে যায়। সময়ে শব্দ বাঁচে না। তাই লোকটা যখন "প্যাটটা ভুখায়" বলল তখন অনেকটা সময়ের অতিবাহনের বোধ সৃষ্টি হয় অথচ "প্যাটটা বিষায়"—এই কথাতে লোকসঙ্গীতের পুনরাবৃত্তির সুর ধরা পড়ে। "প্যাটটা বড খালি বাবু, দশদিন আগত ভাত খাই নি, প্যাটত কুস্থ নাই"—সম্ভবত লোকটা আর তুহিনের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে না। যাও বললে লোকটা যাবে না, যাবার জন্য সে এত রাতে আসে নি এটা বুঝেই

তুহিন শেষ-হয়ে-যাওয়া সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে, উঠে দড়াম করে দরজা বন্ধ করার বদলে চৌকাঠের ওপর টিপে আগুনটা নেবায়, তাতেও দু একটা ফুলকি ওঠে, আস্তে করে উঠে ঘরের ভিতর চলে যায়, তাতে লণ্ঠনের আলোটা বাইরে যায় বটে, কিন্তু চৌকাঠ আর দাওয়ার ছায়াটায় লোকটাকে ঢেকে গিয়ে পড়ে বেশ কিছুটা দূরে। তুহিন ঘবের ভেতর দাঁড়িযে ভাবে দবজাটা আস্তে বন্ধ করবে, না জোবে।

"হামরালার নাম অতীশ্বর। বাপাটা মবি গেইসে। নাম মতীশ্বর। ফান্দাইতপাড়া। তিন-নম্বর গ্রামসভা। নয-নম্বর মণ্ডলঘাট অঞ্চল। তিস্তার বানায ভাসে নাই। কিন্তুক ভুখ নাগে।" লোকটাকে দেখা যায না। দাওয়ায় ঢাকা পড়েছে। নাকি লণ্ঠনের আলোটা তুহিনের চোখের সামনে পর্দা হয়ে লোকটাকে আড়াল করেছে। লোকটা তাহলে মাটির সঙ্গেই কথা বলছে।

"বাপাটা মরি গেইসে। মতীশ্বর বাপাটা। কিন্তুক বাপার নামটা তো নাগিবে, বাবু। এইঠে তো আরো কনেক অতীশ্বর থাকিবার হয। হুই দেউনিয়াপাড়াব অতীশ্বর। হুই ববমতলার অতীশ্বর। হুই সাহেববাড়ির অতীশ্বব। আর হেই ফান্দাইতপাড়ার অতীশ্বর। বাপার নামটা না জানিলে কোন্ অতীশ্বরক্ ভাত খিলাবেন বাবু। হামরালা বাপা মতীশ্ববেব ছোযা ফান্দাইত পাড়ার না-খাউয়াইযা অতীশ্বর। আব উমরালা খাউযাইয়া অতীশ্বর"—। লোকটা তো হুমড়ি খেযে ছিল, এখন বোধহয় দুই হাতে মাটি হাতাচ্ছে আর মাটির সঙ্গে কথা বলছে। তুহিন দরজার কাছে না এগিয়ে পারল না। না। লোকটা চাঁদ-উঠেছে-অথচ-দেখা-যাচ্ছে-না-যে-আকাশে সেদিকে তাকিয়ে দাওযায ঠেস দিয়ে কথা বলছে। মাটির সঙ্গে ওর কথা বলা বোধহয় শেষ হযেছে। এখন আকাশের সঙ্গে। তারপব, সেকথা বলা সাঙ্গ হলে? আস্তে দরজাটা বন্ধ করে খিল আটকে তুহিন চৌকিতে উঠল। বাইরে কথকতা—

বাবু, মতীশ্বরের ছোয়া ফান্দাইতপাড়ার না-খাউয়াইয়া অতীশ্বর পাঁচ মাইল হাঁটি আইসচে। তোমরালার গাড়িটা দেখিসু। মাথাত হুই এত্তো বড়ো কডাইটা দেখিসু। আর ছুটু দেসু। হুই কডাইটা বডো ভালো দেখাসে বাবু। হেই এত্তো বডো, হে-এ-ই এত্তো বডো। বডো তো

নাগিবা হয়, কতো মানষির ভাত ফুটিবে। দুগ্গা পুজার ভোজ হয়, ওইঠে। তা বাবু, কালি সকালত আন্না (রান্না) চড়িবে ? হুই অতো বড়ো কড়াইটা। কতো মানষিলার ভাত আঁটিবে। বাবু। শুধু ভাত দিও বাবু। ভাতের বাসটা পাই নাই। জলটা ঢালিলে যে বাসটা অয় উটা পাই নাই। দশদিন আগত ভাত খাস্থ। উ বাসি ভাত। ফেলনা ভাত। স্থবাস না থাকে। তোমরালার ভাতত স্থবাস থাকিমে।

আমি তুহিনজাপদ চক্রবর্তী। একসঙ্গে হিমালয়, হিমালয়ের মেয়ে দুজনকেই খুশি রাখতে চেয়েছেন বাবা। বাবা শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী। তেত্রিশ-কোটির কোন দেবতাই বাদ যাবে না। বি-এ পাশ করে ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট অফিসে চাকরি করছি। বাবা জে-এল-আর-ও অফিসের কেরানি। ঠাকুর্দা ছিলেন পুরোহিত। বাবা গত পনেরো বছরে হালতিনেক জমি করেছেন। তার কয়েক বিঘাব তদারকি আমিও করি। গেল বার কপি লাগিয়েছিলাম। স্নো বল ভালো হযেছিল। বছরের খোরাকি ক্ষেত থেকে ওঠে না। তাও ছয মাসের চলে যায। রেশনকার্ডে আমি আর বাবা আলাদা। বাবা রেশন পায না—গ শ্রেণী। আমি রেশন পাই—ক শ্রেণী। আমার রেশন আর বাবার ক্ষেত মিলে আটমাস চলে যায়। এবার বারো মাসের বেশি যাবে।

দশদিন আগত ভাত খাস্থ। হেই কায় কহিল উমরালা খিলাবে, বেটিছোযার বিয়া। মিছা কথা। খিলাবে না। বসি বসি ফিরি আসিন্থ। ভিতরত খুব ভাতের বাস পাসি। বাস খুব চিকন বাবু। বাস শুঁকি বুঝিবার পারি ভাতটা শাদা। ধবধব শাদা। হেই চাঁদাটার মতন শাদা হবা পারে। আর চিকন, হেই নেনিয়া হবা পারে। কালা নেনিয়া। বাসমতী হবা পারে। কালা নেনিয়া আর বাসমতী ই তো বাসত ফারাক বুঝিবার না পারি। তয় ই তো ঠিক বুইঝ্‌ঝু চিকন ভাত। উ তো হামরার খিদা না মেটে। আব উ ভাতত্‌ ত নবন নাই। উ এক মুঠা ভাতত দুই মুঠা নবন নাগে। না খাই অ ভাত। প্যাট না ভরে। আর উ মানষিলা ত খ্যাদায় দিসে। দিসে। ফিরি আসিন্থ। আর আসিবার তানে বাস পাইস্থ। বাস নাক ভরি নিস্থ। ভাতের বাস, বাবু। চিকন্ ভাতের বাস।

বাবা ব্যবসা করেছে। চালের ব্যবসা। লেভি দেয় নি। রিটার্ণ দিয়েছে

সব বিক্কিরি হযে গেছে। লেভি হয়তো ধরতই না। ছাড়ই পেত। তবু আর সে অনিশ্চযতার মধ্যে যায় নি বাবা। তারপর আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি আমার মাইনের টাকা দিয়ে ধান কিনল। দশ সের। প্রথমবার সেই ধান দুদিন পরে বেচল। তারপর আবার দশ সের কিনল। এবার নিজে বাজারের ব্যাগে করে নিয়ে গেল। স্টেশনের পাশে আছে ছোট্ট একটা হাস্‌কিং মেশিন। সেখানে জমা দিয়ে ছয় সের চাল দিল। সেখান থেকে বাজারে গেল। বাজারে পাইকার আড়াই টাকা করে কিনল। এই দুইবার বাবা বোধহয় পরীক্ষা করল। তারপর থেকেই মন হিশাবে কেনা-বেচা। টাকাও আটকা পড়ে থাকে না। এখন বাবা শিলিগুড়িতে চাল পাঠাচ্ছে। সেখানে চালের কেজি চার টাকা করে। কেজিতে দুই টাকা লাভ কমপক্ষে। জে-এল-আর-ও অফিসের এক তহশিলদার বাবার কাছ থেকে নগদ টাকা দিয়ে চাল নিয়ে যায়। শিলিগুড়িতে পাচার আর বেচার ভার তার। সুতরাং বাবার ধরা পড়ারও কোন ভয় নেই।

হুই ভাতেব বাসটা নিতে নিতে নিদ্ গেস্নু, বাবু। ভাতেব বাস নিতে নিতে নিদ গেস্নু। হঠাৎ জাগি উঠিনু। অনেক বাত্রি, বাবু। সগায নিদ্ গিসে। দুই দল কুত্তা খুব চিল্লাসে। ভাতের বাসটা আর নাই। তয় উঠিনু। উঠিয়া রওনা দিনু। তয় এলায় আবাব ভাতের সুবাস পাসি। এলায় গরম ভাত না হয়, বাসি ভিজা পচা ভাতের গন্ধ। কুন্ঠে আইসচে? এলায দেখি দুই কুত্তার দল চিল্লাসে, ভাত আছে, হুই বাসি ভাত, হুই ভাতের চারিপুহে কুত্তার দল আসি মিলসে আর হে-ই খুব চিল্লাসে। হে-ই শালা চিল্লাস কেনে। তয এক লাঠি নিয়া গেসি, গেসি-ই, তয কুত্তা-গুলান্ ভাগসে। আর নিয়াঁ, বাবু। ঐ ভাত, বাবু, নিযা। একটা কলাপাতাত করি নিযা, বাবু। ঐ, ভাত, একটা কলাপাতাত করি নিযা, আস্তার উপর, হেই দুগ্‌গা পূজার পুরোহিতের তানে বসিযা, টুকুস-টুকুস করি খাইস্নু। হেই, এলায হেই ধর কেনে, এই পোয়াটেক ভাত, খাসি সারা রাত ধরি, কনেক কনেক করি, টুকুস টুকুস করি। খাইস্নু। হেই যেলায় সুয্য উঠিবার নাগিসে সেলায হামরালার খাওয়া হই গিসে। তয়, হাঁটি চলি আইচছু। ফান্দাইতপাড়াত চলি আইচছু, হামরালা ফান্দাইত-পাড়ার বাপা মতীশ্বরের ছোযা না-খাউয়াইয়া অতীশ্বর—

সুতরাং আমার বাবার অনেক টাকা হযেছে, হচ্ছে। বাবার আশা আরো টাকা হবে, অনেক টাকা। ব্লক অফিসেব কেরানি আমি, আমার বাবা জে-এল-আর-ও অফিসের কেরানি। ভাবছে অনেক টাকা হবে। মানে এবারের পুজায আমাব ভাই-বোনগুলো বেশ দামি দামি পোশাক পরবে। বাবা-মার ভাবটা কী রকম জানি না। সে-রকম ভাব থাকলে চাই কি মাব দু-একটা ছোটখাটো গযনাও হতে পারে। আর আমাব একটা বউ হতে পারে। মা এর আগেই বলত। বাবা কানে নিত না। এখন বাবাই মাঝে মধ্যে বলে। এবং শেয পর্যন্ত আমার একটা বউ মিলেও যেতে পারে। বাবাব ইচ্ছে, বেশ ছোটখাটো বাচ্চা-বাচ্চা বউ হয। আমি জানি, দেখতে-শুনতে বেঁটে খাটো মেয়েকেই বাবার লক্ষ্মী-লক্ষ্মী বউ মনে হবে। আমার ইচ্ছে, বেশ একটা লম্বা-চওড়া বউ হোক—যাকে পাশে নিয়ে হাঁটতে বেশ ডাঁট-ডাঁট লাগে। আমার বাবার চাল-বেচা টাকা এত হবে কি যাতে আমি ঐ রকম একটা বউ পেতে পারি। নাকি আমার বিয়ে দিয়ে বাবা চাল-বেচা টাকার অঙ্কটাই বাড়াতে চায়। তেমন হলে আমার পছন্দ বাবার পছন্দ কোন পছন্দই টিঁকবে না। সুতবাং আমি এখন মনে মনে আমার বউয়ের একটা চেহারা কল্পনা করতে পারি না।

বাবু, চারদিন আগত আমি শেষবার ভাত দেখসু। গেইসি ঘুঘুডাঙার হাটত। যাসি হামি, রোজ হাটবারত যাসি। দুই একটা দোকানত আমার খোয়া মিলে। দেয়। ওমরারা দযা কবি দেয় কেনে। একমুঠা মুড়ি কি একটা জিলাপি। দেয় কেনে। দুই একটা রুটিও দুই একবার দেয় কেনে। তা গেসি। সারা দিন রাতি ত হাটত পাক খাইসি। হেই জিলাপির টুকরা। আর পাঁউরুটির টুকরা। আর বিস্কুটের টুকরা খাইসি। মুড়ি আর দেসে না বাবু। মুড়ির কেজি চার টাকা করি। কাযও না দেসে। ঘুঘুডাঙার হাটত দেখিসি সগায় ঘুরি ঘুরি এটা ওটা কেনে। ক্ষেত চষিবার তানে বলদ কেনে। কম দাম, জোর বেশি বলদ চাহে লোকে। ঘাডত করি হাল ঠেলিবে। ঠেলিলে মাটি উঠি আসিবে। সেই মাটিত ধানের চারা পুতিবে। সেই চারা বড হইবে। সেই চারার শিষত ধান আসিবে। সেই ধানের ভিতরত দুধের মতো চালের দানা আসিবে। সেই দানা শক্ত হইবে। সেই ধান কাটিবে। সেই ধান মাডাইবে। সেই ধান ভিজাইবে। সেই ধান কুটিবে। সেই ধানত

চাউল হইবে। সেই চাউল জলে সিদ্ধ হইবে। সেই ভাত খাইবে। এখন বলদ কিনিয়া চাষ দিলে হেই অগ্রান মাসত ভাত পাকা যাইবে। ত হামরালা চাউলের বাজার ঘুরিস্থ। ত দেখিনু অনেক ধান কেনে। অত ধান কুটিলে কত চাল হইবে, বাবু। অত চালে কত ভাত হইবে, বাবু। ঐ ভাত রাঁধিবার তানে কতো বড়ো কড়াই নাগিবে, বাবু। তোমার কড়াইটাও ছোট হইযা যাইবে, বাবু। সেই ভাতটা ফুটিবে কেম্‌নে। তোমার কড়াইত ভাতটা ফুটিবে কেম্‌নে, বাবু, কাল সকালত। কেমন ফুটিবে, বাবু। বৃষ্টির ফোঁটা যেলা পুকুরত, সেইলা ঐ কড়াইত ভাতটা ফুটিবে আর ফুটিবে, বাবু। ঘুঘুডাঙার হাটেত অত চাল। ঐ চাল ফুটিবে, বাবু। বৃষ্টির ফোঁটা যেইলা পুকুরত, সেইলা ফুটিবে। তারপর মানষিলা ঐ ঘুঘুডাঙার হাটত চাউলের ভাতের মাড়টা গালি দিবে। দুধধোয়া জল যেইলা, সেইলা জলটা বাহির হইয়া যাবে। সেইলা তোমার কড়াইত কাল মাড়টা গালি দিবা আর জলটা বাহির হইযা যাবে। আর বাহির হইযা গেলে শাদা ভাতটা বাহির হইয়া যাবে। বাবু, চারদিন আগত ঘুঘুডাঙার হাটত চাউল দেখি ভাবিবার নাগে ভাতটা দেখিবার কেমন? দেখহু শাদা ভাত যুনি (যুঁই) ফুলের তক্। বাবু, কালি তোমরালার ভাতও যুনিফুল যেয়লা সেইলার মতো নাগিবে। নাকি তিস্তা নদীব ফেনার মত? বাবু, ভাত দেখিবাব কেনং নাগেঁ, বাবু? বাবু, ভাত দেখিবার কেনং নাগে? যুনিফুল, না তিস্তাব ফেনা। খোওয়াও কি না খোওয়াও, ভাতটা কাল হামার দেখাইও। হামরালা ফান্দাইতপাড়ার বাপা মতীশ্বরের বেটা না-খাউয়াইয়া অতীশ্বর—হামাক কনেক ভাত দেখলাবার পাব?

আমাব মায়ের লক্ষ্মীর• বাক্সে একটা আকবরী মোহর আছে। বিজযা-দশমীর দিন যখন প্রতিমাকে বিদায় দিতে বারোয়ারি পূজামণ্ডপে মা যায়, তখন কাঠের সেই পুরনো কৌটোটা খুলে একবার করে মোহরটা দেখি। ছোটবেলায় তো দেখতাম-ই, এখনো দেখি। কৌটোটা মা ছাড়া আর কেউ খুলতেই পারে না, এমন শক্ত হয়ে গেছে। আর কেউ খুললে হঠাৎ মুখটা খুলে আসে, ভেতরের দু-চারটে সিঁদুর-মাখানো রুপোর টাকা ঝন্‌ঝন্ করে নিচে পড়ে যায়, সিঁদুর ছিটিয়ে পড়ে। আর মা-র কী একটা কায়দা আছে। টুক করে খুলে ফেলে। অন্যান্য রুপোর টাকার সঙ্গে আকবরী

মোহরটার পার্থক্য বোঝা যায় না। সিঁদুরে মাখামাখি হয়ে আছে। সাইজটা একটু অন্যরকমের, চৌকো-চৌকো, তা দেখে চেনা যায়। তারপর বুড়ো-আঙুলের এক ঘষায় সিঁদুরটা তুলে ফেললেই আরবী লেখা বেরিয়ে পড়ে। প্রতিবারই বিজয়া-দশমীতে আমরা একবার করে আকবরী মোহরটাকে দেখি, প্রতিবারই এই একটা আকবরী মোহরের দাম নির্ণয় করি, পঞ্চাশ থেকে শুরু হয়, পাঁচ শোতে গিয়ে শেষ হয়, তাতেও আমাদের তৃপ্তি হয না, কেন আরো বেশি টাকা দাম নয। এ-রকম একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছয়টা একশোটা হাজারটা লক্ষটা মোহরে কত টাকা হবে। বাবা যে-ধান চাল করে বিক্রি করেন, তিনটাকা চারটাকা পাঁচটাকা দরে, তার একেকটার দাম যদি একেক মোহর হত, তাহলে আমাদেব অনেক অনেক টাকা হত। অনেক অনেক আকবরী মোহর হত। আকবরী মোহরের ভেতরেব রঙটা পাকা ধানের রঙ। সোনারঙেব ধানের ভেতর রুপোরঙেব চাল থাকে। রূপার পাতের ভেতর সোনার পাত থাকে। মোহরটা আমি দেখে ফেলেছি। তাই ফান্দাইতপাড়ার বাপা মতীশ্বরের বেটা না-খাউযাইয়া অতীশ্বর আমার কাছে ভাত দেখতে চায। মোহরটা যোগেন্দ্রবাবুও দেখে ফেলেছে। তাই লঙ্গরখানা খুলতে এসেছি আমি, আমাকে যোগেন্দ্রবাবু মাংস-ভাত খাওয়ায়। যোগেন্দ্রবাবুর দাওযার নিচে বসে ফান্দাইতপাড়ার না-খাউয়াইয়া অতীশ্বর চাঁদের সঙ্গে কথা বলে আর ভেতরে শুয়ে আমি শুনি।

কথকতাটা যেন অনেকক্ষণ ধরে শেষ হয়ে গেছে। এখন মনে হচ্ছে কথকতাটা কেউ বলছিল না। বাইরে, এতক্ষণে আকাশ বেযে উঠে আসা চাঁদের আলোয মাধ্যাকর্ষণমুক্ত বাঁশবন, গাছপালা, ঘরবাড়ি, আকাশমাটি থেকে যেমন নৈশবাতাস বা হিম তেমনি এই কথকতা। ভঙ্গির মধ্যে এমন অনায়াস ছিল যে থেমে যাবার পর তখনো ঠিক কবা যাচ্ছে না কতক্ষণ হল থেমেছে বা কোনদিন কোনসময় বলাই হচ্ছিল কি না। ফলে, এমন অনবয়ব উপস্থিতির বোঝা বুকে নিযে তুহিনের পক্ষে আর শুয়ে থাকাটা সম্ভব হল না। তার মনে হল লোকটার কথার তো কোন প্রসঙ্গ ছিল না। তাহলে এমন হঠাৎ সে থেমে গেল কেন। লোকটা কি মরে গেল। লঙ্গরখানার লিস্টে নাম লেখাতে এসে লোকটা কি শেষে মরেই গেল।

লঙ্গরখানার অফিসারের দুয়োরে সারারাত পাহারা দিচ্ছে একটা মরা মানুষ—লণ্ঠনের আলোতেও তাকে বড়বেশি দেখা যায়, চাঁদের আলোতেও তাকে বড় স্পষ্ট দেখা যায়। বেঁচে থাকলে সূর্যের আলোতে তো তার দিকে চাওয়াই যেত না। তারওপর যদি মরে গিয়ে থাকে। আমার দরজায় একজন মৃত মানুষ পাহারা দিচ্ছে এইরকম একটা তাড়ায় তুহিন খুব ছটফট করে। শেষে আর না বেরিয়ে পারে না। কালিপড়া লণ্ঠনের আলোতে, খিল আটকানো দরজার ভেতরে, চাঁদের ছিট আসে এমন বেড়া দিয়ে ঘেরা ঘর থেকে না বেরিয়ে তুহিন পারে না।

দাওয়াতে পিট হেলিয়ে, কোমরটা এলিয়ে, মাথাটা বাঁ-কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে, হাঁ করে, সম্মুখে কাঠির মতো দুটো পা ছড়িয়ে, হাতের পাতা দুটো দু পাশে আকাশের দিকে চিতিয়ে লোকটা ঘুমিয়ে বা মরে।

লোকটার কাছ থেকে বেশ একটু দূরেই তুহিন দাঁড়িয়ে ছিল। একবারে সোজাসুজি লোকটার দিকে তাকিয়ে সে এই ভঙ্গিটা আবিষ্কার করল না। দূরত্ব বজায় রেখে, অপাঙ্গে দৃষ্টি ফেলে, সিগারেট ধরিয়ে, ধোঁয়া ছেড়ে নানারকম কায়দায় তবে সে লোকটার পুরো এই চেহারাটা ধরতে পারল। লোকটার মুখের ওপর সোজাসুজি চোখ ফেলে দেখতে গিয়ে যদি লোকটা ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে, আবার তার কথকতা শুরু করে, তবে চমকানো ছাড়াও তুহিন খুব অপ্রস্তুতবোধ করবে না যে একটা জ্যান্ত লোক মরেছে কিনা দেখছে? সুতরাং লোকটাকে একটু একটু দেখে প্রতিমুহূর্তেই তার কথা শোনার অপেক্ষায় থেকে, শেষে সব দেখাগুলিকে জুড়ে তুহিন লোকটার যে চেহারা খাড়া করল—সেটা মিলিয়ে নিতেও তার সাহস নেই।

তুহিনের সিগারেটটা শেষ হলে সে এবার সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তুহিন বুঝতে পারছে সেই অনিবার্য মুহূর্তটি এগিয়ে আসছে যখন লোকটার কাছে গিয়ে পরীক্ষা করা ছাড়া তার আর কোন উপায় থাকবে না। উপায় কি কি থাকতে পারে। যোগেন্দ্রবাবুকে ডাকলে—তিনি তো এখুনি উঠে আসবেন, তারপর লোকটা যদি কথা বলা শুরু করে—সেটা তুহিনের পক্ষে খুব অপ্রস্তুতজনক হবে না? একটা অনাহারী লোক এসে দাওয়ায় ঠেস দিয়ে বসে, তাতেই তার এত হাঁকাহাঁকি মানায় না। কিন্তু সম্ভবও

তো নয়। ভেতরে গিয়ে দরজা আটকে শুয়ে পড়লে কে তাকে এই অভূতপূর্ব ঘটনা থেকে বাঁচাবে যে একটা মরা লোক তাকে পাহারা দিচ্ছে। লোকটাও হয়তো তুহিনকে দেখছে। না, তুহিনের মতো ঠারে-ঠোরে নয়, সে সোজাসুজিই দেখতে পাচ্ছে। এবং হয়তো মুচকি-মুচকি হাসছেও। অর্থাৎ লোকটা, এই অতিসামান্য লোকটা ইতিমধ্যে তুহিনকে দেখে মুচকি মুচকি হাসতেও পারে। সোজাসুজি লণ্ঠনটা এনে দেখলেই হয়। দেখতে গেলে হয়তো লোকটা ফোঁস করে একটা জলজ্যান্ত নিশ্বাস ফেলে তেল কমে যাওয়া লণ্ঠনটা নিবিয়েই দেবে আর কেন তাকে অমন পরীক্ষা করতে গেছে কৈফিয়ত দেবার বাধ্যবাধকতার দিকে তুহিনকে ঠেলবে। আর যদি বা লোকটা ভেবে নেয় সে সত্যি সত্যি দশদিন ধরে উপবাসী কি না পরীক্ষা করতেই লণ্ঠন, তাহলে হয়ত সন্দেহাতীত প্রমাণ দিয়ে বসে লিস্টিতে তার নাম তোলার দায়িত্ব দিয়ে বসবে তুহিনেরই ঘাড়ে।

অথচ ও জেগে না-ঘুমিয়ে না-মরে সেটা পরীক্ষা না করা পর্যন্ত তুহিন নিজেই তো এই অনুভূতির হাত থেকে ছাড়া পাচ্ছে না যে, লোকটা তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে কি না। যেন একটা অনিবার্য প্রক্রিয়ায় লোকটা এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁচেছে যে অদৃশ্য থেকেও সে নজর রাখতে পারছে আর তুহিন এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁচেছে যেখানে সে নিজের দু-পায়ের ওপর আত্মবিশ্বাসে দাঁড়াতে পারছে না। শ্যামাপদ চক্রবর্তীর ছেলে হয়েও, লঙ্গরখানার অফিসার হয়েও দশদিনের উপবাসী লোকটা কী অবধারিতভাবেই না তুহিনকে আটক করে বসে আছে।

তুহিন একটা ছোট কাশি দিল, যেন গলা সাফ করতে। যদি তোমার কিছু বলার থাকে বলো—এতক্ষণ বিরতির পর কথকতা চলে না। তুহিন দু-পা হাঁটল—যদি তোমার কিছু বলার থাকে বলো—আমি চললাম। তুহিন আর না পেরে লোকটার দিকে সোজাসুজি তাকাতে ঘুরলেও, একটু বেশি ঘুরে হাঁ-করা দরজার সোজাসুজি হয়ে গেল। তারপর আর দাঁড়ানো যায় না, লোকটা টের পেয়ে যাবে সে বেঁচে, না জেগে, না ঘুমিয়ে, না মরে এটা জানতেই এত কৌশল। সুতরাং তুহিন ঘরে উঠে গেল।

উঠে যখন গেলই, তখন সোজা লণ্ঠনটা তুলল। যেন শিখাটা বাড়াচ্ছে বা কমাচ্ছে এমন ভাবে সেটা উঁচু করল—আলোটা যাতে লোকটার মুখে

পড়ে। অথচ আলোটা তারই চোখে-মুখে পড়ে বাইরেব সব জিনিশকে আড়াল করে দিল। যদি বেঁচে ও জেগে থাকে লোকটা তাহলে সেই বরঞ্চ দেখে নিল তুহিনকে। তুহিন তাকে দেখবার জন্য কী রকম উতলা—টের পেয়ে গেল।

যদি লোকটা তুহিনকে দেখেই থাকে তাহলে তো নিশ্চয়ই ভঙ্গি পাল্টেছে। তবে, তবে, ভাবতে ভাবতে তুহিন বেরিয়ে এল। এবার আর সামনে গিয়ে ঠারে-ঠোরে দেখবার দায়িত্ব না নিয়ে পেছন থেকেই সোজাসুজি দেখে নিল। সেই এক ভঙ্গি দাওয়ায হেলান দিয়ে, মাথা হেলিয়ে, পা ছড়িযে, হাঁ কবে, আকাশের দিকে হাত চেতিয়ে লোকটা বেঁচে, জেগে, ঘুমিযে বা মরে।

ঘরে ফেরবার পথ আর তুহিনের রইল না। এবার হয় তাকে পালাতে হয়, নতুবা লোকটাকে ধাক্কা দিতে হয়, ধাক্কা খেয়ে যদি মাটিতে গড়িয়ে পড়ে তো ঝামেলা চুকে গেল, কিন্তু গড়িযে পড়ে নিজেকে মৃত বলে প্রায় ঘোষণা কবার পরও যদি গুঙিযে ওঠে "লিখেন বাবু। নাম লিখেন। বাপা মতীশ্বর। হামরালা ফান্দাইতপাড়ার না-খাউযাইযা অতীশ্বর"—তখন? তখন তুহিন কী করবে। সুতরাং যেন বেড়াতে বেরিয়েছে এমনভাবে তুহিন বেবোতে চাইল। কিন্তু আকাশের দিকে হাত চেতিয়ে পথ আগলে ঘুমনো কি মরা লোকটা। সুতরাং পেছন ফিরে তুহিন নিঃসাড়ে আর এক পথে পা দিল। সে পথ গেছে বটতলা দিযে। সে বটতলায় পঞ্চগ্রাম এসে মিশেছে। উত্তরে নন্দনপুর, দক্ষিণে মণ্ডলঘাট, পশ্চিমে খরিজা-বেকবাড়ি। বাঁশকঠিয়া-কাদোবাড়ি-ঘুঘুভাঙা এসে মিশেছে। পাশ দিয়ে রেল-লাইন চলে গেছে সদর জলপাইগুড়িতে। প্রতি বছর এখানে দুর্গাপূজা হয, এ বছবেও হবে। আর এই তিন ইউনিয়নের, তিন অঞ্চলের, পাঁচ গ্রামের সন্ধিবিন্দুটিতে দাঁড়িয়ে আছে হাজার হাজার হাজার বছরের পুরনো বটগাছ। তার পাতায় পাতায় বাতাসেব আশ্রয়। তার কোটরে কোটরে সাপ-খোপ-পাখির আশ্রয়। তার ছাযায় মানুষের আশ্রয। তার মাথায় বিদেশগামীব শেষ বিদায় সম্ভাষণ আব স্বদেশাগতের প্রত্যুদ্গমন। সেই বটবৃক্ষের পাতায পাতায় লেখা ইতিহাস। সেই বটবৃক্ষের গুঁড়িতে হাজার-হাজার মানুষের ঘামের চিহ্ন, সারাদিন জমিতে লাঙল চালালে সারা শরীর বেযে যে ঘাম নামে, সেই

ঘামের চিহ্ন। সেই বটগাছের তলায় কত নিদ্রার ইতিহাস—সারাদিন লাঙল চষে যে ঘুম আসে, সেই ঘুমেব। কিন্তু সেই বটগাছেব দিকে চাইতেই তুহিন যেন দেখল বটগাছের গুঁড়িটার চারপাশে তারাই শুয়ে আছে, যাদের সে আজ বিকেলে দেখে গেছে, এ-ওব কাঁধে, এ ওর পিঠে, যেন বটগাছের গুঁড়িটার মতোই ঐতিহাসিক ভঙ্গিতে। আব বটগাছটা, সেই তিন অঞ্চল পাঁচগ্রামের সন্ধিবিন্দুর বটগাছটা আকাশে হেলান দিয়ে, মাথা হেলিযে. পা ছড়িয়ে, হাঁ করে, হাত চেতিয়ে, মরে বা ঘুমিয়ে। "হামরালা ফান্দাইত-পাড়ার বাপা মতীশ্বরের বেটা না-খাউযাইয়া অতীশ্বর"।

আর ফেরবার পথ ছিল না। কারণ, যেখানেই যাক পঞ্চগ্রামী বটগাছটার চোখ সে ছাড়াতে পারবে না।

কাফের

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

গাধাগুলোকে সে রাতে আর জল দেখানো গেল না। গরুগুলো গোয়ালে হাম্বা হাম্বা করে ডাকছিল। এবং বাবুদের ঘোড়াগুলোর চিৎকারে ধরা যাচ্ছে যে, এই হত্যাকাণ্ড থেকে কেউ বাদ যাচ্ছে না। নিশুতি রাত। গ্রামগুলো দাউ দাউ করে জ্বলছে। মাঠে মাঠে মানুষের আর্তনাদ, কখনও পোড়া মাংসের গন্ধ আর এক হাহাকারের ছবি মাঠময় প্রেতের মতো ভেসে বেড়াচ্ছিল। সকলেই প্রায় পালাচ্ছিল। অন্ধকার মাঠের তিতরে, ঘাসের ভিতরে অথবা বন-বাদাড়ের ভিতর দিয়ে পালাবার জন্য ছুটছিল। যুবতীদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরাণ ওর স্ত্রীর নাম ধরে মাঠের ভিতরে দুবার চিৎকার দিয়েছিল—ঠিক তখন একদল মানুষ ছুটে আসছে, হাতে মশাল, আগুন ওদের হাতে—ওই যায়, চলে যাচ্ছে, এবারে গেঁথে ফেল সুপারির শলাতে—এমন চিৎকার ছিল ওদের কণ্ঠে। পরাণ তাড়াতাড়ি মোত্রা ঘাসের জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ল। ঘাসের জঙ্গলে সে ফের ফিশফিশ করে ডাকল, 'কিরণী, কিরণী আছস্।'

কোন উত্তর পেল না। সকলেই ভয়ে কথা বলছে না যেন। কোন রকমে এই নিশুতি রাতে প্রাণ নিয়ে পালানো, কিন্তু পালানো দায়, শহরে গঞ্জে উঠে যেতে পারলে রক্ষা। পরাণ কিরণীকে খুঁজে পেল না। সে একা, এবং একা বলেই বোধহয় হাসিমের কথা মনে পড়ে গেল। জাবিদার কথা মনে পড়ে গেল। যদি ওই রক্ষা করতে পারে। হাসিম ওর পরাণের জন, দুঃখে-কষ্টে পরাণকে বারবার রক্ষা করে আসছে। সেই হাসিম,

যদি হাসিম ওকে ক্ষয় করে দেয় তবে আর কোথায় নির্ভর করবে। কোথাও যখন সে যেতে পারছে না, সকলে ওকে ঘিরে ফেলেছে হত্যার জন্য, তখন নদীর জলে ভেসে পড়ল পরাণ। সাঁতার দিল, ডুবে ডুবে হাসিমের বাড়ি উঠে ডাকল, 'একটা তফন ছ্যাও আমারে হাসিম। আমি মুসলমানের মত এক টুপি পইরা চইলা যামু।' অথবা যেন ওর বলার ইচ্ছা ছিল, বনে-জঙ্গলে কিরণীকে খুঁজে পাই নি হাসিম, তোর বাড়িতে কিরণীর খোঁজে উঠে এলাম।

'কে কথা কয়।'

'আমি পরাইন্যা। আমারে বাঁচা তুই। যদি মারতে ইচ্ছা যায় তবে মাইরা ফ্যাল। আর পারি না।'

ভয়ঙ্কর দাঙ্গায় হাসিমের মতো মানুষেরা কেমন একঘরে ছিল। ওরা রক্ষার জন্য, মানুষ, প্রাণ, পাখি রক্ষার জন্য দলে দলে বের হয়ে যেতে পারল না। এই বীভৎস ছবির ভিতর ওরা দরজা বন্ধ করে বসেছিল। ওদের চোখ জ্বলছিল, কপাল ঘামছিল, এবং নৃশংস অত্যাচার অথবা আর্তনাদ পাগল করে দিচ্ছিল।

পরাণ দাঁড়াতে পারছিল না। সে খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। ঘরে একটা লম্প জ্বলছে। মোরগের ডাক শোনা যাচ্ছিল। শীত তীব্র বলে ঘরের ভিতর জাবিদা আগুন জেলে দিয়েছে এবং ওরা পরস্পর ফিশফিশ করে কথা বলছিল। কেউ শুনতে পাবে কথা, সর্বত্র চর ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা লোক অন্ধকার মাঠে চোঙা মুখে চিৎকার করছে, এই হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দিচ্ছে। পরাণ শীতের ভিতর বসে ছিল। সে আতঙ্কে যেন খুব ভুল কথাবার্তা শুনছে, যেন কিরণী কোথাও কোনো ঝোপের ভিতরে বসে ওকে ডাকছে। সে প্রায় কিছুই বুঝতে পারছিল না। সে শুধু একবার জাবিদার দিকে চোখ তুলে তাকাল, তারপর কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'কি কৈতাছে বৈন।'

জাবিদা পরাণকে সাহস দিল। বলল, 'আপনে আগুন পোহান। আমি আইতাছি।' বলে সে উঠোনে নেমে অন্য অনেক বাড়িতে সংবাদ সরবরাহের জন্য খোঁজখবর নিচ্ছিল। জাবিদা সব শুনে আতঙ্কিত। ইসমতালীর পেটে সুপারির শলা ঢুকে গেছে। ওদের স্কুল বাড়িতে কিছু লোককে আশ্রয় দিয়েছিল ইসমতালী, ওর দলটা ওদের বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ লড়ছিল। কিন্তু

শেষ পর্যন্ত পাবে নি। স্কুলে এখন আগুন জ্বলছে। মাঠের ভিতর ইসমতালী চিৎ হয়ে শুয়ে এখন আশমান তারা নক্ষত্র গুনছে।

হাসিম বলল, 'ইসমতালী-অ গ্যাল।' '

পরাণ ঘটনাটা যেন এতক্ষণে ধরতে পারছে। যেন এতক্ষণ পর বুঝতে পারল ইসমতালী যাদের স্কুলে আশ্রয় দিয়েছিল, তারা সব পুড়ে মরেছে। অনেক হতাহত হয়েছে। চোঙ মুখে লোকটা সবাইকে সেই খবর দিয়ে মাঠের দিকে যে মসজিদ আছে—যেখানে চারের কূপ আছে এবং জলের ভিতর এখনও যেখানে ছায়া সৃষ্টি হয়—সেদিকে চলে যাচ্ছে।

পরাণের ভয় হল সে বুঝি হাসিমেরও বিপদ ডেকে আনবে। সে উঠে বলল, 'বৈন আমি যাই। মাঠে নাইমা যাই।' বলে সে ছুটতে চাইলে হাসিম আগলে দাঁড়াল দরজায়। বলল, 'যাইবা কৈ ? মাঠে ? আমি তো এখনও মরি নাই।' তারপর বিবির দিকে তাকাল পরামর্শের জন্য। তফন পরে টুপি মাথায় পরাণ নেমে যেতে পারে মাঠে। ছদ্মবেশে সে শহরে উঠে গেলে ভয় নেই। কিন্তু অঞ্চলের মানুষ পরাণ, ধরা পড়ে যাবে। জাবিদা কোনো বুদ্ধি দিতে পারল না। মাঠে মাঠে অনেক দূর যেতে হয়, তারপর নদীর পার ধ'রে। সহসা জাবিদার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বেশি সময় আর ঘরে রাখা যাচ্ছে না পরাণকে, বাড়ি বাড়ি চর ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওর মুখে আশার আলো দেখা গেল। সামান্য বুদ্ধি করে নদী পর্যন্ত হেঁটে যেতে হবে। তারপর নদীর জলে পরাণ, সঙ্গে একটা পাতিল, পাতিলটা জলের উপর ভেসে যাবে, জলের নিচে পরাণের মুখ, পাতিলের নিচে মুখ রেখে শ্বাস নেবে পরাণ। নদীর পারে বসবে হাসিম, কাঁধে বাঁশের লাঠি, ছোট এক পুঁটলি ঝুলবে চিড়ার, এক বাটি জলে চিড়া ভিজিয়ে মাঠের কোন ঝোপে অথবা বন-বাদাড়ে খুদা পেলে পরাণকে খেতে দেবে। জাবিদা নদীর পারের মানুষ। নদীর জল সম্পর্কে, কচুরিপানা সম্পর্কে এবং কোন্ পারে কি আছে সব তার টিয়া পাখির মত মুখস্থ।

গোয়াল থেকে হাসিম সামান্য দুধ দুয়ে নিল। জাবিদা শীতের রাতে সেই দুধ গরম করে চারিদিকে তাকাল, এই সময়, নয়ত মশালের আলো নিয়ে যারা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা পর্যন্ত টের পেয়ে যাবে। জাবিদা দুধ দিল খেতে পরাণকে। পুঁটলিতে চিড়া বেঁধে দিল। হাসেম পাহারাদারের মতো অথবা বরকন্দাজের মতো পাহারা দিয়ে নদী পার করে দিয়ে আসবে।

আব পবাণ নদীব জলে পাতিলেব নিচে মুখ বেখে, শ্বাস-প্রশ্বাসেব জন্য সময সময পাডে হাসিমেব লাঠিব শব্দ শুনে জলেব উপব ভেসে উঠবে, অথবা এই পাতিলেব ভিতবও ইচ্ছা কবলে পবাণ শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পাবে। ওব কোন কষ্ট হবাব কথা নয। নদীতে কী যায, পাতিল ভেসে যায, পাতিলেব নিচে পবাণ আছে, জলেব নিচে সাঁতাব কাটছে। কেউ টেব পাবে না। পবাণ অনেক জলেব নিচে মাছেব মত, অথবা পাখনা মেলে মাছেব মত জল কেটে শহবে গিযে উঠবে।

ঘোডাগুলোব আব চিৎকার শোনা যাচ্ছে না। বাবুদেব ঘোডাগুলো মবে গেছে। মাঝে মাঝে আকাশে বাতাসে ভীষণ এক কল্লোলেব মতো ইতব সব ধ্বনি ভেসে বেডাচ্ছিল। নিবীহ নাবী-পুরুষগণ আগুনের ভিতব জ্বলছিল। পোডা স্যাঁৎস্যাঁতে চামসে গন্ধ মাঠে মাঠে, কখনও গোপাটেব উপব দিযে ভেসে আসছে। মাঠেব উপব শুধু অন্ধকাব গম্বুজে শাদা পাযবা উডছে। বড বড মাঠ নদীব পাবে—ওবা উডে উডে সেদিকে চলে যাচ্ছিল। জাবিদা লণ্ঠন হাতে উঠোনেব নিচে নেমে এসেছিল। পবাণ সকলেব পিছনে। হাসিম বলল তখন, খুদা ভবসা। ওবা মাঠে নেমে এলে অদৃশ্য হযে যেতে থাকল। যত অন্ধকাবেব ভিতব ওবা অদৃশ্য হযে যেতে থাকল, তত মনে হল জাবিদার—আহা কত ঘাস এখানে, কত পাখি এখানে, সবুজ গন্ধ ছিল মাঠময। পবাণ সব পিছনে ফেলে চলে যাচ্ছে। ওব কিবণী কোথায এখন, ওব সংসাব। মাটিব মতো আব কি প্রিয জিনিশ আছে চাষী মানুষেব। জাবিদাব চোখেব উপব কিছু স্মৃতি ভেসে উঠল. দুঃখেব দিনে, সুখেব দিনে পবাণ, পবাণেব মা মাধুপিশি—সকলেব কথা মনে হল, মোত্রা ঘাসেব জঙ্গলে একবাব পবাণ আবিষ্কাব কবেছিল—জাবিদা, দশমাসেব পোযাতি, জাবিদা ছাগল নিতে এসে অচৈতন্য হযে পডেছে। কোলে কবে সে এই মাঠ পাব কবে দিযেছিল, ঘবে এনে হাসিমকে গালমন্দ কবেছিল, সেই পবাণ ওব প্রিয মাঠ এবং ফসল ফেলে চলে যাচ্ছে। আব এদেশে ফিববে না। জাবিদাব চোখে জল এসে গেল।

ওবা কখনও আগুনেব ভিতব দিযে কখনও নির্জন মাঠেব অন্ধকাব অতিক্রম কবে ছুটে চলছিল। পবাণ তকন পবেছে, টুপি মাথায অন্ধকাবে মুখ ঢেকে

বেখেছে। হাসিম লাঠিতে চিড়াব পুঁটলি ঝুলিযে নিযেছে। পুঁটলিব ভিতব জামবাটি। যখন পবাণ চলতে পাববে না, জলেব ভিতব শীতে ঠাণ্ডা হযে যাবে তখন এই সামান্য চিড়াগুড এবং কিছু উত্তাপ পবাণকে ফেব ডুব-সাঁতাব দিতে অথবা পাতিলেব নিচে ভেসে থেকে অনেকদূব এগিযে যেতে সাহায্য কববে। পবাণ 'আমাব কিবণী গেল কৈ' এই সব বলে যেতে যেতে কপাল থাপড়াচ্ছিল। 'আমাব বাইচা থাইকা কি হৈব হাসিম' এই সব বলে মাঝে মাঝে অন্ধকাব মাঠে বসেই হাউ হাউ কবে কাঁদছিল। তখন কেমন পাগলেব মত পবাণ। পিছনে দাঁড়িযে হাসিম। নানাবকম আশাব কথা শোনাচ্ছিল ফিশফিশ কবে, মাঝে মাঝে বেঁচে থাকাব জন্য, নদী পাব হবাব জন্য এবং নদীতে ভেসে অনেক দূব অনেক পথ সাঁতাব কাটাব জন্য প্রেবণা দিচ্ছিল—যে যেদিকে পাবছে পালাচ্ছে, যেভাবে পাবছে পালাচ্ছে, গঞ্জে কিবণী হযত তাঁবু, সবকাবি তাঁবুতে পবাণেব জন্য অপেক্ষা কবছে, সবই আন্দাজে বলছিল হাসিম। পবাণকে প্রেবণা দেবাব জন্য নানাবকমেব পাঁচ-মেশালি কথা পবাণেব পিছনে দাঁড়িযে বলছিল।

পবাণকে প্রেবণা দিযে কোনবকমে সাঁকো পর্যন্ত হাঁটিযে এনেছে। এবাব সাঁকো পাব হতে হবে। মসজিদেব অন্ধকাবে ক'জন লোক দাঁড়িযে ছিল—ওবা কাবা হাসিম টেব কবতে পাবছিল না। সে হাঠেব নিচে নেমে গেল। তামাক-খেত, পেঁযাজেব খেত চাধ্বাবে। সে মসজিদেব পাশ দিযে গেল না। তামাকেব খেতেব উপব দিযে হামাগুড়ি দিতে থাকল। কুযাশাব জল লেগে ওদেব শবীব ভিজে গেল। পবাণ মণ্ডলেব কোন খেযাল ছিল না, হাসিম মন্ত্রেব মতো ওব নাম, বাপেব নাম নূতন ভাবে শেখাচ্ছে—নাম, মহম্মদ ইদ্রিস, বাজীব নাম—মহম্মদ ইমানুল্লা। অথবা বোবা বনে থাকবে—যা বলবাব হাসিম বলবে, ব্যাবামী নাচাবী মানুষ, শহবে গঞ্জে ডাক্তাব দেখাতে যাচ্ছে। তবে এই অন্ধকাব বাতে কেন? তখন কি বলবে হাসিম? সে ভাবল—না এটা ঠিক হবে না। বোবা পবাণ মণ্ডল বড বড চোখে তাকিযে ব্যা ব্যা কববে শুধু, কোন কথা বলবে না, সে বাছুবেব মতো টেনে বিপদেব স্থানগুলো পাব কবে নেবে। যেন গঞ্জেব হাটে পবাণ মণ্ডলকে বিক্রি কবতে যাচ্ছে হাসিম।

মাঠ, জমিন, শ্যাওড়া গাছেব বন অতিক্রম কবে ওবা হিজলেব মাঠে এসে নামল। ওবা সোজা পথে গেল না। বাঁকা পথে গেল। ঘুবে ঘুবে, যেখানে

খুনজখম কম হচ্ছে সে পথ ধবে গেল। কিছু মানুষেব শব্দ পেল। হৈ হৈ কবে গ্রামে ফিবছে। সে বুঝল ওবা কোথাও এতক্ষণে খুনজখমে লিপ্ত ছিল—এখন গ্রামে ফিবছে। সে পবাণকে নিযে ফেব ঝোপেব ভিতব লুকিযে পড়ল। যখন দেখল মানুষগুলো গ্রামেব ভিতব ঢুকে গেছে—এখন ছুটতে পাবলে আব ধবতে পাববে না, তখন ওবা বড মাঠে পডে ছুটতে থাকল।

পবগনাতে পবগনাতে দুঃসহ অবাজকতা। উত্তব দক্ষিণে সোনাব গাঁ, পুবে পশ্চিমে মহেশ্ববদি অথবা শীতলক্ষ্যাব দুই তীব ধবে ধ্বংসেব উল্লাস। মানুষেব ভযানক দুর্দিন—ধর্মেব কথা কেউ শুনছে না, ধর্মবোধ নষ্ট হযে যাচ্ছিল, উগ্র বিদ্বেষ ক্রমশ এক ভুজঙ্গেব মত গোটা অঞ্চলকে গ্রাস কবে ফেলছে। যেতে যেতে হাসিম সেই আগেব মতো বিডবিড কবে বকে যাচ্ছে। ওব প্রায চাবিদিকে নজব বাখতে হচ্ছে। কাবণ পবাণ, বেহুঁশ পরাণকে না বাঁচাতে পাবলে ওব সম্মান থাকে না, মানুষেব সম্মান থাকে না—হাসিম ছুটতে ছুটতে পবাণকে বাঁচাব জন্য ফেব নানা ভাবে প্রেবণা দিতে থাকল।

ওবা গবিপবদীব আশ্রমে পৌঁছে প্রথম থামল। অশ্বত্থেব জঙ্গল এবং ভাঙা মঠেব ভিতব কিছু পাখিব কলবব শোনা যাচ্ছে। ভোব হতে বাকি নেই। নদীব জলে কিছু পাখিব ছাযা পডছিল, কোন পাখি উত্তব-দক্ষিণে হাবিযে যাচ্ছে। কাক-শালিখেবা তেমনি ডানা মেলে আকাশে উডছিল, এত বড খুনেব উল্লাস দিনেব বেলাতে আর্শিব মত পবিচ্ছন্ন, যেন কোথাও কোন মালিন্য লেগে নেই। কিন্তু হাসিম টেব পাচ্ছিল, জলেব নিচে তখনও বড এক অজগব ফোঁশে ফোঁশে উঠছে, সময পেলেই ছোবল দেবে। এখন সামনে শুধু নদীব জল। দিনেব বেলায যেতে গেলে পবাণ মণ্ডল ধবা পডে যাবে। জলে নেমে পাতিল মাথাব উপব বেখে জলে জলে এখন থেকে হেঁটে যাওযা। গঞ্জে উঠে যেতে তিন ক্রোশেব মতো পথ আব। মাত্র এই তিন ক্রোশ টেনে নিতে পাবলেই হাসিমেব সম্মান বাঁচে। পবাণকে সে জামবাটিতে চিডা-গুড দিল খেতে। সাবা দিনেব জন্য পবাণকে জলে ডুবে থাকতে হবে। পবাণ পাতিল মাথায জলে ভেসে যাবে, শ্বাস-প্রশ্বাসেব ক্রিযাটুকু মুখ ভাসিযে পাতিলেব নিচে সেবে নেবে। কিন্তু হায পবাণেব ভিতব জীবনেব কোন লক্ষণ পাওযা যাচ্ছে না। ভযে শবীব মুখ ফ্যাকাশে হযে গেছে। সে গত সালেব মেলাব কথা বলে, মেলাব লাভ-লোকসানেব কথা

-বলে অন্যমনস্ক কবতে চাইল পবাণকে। কিন্তু পবাণ, ভূতেব মতো বসে আছে খাচ্ছে না, যেন জোব কবে চিডে গুড ঠেলে দিচ্ছে মুখে—হাসিম বসে নজব বাখছে চাবিদিকে, খাওযা হযে গেলে আব দেবি কবল না হাসিম পবাণকে নদীব জলে নামিযে নিজে পাযে পাযে হেঁটে যেতে থাকল। যেন হাসিম এখন যথার্থই তীর্থযাত্রায বেব হযে পডেছে, মক্কা মদিনা যাচ্ছে মানুষেব ভালবাসাব স্থান, যেখানে মানুষে মানুষে কোন বিভেদ থাকে না সবই ঈশ্বরপ্রেবিত, জীব মাত্রেই করুণাব যোগ্য—সুতবাং প্রাণধাবণে অবহেলা কবলে পাপ, হাসিম হাঁটতে হাঁটতে মদিনা যাচ্ছে, মক্কা যাচ্ছে—নিচে শীতেব জল, জলে একটা শুধু এখন পাতিল ভাসছে। পাতিলটা বেগে দক্ষিণ দিকে উঠে যাচ্ছে, দক্ষিণ দিকে জলেব উপব ভেসে যাচ্ছে—কোন টের পাবাব কথা নয, অঞ্চলেব একজন মানুষ পাতিল মাথায নিরুদ্দেশে পাড়ি দিচ্ছে। নদী এখানে অগভীব—জল কম, জলজ ঘাস নেই, জলেব নিচে বালি মাটি। পবাণ জলেব নিচে গোসাপেব মতো সাঁতাব কাটছিল। মনে হবে সব কীটপতঙ্গেব মতো, মবা বাঁদব অথবা বেডালেব মতো কচুবিপানার পাশে সামান্য এক পাতিল ভেসে যায, পাতিলেব নিচে এক মানুষ আছে মানুষ জলে ভেসে যায কেউ বলবে না। পাডে লম্বা হযে হাসিমেব ছাযাটা জলেব উপব এসে পডছে, আব ঘোডাব খুবেব মতো শব্দ ঠক ঠক, বাঁশের লাঠিব শব্দ কবছিল—এক দুই। এক দুই। ভয, ভয। শব্দটা জলেব নিচে পবাণ শুনছে—ভয ভয। সে ডুবে থাকছে। এক দুই তিন, তিনটা শব্দ কবছে পাথবে ঠুকে ঠুকে, আব ভয নেই! সে মুখ তুলে কচুবিপানাব ভিতর দিযে হাঁটতে থাকল।

নদীব পাড ক্রমশ পাহাডেব মতো উঁচু হযে যাচ্ছিল। অনেক উঁচুতে হাসিম হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। ওব শবীবটা ক্রমশ ছোট হযে আসছে অনেক দূব থেকে এখনও সেই শব্দ, ক্রমাগত শব্দ, এক দুই, এক দুই—অদ্ভুত শব্দটা, জলেব নিচে মনে হয কোন এক পাতালপুবী আছে, সেখানে রাজপুত্র ঘোডায চডে ঠক ঠক কবে যাচ্ছে, অথবা কদম দিচ্ছে ঘোডায—এক দুই তিন, কদম তুলে ঘোডা ছুটলেই আব পবাণেব ভয থাকছে না সে জলেব নিচে কিবণীব স্বপ্ন দেখছে। ছোট মুখ কিবণীব, বড চোখ কিবণীব, ছাগল গরু পাযবা কিবণীব সব পুডে গেছে। এখন কিবণী কোথায

হল্লাটা বড সহসা আবম্ভ হযেছিল, সে জেগে দেখল আগুন জলছে
:গাযালে, বেব হযে দেখল মানুষেব আর্তনাদ। সে সব ফেলে ছুটতে
!াকল।

নদীব ছুপাবে গ্রাম মাঠ ফসল। ঝোপে জঙ্গলে টুনি ফুলেব লতা।
ামনে মাঝেব চবেব শ্মশান। আবাব সেই এক ছুই—ঠক্ ঠক শব্দ।
াবাণ জলেব নিচে, পাতিলে মুখ ভাসিযে ডুবে থাকল, অথবা জলেব নিচে
যন পবাণ ঝিনুক খুঁজছে, ঝিনুক নয, পবাণ কিবণীকে খুঁজছে, হাতডে
:াতডে জলেব নিচে জলেব পাশে, গ্রামে, মাঠে অথবা ফসলেব ভিতব
কৈবণীকে খুঁজছে। কিবণী, আমাব কিবণী, জলে মাঠে যে কিবণী প্রাণেব সঙ্গে
লগে থাকত। পবাণ যেতে যেতে বলল, 'কিবণী, তুই কোন্খানে আছস ক।
ামি পবাণ তবে কালাইযা কৈ যামু।'

জলেব নিচে সে আবাব শব্দটা পেল—ঠক ঠক ঠক। আব ভয নেই।
স মুখ ভাসিযে বাখল জলেব উপব। ছুহাতে কচুবিপানা কেটে সে
াগুতে থাকল। শক্তি ক্রমশ নিঃশেষ হযে আসছে। শীতেব সময বলে
জল হিমেব মতো ঠাণ্ডা। সে ভিতবে ভিতবে মবে যাচ্ছিল, ভযে বিস্মযে
াবং কিবণীব জন্য, এই শীতেব জন্য, হিম ঠাণ্ডাব জন্য ওব প্রাণশক্তি ক্রমশ
াবে যাচ্ছে। হাসিম পাড থেকে ওকে চিৎকাব কবে সাহস দিচ্ছে—
আব বেশি দেবি নাই পবাইন্না। ধামগডেব কলেব চিমনি ছাখা যাইতাছে।
াখানে তব কিবণীবে পাইবি।' ঠিক সেই জলেডোবা মানুষেব মত। যেমন
পিতা পুত্রকে বলছে—দেখো, দূবে বাতিঘব দেখা যাচ্ছে, আমবা আব একটু
াতাব কাটতে পাবলেই সেই বাতিঘব পাব। আলো, খাছ এবং তাপ পাব।
াথবা দেখো জন, আকাশেব নক্ষত্র দেখ, তোমাব মা বাডিতে আমাদেব
জনেব প্রতীক্ষাতে বসে আছেন, আব একটু সাঁতাব কাটতে পাবলেই
ামবা এই ভযঙ্কব সমুদ্র অতিক্রম কবে চলে যেতে পাবব। জাহাজডুবি
ানুষ পুত্রকে যেন উদ্বুদ্ধ কবছে। হাসিম পবাণকে প্রেবণা দিচ্ছে—আব
একটু যেতে পাবলেই সেই বাতিঘব, বাতিঘবে আমাদেব পৌছোতে হবেই।

হাসিম এখন লাফিযে লাফিযে হাঁটছে। যত নদী নিচে নেমে যাচ্ছে,
ত হাসিম উপবে উঠে যাচ্ছে, তত পাডেব ফাটল গভীব এবং প্রশস্ত হচ্ছে।
াকে খুব সাবধানে ফাটল পাব হতে হচ্ছিল। একটু ঘুবে গেলে পথ,

কিন্তু সেখান থেকে নদীব জলে পবাণকে দেখা যায না, পবাণ অতদূব থেকে লাঠিব শব্দও শুনতে পাবে না। বর্ষাব সময জলে যখন প্রচণ্ড স্রোত থাকে, তখন যেসব জমি স্রোত ভাঙতে ভাঙতে ভাসিযে নিতে পাবে নি, তাবা এখন প্রচণ্ড ফাটল নিযে দাঁড়িযে আছে। বর্ষা এলেই ঝুপ ঝুপ শব্দ হবে, জলে ভেসে মোহানায চলে যাবে। নদী ভাঙতে ভাঙতে পবাণেব মত দূবে সবে যাবে।

পবাণ বোধহয ওব ডাক জলেব ভিতব থেকে শুনতে পায নি। অনেক উঁচুতে দাঁড়িযেছিল হাসিম। নদীর খাড়া পাড, নিচে সামান্য বালুমাটি, যখন ভয নেই, যখন কোন মানুষেব সাড়া পাওযা যাচ্ছে না তখন পবাণেব আব কি কবণীয। সে বিশ্রামেব জন্য ঘাসেব ভিতব বসে থেকে ওপাবেব মাঠে বসন্তেব যসল দেখল। যব গমেব গাছ, পাশে বড গ্রাম নাঙ্গলবন্দ। কামাব কুমোব একঘবও নেই। দেবদেবীব মন্দিব আছে এখানে। মাটিব মূর্তি, ভৈবব ঠাকুবেব পূজা হয এখানে, পাঁঠা বলি হয, এখন আব কিছুই নেই, দেবদেবীব মূর্তি খডেব গাদাব মত পডে আছে। গবিব চাষী মানুষেবা এসেছিল দেবীব গাযে সোনাব অলঙ্কাব থাকলে তুলে নিতে। ঠিক মাথাব উপবে অনেক উঁচুতে হাসিম লাঠিতে শব্দ কবল ঠক্ ঠক্—ঠিক সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙেব মত লাফ, পবাণ ব্যাঙেব মত জলেব ভিতব ডুবে গেল।

হাসিম যেতে যেতে দেখল দুজন যুবক কলা গাছে সুপাবিব শলা বল্লমেব মত গেঁথে বেখেছে। ওবা বর্শাব মত দূবে সুপাবিব শলা নিক্ষেপ কবছিল—তখন ওবা নদীব এত খাড়া পাড ধবে এক মানুষ যায দেখতে পেল। পথ ফেলে, বিপথে যাচ্ছে মানুষটা। ওবা হাতেব উপব সুপাবিব শলা তুলে বলল, 'যায কোন মাইন্‌সে! কোনখানে যায!' বলে ওবা হাসিমকে ধবাব জন্য যব খেতেব ভিতব দিযেই ছুটতে থাকল। হাসিম কি কববে ভেবে পেল না। পবাণেব পবিবর্তে যেন সেই বোবা বনে গেল, বোকাব মত ফ্যাল ফ্যাল কবে তাকাল তাবপব চোখ উল্টে দিল। কিন্তু মানুষেব শখ কতবকমেব হয। ওবা খোঁচা দিল একটা হাসিমকে—'মিঞা, কৈ যাও?'

'নাবানগঞ্জে যাই।' সে চোখ উল্টেই বাখল। হাবাগোবা মানুষ হাসিম। বেশি কথা না বলাব জন্য নিজেই বিড বিড কবে বকতে থাকল।

'তোমাব নাম, মিঞা ?'

'মহম্মদ হাসিমালি। সাং নযাপাড়া, ইসমতালি সেখ আমাব চাচা।'

ওবা বলল, 'পথেঘাটে লোক খুন হৈতাছে। তোমাব বেজায সাহস, মিঞা।'

'আমি সেখেব বাচ্চা। আমাবে খুন কবব কোন মাইন্‌সে।' বলে চোখ সোজা কবে ফেলল। তাবপব যেন দাঁড়াতে নেই, সোজা হেঁটে যেতে হয, সে থপ থপ কবে লাঠিতে ঠক ঠক শব্দ কবল আব হাঁটল। কিন্তু হায, পাশেব কল্‌মিলতাব ভিতবে এক পাতিল ভাইসা যায, পাতিলেব উপব এক কাক বইসা যায, নিচে এক মানুষ ভাইস্যা যায। মানুষেব শ্বাস পড়ে না, জলেব ভিতবে এক মানুষ কিবণীব খোঁজে নাবানগঞ্জে উইঠা যায। হাসিম হাঁটছিল, শব্দ হচ্ছে লাঠিতে ঠক ঠক—কাঁসাব জামবাটিতে, অথবা হ'তেব পাথবে সে শব্দ কবে কবে যায, ভয ভয। পবাইন্যা ভাইস্যা উঠলে ডুইবা মববি জলে, পবাইন্যা ভয ভয। তখন পিছনেব লোক ছুটো চিৎকাব কবে উঠল—'অ মিঞা, ছ্যাখছনি পানিতে এক পাতিল ভাইস্যা যায।'

হাসিমেব শবীব অসাড় হযে আসছে। সে তেমনি হাঁটছে থপ থপ। থামলেই লোকগুলো টেব পাবে। হাসিম এক গেবস্থ মানুষ, হাসিম এক নাচাবি ব্যাবামী মানুষ, সে পবাণকে নিযে শহবে যাচ্ছে। সে কোনবকমে ব্যাবামী নাচাবি মানুষ সেজে ওদেব গাজীব গীতেব গান শোনাল—এক ছিল গাজী ভাই, গাজীব পবাণে সুখ নাই বে নাই। সে ঘুবে ঘুবে লাঠি বাজাল ঠক ঠক। পবাণ ভয ভয। চান্দেব লাখন মুখখান, গাজীব গীদেব বাযানদাব—পবাণ ভয ভয। সে ঘুবে ঘুবে ওদেব অন্যমনস্ক কবতে চাইল। কিন্তু কে কাব কথা শোনে। ওবা শল্‌কি হাতে নিযে পাতিলেব দিকে নেমে যাচ্ছিল।

হাসিম এবাব চিৎকাব কবে উঠল, 'অ মিঞা ভাই, পাতিল তোমাব হাওযায ভাইস্যা যায।'

'হাওযা কোন্‌খানে ছ্যাখতাছ মিঞা।'

হাসিম এবাবে আদাব দিল, যেন এবাব যথার্থই গাজীব গীত শেষ। সে এবাব বিদায নিযে চলে যাবে। গানেব শেষে আদাব দেবাব মত ভঙ্গি কবে ডাকল—'অঃ মিঞা ভাই, কন দেখি চান্দে সূর্যে তফাৎ কী ?

কন দেখি গমে যবে তফাৎ কী, মাটিতে ফসল ফলে, অঃ মিঞা, কাব লাগি। কোন্ সে মানুষ আছে তিন ভুবনে ফসলেব বস দেয, পবাণেব ভিতব বস দেয—অঃ মিঞা, দৌড়ান ক্যান, আল্লা বুঝি আপনেগ জ্বালায সব হাওয়া গিল্যা ফ্যালাইছে।'

ওবা হাসিমেব কথা শুনল না। ওবা পাতিলটাব পাশে গিযে জোবে শলাটা ছুঁডে দিল। পাতিলেব ভিতব দিযে শলাটা পবাণেব ব্রহ্মতালুতে ঢুকে পালকেব মতো খাড়া হযে থাকল। পবাণ জল থেকে উঠে দাঁডাল সহসা। মুখে পিঠে বক্তেব ফোযাবা নেমেছে। চোখগুলো গোল গোল হযে গেল। দুহাত উপবে তুলে পবাণ চিৎকাব কবে উঠল—কিবণীবে পাইছি। বলে সে পাতিলটা বুকে জডিযে ডুবে গেল ফেব। কিছু বুদবুদ দেখা গেল। মানুষ দুজন হা হা কবে হাসল তাবপব যেদিকে হাসিম পাগলেব মত পালাবাব জন্য ছুটছে সেদিকে ওবা ছুটতে থাকল। 'কাফেব যায।' ওবা মাঠেব ভিতব, খাড়া পাড়েব ভিতব সেই কাফেবকে ধবাব জন্য লাফিযে লাফিযে ছুটছিল। আব বলছিল, 'ঐ দ্যাখ কাফেব যাইত্যাছে। দ্যাখ এক কাফেব যায, যব গম খেতেব ভিতব দিযা এক কাফেব যায। সন্ধ্যা হয হয, যব গম খেতেব ভিতব এক কাফেব ছুইটা যায।' পাখিবা ঘবে ফেবে—যব গম খেতেব ভিতবে এক কাফেব লুকিযে বয. ওবা শলা দিযে গাছগুলোব মাথায বাড়ি মাবছে আব সেই গাজীব গীতেব বাযানদাবেব মত কাফেবটাকে খুঁজে মবছে। পেলেই শলা দিযে পেটে একটা খোঁচা।। কাফেবটা হাঁ কবে আলিসান এক ভুজঙ্গেব মতো পড়ে থাকবে মাঠে।

হাসিম খুব নুযে যব খেতেব ভিতব দিযে ছুটছে। সামনে বড় বড় ফাটল। সে ফাটলগুলো• লাফ দিযে পাব হচ্ছে। মৃত্যুভয হাসিমকে অস্থিব কবে তুলছিল, সে একবাব গলা তুলতেই দেখল ওবা ঠিক পিছনে পিছনে আসছে। সন্ধ্যা হযে গেছে এতক্ষণে। মবা চাঁদেব ফালিটা বামগড়েব মিলটাব চিমনিতে মবা কাকেব মতো ঝুলে আছে যেন। সামনেব ফাটলটা অতিক্রম কবতে গিযেই মনে হল নিচে এব'ব পড়ে যাবে। পড়ে গেলে সেই অতল এক গহ্বব। অন্ধকাবে গহ্ববটা ভযাবহ মনে হচ্ছিল। কিন্তু সে উঁকি দিতেই দেখল, ওবা এসে গেছে, ওবা ওকে লক্ষ কবে শলা এবাব নিক্ষেপ কববে। সে ফেব বলল, খুদা ভবসা, বলে লাফ দিযে

অন্য পারে পড়তেই মনে হল বাঁ পাটা ভেঙে গেছে। সে নড়তে পারছিল না। ওরা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হা হা করে হাসছে। এখন খোঁচা মারলেই হাসিম সারা হয়ে যাবে, সে হাতজোড় করে পড়ে থাকল মাটিতে। সে গোঙাতে থাকল। এমন কাছে যখন পাওয়া গেছে, যখন আর কোন দিক থেকে পালিয়ে যাবার উপায় নেই, তখন লাফ দিয়ে ওপারে চলে গেলে পিঠের ওপাশ থেকে শলাটা ঢুকিয়ে দিলে সুখের হয়। হাসিম ভয়ে কুকুরের মত গুটিয়ে ছিল। হাসিম কিছু বলছিল না, কি যেন দেখছিল। শুধু শক্ত করে লাঠিটা ধরে রেখেছে ডান হাতে। সে শেষবারের মত ওরা লাফ দিলে লাঠি দিয়ে ফাটলের মাঝখানে আটকে দিল পথটা। ওরা হুড়কে নিচে পড়ে যেতে থাকল। হাসিম কোন তাড়াতাড়ি করল না। সে নিচে মুখ ঝুলিয়ে দিল—'কি মিঞারা আসমান ছাখ, নদী ছাখ। কিরকম লাগে। কোনখানে আছ মিঞা। দোজখের পথটা চোখে পড়তাছেনি।' হাসিম এবার জোরে হা হা করে হেসে উঠল। পরাইন্যারে আর ভয় নাই। নদীতে সাঁতার দিয়া ছাখ পানিতে ঝিনুক আছে, সব ঝিনুকে মুক্তা হয় না রে, পরাইন্যা। বলে কেমন বিলাপ করতে থাকল। তারপর লাঠিটা পাশে রেখে খাদের ভিতরে মুখটা ঢুকিয়ে বলল, 'কিগ মিঞারা, আল্লা সব হাওয়া গিল্যা ফ্যালাইছে। আল্লা কি কয়?'

কাতর শব্দ দ্রুত ফাটল থেকে উঠে ছড়িয়ে পড়ছিল মাঠময়। ফাটলের ভিতর মানুষ দুটোর উপর পাড় থেকে মাটি ধ্বসে পড়ছিল। তখন আঁধার মাঠে। তখন লণ্ঠন নেমে আসছে মাঠে। যব গমের খেতে লণ্ঠন হাতে মানুষ নেমে এসেছিল—কাফের যায় এক, চিৎকারে মানুষেরা ছুটে আসছিল। আর হাসিম হা হা করে হাসছিল। যেন বন্যার ইচ্ছা ছাখ ছাখ দুই কাফের জীবন্ত কবর যায়। বলে সে তার জামবাটির বাকি চিড়া গুড়টুকু ফাটলের মুখে ঢেলে দিল এবং বাটি দিয়ে বালি মাটি টেনে বড় বড় ধ্বস নামাল। নিচে তখন আর কাতর শব্দ শোনা যাচ্ছে না। সে মানুষজনদের ভিড় বাড়তে দেখে বলল, দুই কাফের যাচ্ছিল মিঞা—দিলাম, গোরে দিয়া দিলাম।

আর অন্ধকারে হাসিমের মাটি টেনে ফেলার কাজ শেষ হচ্ছিল না। পরাণের মুখ কেবল মনে পড়ছিল। পরাণের মাথায় শড়কিটা পালকের

মত আটকে ছিল। ওব চোখেমুখে কোন দৃশ্য ঝুলে ছিল না। মৃত দুই চোখ নিযে সে অন্ধেব মত জলেব উপব কেবল ভালবাসাব ধন, ভালবাসাব মাটি এবং ভালবাসাব কিবণীকে খুঁজছিল। হাসিমকে দেখে মনে হচ্ছে সে সেই ভযঙ্কব দৃশ্য ভুলতে পাবছে না, পাগলেব মত কেবল মাটি টেনে ফেলেছে। জোযাবেব জল ফাটলেব মুখে ঢুকে গেছে তখন। মাটি জলেব ভিতব পড়ে গুলে গুলে যাচ্ছে। ঘামে ওব শবীব ভিজে গেছে, সে খুঁট দিযে মুখ মুছে ফেলতেই দেখল সামনে এক লণ্ঠন জ্বলছে। দুজন লোক লণ্ঠন হাতে দাঁড়িযে আছে।

'অ মিঞা, পাগলেব মত মাটি ফ্যালতাছ ক্যান?'

হাসিম জবাব দিল না। সে পাগলেব মতো মাটি আঁচড়ে নিচে টেনে টেনে ফেলছে।

ওবা ফেব বলল, 'মাটিব নিচে কি খোঁজতাছ?'

হাসিম এবাব হায হায কবে বিলাপ কবে উঠল, মাটিব নিচে সোনা খোঁজতাছি, মিঞা। আমাব সোনা কোনখানে হাবাইযা গ্যাছে।'

ওবা হাসিমকে এবাব যেন চিনতে পাবল, তুমি হাসিম না?

কত দীর্ঘকাল পব যেন মনে হল সে যথার্থই হাসিম। সে সব ভুলে গিযেছিল। ঘবে ওব বিবি জবিদা আছে। সে এবাব জামবাটিটা বুকেব কাছে নিযে দাঁড়াতে গিযে দেখল পাবছে না, উঠতে পাবছে না। সে ফের বসে বলল, 'আপনেবা।'

'পবাণেব বৌ কিবণীবে তুইলা দিযা আইলাম।'

'আমাবে ইবাব তুইলা লন, আমি যাই।'

যব গম খেতেব ভিতব পবাণেব পাযবাগুলি তখন উড়ছিল, বক বকম কবছিল। নদীব জলে পবাণ ডুব দিল। পাতিল বগলে পবাণ জলেব নিচে শুযে ছিল। কোন দুঃখ ছিল না। নিজেব দেশ, নিজেব এই মাটিতে শুযে পবাণ স্বপ্ন দেখছে—কলমিলতায আবাব ফুল ফুটেছে। পাখি উড়ছে আকাশে। যব গম খেতেব ভিতব পবাণ কিবণীব সঙ্গে লুকোচুবি খেলছে।

স্বদেশরঞ্জন

অজিত মুখোপাধ্যায়

এরপর পাঁচ বছর স্কুলে যে নিয়মিত উপস্থিতির জন্য পুরস্কার পেয়েছে তার এমন অসুখ হবে কে ভাবতে পেরেছিল। স্বদেশরঞ্জন ভারোত্তোলনে কোন রেকর্ড তৈরি করে নি। বা দেহসৌষ্ঠবে শ্রী আখ্যায় ভূষিত হয় নি। একহারা চেহারা, কনুই ও পাঁজরার হাড়গুলি সহজেই চোখে পড়ে। পেশীগুলি আদৌ সুগঠিত নয়। লম্বা আর সুশ্রী। চোখা বা খড়্গাকৃতি নাক তার নেই, সেইজন্যই হয়তো জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। মাঝারি আকারের নাক, ছোট কপাল আর মাঝারি চোখ। চোখদুটি মোটামুটি উজ্জ্বল।

স্কুলে কোন বিষয়ে সে প্রথম হয় নি। সব বিষয়ে সে সমান পারদর্শী। অংক এবং ইতিহাস বা বাংলা সবই তার কাছে সহজ। পড়লেই ভাল নম্বর। না পড়লেই খারাপ। স্বদেশরঞ্জন সেইজন্যই বোধকরি জীবনের কোন একটা নির্দিষ্ট পথ গ্রহণ করতে পারে নি। যার জন্য কোন বিষয়ে সে শীর্ষে পৌঁছয় নি।

রাজনীতিতে জীবনটা নিয়োগ করবে অনেকবার ভেবেছে, কিন্তু দলাদলি, বা ল্যাং মারামারিতে সে খুবই অপটু। ফলে তার পরিচিত এলাকার বাইরে জেলার বা দেশের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে নেতৃস্থানে প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি।

অবশ্য দেশের আবহাওয়ায় সে বিশারদ। তার ভবিষ্যদ্বাণীর অধিকাংশই ফলে। লোকে স্বীকার করুক আর নাই করুক, কাছের লোকেরা ঠিক জানে। স্বদেশরঞ্জনের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যাওয়ার কারণ দেশ, মানুষ ও

ইতিহাসকে সে খুব কাছের ব্যাপার বলে মনে করে। নিজের উত্তপ্ত অভিজ্ঞতার বিচারে সে কথা বলে। কেবল বইয়ের বিচার বা শোনা কথার উপর সে ভরসা করে না। ফলে সে কোন দলের কোন পতাকার তলায় নিজেকে বিসর্জন দিতে পারে নি।

স্বদেশরঞ্জন এমন কিছু অসাধারণ নয়। খুব সাধারণ সহজ। তাকে চেনা খুব সোজা।

বলতে গেলে, উনিশশো সাতষট্টি সালে সে এক অযোগ্য ব্যক্তি। কারণ স্বার্থ সে চেনে না। চিনতে চায় না এমন বোকা লোক মেলা আজ খুব কঠিন। কোটিকে গুটিক। অন্তত লোকে তাই বলে। আমিও স্বদেশরঞ্জনের মত দ্বিতীয় ব্যক্তি জীবনে দেখি নি।

বহুদিন আমি কলকাতায় ছিলাম না। এক ক্লাসে দুজনে পড়তাম। স্বদেশ কোনরকমে বি-এ পাশ করে কলকাতায় থেকে গেল। আমি কলকাতায় চাকরির ব্যবস্থা করতে না পেরে গ্রামে পালালাম। স্বদেশরঞ্জনও মফস্বলের ছেলে। বর্ধমানের এক গণ্ডগ্রামে তার বাড়ি। দুজনে আমাদের বেশ ভাব। আমি শ্রোতা, স্বদেশরঞ্জন বক্তা, কলেজে ওকে সবাই চেনে। সর্বঘটের কাঁটালি কলা স্বদেশরঞ্জন। ওর বর্তমান ও ভবিষ্যতের কাজ ও কল্পনার একমাত্র দলিলরক্ষক আমি। কলেজের ইউনিয়নে ফাংশনে সব ব্যাপারে তাকে বিদলিত করার কত না চেষ্টা চলেছে। চেষ্টা অনেকবার সফলও হয়েছে। কিন্তু স্বদেশরঞ্জন যেন গণ্ডার। সব সয়ে গেছে। কখনো কারুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে নি। শত্রুর কাঁধে হাত রেখে হেসে কথা বলেছে। শুধু কথা নয়, গোপন কথা। আমরা ওকে কতবার সাবধান করে দিয়েছি, শোনে নি সে। রাগারাগি করেছি। কর্ণপাত করে নি। কথা বন্ধ করেছি। ও যেচে এগিয়ে এসেছে। ওর এই বোকামির জন্য কলেজের নির্বাচনে বরাবর হেরে গেছে। কিন্তু কলেজের সব ব্যাপারেই শত্রুপক্ষীয়রা স্বদেশরঞ্জনের কাছে সক্রিয় সহযোগিতা ভিক্ষে করতে এসেছে। তখন স্বদেশ একমুখ হেসে আমায় বলেছে, দেখলি তো।

আমি বলেছি, এ জগৎ থেকে পাশপোর্ট নিয়ে তোর অন্য কোন গ্রহে চলে যাওয়া উচিত।

কেন, কেন।

তুই এ জগতে ডিসকোযালিফাযেড। তোব যদি সামান্য বুদ্ধি থাকত তাহলে ইউনিযনেব চেহাবা বদলে যেত।

ক্ষমতা হাতে নিলেই কি বদলান যায ?

থাম থাম। আব দর্শন আওডাস না।

দর্শন আওডাচ্ছি না। কোথাও কোন দেশে নেতাবা সমাজ বদলান নি, বদলেছে তাদেব সহকর্মীবা ও সাধাবণ লোকে।

আমি বলেছিলাম, তুই সেক্রেটাবি হলে আমবাও কাজ পেতাম।

ও বলেছিল, এখনো কাজেব অভাব নেই।

ওব কথা ববাববই বাঁকা। যাবা ওকে চেনে না তাবা ওকে অন্য ভাবত। ভাবত স্বদেশবঞ্জন প্যাঁচাল ছেলে।

বইতে পডা দেশকর্মীব কোন চবিত্রেব সঙ্গে স্বদেশবঞ্জনেব জীবনেব মিল নেই। অন্তত এমন চবিত্র আমি কোন বইতে পাই নি।

স্বদেশবঞ্জন যে জীবনে কখনও খুব উঁচুতে উঠতে পাববে না, এ বিশ্বাস আমাব ছিল। কাবণ সে জটিলতাব সমাধান কবত সহজ পথে। শ্রীকৃষ্ণ, চাণক্য বা যেকোন আব পাঁচটা সাংসাবিক লোকেব মত সে কথায ও কাজে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নয।

সেজন্য আট বছব বাদে যখন আবাব তাকে দেখতে পেলাম তখন তাকে দেখলাম একেবাবে দশটা মানুষেব মতই সে জীবনেব সঙ্গে লডাই কবছে। লডাই কবছে বলাটা বোধহয ঠিক হল না।

গ্রামে চলে যাওযাব পবেও বছব দুযেক তাব সঙ্গে আমাব চিঠিব আদানপ্রদান ছিল। সে চিঠি লিখতে পাবে না। আমাব দুটো-তিনটে চিঠিব পব তাব নীবস একটা চিঠি আসত। আব দুজনেব ক্ষেত্র আলাদা হযে যাওযায আমবা বিশেষ প্রসঙ্গ খুঁজে পেতাম না। কেমন আছিস, সব একপ্রকাব—এ পর্যাযে চিঠিব ভাষা পৌছতে একদিন চিঠি লিখতে আমিও ভুলে গেলাম।

গ্রামীন জীবনে আমি প্রতিষ্ঠিত। প্রতি বছব নতুন নতুন জমি কিনছি। হাস্কিং মেশিন, ধানেব গোলা ও কনট্রাক্টবি—তিন-তিনটি ব্যবসা চালাই তিন ভাইতে। কাজেব চাপ সামলাতে মোটবসাইকেল কিনেছি। কিন্তু সে সাইকেলটি কযেকমাস বাদেই বিশ্বাসঘাতকতা কবেছে। স্পেযাব পার্টস

ও টায়ার কিনতে কলকাতায় যেতে হল। সবাইকে তাই বললাম, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিল হাস্কিং-এর একটা নতুন মেশিন কেনা। ওঠার জায়গার অভাব নেই আমার। কাঁসারিপাড়ায় মাসিমা থাকেন, সেখানে উঠলাম। গড়বেতা থেকে ট্রেনে চাপার সময়েই স্বদেশের কথা মনে এসেছিল। ও বাসা করেছে খবর পেয়েছিলাম চিঠিতে। কিন্তু সে-বাসায় এখন আছে কি নেই, ভেবে আর ওর কাছে সোজা গেলাম না।

দিন দুই কলকাতায় নানান কাজে কাটল। গ্রামের ছেলে কলকাতায় এলে নিজের ছাড়া আরও পাঁচজনের ফরমাস থাকে। সবগুলো মিটিয়ে তৃতীয় দিন সকালে গাড়ি ধরতে গিয়ে আবার স্বদেশরঞ্জনের কথা মনে পড়ল। গাড়ি ছেড়ে দিলাম হাওড়া স্টেশনে এসেও।

গলির নামটা মনে ছিল। নম্বরটা ভুলে গেছি। যদি স্মরণ করতে পারি এই ভেবে চলে এলাম। গলিটাতে ঢুকে কিছুতেই আর নম্বরটা মনে করতে পারলাম না।

পথচারীকে প্রশ্ন করতেই দেখলাম স্বদেশরঞ্জনকে এখানে চেনে প্রায় সবাই। ভাবলাম স্বদেশ তাহলে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে জীবনে। খুশি হলাম। মফস্বলের লোক হলেও, ওখানে ক্ষমতাবানদের মধ্যে আমার স্থান। আমি একজন কৃতী ব্যক্তি। এস-ডি-ও, ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি সমাজের মান্যগণ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার দহরম-মহরম। অকৃতী মানুষের প্রতি আমার তাচ্ছিল্য-ভাব স্বাভাবিক। বন্ধুদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখতে খুশি হব সে আর কী বড় কথা।

পুরনো বাড়ি। গোটাদশেক পরিবার বাস করে। বাড়ির ঘর-দোরের, দেয়াল ও রাস্তার চেহারা দেখে মন খিঁচড়ে গেল। এ বাড়িতে কোন কৃতী লোক বাস করতে পারে না। উত্তর কলকাতার কোন সঙ্কীর্ণতম গলিতে ছাইগাদা আর উপচান নর্দমার জলের পাশাপাশি বাড়িতে কোন কৃতী লোক বাস করে না, এ ধারণা আমার আছে। হয়তো সে ধারণা মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হয়েছিলাম।

বাড়ির সরু গলি পেরিয়ে দোতলার বারান্দায় উঠলাম, আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সাত বছরের একটি ছেলে, তার সারা গায়ে ঘামাচি, খালি গা,

খালি পা। দোতলার বারান্দার মেঝেটা একদিকে বসে গেছে, চলতে গেলে মনে হয়, এই বুঝি হুমড়ি খেয়ে পড়বে ছাদটা।

স্বদেশরঞ্জনের ঘরে ঢুকে ওকে দেখতে পেয়েই বললাম. যাক আছিস। ভাবছিলাম তোকে পাব কিনা।

আরও অনেক কথা গড়গড় করে মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিল, স্বদেশের চেহারা দেখে থেমে গেলাম।

পাকা বেতের মত স্বদেশের দেহের কাঠামো কোথায় যেন উবে গেছে। আর তার চোখ থেকে মুছে গেছে স্বচ্ছ দৃষ্টি।

স্বদেশরঞ্জন ধীরে ধীরে কনুইতে ভর দিয়ে উঠে বসতে পেল। পুরনো হাঁপানি রুগির মত তার নিশ্বাসে টান শুনতে পেলাম।

বললাম, থাক থাক, তোকে উঠে বসতে হবে না।

ওর চেহারা ও ভাবভঙ্গি দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম স্বদেশ যে-কোন মুহূর্তে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করতে পারে।

ও আমার কথা শুনল না। বালিশটা পিঠে ঠেকিয়ে শেষ পর্যন্ত কাঁচা হাতের 'দ'-এর মত বসল।

বলল, দেবু তুই! তুই এসেছিস আর আমি শুয়ে থাকব!

স্বদেশ কী বলল আমি সবটা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম না। স্বদেশরঞ্জনের তিনটি ছেলেমেয়ে ঘরে দাপাদাপি করছে, দুটি স্কুলে যায়, একটি আড়াই বছরের। পড়াশুনা করছিল বড় দুটি। কিন্তু তাদের কে শাসন করবে? তারা স্বাধীনতা ভোগ করছে চূড়ান্ত। যে-স্বাধীনতার কথা স্বদেশরঞ্জনের মুখে আমি হাজার বার শুনেছি, আজ সেই স্বাধীনতার দাপটে স্বদেশ নিজেই বিচূর্ণ হচ্ছে। এমন তিনটি শিশুর চুলোচুলি লাফালাফির মধ্যে কখন মুমূর্ষু রুগি বাস করে, বেঁচেও থাকতে পারে আমার কল্পনার বাইরে।

বড় দুটিকে আমি ধমকালাম।

যাও। পড়তে হবে না। বারান্দায় খেল গিয়ে।

ওরা আমার দিকে সকৌতুকে তাকাল। তারপর যথারীতি নিজেদের স্বাধীনতা ভোগ করতে লাগল।

স্বদেশরঞ্জনের শোবার, বসবার বা পড়বার একমাত্র ঘরের তিনদিক রুদ্ধ,

জানলা বা দরজা মাত্র বারান্দার দিকে। আলো খুবই কম। এমন ঘরের কথা লোকমুখে আমি শুনেছি। যেখানে দিনেও আলো জ্বেলে রাখতে হয়। দেখি নি। দেখলাম। গ্রামের ছেলে আমি, ফাঁকা মাঠ ছাড়া সকালবেলার কাজ করতে পারি না। এই ঘরে আমাকে যদি থাকতে হয় ভেবে আমার বুকেও হাঁপ দেখা দিল বোধহয়।

বলতে গেলাম, আজ উঠি। তুই একটু সেরে ওঠ। আর একদিন এসে গল্প করা যাবে।

প্রায় চৌকোনো মুখ, মাথায় বিরল চুল, চোখে পুরু লেন্সের চশমা, স্বদেশের জুড়ির মত আর একটি স্ত্রীলিঙ্গের কাঠামো এবং কুৎসিত-দেখতে-বরাবরই-ছিল (যদি কোনদিন দেহে স্বাস্থ্য থেকে থাকে) এমন একটি মেয়ে ভাঙা হাতলের কাপে চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। আমি মেঝেতে ছেঁড়া মাদুরে বসেছিলাম, তার উপর রাখল চা-টা। মেয়েটি কাছে আসতে দেখলাম, একে রং কালো তাতে আবার বসন্তের গভীর দাগ।

ছেলেরা সঙ্গে সঙ্গে চুপ। কিন্তু মায়ের হাতের শাস্তি থেকে রেহাই পেল না। বুঝলাম আমি আছি বলে আজ শাস্তিটা মৃদু। মৃদু শাস্তির চেহারা দেখে আসল শাস্তির কল্পনা করে আমার চোখে জল এল।

তুই বিয়ে করেছিস!

এঁরা কার ছেলে ভাবছিলি? স্বদেশ বলল ফ্যাসফেঁসে গলায়।

পড়শীর। জানাস নি কেন?

জানাবার সময় কোথায়?

কেন?

বলছি। শোনো—এই·

বুঝতে পেরেছি—মেয়েটি বলল—দেবব্রতবাবু।

আমার নাম হয় তাহলে?

স্বদেশ হাসল নিঃশব্দে।

বলল, খুশি, বিস্কুট নেই?

থাক থাক। তোকে আর ব্যস্ত হতে হবে না।

খুশি বলল নিঃসঙ্কোচে, থাকলে কি আর তোমার বন্ধুকে দিতাম না।

যা বলেছ, খুশি।

ওব বউকে প্রথম থেকেই নাম ধবে তুমি বলতে দ্বিধা কবলাম না। স্বদেশ সেবকমই আছে। ওব কাছে গেলেই অন্তবে পৌছনো যায।

আমি একটা ছেলেকে ডাকলাম।

কী নাম তোমাব ?

শত্রুজিৎ।

অত বড নাম ধবে ডাকা যায না।

ঝুমু।

ঝুমু, এক টাকায যতগুলো বিস্কুট হয নিযে এস।

খুশি বলল, বেশি হযে যাচ্ছে না ?

ওবা তিনজন আব তুমি ও আমি। পাঁচজনে একটাকাব বিস্কুট বেশি ? আমি কিন্তু আবও তিন-চাববাব চা খাব, তোমাব চা-চিনি আছে ?

খুশি বলল, চিনি আছে।

পকেট থেকে আব একটা টাকা বেব কবে ঝুমুকে আমি চা ও গুঁডো দুধ আনতে দিলাম। অবশ্য এ-বাডিতে যে দুধ ঢোকে না, সেটা আমাব আগেই ভাবা উচিত ছিল।

ঝুমু চলে যাবাব পব খুশিও বান্নাব কাজে গেল। আমি দাঁডালাম। বাবান্দায এসে পাযচাবি কবতে কবতে একটা বিডি খেলাম। মাথাটা ধবে গিযেছিল। দাবিদ্র্য অনেক দেখেছি। এটা আমাব কাছে আমাধ দেশে সুলভ। দাবিদ্র্য দেখে দেখে, অনাহাব অর্ধাহাব, না খেতে পেযে মৃত্যু— দেখে দেখে আমাব চোখ পচে গেছে। বাস্তাব ওপব মডা পডে থাকলে আমবা গ্রামেব লোকেবা হযত আজও জটলা পাকাই, শহব কলকাতাব লোকেদেব দেখেছি বেলকুঁডি শুঁকতে শুঁকতে উর্ধশ্বাসে ছুটছে। এমন অবস্থায স্বদেশেব দাবিদ্র্য এমন কিছু কডা স্বাদেব নয। কিন্তু স্বদেশ যে দাবিদ্র্যে পডবে, পডতে পাবে, ওব অতিথিব জন্য চা-দুধ কিনে দেবে অতিথি নিজে, আব চিকিৎসাব অভাবে দিনেব পব দিন মাসেব পব মাস পডে থাকবে অন্ধকাব ঘবে—আমি অন্তত ভাবতে পাবি নি।

আমবা ওকে বিদ্যাসাগব বলে ডাকতাম। ব্যঙ্গ কবে নয, সত্যি সত্যি। ওকে দিযে উপকাব পায নি আমাব জানাশোনা এমন কেউ ছিল না। ও শত্রুব কাঁধে হাত বেখে শুধু কথা বলত না, শত্রুব উপকাবও কবত।

খুব সুন্দব বেহালা বাজাত স্বদেশ। হোস্টেলে আমাদেব ঘবে, যে-ঘবে আমি, স্বদেশ ও আবও দুজন ছেলে থাকতাম, সে-ঘবে মাঝে মাঝে গান-বাজনাব জলসা বসত। হাবিব সঙ্গত কবত। হাবিব স্বদেশেব পাশেব গ্রামেব ছেলে, পডত ইসলামিযা কলেজে। সাতচল্লিশ সালে দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রায বোজই লেগে থাকত। হাবিব সেজন্যে আসতে চাইত না আমাদেব হোস্টেলে। স্বদেশেব অনুবোধ উপেক্ষা কবতে পাবত না কেউ, হাবিবও না। একদিন সন্ধ্যেব পব আমাদেব গান-বাজনাব জলসা জমজমাট, কলাবাগানেব দিকে জিঘাংসাব হল্লা শোনা গেল। হাবিব বাব বাব তাল কাটতে লাগল, বেপবোযা ছেলে হাবিব, কিন্তু এখানে সে একা, আব যে-কোন মুহূর্তে মৃত্যু যে-কোনরূপে হাজিব হতে পাবে, হাবিবেবও ভয আছে বৈকি। স্বদেশেব শত্রুব অভাব নেই, যদিও সে সবাইকাব মিত্র। হীরু ও নকুল আমাদেব ঘবেব সামনে থাকত। ওবা কঠোব পবধর্মবিদ্বেষী। পৃথিবীতে অন্য সব ধর্ম বাজে ওদেব কাছে। ওবা আমাদেব দিকে এবং জলসাব দিকে বাব বাব শেযালেব চোখে তাকাত। অন্যতম প্রধান কাবণ আমবা ও হাবিব এক থালায প্রকাশ্যে মুডিমুডকি থেকে ভাত পর্যন্ত খাই। সেদিন সন্ধ্যেয নকুল আমাদেব জলসাব মাঝখানে এসে হাবিবকে ডাকল। ওব সঙ্গে নাকি ব্যক্তিগত কথা আছে। স্বদেশ ওকে যেতে দিল না। বলল, যা বঁলাব এখানেই বল। স্বদেশকে অগ্রাহ্য কবে নকুল হাবিবকে তবু ডাকল। শেষে যখন স্বদেশ হাবিবকে ছাডল না দেখল নকুল, তখন হীরু এসে যোগ দিল। বলল, মুসলমানবা হিন্দুদেব মাবছে, আমবাও মুসলমানকে মাবব।

স্বদেশ লুঙ্গি পবেছিল। উঠে এল দবজাব কাছে। দুটো কপাট দুহাত দিযে ধবে দাঁডাল।

বলল, দাঙ্গা মানেই এক ধর্মেব লোক অন্য ধর্মেব লোকেদেব মাববে। কে কাকে মাবছে, বা কে আগে মাবছে এসব প্রশ্ন অবান্তব। এসব প্রশ্ন তুলে যাবা দাঙ্গা কবে তাবা অমানুষ। আব হত্যাব কথা বলতে চাও? হত্যা তো তোমাব ধর্মে কিছু কম হচ্ছে না, তাদেব জন্যে তুমি কী কবেছ? অন্যায মৃত্যুকে রুখতে তোমাকে কোথাও কোনদিন দেখেছি বলে আমাব জানা নেই, ওবকম কাজ তুমি যদি কবে থাক আমাকে বল দেখি। আগে শুনি।

স্বদেশ সব ব্যাপারকেই একটা দার্শনিক অর্থে ব্যাখ্যা করত, এ তার গুণ বা দোষ দুই-ই।

ওরা তখন স্বদেশের মুখে উচ্চভাবের কথা শুনে আরও খচে গেল।

নকুল বলল, হাবিবকে ছেড়ে দাও, স্বদেশ।

স্বদেশ বলল, তোমরা আমাকে আদেশ করছ শুনে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি।

সত্যি, আমরাও অবাক হয়ে গেলাম। স্বদেশের যত শত্রুই থাক, ওকে সবাই অন্তত প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা করে, মান্য করে এই অভিজ্ঞতাই আমাদের ছিল। প্রিন্সিপ্যাল পর্যন্ত স্বদেশের সঙ্গে অন্য সুরে কথা বলত। স্বদেশ বাইরের বই এত পড়াশুনা করত যে অধ্যাপকরাও ওর মুখ থেকে আধুনিক যুগের জ্ঞানের বিবরণ পেত। সবাই জানত স্বদেশ যা করে যা বলে তার মধ্যে সত্য আছে ন্যায় আছে, অন্তত জানত স্বদেশ অন্যায় বা অসত্য আচরণ করে না। সেইরকম ছেলেকে স্বভাবতই সবাই সমীহ করে চলে। নীতির বিচারে হয়ত স্বদেশের কার্যাবলী মিলবে না অন্যের সঙ্গে, কিন্তু স্বদেশ বিনা-যুক্তিতে বিনা-বিজ্ঞানে কিছু করে না।

হীরু ও নকুল দুজনে বলল, ছেড়ে দেবে কিনা বল।

স্বদেশ বলল, ছেড়ে দেব কিন্তু তোমাদের হাতে নয়।

স্বদেশ ইঙ্গিতে হাবিবকে আসতে বলল। হাবিবের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি ওকে চিনতে পারি না। লালচে মুখ ওর। কেমন বেগুনি হয়ে গেছে।

হাবিবকে আমাদের ব্যূহের মধ্যে রেখে স্বদেশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে ঢুকল। পুলিশে ফোন করাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দিয়ে। পুলিশ এসে হাবিবকে নিয়ে গেল।

•

কিন্তু স্বদেশের কাঁধে ছুরি বিদ্ধ করল কে বা কারা দিন কয়েক বাদেই। সেই হীরু ও নকুলকে স্বদেশ একদিন কাবুলিওয়ালাদের ছুরির হাত থেকে বাঁচাল। হীরু ও নকুলের চেহারা সেদিন সবার কাছে প্রকট হয়ে গেল। রোজ মদ ও জুয়ার পেছনে ঢালতে কোত্থেকে তারা টাকা পেত সেদিন আর অজানা থাকল না। ওরা কাবুলির কাছে দেনা তো করেছেই, এমন কি কাবুলিওয়ালাটি অন্যকে দেবে এমন একটি চেক ওদের ভাঙাতে দিয়েছিল, সে-চেকও ওরা আত্মসাৎ করেছে। হোস্টেলের সামনে কাবুলিওয়ালাদের ভিড়ের ভেতর থেকে

স্বদেশ ওদেব দুজনকে টেনে আনে, নিজে কাবুলিওযালাব কাছে জামিন থাকে। স্বদেশেব ভদ্রজনোচিত চেহাবা দেখে কাবুলিব বিশ্বাস হয। অবশ্য হীরু ও নকুল কযেকমাস পবেই হোস্টেল ছেড়ে পালায। ওদেব টাকা স্বদেশ চাঁদা তুলে শোধ কবে। হীরু ও নকুল কাবুলিওযালাদেব সেদিন নাকি বাপ-মা তুলে গালাগাল দিযেছিল।

হীরু ও নকুল ছাড়া আবও অনেক শত্রুব উপকাব কবেছে স্বদেশবঞ্জন। না, স্বদেশ পীব না, পযগম্বব না, দেশনেতা বা দেবতাও না। ও অন্যাযেব মূর্তিমান প্রতিবাদ, ও চোখেব জলেব তলায সহৃদয বুক। অন্যেব হৃদযেব কাছে স্বহৃদয।

কিন্তু ও বোকা।

বোকামিব খেসাবত তাকে কলেজ-জীবন থেকে কর্মজীবনে, এমন কি সংসাব-জীবনেও দিতে হযেছে।

কর্মজীবনেব বোকামিব বৃত্তান্ত শুনলাম স্বদেশেব মুখ থেকে।

খুশি আবাব চা কবে আনল।

ছেলে দুটি চলে গেল কর্পোবেশনেব ফ্রী প্রাইমাবি স্কুলে, ছোট মেযেটিকে স্নান কবিযে দুমুঠো সেদ্ধ ভাত খাইযে ঘুম পাড়িযে দিল। আমি ভাঙা চৌবাচ্চায এবড়োখেবড়ো চটানে দাঁড়িযে কযেক মগ জল ঢেলে খুশিব হাতেব ভাত, কড়াইযেব ডাল আব পোস্ত খেলাম। বলা বাহুল্য ডাল আব পোস্ত আমাব পযসায কেনা। মেযেটিকে ঘুম পাড়িযে খুশি গেল স্নান কবতে। স্বদেশ কযেক ঢোঁক বার্লি খেযে পাতি লেবুব ফালি বাব বাব চুষতে লাগল। খুশি ওকে সযত্নে স্পঞ্জ কবিযে দেওযায একটু চকচকে দেখাচ্ছিল।

স্বদেশ এমন ছেলে যে সকালে স্নান কবে বেবোয আব দুপুবে ফেবে। বাড়িতে খেতে হয না, যেখানে যায সেখানেই চা-রুটি বিস্কুট মুড়ি এমন কি ভাত পর্যন্ত খেযে আসে। চাকবি কবতে ঢুকে গোড়ায থাকত মেসে। মাসে চব্বিশদিন তাব নো-মিল। চাকবি গেল তাব তিনবাব না চাববাব। বছবে ন মাস কামাই। কে ওকে বাখবে। তাব ওপব আবাব ইউনিযনেব কট্টব কর্মী। কেউ না কেউ ছাঁটাই হয, কেউ না কেউ উপবওযালাব বিবাগভাজন হয, সে-সবেব সুব্যবস্থা কবাব অলিখিত দাযিত্ব স্বদেশেব। স্বদেশকে সবাতে পাবলে কোলাহল থিতিযে পড়তে পাবে ভেবে উপবওযালাবা

স্বদেশকে সসম্মানে আগেই বিদায় করেন। স্বদেশের জন্যে লড়ছে তার বন্ধুরা। কিন্তু সব জায়গায় মধ্য ও নরমপন্থীর দল-জোরদার। কতদিন আর স্বদেশের জন্যে সবাই চাঁদা তুলে কেস চালাবে। এইভাবে তিনটি কেস স্বদেশ নিজেই তুলে নিয়েছে। যে দেশে কেউ সহজে চাকরি পায় না, সেখানে স্বদেশের চাকরি-ভাগ্য আশ্চর্যের। অফিসের চাকরি গেলে সে বেহালা বাজিয়ে চালাতে লাগল। আমি ওকে দেখেছি. হোস্টেলের ছাদে সারারাত ছড় টেনে চলেছে। কলকাতা হাওড়াব্রীজ, নীল অন্ধকার, টুকরো টুকরো তারা আর ডাবের মত চাঁদ স্বদেশের বেহালার ধ্বনিতে চুপচাপ বসে থেকেছে। ফাংশনে রেডিওতে রেকর্ডে এমন কি সিনেমায় বেহালা বাজানোয় স্বদেশ বেশ সুনাম অর্জন করেছিল। কিন্তু অচিরেই তার বেহালায় ধুলো জমতে শুরু হয়েছে। রাজ্যের সমস্যার যেন একমাত্র উপদেশদাতা, একমাত্র মুশকিল-আশান স্বদেশ। রেওয়াজ করতে বসেছে—মাথা ফাটাফাটির কেস হাজির। কী? না রাস্তার কলে জল নিতে গিয়ে খাবার ও কাপড় কাচার জলের কোন্‌টা বেশি প্রয়োজন এই নিয়ে বিবাদ। নানান ঝামেলা, কোথাও রোগ, কোথাও বিয়ে, কোথাও দাম্পত্যকলহ স্বদেশের বেহালার স্বর ছাপিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে।

ভট্‌চায-বাড়িতে খুশিরা ছিল ভাড়াটে। ওর বাবা কাপড়ের দোকানের সেল্‌সম্যান। লোকটি খুবই ধর্মভীরু। খুশি খুবই পড়ুয়া। একটিমাত্রই সন্তান কেশববাবুর ওই খুশি। ভদ্রলোক অনেক কষ্টে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ালেন মেয়েকে। ম্যাট্রিকে মেয়েটি ভালভাবে পাশ করল। আর পড়াতে পারবেন না বললেন কেশববাবু। খুশি খাওয়াদাওয়া বন্ধ করল। কেশববাবু হয়ত ধার-দেনা করে মেয়েকে কলেজে পাঠাতে পারতেন, কিন্তু ধিঙ্গি মেয়েকে আর বাইরে যাতায়াত করতে দেবেন না। শেষ পর্যন্ত যখন খুন্তি ঠেলতেই হবে তখন খুব বেশি পড়ার কী দরকার। বিয়ে থা-র চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কালো কুৎসিত মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি সোজা কথা। বছরের পর বছর চলে গেল। বিয়ে হল না। খুশি বসন্তে আক্রান্ত হল। এমন বসন্ত যে প্রতিটি রোমকূপ ভরে গেল। সারা গায়ে পোকা হয়ে গেল। মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এল একটি চোখ নিয়ে।

আমি এখানে আর্তনাদ করে উঠেছিলাম, খুশির একটা চোখ নেই।

অন্যটাও বোধহয় থাকবে না। ওটাও ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে। বাঁ চোখটা তো পাথরের।

খুশিকে এ পর্যন্ত স্বল্পালোকে দেখেছি, তাই পাথরের চোখ ধরতে পারি নি।

ভালো চোখটা শুকিয়ে যাচ্ছে, মানে?

মানে, শিরাগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে।

স্বদেশের সংসারে বেঁচে আছে যে চোখটি সেটিও ক্রমশ আলো হারিয়ে চলেছে এবং একদিন যখন তার আলোও ফুরিয়ে যাবে, তখন স্বদেশ এই ছোট্ট সংসারটা নিয়ে কী করবে ভেবে উঠতে পারলাম না।

বিয়ে করলি কেন?

আমি একবার দেখে নিলাম খুশি আশেপাশে আছে কিনা।

ওকে আমি চিনতাম। পাড়ার মেয়েদের কাছে খুশি আমায় অনেক সাহায্য করেছে। ও অবশ্য আমায় ভালবাসত না। আমায় কেন, খুশি কাউকেই ভালবাসত না। ও ছিল সেই ধরনের মেয়ে যারা স্বামীর জন্য সবকিছুই সযত্নে লুকিয়ে রাখে। স্বদেশের সে-রকম স্বভাব ছিল না। ও বরাবরই মুক্ত আচরণের পক্ষপাতী। স্বাধীনতা, সৌন্দর্য-আস্বাদন, উদারতা আর আনন্দ ইত্যাদিকে স্বদেশ কোন পাত্রে আবদ্ধ করে চলতে পারত না।

পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর খুশি স্বদেশের কাছে কেঁদেছে। স্বদেশ ওকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বাড়িতেই পড়তে বলেছে। খুশি পরপুরুষের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া ভালো চোখে দেখতে পারে না। তার রুচিবিরুদ্ধ।

বসন্তের ঝড় খুশির শরীরটাকে একেবারে ভেঙে দিলে স্বদেশ দেখল এবার মেয়েটা মরবে। কেশববাবুর কাছে বিয়ের প্রস্তাব জানাল। কেশববাবু যেন সামনে বিভীষিকা দেখলেন। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। তারপর হেসে উঠলেন পাগলের মত। শেষে কেঁদে ফেললেন স্বদেশের দুহাত ধরে।

খুশি বলল, আমি বিয়ে করব না।

স্বদেশ বলল, তোমাকে আমি পড়াব।

খুশি আর আপত্তি করতে সাহস পেল না।

আমি আবার চাপাস্বরে গর্জে উঠি দিন দিন কানা হয়ে যাচ্ছে বললে না?

হ্যাঁ বলেছে।

স্বদেশকে তাবপব আমি কুঁজো থেকে জল ঢেলে মুখেব কাছে তুলে ধবি। মনে মনে ওকে গালাগাল দিই। ওব প্রতি আমাব তীব্র ঘৃণা জাগে। হাত-ব্যাগেব হাতলে আবাব আমাব মুঠোটা শক্ত হয। আমাব হাতব্যাগে কযেক হাজাব টাকা। স্বদেশ আমাব চাইতে কম ধীমান ছিল না, কম জনপ্রিয ছিল না, কম গুণ ছিল না। ও যদি ইচ্ছে ক'বে পৃথিবীব যাবতীয দুঃখ বক্ত পুঁজ যন্ত্রণাগুলিকে নিজেব সাবা গাযে মাখে তবে ওকে কে বাঁচাবে? সেইজন্যেই উপকৃত লোকগুলি তাব কাছ থেকে সবে গেছে। কেননা তাদেব প্রতিদানেবও তো সীমা আছে।

আমাব মনোভাব বোধহয পডতে পাবল স্বদেশ।

না বে, তোবা আমায উপদেশ দিস না। কোন দুঃখ আমাব নেই।

তোব দুঃখ আছে কে বলছে। আমি এখনো রুক্ষ।

তুই ভাবছিস আমাব মূর্খামিই আমাব কববেব মাটি। আমি বলি, না। কত লোক আমাব আপন সেইটাই আমাব আনন্দ। সত্যি বলছি, খুশি বা অন্য যেকোন লোকেব জন্যে আমি কিছু কবতে গিযে বাহাদুবি দেখাই নি। অনেকে বলে পাঁচজনকে ব'লে বেডাবাব জন্যে আমি লোকেব উপকাব কবি।

স্বদেশ! তুই থামবি। আমি তোকে চিনি না?

চিনিস। সেইজন্যেই—আমি কী—আবাব নিজেব কাছে তুলে ধবতে চাইছি।

তুই আহাম্মক।

যা বলেছিস। আমি আহাম্মক। আহাম্মকই থাকতে চাই, যেন আমাব জ্ঞানবুদ্ধি কোনদিন না হয।

আশা কবিস নাকি।

না।

স্বদেশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাশ ফিবে শুল।

ও আমাব কাছে একাধিক পবীক্ষায পাশ কবেছে। শুধু আমাব কাছে নয, আমাব বন্ধুবান্ধবদেব কাছেও। কাকব জন্যে কিছু ক'বে স্বদেশকে সে নিযে আলোচনা কবতে দেখি নি। বড জোব, আমাদেব দবকাব হলে আমাদেব সাহায্য ভিক্ষে কবেছে। দুঃখে ও আনন্দে, বোগে ও শোকশয্যায স্বদেশেব কথা কাজ গান বাজনা সবটাই অবিচ্ছিন্ন। কেউ যেমন কাঠ কাটে, লোহা

পেটে, কলম পেষে—তেমনি স্বদেশ পরের জন্যে কিছু করে। এটা ওর বড় হবার সিঁড়ি নয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষাও নয়, নেশা নয়, এটা ওর পেশা। এর জন্যে ওর জন্ম, এর জন্যে ওর মৃত্যু।

মৃত্যু তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।

খুশি বিকেলের চা নিয়ে এল।

শুনলেন তো?

শুনলাম।

খুশির গলার স্বর স্বদেশের ঘুমে বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

বললাম, আস্তে।

আঙুল দিয়ে স্বদেশের দিকে নিঃশব্দে নির্দেশ করলাম।

ঘুমোয় নি। চার বছর থেকে ঘুম নেই। ওটাই তো প্রধান রোগ। যেদিন ও শুনল ডাক্তারের কাছে, আমাদের বিয়ের পর, চোখের জন্যে আমার পড়াশুনা করা চলবে না—সে রাতে ও ছটফট করল। সকালে বলল —খুশি, আজ কোথাও বেরোব না। একটু ঘুমুব। আমি বললাম, কেউ এসে ডাকবে না তো? 'সে কী!' ও চমকে উঠল। আচ্ছা, আচ্ছা, ডাকব। ঠাট্টা করছিলাম। ততদিনে ওকে চিনে ফেলেছি। লোক এলে ফেরানো চলবে না।

খুশি পা ছড়িয়ে বসল। থামল।

চায়ে আমিও চুমুক দিলাম। ঠাণ্ডা হয়ে আসছে চা। আকাশের রৌদ্রাভা আর এঘরে ঢুকছে না। আমার মনে হল এ বাসায় থাকলে কেউ বাইরের আলো-তাপ যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করতে পারে না। আর যথেষ্ট পরিমাণে নিজে আলো-তাপ না পেলে কী করে অন্যেকে বিতরণ করবে? স্বদেশ বিন্দুতে সিন্ধুর তত্ত্বে বিশ্বাসী। আমার ধারণা, ওটা কথার কথা মাত্র। দেশ কাল ও পাত্র-অপাত্র ভেঙ্গে অনন্ত জীবন যে প্রতিটি জীবে সন্নিবেশ করতে চায়, তাকেও অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে হয়। সেই অনন্ত জীবন কোত্থেকে পাবে স্বদেশ?

খুশি বলল, তার পর থেকে ও আর ঘুমোতে পারছে না।

কয়েক মুহূর্ত বাদে আমার চিন্তার সঙ্গে স্বদেশের কথা মিলে গেল। যে কথা শুনলাম খুশির মুখ থেকে। স্বদেশরঞ্জন একদিন উপলব্ধি করল,

গত দশ বছরে কোন আতঙ্ক কোন জায়গায় কমে নি। সে ছাড়া আরও হাজার হাজার দেশকর্মী, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক সবাই চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু কই, জীবনের ও অস্তিত্বের অনিশ্চিতির উপায় কোথায়? খুশিকে একদিন বলল, খুশি আমি যদি একাই লক্ষ লক্ষ ডাক্তার লক্ষ লক্ষ বৈজ্ঞানিক হতে পারতাম তাহলে বোধহয় সকলের সামান্য উপকার করা যেত।

খুশি হেসেছিল।

অবশ্য এমন উদ্ভট কথা সে সবার সামনে বলে না।

লোকে পাগল তো বলবেই, উপরন্তু তার সঙ্গ হয়তো ত্যাগ করবে।

খুশিকে স্বদেশ বলেছিল গভীর গাঢ় গলায়, তার দুগালে দু-হাত দিয়ে বলেছিল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় মেঝেতে বসে ফ্যানের হাওয়ায় তখন স্বদেশকে রোদে-পোড়া শুকনো ও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। সারাদিন সে চালের গুদামে দাঁড়িয়ে থেকে ন্যায্য দরে চাল বিক্রি করেছিল। প্রায় উলঙ্গ, রুক্ষচুল, কালো-কুচ্ছিত মানুষগুলো—যাদের বর্তমানে জীবনের মর্ম এসে ঠেকেছে দুমুঠো অন্নগ্রহণে। তাদের কেউ কেউ পয়সা এনেছে। যারা পয়সা এনেছে তারা কিছু কিছু চাল নিয়ে গেল, বেশির ভাগ লোক জন্তুর মত লাল-লাল চোখ মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, তাদের পয়সাও ছিল না। যাদের পয়সা ছিল, তাদের মধ্যে চাল বিক্রি করতেই গুদাম সাবাড়। সুতরাং অর্থহীনদের মধ্যে চাল বিতরণের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

স্বদেশ যেমন ঘুম ত্যাগ করল, তার সঙ্গে সঙ্গে তেমনি তার খাওয়া কমে গেল। খিদে ক্রমশ কমতে কমতে শেষ হয়ে গেল। বিনা খিদের ওপর খাবার চেষ্টা করল, কিন্তু পেটে থাকে না, বমি হয়ে যায়. পেটের অসুখ হয়। স্বদেশরঞ্জনের সত্তা ক্রমশ নিভে যেতে লাগল। বুঝতে পারা যাচ্ছে, ওর ভিতরকার বাতিটা ক্রমশ শিখা গুটিয়ে চলেছে। খুশি ও তার বন্ধুবান্ধব সবাই এবারে ওর দিকে নজর দিল। কেশববাবু ভালো হোমিওপ্যাথ ওষুধ দেন। তিনি ওষুধ দিতে লাগলেন। কিছু হল না। তারপর অ্যালোপ্যাথ। তাও কিছু হল না। তারপর টোটকা, যে যা বলে তাই করা হয়, প্রতিটি মানুষের ডাক্তারি নির্দেশ পালন করল খুশি। স্বদেশরঞ্জন ওষুধ খেতে ওস্তাদ। যেকোন ওষুধ যত বিস্বাদই হোক—গিলে ফেলে হাসিমুখে। হাতুড়ে থেকে

চৌষট্টি টাকা ফি-এব ডাক্তাব, সকলেব ওষুধ খেযেও স্বদেশ ক্রমশ খাবাপেব দিকে।

জিজ্ঞেস কবলাম, বোগটা কী?

খুশি বলল, সেটাই তো কেউ জানে না।

কতদিন থেকে হযেছে?

তা, বছব চাব।

তোমাদেব চলছে কী কবে?

আমি জানি না।

স্বদেশ জানে?

ও তো বিছানা থেকে নামে নি ছ-মাস। দেখছেন না, চৌকিব তলায বেডপ্যান।

হাতব্যাগটা আমি আঁকড়ে ধবলাম। পুবনো হাস্কিং মেশিনটা আমাব প্রাযই বিগড়ে যাচ্ছে। ওটা বেচে দেব, কিনব একটা নতুন মেশিন। সেজন্যে কযেক হাজাব টাকা সঙ্গে এনেছিলাম। নতুন মেশিনটা পছন্দ হয নি। টাকাটা ব্যাগেই আছে।

খুশি ছোট্ট আর্শি এনে দবজাব কাছে বসল: চুলে চিরুনি বুলোতে লাগল। গলি থেকে খেলে ফিববে ছেলেবা। মেযেটা নিচেব তলায।

খুশি বলল, আজকাল বিশেষ কারুব টিকি দেখা যায না। প্রথম প্রথম কত লোক আসত। প্রথমদিকে ওঁব মুখে হাসি ছিল। লোকজন আসা-যাওযা কমে যাওযাব সঙ্গে সঙ্গে হাসিও কমে গেল।

পাশ ফিবে শুল স্বদেশবঞ্জন। শব্দ পেলাম অস্পষ্ট। ওব দিকে আমবা তাকালাম।

ও বলল, খুশি তোমাব কথাব মানেটা কিন্তু অন্য বকম দাঁড়াচ্ছে। কেউ এল কি এল না, তাব জন্যে কি আমাকে দুঃখ কবতে দেখেছ?

তা অবশ্য দেখি নি।

আমি জানি, ও কখনই অতীতেব জন্যে আফশোস কবে না। এমন কি কোন ব্যাপাবে নয। কী কবে বর্তমান আব ভবিষ্যতেব সমযগুলো কাটাবে, তাবই কাজেব পবিকল্পনায সে মত্ত। বাগ আছে তাব, কিন্তু বিদ্বেষ দেখি নি। স্বদেশ কোটি লোকেব কাছ থেকে সম্মান আব ভালোবাসা পাবার

যোগ্য। কিন্তু কোটি লোক যদি তাকে অসম্মান করে, দূরে ঠেলে, তাহলেও সে হতাশ হবে না। বোধহয় তার হতাশ হবার ইচ্ছেটাই নেই। কিংবা কারুর জন্যে দুঃখ করার মন সে হারিয়েছে। কিন্তু একজন লোক যে প্রচণ্ড মনের জোর, সাহস আর ভালোবাসা নিয়ে এসেছে—তার এমন রোগ কেন ?

রোগের কি বিশেষ কারণ আছে ? রোগ কত কারণে হতে পারে। কত রকম জীবাণু আছে, আক্রমণের কত প্রকার রাস্তা। কিন্তু স্বদেশকে আমি জীবনে একবার হাঁচতে শুনি নি। কাশতে দেখি নি। চার বছর একঘরে আমি আর ও বসবাস করেছি হোস্টেলে।

স্বদেশ বলল, এখনো যখন দু-বেলা আমাদের রান্না হচ্ছে তখন বুঝতেই পারছিস, দেবু, লোকে আমার কাছে আসে। আজ পুরো চার বছর আমি বেকার।

খুশি বলল, থামো, কতদিন তোমার প্রেস্‌ক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ কিনতে পারি নি, তুমি জানো ?

কই, আমাকে তো বলো নি।

তোমাকে বলে কী হবে ?

আজ বলে কী হল, খুশি ? স্বদেশরঞ্জন টেনে টেনে বলল।

তোমার ভুল ভাঙা দরকার মনে করলাম। খেয়ে, না খেয়ে, দুপুরের ভাত সন্ধ্যেতে খেয়ে দিনের পর দিন তুমি যাদের জন্যে করেছ, তারা আজ কোথায় ? তোমার ধারণা, তারা তোমার প্রয়োজনেই ছুটে আসবে, কেবল তোমার প্রয়োজনটা এখন নেই বলে আসছে না। কিন্তু তারা ততদিন এসেছে যতদিন আশা করত তুমি সেরে উঠবে, তোমার কাছ থেকে তারা আবার উপকার আদায় করবে।

স্বদেশরঞ্জনের মুখে এতক্ষণে বিকৃত ভাঙাচোরা রেখা ফুটে উঠল।

আঃ খুশি, অমন করে লোকের নিন্দে করো না।

সত্যি সত্যি খুশি থেমে গেল, বোধহয় ভয়ে। খুশি জানে, সত্য হোক মিথ্যা হোক ওই ধারণাতেই স্বদেশ আজ পর্যন্ত বেঁচে আছে। ও জানে মানুষ কৃতজ্ঞ। যদিও স্বদেশ কারুর প্রতিদানের প্রত্যাশা করে না। তাছাড়া খুশির ধারণা, স্বদেশরঞ্জনের আশা ছিল যে সে সবাইকার দুঃখ মোচন করতে পারবে, সে আশা তার নিভে গেছে, জেগেছে অক্ষমতা।

আড়ালে খুশি আমায় বলেছিল, বিদেশ থেকে কে এক স্বদেশের বন্ধু ভালো ডাক্তার হয়ে ফিরে এসেছে। সে তাকে নতুন ধরনের চিকিৎসা করতে চায়। কিন্তু চিকিৎসা করাতে পারছে না একমাত্র পয়সারই অভাবে।

ডাক্তারটির নাম বলল খুশি, মিলন বিশ্বাস।

চিনতে পারলাম না।

স্বদেশ তাকে বলেছে আর সে চিকিৎসা করবে না। কিন্তু ডাক্তারটি নাছোড়। খুশির খুব ইচ্ছে চিকিৎসা করায়। ডাক্তারটি বেশ চটপটে আর ওর কথা শুনে মনে হয় কথার দাম আছে। কিন্তু খুশি জোর দিয়ে বলতে পারে না। পয়সা জোগাড় করবে কোত্থেকে ?

খুশি কি আমার ব্যাগের অন্তস্তল দেখতে পেয়েছিল ?

সন্ধ্যের গাড়িটা ধরতে হবে বলে আমি তাড়াতাড়ি গোটা দশেক টাকা খুশির হাতে গুঁজে পালিয়ে এসেছিলাম।

হ্যাঁ, স্বদেশ জীবনে আমারও উপকার করেছে। বাবা মারা যাবার পর আমাদের সম্পত্তি কী করে জ্যাঠামশায় দখল করে বসেছিলেন। জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে মামলা লড়তে হচ্ছিল, এদিকে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর পড়ার খরচ। তখন খুব টাকার অভাবে পড়েছিলাম আমরা। তখনো তিন ভাই পড়ছি। স্বদেশ মাসের পর মাস আমার খরচ জুগিয়েছে দুঃস্থ ছাত্রদের জন্যে চ্যারিটি শো ক'রে।

মাস কয়েক পরে নিজে দু-তিনটে চিঠি লিখে খুশির একটা চিঠি পেয়েছিলাম, কী একটা অপারেশন করবে বলে ডাঃ মিলন বিশ্বাস স্বদেশকে নিয়ে গিয়েছিল। আসলে কোন অপারেশন করে নি। সাতদিন স্বদেশকে রোজ কয়েক ঘণ্টা অজ্ঞান করে রাখত। স্বদেশ নিজেকে যত আহাম্মক, মূর্খ বা অজ্ঞান বলুক সত্যি সত্যি সে তা নয়। ওর স্নায়ুতন্ত্র অতীব স্পর্শকাতর। ডাঃ বিশ্বাস ওকে অন্তত কয়েক ঘণ্টা জাগতিক চিন্তার হাত থেকে রেহাই দিতে চেয়েছিল। তাতে সাফল্যলাভও করেছিল। স্বদেশ সাতদিন পরে বাসায় ফিরে কী ঘুমোতে লাগল। দিনরাত সকাল-বিকেল ঘুমোয়। তাতে ওর ক্ষিদে হল। ক্ষিদে আবার বাড়ল। এখন ও দু-তিন জনের সমান খেতে পারছে। কিন্তু এত খাদ্য কে জোগাবে ?

না, খুশি আমার কাছে কিছু চায় নি।

আমার কাছ থেকে চিঠির উত্তরও না।

তবু আমি স্বদেশকে উৎসাহ দিয়ে লিখেছিলাম। ও কয়েক সপ্তাহ পরে উত্তর দিয়েছিল। সেইটাই স্বদেশের সঙ্গে আমার শেষ যোগসূত্র। তারপর আর ওর কাছে চিঠি লেখার মুখ আমার থাকে নি। লোকের কাছে শুনেছি স্বদেশরঞ্জন আবার চতুর্গুণ উদ্যমে সঞ্জীবিত।

ওর চিঠিটা আমার জীবনের এক প্রচণ্ডতম আঘাত। অন্তত স্বদেশের কাছ থেকে যা কখনও আশা করি নি।

'দেবু,

এই চিঠি পেয়ে তুই জানবি যে অন্তত একজন তোকে চেনে—সে স্বদেশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। তোর কাছে সেদিন আমি বা খুশি কিছু চাই নি। কিন্তু তোর কাছে সাত হাজার আটাশ টাকা থাকা সত্ত্বেও তুই খুশির হাতে মাত্র দশটা টাকা দিয়ে গেলি। ঘেন্নায় ও-টাকা আমি ভিখিরিকে দিয়েছি। কারুর কাছ থেকে প্রত্যুপকার আমি আজও আশা করি না। কিন্তু আমি শত্রুকে শত্রু বলে আর মিত্রকে মিত্র বলে গ্রহণ করতে শিখেছি মিলনের চিকিৎসার পর। এতে আমার মনের জোর লক্ষগুণ বেড়ে গেছে। জিদ চেপেছে। বৈরাগ্যে কোন কাজ হয় না। লক্ষ্যভেদী তীব্র লিপ্সাতে দেখছি জীবনের গতি দুর্বার। সবারই জীবনের লক্ষ্য সহস্র, তীরও সহস্র, তীরের গতিও সুতীব্র। এই বোধ আমাকে খুশি করেছে। ইতি

স্বদেশ'

•

পরকলা

সুরজিৎ বসু

দুটো জানালা। একটা বাইরের, একটা ভেতরের। সে ভেতরের দিকে তাকাল।

গনগনে রোদে চারদিক লকলক করছে। মণ্ডপ আর বৈঠকখানা ঘরের লাল রঙ-করা টিনের চাল, পুকুরের শান-বাঁধান ঘাটলা, জেলাবোর্ডের লম্বা শাদা সড়ক, নিবারভাঙা পুল।

পুকুরের জলের উপরে মাছরাঙা। এখন এখানে, এখন ওখানে, এখন উপরে, এখন নিচে। এখন একেবারে স্থির। পোড়া আকাশের গায়ে চড়া রঙের ফোঁটা।

ঘাটলা থেকে হাত কয়েক দূরে চারকাঠির মাথা জলের উপরে নাক বের করে রয়েছে। পাশেই ছিপ রাখার দাঁড়। জলে বাঁকা ছায়া। এসব ঘিরে দুটো কাচপাখার ফড়িং।

ঘুঘু ডাকছে কাকদাসুন্দরী আম গাছের ভেতরে বসে। চারদিক খাঁ-খাঁ করছে।

ঘরের কালো সিমেন্টের চকচকে মেঝেতে মা ঘুমিয়ে, বালিশের উপর দিয়ে তাঁর চুলগুলো মেঝের উপর এলান। দক্ষিণের জানালার ফাঁক দিয়ে একরেখা সরু রোদ এসে পড়েছে ডান হাতের শাঁখা ছুঁয়ে। উপুড় করা গল্পের বই। মলাটে একটি সুন্দর মেয়ের মুখ।

আস্তে খাট থেকে নেমে পা টিপে টিপে এল ভেজান দরজার কাছে। দরজা খুলল। তারপর বারান্দা আর সিঁড়ি পেরিয়ে উঠোন, উঠোনে নেমে ভোঁ দৌড়।

ভোলাকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। সে ঠিক সঙ্গ নিয়েছে।

দাসেদের বাড়ির উঠোনে ধান শুকোতে দিয়েছে। তিন ভিটের তিন ঘরের দরজা বন্ধ। ঘুমোচ্ছে। বড় চৌচালা ঘরের উত্তর দিকের চওড়া বারান্দায় ঢেঁকিখোলা। ঢেঁকিটা নাক উঁচিয়ে রয়েছে গঙ্গাফড়িং-এর মত, যেন এখনি তিড়িং করবে। গর্তের মধ্যে দুটো ছাগলের বাচ্চা। ঢেঁকির ঠেকনা সরিয়ে নিলে আর দেখতে হবে না।

ভোলা এদিক-ওদিক করছে। রাস্তায়-রাস্তায় এরকম দাঁড়ানটা সে মোটে পছন্দ করে না।

লোচার ভিটের সরু একপেয়ে পথে এসে পড়তে গা ছমছম করে উঠল। গাছ, গাছ আর গাছ। দিনের বেলাতেও অন্ধকার-অন্ধকার। শ্যাওড়া গাছটার ডালে পাতায় জট পাকিয়ে আছে। গার গাছের ভেতরে ভেতরে অন্ধকার।

লোচারা ছিল চার ভাই, দুর্দান্ত ডাকাত। ওদের হাঁকে তালগাছের মাথার চিল-শকুন আঁৎকে উঠত, মেয়েরা ভরা কলসি ফেলে রেখে পালিয়ে যেত, লুকিয়ে পড়ত জঙ্গলে। আগে খুন পরে লুট, এই ছিল ওদের নিয়ম। তা, একদিন তাদের বুড়ি মা বলল কি, বাছারা, তোরা তো কোথায় কোথায় যাস, একা একা আমার সময় আর কাটে না।

মায়ের কথা শুনে চার ভাই ঠা-ঠা করে হেসে উঠল। সেই হাসির শব্দে দশ গাঁয়ের লোক মূর্ছা গেল, গাছের যত পাতা ছিল সব টুপটাপ ঝরে পড়ল, পাখির বাসায় যত ডিম ছিল সব ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল।

প্যাঁকাটির মতো হাত-পা, শণের মতো চুল। ডান হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে বাঁকা কোমরটা একটু টান করে ফোকলা মুখে বুড়ি বলল, 'না রে, হাসির কথা নয়। চার ভাই আমাকে চারটি লাল টুকটুকে বৌ এনে দে, আমি সুখে ঘর-সংসার পাতি।

চার ভাই একসঙ্গে বলল, 'বেশ, তাই হবে।'

সেদিন আকাশভরা মেঘ, দিন শেষ না হতেই চারদিক আঁধার করে এল। শ্রাবণ মাস, সারাদিন টিপটিপ বৃষ্টি ঝরছে।

নিরারভাঙা পুল পেরিয়ে যে বটগাছ, তার তলায় ছিল ওদের আস্তানা। চারদিকে সরু-মোটা ঝুরি, ভেতরটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে চার ভাই

ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে। তাদের কালো-কালো গা আর চুলের বাবরি বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তাদের সামনে ঝকঝকে চারটে রাম-দা ভিজে মাটি আর পচা পাতার উপর শোয়ান।

চার ভাই তো বসে থাকতে থাকতে অধৈর্য, এদিকে বেলাও আর বড় বেশি নেই।

সন্ধ্যের কাছাকাছি বৃষ্টিটা একটু ধরে এল। পশ্চিম আকাশের কিনারে কিনারে মেঘ চিরে চিরে একটুকুন লাল আলো চিকচিক করে উঠল, পাতার আড়াল থেকে ছোট্ট ছোট্ট সব পাখি তাদের শালুক-রাঙা ঠোঁট আর হলুদবরণ বুক নিয়ে বেরিয়ে এল। কোত্থেকে একটা কাঠবেড়ালি চার ভাইয়ের সামনের সেই চার রাম-দার উপরে এসে থমকে দাঁড়াল, হাত দিয়ে বার বার মুখ মুছল, মুখে নানান ভঙ্গি করল তারপর পলক না ফেলতে এক লাফে বটের ঝুরি বেয়ে কোথায় উঠে গেল।

তারপর যখন দিনেরও শেষ আর রাত্রিরও শুরু, সেই রাক্ষসীবেলায় চার ভাই দেখল এক সোনার প্রতিমা তাদেরই দিকে এগিয়ে আসছে। চার ভাইয়ের চোখে পলক আর পড়ে না।

পরনে লাল চেলি, কপালে লাল টুকটুকে সিঁদুরের ফোঁটা। গা ভর্তি গয়না আর সোনার নূপুর পায়, তার মাথায় সোনার ঘট।

বাতাসে একটি সুন্দর গন্ধ উড়িয়ে আনল। চার ভাই ভাবল, এ আবার কী? হঠাৎ মিষ্টি গলার গান ভেসে এল। চার ভাই ভাবল, এ আবার কী?

ওদিকে অন্ধকার আলো করে সেই সোনার প্রতিমা এগিয়ে আসছে। চার ভাই উঠে দাঁড়াল, বেরিয়ে এল বটের ঝুরির ভেতর থেকে। তাদের চোখে পলক আর পড়ে না, নিশ্বাস আর সরে না।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল মেয়েটি, এসে দাঁড়াল বটগাছের তলায়। চার ভাই এগিয়ে গিয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। তাদের হাতে সেই রাম-দা, রক্তে সেই মাতন, বলল, কে তুমি?

'আমি?' মেয়েটি হাসল। হাসিতে তার দোলনচাঁপার গন্ধ, চারদিক ভরপুর হয়ে উঠল। 'আমি হীরাবণিকের মেয়ে।'

'যাচ্ছ কোথায়?'

'যাচ্ছি? অ-নে-ক দূরে, শ্রীজ্ঞানের বিহারে।'

'বাক্ষুসি-টাক্ষুসি হবে বোধ হয।'

'নাবে, না, বাক্ষুসি হতে যাবে কেন? ও হীবাবণিকেব মেযে, চলেছে ভিক্ষুণী হতে। ভিক্ষুণী চিনিস তো?'

'খুব চিনি। ভিক্ষুণীব অধম সুপ্রিযা। তাবপব চাব ভাইযেব কী হল?'

আব চাব ভাই। তাবা দাঁড়িযে বইল তো দাঁড়িযেই বইল, তাকিযে বইল তো তাকিযেই বইল।

তেমনি গান গাইতে গাইতে বাতাসে দোলনচাঁপাব সুবাস ছড়াতে ছড়াতে মেযেটি অন্ধকাবে মিলিযে গেল। গানেব সুব আব ফুলেব গন্ধে চাবদিক চাঁদেব আলোব মতো ভবে উঠল।

তাবপব বাত কেটে দিন, দিন কেটে বাত এল। বর্ষাব পবে শবৎ, শবতেব পবে হেমন্ত এল, চলে গেল। যেমন ছিল, চাব ভাই তেমনি দাঁড়িযেই বইল। তাদেব ঘিবে বইল গানেব সুব আব দোলনচাঁপাব গন্ধ। দাঁড়িযে থাকতে থাকতে তাবা পাথব হযে গেল। শালুকবাঙা ঠোঁট আব হলুদববণ ছোট্ট পাখি নির্ভযে এসে তাদেব কাঁধে বসল, মাথায বসল।

এখনও তাবা তেমনি অপেক্ষা কবে আছে। মেযেটি বলে গিযেছে সে আবাব এই পথ দিযেই ফিবে আসবে।

সাবাদিন বৃষ্টি আব বৃষ্টি। এখনও সন্ধ্যেব কাছাকাছি যদি বৃষ্টি ধবে আসে, যদি পশ্চিম আকাশেব মেঘ চিবে একটুকুন লাল আলো চিকচিক কবে ওঠে, যদি পাখিবা গান গায, দোলনচাঁপাব গন্ধ যদি ভাসে বাতাসে, তাহলে—তাহলে এখনও সেই চাব ভাইকে সেই বটগাছেব তলায দাঁড়িযে থাকতে দেখা যায।

আব সেই বুড়ি, চাব ভাইযেব মা, তাব কী হল?

লোচাব বাগানেব বুনো বুনো গন্ধ। সে-গন্ধ গাছেবও নয, মাটিবও নয, ঘাসেবও নয, এ-গন্ধ বুড়িব চাপা নিশ্বাসেব। ছেলেদেব শোকে বুড়ি পাগল হযে গেল।

তা, হল কি, হব-পার্বতী যাচ্ছিলেন আকাশ দিযে। ববফেব বাজ্যি দক্ষিণে আসতেই পার্বতীব বুক ঠাণ্ডা। অবাক হযে জিগ্‌গেস কবলেন, প্রভু, এ এলাম কোথায? দুই দিকে দুই গভীব বন আব মধ্যিখানে শ্যামল খেতেব

ঢেউ। নদী তো নয সাতনবী হাব, কী নাম এমন দেশেব ? দাঁড়াও দাঁড়াও, দুচোখ ভবে দেখি।

এই না বলে পার্বতী পুবে তাকান, পশ্চিমে তাকান, দক্ষিণে তাকান। আশ আব মেটে না, চোখ আব ভবে না। শেষে বললেন, প্রভু, এত গভীব সবুজ কেন সাবাটা দেশ জুড়ে ?

মহাদেব হেসে বললেন, হবে না, এ যে হৃদয, ধবাতলেব হৃদয।

হঠাৎ পার্বতীব দুচোখ ফেটে নামল জলেব ধাবা, তিনি তাকিযে দেখলেন, লোচাব মা। পার্বতীব বুক উঠল হা-হা কবে। বললেন, প্রভু ওকে শান্তি দাও, ওব ছেলেদেব ফিবিযে দাও।

মহাদেব হেসে বললেন, তথাস্তু।

বুড়ি শিমুল গাছ হযে বেঁচে বইল।

সাবাটা বর্ষা বুড়ি অঝোবধাবায কাঁদে, তাবপব ফাল্গুন মাসটি যেই এল, শুকনো পাতা উড়ল গবম হাওযায—বুড়িব বুকেব বক্তও ডালে ডালে জমে উঠল থোকায থোকায। চৈত-পুজোব ঢাকেব শব্দে বুড়িব ত্বব আব সয না, প্রাণ আব মানে না, সে বুকফাটা মাঠেব উপব দিযে হা-হা-কবা হাওযাব সঙ্গে পাল্লা দিযে ছোটে। তাব শাদা চুলেব ভেতবে ভেতবে ছোট্ট এইটুকুন এক তাবিজ, এইটুকুন এক আশা খাল-বিল-মেঘনা-ধলেশ্ববী-পদ্মা আব গঙ্গা-টঙ্গা পেবিযে বুড়ি কোথায কোথায যে যায, ছেলেদেব খোঁজে—কেউ তা জানে না।

সে এবাব বাইবেব দিকে তাকাল।

ট্রাম-লাইনেব পাশে একটা ব্রেক-ডাউন-হওযা বাস পোড়াবোদ পিঠে নিযে দাঁড়িযে বযেছে।

সীমালেখা

প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়

তিস্তার বাঁকে আমার নৌকো ধাক্কা খেল। ছইয়ের ওপর টাল সামলাতে আমি একটা লগি ধরে ফেললাম। রাজাভাত-খাওয়ার পর নানা ভাবে এসে এইবার আমি লুকিয়ে নৌকোয় চড়েছি। মাইল তিনেক নৌকো চলার পর অন্ধকার এলিয়ে পড়েছে। নদীর পশ্চিমে আকাশ এতক্ষণ লাল ছিল। সন্ধ্যে উপচে অন্ধকার গড়িয়ে গড়িয়ে লাল দিকটায় ছড়িয়ে পড়ল। মাঝি বলল, বাবু হাট, ওই পুখে—তেলকল পুক্ পুক্ শব্দ করছে। আমি নৌকো থেকে নামলাম।

তেলকলের শব্দ শুনে আমি এগুচ্ছি। আমার শরীর ভীষণ ক্লান্ত। এতক্ষণ আমার ভয় ছিল, এখন আমি বেপরোয়া। যা হবার হবে। হাঁটতে হাঁটতে আমি যে গ্রামে ঢুকলাম, নাম দেবীগঞ্জ। আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। আমি নিজের গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। আমি খালেকমিঞার দোকানে কাজ করতাম, দোকান ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। পাশের গ্রামে আকাশ তখন আগুনে লাল হয়ে ছিল। আমি অন্ধকারে পালিয়েছি। গোজুর মা বলত—তুই হেঁদুর ছাওয়াল।

খুব ছোটবেলায় খালেকমিঞা আমায় কুড়িয়ে পেয়েছিল। আমি শুনেছি। তখন গোজু হয় নি। তারপর হল। বড় হল। আমি দোকানে বসে দেখতাম। ভাবতাম। মনে হত আমি হিন্দু। খালেকমিঞাকে চাচা বলি। ও আমার কেউ নয়। আমার বয়স তখন আঠারো। ইচ্ছে হত দোকানে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যাই। মনে মনে চাচার ওপর রাগ ছিল। একদিন চিটেগুড়ের টিন ছুঁড়ে আমার কপাল কেটে দিয়েছে। একটা ভাঙা

আয়নায় মুখ দেখতাম। কাটা দাগটা চোখে পড়ে। গোজুব মা ভাল। আমার ভাত গরম রাখত। রাত্রে দোকান বন্ধ করতে দেরি হলে বকত।

মাঝে মাঝে আমি দোকানে বসে ভাবতাম—গোজুর মা আমাব কে! আমার সন্দেহ হত আমি হিন্দু, না মুসলমান। বুঝতে পারতাম না। আমার মা কে? বাবা কে?' কেমন সব গণ্ডগোল হয়ে যেত। কত হিন্দু, পাশের গ্রাম থেকে এসে আমাদের দোকানে সওদা করত—আমি তাকিয়ে তাকিয়ে চেনবার চেষ্টা করতাম ওরা হিন্দু। আমার মনে কিছুই হত না। কিন্তু অনেক দিন পর হঠাৎ একদিন আমি খালেকমিঞার ওপব রাগ করে চিৎকার করে বলে উঠলাম, আমি হিন্দু—তোমার বাড়ির ভাত আমি খাব না। কিন্তু গোজুর মা লুকিয়ে ভাত পাঠাত। তখন চারিদিকে বিশ্রী অবস্থা আরম্ভ হযেছে। আমার মন ভীষণ খারাপ। একদিন গোজু ভাত নিয়ে এসে বলল— দাদা, তুমি আজ অন্য গ্রামে পলাইয়া থাক। পরে আসবা, মা কইছে।

আমি দোকান ছেড়ে পালাবার জন্যে যখন বেরিয়েছি, তখন পাশেব গ্রামের আকাশ লাল। চিৎকাব থেমে গেছে।

হঠাৎ একটা চিৎকারে আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। আমি ভুলে গেলাম দেবীগঞ্জ গ্রামে ঢুকছি। মনে পডল আমি দেবীগঞ্জ গ্রামে হাঁটছি। এখানে ভয় নেই। আর শরীর ক্লান্ত, পেটে ভাত নেই—ভয আসছে না।

আমি হাঁটছি গাছপালাব নিচ দিযে। মাঠের ওপর দিয়ে এগিযে আসছি। কিছু টিনের চালা চোখে পডল। ছইফেলা গরুর গাডি এক জাযগায কতকগুলো দাঁড়িয়ে। বুঝলাম কাছেই হাট।

দুটো দোকানের মধ্যে দিয়ে হাটে ঢোকার একটা সরু পথ। কাদার জন্যে ইঁট ফেলা। ইটের ওপর পা দিযে দিযে হাটে ঢুকলাম।

হাট বড মনে হল। প্রায দোকানের সামনে কুপি জ্বলে উঠেছে।

কেউ জিনিসপত্তর গোটাচ্ছে, আবার কোন দোকানী পা ছড়িযে লম্বা থলিতে হাত ঢুকিয়ে পযসা গুনছে। হাটের হট্টগোলেব মাত্রা মধ্যম।

আমি কিছু চিঁড়ে গুড কিনে একটা কাপডের দোকানের সামনে বাঁশের মাচায় বসে খেলাম। বেঞ্চিটা বেশ ভাল। রাত্রে এইখানেই কাপড ঢাকা দিয়ে শুয়ে পডব। ভোর হলে দেখি কোথায় যাই। গোজুর মা হযত আমার জন্যে ভাত বেঁধেছিল। গোজু হয়ত অনেক বার দেখে বলেছে, দাদা ফেরে

নাই। খালেক মিঞা গোজুর মাকে বকত। ওর আশকারায় নাকি আমি খারাপ হয়ে যাচ্ছিলাম। আমি পালিয়ে আস্রাতে খালেকমিঞা গোজুব মার ওপর আরও চটবে।

চিঁড়ে খেয়ে গলাটা শুকিয়ে গেছে। জলের খোঁজে খুঁজতে খুঁজতে হাটের একপাশে শান-বাঁধান একটা কুয়ো দেখলাম। কুয়োর পাড়ে এক বুড়ো হুঁকোয় জল ভরছে। হেসে বললাম—চাচা, একটুক পানি দিবা তল্লা করুম।

বুড়ো আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাল। —কোন্ গ্রাম ·· ? নয়া আদমি জানি···?

আমি থতমত খেয়ে গেলাম। হাসি মিলিযে যাচ্ছিল। হাসি আবার কোন রকমে মুখে টানলাম। —হ চাচা, নযা···দাও পানি তল্লা করি। সওদা করতে আসছিলাম, দেরি হইছে অনেক।

কাপড়ের দোকানের সামনে রাত্রি কাটাবাব চিন্তা উবে গেল। সেই রাত্রে হাট ছেড়ে হাঁটতে আবম্ভ করলাম। মাঝের একটা দিন বড কষ্টে কাটল। কত অজানা মানুষ-জায়গা পেরিয়ে আমি চলছিলাম গ্রাম এড়িযে। পথ দূরে রেখে আমি মাঠ আর জঙ্গলের পথে এতটা পথ হেঁটে এসেছি। পা কেটে গেছে। কাপড়ে কাদা লেগেছে। কাপড় ছিঁড়েছে। আর চলতে পারছি না। কোথায় বসেছি, জামায কাদা লেগেছে। আর ভয় নেই। পেটে দারুণ খিদে। একটা গ্রামে ঢুকে পড়েছি। চলতে আর পারছি না। ও কাছে কি! একটা ভাঙা মন্দির চোখে পড়ল। শরীরটাকে কোনরকমে ঠেলতে ঠেলতে মন্দিরের নড়বড়ে সিঁড়ি দিযে ওপরে উঠলাম। কালো রঙের কুকুর শুয়ে ছিল। প্রথমটা ভয় পেয়ে পালাল, তাবপর চিৎকার করে তেড়ে এল। আমি নির্বিকার। আমার কোন ভয নেই। কুকুরটা এগুলো না, দূরে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করছে। আমি একটা চাদব বিছিযে নিয়ে বড নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়লাম। পেটের মাঝখানে একটা ব্যথা উঠেছে। নাবাদিনে চার পয়সার মুড়ি ছাড়া কিছু খাওয়া হয নি। চারিদিক অন্ধকার। কাছে পুকুর আর ঝোপ। ওইখান থেকেই একেকটা শব্দ আসছে। কিছুক্ষণ পর শব্দ আর শুনতে পেলাম না। ঘুমিযে পড়লাম।

স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুম ভাঙল। তখন চারিদিকে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। মুখের ওপর রোদ পড়ছিল। মনে হল, সকাল অনেক গড়িয়েছে। এদিক

ওদিক তাকালাম। মন্দিরের ভাঙা খাঁজে কালো পায়রার দল বসে। রাস্তা দিয়ে একজন লোক যেতে যেতে দাঁড়াল। মাটিতে হাত রেখে কপালে জিভে ঠেকাল। কানে হাত দিল, নাক মুলল। মনে হল, আমাকে দেখে একটু চিন্তায় পড়েছে। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। লোকটা চলে গেল। কোথায় গেল? কালকের কুকুরটা রাস্তা ধবে ওই গ্রামের মধ্যে ঢুকছে। ওরা যাচ্ছে। আমি কোথায় যাই!

—এই ছোঁড়া, তুই কে! একটি মধ্যবয়স্ক লোক সাজি হাতে মন্দিরে উঠছে।

—সকালে যাবার সময় দেখলাম ঘুমুচ্ছিস—আঃ, তুই কে? কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

আমি প্রথমে বুঝতে পারি নি। তাকিযে আন্দাজ করলাম ব্রাহ্মণ। পূজো করে। আমার মুখ দিয়ে বেরিযে গেল দেবীগঞ্জ।

—দেবীগঞ্জ। সে ত পাকিস্তান।

আমি ভয পেলাম। তাহলে আমি হিন্দুস্থানে ঢুকে পড়েছি। কখন আমি হিন্দুস্থানে ঢুকে পড়েছি! এতক্ষণ তো কোন তফাত বুঝতে পারি নি। বললাম—হ্যাঁ। পাকিস্তান।

ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করল। কোন্ জাত?

বললাম—হিন্দু।

—হিন্দু তো বটেই—না হলে রাতে পাকিস্তান পেরিযে ভারতে ঢুকে পড়েছ। বলি মুচি হাড়ি নাকি? ব্রাহ্মণ একটু এগিযে এল।

আমি চুপ করে রইলাম। জাত আমার জানা নেই। আমি হিন্দু, না মুসলমান তাই আমি জানি না। খুব ছোটবেলায় খালেকমিঞা কুড়িয়ে পেযেছিল। হযত গোজুর মা জানত, তাই আমায সেদিন পালিয়ে যেতে বলেছিল। খালেকমিঞাকে আমি চিৎকার করে বলেছিলাম, আমি হিন্দু। সোনামিঞা বলেছিল—হ্যাঁ, ও হিন্দু। আমার মনে হত আমি হিন্দু। বললাম, জাত আমি জানি না। ছোটবেলায় খালেকমিঞার বাড়িতে মানুষ হযেছি;

ব্রাহ্মণ শুনতে পেল কিনা জানি না। মন্দিরে ঢুকে ফুল বেলপাতা সবাতে লাগল। দেখলাম বেছে বেছে পযসা বার করে সাজিতে রাখছে। ফুল বেলপাতাব মধ্যে যে-পয়সাগুলো পড়েছিল গুণে গুণে বের করে নিল।

তারপর বেরিয়ে এসে আমার দিকে তাকাল ।—আমাদেব সাতপুরুষের মন্দির। মন্দিরেব পুজোর ভার আমাদের ওপর আজ কতকাল থেকে চলে আসছে··· আগে কত ঘটা করে শিবরাত্রির দিন পুজো হত। হ্যাঁ, তুমি আর মন্দিরে পড়ে থাকবে না·· হ্যাঁ, আমি চলি এবার···। ব্রাহ্মণ চলে গেল। মন্দিরের সিঁড়িতে ইটের শব্দ হল।

আমি মন্দির থেকে নামলাম। বড খিদে পেয়েছে। গ্রামের মধ্যে যদি কিছু পাওয়া যায়। ঘুরতে ঘুরতে একটা দোকানে এসে দাঁডালাম। দেখি, দু-আনির মুডিমুডকি দাও তো।

মুডিমুডকির ঠোঙা হাতে নিযে দোকানীকে পয়সা দিলাম। পয়সা দেখে দোকানী আমার দিকে তাকাল। এতো পাকিস্তানের পযসা।

তাই তো, আমার পযসা পাকিস্তানের। আমার খেয়াল নেই। আমি কখন কিভাবে হিন্দুস্থানের হযে গেলাম বুঝতে পারছি না। আমি তো আমার সেই গ্রামেই দাঁডিয়ে আছি। এই মাটি—মাথার ওপর রোদ, চারদিকে গাছগাছালি। ওই তো গরু চরছে—পুকুরে হাঁস···। নতুন কিছু নেই। কিন্তু পয়সা চলবে না। ঠোঙা ফেরত দিযে দিলাম। আমার কান্না পেল। আবার হাঁটতে হাঁটতে মন্দিরে এসে উঠলাম। গাছের আড়ালে কর্কশভাবে কাক ডেকে উঠল। মাথা দপ্‌দপ্‌ করছে। কানে এল কে ভোলা ভোলা করে ডাকছে।

গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে একটা কুকুর ছুটে গেল। হয়ত ওব নাম ভোলা। কেউ পাতের ভাত দেবার জন্যে ডাকছে। গোজুর মা হযত আজও আমার জন্যে ভাত বেঁধেছিল।

মুঠোর মধ্যে পয়সা। ঘামছে। গরুর গম্ভীর ডাক দুপুরের আকাশ চিরে কানে আসছে। বড রোদ। মন্দিরের থামে ঠেস দিযে বসে পডলাম।—তাই তো, মন্দিরেব ভেতরে খুঁজলে যদি আর কিছু পয়সা পাওয়া যায় —ব্রাহ্মণ হয়ত সব খুঁজে পায় নি। আর উঠতে ইচ্ছে করছে না।—পায়ে বড ব্যথা। শরীর অবশ।

খুঁডিয়ে খুঁডিযে মন্দিরে ঢুকলাম। ফুল বেলপাতা সরাতে লাগলাম। একটা পযসাও চোখে পডল না। নিচের ফুল বেলপাতা পচে গন্ধ বেরুচ্ছে। আমি ক্ষেপার৽ মত খুঁজতে লাগলাম। বাইরে কি শব্দ হল। আমি চমকে

পেছনে তাকালাম। কিছু নয়, একটা গরু এসে দাঁড়িয়েছে। শিবের মাথায় একটা ফুটো হাঁড়ি থেকে জল পড়ছে—ফোঁটা ফোঁটা। জল একটা সরু নল দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাবার রাস্তা। আমি নলে হাত দিয়ে খুঁজতে লাগলাম —হ্যাঁ, পেয়েছি। নিজেকে শোনাবার জন্যেই যেন বলে উঠলাম। পয়সা। কতকগুলো পয়সা পেলাম। হিন্দুস্থানের পয়সা।

বিকেলে একটা পুকুরধারে বসে থাকতে ভারি ভাল লাগছিল। গোজুর কথা মনে পড়ল। ওর মার কথা মনে পড়ল। আমি চাচী বলতাম। রাগ হলে বলতাম গোজুর মা এবং বাইরের লোকের সামনে বলতাম গোজুর মা। —আমি কি হিন্দু? আমি হিন্দু নই। তাহলে মন্দির থেকে পয়সা নিয়ে খেলাম কেন! আমার মন কেমন যেন হয়ে গেল।—আমি মন্দিরের দিকে ছুটলাম। কিন্তু আমার ভীষণ খিদে পেয়েছিল বলেই পয়সা নিয়েছিলাম। মন্দিরে উঠে আমার পকেটে পাকিস্তানের যা পয়সা ছিল ছড়িয়ে ফেলে দিলাম। মনটা হাল্কা হল।

আমি মন্দিরের গায়ে ঠেসান দিয়ে বসলাম। তখন মুড়িমুড়কি যে ঠোঙাটায় দিয়েছিল পকেটে মুড়ে রেখে দিয়েছিলাম। ওইরকম ফালি ফালি কাগজ আমি পড়ে ফেলি। খালেকমিঞার দোকানে যখন খদ্দের থাকত না, আমি বসে পুরনো খবরের কাগজ ঘেঁটে ঘেঁটে অনেক খবর পড়তাম। কাগজটা পকেট থেকে বার করলাম। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। তাই পুরনো কাগজের লেখা পড়তে আরও অন্ধকার হয়ে এল। একটা জোনাকি আমার জামার ওপর উড়ে কখন যেন বসেছে। রাত্রি আরও ধীরে ধীরে কখন এগিয়ে এল বুঝতে পারলাম না। আমি সমস্ত শরীরমুখ ঢেকে মন্দিরের বারান্দায় শুয়ে পড়লাম। সকালবেলা ব্রাহ্মণের ডাকে ঘুম ভাঙল।

প্রথমে বুঝতে পারলাম না কতকগুলো পয়সা দেখিয়ে ব্রাহ্মণ কী বলল।

—এই পয়সাগুলো তুই মন্দিরে দিয়েছিস? এইসব পাকিস্তানের পয়সা, চলে?

আমি তাকিয়ে বুঝতে পারলাম। হেসে বললাম—হ্যাঁ।

—এই পয়সা এইখানে চলে? এ তো পাকিস্তানের পয়সা!—যা, হাযাতের দোকান থেকে বদলে নিয়ে আয়। ও পাকিস্তানের পয়সা বদলে দেয়—কিছু কেটে নেবে অবশ্য—এনে বাবার মাথার কাছে রাখবি—ওইভাবে ছড়িয়ে ফেলবি না। ব্রাহ্মণ পয়সাগুলো আমার হাতে দিল।

আমি অনেক খুঁজে হায়াতের দোকানে এলাম। দোকান খুব বড নয়। তবে সব জিনিস আছে। চাল ডাল তেল নুন পান বিড়ি কলা বিস্কুট লোহা লক্কড সবই আছে। তাছাড়া হিন্দুস্থান পাকিস্তানের পয়সা বদলের কারবারও আড়ালে আছে। দেখে মনে হল হাযাত বুদ্ধিমান।

হায়াত খানিকক্ষণ আমায় ভাল করে দেখে নিল। বলল,—এ পয়সা পেলে কোথায়?

আমি ওকে সব কথা বললাম। ও পয়সাগুলো বদলে দিল। বলল—পরে এস, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

কিছুক্ষণ পর, আবার হায়াতের দোকানে গেলাম।

বলল, তুমি তো পাকিস্তানে মুদিব দোকানে কাজ করতে।

—হ্যাঁ।

—এখানে কাজ করবে?—তবে মাইনে দিতে পারব না।

—করব। আমার খুব আনন্দ হল। বললাম,—কেন করব না।

—খাওয়া থাকা দেব।—এই দোকানে থাকবে। খাবে আমাদের বাড়ি।

—না।

—হায়াত আমার দিকে তাকাল।—না?

—আমার চাল ডাল দিয়ে দেবেন। আমি নিজে রান্না করে খাব।

হায়াত হাসল, আচ্ছা নিজেই রান্না ক'রো।

আমি মনে মনে ঠিক করলাম, আমি হিন্দু। আর মুসলমানের বাডি খাব না। আমি নিজেই রান্না করে খাই। হায়াতের দোকানে কাজ করছি একমাস হয়ে গেল। হাযাতের বাবা কিছুক্ষণ আগে তামাক খাবে বলে টিকে নিয়ে গেছে। আমি দোকানের কাজ শেষ কবে বাইরে বসে রান্না করছি। ভাতের ঢাকা সরিয়ে দেখছিলাম। আবার পেছনের পুলের ওপর শব্দ হল। দোকানের কিছু অংশ পুকুরের ওপর। দোকানেব পেছনে ছোট্ট কাটা দরজা দিয়ে হাযাতরা বাগান পেরিয়ে দোকানে ঢোকে।

কেউ পেছন দিয়ে ঢুকলে বাঁশের পুলটা মচ্‌মচ্‌ করে ওঠে। শব্দ হতে আমি তাকিয়ে দেখলাম একটা মেয়ে ঢুকছে। আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। হায়াতের বোন। দূর থেকে কযেকবার দেখেছি। খুব সুন্দর দেখতে। কিছু না বলে তাক্‌ থেকে সুপারির টিন নামাতে গিয়ে পাশের

একটা ছোট টিন ফেলল। নিজেদের দোকান বলে আমাকে কিছু জিগ্‌গেস করা প্রয়োজন মনে করল না। আমার রাগ হল। টিনটা পড়ে যাওয়াতে উঠে এগিয়ে এলাম। বললাম, কী দরকার আমায় বলুন।

আমার গলার স্বর স্বাভাবিক ছিল না। মেয়েটা চুপ করে রইল। বললাম, যদি সুপারি লাগে নিয়ে যান। আমি টিনটা কুড়িয়ে আবার তাকে রাখলাম। বাইরে বেরিয়ে এলাম। ততক্ষণে মেয়েটি পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে। সুপারি নিল কিনা কে জানে। কথাটা হয়ত কড়া করে বলে ফেলেছি চিন্তা করতে লাগলাম।

ওকে দেখে আমার বুকটা কেঁপে উঠেছিল। দেখতে কিন্তু সুন্দর। ও তো কোনদিন বাইরে বের হয় না। হয়ত ওর মা পান খায়, সুপারি নেই, তাই আনতে বলেছে—কি জানি। হায়াত তো বাড়ি নেই। কোথায় যেন গেছে। কালও থাকবে না, সওদা করতে গঞ্জে যাবে।

আমার রান্না হল। ভাত ডাল আলুভাতে আর পেঁয়াজ। খাওয়া শেষ করে থালা মেজে তুলে রাখলাম। সব ঠিক করে রেখে, অর্ধেক-ফেলা ঝাঁপ ফেলে দিলাম। বাঁশ সরিয়ে মাচার নিচে রাখলাম। তারপর যথারীতি টিন সরিয়ে বস্তা বিছিয়ে মাচার ওপর কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

অনেকদিন পর একদিন শিব-মন্দিরে গিয়ে বসলাম। হায়াতকে বললাম আমি কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুরে আস্‌ছি।

আমি মন্দিরে গিয়ে বসলাম। মন খারাপ। এখানে আর ভাল লাগছে না। হায়াতের বোনকে সেদিন কলাগাছের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমাকে দেখে ভেতরে চলে গেল। হয়ত সেদিনের কথা তখনও মনে ছিল। আজ মন ভাল নেই। চাচী হয়ত অনেকদিন আমার অপেক্ষায় থেকে আশা ছেড়ে দিয়েছে। আমার মাঝে মাঝে চলে যেতে ইচ্ছে হয়। সেদিন পাকিস্তান সীমানার কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদিকের গাছপালা দেখলাম। মন্দিরে কতক্ষণ বসেছিলাম খেয়াল নেই।—একি, সন্ধ্যে হয়ে গেছে! উঠে চলে এলাম।

হায়াত আমায় খুব বিশ্বাস করে। দোকানের সব ভার দিয়ে সওদা করতে অনেক দূরে যায়। দোকান চালাতে আমার কোন ভুল হয় না।

একদিন কানে এল—মমতাজ। হায়াতের বোনের নাম।

আজ আবার মমতাজ আমার দোকানে ঢুকেছে। বেশ রাত। আমি রান্না চাপিযেছি। হাটবার ছিল, তাই খদ্দেরের ভিড়ে দেরি হয়ে গেছে।

টিনের ওপর দুটো ডিম রেখে মমতাজ চলে গেল। বুঝলাম আমি রান্না কবছি, তাই ওব মা হয়ত পাঠিয়ে দিল।

কিন্তু মতালেব সেদিন কথায় কথায বলল, মমতাজের মার তো মাথা খারাপ। হাযাতের গরু চরায় মতালেব। আব দোকানে এসে বিড়ি খেতে খেতে মাঝেমধ্যে আমার সঙ্গে গল্প করে। মমতাজ ডিম দিযে গেল। আমার কেমন অবাক লাগতে লাগল।—না, ওব বাবা হয়ত পাঠিয়েছে।—কিন্তু বাবা তো…। থাক…।

মাথায় নানা চিন্তা ঘুরতে লাগল। ভাবলাম মমতাজকে জিগ্‌গেস করি। কিন্তু মমতাজ ততক্ষণে পেছনের দরজা দিয়ে পায়ে পায়ে আলের পথ দিয়ে কলাগাছের ওদিকে চলে গেছে। ও আড়াল হযে গেল।

ওদিকে কাঁঠালগাছেব ডালপালার ভেতর দিয়ে ওদের বাড়ির টিন নজরে পড়ে। আমি মাঝেমধ্যে তাকিয়ে থাকি। হায়াত আজকাল বলে, এত অন্যমনস্ক হযে যাচ্ছ কেন।

আমি সত্যি কথা বলতে পারি না। বলি—কই, না তো।

আবার দুপুরে মমতাজকে দেখলাম কলাগাছের পাতা কাটছিল। মুখে একগোছা চুল পড়েছে। কাটারি দিয়ে কলাপাতা কাটছে। কাটারি হাত থেকে পড়ে গেল। ওর বাবা দাঁড়িয়ে না থাকলে আমি গিযে পাতা কেটে দিতাম হয়ত। কেন আমি মমতাজকে সাহায্য করতাম! মমতাজ আমার কথা ভাবে তাই। মমতাজ মুসলমান। আমি।—হিন্দু। আমি নিজের হাতে রান্না করি ও জানে।—ওদের বাড়িতে আমি খাই না। মমতাজ নিশ্চয় জানে।—আচ্ছা, আমি যদি…থাক ও কথা। মমতাজ ভালো।

আমার একটু জ্বর-জ্বর ভাব হয়েছে—কাল থেকে। মন দিয়ে দোকান করতে পারছি না। হায়াত থাকলে বলতাম—দোকান আপনি দেখুন, আমি একটু বাইরে বসে থাকি। আমি চমকে উঠলাম। বুকটা ধড়াস করে উঠল। দোকানের ছোট দরজা দিয়ে মমতাজের মুখ দেখতে পেলাম। শুধু কানে ধীরে ধীরে এল, চা-পাতা।

মমতাজ চা-পাতা চাইতে এসেছে। আমার হাত একটু কেঁপেছিল।

আমি উঠে একটা কাগজে চা ঢেলে দিয়ে ওর দিকে একটু তাকিয়েই চোখ নামালাম।

ও আমার হাতের দিকে তাকিযে আছে। আমি পুলের মচ্ মচ্ শব্দ শুনলাম। তাকিযে রইলাম। মমতাজ চলে যাচ্ছে। বড তাডাতাডি কলাগাছের আডালে মমতাজ অদৃশ্য হযে গেল। আমি আবও কয়েক মুহূর্ত ওইদিকে তাকিযে তারপর এসে বাইরের বেঞ্চিতে বসলাম। কতকগুলো মুর্গিব বাচ্ছা মায়ের পেছন পেছন ঘুরছিল। আমি ওইদিকে আবার তাকালাম। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। দু-একজন খদ্দের আসছে যাচ্ছে। তাই দোকানে গিযে বসলাম। মমতাজ একটা কলাইকবা গেলাস হাতে ওই দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, চা। আদা দেওযা আছে।

আমি থতমত খেয়ে গেলাম। হাত বাডিয়ে নিলাম। আমার হাত ওর হাতে লাগল। মমতাজকে কী যেন বলব বলে দরজা দিয়ে মুখ বাড়ালাম। মমতাজ তখন কলাগাছের ওদিকটায চলে গেছে। ওদিকে কাঁঠালগাছের অন্ধকারে আমি দেখতে পেলাম না।

গেলাস আমার হাতে। একজন খদ্দের দাঁডিয়ে। আমার মন তিব তির করে কাঁপছে। কেমন এক আনন্দে আমার ভীষণ কান্না পেল। চোখে আমি ঝাপসা দেখছি। চিমনি পরিষ্কার নেই। কালি পডেছে। রাত্রি সময় পেরুতে ব্যস্ত। অন্ধকার ঝিঁঝি পোকার ডাকে কাঁপছিল। আমি দোকানের ঝাঁপ ফেলে শুয়েছিলাম। আজ রাঁধতে ইচ্ছে হল না। খেতে ইচ্ছে হল না। একেকবাব একেকটা চিন্তা এসে আমায় ঘুমুতে দিচ্ছে না। দোকানেব ভেতব একটা জোনাকি কি করে ঢুকে পডেছে। ঘুবছে, বসছে আবাব ঘুরছে। বাঁশের পুলে যেন একটা পরিচিত শব্দ শুনতে পেলাম। আমি বললাম,—কে? কেউ সাডা দিল না। বাঁশের পুলটা মচ্‌মচ্ কবে উঠল।—কে। মমতাজ। আমি শুনতে ভুল করেছি। কেউ নেই। অন্ধকার! ইঁদুর কুট্‌কুট্ করে কী কাটছে, তাই শব্দ উঠছে।

সে রাত্রে পুলের ওপর শব্দ হয়েছিল কিনা জানি না। তারপর মমতাজ আর আসে নি। অনেকদিন হয়ে গেল মমতাজকে আর দেখতে পাই না। দোকান করার ফাঁকে কলাগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি। ইচ্ছে হয় হায়াতকে জিগ্‌গেস করি মমতাজ কোথায়। মতালেব বলল, মমতাজ মামার

বাড়ি গেছে। কেন গেল ? কবে ফিরবে ?—জানি না। হায়াত অনেক সময় আমাব দিকে তাকায়। কিছু বলে না।

হঠাৎ একদিন ঘুম করে বুড়োকে জিগ্‌গেস করে বসলাম, মমতাজকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন কেন !

দূরে মাঠে গরু চবছে। তার পেছন পেছন একটা বক ঘুরে ঘুরে কি যেন ধরে ধরে খাচ্ছে। আমি তাই দেখতে দেখতে হঠাৎ বুড়োকে জিগ্‌গেস করে ফেললাম।

বুড়ো আমার দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন আমি ভীষণ অপরাধ করে ফেলেছি। কোন জবাব দিল না। হায়াতকে আব জিগ্‌গেস করলাম না। একজন খদ্দেরকে তেল বেচতে গিয়ে বোতল গডিয়ে অনেকটা তেল চোঁযাতে লাগল। অন্যদিন এক ফোঁটা তেল গায়ে লাগলে আমি মুছে নিতাম। আজ কোন দৃষ্টি দিলাম না। একটা অচল চার-আনি নিয়ে বসেছি। কি করব ভেবে পাচ্ছি না। দোকানের টিন রোদের তাপে তেতে উঠেছে। তাকিয়ে দেখলাম কলাগাছের ছায়ায় মুর্গির বাচ্ছাগুলো বসে। বাচ্ছাগুলো অনেক বড় হয়েছে। সংখ্যায় অনেক কমেছে। একটা কাক তার মুখে করে র'সে। বাসা বাঁধবে।

রাত্রে বৃষ্টি পড়ছিল। টিনের চালে বৃষ্টি পড়ার শব্দে পাকিস্তানের কথা মনে পড়ল। চাচী একদিন বলেছিল, ছালাটা মাথায দিয়া আসন যায় না—পানিতে গাওডা তেনা হইছে, জ্বরে পরলে বুঝবা।—চাচী আমায় ভালবাসত। গোজু আমায় ভালবাসত।—আমি ফিরে যাব। আমি চলে যাব। কিন্তু শুয়োরের বাচ্ছা খালেকমিঞা আছে। আমি হিন্দু। কিন্তু আমি যদি মমতাজকে বিয়ে করি। মমতাজ কোন্ জাত। ঠোঙায মুড়ি নিয়ে তেল মাখলাম। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। মমতাজ একদিন বলেছিল, আমাদের পাক খান না কেন ?

মমতাজকে যদি পাই, বলি তোমার হাতে সব খেতে পারি। মমতাজের গাযে চাঁদের আলো পড়েছিল। আলো যেন সরতে চায় নি। আজ অন্ধকার বৃষ্টির ঝাপটা বাঁশের বেড়ায লেগে অন্য রকম শব্দ হচ্ছে। কুচো কুচো জল এসে দোকানেও ঢুকছে। সেদিন হযত মমতাজের যাবার ঠিক হয়েছিল। তাই কলাগাছের কাছে দাঁডিয়ে আমায় ডেকেছিল। ও চলে যাবে আমি

বুঝতে পারি নি। ও মামার বাড়ি যাবে আর ফিরবে না আমি ভাবতে পারি নি।—ঠোঙায় কিছু মুড়ি ছিল। ঠোঙাটা মুড়ে বাইরে ফেলে দিলাম।

সকালবেলা কতকগুলো কাক ঠোঙা নিয়ে কাড়াকাড়ি করল।

হায়াতকে বললাম, আমি আর রান্না করব না। আপনাদের বাড়িতেই খাব। হায়াত হাসল। বলল, আমি তো আগেই বলেছিলাম। ঠিক আছে, আমি মতালেবকে বলে দিব। হ্যাঁ, আমরা সাতদিনের জন্য বাইরে যাব—তুমি ঠিক করে দোকান দেখবা।

দোকান ছেড়ে হায়াত একসঙ্গে এতদিন বাইরে থাকে না। কোন কথা বলল না। আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গেল।—কোথায় যাবে। মমতাজকে নিয়ে আসবে তো। সন্ধ্যায় মতালেব যখন বিড়ি খাবার ইচ্ছে জানাল, তখন দোকানে ভিড়। অনেক পরে মতালেবকে জিগ্‌গেস করলাম—হায়াত ভাই কোথায় যাচ্ছে।

—ও, তুমি জান না! মতালেব বিজ্ঞের মত মুখ করল। —মাদারিহাট। শাদি মমতাজের। এই সেদিন আমার সামনে হল—আর আজ শাদি—আজব দুনিয়া। হাঁ, দামাদ ভালো বড় আমির···আছে···।

মতালেব আরও কিসব বলল। আমার ইচ্ছে হল বলি—মতালেব ভাই, তোমায় আর বলতে হবে না। এমন একটা ভয় আজ সকাল থেকে কি জানি কেন আমার মনে চেপে বসেছিল। খদ্দের কী চাইছে! মতালেবের গলা শুনতে পেলাম। আমার চোখের সামনে ঝাপসা। মনে হল জুনেদ। কী নেবে?

শুনলাম আমাকে ঠাট্টা করল। তুমি কি নতুন হলে আজ।

কথা যাতে বলতে না হয় তাই আমি হাসলাম। কী নেবে? বলতেই আমি বুঝলাম আমার গলা কেঁপে উঠেছিল। আমি মতালেবকেও আর কোন প্রশ্ন করলাম না। জুনেদ চলে গেছে। দোকানের বাইরে বেঞ্চির উপর মতালেব শুধু বসে। বিড়ি ধরিয়েছে আর একটা। মতালেব আমার মুখ দেখে কিছু আন্দাজ যাতে না করে, তাই ওকে আর একটা বিড়ি দিয়ে বললাম—খাও। সহজ হবার চেষ্টা করছি।

মতালেব বলল, মমতাজকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিল বুড়ো। নাকি তোমার সঙ্গে ও মাঝেমধ্যে কথা বলত, পসন্দ করত না—তাই। আমি শুনেছি তোমায়

বলি নি এতদিন—বুড়োটা শালা···। মতালেব চারিদিক দেখে নিল। এ শালা কাজ আমি ছেড়ে দিব।

কিছুক্ষণ আরও কথা বলে মতালেব চলে গেল। আমি অন্ধকারে কলা-গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। মনে হল হায়াতকে বলি। আমার সঙ্গে মমতাজের বিয়েতে বাধা কোথায়। আমি হিন্দু কিনা আমি তো জানি না। আর মমতাজ যদি মুসলমান হয়, তাহলে আমিও তাই। হায়াত ব্যস্ত। কোন কথা বলা হল না। হায়াত বলল, দোকান বন্ধ করে খেয়ে নাও।

সকালে হায়াতরা চলে গেল। আমায় জিগ্‌গেস করল, কিছু বলবে?

আমি কিছু বলতে পারলাম না। দুপুরে আমি দোকান বন্ধ করে কাঁদলাম। অনেক পরে চোখমুখ ভালো করে ধুয়ে দোকান খুললাম। সন্ধ্যার সময় হাবিকেন মুছে আলো ধরালাম। তেল ছিল না। তেল ভরে নিলাম। বাড়িটা কেমন যেন আরও নিস্তব্ধ মনে হল। একটু একটু হাওয়ায় কলাপাতা নড়ছে। এলোমেলো ঝিঁঝি পোকার ডাক মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। চাঁদ আজ বেশ উজ্জল। খণ্ড খণ্ড মেঘ মাঝে মাঝে চাঁদকে ঢেকে উড়ে যাচ্ছে। আমি ভাবলাম মমতাজ এখন কী ভাবছে।

মতালেব কখন এসে চুপচাপ বসেছে খেয়াল করি নি।

কলাগাছের ওপর চাঁদের আলো এলিয়ে পড়েছে। ঠিক সেদিনের মত।

আচ্ছা মতালেব ভাই, মমতাজের সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারত না? আজ হায়াতকে বলতে পাবলাম না।—আমার হঠাৎ মুখ দিয়ে কথাগুলো খুব স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে এল।

মতালেব খানিকক্ষণ আমাব মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, না।

কেন? ও না বলায় আমার যেন জেদ চেপে গেল।—না কেন? আমি যদি মুসলমান হই! তাহলে? বলো।

—না। তোমার পয়সা নাই, জোতজমি নাই।

পয়সা নাই। জোত জমি নাই···। দোকানে খদ্দের এসে দাঁড়িয়েছে। আমি ঝাঁপ বাঁচিয়ে মাথা নিচু করে দোকানে ঢুকলাম।

শিকার

ভগবতীচরণ পাণিগ্রাহী

সে অঞ্চলে শিকারী হিসেবে ঘিনুয়ার নাম বিখ্যাত। সে বন্দুক ছুঁড়তে জানে না। তার প্রধান অস্ত্র তাব নিজের হাতে তৈরি তীর-ধনুক। সে তীর ছোঁড়বার সময় চিৎ হয়ে পড়ে। বাঁ পা-টা ধনুকে লাগিয়ে কান পর্যন্ত তীর টেনে ছাড়ে। এক মাইল দূব থেকে লক্ষ্যভেদ করতে পারে। তীরধনুক দিযে হরিণ, সম্বর, শুযোর, ভাল্লুক, অসংখ্য মেরেছে, অনেক চিতাবাঘও মেরেছে। কিন্তু মহাবল অর্থাৎ বাঘ মেরেছে মাত্র দুটি। বাঘ মেরে ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে পুরস্কারও পেয়েছে।

সেদিন সকালে সে এক অদ্ভুত শিকাব নিয়ে ডেপুটি কমিশনারের বাংলোয হাজির। এক কাঁধে তার ধনুক, হাতে দু-তিনটে তীর, অন্য কাঁধে কুড়ুল। ঘিনুয়াকে এ হেন বেশে দেখে আর্দালী জিজ্ঞেস করলে :

"কি রে। আজ কী শিকার এনেছিস?" ঘিনুয়ার সঙ্গে তার খুব চেনাপযচান। কতবার সে তার বখশিসেব ভাগীদার হযেছে। উত্তরে ঘিনুয়া কেবল তার দুপাটি মযলা দাঁত দেখালে। সে হাসল, না মুখ ভ্যাংচাল—বোঝা গেল না। হাসি বলতে যা বোঝায়, ঘিনুয়াকে সেই হাসি হাসতে কেউ দেখে নি। সে কেবল মাঝে মাঝে এইভাবে দাঁত বার করে। তা হাসিও নয়, কান্নাও নয়। কেবল দাঁত দেখানো।

আর্দালী আবার জিজ্ঞেস করলে · "কি রে, কী শিকার এনেছিস আজ?"

ঘিনুয়া তাব গামছায বাঁধা একটা জিনিশ দেখিয়ে বললে সে আজ এক মস্ত জানোয়ার শিকার করে এনেছে।

আর্দালী জিজ্ঞেস করলে—"বাঘ" ?

ঘিনুয়া মাথা নেড়ে জানালে—"না"।

"কী তাহলে·· চিতা···ভাল্লুক শুয়োর···"

ঘিনুযা কেবল মাথা নাড়ল।

"আরে তাহলে কী রে, বেটা ?"

গোলমাল শুনে সাহেব বাংলো থেকে বেরিয়ে এলেন। ঘিনুয়া মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে আবার দাঁত বার করলে। শিকারের চেহারাটি কী তা জানার জন্যে সাহেবের ঔৎসুক্য দেখে সে গামছার ভেতর থেকে বার করে সাহেবের পায়েব তলায় রাখলে একটা সভ্য কাটা মানুষের মুণ্ডু।

সাহেব চমকে উঠে দু চার পা পেছিযে গেলেন। ঘিনুয়া হাত বাড়িয়ে বললে, "সাহেব, বখশিস।"

একটু পরে সাহেব নিজেকে সামলে নিয়ে বখশিসের জন্যে ঘিনুয়াকে অপেক্ষা করতে ইশাবা করে ভেতরে গিয়ে থানায় ফোন করে সশস্ত্র পুলিশ ফৌজ ডাকালেন। এ ছাড়া ঘিনুয়াকে জব্দ করার কোন উপায় নেই। গাযে তাব অসুরের বল, হাতে তার ওপর তীরধনুক আর কুড়ুল।

হাতে হাতকড়া আর পাযে বেড়ি পরিযে ঘিনুয়াকে যখন হাজতে পুরলে, সে কিছুই বুঝতে পারলে না। এভাবে তাকে আটকে রাখার মতলব কী ? সুবিধে পেলে সে কাউকে কাউকে এ বিষয়ে জিগ্‌গেস করে। কেউ বলে তার ফাঁসি হবে, কেউ বলে তাকে কালাপানি পাব হতে হবে। কেন, সে কী এমন অপরাধ করেছে ? কিছু না বুঝতে পেরে সে তাদের কথা বিশ্বাস করলে না। শেষে একদিন ডেপুটি কমিশনার জেল দেখতে এলেন। সে তাঁকে হালচাল জিগ্‌গেস করলে। তিনি বললেন সে আগে বাঘ ভাল্লুক মেরেছিল বলে সঙ্গে সঙ্গে বখশিস পেযেছে। এখন সে মানুষ মেরেছে। এখন সে কী পুরস্কার পাবে তা পাঁচজনকে বুঝেসুঝে বিচার করে ঠিক করতে হবে। কথাটা ঘিনুয়ার মনে হল মানবার মত বটে।

যেদিন ঘিনুয়ার বিচার হল, সে মনে মনে ভাবলে আজ সে পুরস্কার পাবে। সে উৎসাহ-সহকারে জজকে সব কিছু বলতে লাগল: সে যে গোবিন্দ সর্দারকে কাটল, তার জন্যে তাকে কম কষ্ট করতে হয নি। আরও অনেকে তাকে মারবার জন্যে ওৎ পেতে বসেছিল, কিন্তু কেউ পারে নি।

গোবিন্দ সর্দার যে সব সময় মোটরগাড়ি করে যাওয়াআসা করে। সে তার ধনসম্পত্তি অন্য সবাইকে লুট করে কামিয়েছে, বড শযতান লোক ছিল সে। কত লোককে সে মেবেছে, কত লোককে পথে বসিয়েছে, কত স্ত্রীলোকেব ইজ্জত নিয়েছে ঠিকঠিকানা নেই—ঘিনুয়ার জমিজমাও লুটে নিয়েছে। সেদিন সন্ধ্যে বেলায় ঘিনুযার স্ত্রীর ওপর পর্যন্ত অত্যাচার করতে বসেছিল। কত বড সাহস। ঘিনুযাকে দেখেই মোটরে করে পালাচ্ছিল। ভেবেছিল তার হাত থেকে পার পাবে। তার মোটরের চাকায় তীর মেরে সে মোটর অচল করে দেয়। তারপর কুড়ুল দিযে তার মাথা কেটে নিযে সেই রাতেই সে সোজা বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে তিরিশ মাইল রাস্তা এক নিশ্বাসে দৌড়ে ডেপুটি কমিশনারের বাংলোয হাজির হয়েছিল।

গোবিন্দ সর্দার যে-সে লোক নয়। হাতে তার সর্বক্ষণই বন্দুক মজুত থাকত। বাঘভাল্লুকের চেয়ে লোকে তাকে বেশি ভয় করত। বাঘভাল্লুকের চেযে সে লোকের ঢের বেশি ক্ষতি কবত। তাকে মারতে ঘিনুয়াকে কম সাহস, কম বিচক্ষণতা খরচ করতে হয নি।

কযেক বছর আগে বিদ্রোহী ঝপট সিং-এর মাথা কাটার জন্যে সাহেব ডোরাকে পাঁচশো টাকা বখশিস দিয়েছিলেন। ঝপট সিং তো একরকম ভালো লোক ছিল। সে কোন স্ত্রীলোকের ইজ্জত নেয নি কিংবা কারুর জমিজমা দখল করে নি। সে কেবল খাজাঞ্চিখানা লুট করেছিল। আর কযেকজন সেপাইকে মেরেছিল। গোবিন্দ সর্দার কিন্তু ভয়ানক লোক। তাকে মারার জন্যে ঘিনুয়ার বেশি বখশিস পাওযা উচিত।

ঘিনুয়ার যুক্তি শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। জজসাহেব হাসতে হাসতে বললেন, “হ্যাঁ, তোমায় উপযুক্ত বখশিসই দেওয়া হবে।” সরকারি উকিল বললে, “আরে, তোকে এখানে বখশিস দেবার জন্যেই তো আনা হয়েছে।”

ঘিনুযা এসব কথা ঠাট্টা না ভেবে সত্যি ভাবলে। সে হাসিঠাট্টা তামাসা-পরিহাস বোঝে না। তার প্রকৃতি নিতান্ত রসকষহীন।

শেষে রায় দেওয়া হল—প্রাণদণ্ড। ঘিনুযা এর কোন মানেই বুঝল না। আবার তাকে জেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার সময় বোঝানো হল, তার বখশিসের দিন ঘনিয়ে আসছে। ঘিনুয়া তখনও অবধি বুঝতে পারলে না যে সে অপরাধী,

তাই তার প্রাণদণ্ড হয়েছে। ঝপট সিংকে মাবা আর গোবিন্দ সিংকে মারা যে এক জিনিশ নয়, সে তা কী করে বুঝবে। সে বুঝল না যে একটা গৌরবের বিষয়, অন্যটা দোষাবহ। আইনের সূক্ষ্ম জাল ভেদ করবে তার সে মাথা কই। সে যে বুনো সাঁওতাল।

মনে মনে ভাবে, ডোরা ঝপট সিংকে মেরে পাঁচ শো টাকা পেয়েছিল। তার বেশি না হলে সে কেন নেবে? সব ফিরিয়ে দিয়ে বলবে, "সাহেব। কিছু না দাও সেও ভি আচ্ছা। ডোরার চেয়ে বেশি পাওয়া আমাব হক।"

জেলের নির্জন গুহায় বসে সে কত কি ভাবে। কথাবার্তা বলবার লোক নেই, কথাবার্তা বলার আগ্রহও আর তার নেই। কেবল বখশিস নিয়ে বাড়ি ফেরার জন্যে তার প্রাণ ছটফট করে।

শেষে তার ফাঁসির দিন এল। তাকে জিগ্‌গেস করা হল তার কী দবকার। সে বললে, "আমার বখশিস?"

"আচ্ছা, নিবি চল"—বলে তাকে নিয়ে গেল। মাথায় তার একটা কালো কানির খোল পরিযে দেওয়া হল। ঘিনুয়া ভাবলে তার চোখে ঠুলি পরিযে তাব হাতে এবার সোনাকুপো ঢেলে দেবে। সরকারের ঘরের কি কম ফন্দিফিকির, কম কুটকচালি। খালি অমনি বখশিস দিলে ভাবনা ছিল না। সে বাড়িতে ফিরে তার স্ত্রীকে সব দেখাবে, তার স্ত্রী সব দেখে কী খুশিই হবে। ভালো ঘরদোর করে, জমিজমা চষে সে সুখে থাকবে। আর তো গোবিন্দ সর্দার নেই যে সব লুট করে নেবে।

হঠাৎ কী একটা এসে তার ঘাড়ে বাধল।

ওড়িয়া থেকে অনুবাদ · রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

হাতি আর পোকা

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মা'র কোল খুব স্পষ্ট মনে পড়ে না।

অনেক শরিক ছিল। ছ'টি ভাইবোনের ভাগাভাগিতে মা যেন ষষ্ঠীঠাকরুন বনে গিয়েছিলেন।

কেবল সকাল বিকেল দুধের বাটিতে মার হাতের স্বাদ-গন্ধ পেতে পেতে আমার দেড় বছরের জীবনে একটা অদ্ভুত একাকিত্ব পেয়ে বসত।

মার কোল জুড়ে যে বোনটি আমাকে নিঃসঙ্গ করছিল, সে ছিল চিরকুগ্ন। মা তাকে বাঁচাবেনই, এই মার পণ।

'সে-ও বাঁচবে না। তার রূপ দেখে পাড়ার লোক বলত, 'এ বাঁচবে না— এ যে দেবশিশু।'

সে বাঁচেও নি।

মা যখন এই বাঁচাবার লড়াইতে মেতেছেন, তখন আমার ভেতরেও একটা লড়াই চলেছে। জীবনটা দেড় বছরের হলেও মনের বুলি ফুটে গিয়েছিল। একটা কোল খুঁজছিলাম। মার কোল। কোল মিলে গেল। মস্ত একখানা কালো, ভরাট কোল। সাতক্ষীরার জঙ্গলের ধারে ছিল আমাদের সরকারী কুঠি। বিরাট তিনমহলা বাড়ির এ-কোল ও-কোল জোড়া বাগান। বাগানের উত্তর সীমানা ঘেঁষে জঙ্গল। সেখানে তিনটে সরকারি হাতি বাঁধা থাকত। আমার কাকুনের ব্যবহারের জন্যে।

একদিন বুড়ো বৃন্দাবনের কাঁধে চেপে বায়না ধরেছি জঙ্গলে নিয়ে যেতে হবে। একে আমার ভার। তায় জঙ্গলে যাবার বায়না। বৃন্দাবন আমাকে

ভুলিয়ে ভালিয়ে হাতিগুলোর সামনে নিয়ে গিযে ছড়া কাটতে লাগল—'হাতি তোর গোদা গোদা পা—আমারে চড়ায়ে লইযা যা।'

ছু-তিনবার বলতেই তিনটে হাতির বড় হাতিটা কান ছুলিযে ছুলিয়ে সামনের ডান পা দাপাতে লাগল। পাশেই মাহুত দাঁড়িয়ে ছিল। হেসে বলল—'খোঁকিরাণীকে কোলে নিতে চাইছে।'

বলে মাহুত কী একটা অদ্ভুত ভাষায় বড় হাতিটার কানে কানে কী বলল। হাতিটা ইতিমধ্যে আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে কান দোলানো থামিয়ে মাহুতের কথা শুনছিল। হঠাৎ শুঁড় আগিয়ে বৃন্দাবনকে ভীষণ চমকে দিযে আমায় কোলে তুলে নিল। শুঁড়ে বাগিযে ধরে সোজা বসিয়ে দিল নিজের মাথায়। আর কী প্রকাণ্ড এব্ড়ো-খেব্ড়ো একখানা মাথা! তাতে এখানে ওখানে খোঁচা-খোঁচা লোম। কিন্তু সব মিলিয়ে বেশ একটা জংলী-জংলী মা-মা ভাব!

আমার প্রায সঙ্গে সঙ্গে মাহুতও লাফিযে ওপরে উঠে এল। আধবুড়ো বটে, কিন্তু মাহুত রহমত আলি মানুষটা খুব তেজী। কালো মুখে শাদা শাদা দাঁত বার করে বলল, 'খোঁকিকে শাহাজাদী বানিয়ে দিল মালা।'

বৃন্দাবনকে অভয় দিয়ে মালার মাথায় বসে, আমাকে নিযে জঙ্গলের সঙ্গে মোলাকাত করাতে চলেছে রহমত। আমাদের যেতে দেখে ছোট হাতি ছুটো পা দাপিয়ে শেকল বাজাতে লাগল। মাঝাবি হাতিটাকে শুঁড় দিযে একটু ছুঁযে বাচ্চা হাতিটাকে নিজেদের ভাষায ফোঁস্ ফোঁস্ করে আওযাজ করে কিসব ব'লে, আবার বনের দিকে ঘুরে গোদা গোদা পা ফেলে মালা এগিয়ে চলল। হাতিছুটো দাঁড়িযে ছুলতে থাকল। আর ছোট্টটা মাঝে মাঝে শুঁড় তুলে 'আঁ-আঁ' করে কেঁদে কেঁদে সারা হল।

রহমত বলল, ওটা কিন্তু মালার বাচ্চা নয়। হলে অবশ্য আমার বেশ হিংসে হত। মা-হাতি সর্বত্রই নাকি সব দলের বাচ্চাকেই তার নিজের মনে করে। পৃথিবীতে আগে হাতিরা দাপটে ঘুরে বেড়াত। সব চাইতে উঁচু, সব চাইতে বড়, আর সব চাইতে বুদ্ধিমান, হৃদয়বান জন্তু হল হাতি। মা-হাতিরা পালে বাচ্চা আগ্লায়—বাঘের আর মানুষের হাত থেকে। পুরুষ হাতিরা পাল আগ্লায়—পৃথিবীতে হাতির জাত বাঁচাতে। বনের আসল রাজা তো বাঘও নয়, সিংহও নয়—আসল রাজা হাতি! রহমত বলে।

তাহলে রহমতের কথাই বা শোনে কেন আর আমাকেই বা কোলে তুলে নেয় কেন মালা?

তার কারণ, রহমত বলে, মালার হল সত্যিকারের শাহাজাদীর মন—পৃথিবীটাকে অনেক উঁচু থেকে দেখতে পারে।

এমনি করে রোজ রোজ আমি মালার কোলে বসে অনেক দূর পাল্লা ঘুরে জঙ্গলকে আর হাতিদের আপন করে নিতে শিখে গেলাম। আমার দাদারা ছিল ছোট ছোট। দিদি আর ছোটমাসী একটু বড় ছিল বলে হাতিগুলোকে মাঝে মাঝে আমাকেই দুধ খাওয়াতে হত। পরে মালাই আমাকে দুধ খাওয়াত। ভরা দুধের বাটি ওর শুঁড়ে বসিয়ে দিত বৃন্দাবন। অদ্ভুত কায়দায়, একটুও না ফেলে মালা দুধ তুলে দিত আমার মুখে। মাহুত রহমত এসব দেখে এত আনন্দ পেত যে, ইদানীং লোহার রড্‌টা দিয়ে মালাকে শায়েস্তা করার কথা পর্যন্ত ভুলে যেত।

মালা অনেক সময় জঙ্গলের পথে কেমন যেন বেখাডাভাবে হেঁটে আমাদের নিয়ে হঠাৎ ডালপালা ভেঙে ছুটতে আরম্ভ করতেই, রহমতের চোখেমুখে একটা ভয় ফুটে উঠতে দেখতাম। প্রথমে মুখে থামতে বলত। তারপর লোহার মোটা ছুঁচলো রড্‌টা মালার কানের পাশে ফুটিয়ে দিত। মালা আঁৎকে থেমে গিয়ে একটা করুণ ডাক ছাড়ত। আমার গলা দিয়েও কান্না বেরিয়ে আসত। কেননা, অনেক সময় ওর ব্যথার জায়গায় হাত পড়ে গেলে রক্তে ভিজে উঠত আমার আঙুলগুলো। মনে হত কে যেন আমার মাকে মেরেছে।

অথচ রহমতকে কী ভালটাই না বাসে মালা। ওঠা, বসা, সব ওর ডাকে। অন্য কারুর কথা শুনবে না। তোয়াক্কাও করবে না।

আমার দাদা-দিদিরা মাঝে-সাঝে মালার পিঠে চাপার অধিকার পেত। কিন্তু কোলটা ছিল আমার। মস্ত মাথাজোড়া কোলে যেদিন সরকারি সাজসজ্জা চড়ানো হত, সেদিন অসম্ভব বোকা-বোকা মুখে কুৎকুতে চোখ পিট্‌পিটিয়ে চেয়ে থাকত মালা। যেন কোন আদিবাসী মেয়েকে শহরের ব্রেস্‌লেট্‌, টায়রা পরিয়ে কেউ সাহেব-সুবোদের পার্টিতে নিয়ে যাচ্ছে। সে ক'দিন আমার ঘ্যানঘ্যানানিতে বাড়ির সকলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠত।

ছোটমাসী রেগে বলত, 'বাব্বাঃ, যা ওজন মেয়ের, কোলে নিতে বড়দেরই দম ফুরোয়! ওব ঐ হাতির কোলই সয। কবে যে আবার ঐ মালার ধড়াচুড়ো খোলা হবে!'

আমি দূর থেকে মালাকে দেখতে পেতাম। সিঁড়িতে বসে আজেবাজে গল্প বলে ছোটমাসী আমাকে দুধ খাওয়াত। মালার এখন কাঠ বওয়ার কাজ। জঙ্গলের মোটা গুঁড়িগুলো শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে আসবে শহর গড়ে তোলার জন্যে। এসব কাজেব সময় রহমতকে ভাবি বুড়ো দেখায। বলে, বড দুশ্‌মনী কাজ—জঙ্গল সাফ কবতে করতে এরা দুনিয়াটা বিলকুল ফাঁকা করে দেবে। মানুষ যখন হ্যাংলা হযে সব কিছু গিলে ফেলতে চায়, তখন নাকি রহমতের আর মানুষ বলে পরিচয় দিতে ইচ্ছে হয না। লজ্জা করে।

এমনি এক বিকেলে মাসী দুধ খাওয়ানো শেষ করে আমার গালে একটা চুমো খেয়ে 'সোনা মেয়ে, চুপ করে বসে খেলা করো' বলে দল বেঁধে এক্কাদোক্কা খেলতে চলে গেল। ইতিমধ্যে আমার বয়েস হয়েছে সাড়ে তিন। আর কোলের বোনটি মারা গিযে আবার একটি বোন জন্মে আবার মার কোল জুড়ে শুয়ে আছে। বাবা থাকেন বিদেশে। কাকুন বললেন, এবার নাকি আমবাও সব বিদেশ যাব বাবার কাছে। শুনে আমি দুলে দুলে জিগ্‌গ্যেস করলাম, 'মালা যাবে না?' কাকুন হেসে অস্থির। 'মালা কোথায় যাবে, মালা তো সরকারি হাতি।' আমি বললাম, 'তবে আমিও থাকব।' কাকুন হেসে বললেন, 'তাহলে আমাদেব পালে চারটে হাতি হবে।'

কাজ সেরে সেদিন মালা রহমতকে ছাড়াই সিঁড়ির গোড়া থেকে আমাকে কোলে তুলে নিল। হাতিদের বাচ্চাদের তো আর এমনি করে কোলে তুলতে পারে না ও। তাই আমাকে কত রকম খেলা দিযে কোলে নেয় মালা। খুব মজা পায়। শুঁড় দিযে শূন্যে ছুঁড়ে লোফালুফি করে, মাথা থেকে তুলে নিযে শুঁড়ে করে একবার মাটিতে, একবার পিঠে, একবার পেটের নিচে ঘুরিযে দোল দিযে নেয়। আজ মালাকে একটু যেন এলোমেলো দেখাচ্ছে। বন কেটে ক'দিন ধরে কাঠ বয়ে বযে ও বোধহয় নাজেহাল হয়ে পড়েছে। হাঁটার মধ্যে একটা কি রকম ভাব। শুনেছিলাম রহমতের অসুখ করেছে। তাই ক'দিন ওর ছেলে আহ্‌মদ মালাকে চালাচ্ছে। আহ্‌মদকে

তো ত্রিসীমানায় দেখছি না। মালার পায়ের ভারী শেকলের শব্দ তুলে আমরা বনের পথ ধরলাম। কেউ কিছু বোঝার আগেই মালা ডবল কদমে হেঁটে গভীর জঙ্গলে পৌঁছে আবার আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। কত পাখি! যখনই আসি, গাছে গাছে পাখিরা ডাকাডাকি করে। আজ বিকেলের দিক বলে ডাকাডাকিটা এত বেশি যে বেসুরো মনে হয়। সবুজ সবুজ পাতাগুলোর রকমারি, রঙ্, হরেক রকমের সাইজ। গায় মাথায় লাগে। বড ডালের কাছে এসে মালা থম্‌কে দাঁড়িয়ে আমায় শুঁডে করে নামিয়ে দোলাতে দোলাতে হাঁটে। দূরে একদল হরিণ চরছিল। মালার গহনাব শব্দে ওরা ভযে ছুটে গেল। সজারুটা বেয়াডা। কাঁটা উঁচিয়ে তেডে আসছে। বুনো শুয়োর দুটো প্রথমে গোঁজ হয়ে রুখে দাঁডিয়েছিল। মালা একখানা পা তুলে কান দোলাতেই তারা ঝোপেঝাডে মিলিযে গেল। বাঁদরের দল বাঁদ্‌রামি করে শুধু ডালে ডালে একটু সরে বসে মাত্র। মুশকিল দেখলেই দল বেঁধে পালাবে। মালার কোলে বসে বসে দেখছি ওর পায়ের নিচেই সব কিছু। ও হাঁটছে। মাটি কেঁপে উঠছে। শুঁড দিয়ে গাছপালা ভেঙে পথ করতে করতে কখনও খোলা মাঠ, কখনও ঘন লতাপাতার কাবসাজি দেখছি। এমন সময হঠাৎ আকাশে মেঘ দেখা গেল ফাঁকা মাঠে পডতেই। আর মেঘ ডাকতেই মালার ছোট ছোট চোখে ভয দেখা দিল। হাঁটাচলায় কেমন এলোপাথাডি তাল। খানিকটা এগিয়েই ও থম্‌কে দাঁডিয়ে শুঁড তুলে হাঁক দিল—আঁ—আঁ—আঁ।

কয়েক পা দূরে একটা ঝিলের গায়ে একটা বাডি থেকে এক সাযেব বেরিয়ে এসে আমাদের দেখছিলেন। মালা তাঁকে দেখে আরও ঘাব্‌ডে ঘেঁষডে পিছু হটতে লাগল। কেমন যেন পালা পালা ভাব। কান দুটোয হাওয়া তুলে ও দোলাতে লাগল। ঠিক কিছু দেখে বেগে গেলে বা খুশি হলে যেমন করে।

পাদ্‌রি সাযেব এই জঙ্গলের ফরেস্ট অফিসারও বটে আবার পাদরিও বটে। রহমত বলেছিল। মালাকে ভাল করে চেনেন। মালাও ওঁকে চেনে। হাত উঁচিযে ডাকলেন, 'মালা।' এক নিমেষে মালার ভাব বদলে গেল। রহমতের মত এলোমেলো করে পাদ্‌রি কিসব মালার কান উদ্দেশ্য করে বললেন।

সবটা বোধহয় বুঝল না। মালা পা দাপাতে লাগল—না, ও আমাকে নামতে দেবে না। এককাঁদি কলা, ফলমূল, একটা বিরাট খড়েব গাদা সব সামনে ধরতে তবেই মালা নিচু হল। আর হাত বাড়িয়ে মালার কোল থেকে পাদ্রি আমাকে নিজের কোলে তুলে নিলেন। চোখ থেকে এলোমেলো চুল সরিয়ে দিয়ে জিগ্গেস করলেন, 'তুমি কে ?'

'আমি।'

পাদ্রি হাসলেন।

'তাহলে শোনো, আমি। তুমি আমার কে হও বলো তো ?'

'আমি।'

'অতগুলো আমিব সম্পর্কের হিসেব কষতে গেলে আমার অঙ্কের জ্ঞান ফুরোবে। তুমি একলা হাতির পিঠে চড়ে এসেছ, ভয় করে নি ?'

'ও তো মালা। আমার মালা।'

'বাঃ বাঃ! চলো, তোমায় একটি ছোট ছেলের ছবি দেখাই। সে গাধার পিঠে চড়ে বেড়াত। আর পৃথিবীটাকে খুব ভালবাসত।' বলে পাদ্রি ওঁর প্রার্থনার ঘরে আমায এনে একখানা মস্ত ছবি দেখালেন। খুব চেনা ছবি।

'ও তো যীশুকেষ্ট।'

পাদ্রী হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'তুমিও অমনি হবে।' বলে আমায় আদর করে বাবা যেমনি করে শব্দ করে চুমু খান, তেমনি কপালে চুমু খেতেই জানলার শার্সিতে ঠক্ ঠক্ করে আওয়াজ হতে লাগল। খুলে দেখা গেল, মালা ওখানে দাঁড়িয়ে ঝপ্‌ঝপ্ করে কান দোলাচ্ছে। পা ঠুকছে একটু একটু। মেঘের ডাক বেড়েছে।

'তোমার হাতি মা-টি খুব কড়া লোক দেখছি। হিংসুটেও বটে।'

দুধ খেয়ে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল। বললাম, 'মালার কোলে ঘুমুব।' শুনে পাদ্রি হাসলেন—'বৃষ্টি পড়ছে যে!'—'মালার কোলে ঘুমুব—ঘুমুব—'

মা হিসেবে মালা মানুষটা হাতি হওয়ায় ওর গা-টা বাইরে রেখে মাথাখানা এগিয়ে দিল বাংলোর বারান্দায। আমি ওর এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো কোলে শুয়ে পাদ্রি সায়েবকে বললাম, 'গল্প বলো'। একখানা পাখা নিয়ে মশা তাড়াতে

তাডাতে ঘুমন্ত মালার কোলে আধ-ঘুমন্ত আমাকে সায়েব গল্প বলতে লাগলেন —মোজেস্-এর গল্প। আমি ঘুম-বিড়বিড়ে স্বরে জিগ্‌গেস করলাম—'তুমি আমার বাবা?' পাদ্রিব গলার স্বর আট্‌কে গেল। চশমাটা বার কয়েক মুছলেন। ধরা ধরা গলায় বললেন—

'হ্যাঁ, আমি।'

শেষবারের মত মিট্‌মিট্‌ করে তাকিয়ে দেখলাম গোধূলির আলোয পাদ্রির চোখে বাইরের বৃষ্টির মত টসটসে জল। ঝিপ্‌ ঝিপ্‌ করে বৃষ্টি পড়ে সব কিছু যেন মেশামিশি হয়ে গেছে। ঝিলের জলে কি সব ভেসে বেড়াচ্ছে। অনেক কিছু একসঙ্গে নডছে সরছে এগোচ্ছে। পাদ্রির একা একা মুখখানা ছবির মত চেযে এসব দেখছে।

সেই আমার শেষ মালার কোলে চডা।

তারপর প্রায় এক যুগ কেটে গেছে। বড হয়েছি। সভ্য হয়েছি। সভ্য সমাজের আওতায আমার নিজের মা-বাবাকে কাছে পেযেছি। আদর কাঁডিয়েছি। দিযেছি। কিন্তু সব কিছুর মধ্যে একটা অপরাধবোধ থেকে গেছে। ববাবর। ঘুমের মধ্যে অরণ্যের স্বাদ, মালার কোল, পাদ্রির চোখভরা নিঃসঙ্গ কান্না। আর একটা গভীর অরণ্য কেটে ফেলার হুম্ হুম্ শব্দ। গাছগুলো গুঁডিসুদ্ধ্ পডছে। মালা আব অন্য হাতিরা তা টেনে আনছে। আমাদের সভ্য হতে দিচ্ছে ওরা। আর সভ্য হবার নামে পৃথিবীটাকে নেড়া কবে তুলছে আমাদের লোভী মনগুলো। আর প্রকৃতির এক আশ্চর্য উদারতা মনে নিয়ে মালারা আজও কোল দিচ্ছে আমাদের। আস্তে আস্তে, অনুদার পাযে আমরা ওদের সর্বহারা করে যে সভ্যতা গড়েছি তার মধ্যে লোভেব বিষফল বিষের ক্রিয়া করছে।

এ অঞ্চলে এসে মালার খোঁজ করেছিলাম। শুনলাম মহীযসী বাণীর মতই সে মারা গেছে। অনেক রাস্তা তৈবি ক'রে, বন কেটে, অনেককে কোলেপিঠে মানুষ ক'বে মালা একদিন রুখে দাঁডাতে বাধ্য হযেছিল। ছোট একটা বাচ্চা হাতিকে কারা ধরে এনেছিল কিছুদিন আগে। তার মাহুতের ভাই তার ভাগের খাবার থেকে চুরি কবে চোরাকারবারে মেতে উঠেছিল। ধানের ভাগটা সব হাতিব খোরাক থেকে চুরি হযে যেতে লাগল। বাচ্চাটা

একদিন পা দাপিয়ে আপত্তি জানিয়ে ডেকে উঠতেই মাহুতের ভাই তাকে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মেরে বসে। জঘন্য কাপুরুষের মতই।

অনেক সহ্য করেছে মালা। আজ তার সমস্ত ভেতরটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। শেকল ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে ছুটে গিয়ে একটা পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে দিল। সেই চোরাকারবারি লোভী পোকাটাকে। আর সেই অপরাধে আরেক কাপুরুষ শিকারীকে ডেকে আনা হল মালাকে শায়েস্তা করার জন্যে। ইঙ্গবঙ্গ শিকারীটি খুনকে পৌরুষ ভেবে মালার কপাল লক্ষ করে একটা গুলি ছুঁড়ল।

হতভম্ব মালা থমকে তাকিয়ে দু'বার কান দোলাল। বিশ্বাস করতে পারছে না। ওকে মারা হয়েছে এটা বিশ্বাস করা মালার পক্ষে কঠিন। খুব কাছ থেকে পৃথিবীর অনেকটা ফাঁকা করে দিয়ে আরও দুটো গুলির চোট লেগে মালা শেষ নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে আস্তে আস্তে পড়ে গেল।

একজন লোক মৃত মালার শুঁড়ে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে তৈরি হয়ে নাকি বলেছিল, 'ইস্, মাদী হাতি! টাস্কার হলে দাঁতদুটো কাজে লাগত।'

আগামী সংখ্যাগুলিতে থাকবে

গল্প

টিবর ডেরি ॥ প্রেম
অনুবাদ : অসিত গুপ্ত
অজয় গুপ্ত ॥ শকুনির ছবি
বৈতালিক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ অনিদ্রা
আশিস সেনগুপ্ত ॥ নীলকণ্ঠ পাখির পালক
দীপক সরকার ॥ সময়
নীরদ ভট্টাচার্য ॥ মদন, বাঘার মা এবং শকুন

হাত চুরি

কৃষণ চন্দর

কাল ভোরে চোখ খুলে দেখি আমার বাঁ-হাতখানা একেবারে গায়েব। রাত্তিরে শোবার সময় তো দিব্যি ছিল। ঘাবড়ে গেলাম খুব। কিন্তু কোথায় হারাল হাতটা? বিছানার ওপর এদিক ওদিক খুঁজলাম কোথাও পেলাম না। কনুই দিয়ে (ডান কনুই, বলাবাহুল্য) ঠেলা মেরে স্ত্রীকে জাগালাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'ওগো, তুমি আমার হাতটা কোথায় দেখেছ? বাঁ-হাতটা?' উনি বললেন, 'ডানই বা কি, বাঁ-ই বা কি? তোমার হাতের কত খেলাই তো আমার হাড়ে হাড়ে জানা। এবারে আবার তুমি কোন্ ধরনের হাত-সাফাই দেখাচ্ছ?' বললাম, 'শোনো লক্ষ্মীটি, আমি হাত-সাফাই দেখাব কি ক'রে বলো? আমার বাঁ-হাতটাই যে গায়েব। বিশ্বাস না হয় তো নিজে দেখ।' এ কথায় তিনি চমকে উঠে বসলেন, আমার জামার শূন্য হাতাটা নেড়ে বললেন, 'সত্যিই তো। মনে হচ্ছে কোন-দিনই ছিল না হাতটা।' তারপর আমার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'কাকে দিয়ে এসেছ?'

'আরে। কাকে আবার দেব? হাত আবার নেয় কে? তাছাড়া বাঁ-হাত।'

'নিশ্চয় কারো হাতে হাত রেখেছিলে তুমি আর সেই সর্ব্বনাশী রঙের-পাখি ওটা নিয়ে ভেগেছে। না হয় তো কোন সুন্দরীর কোমর জড়িয়ে ধরেছিলে তুমি, আর হাতের বাঁধনটা খুলে নিতে ভুলে গেছ।'

'দেখ, বৌ, এটা হাসিঠাট্টার সময় নয়। দেখছ না, বাঁ-হাতটা উধাও।'

'তো আমি কি করব,' তিনি হাই তুলে বললেন, 'খোঁজো এখানে ওখানে, কোথাও ভুলে ফেলে রেখেছ। এ তো তোমার আজকের অভ্যেস নয়, জিনিশ এখানে ওখানে রেখে স্রেফ ভুলে যাও।' সমস্ত ঘর খুঁজলাম, পাতলুনের দুই পকেটই দেখলাম, স্নানঘরের টাবটা পর্যন্ত দেখলাম। চাকরকে ধমকে জিগ্‌গেস করলাম, 'তুই আমার বাঁ-হাতটা তো নিস নি? ঠিক ঠিক জবাব দে, না হলে মজা দেখাব এক্ষুনি।' বেচারা ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'হুজুর, আমি আপনার হাত নিয়ে কি করব বলুন, আমার তো দুটো হাতই আছে আগে থেকেই, এই দেখুন না।'

কথাটা তো ও মিথ্যে বলে নি। ওর দুটো হাতই তো বহালতবিয়তে আছে, তৃতীয় হাত নিয়ে ও কী করবে? দেহের কোন্ অঙ্গে জুড়বে? আমি ওকে ছেড়ে দিলাম। উদ্বিগ্ন মনে বেরিয়ে পড়লাম, সেই রাস্তা ধরলাম রাত্তিরে খাওয়া সেরে আমি যে রাস্তায় একটু বেড়াই। আমার পুরনো অভ্যেস, চলতে চলতে হাত ঝুলিয়ে চলি। এমন হতে পারে চলতে চলতে বাঁ-হাতটা একটু বেশি জোরে ঝুলিয়েছিলাম, আর বেচারি ছিট্‌কে গিয়ে কোন গর্তে পড়ে আছে। রাস্তায় সমস্ত গর্ত দেখলাম। হাত কোথাও পড়ে নেই। মুদীর দোকানে গেলাম, রাত্তিরে বাড়ি আসবার সময় কিছু জরুরি সওদা করবার জন্যে দাঁড়িয়েছিলাম। মুদী আমার কথা শুনে দুহাত জোড় করে বলল, 'না বাবুজী, আমি অন্যের হাত রাখি না। রাম, রাম! এমন খারাপ কাজ আমি কখন ও করি না।'

'মিথ্যুক কোথাকার। এটা তো তোদের পুরনো স্বভাব। রাম নাম জপা আর অন্যের জিনিশ হাতানো। বের কর আমার হাত।'

'না বাবুজী, আমি আপনার বাঁ-হাত দেখি নি। আমার দোকানে যদি ভুলে কেউ কোন জিনিশ ফেলে যায় আমি সামলে রেখে দিই। একবার এক গাহক বর্ষার সময় ছাতি রেখে গিয়েছিল। পরের বর্ষায় আমি তাকে ছাতি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। ছাতি তো কাজের জিনিশ, আর আপনার বাঁ-হাত কোন্ কাজে—?'

কোন পথ না দেখে পুলিশেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু মুদীর কথা মনে পড়ে গেল—তাই তো, বাঁ-হাত কোন্ কাজের! সমস্ত কাজ তো আমি ডান হাতেই করি। লিখি ডান হাতে, খাই ডান হাতে, লড়ি ডান হাতে, আদর দিই

ডান হাতে, শুধু হাতজোড করবার সময় দুটো হাতই কাজে লাগে। ভালই হয়েছে, বাঁ-হাত খোয়া যাওয়াতে বারবার হাতজোড করবার খোশামোদী অভ্যেসটা চলে যাবে। বাঁ-হাতের এমন কি কাজ, যা ডান হাতে না করতে পারি। আর যদি পুলিশে রিপোর্ট করি তাহলে রাজ্যের প্রশ্ন করে মারবে—তোমার নাম কী? তোমার বাপের নাম কী? ঠাকুর্দাদার নাম কী? কোন্ সময় চুরি হল, কোথায় চুরি হল? আর তোমার বাঁ-হাত যে আদৌ ছিলই, তারই বা এমন কোন্ প্রমাণ আছে তোমার কাছে? যদি রাতে শুতে যাবার সময় তোমার হাত চুরি গিয়ে থাকে, তাহলে তোমার স্ত্রীর সাক্ষ্য দরকার। তাকে থানায় আনো। এমনও তো হতে পারে তোমার স্ত্রী-ই তোমার হাত চুরি ক'রে নিজের ব্যাঙ্কের লকারে বন্ধ করেছে। এ যদি না মানো, তোমার স্ত্রীর স্বভাবচরিত্রের জামানত পেশ করো। আর এমনও হতে পারে নিজেই তোমার নিজের হাত গায়েব করেছ। আজকাল এমন গল্প তো হামেশা শোনা যায়। নিজেই কোন জিনিশ চুরি ক'রে অন্যের ঘাডে দোষ চাপায়। এও হতে পারে, তুমি তোমার বাঁ-হাতে একটা মস্ত দাঁও মেরেছ—এখন ধরা পডবার ভয়ে হাতটাই গায়েব করে ফেলেছ। কী রঙের হাত ছিল? কত লম্বা ছিল হাতটা? কতগুলো আঙুল ছিল তাতে?'

এসব ভেবে পুলিশে রিপোর্ট করার ইচ্ছের জলাঞ্জলি দিলাম। দিনকতক রাস্তায় চলন্ত লোকদের খুব ভাল করে লক্ষ করে দেখতে লাগলাম। যদি তিন-হাতওয়ালা কোন লোক দেখি তো চট্‌পট্ দৌডে গিয়ে ধরে ফেলব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন তিন-হাতওয়ালা মানুষ মিলল না। এমন অবশ্য কয়েকজন মিলল, যার আমারই মত এক হাত নেই। শেষে একটা বিষয় মনে মনে মেনে নিলাম। এ কয়দিনে একটা হাত যে আমার নেই তা মনেই পডে নি। বাঁ-হাত যেটা ছিল তা আমার কাছে নিষ্প্রয়োজন বা বাডতি অঙ্গ বলে মনে হল। মনে করুন, আপনি প্রেমিকার কোমর ডানহাতে জডিয়ে চলেছেন, তখন আপনার সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত বাঁ-হাতটাকে মনে হবে একটা অবাঞ্ছিত তৃতীয় পুরুষ, যার হাত থেকে আপনি কিছুতেই ছাডা পাবেন না। খুব ভাল হয়েছে, হতভাগা বাঁ-হাতটা নিজে থেকেই গায়েব হয়েছে। কয়েক মাস পরে আমার যে কোনদিন আরেকটা হাত ছিল তা আমি একেবারে ভুলে গেলাম।

আবার একদিন আমার একটা কান উধাও। সেদিনও আমি ঘুমিয়ে

উঠেছি। মুখে হাত বুলোতে বুলোতে অনুভব কবলাম আমাব কানটা নেই। আবাব হাত বুলোলাম। না। যে জাযগায কান থাকবাব কথা সে জাযগাটা একেবাবে ফাঁকা, কোনদিন যে কান ছিল তা বোঝবাব উপায নেই। তক্ষুনি বিছানায উঠে আযনাব সামনে গেলাম। দেখলাম, সত্যি আনাব ডান কানটা নেই কিছুক্ষণ বিস্ময়েব জগতে কাটালাম কোথায গেল আমাব কান! বালিশ উঠিযে দেখলাম, খাট উঠিযে ঝাডলাম। হৈ চৈ শুনে গিন্নী জেগে উঠলেন. 'নাঃ, একটু ঘুমুতে দেবে না, বলি হলটা কী?' তিনি চোখ বন্ধ বেখেই ঘুম জডানো কণ্ঠে বললেন।

'আমাব ডান কানটা নেই।'

'তোমাব তো শযতানেব মত কান, অমন কান আবাব গাযেব হল কী কবে?'

'তুমি একটু ভালো কবে চেযে দেখ, সত্যি একটা কান নেই।'

'আবে, তুমি তো শুনেও শোনো না, এক কান দিযে শোনো, আবেক কান দিযে উডিযে দাও, তোমাকে চিনি না? কান গাযেব হল। বলি কান তোমাব ছিল কবে শুনি? ও তো সব সমযেই গাযেব।'

'একটু চোখ খুলে দেখো গো, ডান কানটা সত্যি নেই।'

গিন্নী এবাবে চমকে উঠে কানে কবাঘাত কবে বললেন, 'দেখতে না দেখতে সব কিছু গাযেব কবে ফেলছ—প্রথমে গেল হাত, আব এবাবে কান। কাল যাবে ঠ্যাং, পবশু ধড। আমি জানি, তুমি ইচ্ছে কবে নিজেকে ভাঙছ। একদিন তুমি নিজেই এঘব থেকে হবে গাযেব আব অন্য এক ভাগ্যবতীব কববে ঘব আলো। কানে কানে খবব ছডাবে। আমি তোমাব স্বভাবচবিত্র ভালোই মত জানি।'

এবাবে বন্ধুবান্ধব সবাই পবামর্শ দিল আমাব পুলিশে যাওযাই উচিত, আব এই অদ্ভুত অসাধাবণ চুবিব বিপোর্ট লেখানো উচিত। অনেক ভেবেচিন্তে আমি পুলিশে বিপোর্ট না কবাই সাব্যস্ত কবলাম। মানে এমন আব কি লোকসান হযেছে? এক কান গিযেছে তো কি হযেছে। আবেকটা কান তো আছে। কাজেব কথা তো এক কানেও বেশ শোনা যায। বাজে কথা শোনবাব সময নেই আমাব। আব এক কান যখন নেই, এবাবে গিন্নীব আব একথা বলবাব সুযোগ হবে না· তুমি এক কান দিযে শোনো আব এক

কান দিয়ে উড়িয়ে দাও। আবেক কান না থাকাব জন্যে এ অভিযোগ তো তিনি আব কবতে পাববেন না। এক কান হওয়াতে তুনিযাব শোবগোলটাও হযে যাবে অর্ধেক, আব এ তুনিযায শোবগোলটা এত বেশি যে জীবনটাই অর্ধেক হযে যায। একটা কান কমে যাওযাব আমাব আয়ু ববং বেড়ে যাবাব সম্ভাবনা দেখা দিল। বিষযটা যতই ভেবে দেখলাম, তু কানেব চেযে এক কানই বেশি লাভজনক বলে মনে হল। মোটকথা, পুলিশে যাবাব কথা আব একেবাবেই মনে ঠাঁই দিলাম না।

কযেকটা মাস খুব স্বস্তিতে কাটল, কিন্তু একদিন আমাব চোখ হল উধাও। হল কি, আমাব পড়াব ঘবে আবাম-কেদাবায বসে একটা বই পড়ছি। বইটা অসম্ভব ভাল, কিন্তু কযেক পৃষ্ঠা পড়বাব পব বসে বসেই ঘুমিযে পড়লাম। যখন জেগে উঠলাম তখন বেলা পড়ে গেছে, সন্ধ্যে হযে গিযেছে, আমি তাড়াতাড়ি উঠে ঘবেব আলো জ্বাললাম, স্নানঘবে গিযে হাতমুখ ধুতে ধুতে হঠাৎ আমাব চোখ ধবে ফেলল যে আমাব একটা চোখ নেই। ঘাবড়ে গিযে তাড়াতাড়ি আযনাব সামনে গিযে দাঁড়ালাম। সত্যি, আমাব বাঁ-ভুরুব নিচে যে জাযগায চোখ থাকে সেখানে তা নেই। বাব বাব চোখ বড়বড় কবে দেখলাম—সত্যি, দ্বিতীয চোখ চোখে পড়ল না। যেন কোন দিনই তা মুখে ছিল না।

'একি হল?' কিছুক্ষণ একেবাব বিহ্বল হযে পড়লাম। একটু প্রকৃতিস্থ হযে চেঁচিযে উঠলাম। আমাব চিৎকাব শুনে গিন্নী দৌড়ে এসে স্নানেব ঘবে ঢুকলেন, বললেন, 'কি হল, চোখে সাবান গিযেছে বুঝি?'

'আমাব বাঁ—'

মুহূর্তমাত্র অনুমান কবে তিনি বললেন, 'নিশ্চয তুমি কোন মহিলার দিকে কু-দৃষ্টিতে তাকিযেছ।'

'লক্ষ্মীটি।'

'অথবা কোন চটুলনযনাব চোখে চোখ মিলিযেছ।'

'উঃ।'

'অথবা কাব চোখে চোখ বেখেছ আব সেই ছিনাল মাগী তোমাব চোখ উপড়ে নিযেছে।'

ভাবলাম গিন্নীকে আব কিছু জিগ্‌গেস কবা ঠিক হবে না, কাবণ ওঁব

তো একই কথা। তাই আমি বইযেব পাতা ভাল কবে দেখলাম, চেযাবেব নিচে দেখলাম, চশমাব ডালা খুলে দেখলাম। কিছুদিন বন্ধুবান্ধবদেব বাডি গেলেও সেখানে খুঁজে দেখেছি, কিন্তু চোখ কোথাও পাওযা গেল না। কেউ চুবি কবে থাকলেও তো আব ফিবিযে দেবে না। আমি ব্যবসা কবছি আমি জানি। আজকাল লোকেব চোখেব জল মবে গেছে। দযামাযা নামে কোন জিনিস আজ আব নেই।

এবাব গিন্নীও পুলিশে যেতে বললেন, কিন্তু আমাব বিবেক তাব বিপক্ষে বায দিল। আমাব কাজেব পবিধি এত বিস্তৃত যে, যে-সময আমি বিপোর্ট লেখাব, সে-সমযা অন্য ভাল কাজে দিতে পাবব। যাক, এক চোখ গিযেছে, আবেক চোখ তো আছে। আব এক চোখ যাওযায আবেক চোখেব শক্তি এত বাডবে যে দুচোখেব শক্তিব সমানই হযে যাবে। একে শাস্ত্রে ল' অব কম্পেনসেশন বলে। আব, এক চোখ থাকাব সুবিধা এই যে আপনি এক চোখে তামাম দুনিযা দেখবেন—প্রায সোসিযালিস্টিক হযে গেলেন আব কি। চোখ খোযা যাবাব পব আমাব গিন্নী কযেকদিন একটু বিগডে গিযেছিলেন ঠিকই, কিন্তু এখন চক্ষুবিশেষজ্ঞ ডাঃ সুজানী এমন সুন্দব নকল চোখ লাগিযে দিযেছেন যে, মনে হচ্ছে আবেকটা চোখ উপ্‌ডে ফেলে নকল চোখ লাগিযে নিই। মোটকথা, যেদিক দিযেই বিচাব কবি না কেন আমাব এক চোখেই বেশি লাভ দেখতে পাচ্ছি।

পবশু আমাব ব্যাগ চুবি হল। বালিশেব তলায ছিল। ব্যাগে দশটা টাকা ছিল, এব চেযে বেশি টাকা আমি ব্যাগে বাখি ন', থাকলে বাত্তিবে আলমাবিতে বেখে দিই। কিন্তু দশটাকা ব্যাগে ঠিকই ছিল। আব দশটাকা দশটাকাই। আমি যখন চুবিব কথা গিন্নীকে বললাম, তিনি ঝাড়ুদাব মেযেটিকে জিগ্‌গেস কবতেই সে চেঁচিযে উঠল, আব নিজেব নির্দোষিতাব দিব্যি দিতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে ওটা পাওযা গেল বাবুর্চিব বালিশেব নিচে, সে চাবদিন হল জ্ববে পডেছিল। আমি ধমক দিতেই সে কবুল কবল যে দশটাকাব নোট সে-ই নিযেছে। আমি তাকে দুই ধাক্কা দিলাম আব কান ধবে উঠিযে বসালাম. 'হাবামজাদা, আমাব চাকব হযে তুই আমাবই ঘবে চুবি কবেছিস?'

'ছেডে দাও, ছেডে দাও'—আমাব গিন্নী বললেন, 'বেচাবা চাবদিন জ্বরে

পড়ে আছে। ইঞ্জেকশনের জন্যে পয়সা চেয়েছিল আমি দিই নি, ভুলে গিয়েছি।'

—'তুমি ভুলে গিয়েছ, তার মানে কি ও চুরি করবে?' আমি বাবুর্চিকে একটা জোর ধাক্কা দিলাম, সে ধড়াস করে মেঝের ওপর পড়ে গেল।

'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও'—গিন্নী হাতজোড় করে বললেন, 'দেখছ না, বেচারা চারদিন জ্বরে ধুঁকছে। দশটাকা খোয়া গেলে তোমার এমনকি লোকসান হবে, তুমি তো লাখ পয়সা কামাও।'

'দশটাকা।' আমি গর্জে উঠে বললাম, 'দশটাকার মূল্য তুমি কি করে বুঝবে?' কত বেইমান মেহনত আর নোংরা বিবেক-বেচা ব্যবসার ভেতর দিয়ে এই দশটাকা কামাই। তুমি এই দশটাকার গুরুত্ব কী জানবে? সে আমিই জানি।'

—'ওকে ক্ষমা করো।'

—'না, ও আমার দশটাকা চুরি করেছে। আমি এই চোরকে তার চুরির যোগ্য সাজা দেওয়াব।' এই বলে আমি বাবুর্চির ঘাড় ধরলাম আর চললাম ওকে পুলিশে দিতে।

উর্দু থেকে অনুবাদ জ্যোতিভূষণ চাকী

একটি কালো মেয়ের কথা...

অমৃত রায়

তুমি আমাব চোখে চোখে আব চাইতে পাবো না, মা, তোমাব আমাব মধ্যে কেমন একটা প্রাচীব সৃষ্টি হযেছে—ছলনাব এক দুর্ভেদ্য দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীব—তাব একদিকে তুমি, একদিকে আমি। আমবা যেন একে অন্যেব সঙ্গে লুকোচুবি খেলছি।

কিন্তু, মাগো, লুকোচুবি তো ছেলেবেলাব খেলা। ছোটদেবই খেলতে দাও, মা। আমি তো আব তোমাব মেযেটি নই—আমি নাবী, তুমিও যেমন নাবী—আমিও তেমনি। লুকোচুবি খেলা তোমাব আমাব সাজে না, কেউ চাইলেও সাজে না।

আজ ছোটবেলাব সেই কৌতূহল, সেই সহজ সবল বিশ্বাস, সেই প্রফুল্ল আত্মবঞ্চনা—কিছুই আব নেই। তুমি আমাকে দেখ আডচোখে,—না দেখাব ভান কবে, আব আমিও তোমাব চোখে চোখ পডলে, যেন দেখি নি, এই ভাব দেখিযে না দেখাব অভিনয কবে যাই। এই ছলনা আব কতদিন, কতদিন চলবে, মা?

আজ আমাব উপব থেকে প্রথম কৈশোবেব জ্যোৎস্নাব মাযাজাল সবে গেছে, দেখ. কী কঠিন কঠোব উগ্র বৌদ্রবাশি আমাব সর্বাঙ্গ ঘিবে—এ যেন গণিকাব নগ্ন দেহেব উপব লোভীব স্পষ্ট লুব্ধ দৃষ্টিব মত,—এতে কুণ্ঠা নেই, আববণ নেই, আলো-আঁধাবেব কোমল বহস্য ছিঁডে খান খান হযে গেছে।

তাই বলি, মা, লুকোচুবি খেলাব দিন আব নেই। এখন তোমাব ঐ ছলনাব অন্তবাল সবিযে বাইবে এস যেখানে মধ্যাহ্নেব সূর্য খবতেজে ইস্পাতেব মতো কঠিন হযে জ্বলছে—এখন আমাব এই আগুনেব ধাবায স্নান কববাব সময, সব দবজা খুলে দাও, দেহেব আববণ সবিযে ফেল,—আমাব উপব বৌদ্রেব সেই অনলধাবা বর্ষিত হোক, অঙ্গেব সকল নিভৃত বহস্যভবা কন্দব অগ্নিস্নানে সার্থক হযে উঠুক। এখন ত জীবনে সেই মহোৎসবেবই সময —চাবদিকে সকলেই তো সেই অগ্নিজলে স্নান কবছে। একটা তুচ্ছ সংস্কাব আমাব আত্মাকে, আমাব দেহকে এমন কবে আচ্ছন্ন কবে বাখবে?—তাকে আমি মাকডসাব জালেব মত ছিঁডে টুকবো টুকবো কবে ফেলতে চাই, মা।

লজ্জা নাবীব ভূষণ, এ যে কতবড মিথ্যা আমি আজ বুঝেছি। নাবী মাযেব জাত, কত বড নিষ্ঠুব অসত্য এই কথা'টা, তা বুঝতেও আমাব বাকি নেই। নাবী পূজনীযা, নাবী দেবী, এসব স্তোকবাক্যও মিথ্যা, একেবাবে নির্জলা মিথ্যায ভবা। আজ তুমি আমাকে আব ভোলাতে পাববে না, মা, দেখে বুঝে দগ্ধে-দগ্ধে আমি জেনেছি, এসব সত্যি নয, সত্যি নয। তেইশটি গ্রীষ্মেব খবতাপ আমাব উপব দিযে গেছে, তাই বলি, বুঝবাব বযস আমাব হযেছে—আব এই অভিজ্ঞতাযই জেনেছি লজ্জা নাবীব ভূষণ নয, কনকবল্লবীব মত দেহখানাকে বিশ্বেব বাসনাব সম্মুখে উন্মুখ কবে বাখাই নাবীব সার্থকতা।

কৈশোব বযসেব লজ্জাব আববণ যে কত নিষ্ঠুব, কত কুৎসিত ছিল আজ বুঝতে পেবেছি। এখানে যেও না ওখানে যেও না, এব সঙ্গে কথা ব'লো না ওব সঙ্গে কথা ব'লো না, এই বই প'ড়ো না ঐ ছবিটা দেখো না, মাথাব উপব আঁচল বাখবে, ওডনা ঠিক আছে কিনা লক্ষ্য বাখবে, পাযেব কাপড় যেন হাঁটুব দিকে না উঠে পডে দেখবে, শবীবেব এপাশ-ওপাশ যেন কাবো চোখে না পডে যায—কিন্তু কেন এসব? কৃপণেব ধনেব মত শবীবটা ঢেকে-ঢুকে অন্যেব দৃষ্টিব আডাল বেখে কী হল? সাত-সাতটা বছব তো দেখলাম, আর আজ কিনা এব কোন খদ্দেবই নেই।

ছিঃ ছিঃ, মা! আমাকে নিযে এতদিন কী হ্যাংলা কাঙালপনাই না তুমি কবেছ—কোথায যে তুমি কাকে যে আমাকে দেখাও নি তাই ভাবি। অমুকেব বাডি চাযেব নেমন্তন্ন, যেতে হবে, তমুকেব বাডি গানেব জলসা, বলে গেছেন, আজ তোমাব বাবাব এক বন্ধু আসবেন সপবিবাবে—তুমি

নিজের হাতে তাঁদের চা পরিবেশন করবে, কখনও পার্কে বেড়াবার অছিলায়, কখনও সিনেমা দেখাব ছুতো করে আমি সবই বুঝতাম, আর তুমিও কি বুঝতে না যে আমি বুঝছি? তবু তখন একটা পর্দা ছিল, লজ্জার একটা পাতলা ফিকে পর্দা কিন্তু কেন এসব, আমার কি আত্মসম্মান বলেও কিছু থাকতে নেই? এই কি নারী দেবী, নারী পূজ্যা? কখনও পাঁচজোড়া চোখ, কখনও সাতজোড়া চোখ যেন আমার শরীরটাকে তুরপুনের মত কুরে কুরে ছেঁদা করতে থাকত—আমি মাথা নুইয়ে যখন চা ঢালতাম, কিংবা জানলা দিয়ে পাশের বাড়ির ছাদের দিকে কিংবা দূরের কোন গাছের ডালপালার দিকে চেয়ে থাকতাম, তখন ওদের দিকে না তাকিয়েও বুঝতাম, আমার শরীরটাকে ডাক্তারের মড়াচেরার মতো চিরে চিরে তারা পরীক্ষা চালাচ্ছে। আর শুধু কি দেহের ডাক্তার ওরা, মনেরও—মনের কোন গোপন পরতে কোন গিঁঠ লেগে আছে কিনা, এটাও ওদের বুঝতে হবে। চোরের মতো মিচমিচে চোখে কেউ, ডাকাতের মতো ড্যাবড্যাবে চোখে কেউ, আমার ভাবী খদ্দেররা কী যে চেয়ে চেয়ে দেখত ওরাই জানে। কিন্তু আশ্চর্য, কেউ আমার সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলে নি—তারা দেখত, শুধু দেখত, কী দেখত? রূপ, রঙ—না না রূপ নয়, রঙ, শুধু রঙ—শুধু চামড়াটাই তারা দেখত। আমি কালো—এই অপরাধে পাঁচবার, হ্যাঁ এই সাত বছরে পাঁচ বার আমি বিকোবার অযোগ্য হয়ে গেছি। এঁরা চান দুধেআলতা আপেলরাঙা কোন জ্বলজ্বলে ফর্সা মেয়েকে—হোক না নিজে দেখতে আলকাতরার মতো. কিন্তু মেয়েটি চাই একেবারে বরফের পুতুল। দু-এক শ্রীমান তো একেবারে নিজেই এসেছিল দেখতে, তুমি না জানালেও আমি কি তা জানতে পারি নি? তুমি নিজেই মনে করে দেখ, কী চেহারা ছিল বাবুদের—একটার গায়ের উপর তো মনে হচ্ছিল মাছি ভনভন করছে, আর একটার কথা মনে হলে এখনও বমি আসে—ওয়াক্। মাগো। ঐ যে ঘুণধরা নপুংসকের মতো চেহারা বেহায়াটা, কোন নারীকে দেবার মতো ওটার কী আছে? ওর সঙ্গে শোয়ার চেয়ে, সব মেয়েরই বিষ খাওয়া ভালো—আরো ভাল ঘুম হবে।—কিন্তু কে বলে এসব কথা, আর কী করেই বা বলে? আমি ত ওর জন্যে চা ঢাললাম, বাটি করে ক্ষীর পরিবেশন করলাম—আর ঐ অসভ্যটা কিনা আমার মুখে থুথু দিয়ে চলে গেল · বিয়ের বড়ির

মতো এই অপমান আমাকে গিলতে হল,—আব তুমি তোমাব এই পোড়াবমুখী মেযেব জন্যে আবাব খদ্দেব খুঁজতে লাগলে—কেউ অনুগ্রহ কবে কিনা। আমাব মাথা খাও, মা। আব নয। এবাব তোমাব ঐ বেচাকেনাব খেলা বন্ধ কব—নইলে আমি পাগল, একেবাবে পাগল হযে যাব। আমি আব সহ্য কবতে পাবছি না, মা—আমাব ধৈর্যেব শেষ সীমায পৌছে গেছি।

মা গো, মনে পড়ছে প্রথম যখন ওবা আমায দেখতে এসেছিল। বুকটা আমাব হাপবেব মত ওঠানামা কবছিল—চোখেব সামনে বামধনুবঙা প্রজাপতিবা উড়ছিল, নাড়িব মধ্যে ভ্রমবেব গুঞ্জনেব মত ঝিমঝিমানি এসেছিল, কানেব ভেতব যেন সানাই-এব ধুন বেজে চলেছে চাবিদিকে হুলুধ্বনি, শাঁখেব শব্দ। গোলাপি পাগড়ি পবে ঘোড়ায চড়ে কে এসে যেন থামল সদব দেউড়িতে। ফুলেব ঘেবাটোপে একটা পালকি নববধূব মত সাজান হযেছে—তুমি আমাব কপালে চুমু খেযে আমাকে আশীর্বাদ কবছ—তোমাব মেযেব সৌভাগ্যসুখে তোমাব চোখে জল এসে পড়েছে—আমি কাঁদছি আমাব অজ্ঞাত জীবনে অজানা আশঙ্কায—কখন কেঁপে কেঁপে উঠছি, আমাব গাল এক মধুব লজ্জায বাবে বাবে সিঁদুব-বাঙা হযে উঠছে, চোখেব উপব পড়ছে স্বপ্নচন্দনেব প্রলেপ—খোলা চোখেই আমি স্বপ্ন দেখে চলেছি, মা

আজ সে স্বপ্ন ভেঙে গেছে। কী হযেছে তাতে? আমাব কোন দুঃখ নেই—যা গেছে যাক। আজ আমাব চাবদিকে খববৌদ্র, আগুন জ্বলছে আমাকে ঘিবে আমি জানি আমি সুন্দবী নই, কিন্তু এমন অসুন্দবই কি আমি? কলেজে পড়াব সময ছোকবাবা কী তৃষ্ণাব দৃষ্টি নিযেই না আমাকে দেখত। তাদেব সলজ্জ চোবা চাউনিব অর্থ কি আমি বুঝতাম না, মা? সে প্রার্থীব দল বেশি কিছু চাইত না, একটু টুকবা কথা, একটু হাসি—এতেই ওদেব প্রত্যাশা মিটত। বেশি হলে একসঙ্গে বসে চা-খানায বা কফিহাউসে একটু চা বা কফি খাই—এইটুকুমাত্র। কিন্তু আমি এমন একটা গাম্ভীর্যেব খোলস পবে থাকতাম, কেউ কিছু স্পষ্ট কবে বলতে পাবে নি আমাকে কখনও। তোমাব শিক্ষায আমি তখন নিজেই নিজেকে বক্ষা কবে চলেছি। কিন্তু আজ বুঝতে পাবছি, কী বিষম ভুলই না কবেছি তখন। এখন আমি আমাব কৃপণেব ধন বিলিযে দিতে চাচ্ছি, কিন্তু কেউ নেবাব নেই—তুমি আমাকে ফেবি কবাব জন্যে গলিতে গলিতে ঘুবছ, কিন্তু যে দেখছে সেই

মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। বুঝতে পারছ, মা? এতদিনে তোমার মাল পচে গেছে। দাগী পচা সওদা কে নেবে বলো?

এ সবই হল তোমার সেই লজ্জা নারীর ভূষণ ওই মিথ্যাচারের ফল—কত আদর করেই না এই ভূষণ আমার গায়ে তুলে দিয়েছিলে তুমি, আর মূর্খের মত আমিও তাকে কণ্ঠহার করে গলায় পরেছিলাম—আজ ওই কণ্ঠহারই কিনা আমার গলায় ফাঁস হয়ে আটকে গেল, কয়েদী যেমন হাতে-পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি নিয়ে চলে আমার লজ্জাও হয়েছে তেমনি। উঃ, কী মিথ্যা, কী ভয়ানক সর্বনাশা মিথ্যা তুমি শিখিয়েছিলে মা।

কলেজে পড়ার সময় প্রমীলা খান্নাকে কত ছোট নজরেই না আমি দেখেছি—তার দোষের মধ্যে সে শৌখীন রঙবেরঙা শাড়ি পরত, বেপরোয়াভাবে ছোকরাদের সঙ্গে মিশত, ওদের সঙ্গে পিকনিকে যেত, হোটেলে আড্ডা মারত—ওদের হৈ-হুল্লোড়ে প্রমীলা খান্নাকে না হলে চলত না, একসঙ্গে দু-দুটি বা চার-চারটি ছেলের সঙ্গে ওর প্রেম জমেছে—এ নিয়ে ছেলেদের মধ্যে রেষারেষি হয়েছে, চাকু চলেছে, দুর্নামে চারদিকে ঢি ঢি পড়ে গেছে—প্রমীলা খান্না য়ুনিভার্সিটি থেকে রাস্টিকেট হয়েছে আমার মতো লজ্জাবতীরা ওকে বাজারে-মেয়ে বলে তাচ্ছিল্য করেছি, সামনে পড়লে ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি, কিন্তু মনের গভীরে, আজ বুঝতে পারছি, তাকে ঈর্ষা করেছি।

কিন্তু কী হয়েছে প্রমীলা খান্নার এই দুর্নামে, রাস্টিকেট করে য়ুনিভার্সিটি তার কী করেছে, কী করেছি আমরা লজ্জাবতীরা তাকে ঘৃণা করে? জাঁক করে কত বড় অফিসারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। মডেল টাউনে কী চমৎকার বাড়ি প্রমীলা খান্নাদের। মোটর, আর্দালি-চাপরাসি, নানা জাতের হালফ্যাশানের কুকুর, কী নেই প্রমীলা খান্নার? হ্যাঁ, ছেলেপুলে নেই—নাই বা রইল ছেলেমেয়ে, ওরা তো ওসব চায়ই না—নিরর্থক ঝামেলা যত সব, নারীত্বের এত বড় শত্রু আর আছে নাকি? শরীর-মন সব ঝুলে পড়বে ঐ শিশুর দৌরাত্ম্যে—কোথায় থাকবে তখন তোমার তাজা ফুলের মতো যৌবন মিথ্যা, মিথ্যা, নারীর জীবনের সার্থকতা মা হওয়ায়—এ মিথ্যা কথা। নারী আসলে নারী, সে রমণী, কামিনী—মাতৃত্ব তার বন্ধন, আদিম যুগের একটা সামাজিক অসহায়তা, আর কী? আজ তারও সমাধান হয়ে গেছে, চিরযৌবনের অমৃতপাত্র তোমার হাতে এসে গেছে।

চল্লিশ বছরেও তোমাকে চোদ্দ বছরের মেয়েটির মত ফুটফুটে দেখাবে, তেমনি হালকা ফুলকা, তেমনি ঝরঝরে, তেমনি সুডৌল অঙ্গরেখা, তেমনি রসাক্ত রক্তিম ওষ্ঠ, চোখে কুমারীর উচ্ছলতা, চলনে স্ফূর্তির আবেগ যৌবনের এই রত্নমঞ্জুষা হেলায় ত্যাগ করে, কে তুলে নেবে বলো ক্লান্তির অবসাদের ঐ কুৎসিত, বোঝা? সব সময় চিন্তা—এটা কাশছে, এটার পেট নাবাচ্ছে, ওটার বুকে সর্দি বসেছে জীবনের আনন্দমূল্যে এই দুর্বহ ভার কে বইতে চাইবে বলো? তোমরা সব বেকুব ছিলে মা—একেবারে নিরেট বেকুব। তোমাদের যুগ গেছে, এখন নতুন যুগ এসেছে প্রমীলা খান্নাদের। সারা দুনিয়া ওদের দিকে এগিয়ে চলেছে, দেখতে দেখতে তোমাদের মিথ্যার উপর গড়া প্রাচীর পড়েছে ভেঙে· তুমি নিজে গিয়েই ঘুরে দেখে এস একবার, কোথায় গেল তোমাদের ঢসঢসে জবুথবু কাপড় পরা। এখন কাপড় পরা, হ্যাঁ, শরীরকে তা লুকোবে না—তাদের দৃষ্টির দিকে তাকাও, পাও কি সেখানে তোমাদের যুগের লজ্জার ছাপ? তাদের হাসি দেখ—কুণ্ঠার অপ্রতিভতার চিহ্নমাত্র নেই তাতে। এখন বুঝেছ, মা, নারীর সবচেয়ে বড় সম্পদ হল তার দেহ, শুধু বড় কেন, এটাই তার একমাত্র সম্পদও—জীবনের কারবারে তার পুঁজি তার ঐ শরীর, পুঁজি লাগালে তবে তো তার বৃদ্ধি হবে—বুঝেছি বুঝেছি, মা, তুমি কী বলতে চাও, ঐ সেই পচা পুরনো কথাটা, লজ্জা নারীর ভূষণ, আমার মাথার দিব্যি, তোমার ঐ ভূষণ তোমারই থাক, আমার ঘেন্না ধরে গেছে মা ঐ ভূষণে।

মা গো, লজ্জার ভার বয়ে চলাই নারীর জীবন নয়, জীবন আনন্দের জন্য—আনন্দ পাবার জন্য, আনন্দ দেবার জন্য। একে বাদ দিয়ে জীবনের কোন অর্থ নেই, কোন প্রয়োজন নেই—আর সবই মিথ্যা, মেকি, একটা ভড়ং মাত্র। আজকের মেয়েরা জীবনযাপনের এই সূত্রটি চিনে নিয়েছে, তবেই না দুহাতে তারা নিজেকে ছড়িয়ে দিচ্ছে—বেপরোয়া হয়ে এই দেওয়াতেই তো পাওয়া হ্যাঁ, আমার মতো মেয়েও আছে, সমাজে নুলো-আতুরদের দল এরা, এদের কী ভবিষ্যৎ আছে, মা, বলো আজকের দিনে? সময় এদের পিছনে ফেলে অনেক এগিয়ে গেছে, এরা সমাজের আঁস্তাকুড়ে যেখানে এঁটোকাঁটা জঞ্জাল ফেলা হয় তাতে স্থান পেয়েছে সময়ের দোষ কী বলো? সময় হচ্ছে আনন্দপুরুষ, জীবনের রসিক নাগর—সে কোন তুচ্ছ বন্ধনকে স্বীকার করে না, এগিয়ে

গিয়ে যে তাকে আলিঙ্গন করতে পারবে, সময় তারই হয়। এর জন্যই তো চারদিকে এত হুড়োহুড়ি, এই দৌড়ে যে পেছনে পড়ল, তার হয়ে গেল—ব্যস্।

কিন্তু আমি এভাবে মরতে চাই না—জীবনে উপেক্ষিত, বঞ্চিত, তিরস্কৃত—গায়ে কেরোসিন ঢেলে, গলায় ফাঁসি দিয়ে, রেলের তলায় মাথা রেখে, নদীতে ঝাঁপ দিয়ে—না, না, আমি বাঁচতে চাই, যুগের সঙ্গে আমি ছুটে চলব—আমার পায়ে তোমার দেওয়া বেড়ি আমি ভেঙ্গে ফেলব· আজ আমার চোখ খুলে গেছে, তুমি আমাকে সব মিথ্যা কথা শিখিয়েছ, মা। লজ্জা নারীর ভূষণ নয়, ভূষণ হতে পারে না—নারীর ভূষণ নির্লজ্জতা, যে যত নির্লজ্জ সংসারে তারই তত জিৎ দেখছ না সারা সংসার নির্লজ্জাদের চৌকাঠের উপর গিয়ে নাক ঘষছে—যে তাকে গালি দিচ্ছে, সেই সব চেয়ে বেশি নির্লজ্জতায় কত লাভ দেখলে, মা? ওরা তোমাদের বাসি নীতি-নিয়মকে কাঁচকলা দেখিয়ে এগিয়ে চলেছে, সব পুরুষের মধ্যেই যে আদিম পশুটা আছে, নির্লজ্জারা তার সঙ্গে তার ভাষাতেই কথা বলতে পারে—সোজা করে, স্পষ্ট ভাবে, কোন ঢাকাঢুকি নেই, আড়াল-আবডাল নেই, একেবারে স্পষ্ট মাথা নুইয়ে ফেললে, মা। মাথা নোয়াবার কিছু নেই—ওই পশু সকলের মধ্যেই আছে, অজর অমর অবিনাশী সনাতন পশু। ওকে ভোলাবার চেষ্টা করে লাভ হবে না।

ঐ পশুকে আমিও দেখেছি, মা। কয়েকবারই দেখেছি, নানা রূপেই দেখেছি প্রথম বার কী ভয়ই নয় পেয়েছিলাম নয় বছর আগের কথা, তারিখও আমার স্পষ্ট মনে আছে—১৭ই অগস্ট, ১৯৫৬ তখন আমরা এ বাড়িতে আসি নি, মোতীবাগের বাড়িতে, বাবা তখনও বেঁচে আছেন—তোমরা সব সাহারানপুর গিয়েছ কাকাকে দেখতে, বাড়িতে আমরা শুধু দুজন আছি—আমি আর মুকুল। মনে পড়ছে, পরের দিন আমার কম্প দিয়ে জ্বর এসেছিল—মুকুল ছুটে ডাক্তারবাবুর কাছে গেছে, একেবারে ডাক্তারবাবুকে নিয়েই মুকুল ফিরে এল। ডাক্তারবাবুকে মনে পড়বে তোমারও নিশ্চয়—সেই নীরদ সেন, বাবার বন্ধু, তোমাকে বৌদিদি বলে ডাকতেন, আমি ছিলাম তাঁর 'সবযূ বেটী' ডাক্তারবাবু ব্লাউসের গলার ভিতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে স্টেথেস্কোপ লাগালেন, একটু পরেই বললেন পাশ ফিরে শুতে—

পিঠে স্টেথোস্কোপ দিয়ে তিনি আবার শব্দ শুনতে লাগলেন—কী শব্দ তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন, তিনিই জানেন, দেখলাম হঠাৎ ডাক্তারের চোখদুটো চকমক করে জলে উঠল—কী ভয় যে পেয়েছিলাম, মা ডাক্তার মুচকি হেসে মুকুলকে বলল, হার্টে কনজেস্‌শন, প্রেস্‌ক্রপশন লিখে দিচ্ছি, যাও চট করে গিয়ে অ্যান্টিফ্লোজিস্টিন নিয়ে এস—আমি নিজেই বেঁধে দিয়ে যাচ্ছি মুকুল ফিরে এল, স্টোভ জালিয়ে অ্যান্টিফ্লোজিস্টিন গরম করে দিল, ডাক্তার পকেট থেকে রুমাল বের করে গরম ডিবা হাতে করে নিল ডাক্তারের চোখদুটো আবার পলকের জন্য ঝকমক করে উঠল, আমার মনে হল যেন চিৎকার করে উঠব, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না হঠাৎ একটু হেসে ডাক্তার বলল, ঐ যাঃ, ভুল হয়ে গেছে, লিণ্ট্‌ আর গজ তো আনা হয় নি—যাক, কাছেই দোকান আছে, যাও চট্‌ করে লিণ্ট গজ নিয়ে এস। মুকুল বেরিয়ে গেল, ডাক্তার ছুরি দিয়ে আমার বুকের ঠিক মধ্যিখানে খানিকটা ওষুধ রাখলে, তারপর হাত দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে সরিয়ে দিতে লাগল উঃ, সেদিনের ঘটনাগুলো আমার স্মৃতিতে কেউ যেন পোড়া লোহা দিয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে রেখেছে। কিন্তু চিৎকার করে উঠলাম না কেন, চিৎকার করতে পারলাম না কেন—জানি না। শুধু কি ভয়—একটা অন্ধ ভয় শুধু, না কোন বিহ্বলতা, যার আচমকা আঘাতে সব শক্তি লোপ পেয়ে যায়, না কি কোন অনাস্বাদিত অনুভূতি কী জানি, কিছু ভাল করে বুঝতে পারছি না।

মুকুল আসতে আসতে অ্যান্টিফ্লোজিস্টিনের প্লাস্টার বসানো হয়েছে, আমি থরথর করে কাঁপছিলাম, জ্বরের কম্প নয় তা পাপের সঙ্গে এবং পাপের গ্লানির সঙ্গে ঐ আমার প্রথম পরিচয় আমার নিজের কাছেই নিজের লজ্জা করতে লাগল, ডাক্তারের চোখে চোখ পড়তে আমার মন ঘৃণায় ভরে গেল অনেকদিন পর, তোমরা ফিরে আসারও অনেক পরে, ডাক্তার একদিন আমাকে একা পেয়ে ক্ষমা চেয়েছিল—আমি সেদিনও ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু আজ ভাবছি, ডাক্তার ক্ষমাই বা চাইতে গেল কেন? এইজন্যই কি, যে একটি কুমারী মেয়ের দেহ তার কাছে লোভনীয় মনে হয়েছিল? কিন্তু তাতে এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার কী ঘটেছে, যে ডাক্তারকে ক্ষমা চাইতে হবে? যদি ভয়ঙ্কর ব্যাপারই হয়, তাহলে আশি বছরের বুড়ো কী

কবে নাতিপুতিব বয়সী মেয়েকে বিয়ে কবে? আব সমাজই বা কী কবে তাব উপব আপন সমর্থনেব ছাপ লাগিয়ে দেয়? ও, সেখানে বুঝি পুরুতেব মুখেব অনুস্বাব বিসর্গেব ছিটা দিয়ে ব্যাপাবটাকে শুদ্ধ কবে নেওয়া হয়? আসলে ডাক্তাব 'সবযূ বেটী' ডাকলেও, আমাব কুমাবী দেহটাব আকর্ষণ যাবে কোথায়? · ডাক্তাব মূর্খ, মূর্খ ছিল ডাক্তাব—মবে গেছেন, ভগবান তাঁব আত্মাকে শান্তি দিন, তবু তিনি তো ক্ষমাই চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি কী মূর্খ, ঘৃণায় মুখ ফিবিয়ে নিলাম। শুনতে যত অশ্লীল, যত তেতোই মনে হোক না কেন, এটা তো সত্যি যে নাবী পুরুষেব কাছে নাবীই, অন্য সবকিছু সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক মাত্র—এসব আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ ঘটনাচক্রে মানুষেব আদিম ক্ষুধাকে স্তব্ধ কবে বাখা য'য ·

নবযুগেব নাবী এই সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে প্রমীলা খান্নাব দুর্দান্ত প্রাণাবেগেব এই তো বহস্য। প্রমীলা খান্না সমাজেব অগ্রগামিনী, সে পথিকৃৎ, সে নমস্যা—তাবই পথে আজ সমাজ চলেছে। ফাটকাবাজাবে পুঁজি খাটাবাব বেপবোয়া পন্থা শিখে নিয়েছে প্রমীলা খান্না—ওকে কেউ আটকাতে পাববে না দোহাই তোমাব, একবাব বাইবে এসে দেখ, মা—দেখ, কেমন চলেছে এবা সব কী ঝলমল-কবা চোখ-ধাঁধানো সাজ, চোখে কী তীক্ষ্ণ নির্লজ্জ দৃষ্টি, কেমন বুক টান কবে বেপবোয়া চলেছে। আহা। দেখ, দেখ—কোমবেব দোলনটুকু, দেখেছ কী কষে বাঁধা কাঁচুলি, শবীব ঢাকবাব জন্যে নয় ওটা মা, শবীবকে ফুটিয়ে তোলাব জন্য—ওটা ছুঁডে ফেলে দিলেই দেহটাকে কম উলঙ্গ মনে হবে দেখেছ ওদেব চলনে কেমন মাতালেব মত্ততা, কেমন জুয়াবীব অন্ধতা, কেমন খেলোয়াডেব ব্যগ্রতা ঐ শোনো, মিছিল থেকে ওবা বলছে, এস বিশ্বসংসাব, দুচোখ ভবে আমাদেব রূপবাশি দেখে নাও, পৃথিবীতে ভগবানেব শ্রেষ্ঠ বব নাবীব যৌবন, এতে সকলেবই অধিকাব আছে এস, আমবা কাউকে বঞ্চিত কবতে পাবব না আকাশ থেকে রূপেব যে উজ্জ্বল বর্ষা নেমে এসেছে—এস এস, আজ সকলে মিলে আমবা তাকে উপভোগ কবি ··

মা, আজ শেষবাবেব মতো তুমি আব একবাব আমাকে বেচতে চাইলে · বেশ তো পুতুলেব মতো সাজিয়ে গুছিয়ে ওদেব সামনে নিয়ে খাডা কবলে · কিন্তু কী ফল পেলে, মা? খদ্দেব তো মুখ ফিবিয়ে চলে গেল—শুনিয়ে গেল, মেয়ে কালো। ··কালো, কালো, কালো, এ তো শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা

হযে গেল—কালো ছাড়া কি এ দেহটায আব কিছু দেখাব নেই? ইচ্ছে হয সামনেব আয়নাটায যেমন আমাব ছবি পড়েছে, তেমনি জগতেব সামনে নিবাববণ কবে নিজেকে একবাব তুলে ধবি—বলি, তোমাদেব অন্ধ চোখ শুধু বঙটাব উপব গিযে থমকে দাঁড়ায কেন, দেখতে পাও না এতে আবও কত নিবিড় জিনিস আছে—দেখতে পাও না এতে হৃদয আছে, হৃদযে বাসনা আছে, ফোটা ফুলেব মত আপন ভাবে সমর্পিত হযে ঝবে পড়তে চায সে হৃদয—আব যদি ততটুকু চোখ না যায, তবে শবীবটাও তো ভাল কবে দেখতে পাবো—সেখানে তো যৌবন আছে, মাদকতা আছে।

না। আব তুমি আমাকে বাধা দিও না, মা। আমি তোমাদেব ঘবেব বেড়া কেটে বেবিযে পড়ব, দেখব নাবীব যে দেহ নাবী হিসেবে আকর্ষণীয়, বিযেব বাজাবে তাব আকর্ষণ নেই কেন—সেখানে কেন নিন্দা, তিবস্কাব তাব প্রাপ্য হয জানি, মা, এ সহজ খেলা নয, জানি না এব পবিণাম কী হবে, বেলেব তলায মাথা দেওয়া যাই হোক, যাই হোক

বিদায মা গো, বিদায। আমি চললাম, মা—জগতেব হাটে নিজেকে বিকোতে চললাম, হ্যাঁ মা, বিকোতেই চললাম, কিন্তু বিশ্বাস কবো মা, কোনো উদাসীন ক্রেতাব হাতে নয, সেই দুটি হাতে মা, যে দুটি হাত প্রথমে তোমাব সবযূব হাতে লগ্ন হযে তাব কাছে বিক্রীত হবে যেখানে আনন্দ পাওযা আব দেওযায ভেদ নেই, যেখানে কেনা আব বেচাব মধ্যে ভেদ নেই, যেখানে এক অপবে প্রবিষ্ট, পবস্পব অভিন্ন

হিন্দী থেকে অনুবাদ সুবোধ চৌধুবী

•

হওয়া না-হওয়া

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মিতু বলল "বাবা, তাহলে আমি মা হযে যাই ?"

মণিমোহন পুবদিকেব জানলাব নিচু পাল্লা দুটি বন্ধ কবতে কবতে ঘাড ফিবিযে বলল "আব আমি ?"

মিতু কনকেব মতো ঠোঁট টিপে হাতেব মুদ্রায হাসি ফুটিযে বলল "আব কি, তুমি তাহলে মিতুই হযে যাও।"

মিতুব সেই উজ্জ্বল আব নিষ্পাপ চোখদুটোব দিকে তাকিযে মণিমোহন কনকেব জন্য বড মাযা বোধ কবল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাইবেব দিকে তাকাল। আব সঙ্গে সঙ্গে তাব সমস্তটা মন বিস্বাদ হযে গেল। বাস্তাব ধাবে ডিঙ্গি মেবে বসে কে-একজন পেচ্ছাপ কবছে—পবনে গামছা, কানে পৈতে, মুখে ব্রাশ-ঘষাব মিহি শব্দ। পুবোদস্তুব মিলিটাবি ইউনিফর্ম পবা নিতাই পাশে দাঁডিযে চাপা গলায তাকে কি-সব বলছে। নিতাইযেব বগলে ভাঁজকবা খববেব কাগজ। দেখে মণিমোহন অধীর হযে উঠল। লোকটি ঐ ডিঙ্গিমাবা অবস্থাবই হাসতে হাসতে ঘাড ঘুবিযে জানলাব দিকে তাকাতে, মণিমোহন তাব মুখ দেখতে পেল। অনাথ। কষ দিযে সবুজ ফেনা গডাচ্ছে। আটটা বাজলে চাপা প্যাণ্ট আব টেবিলিনেব শার্ট পবে কাবখানায বেরুবে। "বাত্তিবে ক্যামেবা কোলবালিশ ". কযেকটা মাত্র কথা কানে এল। কৌতূহল ও অস্বস্তি বাডাবাব জন্যই যে এবা নিচুগলায আলাপ কবছে, তা বুঝতে পেবে মণিমোহন জোব কবে জানলাব সামনে দাঁডিযে বইল। উল্টোদিকে বাস্তাব গাযে বেশ খানিকটা জমি। সবকাবডাঙ্গা। কথা আছে ফ্ল্যাট উঠবে। কিন্তু লো না মিডল্—কোন ইনকাম গ্রুপেব জন্য, তা ঠিক কবা

যায নি বলেই জমিটা এতকাল পড়ে আছে। ছেলেবা ওখানে প্যাবেড কবে, খেলে। গ্রীষ্মকালে সন্ধেবেলা ব্যাবাকেব বযস্ক পুরুষবা তাসেব আড্ডা বসায়। এই জানলা আব ফাঁকা আকাশটুকুব লোভে ঘবটি কনকেব পছন্দ হযেছিল। সবকাবডাঙ্গায যথাবীতি বেশ কযেকজন ছেলে জড়ো হযেছে দেখল। অনেকে তাদেব পেট পুবে খেতে পায না, কিন্তু পবনে ইউনিফর্ম। সেটি নাম লেখালেই পাওযা যায। হবেনবাবুব ছোট ছেলে বিশু চোখ কচলাতে কচলাতে আসছিল, হঠাৎ থমকে দাঁড়িযে অনাথেব পাশেই বসে পড়ল। নিতাই বলল "কি বে, এখনও ঢুলছিস যে।" অনাথ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল "সবে মাযেব কোল ছেড়ে এল—একটু সময লাগবে না? ও যতই প্যাবেড কবাও—বাঙালিব বাচ্চাব গাযে কাঁথাব গন্ধ থাকবেই।" কথা শেষ কবে সমর্থনেব প্রত্যাশায মণিমোহনেব দিক তাকাল। মণিমোহন ভাবলেশহীন মুখে অনাথেব মাথা ডিঙিযে সবকাবডাঙ্গাব ছেলেগুলিব দিকে তাকিযে বইল। বছব বাবোব বিশু ঐ ডিঙ্গিমাবা অবস্থায বসেই ঘাড় ফিবিযে উত্তব দিল "তেমন মাযেব দুধ খাই নি, বুঝলে অনাথদা? দস্তুবমতো মিলিটাবিতে যাব, পাইলট হব—তবে আমাব নাম বিশ্বেশ্বব।" নিতাই প্রশ্রযেব হাসি হেসে বলল "হ্যাঁ, বিশেটা বাহাদুব আছে। সেই ফুলবাগানেব হাঙ্গামাব সময ও একাই তো মজিদেব দোকান হাপিস কবল।" মণিমোহন জানলাব কাছ থেকে সবে এল। পুজুবি বামুনেব ছেলে বিশু, স্কুলে পড়ে—আবাব মাঝেমধ্যে নামাবলী গাযে যজমানবাড়িও যায। ওব ছোটভাই খোকন মিতুব বন্ধু। মনে মনে না বলে পাবল না "হায হতভাগ্য।" সঙ্গে সঙ্গে তাব চিন্তায সায জানিযে টিকটিকিব সেই অমোঘ ডাক শোনা গেল। মণিমোহন লক্ষ কবল মিতু ঘাড় ফিবিযে দেযালেব দিকে তাকাচ্ছে না। তাব চোখে মুখে বিস্ময বা কৌতুকেব কোনো অভিব্যক্তি নেই।

দক্ষিণেব জানলাব ওপবকাব দুটি পাল্লা বন্ধ কবতে কবতে উঠোনেব দিকে চোখ পড়ল। কনকেব টবেব লতায একসঙ্গে তিনটি অপবাজিতা ফুটেছে। ডীপ ব্লু আস্তে আস্তে তবল হযে স্তম্ভিত ঢেউযেব মতো শাদাব গাযে থমকে দাঁড়িযেছে। বোঁটাটি গাঢ় সবুজ। ইচ্ছে হল মিতুকে ডেকে দেখায। কিন্তু তাহলেই সিঁড়িতে কেউ না কেউ এসে দাঁড়াবে। কিছু না কিছু কথাবার্তা। ববং কনক ফিরুক। আবাব তাব ভাবনায সায দিযে টিকটিকিটা ডেকে

উঠল। মণিমোহন লক্ষ্য করল এবারও মিতুর চোখে মুখে কোনো ভাবান্তর নেই।

তাহলে এই শিশুও ক্রমশ শব্দে গন্ধে দৃশ্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে? দীর্ঘশ্বাস চেপে মণিমোহন বলল "না, আমি মিতু হব না, বাবা থাকব। তুমিও মিতু থাকো। আগে লেখাপড়া হবে, তারপর—।"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মিতু বলল "তারপর আমি মা হব?"

"হ্যাঁ।" মণিমোহন ভাবল একটু যদি চা পাওয়া যেত। খিলখিল করে হাসতে হাসতে কারা যেন সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠে গেল। মণিমোহন লজ্জা পেল। মিতু চারদিন দুধের মুখ দেখে নি। সকালের জায়গায় বিকেল হলেও এখন তবু দুধ বলতে কিছু একটু জুটছে। কনক হরলিকসের বোতলে করে স্কুল থেকে দুধ আনে। তাদের টিচার্স রুমে যে হিন্দুস্তানী গোয়ালা চায়ের জন্য দুধ যোগায়, লজ্জার মাথা খেয়ে দারোয়ানকে বলে কনক তারই সঙ্গে ব্যবস্থা করেছে। জল দেওয়া মোষের দুধ, দাম বেশি—তবু মিতুকে সেটুকু খাওয়াবার জন্য তাকে কত গ্লানিই না সইতে হচ্ছে। যখন স্বামী স্ত্রীর হাত ধরতে লজ্জা পায়, ভয়, পিতা সন্তানকে আদর করতে লজ্জা পায়, ভয়, তখন ট্রামে বাসে চেপে মা তার বাচ্চার জন্য বোতলে দুধ আনবে—এর থেকে গ্লানির, এর চেয়ে হাসির ব্যাপার আর কি হতে পারে? সমস্ত স্বাভাবিকতার মৃত্যু এইভাবেই ঘটছে। জেনে, না জেনে। আর প্রতিবাদ করেছ কি তাকে খাঁচায় পুরে দেওয়া হবে।

মণিমোহনের ভাবনায় সায় দিয়ে আবার টিকটিকি ডাকল। মণিমোহন মনে মনে বলল 'থুঃ।" অজ্ঞাতে তার দুটো কান উৎকর্ণ হয়ে উঠল কোনো একটা মন্তব্য শোনার জন্য। কিন্তু না পুবের জানলা, না দক্ষিণের সিঁড়ি—কোনোদিক থেকে কিছুই কানে এল না। মণিমোহন লক্ষ্য করল মনে মনে একচোট ঝগড়া করবার জন্য কেমন সে প্রস্তুত হয়ে উঠছিল। করতে না পেরে এখন কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। অথচ সমস্ত কোলাহল এড়াবার জন্যই তার এই বনবাস।

"বাবা দ্যাখো, আমি বাবু হয়ে বসেছি। আমি ভালো না?"

অনুতাপে কাঁপা গলায় মণিমোহন বলল "তুমি তো লক্ষ্মীছোনা।"

"আমি তোমাব একটামাত্র। আমি তোমাব লক্ষ্মীছোনা। আমি তোমাব 'আমবা ছুটি ভাই'—না বাবা ?"

"হ্যাঁ, এইবাব পড়ো।"

অত্যন্ত বাধ্যেব মতো আব বেশ একটা অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মিতু উবু হযে শুযে পড়ল। আড়চোখে তাকিযে দেখল ছুটো বালিশই মণিমোহনেব দখলে। চাইলে ব্যাপাবটা তাব নজবে পড়ে যাবে, তাই কনুইযে ভব বেখে হাতেব তালুতে গাল পেতে বেশ আবেগেব সঙ্গে চিৎকাব কবে পড়তে শুরু কবল—"য-ফলা উঁচিযে লাঠি হাঁকে মাব্ মাব্, ব-ফলা আসছে তেড়ে বাগিযে তলোযাব।"

আব, সবকাবডাঙ্গায হুইসিলেব শব্দ শোনা গেল। তাবপব নিতাইযেব কমাণ্ড—"এ্যা-টেন্-শন্।"

মণিমোহন ধড়মড় কবে উঠে বসল। প্রায আর্তনাদ কবে বলল "থাক থাক, ও-বই এখন পড়তে হবে না।"

মিতু অবাক হযে বলল "মা যে পড়া দিযে গেছে ?"

"আমি মাকে বলব। এখন একটু গান হোক।"

মিতু সোৎসাহে উঠে বসে বলল "ধনধান্যে ?"

"হ্যাঁ।" কথাটা বলেই সে তাব শবীবেব যত্রতত্র সেই চেনা ও কষ্টকব একটা প্রতিক্রিযা অনুভব কবতে লাগল। যেন কোন অদৃশ্য উপাযে তাকে ইলেকট্রিক চার্জ কবা হচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে সে মনে মনে বলল—কক্ষনো না।

আব একটা বাচ্চা কোথায চিৎকাব কবে কেঁদে উঠল। আব যতীনবাবুব গর্জন শোনা গেল—"দাঁত খুলে নোব। এতবড় সাহস ?" মণিমোহন আবাব নিঃশব্দে বলল—কক্ষনো না।

মিতু উঠে দাঁড়িযে জোড়হাতে গান ধবল। মণিমোহন তাব হাতেব ভঙ্গিতে বোঝাল, সে-ও উঠে দাঁড়িযেছে। তাবপব দাঁতে দাঁত চেপে মিতুব সঙ্গে গলা মিলিযে গান গাইতে লাগল "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।"

"লেফট বাইট লেফট। 'বাউউট টার্ন। লেফট। লেফট। লেফট বাইট লেফট "

"সকল দেশেব   "

"মাছ কি আমি গডাব ?" "তাই বলে ছেলেটা একটু পথ্যি কববে না ?' যমেব মুখ থেকে ফিবে এলো ?" "তো নিজে বাজ'বে যাওনা। দেখে শুনে কিনে আনো।" "তাই যাব। ওই তো মিতুব মা—স্কুল কবে বাজাব সেবে ফেবে। সেও ম্যাস্টাবনি, তুমিও ম্যাস্টাব। বলে মাছ নেই। এইমাত্র ডালা মাথায হেঁকে গেল।" "কি বিপদ, সেদিন ছেলেবা হামলা কবেছে বেশিদামে মাছ বেচতে দেবে না—জেলেগুলো তাই বাজাবে বসছে না। আবো চডা দামে এদিক-ওদিক বেচছে।" "তো ছেলেপুলেকে কি খেতে দেবো ? কি খেযে বাঁচবে ওবা ? ইদিকে হামলা কবলি। আবাব তোবাই তোদেব বাপ-জ্যাঠাই কোন মুখে বেশি দামে মাছ কিনিস ? ঘুষেব টাকা—ঘবে আব ধবছে না। ভেবেছিস কি, ভগবান নেই ? একটা কোনো বিহিত হবে না ?" পবেশবাবু স্ত্রীব মন নবম হযেছে ভেবে ঠাট্টা কবলেন "কেন, সবকাব থেকে সেইজন্যেই তো বলছে—সংসাবটা একটু গোছাও। মেল ট্রেন ছেড়ে লুপলাইন ধবো।"

"—বাউউউট টা-র্ন। লেফট। লেফট। লেফট বাইট লেফট।"

"কোথাও খুঁজে পাবে না-কো-ও তুমি—"

হঠাৎ গান থামিযে মিতু বলল "বাবা, ভিক্ষে।"

মণিমোহন শুনতে পায নি। তাব কান ছিল পবেশবাবুদেব দিকে। পবেশবাবুব স্ত্রী কনককে প্রশংসা আব যতীনবাবুকে খোঁটা দেওযায আশ্চর্য যে মনটা একটু খুশিখুশিও লাগছে। সে শুনতে পায নি। কিন্তু সাতসকালে বাচ্চাকোলে বাস্তা দিযে ভিক্ষে চাইতে চাইতে যে মেযেটা ডেকে গেল—তাব গলা মিতুব কান এডায নি। মণিমোহন তোষকেব তলা থেকে একটা নযা পযসা বাব কবে দিল। মিতু দৌড়ে জানলাব কাছে গিযে হাত বাব কবে ডাকতে লাগল "এই যে, এই যে—ও ভিক্ষে দিদি।"

"মি-তু।"

"ডালিযাদিদি।"

"ওমা! তুই ভিক্ষে দিচ্ছিস ? আমাব বাবু না ভিক্ষে দিলে খুব বাগ কবে।"

"কেন ?"

"বলে—খেটে খেতে পাবো না? বাচ্চা কোলে ব্যাবসা। ওদেব ববেবা নাকি ওদেব ভাডা খাটায।"

"তুমি কোথায যাচ্ছ?"

"ডিসপেনসাবি।"

"আমাকে নিযে যাবে?"

"মেসোমশাই তোকে বেবোতেই দেবেন না।"

"বাবু, আমি একটু ডালিযাদিদিব সঙ্গে ডিছ্‌পেনচাবি যাবো?"

"সে কি? আমাদেব এখন কত কাজ, তুমি যাবে কি কবে? ডালিযাদিদিকে টা টা কবে দাও।"

'ডালিযাদিদি, টা টা।"

"বাই বাই।"

"বাটাব জুতো চাই।"

মিতু মুখ গম্ভীব কবে বলল "বাবু, হুপুদিদি দুত্তু।"

'কেন?"

"আমাকে ভেঙ্গাল।"

"ও বাচ্চা তো? বোঝে না।"

"আমি কাউকে ভেঙ্গাই না। আমি বড নয?"

"হ্যাঁ।" মণিমোহন ক্লান্ত বোধ কবল। নিশ্চযই ডালিযাব কথায কোনো বিশেষ ইঙ্গিত নেই। আব কি অসভ্যেব মতো বাঁচা। কোথায কি ঘটছে কিছুই জানবাব উপায নেই। কনক ফিবলে তবে খববেব কাগজ। তাও যদি কিনতে পায। মাঝে মাঝে এদিক থেকে ওদিক থেকে সত্য মিথ্যে খববেব ভগ্নাংশ শুনব আব আমাব টেনশন বাডবে। কিন্তু কি হযেছে জানতে পাবব না।

"আমি ভালো না?"

"খুব ভালো। এইবাব চিঠি লেখ তো কযেকটা—মাকে, ঠামাকে, বাবাকে।" কটা বাজল? কনকেব ফিবতে সেই বাবোটা। যদি একটু চা পাওযা যেত। সত্যি কনক, কি ভাবে এত সইছ? এত জোব কোথা থেকে পাও? আমি তো পাবি না। দৌডতে দৌডতে স্কুলে গিযেছ, দৌডতে দৌডতেই ফিববে, তাবপব দৌডতে দৌডতে শুরু হবে তোমাব সংসারের

পাট, সেবে উঠতে বিকেল চাবটে। কি অসম্ভব বোঝা একটা বইছ। আব সর্বত্র এক অকাবণ নিষ্ঠুবতা সেই বোঝাকে কি অবিশ্বাস্য ভাবী কবে তুলছে। কতদিন, কনক, কতদিন এইভাবে পাবা যাবে? এত অপচয আব সহ্য বয না। এই অনিযম। আমাব দবকাব কাজ, তোমাব একটু বিশ্রাম। কিন্তু কিভাবে? কনক, কনক, আমাব ভুঁইচাঁপা।

"জোছ্না, ওবে অ জোছ্না—এখনো নিচে নামতে পাবলি নি? বলি ভাইকে কি আমি ছুঁচিযে দেব?" "সেই থেকে বাবুকে ডাকছি তো। হেগোপোঁদে তিনি যে মলিনেব অঙ্ক কষা দেখছেন"। 'হুঁ, বড বযেসে জাহাজ হবেন—বিদ্যেব ঘোডা তাই এখন চাদ্দিকে দাপিযে বেডাচ্ছে। এক কাঁডি হেগেছে দ্যাখো বুডো-মানুষেব মতো। আব কি গন্ধ বাবা।"

না, মিতু নির্বিকাব। নিশ্চযই এই বিশ্রী গন্ধটা ওকে সইতে হচ্ছে না। ঝুঁকে আপন মনে চিঠি লিখছে। আমি এই খাঁচাব জানলা আটকে মিতুব চোখ বাঁচাতে পাবি, কিন্তু কান বন্ধ কবব কি কবে? সমস্ত শব্দ কি নিজেব অজ্ঞাতে ওব স্মৃতিতে জমা হচ্ছে না? আব তুমি? অহর্নিশি এই বেডাজালে আটক থেকে, ওহে শ্রীমান, কতদিন তুমি নিজেকে বাঁচাতে পাববে? কাল হঠাৎ যোগেশবাবুব ঐ গানই কি তোমাব ভালো লেগে যায নি? কোথায থাকছে রুচিব সেই প্রবল অভিমান?

"যাবে আব কোথায? চাকবিব নাম কবে বেবিযে—"

"যা বলেছিস, মিল্ক ডিপোব কাজে এত সময লাগে?"

"এই, বড মামা।"

মণিমোহন কানে হাত দিযে শুযে বইল। যা কিছু সুন্দব স্মৃতি, তাকে কলঙ্কিত কবা হযেছে। একদা বৌযেব সঙ্গে ঘোডাব গাডি চডে বেডাতে গিযেছিলাম, বিস্মৃতিব কবব খুঁডে সেই ইতিহাস টেনে বাব কবা হযেছে। তাইআমি ঘোডা। যা কিছু শুদ্ধ—তাকে কলঙ্কিত কবা হলো। কিছুই আব গোপন নয, ব্যক্তিগত নয। একদিন এব সবটাই ঘুবে আসবে।

"উাউউট-টার্ন। লেফট বাইট লেফট। লেফট লেফট।"

এবা দেশেব জন্যে তৈবি হচ্ছে। মণিমোহন, তোমাব দেশ কোথায? মানুষকে ভালোবেসে মানুষেব কাছ থেকে দূবে থাকায কোন অভীষ্ট

-লাভ হবে। নিজেব হাত কলঙ্কিত করবে না বলেছিলে। কিন্তু অস্তিত্ব? সে যে চাপে চাপে বিকৃত হযে যাচ্ছে।

আবাব সেই শক্। বিবমিষা বোধ কবল। "কি অত্যাচাব বলো দিকি নি। এবা ঘবেও টি঺কতে দেবে না?" মেজগিন্নিব গলা সিঁড়ি বেযে নিচে নামছে। আশ্চর্য—মুখে থুথু জমা হচ্ছে। ওদিক দিযে বলায, এদিক দিযে নিষ্ঠীবন ত্যাগে বাধ্য কবে। যদি বাইবে গিযে ফেলি—মেজগিন্নি ভাববেন তাঁকে অপমান কবছি। যদি বাস্তাব জানলা দিযে ফেলতে চাই—নিশ্চযই দেখব দৃষ্টিসীমাব মধ্যে কেউ গামছা পরে দাঁড়িযে আছে। থুথু ফেলা যাবে না, মাঝেব থেকে চোখেব চবিত্রও নষ্ট। এতএব এই থুথু গিললাম। ভেবেছ সব জাযগায, সব সময, তোমাব সব হিসেব মিলবে? স্কাউণ্ড্রেল।

"না বে, চোব নয। পাল্লায পড়ে—"

"বাখ বাখ। কচি খোকা।"

"চাকবি তো যেতই। মানে মানে আগেই সবে পড়েছে।"

"ফুসলে বিযে কবে—"

"ধুব, বউটাই ছেনাল।"

"বুড়ি, তাব আবাব ডাঁট কত। দেখিস তো নি।"

"দুটোয যা ঝগড়া কবে।"

"হ্যাঁ। বাচ্চাটাবই কষ্ট।"

"বাড়ি থেকে ত্যাখে না?"

"ঢুকতে দিলে তো।"

"না বে, মাল যে আবা—"

"ওসব পলিটিকসেব গপ্প বাখ তো। কত হাতি ঘোড়া বলে পাব হযে যাচ্ছে।"

"যা বলেছিস। নিশ্চযই মাসোহাবা পায।"

'মানে বঞ্চিত?"

"হ্যা হ্যা হ্যা। মাসী তাহলে—"

"ইযা ইযা।"

ত্রিশ বছবে তোমাব মাথাব চুলে পাক ধবেছে। শোনো কনক,

তোমায এবা অভিনন্দন জানাতে এসেছে। আমাকে ভালোবেসেছিলে, পিতাব আশ্রয ছাডতে হলো। আমাকে ভালোবেসে, শ্বশুববাডিতেও জাযগা পেলে না। আমাকে ভালোবাসো—তাই উঠতে বসতে তোমাকে শুনতে হয তুমি ছেনাল। এই দেশে এই সময়ে ভালোবাসাব এই তো পাওনা। ঐ যাবা গল্প কবছে—তাদেব একজনেব গলা অবিকল সিদ্ধার্থেব মতো, আমাব শ্রেষ্ঠ বন্ধু—যে সেদিন বাডি বযে এসে তোমায অপমান কবে গেছে। কি ও চেনে সিদ্ধার্থকে, না এ নেহাতই আকস্মিক মিল? ওবা কি অন্য কাবোব বিষযে বলছে, না আমবাই লক্ষ্য? লাঞ্ছনাব ভযে যাদেব কাছে যাই না, যাদেব অনেকেব্ কাছে আজ যাওযাব উপায নেই, সেই আমাব প্রিযজনদেব নাম কবে সত্য-মিথ্যায মিলিযে কত না গল্প বাস্তায দাঁডিযে লোকে প্রতিদিন শুনিযে যায। কতদিন কত অসম্ভব মুহূর্তে কত না প্রিযজনেব কণ্ঠস্বব শুনে চমকে উঠেছি, প্রতাবিত হযেছি। স্মৃতি—স্মৃতিব হাত থেকে আমায বেহাই দেওযা হবে না। মন ভালোবাসাবাসি মুছে ফেলতে না পাবলে এই নবক থেকে মুক্তি নেই।

টিক টিক টিক। সেই অমোঘ ডাক। থুঃ। না, তডপে লাভ নেই। কিন্তু মাটি ছাডলেও চলবে না। বিনযেব সঙ্গে ভালোবাসাকেই ভালোবাসতে হবে। হ্যাঁ, কি যেন ভাবছিলাম। ভুঁইচাঁপা। কনক—

"যাই-ই ই ই ই ই।"

মণিমোহন চমকে উঠল। জ্যোৎস্নাব গলা। য্যাছ, আজকাল পুঁচকে মেযেটা বেজায জ্বালাচ্ছে। পযেণ্টটা কি? কনক, তোমাব মনে পডে, সেই— এ কি, জ্যোৎস্নাব মুখ কেন? আহ্, আমাব বক্ষেব কাছে পূর্ণিমা লুকানো, কনক, পূর্ণিমা, জ্যোৎস্না। আহ্, ভুঁইচাঁপা।

"বাঘেব স্ত্রীলিঙ্গ বাঘিনী, সিংহেব স্ত্রীলিঙ্গ সিংহী, ঘোডাব স্ত্রীলিঙ্গ ঘুডি।"

"উঁহু—ঘডি।"

"ও, সেই জন্যই ঘোডাবা সব হাতে বেঁধে ঘোবে? নইলে ঘডিব দল বুঝি সটকে পডবে?"

"হ্যা হ্যা হ্যা।"

"আব মহব্বতেব সময ঘোডাবা সব ঘুডি হযে যায। পীবিতেব আকাসে পাখনা মেলে ওডে।"

"দেখি, একটা সিগ্রেট ছাড। চাবমিনাব ?"

"না বে, বড্ড কাশি হযেছে। কদিন পানামা খাচ্ছি।"

"কা-শি ? পা-নামা ?"

"হ্যা হ্যা হ্যা।"

"শিখাব কি খবব মাইবি ?"

"শি-খা ?"

"হ্যা হ্যা হ্যা।"

"আব কি, উডছে।"

"চাঁদিযাল না চক্ষুযাল ?"

"পেটকাটা"।

"হ্যা হ্যা হ্যা।"

"তোব দেশলাইতেও ঘোডা যে বে ?"

"পেছনে ছাখ—পানামা। কেউ খুব টেঁটিযা কবলে না দেশলাইটা আলতো কবে মুখেব সামনে তুলে ধববি।"

"সালা নীতেদাব প্যাবেড আব শেষ হয না।"

"খুব খিঁচছে, একটু কাজ দেখাতে হবে না ?"

"নীতেদাব মাযেব যা খাঁকতি।"

"ঐ, ঘুডী বুডো হযেছে—এখন একটু আবামে থাকতে চায।"

"হ্যা হ্যা হ্যা।"

"আজকেব আনন্দবাজাব দেখেছিস ?"

"আ ননদবাজাব ?"

"সামন্তেব নাকি ছবি বেবিযেছে ?"

"হ্যাঁ, ক্রাউডসীনে। পাত্তি পেযেছি, লবি এনে দিযছ, মিটিংযে গিযেছি। ও ভীডেব মধ্যে কাউকেই চেনা যায না। ফটো উঠলেই বা কি, না উঠলেই বা কি।"

"যা বলেছিস।"

"কাল ছোন্টুব দোকানে নীতেদাব কি বোযাব! এ তল্লাট থেকে কোনোদিন নেহেরুব মিটিংযে এত লোক গিযেছে ? বলে—এ আবও ভাবি লীডাব। যেন ওব বাবা।"

"শা স্ত্রী জী।"

"হ্যা হ্যা হ্যা।"

"বাযচৌধুবীবাবু তো আজকাল নীতেদাব নামে ইগনোবেণ্ট।"

"হবে না, মালকে মালই চিনতে পাবে।"

"মাইবি, বোটাবি ক্লাবেব সেণ্টাব খুলবে বলে এতগুলো টাকা—"

"দাঁডা না, নীতেদা ভাবছে আমাদেব বাদ দিযেই ও—"

"সব জ্বালিযে দোবো।"

"বাউউট টার্ন। লেফট বাইট লেফট।"

মণিমোহন অস্ফুটে বলে উঠল—"মা, মাগো।"

মিতু বলল "বাবা, তাহলে কিন্তু মা হযে গেলাম।"

মণিমোহন বলল "আব আমি ?"

মিতু কনকেব মতো ঠোঁট টিপে হাতেব মুদ্রায হাসি ফুটিযে উত্তব দিল "আব কি, তুমি তো মিতু হযেই গ্যাছ।" তাবপব মিনতিব স্ববে আবদাব কবল "আমায একটু মা বলে ডাকো না ?"

মণিমোহনেব মাকে মনে পডল। বাবান্দায মোডা পেতে বসে বাস্তাব দিকে তাকিযে আছে। কাজ নেই, সংসাব নেই—মা আব পাবে না। এবং এইখানে, আমি, ভোব বাতে উঠে মিতুকে আগলাচ্ছি। নিশ্বাস ফেলাব অবকাশ পর্যন্ত জোটে না।

মণিমোহন ডাকল "মা।"

"কি। মিতু, কি।"

"ও-ও মা।"

মিতু একই সঙ্গে খুশি আব উৎকণ্ঠায ঝুঁকে পডে বলল "কি হযেছে। এই তো আমি। এই তো মা।"

"একটু ভালোবেসে দাও না।"

ঝাঁপ দিযে মণিমোহনেব কোলে উঠে দু-হাতে গলা জডিযে ধবে বলল "এই তো তোমায কোলে নিযেছি। কত আদ্বু কবছি। আমাব সোনা, আমাব একটা মাত্র, শুধু আমাব, বাবাব না—বাবা দুত্তু।"

"তুমি ইক্কুলে যাবে না।"

মিতু আঁতকে উঠে বলল "ছেলেমেয়েরা যে কাঁদবে।"

'কেন ?"

'আমি না গেলে ওদের কে লেখাপড়া শিখিয়ে দেবে ?"

'ওরা নিজে নিজে পড়বে।" মণিমোহন হাসি চেপে বলল "আমি তো নিজে নিজে পড়ি—'সোম আর মঙ্গলবার নুটু বাবুর মুখটি ভার। বুধ আর বৃহস্পতি'—তারপর কি গো মা ?"

মুহূর্তের জন্য সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মিতু বলল "নিজে নিজে বলো।"

"ভেবে ভেবে ?"

আস্তে মুখ ফিরিয়ে মিতু ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

"সোম আর মঙ্গলবার নুটু বাবুর মুখটি ভার। বুধ আর বৃহস্পতি তারপর শনি তারপর" মণিমোহন মুখে আঙ্গুল পুরে ভাবতে বসল।

মিতু উঠে দাঁড়িয়ে এমন একটা ভঙ্গি করল যেন মণিমোহনকেই তার কোল থেকে নামিয়ে বসাচ্ছে। ফ্রকের কাঁধটা টেনেটুনে শাড়ির আঁচল ঠিক করে, আঙ্গুলের ডগা দিয়ে অদৃশ্য এলোচুলের ডগা পাকাতে পাকাতে মন্থর পায়ে হেঁটে সে তাক থেকে নিজের যাবতীয় বইয়ের সঞ্চয় নিয়ে এল। মলাটের ওপর কয়েক কুচি রঙীন কাগজ এমন ভাবে সাঁটা যে মনে হবে শিল্পকর্ম। মণিমোহন সেদিকে তাকিয়ে কনকের জন্য একই সঙ্গে গৌরব ও মমতা বোধ করছিল। মিতু মুখ ফিরিয়ে ভীরু গলায় বলল "আবার বই ছিঁড়েছ ?" মণিমোহন চেষ্টা করেও হাসি চাপতে পারল না, অপ্রতিভ স্বরে উত্তর দিল "ছিঁড়ে যায় যে।"

মিতু বলল "বোধহয় নিশ্চয়ই দোষ করে হাসতে হয় ? বলেছি না ফুল ছিঁড়লে গাছের লাগে, পাতা ছিঁড়লে বই ব্যথা পায়।"

মণিমোহন বলল "ব্যথা পায় তো কাঁদে না কেন ?"

"জানো না রাক্ষস ওদের বোবা করে রেখেছে ? কি করে কাঁদবে ?"

"অভীক এলে ফুল বই সকলে কথা বলে উঠবে ?"

"হ্যাঁ তো।"

"ওদের মা তখন ওদের আদর করবে ?"

"হুঁউ।"

"প্যাণ্ট পরিয়ে দেবে ?"

"হুঁউ।"

"বইয়ের মা তো সরস্বতী ?"

"হ্যাঁ।"

"আর গাছের মা ?"

"বসুমতী।"

"এঁ্যা, একটা খবরের কাগজ হল গাছের মা ?"

মিতু রাগ করে বলল "আ হা হা, আকাশে ফোটে তারা, আবার ডালিয়া দিদির বোনের নামও তারা। তাহলে ডালিয়া দিদির বোন বোধহয় নিশ্চয়ই আকাশেই থাকে।"

মণিমোহন বলল "ঠিক ঠিক। খালি খালি ভুল হয়ে যায়।"

মিতু প্রশ্রয়ের সঙ্গে হেসে বলল "তুমি তো আমি হয়ে গ্যাছ। সব এখন বুঝতে পারবে না।"

মণিমোহন বলল "দিনের বেলা তারাগুলো কোথায় যায় গো মা ?"

"কোথায় আবার যাবে ? খেলা করে, গল্প করে, তারপর শুয়ে শুয়ে ঘুমোয়। ওদের মা তো চাঁদ, ভোর রাতে সে ইস্কুলে চলে যায়, সন্ধে হলে ফেরে। রান্না বসিয়ে ছেলেমেয়েদের ঘুম থেকে তুলে স্নান করায়, খেতে দেয়। আর আকাশ তো ওদের ঠামা, সারাদিন সে জেগে জেগে পাহারা ছ্যায়, তারপর বৌমাকে ফিরতে দেখে এক দৌড়ে বাথরুম। তার আবার ঠাকুরপুজো, হবিষ্যি—এসব আছে কি না !"

"তুমিও তো ভোরবেলা ইস্কুলে যাও, বারোটার আগে ফেরো। চাঁদের ফিরতে এত দেরি হয় কেন ?"

মিতু মুহূর্তেক ভেবে নিয়ে বলল "চাঁদ যে বড় দিদিমণি।"

মণিমোহন বলল "মেজপিসি তো বড় দিদিমণি, কেমন ইস্কুলেই থাকে।"

মিতু বলল "বোধহয় নিশ্চয়ই তোমার মেজপিসির অনেক ছেলে মেয়ে আছে। তাদের ফেলেই সে ইস্কুলে থাকে।"

"ও-ও ! যে বড় দিদিমণিদের বিয়ে হয় নি, শুধু তারাই ইস্কুলে থাকে ?"

"হ্যাঁ।"

"তারাদের বাবা নেই ?"

মিতু দু-হাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে হাসতে লাগল।

"বলো না মা। তাবাদেব বাবা নেই ?"

"বা-গী বা-বা"। চোখ পাকিযে টেনে টেনে বলল।

"তিব্বত পর্যন্ত ?"

"না—এখান থেকে আকাশ, আকাশ থেকে তিব্বত, তিব্বত থেকে এখান।"

"এতো ?"

"হ্যাঁ। ঠামাব সঙ্গে ঝগডা করে, কাকুদেব সঙ্গে ঝগডা কবে, পিসিদের সঙ্গে ঝগডা কবে। গোযালা জ্যেঠু, কাগজআলা দাদা, মঙ্গলাব মা দিদি—সব্বাব সঙ্গে ঝগডা কবে।"

"কি নিযে এত ঝগডা করে ?"

"ঠামাব সঙ্গে কি নিযে ঠিক জানি না। জ্যেঠু কাকু পিসিদেব সঙ্গে বোধহয কংবেস কমিনিস্ট নিযে। আর গোযালা জ্যেঠু, কাগজঅলা দাদা, মঙ্গলাব মা দিদি—এবা কেউ কথা শোনে না। তাই তো ভালোবাবা বাগীবাবা হযে যায। চাকবি ছেড়ে ঘবে বসে থাকে। কোথাও যায না।"

মণিমোহন দীর্ঘশ্বাস চেপে প্রশ্ন কবল "বাগীবাবাব কোনো বন্ধু নেই ?"

"না।"

"একজনও না ?"

"কি জানি।"

"বাগীবাবা সাবাদিন একা একা কি কবে ?"

"কখনও পাযচাবি কবে, কখনও ঘুমোয, কখনও বালিশে বুক চেপে বই পড়ে।" মিতু বসে বসেই হাতে ঢেউ খেলিযে শোযাব ভঙ্গিটা দেখিয়ে দিল।

"কি বই ?"

"যা দেখে তা-ই তো বই।"

"বটে বটে। আব কি কবে ?"

অবিকল কনকেব মতো হাসি চেপে রাগ দেখিযে ভুরু কুঁচকে বলল "বোধহয নিশ্চযই তুমি জানো না।"

মণিমোহন বলল "আমি না ছোট ? আমাব কি সবকথা মনে থাকে ?"

স্বীকারোক্তি শুনে মিতু একগাল হেসে বলল "মা যখন ইক্কুলে চলে যায—বাগীবাবা তখন ভালোবাবা হয়ে তাব একটামাত্রকে ছাখে, একটামাত্র

তো ছোট—তাই বোঝে না, গল্পের মিতু হয়ে মার ইস্কুলে যাওয়ার সময় রোজ হাঁই হাঁই করে কাঁদে। ভালোবাবা তখন তার একটামাত্রকে এমনি কোরে কোলে নেয়, কত আদর করে, বাড়িতে তালা দিয়ে সূর্য দেখাতে নিয়ে যায়, ফিরে এসে স্টোভ জেলে বার্লি জাল দিয়ে খাওয়ায়, একটামাত্র তরা তরা করলে জল ঢেলে দ্যায়, একটামাত্রকে নিয়ে ঘর ঝাঁট দ্যায়, একটামাত্রের সঙ্গে খেলে পড়ে ঘুমোয়, তারপর মা ইস্কুল থেকে ফিরলে রাস্তা থেকে জল ধরে আনে। কত কাজ করে।”

“ডালিয়াদিদির বাবাও তো কত কাজ করে।”

“নিশ্চয়ই বোধহয় ডালিয়াদিদির বাবাও আমার বাবুর মতো বাজার করে, রেশন আনে, ধোপার বাড়ি কাপড় নিয়ে যায়।”

“তো কি করে ?”

“বাজার করে আর কাজে যায় আর তাস খেলে।”

“তাস ?”

মিতু দু-হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে হাসতে লাগল। তারপর বলল “জানো বাবা। খোকনদাদাও তাস খেলে। খোকনদাদা দুষ্টু।”

“ঐ রকম বলতে হয় না। খোকনদাদা তোমায় কত ভালোবাসে। রোজ বিকেলে তোমার সঙ্গে খেলা করে।”

“বলবই তো। বলে—আমার মা কেমন বাড়ি থাকে, আর তোর মা তোকে ফেলে ইস্কুলে যায়। বলে—আমরা কেমন মাছ খাই মাংস খাই, আর তোরা ? তোরা তো খাস—বাঙাল পুঁটি মাছের কাঙাল।” তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বলল “বলো বাবা, আমরা বোধহয় নিশ্চয়ই বাঙাল। খোকনদাদার কি বুদ্ধি। আমরা তো বাঙালী।”

“হ্যাঁ মা। আমরা বাঙালী, আমরা ভারতবাসী”। অন্যসময় হলে মানুষ, পৃথিবী ইত্যাকার প্রসঙ্গেও মেয়েকে কিছু জ্ঞান দিত—কিন্তু এখন আর উৎসাহ পেল না। দু-হাতে মিতুকে জড়িয়ে ধরে মণিমোহন ভাবল—তোকে আমি কি ভাবে বাঁচাব।

উত্তেজনায় চোখ বড় বড় করে, গলার রগ ফুলিয়ে কিন্তু কণ্ঠস্বর নামিয়ে মিতু বলতে লাগল “আর জানো, খোকনদাদা না টুইস্ নাচে।”

মণিমোহন শিউরে উঠে বলল “কি ?” কোনো কোনো কথা যে গলা

নামিযে বলতে হয, তা কি মিতু বুঝতে আবম্ভ কবেছে ? আব প্রায সাবাদিন যে শিশু ঘবে থাকে—তাবও কানে পৌছেচে টুইস্ট নাচেব কথা ? মিতুব থেকে বছব খানেকেব বড যে খোকন, পুজুবী বামুনেব ছেলে—সে টুইস্ট নাচে ?

"লাবিন টৌকিও গায।"

আহ্। আব পাবি না পাবি না।

খিলখিল কবে একসঙ্গে কাবা যেন হেসে উঠল।

"কেমন জব্দ ?" "বড্ড গুমোব তোমাব, দাঁডাও না ?" "মানুষকে মানুষ বলেই জ্ঞান কবে না।" "আবে বাখ, এখন পৈতে পুডিযে বামুন হযেছে। বাবা তো বলছিল সেদিন—।" মিতু দৌডে জানলাব কাছে গিযে ডাকল—"শিখা দিদি।" একজন সাডা দিলো—"টুকি।" আব সিঁডি দিযে নামতে নামতে মেজগিন্নি কাকে যেন বলতে লাগল "কেউ বাঁচবে না। আমি তোমায বলে দিলুম। কেউ বাঁচবে না।" যেন তাকে সায দিযেই টিকটিকিব ডাক শোনা গেল।

"বাবা, জানলাটা একটু খুলি ?"

"না মিতু। বাস্তা দিযে সকলে যাতাযাত কবে। ধুলো ওডে। বলেছি না এতে অসুখ কববে।"

"তাহলে ওপবেব জানলাটা খুলে বেখেছ কেন ?"

"নইলে যে ঘবে আলো ঢুকবে না, হাওযা ঢুকবে না। তাতেও অসুখ কববে।"

"আচ্ছা বাবা, আমবা তো তিব্বতে চলে গেলে পাবি।"

"যদি গেছোদাদাব সঙ্গে দেখা হযে যায ?"

"তো বলব—না ভাই, আমাকে গাইতে বোলো না।"

"তোমাব এখন বাডতি না কমতি।"

"কমতি।"

"তবে তো যাওযা যাবে না।"

"কেন ?"

"তিব্বতে যে খুব ঠাণ্ডা।"

"আকাশ থেকে সুয্যিমামাকে বগলে নিযে নেব।"

"তাহলে হিমালযেব সব ববফ গলে যে দেশ ভেসে যাবে।"

"তখন জহ্নু মুনি হযে চোঁ চোঁ কবে খেযে ফেলব।"

"তাহলে জলেব অভাবে যে দেশ শুকিযে যাবে।"

"তুমি ভগীবথ হযে যাবে, আমাকে ডাকবে।"

"ও ব্বাবা, আমি অত তপস্যা কবতে পাবব না।"

"কেন, তুমি কে হযে গেছ ?"

"আমি ? আমি হিজবিজবিজ।"

"তাহলে আমি ব্যাকবণ সিং।" মাথাব দুদিকে দুটি আঙুল ধবে বলল "দিই গুঁতিযে ?"

"না না, তাব থেকে আমি ববং ভগীবথই হযে যাই। বেশ বনে গিযে তপস্যা কবব, ফল খাব।"

"কি ফল ?"

"আম-কাঁঠাল-কলা-জামরুল-পেযাবা-শশা—"

মিতু খানিকক্ষণ গালে হাত দিযে ভেবে বলল "আব আমি ? কিবম ববফেব জল খাব, বোতলে কবে জ্যেঠুকে পাঠিযে দিযে বলব—জ্যেঠু, তোমাব ফ্রীজ যদি খাবাপ হযে যায, তাহলে এই জল খেও। তুমি বনেব মধ্যে ঠাণ্ডা জল পাবে ?"

"ঠাণ্ডা জল খেযেই থেকো। আব তো কিছু খেতে পাবে না।"

"বোধহয নিশ্চযই নদীতে বড বড রুই-ইলিশ-তেলাপিযা—এসব মাছ থাকবে না ?"

"বোধহয নিশ্চযই কাঁচা কাঁচাই খাবে ?"

মিতু আবাব গালে হাত দিযে খানিকক্ষণ ভেবে বলল "বাবা ?"

"বলো ?" মণিমোহন হাই তুলল। ঘডিব দিকে তাকিযে তাব মনটা দমে গেলো।

মিতু বলল "আমবা দুটি ভাই তো ?"

"হুঁ।"

"তাহলে তুমি জহ্নুমুনি হও, আমি ভগীবথ হই।"

"হও।"

মিতু উঠে দাঁডিযে ডান পাযে ভব বেখে টলমল কবতে কবতে একটা লাফ

দেওযাব ভঙ্গি কবল, তাবপব হাত বাডিযে সূর্যকে নিয়ে বগলে পুবল, ডান হাতেব তালু মুখেব কাছে ধবে ফুঁ দিযে বলল "ছ্যাঁকা লেগে গেছে।" তাবপব বাঁ পাযে ভব দিযে টলমল কবতে কবতে আবাব একটা লাফ দেওযাব ভঙ্গি কবে বলল "এই তিব্বতে এসে গেলুম।" মণিমোহন দুই হাত আঁজলাব মতো পেতে কাল্পনিক জলধাবা পান কবতে লাগল। তাবপব ঢেঁকুব তুলে বলল "আ-আ।" তাবপব মিতু তপস্যা কবতে বসল। মণিমোহন চোখ বুঁজল। তাব বেজায ঘুম পাচ্ছে।

দিন সাতেক আগে যতীনবাবু হঠাৎ আদেশ কবলেন মণিমোহনকে পেছন দিকেব বাস্তা দিযে যাতাযাত কবতে হবে। প্রথমে ভেবেছিল ঠাট্টা কবছেন। তাবপব ভদ্রলোকেব চোখে হুমকি আব কৌতুক দেখে বুঝল লোকটি সত্যিসত্যিই সদব বাস্তা দিযে তাব চলাচল বন্ধ করতে চায। শান্তস্ববে মণিমোহন জানাল ঘবভাডা নেওযাব সময যখন এবকম শর্ত ছিল না এবং খিডকিব দবজা দিযে চলাব যখন কোনো কাবণ ঘটে নি—তখন সে সামনে দিযেই হাঁটবে। পবদিন বেরুবাব সময যতীনবাবু তাকে মাবলেন। মিতুব সামনেই। বাচ্চা এতদিন জানত—পৃথিবীতে বাবাই সব থেকে শক্তিমান। সে অবাক হযে গেলো। তাবপব অবশ্য আব কোনো গণ্ডগোল হয নি। যাতাযাত সামনে দিযেই চলছে। শুধু যতীনবাবু তাব ঘবে আলোব কানেকশান কেটে দিলেন এবং তাকে শুনিযে পবেশবাবুকে জানালেন লাইন খাবাপ হযে গেছে। তাব দুদিন পবে গোটা ব্যাবাকবাডিটা অন্ধকাব হযে গেলো। আজও সাবানো হয নি। এতগুলি পবিবাব অন্ধকাবে ডুবে আছে। সমস্ত বাত কুপি জ্বলে, দবজা-জানলা বন্ধ, ঘবেব ভেতব গ্যাস জমাট বাঁধলে কনক চোবেব মতো উঠে জানলাব পাল্লা দুটো খুলে দিযে দেযাল ঘেঁষে দাঁডিযে থাকে। আব বাইবে অন্ধকাব, মাঝে মাঝে কুকুবেব ডাক, মানুষেব চাপা গলা, অনির্দিষ্ট নানা শব্দ। কনক ভয পায, ঘুমোতে পাবে না। আব বাতাসে পবপব কখনো মদেব গন্ধ, কখনো টিযাব গ্যাসেব, কখনো বা বক্তেব। মণিমোহন ঘুমোতে পাবে না। শুযে শুযে নিজেব পাপ, নিজেব পুণ্য যাচাই কবে। ভযে কনকেব সঙ্গে কথা বলে না। অভিজ্ঞতা শব্দকে বোঝা কবে তুলেছে। তাছাডা ঘুম হয না শুনলে কনকেব ভাবনা বাডবে। কতদিন ভুঁইচাঁপা বলে ডাকি না। ডাকব না। কিছু কিছু কথা, কিছু কিছু

স্মৃতি নিজের থাকুক। যে কোনো লোকের মুখে অবিকল বর্ণনা শুনতে পাব এই ভয়ে যেমন কনককে স্পর্শ করি না, তেমনি যে কোনো কণ্ঠে প্রতিধ্বনি শুনতে হবে বলে—কতকিছু আমি বলি না, ভাবি না।

"মিতু।"

মিতু পিটপিট করে তাকাল। তারপর বলল "আমি তপস্যা করছি।"

"দেখে যা।"

"বাবা যাব ?"

"যাও।"

মিতু জানলার ওপর ঝুঁকে পড়ল। তারপর মণিমোহন দেখল তার হাতে একটা ছেঁড়া ঘুড়ি।

"সাধনদা ছিঁড়ে দিয়েছে। সাধনদাকে আমরা বয়কট করব।"

"কি ?

"বয়কট বয়কট। কথা বলব না। তুইও বলবি না। নইলে কিন্তু তোমার সঙ্গে খেলব না।"

"আচ্ছা।"

"কেটে গোঁত্তা মেরে পড়ল। আমি ছুটে ধরলুম। আর সাধনদা কেড়ে নিতে গিয়ে একেবারে ফাঁসিয়ে দিলে।"

ওদিক থেকে মেজগিন্নি চেঁচিয়ে উঠলেন "এ্যাঁ, মারা গেল ?"

"হ্যাঁ গো। আহা, বয়েস হয়েছিল বুড়ির।"

আর অনেক দূরে কোথায় যেন মাইকে গান বেজে উঠল "ফিরে আয় আপন ঘরে।"

আহ্। কনক, কনক—যতক্ষণ তুমি না ফেরো, ততক্ষণ ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি। সবকিছুই কি অনিশ্চিত। প্রত্যেকটি মৃত্যুকে মনে হয় হত্যা। প্রত্যেকটি অসুখ যেন আরোপিত। প্রত্যেকটি মানুষের গলায় ফাঁসির দড়ি—যেকোনো মুহূর্তে টান পড়তে পারে। বড় ভয় করছে। বড় ভয় করে। এত দুঃখী আমরা। তবু সকলে মিলে কেন সব সময় ভয় দেখায় ?

"ভগবানই ভরসা।"

"যা বলেছ।"

না। আমার ভগবান নেই। কি অলৌকিক বিজ্ঞানের শক্তিতে দেশে

মধ্যযুগেব আবহাওয়া তৈবি হচ্ছে—আমি তা বুঝি। আমাব ভগবান থাকতে নেই।

"মার্ক টাইম। লেফট বাইট লেফট।"

হ্যাঁ, কোনোবকমে টিঁকে থাকা। এখানে ওখানে নানা জাযগায় মানুষ দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষা কবছে। ততদিন নিজেকে বাঁচিযে বাখা।

"সাধনদাকে সোনাদি খুব বকেছে।"

"সোনাদি কে বে?"

ও। কনক, মানে সোনা। মিতুকে আব সোনা বলে ডাকা যাবে না। সোনা-শো-না-show না। এ্যা? ছোনা, চ্ছোনা, জ্যোচ্ছোনা। এ্যাঁ! শব্দ সবে যাচ্ছে। শব though। এ্যাঁ, ভালো ভালো। আব বাঁচা গেলো না। মানুষ পাভলভেব কুকুব। What man has made of Man!

"কই, হাঁটু চিবে বাব কবে দাও?"

"কি?"

"তুমি কে হযে গেছো?"

"তুমি?"

মিতু বলল "আমি তো ভগীবথ।"

মণিমোহন বলল "আমি জহ্নু মুনি না, আমি কুচ্ছু না।"

মিতু খিলখিল কবে হেসে উঠে বলল "আমি মা, তুমি কুচ্ছু না?"

"না। তুমি হাথে ফাথে আমি কুচ্ছু না।"

"না, তুমি ইনডিস্কি বিনডিস্কি মিনডিস্কি, আমি কুচ্ছু না।"

"না, তুমি আঙ্গে চাঙ্গে পাঙ্গে, আমি কুচ্ছু না।"

"না, তুমি কডা, আমি কুচ্ছু না।"

মণিমোহন বলল "না, আমবা দুটি ভাই—আমবা দুজনেই কডা। আব সকলে কুচ্ছু না।"

মিতু বলল "তাহলে এসো আমবা কডা হযে যাই।"

তখন ওবা দুজনে কডা হযে কনকেব স্কুলে গেলো, তাবপব মেজ পিসিব স্কুলে—ঠামাব কাছে। তাবপব ডালিযা দিদিব বাডি। তাবপব পাহাড-জঙ্গল-সমুদ্র-মরুভূমি। তাবপব দেশ-বিদেশ। তাবপব স্বর্গ। ঘুবে ঘুবে খুব খিদে পেযেছিল, পেট ভবে অমৃত খেলো। গেলো পাতালে—সেখানে যমুনাব কাছে ভাইফোঁটা পবল। ফিবতে ফিবতে নাবদমুনিব সঙ্গে দেখা। নাবদমুনি নচিকেতা দাদাব সঙ্গে তর্ক কবছে। মিতু তর্ক বুঝতে না পেবে ধনধান্যে গাইতে লাগল। তখন তাবাও গান ধবল। গাইতে গাইতে গাইতে তারা আবাব পৃথিবীতে ফিবে এলো।

"ব্যস। এইবাব মিতু হযে যাও। আমি বাবা।"

"না।"

মণিমোহন জানে মিতু আব সব হতে বাজি, শুধু মিতু হবে না। যতক্ষণ না কনক ফিববে—ততক্ষণ ও কিছুতেই মিতু থাকবে না।

"তাহলে কি হবে ?"

"বাগীবাবা।"

"আব আমি ?"

"গল্পের মিতু।"

মণিমোহন ক্লান্তভাবে বলল "হও।"

তখন তারা আবাব পবপব অনেক কিছু হতে লাগল। আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-গাছ-পালা-পশু-পাখি।

মিতু বলল "এইবাব ?"

মণিমোহন বলল "এইবাব ?"

"কুচ্ছু না।"

"কুচ্ছু না ?"

"কি ?"

"কুচ্ছু না ?"

"কি ?"

"কুচ্ছু না ?"

"কি ?"

অবশেষে মিতু বলল "ক্ষিধে পেযেছে।"

মণিমোহন বলল "আমাবও।"

মিতু বলল "ঘুম পাচ্ছে।"

মণিমোহন বলল "আমাবও।"

মিতু বলল "তুমি কে হযে গ্যাছ ?"

মণিমোহন বলল "বাবা। আব তুমি ?"

মিতু বলল "মিতু। একটামাত্র। আমায একটু কোলে নাও না, একটু আদ্‌ কবো না।"

মণিমোহন অবাক আব খুশি হযে মিতুকে কোলে নিযে বসল। কনক আসবে। ততক্ষণ তাদেব দুজনকেই জেগে থাকতে হবে। তারপব সে মাব কাছে যাবে। মা, ভাইযেদেব জন্য যাকে পৈতৃকনিবাস ছাডতে হযেছে। সে জানে, ফিবে দেখবে কনক আব মিতু তাব জন্য এমনি কবেই জেগে বসে আছে। তখন তাবা তিনজনে গোল হযে বসে মাযেব গল্প কববে। তাবপব একদিন মাকে বাডিতে নিযে আসবে।

গল্প * গল্প * গল্প * গল্প * গল্প

গল্প * গল্প * গল্প * গল্প * গল্প

ডিসেম্বর, ১৯৬৪ কার্তিক-অগ্রহায়ণ

পরিচয়

বর্ষ ৩৭ ॥ সংখ্যা ৪/৫

কানা-কানি

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১

হ্যাদে লো ব্যাঙের ছাতা
এতকাল ছিলি কোথা ?
ছিলুম ভাই রাজভবনে ;
দাদা আমাব মন্ত্রী হলো
আমারে যেতে হলো।
দাদা নেন বংশী হাতে
আমি নিই কলসি কাঁখে ;
গিয়েছি খিড়কি দিয়ে।
ছেলেটা দিচ্ছে ডুয়ো
মেয়েটা তুরুক কাটে।

২

আয বৃষ্টি হেনে মন্ত্রী দেবো কিনে
বাজার থেকে শস্তা, এক পয়সায় দশটা।
'ক'টা মন্ত্রী কিনলি, বাছা ?'
'তিনটে পাকা, সাতটা কাঁচা।'
মন্ত্রী পড়ে টুপ্‌টাপ্‌
সোনা গেলে গুপ্‌গাপ্‌।

অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চাশ বছর

সরোজ আচার্য

এখন অনেক কিছু জানা, পঞ্চাশ বছর আগের সেই ঘটনা অথবা ঘটনাধারা, বলশেভিক বিপ্লব, শস্তা কাগজী বয়ানে যাকে বলা যায় যুগান্তকারী, চমকপ্রদ, ঐতিহাসিক, অভূতপূর্ব, তার আগে কী ছিল, পরে কী হয়েছে, এখন কী হচ্ছে, এ-সব জানা এখন সহজ। বোঝা সহজ কিনা বলতে পারিনে, সেখানে তো বাদ-প্রতিবাদ তর্ক-বিতর্কের অন্ত নেই। আমরা কী বুঝেছি, জেনেছি কী ভাবে, কতটুকু এবং কখন, শুদ্ধ সেই কথাই বলতে পারি। এ যদিও নিজের জবানীতে নিজের যৎসামান্য অভিজ্ঞতার কথা, সে কথা আমাদের দেশের রাজনৈতিক কর্ম ও চিন্তাধারায় একটা বৃহৎ পর্বের সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে গেছে।

বলশেভিজম, বলশেভিক বিপ্লব, কম্যুনিজম, কম্যুনিস্ট আন্দোলন, এ-সব নিয়ে যত বই-পত্র-প্রবন্ধ লেখা হয়েছে গত পঞ্চাশ বছরে, আর কোন ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে তার অর্ধেকও লেখা হয় নি। খবর-কাগজের সংবাদশিল্পে, সভাসমিতিতে, দেশে দেশে পারলামেন্টে বক্তৃতায়, বিতর্কে, বিবৃতিতে আরও কত কী যে প্রচারিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে তারও লেখা-জোখা নেই। ফরাসী বিপ্লবও তোলপাড় ঘটিয়েছিল, তবে ঠিক সারা পৃথিবীতে নয়, প্রধানত ইওরোপে এবং স্বল্পকালমাত্র। সেই ফরাসী বিপ্লব এখন ভদ্রস্থ, ভদ্রলোকরা বলতে গেলে এর ওপরেই তাঁদের ভদ্রাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। বনেদী পণ্ডিত বুদ্ধিজীবী মহলে তবু ইদানীং আক্ষেপ (রেমণ্ড আর), বিপ্লব-

নামে আফিং-এর নেশা প্রথম ধরায় ওই ফরাসী বিপ্লব, তা থেকেই বিপর্যয়ের শুরু—ভদ্রলোকদের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার পাট এর পর দখল করেছে, করতে চাইছে মেহনতী মজুর-চাষী-সাধারণ।

কোন কোন ইতিহাসশাস্ত্রীর (টয়নবি) মতে বিপর্যয়েব শুরু আরও আগে, মার্টিন লুথার-এর রেফরমেশন আন্দোলন থেকে—'অথরিটি' অর্থাৎ কর্তাগিরি, ধর্মভিত্তিক থাকবন্দী সমাজব্যবস্থায় সেই যে ভাঙনের শুরু তার থেকেই ফরাসী বিপ্লব—বলশেভিক বিপ্লব ইত্যাদি বিপত্তি। আরেক দার্শনিক পণ্ডিত দেনিস রুজমঁা-র ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ শুনেছি ১৯৫০ সনে—বলেছিলেন, গোটা ইওরোপের বিগত পঞ্চাশ বছরের সাহিত্য-প্রবাহের মূল ধারাটা "সাবভার্সিভ", দিশী ভাষায় যাকে বলা হয "নাশকতামূলক"। এখন এই "নাশকতামূলক" চিন্তা ও কর্মধারাকে ভীতি অথবা প্রীতির চোখে ভালো অথবা মন্দ যে যেমন ভাবেই দেখুন না কেন, সেই অর্ধশতাব্দীব্যাপী ভাঙা এবং গড়ার ইতিহাসের অনেকখানি, প্রায় সবখানি জুড়ে বলশেভিক বিপ্লব।

ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে ভয়, ঘৃণা ও নিন্দার বাণী তখনকার কালে কম শোনানো হয নি। ফরাসী বিপ্লবী "জ্যাকোবিন"রা তখন "ফরাসী নরখাদক"; ঐতিহাসিক সমারভিল লিখেছেন, জ্যাকোবিনের অখ্যাতিটা একালে বলশেভিকের। ফরাসী বিপ্লবের তত্ত্বের বিরুদ্ধে এড্‌মাণ্ড বার্কের সবচেয়ে শাণিত বিদ্রূপ ছিল এ-বিপ্লব "মেটাফিজিকাল"; বলশেভিজম, কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে ওই কথাটিই কিছু বদলিয়ে হয়েছে "আইডিওলজিকাল"। তখন বনেদী বিচারে "মেটাফিজিক্‌সে"র দৌরাত্ম্য, এখন "আইডিওলজির"। তখন ইওরোপের বনেদী সমাজের রব ছিল, ফরাসী বিপ্লবের ধাক্কায "পাবলিক অর্ডার" বিপন্ন; একালেরও রবও প্রায় তাই, কেবল "পাবলিক অর্ডার" তথা স্থিত-স্বার্থের দখলকে নানারকম চটকদার মনভুলানো বিশেষ্য বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। যেমন "ফ্রী ওয়র্লর্ড" যেখানে স্থিতস্বার্থ-রক্ষায় রকমারি জবরদস্তি, ডিক্টেটরী ভদ্রস্থ, জলচল, কিন্তু "ফ্রী ওয়র্লর্ড"কে সর্বপ্রকারে "ফ্রী অব্‌ কম্যুনিজম" রাখা চাই-ই চাই। কম্যুনিজমকে রুখতে পারাই স্বাধীন ছুনিয়ার সারার্থ।

ফরাসী বিপ্লবকে ঘেরাও এবং খতম করতে ইওরোপের রাজারা, সামন্তবৃন্দ ও পারিষদরা জোট বেঁধেছিলেন। বলশেভিক বিপ্লবকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করবার উদ্যোগ আয়োজনও হয়েছিল আরও ঢালাওভাবে। কারণ এ-বিপ্লব তো

আরও সাংঘাতিক, সারা দুনিয়ার সমাজের নিচুতলার মানুষদের রাজত্ব-প্রতিষ্ঠার সংকল্প এবং প্রথম সফল প্রয়াস। "ইন্টারভেনশন", "সাবভার্সন", "ইন্‌ফিলট্রেশন", "এন্‌সারক্‌ল্‌মেন্ট", "অ্যাগ্রেশন" ইত্যাদি কলাকৌশল বনেদী জিনিশ, এসব বলশেভিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে ইওরোপ-আমেরিকা-জাপানের রাষ্ট্রপতি ধনপতিরাই চুটিয়ে প্রয়োগ করেছেন। সেই যে "আয়রন কার্টেন" তথা লৌহযবনিকা যার এত নিন্দা, যে নিন্দার জন্য অন্তত একটি পর্বে অনেকটা দায়ী সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রনীতি, সে আয়রন কার্টেনের জন্মদাতা আসলে ইওরোপের ধনতন্ত্রী রাষ্ট্র বিধাতারাই, তাঁরাই "কর্ডন স্যানিটেয়ার" তথা বলশেভিজমকে জব্দ করতে সোভিয়েট ইউনিয়ন ঘিরে স্বাস্থ্য-বন্ধনী অর্থাৎ লোহার বেড়া দিয়েছিলেন, 'আয়রন কার্টেন' ছিল ওরই উল্টোপিঠ।

আমরা ছিলাম এ-পিঠে, অনেককাল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বাস্থ্যরক্ষকদের খবরদারীতে। সেই ১৯১৭ সনে আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক চিন্তা ও চেতনাই বা কতটুকু? ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দানা বেঁধেছিল ওরই কিছু আগে স্বদেশী আন্দোলনে। বাংলায়, মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী গুপ্তসমিতি তখন থেকে সক্রিয় হয়েছে। আমাদের মফস্বল শহরে তার কিছু কিছু ছাপ, বাড়িতে পাড়া-প্রতিবেশী মহলে সেই ছোট বয়সে নানা রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনা। কাছেই নদীর ওপারে "বাঘা" যতীনের বাড়ি; তাঁর অনুচর ও ভক্ত অনেকে শহরের শিক্ষিত মহলে। প্রতিবেশী আত্মীয়-অগ্রজ-স্থানীয় একজন আরও বছর কয়েক আগে ইংরেজ পাদ্রী হিকেনবোথামকে গুলি মারার মামলায় গ্রেপ্তার হন। সে সব কথাও ছেলেবয়সে শোনা যেত চাপা সুরে। রাগটা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে; ব্রিটিশ শাসন কী ভাবে খতম করা হবে, তারপর কী হবে, এ-সব বিষয়ে ছোট শহরের শিক্ষিত মহলে স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। কেবল এইটুকু মনে আছে, ১৯১৭ সনে রাশিয়ার সম্রাট নিকোলাস গদীচ্যুত, সে খবরটা শহরের শিক্ষিত মহলে নাড়া দিয়েছিল, কারণ রুশ সম্রাট নিকোলাস ছিলেন "আমাদের" সম্রাট পঞ্চম জর্জের জ্ঞাতি।

১৯১৭ সনের স্মৃতি এবং জ্ঞান ওইটুকুই। তখন বয়স মাত্র দশ। ১৯১৭-র নভেম্বর মাসে রাশিয়ায় কী ঘটে গেল, লেনিন ট্রটস্কী স্টালিন ইত্যাদি

বলশেভিক নেতারা কী করেছিলেন, বলশেভিজম জিনিশটাই বা কী, এ সব তখন জানি নি, জানবার বুঝবার ক্ষমতাও ছিল না, বুঝবার সুযোগও হয় নি। বয়স্ক শিক্ষিত মহলে রাজনীতির একমাত্র গীত তখন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে। সে-গীতের সুরটা ক্রমশ চড়া হচ্ছিল। টিলকের মৃত্যুর পরদিন কী জানি কী করে যেন কারও পরামর্শ বা মন্ত্রণা ছাড়াই ওই ছোট শহরে প্রথম রাজনৈতিক সংঘাতে এগোতে হল; স্কুলের অতি নিরীহ ছাত্র আমরাই হেডমাস্টার মশায়ের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে টিলকের স্মৃতির প্রতি সম্মানে ধর্মঘট করে বসলাম, সেই প্রথম ধর্মঘট। শাস্তিও হল, কিন্তু শহরের শিক্ষিত মহল আমাদের কাজে খুব-খুশি।

এরপর নেশা ধরতে থাকল রাজনীতির, নানা বই পড়া, অন্ধকারে হাতড়ানো। রুশ সম্রাটের রাজত্বে অত্যাচারের কাহিনী, নিহিলিস্ট আন্দোলন; রুশ সাহিত্যের ছোটখাট বিবরণ পড়েছিলাম পুরনো বাংলা মাসিকপত্রে, বিনয় সরকার, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের নানা প্রবন্ধে। বলশেভিজম, কম্যুনিজম তখনও নাগালের বাইরে। আশ্চর্যই বলতে হয়, "কম্যুনিজম সেই মহাবৃক্ষের ফল," বঙ্কিমের "সাম্য" প্রবন্ধের ওই লাইনটি তখন থেকে স্মৃতিতে গাঁথা। "পরস্বাপহরণের নাম সম্পত্তি" প্রুধোঁর উক্তিও বঙ্কিমের প্রবন্ধে পড়ি; এর প্রখর সমালোচনা মার্ক্স-এর বই-এ পড়ি আরও বছর বারো-তেরো পরে। সে যাই হোক বলশেভিজম, বলশেভিক বিপ্লব, কম্যুনিজম, এ সব বিষয় নিয়ে পড়াশোনা ভাবনা ১৯২১-২২ সন পর্যন্ত করি নি, করবার তাগিদ বোধ করিনি। রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভাবনা উচ্ছ্বাস আবেগে তখন প্রাণ-মন ভরপুর। গান্ধীজির আহ্বান, ননকোঅপারেশন, চরকা, খদ্দর, ওই যথেষ্ট। কংগ্রেস আন্দোলনের এই পর্বে রাজনৈতিক চিন্তার খোরাক ছিল নামমাত্র, গুটিকয়েক সংকল্প আর নিয়ম পালনেই তখন রাজনীতির মোক্ষ।

তাতে মন ভরে নি। ননকোঅপারেশনের বন্যায় ভাঁটা শুরু হল। এদিক ওদিক থেকে নানা প্রশ্ন, আলোচনা। স্বাধীনতা আন্দোলনে দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থ কী, ভূমিকা কী এসব প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছে। বলশেভিজমের কথাও শুনি, কিন্তু ঝাপসা ধরনের। ইংরেজ শাসকদের খবরদারী ব্যবস্থায় বলশেভিজম সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য বইপত্র তখন পাওয়া কঠিন। বলশেভিক তথা কম্যুনিস্ট প্রচার কৌশল সম্পর্কে কত না রোমহর্ষক

গালগল্প চলেছে। কিন্তু সত্যি বলতে কী, বলশেভিক-বিরোধী বই-পত্র-প্রবন্ধ ইত্যাদি যত পড়েছি, যত সহজে হাতে এসেছে এবং এখনও আসে, বলশেভিজমের পক্ষপাতী বইপত্র তার শতাংশও পাই নি, পড়ি নি ; হিশেব করে দেখলে এখনও না। ১৯২১-২২ সনেই বোধহয় শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের একখানি বই-এ পড়েছিলাম, রাশিয়ায় নাকি "ন্যাশনালাইজেশন অব্ উইমেন" অর্থাৎ সব মেয়েদের রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি করা হয়েছে। এটা কী রসাল অথবা বীভৎস জিনিশ তখন তা বোঝা সাধ্য ছিল না, "ন্যাশনালাইজেশন" কথাটার পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে পারি আরও কয়েক বছর পর। যা হোক এই প্রসঙ্গে বলে রাখি কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে এই ধরনের কুৎসা ১৯৪৪-৪৫ সনে পর্যন্ত রটনা করেছিলেন বাংলার "বিপ্লবী দাদা"দের বন্ধু মাদ্রাজের কংগ্রেস নেতা কালেশ্বর রাও, প্রমাণ হিশেবে তিনি বলেন—কম্যুনিস্টরা এঙ্গেল্স-এর "অরিজিন অব্ ফ্যামিলি" নামে খুব খারাপ একখানা বই পড়ে। বলশেভিক বিপ্লবের তত্ত্ব ইত্যাদি ঠিকমত বোঝার সুযোগ ও চেষ্টা পঞ্চাশ বছরেও খুব সহজ হয় নি ; ওয়াল্টার ল্যাকার এখনকার কালের একজন প্রখ্যাত কম্যুনিস্ট বিরোধী মার্ক্সবাদ বিশেষজ্ঞ, তিনিও বলেছেন, কম্যুনিজম সম্পর্কে বিস্তর আজগুবি বিকৃত ধারণা বুর্জোয়া পণ্ডিতমহলে চলতি, তার একটা কারণ সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে ভুল খবর, মার্ক্সবাদের মূলনীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক অনুধাবনশক্তির অভাব। তাছাড়া অবশ্য শ্রেণীগত স্বার্থবোধ, সংকীর্ণতা, ভীতি এবং সুপরিকল্পিত বিরূপতাও আছে।

সেই প্রথম যুগে ১৯১৭-২৭ সনে বলশেভিক বিপ্লব সম্পর্কে ভয় ঘৃণা অবজ্ঞা অবিশ্বাসের ঝোঁকই মনে হয় এ দেশে সাধারণত প্রবল ছিল। যাঁরা ওই যুগে এদেশে কম্যুনিস্ট ভাবধারা চর্চায়, প্রচারে, কম্যুনিস্ট সংগঠন পত্তনে অগ্রণী-উদ্যোগী, তাঁদের অভিজ্ঞতা আলাদা। কম্যুনিস্ট সংগঠন, আন্দোলনের বাইরে ও দূরে থেকেও জাতীয় সংগ্রামের আবহাওয়ার রাজনীতির নানা প্রশ্ন বুঝবার চেষ্টায় অনেকে বলশেভিজম, কম্যুনিজম সম্পর্কে কৌতূহলী হয়েছেন, আমি কেবল তাঁদের কথাই বলতে পারি। বলশেভিক বিপ্লব সম্পর্কে টিলক কী বলেছিলেন, লাজপৎ রায়ের দৃষ্টিভঙ্গি একসময়ে কী ছিল, এসব এখন জানতে পারছি। জাতীয় রাজনীতিতে তাঁদের এসব অভিমত তখন অন্তত বিশেষ আমল পায় নি। রাশিয়ায় দুর্ভিক্ষ চলছে, লেনিন

ক্রেমলিনে বসে গোগ্রাসে গিলছেন, বেশ মনে পড়ে বিলাতী পত্র-পত্রিকায় এবকম রোমহর্ষক ব্যঙ্গচিত্র দিশী মাসিকপত্রে ছাপা হয়েছে। বলশেভিকবাদ সম্পর্কে উদ্ভট গালগল্প-ভরতি ইংরেজি বই-এর বাংলা অনুবাদ চলতে দেখেছি ১৯২১-২২ সনে।

ননকোঅপারেশনে ভাঁটা পড়বার পর গণমুক্তির প্রশ্নটা বলশেভিজমের আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে ধারালো আলোচনা কিছু কিছু হয়েছে তখনকার কোন কোন বাংলা সাপ্তাহিকে। ডাঙ্গে-সম্পাদিত "সোশ্যালিস্ট" কাগজও দু এক সংখ্যা পড়েছি সে সময়। পড়েছি অদ্ভুতভাবে ব্রিটিশরাজের স্বাস্থ্যরক্ষা-বন্ধনী গলিয়ে আসা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের "ভ্যানগার্ড" পত্রিকার দু-এক খণ্ড। 'বিজলী' 'আত্মশক্তি', 'ধূমকেতু' 'লাঙল' ইত্যাদি কাগজের টুকরো টুকরো লেখায় মনে আমেজ ধরলেও বলশেভিজমেব তত্ত্ব ও কর্মকৃতিত্ব তখনও বুদ্ধিগত হয় নি। কেন হয় নি সেটা স্পষ্ট বলা দরকার, তাতে আমাদের শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর মানসিক বাধা অসুবিধা, সংস্কাবগত প্রবণতা কিছুটা বোঝা যেতে পারে। আমরা ইংরেজ তাডানোর সংকল্পটাই মনেপ্রাণে নিয়েছিলাম। মজুর চাষী-সাধারণের সুখ-দুঃখস্বার্থের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কই বা কতটুকু? বড জোব দরিদ্র-নারায়ণ সেবা পর্যন্ত ছিল আমাদের দৌড। উত্তর-তিরিশে ভার্জিনিয়া উল্‌ফের স্বীকৃতিটা মনে পড়ে, সে সময় দুনিয়াজোডা অর্থসংকটের ধাক্কায় গজদন্ত মিনার হেলে পড়েছে, "লিনিং টাওযার" প্রবন্ধে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ লিখেছিলেন, আমাদের সমৃদ্ধিস্বাচ্ছন্দ্যের চূডা আমাদের পূর্বপুরুষদের নানা কৌশলে সঞ্চিত সোনার ওপর খাডা ছিল, সে কথা এতদিন ভুলে ছিলাম। আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যারা স্বাধীনতার সংগ্রামে উৎসাহী হয়েছি, কেবল ইংরেজ তাডানোর কলাকৌশল সন্ধান করেছি—তাদের আর্থিক অবস্থানও তো ছিল বাংলার চাষী সাধারণের কাঁধের ওপর। কাজেই বলশেভিজম, কম্যুনিজম, বলশেভিক বিপ্লব সম্পর্কে কৌতূহল ছিল অনেককাল পর্যন্ত ভাসা-ভাসা, বিরূপতা ছিল বেশি।

বাংলাদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণ মহলে গুপ্তবিপ্লবী কর্মকাণ্ডের তখন প্রচণ্ড আকর্ষণ। মার্ক্স লেনিন, বলশেভিক বিপ্লব নয়—টেরেন্স ম্যাকসুইনি, মাইকেল কলিন্স, আইরিশ বিদ্রোহ সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ, কৌতূহল। কলেজে ছাত্রজীবনের প্রথম পর্বের আবেগ ও ভাবনার দিগ্‌দর্শন ম্যাকসুইনির

"প্রিন্সিপ্‌ল্‌স অব্ ফ্রীডম," "কানাইলাল" ইত্যাদি। সেই সঙ্গে রাশিয়ায় জারের আমলে সন্ত্রাসবাদী কর্মপ্রচেষ্টার কাহিনী। বলশেভিক বিপ্লবের ইতিহাস ইংরেজি বাংলা কোন ভাষাতেই তখন চোখে পড়ে নি। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'ইণ্ডিয়া ইন ট্রানজিশন', 'আফটারম্যাথ অব ননকোঅপারেশন' খুব জোরাল লেখা, কিন্তু জাতীয়-আন্দোলনের বিরুদ্ধে, ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে উগ্র অভিমানে অভিসম্পাতে ঠাসা। কতটুকু কী বুঝেছিলাম মনে নেই, তবে স্বীকার করা ভালো বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থ আর মজুর চাষীর স্বার্থকে পৃথক, পরস্পরবিরোধী ভাবে দেখবার ও বুঝবার মত জ্ঞানবুদ্ধি অভিজ্ঞতা ছিল না।

মজুর-চাষীর ভালো সম্পর্কে ভালমানুষী ভাবালুতা কিছুটা হয়তো ছিল, কিন্তু তখনও বিশ্বাস ইংরেজ তাড়ালেই সব ভালো হবে। বিপ্লবী গুপ্তসমিতির কোন কোন নেতামহলে এ বিষয়ে দরাজ যুক্তিতে ফাঁকিবাজিও ছিল, যাঁরা বলশেভিজম কম্যুনিজমকে একেবারে সোজাসুজি জাহান্নমে দিতেন না তাঁরা ভরসা দিতেন, আগে ইংরেজ তাড়ানোর কাজ, তারপর করা যাবে সোশ্যালিজম, কম্যুনিজম। মজুর-চাষীদের জাতীয় আন্দোলনে টানবার জন্য কোন কোন জাতীয়তাবাদী নেতা জনসংযোগের কাজ কিছু-কিছু করতেন, তাঁদের মতলব, জ্ঞানত বা যেভাবে হোক, ছিল মজুর-চাষীকে ইংরেজ তাড়ানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা। স্বরাজ সম্পর্কে দেশবন্ধু কবে মজুর-চাষীর তরফে কী কথা বলেছিলেন তাতে বাস্তব রাজনীতির ওপর বলশেভিক বিপ্লবের, কি সমাজতান্ত্রিক চিন্তার কিছুমাত্র প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয় না। অন্তত কংগ্রেস আন্দোলনে, স্বরাজ্য পার্টিতে, বিপ্লবী গুপ্তসমিতিতে সে-রকম ভাবনা চিন্তার আন্তরিক পরিচয় পাই নি। ব্রিটেনের কম্যুনিস্ট এম-পি কমরেড সাকলাতওয়ালাকে সংবর্ধনার ধুমধাম (১৯২৭), সেও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীকে একটু ভয় দেখানো ছাড়া আর কী? বলশেভিক জুজুর ভয় তখন থেকে দু তরফই কাজে লাগিয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা দেশী লক্ষ্মীমন্তদের মনে ভয় ধরিয়েছে, ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদীরা ভয় দেখিয়েছে, স্বরাজ ভালোয় ভালোয় না দিলে বলশেভিকদের সঙ্গেই নির্ঘাৎ ভিড়ে যাওয়া।

১৯২৫-২৭ সনের কথায় ফিরে আসি। কম্যুনিস্ট পদ্ধতিতে রাজনৈতিক আলোচনা, গণসংগঠনের কিছু পরিচয় তখন পাচ্ছি—সভা-সমিতিতে, বক্তৃতায়

আলোচনা প্রবন্ধে। আমার সে পরিচয় বাইরে থেকে, আলগা, এলোমেলো। কম্যুনিজম তথা বলশেভিজম কী চায় সবটা পরিষ্কার বুঝি নি; সোভিয়েট ইউনিয়নে কী ঘটেছে এবং ঘটছে সে বিষয়ে ধারণা আরও অস্পষ্ট। সে সময় বি-এ ক্লাশের ছাত্র। কলেজ লাইব্রেরি থেকে পড়লাম রাসেলের "থিওরি অ্যাণ্ড প্র্যাকটিস অব্ বলশেভিজম", রেনে ফুলপ মিলারের "মাইণ্ড অ্যাণ্ড ফেস অব বলশেভিজম।" মনে কোনরকম ভালোমন্দ দাগ কাটলে মনে রইত, ওই দুখানি বই আমার জিজ্ঞাসাকে তৃপ্ত করে নি। বরং টুর্গেনিভের "ভারজিন সয়েল" পড়ে রুশ জনজীবনের, গণমুক্তির একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট পথ-রেখার ইঙ্গিত পেয়েছি। সে ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট প্রখর হল, মজুর শ্রেণীর রাজনৈতিক ভূমিকা, তাদের বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষ সম্পর্কে ধারণা হল গর্কির "মাদার" পড়ে। গর্কির এই "মা"কে কিন্তু তখন এবং তারপর আমরা খুঁজেছি, অনেক সময় পেয়েছিও বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের ব্যাপারে। "মাদার"-এর প্রলেতারীয় প্রেরণা ও তাৎপর্য কাজে লেগেছে সামান্যই।

ঠিক এরপর বোধহয় ১৯২৬-২৭ সনে হাতে এল জন রীডের "টেন ডেজ দ্যাট শুক্ দি ওয়র্লড।" এই প্রথম বলশেভিক বিপ্লবের ওপর থেকে যবনিকা সরে গেল আমার মনে। জন রীডের বইখানা তখন ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির প্রকাশন, ব্রিটিশ ভারতে নিষিদ্ধ। ছাই রঙে মলাটে লাল রঙে ছাপা ভূমণ্ডলের চিত্র, তার ওপরে প্রচণ্ড বদ্ধমুষ্টি প্রহারের প্রতীক। বই-এর নাম, প্রচ্ছদপট, জ্বলন্ত জীবন্ত ঘটনা-ধারার বিবরণী, সব মিলিয়ে তার আকর্ষণ আবেদন ভুলবার নয়। ১৯১৭-র নভেম্বর মাসের সেই দশটি দিনে কী ঘটেছিল, পৃথিবীর প্রথম শ্রমিকরাজ কী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল, জন রীডের বই থেকে এই প্রথম সে সব জানতে পারলাম। মনের ভাণ্ডারে বলশেভিক অর্থাৎ মার্ক্সবাদী তত্ত্বের সঞ্চয় তখনও খুবই সামান্য, নেই বললেই চলে। ভাবালু তরুণ মন, তত্ত্বের চাইতে চিত্রের আকর্ষণ প্রবল। জন রীডের, ধারা-বিবরণী বলশেভিক বিপ্লবের নাটকীয় ঘটনাবলীর চিত্রশালা। তখন আমার কাছে সে-ই ঢের।

এর কিছুদিন পর হাতে এল অ্যালবার্ট রীস উইলিয়ামসের "থ্রু দি রাশিয়ান রেভল্যুশন।" রীস উইলিয়ামসও বলশেভিক বিপ্লবের প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর

বইখানি জন রীডের মত স্রদ্ধ 'রিপোর্টাজ' বা ঘটনাচিত্র নয়, রুশ বাদশাহী আমলের পট ভূমিকা থেকে শুরু করে বলশেভিক বিপ্লব পর্যন্ত ঘটনা-ধারার সরস ইতিহাস বর্ণনা ও আলোচনা। রীস উইলিয়ামস্ তখন কিংবা তারপর ছিলেন ব্রিটেনে লিবারেল পার্টির এম-পি, এখনও জীবিত, মাস ছয়েক আগেও "গার্ডিয়ান" পত্রিকার বলশেভিক বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর দরদী প্রবন্ধ পড়েছি। জন রীড আর রীস উইলিয়ামস, এই দুজনের বই দুখানি নির্ভর ক'রে বলশেভিক বিপ্লবের মোটামুটি বিবরণ লিখি ১৯২৭ সনের শেষদিকে, ঢাকা থেকে প্রকাশিত শ্রীনলিনীকিশোর গুহ মহাশয়ের সম্পাদিত "বাংলার বাণী" সাপ্তাহিকে ধারাবাহিক বার হয় "রুশিয়ায় রক্তবিপ্লব" নামে, বোধহয় ১৯২৮ সনে; "নব্যরুশিয়া" নামে বই-আকারে প্রকাশিত হয় আরও দুই কি তিন বছর পরে, তখন আমি বন্দীদশায়।

তখন মোটামুটি এইটুকু মাত্র বুঝেছি যে, স্বাধীনতার লড়াই-এ মজুর-চাষীকে টেনে আনা দরকার। বুঝি নি বলশেভিক বিপ্লব, বলশেভিজম, কম্যুনিজমের তাৎপর্য তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি। আমার বা আমাদের মধ্যবিত্ত মনে সমাজবিপ্লবের ধারণা স্পষ্ট হয় নি, হতে পারে নি। ফাঁক তো ছিলই, ফাঁকিও ছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনের ধাপে ধাপে সেটা স্পষ্ট হয়েছে। যুবছাত্রআন্দোলনের সঙ্গে সোস্তালিস্ট চিন্তাধারার সংযোগ সম্ভবত ১৯২৫-২৭ পর্বে। "গণতান্ত্রিক সমাজবাদ" তখন অন্তত পাত্তা পায় নি, সে বস্তুর সেবা কারবারী তো ব্রিটিশ লেবর পার্টির র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড। ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত দেশে ফিরে এসেছেন ওই সময়, তাঁর কথাবার্তায়, আলোচনায়, ভাষণে বারবার শোনা গেছে, "চেন্‌জ দি গোল-ভিউ"—লক্ষ্য দৃষ্টিভঙ্গি বদলাও। কলকাতার আশেপাশে সংগ্রামী মজুর সংগঠনও গড়ে উঠছে। কিশোরগঞ্জে "ইয়ং কমরেডস্ লীগে"র নেতৃত্বে কৃষকদের সংগ্রামী আন্দোলন ঠিক কোন্ সনে মনে নেই, তবে মনে আছে-শ্রেণীসংগ্রামের সামান্য আঁচেই মধ্যবিত্ত উদারতা উবে গেছে, "প্রবাসী"তে "ইয়ং কমরেড"দের কড়া সমালোচনা। গুপ্তবিপ্লবী আন্দোলনের পুরনো বড় দুটি দলের নেতারা প্রায় সকলেই মামুলী রাজনীতির গণ্ডী পার হতে অনুৎসাহী। তবে কলকাতা, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনায় কয়েকটি গুপ্তবিপ্লবী সংগঠনে সোস্তালিজমের চর্চা শুরু হয়েছিল। কিন্তু

সবই পাঁচমিশেলী—সন্ত্রাসবাদ, কংগ্রেসী রাজনীতি আর সোশ্যালিজমের সমাহার।

আমার নিজের ভাবনা, ধারণা ও কাজকর্মও প্রায় তাই। শ্রদ্ধেয় মুজফফর আহমেদ, হেমন্ত সরকার মশাই তখন প্রজা-সংগঠন করছেন কিছু কিছু। একটি প্রজা সম্মেলনের সভাপতির ভাষণের সমালোচনায় আমাদের সাপ্তাহিক "জনমত" কাগজে লিখেছিলাম, মজুর-চাষীকে শোষণমুক্ত করার চেয়ে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়াস অনেক বেশি মহৎ, যুক্তি হিশেবে উদ্ধৃত করেছিলাম টেরেন্স ম্যাকস্থইনীর বচন! বুখারিনের "এ-বি-সি অব কম্যুনিজম" পড়ি ওই সময়ে। খুব আটসাঁট লেখা সূত্রাবলী, কিছু ভাষ্য এবং উদাহরণ। কম্যুনিজম সম্পর্কে ধারণা আমার অন্তত তাতে পরিষ্কার হয় নি। কম্যুনিজমের তত্ত্বকে, কর্মধারাকে ইতিহাসের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে যখন দেখতে পাই, বুঝতে শিখি তখনই কম্যুনিজম সম্পর্কে নানারকম স্ব-বিরোধী ভাবালুতা, দ্বিধাসংশয় কাটিয়ে উঠতে পারি। সে আরও পরে, ১৯৩০-৩২ সনে, যখন বন্দীদশায়; "কম্যুনিস্ট ইস্তাহার", এঙ্গেলসের "সোশ্যালিজম", লেনিনের "হোয়াট ইজ টু বি ডান্" ইত্যাদি, এক কথায়, মূল মার্ক্সবাদী গ্রন্থগুলি, বস্তুবাদী দর্শনের ইতিহাস, সোশ্যালিস্ট চিন্তা ও কর্মধারা বিকাশের ইতিহাস কী আগ্রহ, বিস্ময় যে সৃষ্টি করেছিল সে সময় তা ভুলবার নয়।

তখনকার কৌতূহল, জিজ্ঞাসা আর অনুশীলনের পিছনে ছিল বিশ্ব-রাজনীতিতে ভাঙা-গড়ার প্রচণ্ড প্রভাব। দুনিয়াজোড়া অর্থ-সংকট, ধনতন্ত্রের অন্তর্বিরোধ বিপর্যয় ঘটিয়েছে দেশে দেশে; ইওরোপের বুদ্ধিজীবীমহলে অনেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপুল সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন, বার্নার্ড শ, রলাঁ, রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত সমাজের অগ্রগতির মধ্যে মানবমুক্তির আশ্বাস পেয়েছেন। এ-দিকে ফ্যাসিবাদ, নাৎসীতন্ত্রের উদ্ভব ধনিক শ্রেণীর আধিপত্য টিকিয়ে রাখবার জন্য উল্টোদিকে ঠেলা দিচ্ছে। কম্যুনিজমের আদর্শ, সোভিয়েত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তখন এনেছে আমাদের কাছে গণমুক্তির পথের সন্ধান। ১৯৩১ সনে করাচি কংগ্রেসের সময় থেকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির এক অংশেও কম্যুনিস্ট চিন্তাধারার ছাপ পড়ে, তার একটা কারণ একদিকে ধনতন্ত্রের সংকট, আর একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজবাদী পরিকল্পনার বাস্তব বিকাশ। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের

প্রেরণাও মূলত সোভিয়েত আদর্শানুসারী। "ইনকিলাব জিন্দাবাদ", "সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক", এ দুটি আওয়াজ ভারতবর্ষে প্রথম অযুত কণ্ঠে ধ্বনিত হয় বোধহয় ১৯২৮-২৯ সনে। সেও বলশেভিক বিপ্লব এবং সোভিয়েত কম্যুনিস্ট কর্মাদর্শের প্রভাবে। নেহরু যে "কন্স্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি" গঠনের দাবি তোলেন সেটির উৎস ছিল বলশেভিক বিপ্লব, ১৯৪৭ সনে তার বিকৃত রূপই নেহরু-নেতৃত্বের ব্যর্থতার প্রথম কিস্তি।

পঞ্চাশ বছরের বিশ্ব রাজনীতি, সেই সঙ্গে ভারতে গণমুক্তি আন্দোলনের প্রতিটি পর্বের সংকল্প, সংকট, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও পরিণতির বর্ণনা এ প্রবন্ধে করা দুঃসাধ্য। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭, এই দশ বছরে ধনতন্ত্রের সংকট, নাৎসীতন্ত্রের উদ্ভব, স্পেনে গৃহযুদ্ধ, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিকাশ; এগুলির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে মার্ক্সবাদী চিন্তা ও কর্মধারা স্পষ্ট ও পরিপুষ্ট হয়। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন বহু শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীকে সভ্যতার সংকট সম্পর্কে সচেতন করে। এই দশটি বছরই বলতে গেলে আমাদের চিন্তা ও মনোভঙ্গিকে মার্ক্সবাদী গড়ন দেয়। বার্নার্ড শ বলেছেন, এ যুগের রাজনীতির দুটি ভাগ—প্রাক্-মার্ক্সীয় আর মার্ক্স-পরবর্তী অথবা মার্ক্সীয়। বিলম্বে হলেও ভারতবর্ষের রাজনীতিতেও এই দুটি ভাগ স্পষ্ট হয়েছে, মার্ক্সবাদ সমর্থক হোক অথবা মার্ক্সবাদবিরোধী, 'হাঁ' কি 'না' ধরে নিয়ে তবেই এখনকার রাজনীতির পাঠ। রাজনৈতিক চাতুরীতে, গোঁজামিলেও তাই চাই জনগণের নামে শপথ, সমাজতান্ত্রিক ছাঁচ, জনক্রান্তি, কৃষক-মজদুর-প্রজারাজ ইত্যাদি। বলশেভিক বিপ্লবের পঞ্চাশ বছরের পরিণামফল তাই "হাঁ" ও "না" দু ভাবেই স্বীকৃত।

পঞ্চাশ বছরে কী পেয়েছি, আর কী পাই নি সে হিশাব সহজ নয়, সে হিশাব সবিস্তার দিতে গেলে পুঁথি হবে পর্বতপ্রমাণ। মোটামুটি বুঝি, শোষণমুক্ত সমাজগঠনের প্রতিশ্রুতি ও প্রয়াস ব্যর্থ হয় নি। ভুল বিস্তর ঘটেছে, আতিশয্য, বিকৃতিও কম নয়। কোটি কোটি মানুষকে মিলিয়ে কাজ, বিবোধিতা, বিচ্যুতি, বিকৃতি না ঘটে পারে না। ইতিহাসের পথ পীচে মোড়া নয়। সব কিছু নির্ভুল, নির্বিঘ্ন হবে, এ রকম আশা বা দাবি করা মানে ইতিহাসকে সর্বশক্তিমান দিব্যপুরুষের লীলা মনে করা। মানুষের ইতিহাস আসলে কখনই তা নয়। সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের বাস্তব

রূপরেখা দেখিয়ে দিয়েছিলেন মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্। কোনও মডেল তাঁরা দেন নি, দিতে পারেন না। কতকগুলি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, নির্দেশ, সতর্কবাণী আর মার্ক্সবাদী পদ্ধতি, এই নিয়ে বলশেভিক বিপ্লবের শুরু। রাশিয়ায় সমাজ-বিপ্লব হতে পারে না; এমন কথা মার্ক্স বলেন নি, বরঞ্চ স্পষ্ট বলেছিলেন জারতন্ত্রী রাশিয়া বৈপ্লবিক সম্ভাবনাপূর্ণ। মার্কিনী প্রচারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কেউ কেউ আবার বলছেন এখন, বলশেভিক বিপ্লবটা আদতে বিপ্লবই নয়; জারের আমল খুব খারাপ ছিল না, কর্নিলভ, কেরেনস্কি রাশিয়াকে ভদ্রদস্তুর গুছিয়ে আনতে পারতেন। এর জবাব দেওয়ার দরকার হয় না। সোভিয়েত জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাচ্ছন্দ্য, সামর্থ্য প্রচণ্ড ক্ষয় ক্ষতি বিপত্তি সত্ত্বেও কোন্ স্তরে উঠেছে মার্কিনীরাও সেটা জানে, "স্বাধীন বুদ্ধিজীবী"রা সেটা মানতে নারাজ নানারকম কারণে। আরও কথা, স্বাধীন ভারতীয় বুদ্ধিজীবী যখন মার্কিনী ঢং-এ বলেন বলশেভিক বিপ্লবটা ঝুটা, সোভিয়েত ইউনিয়নে উন্নতিও সামান্য, তখন তাঁর স্বাধীনতা এবং বুদ্ধি সম্পর্কে সন্দেহ না হয়ে পারে না।

মনে আছে, প্রথম পর্বে সোভিয়েত-বিরোধীদের যুক্তি ছিল, কলকারখানা ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত না হলে সমাজ অচল, সম্পদ ও শক্তি বৃদ্ধি অসম্ভব, ব্যক্তিগত মুনাফা-শিকারী অর্থনীতির বিকল্প নেই। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থার অগ্রগতি সে যুক্তি মিথ্যা প্রমাণ করেছে। সোভিয়েত ধরনের অর্থনীতিতেও বহু সমস্যা আছে, তার সমাধানের চেষ্টাও বন্ধ নেই। সে আলাদা কথা। পঞ্চাশ বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সমাজতন্ত্রের যে অগ্রগতি তা সামান্য নয়। মার্কিনী ঢং-এর পাণ্ডিত্যের কথা থাক; ব্রিটিশ লেবার পার্টির নেতা অ্যাটলি ১৯৩৭ সনে বলশেভিক বিপ্লবের বিংশ বার্ষিকীর সময় স্বীকার করেছিলেন—হাঁ, এক রকমের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে-দেশে। সোভিয়েত সমাজে ব্যক্তিগত আয়ের তারতম্য আছে, এ অভিযোগটা ধন-গণতন্ত্রী স্তাবকদের মুখে শোভা পায় না। স্বাধীন বুদ্ধিজীবীরা মার্কসের "ক্রিটিক অব দি গথা প্রোগ্রাম" সন্তর্পণে এড়িয়ে যান। মার্কস সেখানে স্পষ্ট বলেন, ব্যক্তিগত আয় অর্থাৎ পারিশ্রমিকের তারতম্য দূর হওয়া সম্ভব একমাত্র পূর্ণ পরিণত কম্যুনিস্ট সমাজে যেখানে প্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তুর প্রাচুর্য সকলেরই আয়ত্ত হতে পারে। সোভিয়েত সমাজ ব্যক্তিগত মালিকানায় অন্যের পরিশ্রম-

লব্ধ ফল আত্মসাৎ করবার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করেছে, উত্তরাধিকারসূত্রে কলকারখানা ইত্যাদি ভোগ দখল, মুনাফা অর্জনের অধিকার কারোই নেই। তার মানে এ-সমাজ শ্রেণীগত আধিপত্যমুক্ত। এ-সমাজের মেহনতী জনসাধারণ কোনও বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী দ্বারা শোষিত হয় না। সব কিছু ত্রুটিমুক্ত একথা কখনও বলি না, কিন্তু সামাজিক প্রগতির লক্ষ্য ও গতিধারা নিশ্চয়ই মার্কসবাদী আদর্শে গণ-বিপ্লব ও গণমুক্তির প্রতিশ্রুতি পূরণ করছে।

বিরোধীরা বলছেন, কিন্তু সেই যে রাষ্ট্রের বিলুপ্তির প্রতিশ্রুতি, তার কতদূর কী হল? প্রশ্নটা ঠিক নির্দোষ নয়, কিছুটা ধূর্তও। মার্কস-লেনিনবাদী সূত্রের কথা "উইদারিং অ্যাওয়ে অফ দি স্টেট" অর্থাৎ বাস্তব অবস্থাক্রমে রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা শুকিয়ে যাবে, ঝরে পড়বে। সেটা কখন কী ভাবে কোথায় সম্ভব? সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রীদের বিরোধিতা, শত্রুতা যতদিন সুস্পষ্ট, প্রবল, ততদিন পৃথিবীর একটি কি দুটি কম্যুনিস্টশাসিত অঞ্চলে এ-রকম পরিবর্তন ঘটতে পারে না, ঘটানোর দাবি করাটা দুরভিসন্ধিমূলক। সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্মকাল থেকে তাকে খতম করবার জন্য, তার সমাজতান্ত্রিক গঠন প্রয়াস বিপর্যস্ত, ব্যর্থ করার জন্য ধনতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদীদের চেষ্টার কামাই নেই। এটা বাস্তব সত্য, হিটলার মুসোলিনী চার্চিল ট্রুম্যান থেকে লীণ্ডন জনসন তার সাক্ষী। তাছাড়া লেনিনের উক্তিও স্পষ্ট—সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর সারা পৃথিবীতে প্রসারিত প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটতে পারে। স্বাধীন বুদ্ধিজীবীরা লেনিনের এই উক্তিটা চাপা দিয়ে প্রতিশ্রুতিভঙ্গের সোরগোল তোলেন।

নিজের দিক থেকে তবু স্পষ্ট স্বীকার করি, সোভিয়েত রাষ্ট্র শাসন-পদ্ধতির আরও সম্মার্জনা এবং উন্নতি প্রয়োজন। স্তালিনের একনায়কত্ব মার্কস-লেনিনবাদী সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের বিষম বিকৃতি ঘটিয়েছিল। অবশ্য ধন-গণতন্ত্রের ইতিহাসও ব্যভিচার-বিকারমুক্ত নয়। জেফারসন লিংকনের ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতির সঙ্গে মার্কিন গণতন্ত্রের বাস্তব স্বরূপ কতখানি মেলে? ক্যাপিটালিস্ট ইউটোপিয়ায় স্বাধীন ব্যক্তিগত উদ্যোগের ভোজবাজি সত্ত্বেও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আমেরিকায় দুশো বছর পরেও দারিদ্র্য দুর্গতির বাড়াবাড়ি কেন? মামুলি গণতন্ত্রি রাষ্ট্রে জনসাধারণ যে স্বাধীনতা ভোগ করে অথবা ভোগ করতে অধিকারী সে-স্বাধীনতা দু-দশ বছরে আসে নি, ব্রিটেনে, পশ্চিম

ইওরোপে আসতে লেগেছে দুশো বছর। কাজেই সোভিয়েত রাষ্ট্রের একটি কঠিন সংকটময় পর্বের শাসনব্যবস্থার দোষত্রুটি, বিচ্যুতি, বিকারকে অপরিবর্তনীয় ধরে নেওয়া এবং সেজন্য বলশেভিক বিপ্লব এবং সোভিয়েত সমাজব্যবস্থাকে দাগী সাব্যস্ত করা অন্যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন থেমে যায় নি, অগ্রগতি আশাপ্রদ। বলশেভিক বিপ্লবের পঞ্চাশ বছরের পরিণতি সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের সার্থক নিদর্শন—বহু অপূর্ণতা অসঙ্গতি সত্ত্বেও। আইজাক ডয়শার বলেছেন, "অসমাপ্ত বিপ্লব।" ব্যর্থ নয়, অসমাপ্ত; ঠিক কথাই। কিন্তু বিপ্লবের সমাপ্তি কেন হবে? পর্ব থেকে পর্বান্তরে উন্নয়ন, নতুন সমস্যা, নতুন সংকল্প, সমাধান প্রয়াস, এই তো মানবসমাজের নিরন্তর গতিধারা; পঞ্চাশ বছরের বলশেভিক বিপ্লব সেই নিরন্তর গতিস্রোতে ধাবমান পূর্ণতর লক্ষ্যের দিকে।

নতুন দিন

পুরনো কথা

গোপাল হালদার

ভূমিকা

"আই হ্যাভ্ সিন দ্য ফিউচার, ইট ওয়ার্কস"—রুশ বিপ্লব ও সোভিয়েত রাষ্ট্র সম্বন্ধে লিঙ্কন ষ্টিফেন্স-এর এই কথাটি সুপরিচিত। উক্তিটির তারিখ বোধহয় ১৯২০। সেই 'ভবিষ্যৎ' আমরা তখনো দেখি নি। কিন্তু 'আগামীর আঙিনায়' পৃথিবীর ডাক পড়েছে, এ কথা আমাদের কাছেও গোপন থাকল না। উষার আলো পাখির ডানায় স্পন্দন জাগায়, কণ্ঠে কাকলি জোগায়। ঘরের মধ্যেও ঘুমন্ত মানুষই বা তারপরে কতক্ষণ থাকতে পারে চোখ বুজে—বিশেষ করে যে মানুষ প্রভাতের প্রত্যাশী?

এই প্রভাতের প্রত্যাশা এসেছিল বাঙলা দেশের মনে ১৯০৫-এতে। ১৯১৭-এর পরে আমাদের পক্ষে তাই সেই সূর্যোদয়ের দিকে মুখ না ফিরিয়ে থাকা বেশি দিন সম্ভব ছিল না। অথচ, ঘরের দুয়ার-জানালা যে সব খোলা ছিল তাও নয়। তবু চোখ মেলতে না-মেলতেই পেলাম আলোকের আহ্বান। কারণ, প্রভাতের প্রত্যাশা ছিল স্বদেশীর স্বপ্নের মধ্যেও স্বপ্ন হয়ে॥

গৃহ-পরিবেশ রাজনীতির হাতেখড়ি

জন্মেছিলাম শতাব্দীর গোড়ায় (১৯০২)—'স্বদেশী যুগ' (১৯০৫-১৯০৮) দেখেছি বলা অন্যায়। কান দিয়েই তাকে চিনতে হয়েছে। পূর্ব বাঙলায় 'স্বদেশী'-সাধনাকে প্রথম যে রূপে চিনলাম তার সবটা মঙ্গলের নয়। বিদ্রোহে তা দৃপ্ত ও সবল, কিন্তু বিক্ষোভেও তা বক্র ও বিসর্পিত। অথচ আমার গৃহের আবহাওয়ায় উগ্রতা ছিল না, বক্রতাও না। রামমোহন থেকে

মধুসূদন-বঙ্কিম পর্যন্ত জন ছয় বাঙালি পূর্বজদের বাঁধানো আলেখ্য বৈঠকখানার বাঁশের বেড়ায় টাঙানো ছিল—তাঁদের সঙ্গে তাই আমাদের আশৈশব পরিচয়। অন্যদিকে টাঙানো ছিল সেদিনের 'বেঙ্গলী'র লম্বা ক্রোড়পত্রে আর্ট পেপারে মুদ্রিত ডব্লুই. সি. ব্যানার্জি থেকে রাসবিহারী ঘোষ (প্রথম থেকে তৎকালীন শেষ) প্রমুখ কংগ্রেস প্রেসিডেন্টদের ক্ষুদ্রাকার প্রতিকৃতি—একাদিক্রমে তাঁদের নাম আবাল্য বলতে পারতাম মুখস্থ। টিলক, অরবিন্দ, বিপিন পাল ও লাজপৎ রায়ের ছবিও বাড়ির যুবকেরা সেদিন ঘরে রাখতে চাইতেন; কিন্তু বাড়ির কর্তারা জানতেন তা সুবুদ্ধির কাজ হবে না। বরং মহারানীর প্রতিকৃতিকে বেড়ার মধ্যখানে রক্ষাকবচ করে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সেই উকিলের বৈঠকখানায় সন্ধ্যায় নিত্য বসত আমার পিতৃবন্ধু শিক্ষিত ভদ্রলোকের বিশ্রম্ভালাপের আড্ডা। না ছিল তাস না ছিল পাশা, এমন-কি তামাকও মাত্র দু-একজনারও হত মাঝে-মধ্যে প্রয়োজন। মামলা ও আইন সংক্রান্ত বিষয়ের অপেক্ষাও নিত্যকার সংবাদ ও তার আলোচনায় তাঁদের ছিল রুচি; উচ্চ হাস্যে ও শুভ্র রসিকতায় তা ছিল স্বচ্ছন্দ—ঘরের দূর প্রান্ত থেকে আমাদেরও তা আস্বাদন অবারিত ছিল। আপনারই অজ্ঞাতে অনেক জিনিশের মতো দেশের ও বিদেশের রাজনীতিতে এখানেই আমাদের হাতেখড়ি হয়: সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা, কার্জন-রমেশ দত্ত-গোখলের বিতর্কের কথা কানে আসত। সেই সঙ্গেই হেস্টিংস্-এর ইম্পীচ্‌মেণ্ট বিষয়ে বার্ক-শেরিডেন-ফক্‌সের বক্তৃতা, জন্‌ব্রাইট্ গ্লাড্‌স্টোন্-প্রমুখে বাগ্মিতা, আয়র্লণ্ডের পার্নেল ও হোম রুল-সমস্যাও উঠে পড়ত। বাগ্মিতাই ছিল সেদিনের পলিটিক্‌সের বাহন। শেক্‌স্‌পিয়র-মিলটন ও মাইকেলের দীর্ঘ কাব্যাংশ আবৃত্তিতে ছিল সেদিনের বৈদগ্ধ্য! উৎকর্ণ হয়ে শুনতাম ঘোষণা:

Fallen cherub! To be weak is miserable

Better to reign in Hell than to serve in Heaven

সাহিত্য ও স্বাধীনতার বাণী একাকার হয়ে পৌঁছত আমাদের মনে।

এইখানেই আলিপুরের বোমার মামলার সঙ্গে মজঃফরপুরের বোমা ও প্রফুল্ল চাকীর আত্মদানের গল্পে (১৯০৮) চমৎকৃত হয়ে উঠি—সেই আমার 'স্বদেশী'র প্রথম চেতনা। ক্রমে নানা দুঃসাহসিক 'স্বদেশী' কর্ম ঘটল; সে সব প্রসঙ্গও উঠ্‌ত। আমরা কিশোরেরা মায়েদের সঙ্গে বাঙলা সাপ্তাহিকের

পাতা থেকেও তা গ্রাস করতাম। একটু পরে মায়েদের প্রসাদেই 'প্রবাসী'ও' আমাদের প্রাপ্য (১৯০৯-১০) হয়েছিল।

'রুশ-জাপান যুদ্ধের' সময় (১৯০৪-৫) থেকেই সর্বত্র গৌণত রুশিয়ার প্রসঙ্গও উঠত, মুখ্যত উঠত প্রায়ই জাপানের সোৎসাহ অভিনন্দন। জাপানের জয় এশিয়ার জয়, আর 'স্বদেশী'রও (১৯০৪-৫) তা একটা মুখ্য প্রেরণা। তবু সেই জাপান-পূজা (১৯০৮-১৯১১) তত বিস্মৃত নেই। আমাদের বৈঠকখানায় তা প্রবলও ছিল না, উৎসাহেরও আর সঞ্চার করত না। জাপান ইংরেজেরই দোসর, শ্বেতাঙ্গদের এশিয়া থেকে বিতাড়িত যখন করবে তখন সেই এশিয়ার কৃষ্ণাঙ্গ-পীতাঙ্গদেরও নিজেদের দাসে পরিণত করতে ছাড়বে না এমন কথা স্পষ্ট করেই শুনেছি ওই বৈঠকখানায়। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ জাপানের বন্ধুত্ব কামনা করে জাপানে গিয়েছিলেন, ফিরবার পথে জাহাজে তাঁর মৃত্যু হয়, দেহ লাভ করে সলিল-সমাধি। শুনতাম, তিনি নাকি স্বদেশবাসীদের উদ্দেশ্যে মৃত্যুকালে বলে গিয়েছিলেন, 'জাপান ভারতের বন্ধু নয়।' ও-প্রসঙ্গেই ম্যাপে আঁকা বিশাল রুশ সাম্রাজ্যের কথাও জানতাম—ক্ষুদ্র জাপানের হাতে সে পরাজিত হল; স্বৈরাচারী শাসনেরই তা ফল। আর শুনতাম, নেপোলিয়নের ফ্রান্স জার্মানির হাতে তিন সপ্তাহের যুদ্ধেই চূর্ণবিচূর্ণ হয় (১৮৭১), সেদিন থেকেই দুর্ধর্ষ জার্মান জাতি একটা ভয়ানক ভাবী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। বয়স তখন ১২ বৎসরও নয়—কিন্তু এ ভাবে বৈদেশিক রাজনীতিতেও হাতে খড়ি ঘটছিল। ত্রিপলির যুদ্ধ ও বল্কান্ যুদ্ধ সেসব আলোচনার নতুন উপলক্ষ জোগাচ্ছিল, আর এসে গেল প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-এর ৪ঠা আগস্ট থেকে ১৯১৮-এর ১১ই নভেম্বর)। সে যুগের আগেই দেশী ও বিদেশী রাজনীতির কয়েকটা মোটা-মোটা দাগে আমাদের মনের পটভূমি রচিত হচ্ছিল। যথা, ১. 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়' বাঙলা সাহিত্যের এই বাণী থেকে শুরু করে স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার'—টিলকের এই রাজনৈতিক উক্তিতে একটা সাহিত্যিক-স্বাদেশিক মূল ছোপ মোটা হয়ে পড়েছে—২. কংগ্রেস থেকে নরম পন্থীরা (মডারেট) নরম সুরে যা বলবার বলুক, গরম কথাও গরম পন্থীদের (এক্‌স্‌ট্রিমিস্ট) বলা দরকার। কিন্তু চরম মূল্য না দিলে স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব—চোখের উপর আয়র্ল্যাণ্ড তার দৃষ্টান্ত।

তাই চরমপন্থী স্বদেশী বিপ্লবী দলও চাই। ৩. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেও সূর্য অস্ত যেতে পারে—জার্মানী ও জাপান তার ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বী। তবে জার্মান ও জাপান সাম্রাজ্যের উত্থানে এশিয়ার জাতিদের ভাগ্যোদয় হবে না। ৪. রুশ সাম্রাজ্য, অস্ট্রোহাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য, তর্ক সাম্রাজ্য—এ সবের এখন মরণদশা। স্বৈরাচারী রাজাদের শাসন বাতিল করে ওসব প্রত্যেক দেশে 'ইয়ং তুর্কদের' মতো (কোথায় এরূপ কোন্ বিশেষ দল আছে তা জানতাম না) নতুন ধারার যেসব দল মাথা তুলছে তারা যদি গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তা হলেই দেশের মঙ্গল। ৫. পরাধীন জাতি সর্বত্র স্বাধীন হোক্, আর স্বৈরাচারী শাসনের স্থলে সর্বদেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক্,—এ রকম একটা সহজ কামনা ক্রমেই দেশের মানুষের রাজনৈতিক চেতনারূপে দেখা দিতে থাকে—আমরাও বাল্য থেকেই পেয়েছিলাম সেই বোধ।

দেশ ও কাল

বাধল প্রথম যুদ্ধ—যা শেষ হবার এক বৎসর পূর্বেই 'অক্টোবর বিপ্লব' ঘটে।—সে যুদ্ধে এক দিকে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, রুশিযার 'মিত্রপক্ষ', অন্য দিকে জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারি, তুর্কী প্রভৃতির 'মধ্য-ইউরোপীয় দল'। স্বভাবতই এ যুদ্ধে ১. সাধারণ ভারতবাসী ভাবত—ব্রিটিশের পরাজয়েই আমাদের লাভ; অন্তত ব্রিটিশের বিষদাঁত ভাঙলেও আমাদের লাভ। ২. সুশিক্ষিত ভারতীয় নেতারা মনে করতেন বিষদাঁত ভাঙা মন্দ নয়; কিন্তু কাইজার প্রমুখ জঙ্গীবাদীদের যে দাঁতে আরও বেশি বিষ তাতে কারও মঙ্গল নেই। অতএব ২. ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করে ক. কিছু গুড্ কন্ডাক্টের রাজনৈতিক প্রাইজ্ লাভের চেষ্টাই ভারতের পক্ষে 'গুড্ পলিটিক্স' (এরূপই ছিল কংগ্রেসের নরম পন্থীদের নীতি)। আর খ. সেই সঙ্গে কিছু চাপ সৃষ্টি করে যুদ্ধ শেষের পূর্বেই ওই প্রাইজটা 'হোম রুলের' প্রতিশ্রুতি-রূপে আদায় করাই আবশ্যক (এই ছিল কংগ্রেসের, গরমপন্থীদের কৌশল)। লোকমান্য টিলকের ও মিসেস্ বেসান্টের এই হোম্‌রুলের দাবি জনপ্রিয় হোক্; কিন্তু এই যুদ্ধকালেই গ. সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা স্বাধীনতা আয়ত্ত করা চাই, এই ছিল চরম পন্থীদের সংকল্প (এই ছিল 'জাতীয় বিপ্লবী' বা 'স্বদেশীদে'র নীতি)। এই নীতি অনুসরণ করেই ভারতীয় বিপ্লবীরা নানাভাবে সশস্ত্র বিদ্রোহের চক্রান্ত করছিল। যুদ্ধারম্ভে তাই চেষ্টা হল বিদেশ (জার্মান

পক্ষ) থেকে অস্ত্র সংগ্রহের, আর স্বদেশে নিজেদের গুপ্ত সংগঠন বিস্তারের এবং ভারতীয় সৈনিকদেরও সেই গুপ্ত বিদ্রোহ আয়োজনে অন্তর্ভুক্ত করার। যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলা দেশে—বিশেষ করে পূর্ব বাঙলায় বিপ্লবী গুপ্তসমিতিগুলি দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে।

সুযোগও ছিল। মহাযুদ্ধ অভাবনীয় ত্বরিত গতিতে সাধারণ মানুষকে দেশের ও বিদেশের সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। খবরের কাগজ পড়া তখনি প্রথম নেশা হয়ে ওঠে। যদিও সকলেই জানত—আমরা যে সংবাদ পড়ছি তা হচ্ছে ব্রিটিশের স্বার্থে পরিবেশিত সংবাদ, বারো আনিই অবিশ্বাস্য। বারো আনি মিথ্যা বাকি চার আনি মাত্র সত্য। তবু সংবাদ-জানার নেশা কাউকে রেহাই দেয় না, আর সেই সঙ্গেই ছড়িয়ে পড়ে দেশ-বিদেশের রাজনীতির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা। এক মুহূর্তে আমাদের মতো কিশোর (প্রিক-টিন্‌এজার্স) ওই শহরে ইংরেজি দৈনিক স্টেট্‌স্‌ম্যান্, ইংলিশম্যান, নিয়ে সংবাদ পড়তে শেখে, পরে 'বেঙ্গলী' 'পত্রিকাও' শহরে লভ্য হয় আর আমাদেরও পাঠ্য হয়। দৈনিক বাঙলা পত্রিকাও ('নায়ক' ছিল, 'দৈনিক বাঙ্গালী', 'বসুমতী') তখন তাই সুপ্রচলিত হল। সাপ্তাহিক বাঙলা পত্রিকার (হিতবাদী, বঙ্গবাসী, বসুমতী) আরও প্রসার বাড়ে। একজন হয়তো একখানা কাগজ পড়ে, সাক্ষর-নিরক্ষর দশজন গোল হয়ে বসে তা শোনে; আর পরে নিজেদের মতো করে তারা সমস্ত পরিস্থিতির আলোচনা করে—এ ছিল সাধারণ দৃশ্য।

স্বদেশীর দীক্ষা ও স্বদেশীর সন্ধান জিজ্ঞাসা

স্বাধীনতা যুদ্ধের এই সুযোগ সমাগত, সমগ্র বিদ্রোহ আসন্ন,—এই ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয় সহস্র সহস্র বালক ও যুবক গুপ্ত সমিতিতে এ সময়ে যোগদান করে। নানা সূত্রেই আভাস পাওয়া যেত—কিছু বাধা পড়ছে, কিন্তু দেরি নেই। 'বাঘা যতীনে'র মৃত্যুর (৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৬) পরে এ আশায় একটা ছেদ পড়ল। তবু আশা পরিত্যক্ত হল না। এক বাঙলা দেশেই দেখতে না দেখতে 'ভারত রক্ষা আইনে' প্রায় সাড়ে চার হাজার বিপ্লবী যুবক কারারুদ্ধ ও অন্তরীন হল। বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি অবশ্য তাতেও ভেঙে গেল না। কিন্তু 'না হবে তোমার বোধন জননী, রাক্ষসে ভাঙিল মঙ্গল ঘট',—সখেদে সেদিনের গুপ্ত পত্র 'স্বাধীন-ভারত' জানায়, আর আশ্বাস জোগাতে চায়।

সেই আশার রেখা আমরা খুঁজতাম বৈদেশিক শক্তিদের সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবীদের চক্রান্তের যে সব মামলা আমেরিকায় চলে তা থেকে, আর দেশের মধ্যে দলেব বিপর্যয় ঠেকাবার চেষ্টায় যে সব 'স্বদেশী' ডাকাতি, হত্যা, মামলা প্রভৃতি তখনো ঘটে, তা থেকে। কিন্তু সেই সঙ্গেই জাগে 'স্বদেশী' জিজ্ঞাসা; জাতীয় আত্মশক্তির সম্বন্ধে প্রবল চিন্তা। দেশের মানুষকে সচেতন না করলে শুধু মুষ্টিমেয় কিছু যুবক গোষ্ঠীর বিচ্ছিন্ন ভাবে অস্ত্র প্রয়োগেই কি বিপ্লব সম্ভব? কিংবা, স্বাধীনতার গেরিলা যুদ্ধ কি মুষ্টিমেয়ের এই গুপ্ত চক্রান্ত? নিরস্ত্র জাতির অস্ত্রশক্তি নেই, জনশক্তিই তার মূলশক্তি। সেই শক্তিকে সচেতন করাই স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে গোড়ার কাজ।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় 'দরিদ্র নারায়ণে'র সেবার আদর্শে গুপ্ত সমিতিগুলি ইতিপূর্বেও প্লাবনে, দুর্ভিক্ষে, আর্তত্রাণে, রোগশুশ্রূষায় এবং ব্যায়ামাগার, গ্রন্থাগার, পাঠাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়েছিল। তারাও বুঝেছিল দেশ বলতে তো দেশের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে দেশের দরিদ্র সাধারণ; দেশের মানুষের সঙ্গে তাই বিপ্লবীদের আত্মীয়তার যোগ দৃঢ় হওয়া প্রয়োজন। তবে দেশের মানুষ সকলে তো সৈনিক হবে না, সে দায়িত্ব শিক্ষিতদের। অর্থাৎ প্রাণবান্ যুবকদের, এবং কার্যত মুষ্টিমেয় বালক ও তরুণের। এই বাস্তব অবস্থাটা স্পষ্ট হয়ে উঠতেই মনে হল— গুপ্ত মন্ত্র নয়, জনসেবার পথই বরং দেশসেবার পথ, স্বাধীনতা সংগ্রামেরও 'গোড়ার কাজ'।

অন্তত এক-আধজন অপবিণত বুদ্ধি কিশোর 'দেশকে আপন করার' এই পথ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে সচেতন হয়েছিল রবীন্দ্রনাথেরই কৃপায়। 'স্বদেশী সমাজে'র কথাও মনকে স্পর্শ করে। এমন কি, তাদের 'স্বদেশী' ভাবনা ভারত তীর্থের পরিচয় দিতে দিতে এই অনুভূতিতেও পৌছেছিল—'স্বজাতির মধ্যে সর্বজাতিকে ও সর্বজাতির মধ্যে স্বজাতিকে সত্য রূপে অনুভব করা'ও স্বদেশী-সাধনার প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি (অবশ্য ১৯১৮-১৯এ রবীন্দ্রনাথের 'ন্যাশনালিজম্-এব লেখাগুলি 'জাতিপ্রেম' নামধারী অমানুষিকতা সম্বন্ধে আরও গভীর ভাবেই সাবধান করে সকলকে চিন্তায় ও হৃদয়াবেগে অসঙ্গতি। কিন্তু সেই প্রথম স্বদেশী-জিজ্ঞাসার দিনে বহু দিকে এই তরুণদের রইল

জনসেবা ও বিদ্রোহ, জনসাধারণের সক্রিয় আয়োজন ও মুষ্টিমেয়ের আত্মদান; এরূপ দুই পৃথক্ ধারণাকে খাপখাইয়ে নিতে চেয়েছে তারা তাদের চিত্তের প্রাণময় বিশ্বাস দিয়ে স্বাধীনতার সংগ্রাম একটা ব্যাপক ও বহুবিধ আয়োজন; শুধু জনসেবাও তা নয়, জনগণেব আত্মসচেতনতার আশায় পথ চেয়ে থাকলেও তা হবে না। শাসকেরা 'স্বদেশী সমাজ'ও অবাধে গড়ে উঠতে দেবে কেন? শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী সংগ্রামেই সেই আত্মশক্তির সাধনাকে সম্পূর্ণ হতে হবে। কিন্তু বিপ্লবের পথ কী?

রুশ-বিপ্লব ও বিপ্লবের বার্তা বিস্তার

আমার স্বদেশী-ভাবনা যখন এ জিজ্ঞাসায় নিবদ্ধ, তখন ১৯১৭ ফেব্রুয়ারি-মার্চের এক সময়ে জানলাম জার সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, রুশিয়ায় বিপ্লব দেখা দিয়েছে। সঠিক কিছু বুঝবার উপায় ছিল না। আমরা জানতাম —রুশিয়া সন্ত্রাসবাদী নিহিলিস্টদের দেশ, আবার ধর্মপ্রাণ তলস্তোয়ের মতো 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে'র দেশ, বাকুনিন-করোপট্‌কিনের প্রবর্তিত নৈরাজ্যবাদীর দেশ। কিন্তু ফেব্রুযারি বিপ্লবীরা কারা, জানি বা না জানি, জারতন্ত্রের পতনে আমাদের উল্লাসের সীমা ছিল না। বৈঠকখানায়ও তখন সে মর্মের কথাই শুনেছি—'একটা স্বৈরতন্ত্র গেল, আরেকটা প্রজাতন্ত্রের জন্ম হল।'[১] আমাদের যা খেদ—রুশ প্রজাতন্ত্রী শাসকরা যুদ্ধে ব্রিটিশের পক্ষেই থেকে যাচ্ছে। তারা জারের অভিজাত গোষ্ঠীব ও সেনাপতিমণ্ডলের সহযোগী। পড়ছিলাম—বড গোলমাল, 'সাধারণ সৈনিকে'রা যুদ্ধে অস্বীকৃত, শ্রমিকেরা শাসকগোষ্ঠীব বিরোধী, মালিকদের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ, তাদের প্ররোচিত করছে উগ্র বিপ্লবী পার্টি ও তার নেতারা। তথাপি বলশেভিক ও তার নেতা লেনিনের নাম তখন-তখনি চোখে পড়ে নি, পড়লেও তা মন স্পর্শ করে নি। 'অক্টোবর বিপ্লবে' (৭ নভেম্বর, ১৯১৭) যখন লেনিন ও বলশেভিকরা পেত্রোগ্রাদে মস্কোতে শাসনক্ষমতা আয়ত্ত করলে তখন এক মুহূর্তে তা অদ্ভুত নাম হযে উঠল—'স্টেট্‌স্‌ম্যান'-এর মতো ইংরেজি কাগজ থেকে বুঝলাম, এ বিপ্লবে সাম্রাজ্যবাদীদের ও শাসকশ্রেণীর মধ্যে 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' রব উঠেছে। সে সূত্রেই কতকটা ভালোবেসে ফেললাম বলশেভিকদের, তারা নাকি সকলের সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে পৃথিবীতে সাম্য স্থাপন করতে চায়। বেশ তো, আপত্তি কিসের? তারা উগ্র সমাজতন্ত্রী—নামও তাদের জানতাম

না পূর্বে। বঙ্কিম 'বঙ্গদর্শনে' 'সাম্য'বিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে (১৮৭২) প্রথম আন্তর্জাতিকের সাম্যবাদীদের মতামত সশ্রদ্ধ ভাবেই আলোচনা করেছিলেন, তিনিও কিন্তু মার্কস-এঙ্গেলস্-এর নাম জানতেন মনে হয় না। বিবেকানন্দ সোশ্যালিজম ও সোশ্যালিস্টদের সম্পর্কে এসেছিলেন কিনা জানি না ; করোপট্‌-কিনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল (১৮৯৮)। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, পৃথিবীতে বৈশ্যদের রাজত্ব শেষ হচ্ছে, আসছে শূদ্রদের স্বাধিকারলাভের যুগ। রবীন্দ্রনাথের যৌবনের লেখায়ও ইউরোপে সোশ্যালিজম-এর প্রভাবের উল্লেখ আছে। যুদ্ধের পূর্বেই ভারতবর্ষে কেয়ার হার্ডি ও রামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড-এরও পরিচয় ছিল সোশ্যালিস্ট বলে, ভারতবাসীদেরও তাঁরা সুহৃদ ছিলেন। কিন্তু লেনিন তখনো ভারতে অপরিচিত নাম, 'বলশেভিক' 'মেনশেভিক' প্রভৃতি পার্টিগুলিরও নাম আমরা পূর্বে শুনি নি। তবু বলশেভিক বিপ্লব যখন দেখা দিল, তাদের মতামত যতটুকু পড়েছি, তাতে আতঙ্কিত হই নি, বরং আদর্শের ও কর্মের দুঃসাহসে তখনি চমৎকৃত ও আকৃষ্ট হয়েছি।

আকর্ষণ ও চমৎকৃতি অচিরেই পরিণত হয় সশ্রদ্ধ অনুরাগে। ১৯১৭-এর বিপ্লবের কর্মসূচি তো শুধু কথার কথা নয়। রুশ সাম্রাজ্যের অধীন জাতিরা প্রত্যেকেই স্বাধীন, এ কথা বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই বলশেভিকরা ঘোষণা করেছিলেন। ১৯১৮-এর গোড়াতেই জানা গেল এ শুধু ঘোষণা নয়। এমন কি এ পোল্যাণ্ড, ফিন্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি শ্বেতাঙ্গ জাতিদের স্বাধীনতা ঘোষণা মাত্রই নয়। বিপ্লবী বলশেভিক সরকার জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া (ট্রান্‌স্-ককেশিয়া), তুর্কিস্তান ও মধ্য এশিয়ার বোখরা সমরখন্দ-এর তুর্ক, তাজিক্, কাজাক প্রভৃতি জাতিদের স্বাধীনতা দিয়েছে, ইরান চীন প্রভৃতিকে ফিরিয়ে দিয়েছে তাদের যা ন্যায্য প্রাপ্য—জার যা কবলিত করেছিল ব্রিটিশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

অদ্ভুত অবিশ্বাস্য এই সংবাদ—বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইল না। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনাও ঘটে—শাসক জাতির রাজশক্তি কার্যত কখনো ফিরিয়ে দেয় পরাধীন জাতিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। তখনো মহাযুদ্ধ শেষ হয় নি—উইল্‌সনের ও-মর্মের ঘোষণা সত্য বা মিথ্যা বলে জানবারও দিন আসে নি। কিন্তু একটি মুহূর্তে বলশেভিজম হয়ে উঠল পরাধীনের চোখে স্বপ্নাতীত বিস্ময়। মনে হল, বলশেভিক বিপ্লবের অন্য প্রতিশ্রুতিগুলিও তাহলে

শুধু কাগজে প্রচার নয়, তাও বলশেভিকদের আচরণীয় ধর্ম : ১. রুশিয়ার কৃষক এবার হচ্ছে রুশিয়ার জমির মালিক ; ২. কলকারখানা হচ্ছে এখন থেকে সাধারণের সম্পত্তি ; ৩. বিনা লাভ-ক্ষতিতে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করাও বলশেভিকদের নীতি। অর্থাৎ, ৪. বলশেভিজম অর্থ মানুষে-মানুষে সাম্য, জাতিতে জাতিতে সাম্য, দেশে-দেশে মৈত্রী। এ যে বঙ্কিম, বিবেকানন্দ কেন, বুদ্ধদেব যীশু খ্রীষ্টেরও স্বপ্নের সত্য। এমন নীতিতে আমরা ভারতবাসীরা আকৃষ্ট হব না তো হবে কে ?

সাধারণভাবে বলশেভিজম আমাদের চোখে হয়ে উঠল এক দুঃসাহসী আদর্শবাদ,—অবশ্য সংশয়ও থাকত—এ কি সত্য ? এ কি সম্ভব ?

লেনিনের বিরুদ্ধে বিপ্লবের বিরুদ্ধে যত কথা এদেশে প্রচারিত হত তার এক বর্ণও আমরা তাই সত্য বলে মনে করতাম না। ব্রিটিশ সরকার ও তার সংবাদদাতারা যাই বলুক, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে সাধারণ মানুষও কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। তারপর যাঁরা অত বড় আদর্শ নিয়ে এত বড় ব্রত উদ্‌যাপনে অগ্রসর, তাঁরা মূর্খ। এ কথাও কোনো বুদ্ধিমান লোক ভাবতেন না। পরে দেখেছি, রবীন্দ্রনাথও 'মডার্ন রিভিয়্যু'তে বিপ্লবের ৮।৯ মাসের মধ্যেই (১৯১৮-এর জুলাই সংখ্যায়) শিক্ষিত সাধারণকে লক্ষ্য করে এই সব অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করতে দ্বিধা করেন নি। তা শুধু কবির কথা নয়, ভারতের বুদ্ধিজীবীদেরও মনের কথা। আর আমরা যারা যৌবনের দুরন্ত আশা নিয়ে বলশেভিক বিপ্লবের অদ্ভুত আদর্শ ও দুর্বার প্রয়াসের কথা শুনেছিলাম তাঁরাও কবির মতোই তখন মনে করতাম—বলশেভিকদের এই উজ্জ্বল আদর্শ এখন-এখনি যদি সফল নাও হয়, তবু মানুষের ইতিহাসে সে বিপ্লব প্রভাত তারার মতোই নতুন দিনের আভাস নিয়ে দেখা দিয়েছে (মডার্ন রিভিয়্যু-এ)। প্রভাতের প্রত্যাশা জানাল : স্বাগত। স্বাগত!

পরে বিপ্লবের বিরুদ্ধে লুণ্ঠনপন্থী বৈদেশিক শক্তিরা অভিযান চালিয়ে রুশ দেশ ছারখার করতে থাকে। সে সব দেশের সংবাদদাতাদের প্রেরিত সংবাদের বিরুদ্ধে আমাদের অবিশ্বাস বরং তাতে মাত্রাতিরিক্ত রকমেই বৃদ্ধি পায়। তাই সত্য সত্যই লেনিনের যখন মৃত্যু হল (১৯২৪), আমি ও আমার বন্ধুরা তখনো বহুদিন পর্যন্ত সে সংবাদে বিশ্বাস করি নি। টাইম্‌স-এর 'রীগা করেসপণ্ডেন্ট' তখন থেকে একটা প্রবাদ হয়ে ওঠে—শাসক-পক্ষীয়

সংবাদপত্রদের কথা আগাগোড়া অবিশ্বাস্য বলেই ধরে নিই। তাই স্তালিনের অন্যায় আচরণের সংবাদও আমাদের কাছে এ কারণে অবিশ্বাস্য থেকে যায়, তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত।

একটা মজার গল্প এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি—সে বোধহয় ১৯২৪-এ লর্ড লিটনের অর্ডিন্যান্স বলে সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতাদের গ্রেফতারের পরে। কাউন্সিলে সেদিন অর্ডিন্যান্স আলোচ্য ছিল—ব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রমুখ বিরোধী নেতারা অর্ডিন্যান্স-প্রস্তাবের বিরোধিতা করছেন, সরকার পক্ষ তা সমর্থন করছেন। সরকারের সমর্থনে দেশীয় দু-একজন তাঁবেদার-গোছের সদস্যও বক্তৃতা করছেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন—নাম যতদূর মনে পড়ে—মিঃ চুকন আলী বা ঐরূপ কিছু, পূর্বে নাকি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সম্ভবত তা সত্য, তাঁর বক্তৃতাই তার প্রমাণ। তাঁর বক্তব্য, অর্ডিন্যান্স করা ঠিক হয়েছে, গ্রেফতার প্রভৃতিও ঠিক কাজ। কারণ, এসব রাজদ্রোহীরা হচ্ছে বলশেভিস্ট। আর বলশেভিস্টরা ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির বিরোধী, এমন কি, 'দেয়ার শ্যাল বি নো প্রাইভেট ওয়াইফ, বাট ওনলি পাবলিক ওয়াইফ' স্ত্রীও কারও একজনের স্ত্রী থাকবে না, সর্বসাধারণের স্ত্রী হবে। কথাটায় অবশ্য হাসির রোল পড়েছিল সভাগৃহে। তবে এসবই ছিল বিদেশীয় সাংবাদিকদের সোভিয়েত বিপ্লব সম্বন্ধে প্রচারিত সংবাদের নমুনা। এসব গিলতে বাধা হত না ওরকম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের; কিন্তু জনসাধারণ তাতে আরও বুঝেছে—সোভিয়েত-বিরোধী ব্রিটিশ সংবাদ কত মিথ্যা।

বলশেভিকরা কারা?

স্বভাবতই সেই ১৯১৭-১৮ সালে ১৫-১৬ বছরের কিশোরের পক্ষে সব সংবাদ সংগ্রহ করা অসম্ভব, যা সংগ্রহ হয় তারও বিচার অসাধ্য। ইংরেজি-বাঙলা দৈনিক যতই পড়ি, 'মডার্ণ রিভিয়ু' তখনো বেশি পাই নি, তত নিয়মিত পড়িও নি। না হলে হয়তো বিপ্লবের সম্বন্ধে আরও একটু সংবাদ সংগ্রহ করতে পারতাম, আরও একটু ধারণা স্পষ্ট হতে পারত। 'টেন ডেজ দ্যাট শূক দ্য ওয়র্লড'-এর লেখক জন রীড্-এর লেখা থেকে সারাংশ 'মডার্ন রিভিয়ু'তে ১৯১৮-তেই উদ্ধৃত হচ্ছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কমিউনিজম্-এর দার্শনিক দৃষ্টি মানতেন না, কিন্তু সেই প্রথম দিন থেকে রুশিয়ায় কমিউনিস্টদের উন্নয়ন-প্রচেষ্টার তথ্য বরাবর তিনি উল্লেখ করতেন, অকৃত্রিম স্পষ্ট ভাষায় তার প্রশংসা

করতেন। ১৯১৯-এর শেষ ভাগ বা ১৯২০ থেকে আমি মডার্ন রিভিয়্যুর পাঠক হয়ে উঠি—অবশ্য তখন যুদ্ধান্তে বিদেশীয় প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রগুলিও দুষ্প্রাপ্য হত না। অন্তত সাহেবি কলেজের জিজ্ঞাসু ছাত্রদের পক্ষে। তবু যথার্থ তথ্য সংগ্রহ তখনো কঠিন ছিল। নানা ঘোরানো পথে ঘুরে ঘুরে যা আসত সে সব টুকরো খবর মিলিয়ে তাকে তার ধারণা তৈরি করে নিতে হত।

'বলশেভিক', 'বলশেভিজম' ও 'সোভিয়েত' তখন অজস্রবার পড়া শব্দ। কিন্তু কোথা থেকে তার উৎপত্তি, ঠিক তার কী অর্থ, তা তবু জানতে পারি নি, কোথাও পড়তে পাই নি। 'সোভিয়েত' শব্দটার অর্থ অনুমান করে নিই সভা বা সমিতি। কিন্তু 'বলশেভিজম' শব্দটার যথার্থ অর্থ কী? আমাদের ছোট শহরের একজন বহু-বিষয়-জানা মানুষ তখন আমার দাদা (রঙ্গীন হালদার)—অন্যত্রও এমন মানুষ বেশি ছিল না, অন্তত আমার চেনা ছিলেন না। নতুন কিছু জানতে হলে তখন তাঁরই শরণ নিতাম। কিন্তু এ শব্দ দুটি সম্বন্ধে তিনিও ওয়াকিবহাল নন, জানালেন। দু'জনায় তখন ধরেছিলাম তৃতীয় একজন কৃতী সুহৃদকে—তিনি ইতিহাসের ছাত্র (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)। তাঁদের দুজনার আলোচনায় আমি উপস্থিত ছিলাম। সাময়িকপত্র থেকে যা জানা যায়,—ও শব্দের যতটুকু অর্থ, তার বেশি তাঁরাও কিছু জানেন না—সত্যই কী সে মতবাদের বক্তব্য, কেনই বা বলশেভিকদের ওই নাম। 'বলশেভিজম' এই রুশ শব্দটির অর্থ তখনো আমরা কেউ জানি না—শুধু জেনেছি তাঁরা রুশ দেশের উগ্র সাম্যবাদী। এই যখন অবস্থা তখন ব্যক্তিগতভাবে আমি রুদ্ধশ্বাসে পড়তে লেগে যাই রুশ সাহিত্য—তলস্তোয়, দস্তয়ভস্কি, তুর্গেনেভ, গোর্কি, চেখভ্—বিশেষ করে গোর্কি ও তুর্গেনেভ্। রুশ জীবনের যে চিত্র আমি রুশ সাহিত্য থেকে পেতে থাকি তাতে বলশেভিকদেব নামও নেই, কিন্তু তাতে রুশ সমাজের ও রুশ বিপ্লবের প্রেক্ষাপটের আমি সন্ধান পেয়েছিলাম এখনো তা বলতে পাবি।

একাদেমিক হিসাবে আমার ব্যক্তিগত কৌতূহল প্রথম সিদ্ধ হয় ১৯১৯-এর জুলাই-আগস্টে। বি-এ ক্লাশে নতুন ছাত্র তখন আমার দাদা (প্রফুল্ল হালদার) ইকোনমিক্‌সে অনার্স পড়েন। তাঁর সদ্য কিনে আনা 'পলিটিক্যাল চিন্তার ইতিহাস' থেকে পড়ে ফেলি সোশ্যালিজম্ মতবাদ শীর্ষক অধ্যায়টি। লেখক

আমেরিকান অধ্যাপক গার্নার, সোশ্যালিজম্-এর প্রতি সহানুভূতিহীন। কিন্তু একাডেমিক পদ্ধতিতে তাঁর সে আলোচনা ছিল সহজপাঠ্য ও ছাত্রবোধ্য, এবং মোটামুটি তথ্যযুক্ত সে লেখাই মার্কস-এঙ্গেলস্-এর নাম ও মতের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটায়, বলশেভিক মতবাদের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাকে একটা ধারাবাহিক ধারণা দেয়। তারপরে 'বলশেভিস্ট', 'মেনশেভিস্ট' প্রভৃতি শব্দগুলিরও ইতিহাস ও সদর্থ সংগ্রহে বেশি দেরি হয় নি।

মার্কসবাদের সেই প্রাথমিক ধারণা ও সরল আগ্রহ নিয়ে আমি প্রথম যে খাঁটি মার্কসবাদী বই পড়ি তা 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো।' ১৯২১ (না ১৯২২?)-এ কোনো একটা সময়ে তা আমার হাতে এসে পড়ে—যুদ্ধশেষে, বিশেষ করে নন-কো-অপারেশনের রাজনৈতিক উৎসাহের আবহাওয়া, নানা মতের সোশ্যালিজম্, এনার্কিজম্-এর বই দেশে আসছিল। 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'ই আমার পঠিত মার্কসবাদের প্রথম বই। সহজবোধ্য বই তা নয়। কিন্তু একেবারেই যে তা বুঝি নি, এমন কথা বিনয় করেও বলতে পারব না। নিজের মতো করে তার একটা অর্থ আমি গ্রহণ করতে পেরেছিলাম—বিস্তার-বনিয়াদ কাঁচা ছিল; কিন্তু রাজনৈতিক জিজ্ঞাসায় তা সংকীর্ণ থাকে নি।

স্বাধীনতা আন্দোলনের মুক্তধারা

মাঝখানকার (১৯১৯-২২) সেই পথচিহ্নগুলি তাই উপেক্ষণীয় নয়। দৈনিক কাগজে রুশ গৃহযুদ্ধ, বলশেভিকদের রক্তবিভীষিকা, কোল্‌চাক-ডেনিকিন প্রভৃতির 'শ্বেত' দৌরাত্ম্য, ব্রিটিশ মার্কিন প্রভৃতি বৈদেশিক শক্তিদের বলশেভিক বিরোধী অভিযান, রোমানভ-বংশীয়দের সমূলে বিলোপ, এসব পড়েছি। পড়েছি এশিয়ার তুর্কিস্তানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতীয় সৈনিকদের সাহায্যে সাম্রাজ্য প্রসারের ব্যর্থ চেষ্টার কথাও। ক্রমেই সে-সব ভারতীয় সৈনিক ফিরে আসে পাঞ্জাবে ও উত্তর ভারতে স্বগৃহে, আর তাদের মুখ থেকে ওসব নতুন স্বাধীন অঞ্চলের খবর উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে—বাঙলা দেশেও তার এক আধটুকু ছায়া এসে না পৌঁছত তা নয়। এসব নানা দিক থেকেই সংবাদটা রটে গিয়েছিল—লেনিনের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ এক নূতন ধারায় রুশিয়ার জনগণ উদ্বুদ্ধ হয়েছে, আত্মশক্তিতে হচ্ছে সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ। তাই ট্রটস্কি-পরিচালিত 'লাল ফৌজ' সমরে দুর্জয়। এগুলি সামান্য কথা নয়—ভারতীয়দের পক্ষেও।

অন্য দিকে যুদ্ধ শেষ হতেই পাঞ্জাব জ্বলে উঠল (১৯১৯); ব্রিটিশ অত্যাচার ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিল প্রতিবাদের ঝড়। 'বলশেভিজম'-এর জুজু সরকার সৃষ্টি করতে গিয়ে বরং দেশের মানুষের মনে বলশেভিজম সম্বন্ধে আগ্রহই বৃদ্ধি করে দিল। দ্বৈতশাসনের বা ডায়ার্কির গণ্ডূষ জলে গবমপন্থীদের ঠোঁটও ভিজল না। ১৯১৮তেই মণ্টফোর্ড রিপোর্ট বলছিল—রুশ বিপ্লব ভারতের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রবল করে তুলেছে —কি করে, তা রিপোর্টে না বললেও আমরা তার উল্লেখ করেছি, বলশেভিকরাই দিয়েছে পরাধীন সকল জাতিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। ১৯১৭-তেই ডিসেম্বরে কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে মিসেস বেসাণ্ট্ সভানেত্রীর অভিভাষণে রুশ বিপ্লবে রুশ জনগণের ক্ষমতালাভকে এক নতুন সম্ভাবনার সূচনা বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। ১৯২০-এর আগস্ট (/ সেপ্টেম্বরে) মাসের কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে নন-কো-অপারেশনের প্রস্তাব গৃহীত হয়—গান্ধীজীর নেতৃত্বের যুগ এল, কংগ্রেস গ্রহণ করলে সক্রিয় সংগ্রামের (ডিরেক্ট্ অ্যাক্শনের) কর্মপদ্ধতি। লালা লাজপৎ রায় ছিলেন সে অধিবেশনের সভাপতি—তিনি নির্বাসন থেকে ফিরেছেন; অবরোধ থেকে ফিরেছেন দেশের নির্যাতিত বিপ্লবী কর্মীরাও। যতদূর মনে পড়ে, লাজপৎ রায়ের অভিভাষণে একটা নতুন স্বর ছিল—সোশ্যালিজম-এর স্বর। শ্রমিক অসন্তোষও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তখন মাথা চাড়া দিচ্ছে। ১৯২০-এই প্রথম ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস স্থাপিত হয়—লাজপৎ রায় ছিলেন তারও সভাপতি। সেখানকার অভিভাষণে তিনি স্পষ্ট করেই জানালেন যা বুঝলেও আমরা সাহস করে বুঝতে পারি নি—শ্রমিক আন্দোলনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তাৎপর্য। রুশ শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগামী ভূমিকার কথাও তাতে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছিল। অনেক কথাই আর মনে নেই, কিন্তু মনে আছে এ অভিভাষণ আমাকে উচ্চকিত করেছিল। চিত্তরঞ্জন দাশ সেই সুরেই ঘোষণা করেন, 'স্বরাজ ফর ৯৫ পার্সেণ্ট।' রাজনীতির এই নতুন সুর আমাদের আশান্বিত করে—জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলন যুক্ত ধারায় প্রবাহিত হতে যাচ্ছে। জন্ম নিচ্ছে স্বাধীনতার মুক্তধারা। ১৯২১-এর গ্রীষ্মকালে আসামের চা-বাগানের কুলীদের ধর্মঘট ও হাজারে-হাজারে চা-বাগান ত্যাগ, তারই সঙ্গে সমস্ত আসাম ও পূর্ব বাঙলা জুড়ে রেলওয়ে ও

স্টীমারের শ্রমিক কর্মচারীদেব দীর্ঘ দেডমাস ব্যাপী ধর্মঘট, আর এদিকে দেশ জুড়ে সাধারণ হরতাল, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের সেই 'জাতীয় ধর্মঘট' পরিচালনা—এসব আমাদের চোখের উপরই ঘটল—(এ আন্দোলনের গুরুত্ব এখনকাব কমিউনিস্টরা কি জানেন ?) জাতীয় আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনে ভেদরেখা অলঙ্ঘনীয় হয় নি তখন।

নামহীন ভারতের উদ্দেশে

১৯২১-এব জানুয়ারি থেকে বাঙলা দেশে অসহযোগের ঝড বইল চিত্তরঞ্জন দাশের প্রাণোত্তাল নেতৃত্বে—কংগ্রেস সংগঠনও শহরে নয় গ্রামে-গ্রামে গড়ে উঠতে লাগল। আমার ক্ষুদ্র জেলাতেই (নোয়াখালি) ১৯২১-২২-এ প্রায় ২৫০ কংগ্রেস কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়—দেড শতটি সক্রিয়ও ছিল। ১৯২১ থেকে আমরা কংগ্রেস আন্দোলনেও অনুপ্রাণিত বোধ করেছি। শান্তি-পূর্ণ অসহযোগে বিশ্বাস থাক বা না থাক, মুক্ত রাজবন্দীরা স্থির করেছিলেন গান্ধীজীব কথামতো এক বৎসর তাঁরা সেই স্বরাজ আন্দোলনেই সহযোগিতা করবেন। এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গতই ছিল। গান্ধীজীর মতবাদ নিশ্চয়ই সংস্কারধর্মী, তাঁর কর্মপন্থাও দুর্বোধ্য , কিন্তু বিপ্লবের পথও ঘূর্ণিপাকের পথ—সংস্কারমূলক কাজও অবস্থা বিশেষে সে পথকেই এগিয়ে দেয়।—জনতার আলোড়নেই তার পথ করে দিতে পারে। দেশের বিরাট আন্দোলন থেকে দূরে থাকা নিশ্চয়ই রাজনৈতিক মূঢতা। অসম্পূর্ণতার সমালোচনা করা চলে, কিন্তু উদাসীন থাকা বা বাধা দেওয়া চলে না। যে বিপ্লবীরা অসহযোগ আন্দোলন থেকে দূরে থেকে 'হক কথায়' তার বিরুদ্ধাচরণ করছিলেন, পরে গুপ্তচক্রে ছাডা অন্য কোনো জাতীয় প্রয়াসেই তাঁরা স্থান গ্রহণ করতে পারেন নি—জনজীবন থেকে তাঁবা বিচ্ছিন্ন থেকে যান। অসহযোগ ও কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দিয়েও বিপ্লবীরা অনেকে কিন্তু গুপ্তচক্রের মোহ ছাডতে পারেন নি, তবে জন-আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কও তাঁরা আর কাটতে চান নি। আমাব আশা ছিল—জাতীয় আন্দোলনই হবে তাঁদের মুখ্য প্রয়াস ; আর বিপ্লবীরাই গণ-আন্দোলনের দিকে কংগ্রেসের মুখ ফিরিয়ে দেবেন, গণ-আন্দোলন পরিণত হবে গণ-সংগ্রামে। এ বোধ থেকেই আমি কংগ্রেস আন্দোলনেরও পক্ষপাতী হয়ে উঠি—আর সীমাবদ্ধ গুপ্ত চক্রান্ত নয়, আর নরম-গরম পলিটিকসের অবসর-মাফিক প্রস্তাব-পাশ করা পলিটিক্স নয়,—

চাই গণ-আন্দোলন, চাই 'নামহীন ভারতবাসী'র, মূঢ়-ম্লান মূক ভারতবাসীর মুক্তি-আয়োজন—যে মুক্তিপথের আভাস পেয়েছিলাম স্বদেশী-ভাবনার তাড়নায় রবীন্দ্রনাথের লেখায়, সোভিয়েত বিপ্লবে যার মূলধারণাকে আমার মনে দৃঢ় ও পরিচ্ছন্ন করে তোলে;—তারই দিকে জাতীয় আন্দোলনের মুখ ফিরছে অসহযোগের বিরাট আলোড়নে, কংগ্রেসের সংগঠনগত প্রসারে, আর স্বরাজ-কর্মীদের সম্মেলিত সহযোগিতায়। ধারণাটা ছিল অর্ধসত্য, কিন্তু তা পুরো সত্য হয়ে উঠতে পারে দেশের পরিস্থিতিতে এমন সম্ভাবনাও ছিল। তাই ১৯২০-এর অসহযোগে শিক্ষা-বয়কটের প্রস্তাবে আমিও বিরূপ ছিলাম, কিন্তু ১৯২১-এ তার সমর্থনও করেছি—কারণ, চাই জন-সংগঠন ও জন-আন্দোলন।

একটা প্রমাণ তার বেনামীতে হলেও রয়ে গিয়েছে। সেদিনে 'সবুজপত্রে' ছিল বুদ্ধিবাদীদের শাণিত অস্ত্র, প্রমথ চৌধুরী তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের গুরু, বিদ্রূপের বক্র হাসিতে অসহযোগকে করতেন জর্জরিত। আমরা তা সানন্দে উপভোগ করতাম। তবু ১৯২১-এর গোড়ায় সে পত্রে এক বন্ধুর নামে আমি ও-পদ্ধতির বিরুদ্ধে একটা ছোটখাটো প্রতিবাদ পত্রও পাঠিয়ে দিলাম (সবুজ পত্র, ১৯২১-এর ফেব্রুয়ারি, সংখ্যাটা বোধহয় বিলম্বে প্রকাশিত হয়)। তার শেষ কথা ছিল এ-মর্মের: দূরত্বের পরিমাপে রাশিয়া ভারতবর্ষ থেকে অনেক দূরে হলেও মনের দিক থেকে অনেকটা নিকট। তুর্গেনেভ্-এর 'ভার্জিন সয়েল'-এর নায়ক গ্রন্থশেষে এগিয়ে যান 'অ্যানোনিমাস রাশিয়া'-র দিকে। আমাদেরও আজ এগিয়ে যেতে হবে 'অ্যানোনিমাস ইণ্ডিয়া'-র দিকে।

আরেকটি লেখার কথাও বলতে পারি, তবে সে বোধহয় ১৯২৪-২৫-এর হবে। শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-সম্পাদিত ইংরেজি 'ওয়েলফেয়ার' মাসিকপত্র প্রধানত চাইত যুবকল্যাণ, বিশেষ করে, বোধহয় স্বাস্থ্য ও শক্তি-চর্চার দিকে যুবকদের আগ্রহান্বিত করাই ছিল সম্পাদকের অভিপ্রেত। তবে মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণও ছিল কাম্য। পরে আমি তার সম্পাদক বিভাগে কাজও করেছি—ব্যক্তিগতভাবে অশোক চট্টোপাধ্যায়কে দেখেছি মুসোলিনিরই গুণগ্রাহী, সমাজতন্ত্রের বিরোধী। স্বর্গীয় বন্ধুবর সজনীকান্ত দাস আমাকে ১৯২৪-২৫-এর দিকে ও-পত্রে প্রবন্ধাদি লিখতে বলেছিলেন—তার বিশ্বাস ছিল আমি ইংরেজিতে লিখতে পারি; আর ইংরেজি লেখায় দক্ষিণাও মিলে। তার কথামতো সেই ১৯২৪-২৫-এ আমি ওয়েলফেয়ারে প্রবন্ধ লিখি।

প্রথম প্রবন্ধই ছিল 'হোপস অফ দি ইণ্ডিয়ান সোশ্যালিস্টস', তাতে অবশ্য মার্কস-এঙ্গেলসের নীতি ও পদ্ধতিতে পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করেছি—কতটুকুই বা তা জানতাম? কিন্তু আমাদের দেশে মোটামুটি সমাজতন্ত্র যে গ্রাহ্য হওয়া উচিত, এবং তাতে বাধাও নেই, এইটিই ছিল সাধ্যমতো যুক্তিতর্ক দিয়ে সে প্রবন্ধে আমার প্রতিপাদ্য। আশ্চর্য, সম্পাদক কিন্তু তা সম্পূর্ণ ই ছেপেছিলেন। অবশ্য, ১৯২১-২২-এর সময় থেকেই আমার কাছে ও-ভাবনা ক্রমেই দৃঢ় হয়ে উঠছিল,—বন্ধুরা তা জানতেন।

বুঝতে কষ্ট হয় না—বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রাণিত ভাব-ধারা থেকে কোন ঘাটে এসে (সেই ১৯২১-এর প্রারম্ভে) আমার সাহিত্য-লিপ্ত স্বদেশী ভাবনা পেয়েছে তার জিজ্ঞাসার উত্তর: নামহীন ভারতই মুক্তিপথের আশ্রয়।

মুক্তিপথের যুক্ত ধারা

১৯২১-২২-এর পরে অবশ্য অনেক তথ্য জানতে পারি, তত্ত্বেরও সন্ধান পাই। বিদেশ থেকে ভ্যানগার্ড ও বাঙলা বিজলী, আত্মশক্তি, ধূমকেতু প্রভৃতির প্রকাশ লক্ষ্য করি; 'দেশের বাণী'তে আমারও কলম চলে; সংগঠিত কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন রূপ নিতে দেখি। আমাদের শহরের অগ্রজ সুহৃদ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ কোন্ চিন্তা ও কর্মের বাহন হয়ে উঠছেন, তাও জানতাম। কমিউনিস্ট কর্মীদের গোপন প্রয়াস গোপনে কমিউনিস্ট সংগঠনে আকার লাভ করতে চেষ্টা করছিল। পেশোয়ার, কানপুর পেরিয়ে সর্বশেষে মীরাটে গিয়ে পৌঁছল (১৯২৯) রুশ-বিপ্লবের প্রেরণা। ভারতবাসী হিশাবে সোৎসুক দৃষ্টিতে দেখলাম মহা সোভিয়েতে সকল জাতিকে সাম্য ও স্বাধীনতার বন্ধনে সমকক্ষ রূপে মিলিত হয়ে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য গঠনের দৃষ্টান্ত। আর পঞ্চবার্ষিক সংকল্পের প্রথম ঘোষণাপত্র গ্রিঙ্কোর লেখা থেকে, পরে নিকারবোকার প্রভৃতির ব্যাখ্যা থেকে সাগ্রহে অনুধাবন করতে করতে চমৎকৃত ও উদ্বুদ্ধ বোধ করলাম। মানুষ সত্যই ভবিষ্যৎ গড়তে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে বহু দিকের তরঙ্গাঘাতের মধ্য দিয়ে কখনো হয়েছি জনসমুদ্রের তীরে কর্মচঞ্চল, কখনো রাজনৈতিক অসারতায় সকল কর্মে আস্থাহীন, কখনো সাম্প্রদায়িক সংঘাতে বিচলিত, কখনো হয়েছি সাহিত্যে-শিল্পে উৎসাহী, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির রসাস্বাদনে শ্রদ্ধান্বিত, আবার পৃথিবীর

জ্ঞান-বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় মানুষের ভবিষ্যতে আস্থাবান। সেই ১৯২২ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত আমার দিন-মাস-বৎসরগুলি আমাকে আমার অজস্র অসঙ্গতি ও আত্মদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ঠেলে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে,—দেশের উদ্বেল জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে মিলিয়ে, বিরাট পৃথিবীর বিপুল প্রাণাবর্তের মধ্যে ডুবিয়ে ভাসিয়ে—আমি কিছু করি বা না করি আমাকে শতরূপে শতবার হাসিয়ে কাঁদিয়ে—সবসুদ্ধ এই সত্যই আমার মধ্যে দৃঢ় অনুভূতিতে সুস্থির করে তুলেছিল—আমার কালে, আমার দেশে, জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের পথটাই মুক্তিপথ; সে সংগ্রামে ভারতের সকল শ্রেণীর ঐক্য অপরিহার্য নীতি, কংগ্রেসি জাতীয়তার সাধক, স্বদেশী বিপ্লবী কিংবা কমিউনিস্ট বিপ্লবী কর্মী, কারও বিচ্ছিন্ন থাকার উপায় নেই। এই স্বদেশী কর্মকৌশল অন্তরে অন্তরে ছিল সংশয়হীন এই চেতনায় সঞ্জীবিত—মানুষের ইতিহাসে শোষিত শ্রেণীর ও শোষিত জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে সেই ১৯১৭-এর ৭ই নভেম্বর,—ভবিষ্যৎ আমরাও দেখছি—তা শুরু হয়ে গিয়েছে॥

সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ প্রসঙ্গে

চিন্মোহন সেহানবীশ

'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদে'র শেষ অবধি কী হাল দাঁড়াল, এ-নিয়ে মাথা ঘামানো নাকি ঘোর অন্ধের ঘুরঘুটি অন্ধকার ঘরে অনুপস্থিত কালো বেড়াল তল্লাসের সামিল—অনেকে এই রব তুলেছেন। আবার জবাবে পাল্টা প্রশ্নও শোনা যাচ্ছে—'ভালোবাসি' কথাটির বহু (কবির মতে 'টু অফন') অপব্যবহার হয়েছে বলে কি হৃদয়বান ও বুদ্ধিমান কোন ব্যক্তি ঐ সনাতন কথাটিকে বাতিল করে দেন ? সূত্রের অপপ্রয়োগে চটে গিয়ে স্নানের জল ফেলতে কি খোকাকেও ভাসিয়ে দেওয়া সমীচীন ?

এই দুই মতই বাজারে বেশ চালু। তার কারণ, পরস্পরবিরোধী হলেও দুটিই বেশ মানসিক আরামদায়ক। এর যে-কোন একটি পোষণ করে আমরা দিব্যি নিশ্চিন্তমনে ভাবতে পারি—যাক, তা হলে আর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই এ-ব্যাপারে।

ঠিক এই নিশ্চিন্ততারই কিন্তু কোন কারণ নেই আসলে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সেই বহু-বিতর্কিত ২০-তম কংগ্রেস দশ বছর আগে মার্কসবাদী মানসসরোবরে যে তরঙ্গভঙ্গের উদ্রেক করেছিল, তীব্রতার বিচারে যদি বা তার কিছুটা উপশম ঘটে থাকে এতদিনে, সে-আবর্তের পরিধি কিন্তু নিত্য-প্রসার্যমান আজকেও। আর সাহিত্যের বিশিষ্ট ক্ষেত্রে তো প্রচণ্ড

* এ-প্রবন্ধ রচনাকালে 'নিউ হাঙ্গেরিয়ান কোয়ার্টার্লি' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা থেকে বহু সাহায্য পেয়েছি।—লেখক।

বিতণ্ডা শুরু হয়েছিল এর আগে থেকেই, ১৯৪৯-'৫০ সনে হাঙ্গেরিয়ান মার্কসবাদী লুকাচের নন্দনতাত্ত্বিক মতামতকে ঘিরে। ২০-তম সোভিয়েত পার্টি কংগ্রেস, হাঙ্গেরির অভ্যুত্থান প্রভৃতি ঘটনা যে তাতে আরো বেগ সঞ্চার করেছিল তা বলাই বাহুল্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, ইটালি, হাঙ্গেরি, পোল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, বৃটেন, আমেরিকার বহু মার্কসবাদী এই তর্কজালে জড়িয়ে পড়েন দেখতে দেখতে। তর্কযোদ্ধাদের মধ্যে কিছু নাম আমাদের পরিচিত, যেমন, আরাগঁ, গারোদি, শলোকভ, লুকাচ, আর্নস্ট ফিশার। এঁরা ছাড়াও আরো অনেকে যোগ দিয়েছেন বিতর্কে, একাধিক বই ও সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে এ-বিষয়ে। কোন একটি দেশের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি আলোচনা এবং তা ক্ষান্ত হওয়ার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না আপাতত।

তবু বিতর্ক চলার মাঝপথেই এতাবৎ যে মতবিনিময় ও সংঘাত ঘটেছে তার কিছুটা অন্তর্বর্তীকালীন পরিচয় গ্রহণের চেষ্টা করা যেতে পারে। তারও অবশ্য অসুবিধা রয়েছে দুদিক থেকে। প্রথমত, বিতর্কসংশ্লিষ্ট বহু গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা এ-দেশে পাওয়া খুবই দুরূহ, পেলেও ভাষার ব্যবধান অনেক ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে প্রায় দুরতিক্রমণীয়। দ্বিতীয়ত, দুই প্রতিপক্ষই এখানে একে মার্কসবাদী, তায় আবার সাহিত্যিক। তাই যুক্তিপরম্পরার সূত্রে তাঁরা এত অবলীলাক্রমে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছেন যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে দিশে পাওয়া খুবই কঠিন। যেমন, 'বাস্তবতা'র আলোচনাসূত্রে নামা হয়েছে বস্তুবাদী দর্শনের গভীরে, আবার উঠেছে 'বিষয়' ও 'আঙ্গিকে'র ডায়ালেকটিক সম্পর্কের কথা এবং শেষ পর্যন্ত এসে গেছে আধুনিক কালের অনিবার্য সেই 'অনন্বয়' ('এলিয়েনেশন') ও 'অবক্ষয়' ('ডেকাডেন্স') প্রসঙ্গ।

এইসব শাখা-প্রশাখার আলোচনাকে কিছুটা জোর করেই সরিয়ে রেখে যদি মূল প্রসঙ্গের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের' সূত্রটিকে বেমালুম উড়িয়ে দেবার ঝোঁক এখন কিছুটা যেন কমে এসেছে আগের চেয়ে। যাঁরা মনে করতেন যে ঐ সূত্রটি গ্রহণের অর্থ সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক ধরনের রক্ষণশীলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া, তাঁরা বিতর্কের ফলে আশ্বস্ত বোধ করছেন কিছুটা। এমনকি

আর্নস্ট ফিশাবেব মত (তাঁব 'পেলিকান' প্রকাশিত 'দি নেসেসিটি অফ আর্ট'— ১০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) যাঁবা 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদে'ব চাইতে 'সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য' বা 'শিল্প' কথাটা পছন্দ কবতেন, তাঁবাও এ-সূত্রেব প্রযোজনীযতাকে একেবাবে উপেক্ষা কবছেন না এখন। যদিও গ্রেট বৃটেনেব কমিউনিস্ট পার্টিব মতাদর্শ ও সংস্কৃতিবিষযক খসডা প্রস্তাবে দেখছি শিল্পপ্রসঙ্গে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদে'ব উল্লেখমাত্রও নেই। (মার্কসিজম টুডে, মে, ১৯৬৭)।

লুকাচের 'গ্রেট রিয়ালিজম' তত্ত্ব

আসলে ঐ সূত্রেব প্রতি এ-ধবনেব বিরূপতা বা সন্দেহেব পিছনে জ্দানভ আমলেব প্রকট অনাচাব ও বিকৃতিগুলি ছাডা আবো একটি কাবণ ছিল। সেটি হল লুকাচেব 'গ্রেট বিযালিজম'-তত্ত্ব সম্পর্কে বহু মার্কসবাদীব সংশয। 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ' সম্পর্কিত সাম্প্রতিক আলোচনায ঘুবে-ফিবে বাববার উঠেছে লুকাচ ও তাঁব এই মতামতেব কথা। তাই এ-সম্পর্কে কযেকটা কথা বলা দবকাব এইখানে।

লেনিনেব প্রতিফলন ('বিফ্লেকশন') তত্ত্ব ও ঐতিহ্যেব ধাবাবাহিকতা স্বীকাবেব (অবশ্যই নির্বিচাব নয। মনে বাখতে হবে লেনিনেব একটি প্রবন্ধেব নাম—'দি হেবিটেজ উই বিনাউন্স') প্রযোজনীযতা—এ দুই বনিযাদী প্রত্যয অবলম্বন কবে লুকাচ খাডা কবেছিলেন তাঁব বাস্তববাদ-সংক্রান্ত তত্ত্বেব মূল কাঠামো। সে-কাঠামো প্রতিষ্ঠাকালে লুকাচ কযেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা ব্যবহাব কবেছেন আর্টে বাস্তবতাব প্রতিফলন ব্যাপাবটিকে আবো বিশদ কবে তোলাব জন্যে। যেমন তাঁব 'প্রগাঢ় সমগ্রতা'ব ('ইনটেন্সিভ টোটালিটি') সংজ্ঞা দ্বাবা তিনি বলতে চেযেছেন যে প্রকৃত বাস্তববাদী আর্টেব ক্ষমতা থাকে কোন এক শিল্পকর্মে যে বিশেষ সামাজিক ঘটনাব টুকবোটি প্রকাশিত হয তাকে সমাজবাস্তবেব গোটা এক বিন্যাসেব ভিতবে বিধৃত কবাব। আব সেজন্যই শিল্পকর্মে সমগ্রতাব প্রগাঢ রূপ ফুটে ওঠে এবং আমবাও খণ্ডেব মধ্যেই আস্বাদ পাই সমগ্রেব। এই ভাবনাব সূত্রে লুকাচ ব্যবহাব কবেছেন আব একটি সংজ্ঞা—'বিশিষ্ট' ('দি স্পেসিফিক') যা নাকি তাঁব দৃষ্টিতে সামান্য ও বিশেষেব ডাযালেকটিক সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত। আব লুকাচেব চোখে বাস্তবতাব লক্ষণ 'মানবকেন্দ্রানুগতা' ('এনথ্রপসেন্ট্রিজম'), যাব মধ্যে

পবিস্ফুট তাব মানবিকতাসাধক চবিত্র।. সব মিলিয়ে তাঁর এই তত্ত্ব বাস্তব প্রতিফলনেব একটা সাধাবণ মাপকাঠি তুলে ধবতে সমর্থ হয।

লুকাচেব এই মৌল তত্ত্বেব গুরুত্ব প্রতিপক্ষেবাও স্বীকাব কবেন। তাঁদেব আপত্তি সেখানে নয। তাঁদেব সংশয লুকাচেব ঐতিহ্যবিচাবেব ব্যাপাবে। লুকাচ শুধু উনিশ শতকেব 'বৈচাবিক বাস্তবপন্থী' ('ক্রিটিকাল বিযালিজম') সাহিত্যেব মধ্যেই 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদে'ব গ্রহণযোগ্য উপাদান খুঁজে পান—এই হল তাঁদের অভিযোগ। সে-সাহিত্য যে সত্যিই সমগ্র মানবতাব এক গৌববোজ্জ্বল উত্তবাধিকাব—একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ' শুধু সেই উত্তবাধিকাবকেই স্বীকাব কববে, একথা বললে উনিশ ও এই বিশ শতকেব অন্যান্য—এমনকি আদৌ বাস্তবতাবাদী নয এমন সাহিত্যিক ঐতিহ্যেবও মূল্য বেমালুম অস্বীকাব কবা হয আব তাব ফলে প্রশ্রয পায এক ধবনেব একদেশদর্শী গোঁডামি।

এই অভিযোগ সত্ত্বেও একথা মানতেই হবে যে অন্তত তত্ত্বেব দিক থেকে লুকাচ তাঁব বাস্তববাদেব তত্ত্বকে উনিশ শতকেব বাস্তবতাপন্থী বচনাশৈলীব সঙ্গে জডিযে ফেলেন নি। ববং 'বাস্তববাদেব সমস্যা' পুস্তকে তিনি ১৯৩৪ সনে লেখেন 'অতীত যুগেব মহৎ লেখকেবা—শেক্সপীযব, সাব্‌ভেন্‌তিস্‌, বালজাক, তলস্তয তাঁদেব শিল্পে পূর্ণ, পর্যাপ্ত ও জীবন্তভাবে প্রতিফলিত কবেছেন তাঁদেব কাল পুবনো যুগেব মহৎ লেখকদেব কাছ থেকে এটাই আমাদেব শিক্ষণীয—বহিবঙ্গ বা আঙ্গিক নয। আজকে কেউই শেক্সপীযব বা বালজাকেব মত কবে লিখতে পাববেন না, লেখা উচিতও না। আসল কথা তাঁদেব মূল সৃষ্টিশীল কৌশলেব বহস্য আমাদেব উদ্‌ঘাটন কবতে হবে। আব সে-বহস্য সঠিকভাবে নিহিত রযেছে বিষযানুগত্যেব মধ্যে, তাঁদেব কালেব জীবন্ত ও উদ্দীপনামষ প্রতিফলনেব মধ্যে, তাব সব চাইতে মৌল বৈশিষ্ট্যগুলিব মধ্যেকাব সম্পর্কেব ভিতবে, আধাব ও আধেযেব সাযুজ্যে আব বহির্বাস্তবেব ব্যাপকতম পাবস্পবিক সম্পর্কাদিব প্রগাঢ প্রতিফলনস্বরূপ আঙ্গিকেব বিষযাশ্রযিতাব মধ্যে।'

লুকাচের গোঁডামি

তবুও গাবোদি, ফিশাব এবং ভিত্তোবিও স্ত্রাদা প্রমুখ ইটালিযান মার্কসবাদীবা লুকাচেব বাস্তবতাব ধারণা সম্পর্কে যে কিছুটা সংশয পোষণ

কবেন তাব কাবণ তাঁবা মনে কবেন—ঐতিহ্যবিচাবে আর আধুনিক কালেব বুর্জোয়া সাহিত্যিক বা শিল্পসংশ্লিষ্ট ঝোঁকগুলিব মূল্যনির্ধাবণে লুকাচ বড়ই কৃপণ। যেমন তিনি 'আভাঁ গার্দ' (avant garde) এবং সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য বা শিল্পেব ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকভাবে তাব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝোঁকগুলিব প্রতি স্পষ্টতই বিরূপ। এব জন্যই তিবিশেব কোঠাব গোড়াব দিকে তাঁব বিবোধ বাধে বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট ও তথাকথিত হ্বেইমাব শ্রমিক লেখকগোষ্ঠিব সঙ্গে। বিতর্কেব ফলে ইদানীং অবশ্য তিনি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী হিসাবে ব্রেশ্‌টকে স্বীকাব কবছেন কিন্তু তাও "শুধু লিবিক-লেখক ও দ্বিতীয পর্বেব নাট্যকাব ব্রেশ্‌টকে, 'জেচুযানেব ভালোমানুষ' থেকে তাঁব মৃত্যু পর্যন্ত।" ব্রেশ্‌ট ঐ নাটক লেখেন ১৯৪০ সনে। তাই লুকাচের এই হিসাবমত 'গ্যালিলিওব জীবন' বা 'মাদাব কাবেজ'-এব মত নাটক 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ'-সম্মত নয। আসলে ব্রেশ্‌ট সম্পর্কে লুকাচেব এই দৃষ্টিকার্পণ্যের কাবণ ব্রেশ্‌ট 'গ্রেট বিযালিজমেব' পথ অনুসবণ কবেন নি এবং ক্লাসিকাল থিযেটবেব কোন কোন ঐতিহ্যকেও ভাঙা হযেছে ব্রেশ্‌টেব নাটকে।

লুকাচেব এই গোঁড়ামিতেই আসলে অনেকেব আপত্তি। গাবোদি তাঁব একটি বচনায দেখিযেছেন আধুনিক ফ্রান্সেব মহৎ লেখক আবাগঁ কি-ভাবে 'সাঁব্‌বিযালিজম' থেকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায পৌঁছন। নেরুদাব সাহিত্যিক উত্তবণও সেই পথেই। ব্রেশ্‌ট তেমনি 'এক্সপ্রেশনিজম' থেকে আসেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাব শিবিবে। কাজেই নির্মোহদৃষ্টিতে ঐতিহ্যবিচাব কবলে দেখা যায শুধু 'গ্রেট বিযালিজম' নয, এমনকি আমাদের এই বিশ শতকেব বহু সাহিত্য ও শিল্পধাবা থেকেও সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বসদ সংগ্রহ কবেছে কার্যক্ষেত্রে। সে-বিচাবে 'গ্রেট বিযালিজমের' অবদান নিশ্চযই সর্বাগ্রগণ্য। তবু অন্যগুলিকেও যে উপেক্ষা কবা চলে না, তাব প্রমাণ মেলে আবাগঁব মত সার্থক কমিউনিস্ট শিল্পীব এই জবানবন্দীতে: ' যে-সব বই মোটেই এ-বকম ভান কবে না যে তাবা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদেব উপর দাঁড়িযে আছে, বেশিব ভাগ ক্ষেত্রে সেইসব বইযেই আমি এমন সব জিনিস খুঁজে পেযেছি যেগুলিকে অবিকল সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদেব আলোয় পরীক্ষা করে আমি অনেক কিছু শিখতে পেবেছি এবং নিজেকে বাড়াতে

পেবেছি। আমাব সব কিছু বিশ্বাসেব ফলে যেটিকে আমি সকল আর্টেব শেষ লক্ষ্য বলে মনে কবি, সেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদেব দিকে এই সব বই-ই আমাব বিচাবশক্তিকে চালিত কবেছে। যে পথেব সন্ধান কবছি তা খুঁজে পেতে যে লেখক অজ্ঞাতে আমাকে সাহায্য কবেছেন, মতামতেব দিক থেকে তাঁব সঙ্গে আমাব কোন মিল না থাকতেও পাবে, এমনকি তাব ধ্যানধাবণা হযতো আমাকে শত্রুব মত আঘাতও কবতে পাবে' ('নতুন চোখে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ'—লুই আবাগঁ, পবিচয, ফাল্গুন, ১৩৬৬)।

মনে হচ্ছে, বিতর্কেব ফলে লুকাচও সমস্যাটি নিযে নতুন কবে ভাবছেন। ইদানীং একটি বিবৃতিতে তিনি স্বীকাব কবেছেন যে ফ্রান্‌ৎস কাফ্‌কা সত্যই একজন 'বিপুল তাৎপর্যমণ্ডিত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী'।

গারোদির 'বাঁধভাঙা বাস্তববাদ'

আবাব মার্কসবাদী লেখকশিবিবে লুকাচেব ঠিক বিপবীত কোটিতে সম্ভবত গাবোদিব অবস্থিতি (আর্নস্ট ফিশাবেবও মতামতও প্রায তাঁবই কাছাকাছি)। ১৯৬৩ সনে গাবোদি 'দ্য বিযালিজম সাঁ বিভাজ' (অর্থাৎ 'বাঁধভাঙা বাস্তববাদ') নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সে-প্রবন্ধেব মূল্য এইখানে যে, গাবোদি তাতে প্রতিফলন তত্ত্বেব যান্ত্রিক অপপ্রযোগেব বিরুদ্ধে বেশ জোবালোভাবে খাড়া কবে ধবেছেন স্রষ্টাব সক্রিয ভূমিকা আব সৃষ্টি প্রক্রিযাব গুরুত্ব। কিন্তু প্রতিফলন ব্যাপাবটা যে একটা নিষ্ক্রিয, যন্ত্রবৎ ব্যাপাবমাত্র নয—একথা প্রমাণ কবেই গাবোদি ক্ষান্ত থাকেন নি। শিল্পীব নিজস্ব তৎপবতা ও বাস্তব অবস্থার ডাযালেকটিক সম্পর্ক থেকেই শিল্পকর্মেব উদ্ভব—একথা বলেও গাবোদি এ-দুইযেব মধ্যে শেষোক্তটি যে শেষ পর্যন্ত চূডান্ত, সে-কথাটি আব মনে বাখলেন না। শিল্পীব সৃষ্টিশক্তিকে এত একান্ত কবে তিনি দেখলেন যে আমাদেব চেতনানিবপেক্ষ বাস্তব সত্তা তাঁব কাছে গৌণ হযে দাঁডাল। এবই সূত্রে তিনি পৌঁছলেন এই সিদ্ধান্তে যে, 'এমন শিল্প নেই যা বাস্তববাদী নয, অর্থাৎ যাব মধ্যে শিল্পীনিবপেক্ষ বহির্বাস্তবেব উল্লেখ নেই।' ফলে যে যুক্তিকে তিনি খণ্ডন কবতে গিযেছিলেন তাকেই তিনি সমর্থন কবলেন ঘুবপথে। শুধু বাস্তববাদেব গোঁডা প্রবক্তারা বহু গুণ সত্ত্বেও অনেক শিল্পকর্মকে বাস্তববাদী নয, আব তাই শিল্প হিসাবেও ধর্তব্য নয বলে মনে কবতেন। আব গাবোদিব চোখে এ-সবই হল বাস্তববাদী

আব তাই শিল্পও। অর্থাৎ শিল্প ও বাস্তবতাকে উভয পক্ষই একাকাব কবে ফেললেন। গাবোদি বললেন: 'স্তাঁদাল ও বালজাক, কুর্বে ও বেপিন, তলস্তয ও মার্তিন দুগার্দ, গর্কি আব মাযাকোভস্কি—এঁদেব ভিতব থেকে আমবা 'গ্রেট বিযালিজমেব' লক্ষণ গ্রহণ ও বিশ্লেষণ কবতে পাবি। কিন্তু কাফ্‌কা, সাঁ-জন পার্স বা পিকাসোব শিল্প যদি সে লক্ষণেব সঙ্গে না মেলে তবে আমবা কী কবব? আমবা কি তাহলে বাস্তববাদ থেকে অর্থাৎ আর্টেব ক্ষেত্র থেকে তাঁদেব নির্বাসন দেব? না, ববঞ্চ আমবা বাস্তববাদেব সংজ্ঞাকে উন্মুক্ত ও প্রসাবিত কবব আব আমাদেব এই শতকেব বৈশিষ্ট্যসূচক শিল্পকর্ম-গুলিব আলোকে বাস্তবতাব নব দিগন্ত আবিষ্কাব কবব যাতে এই নব অবদানগুলিকেও আমবা যুক্ত কবতে পাবি অতীত ঐতিহ্যেব সঙ্গে?'

গাবোদিব এই বক্তব্যেব মধ্যে নিশ্চযই অন্যতব ভাবনামাত্রকেই বাদ দেওযাব, বিবোধমাত্রেবই সম্ভাবনা বেমালুম অস্বীকাব কবাব সংকীর্ণ কূপমণ্ডুক দৃষ্টিব প্রতিবাদ খুবই জোবালো। কিন্তু আসলে এব মধ্যেও একটি জিনিস প্রচ্ছন্ন বযেছে—সেটি হল নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যকে বাস্তববাদেব সঙ্গে এক কবে দেখাব গোঁড়ামি। তিনি ধবে নিযেছেন যে, সীমাবদ্ধ মাত্রাব মধ্যেও কোন শৈল্পিক গুণ সম্ভব নয যদি না তা বাস্তববাদী হয। ফলে বাস্তববাদেব সীমানা প্রসাবিত কবতে গিযে তিনি তাকে প্রায অর্থহীন কবে ফেলেছেন শেষ পর্যন্ত।

গাবোদি নিজেও তুষ্ট নন তাঁব তত্ত্বে। তিনি তাই বাববাব এ-প্রসঙ্গ, বিশেষ কবে এবই সূত্রে অবক্ষয প্রসঙ্গেব আলোচনায ফিবে ফিবে আসছেন আব প্রতিবাবই সমস্যাব নতুন নতুন জটিলতাব দিকে সকলেব দৃষ্টি আকৃষ্ট কবছেন।

সুতবাং 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদে'ব আলোচনাব মোটেই নিষ্পত্তি হয নি। আব বাস্তবেব নিত্য নব নব উন্মেষপ্রবণতাব দিক থেকে অমন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটবেও না কোনদিন।

বৃষ্টির ভিতরে

আনন্দ বাগচী

বৃষ্টি আব বৃষ্টি আব বৃষ্টি যেন বিশাল মশাবি
সমস্ত শহব গ্রাম দ্রুত ক্ষেপজালে ঘিবে ফেলে
আমাদেব টানছে আবো গাঢ অন্ধকাবেব মুঠোয
ধূসব মৃত্যুব সহবাসে, যেন স্বপ্নেব ঝিনুকে
তীব্র বেদনাব কণা . কাহিনীব গোপন মোডকে
যেমন নিঃসঙ্গ নাবী যেমন নিঃসঙ্গতম নব
নিবেট অশ্রুব মত ঘন মুক্তা, অঙ্গাবেব
জমাট জঠবে
আলোব ছুবিব মত হীবকেব ভ্রূণ ফুল ফোটে।

জলবঙে আঁকা গাছ, ঘববাডি, নদীব ওপবে সাঁকো
মন্দিবেব চুডো
ঘনীভূত এই ছবি কাব কবতলে হলো তাস, স্বপ্ন-
মাযা-মতিভ্রম—

এই তিন তাস। জুযা—
জীবন-যৌবনব্যাপী প্রাকৃত জুযায
সর্বস্ব হারিযে কেউ বৃষ্টিব ভিতবে বাডি যায॥

অঙ্কনশিক্ষা / ব্রিজ আঁকা

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

ব্রিজেব ছবি ?   অনেকেই হেসে উঠবে।   আছে নাকি ?
আঁকতে হলে বস্তুটাকে দেখা চাই তো ?
যাবা ডেইলি পেপাব পড়ে সবাই জানে—
মধ্য শতাব্দীতে একটা বোমা ফাটল
বেছে বেছে সব ক'টা ব্রিজ ভেঙে পড়ল।
আঁকতে হলে বস্তুটাকে দেখা চাই তো ?

আচ্ছা, অন্যরকম কবে ব্রিজ আঁকা যাক,
তুলি নিয়ে দামাল-সামাল চেষ্টা চলুক
বঙের প্যালেট অনেক শেখায়।
একটা হাতেব ঠিক উপবে আব একটা হাত ছুঁযে থাকুক—
দেখতে কিন্তু ব্রিজেব মতো।
দুটি চোখেব ঠিক উপবে আব দুটো চোখ ছুঁযে থাকুক—
ভাবতে কিন্তু ব্রিজেব মতো।
ব্রিজ ভাঙে না,
ডেইলি পেপাব সব জানে না।
অনেক খবর চাঁদেব আলোয উড়ে বেড়ায—
দু'খানা ইট বেঁচে গেলেই ব্রিজ হযে যায।
ব্রিজেব ছবি ?   অনেকেই হেসে উঠবে।
আপনি আঁকুন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্কট

শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১ ॥ সংস্কৃতি কী ॥

শিক্ষা ও সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গী জডিত। একটিকে বাদ দিয়ে অপবটিব কথা ভাবা যায না। উভযই আবাব কোনও বিশেষ সামাজিক কাঠামোব উপব নির্ভবশীল। অর্থাৎ সাধাবণভাবে 'মানব-সংস্কৃতি' কথাটি যতই মনোবম লাগুক না কেন, অন্তে এ জাতীয ভাব প্রাযশই অস্পষ্ট এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থহীন। অতএব এ প্রবন্ধে 'শিক্ষা' ও 'সংস্কৃতি কোনও' বিশেষ সামাজিক পবিপ্রেক্ষিতেব অপেক্ষা বাখে, এটি ধবে নেব। বর্তমানে ভাবতবর্ষ এমনই এক সাংস্কৃতিক বিপর্যযেব সম্মুখীন, ইতিহাসে যাব নজিব মেলা ভাব। যেহেতু শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঘনিষ্ঠ, স্বভাবতই পাবস্পবিক হীনতাও সন্নিবদ্ধ। অর্থাৎ শিক্ষাব গোলযোগ ও সাংস্কৃতিক সঙ্কট সংবদ্ধ। সাংস্কৃতিক সঙ্কটেব অপবাপব বহুল কাবণ থাকতে পাবে, এবং এ বিশেষ ক্ষেত্রে হযত-বা আছেও। কিন্তু শিক্ষা-সমস্যা ঐ কাবণগুলিব অন্যতম। এ কথা অবশ্যই বিচাব-সাপেক্ষ। এ প্রবন্ধে আমবা প্রথমে সাংস্কৃতিক সঙ্কটেব স্বরূপ নির্ধাবণ কবব। দ্বিতীযত দেখব শিক্ষাব সমস্যা কী, এবং উপসংহাবে এদেব কার্য-কাবণ সম্বন্ধ ও সংক্ষেপে সমাধানেব পথ আলোচনা কবব।

সর্বাগ্রে সংস্কৃতি বিষযে কিছু সাধাবণ আলোচনা কর্তব্য। 'সংস্কৃতি কী'? এটিব প্রকৃত অর্থ জানতে হলে জানা প্রযোজন, 'সংস্কৃতি কী নয'। এ শব্দটিব অর্থ-বিভিন্নতা কি সমাজদর্শনে, কি সাধাবণ ব্যবহাবে প্রাযশই দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি কবে। বহুক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষেব রুচিব উৎকর্ষকে সংস্কৃতি বলে বোঝান হয—"যেমন ক খুব সংস্কৃতিবান" অথবা "ওমুকেব সংস্কৃতি আছে"। এ অর্থ

স্বতই মনে আনতে পাবে যে 'সংস্কৃতি' এমনই বস্তু যা কাবও থাকে, কাবও বা থাকে না। কিন্তু সমাজদর্শনে এব যা অর্থ তাতে সংস্কৃতি কোনও ব্যক্তিবিশেষেব গুণ বা ধর্ম নয়, কোনও বিশেষ সামাজিক পবিমণ্ডল। এ অর্থে সংস্কৃতি কিছু পুরুষকাবেব বিষয নয, ওটি নিতান্তই ভাগ্য-নিযন্ত্রিত। যেখানে আমি আজন্ম-লালিত, সেই সামাজিক পবিবেশই (ব্যাপক অর্থে) আমাব সংস্কৃতি —আমি চাই বা না চাই। এ কথা কটি বলা প্রযোজন বোধ কবলাম এই জন্য যে অধুনা কতিপয তথাকথিত উদাব আন্তর্জাতিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি মনে কবেন জাতীযতা অন্যায অভিমান, বস্তুত সংস্কৃতি ইচ্ছাধীন অতএব ইচ্ছা থাকলে কেউ কেউ বিদেশী সংস্কৃতি গ্রহণ কবতে পাবেন, এবং এ গ্রহণে অন্যায তো নেই-ই, পবন্তু দেশেব "ভদ্রজনসমাজেব" প্রভূত কল্যাণ সাধন হবে। এ কথা যুক্তিব দিক দিযে কতখানি অসাব ধবা পড়ে যখনই আমবা স্মবণ কবি সংস্কৃতি শব্দেব প্রকৃত অর্থ এক জাতীয সামাজিক পবিমণ্ডল। পাশ্চাত্য চিন্তানাযক ম্যাথু আর্নল্ডেব সংস্কৃতিবিচাব বহুলাংশে অগ্রাহ্য মনে হয এই কাবণে যে তিনি সংস্কৃতিব বিচাবে সামাজিক অবদান বহুলাংশে বিস্মৃত হযেছিলেন। এই ভুলেব উদাহবণ দেখি 'সভ্য' ও 'সংস্কৃতি' শব্দেব একার্থসূচক ব্যবহাবে। যদিও সংস্কৃতিব অন্তর্গত অর্থ 'সভ্যতা' (সিভিলিজেশন), তথাপি তাবা একার্থক নয। তথাকথিত অসভ্য জাতিবাও সংস্কৃতিবান (কাল্‌চাবৃড্)। অর্থাৎ, দ্যোতনায 'সভ্যতা' শব্দটি 'সংস্কৃতিব' চেযে কম ব্যাপক। সমাজ-বিজ্ঞানীদেব ক্রমাগত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও 'সংস্কৃতি' শব্দেব সংজ্ঞা-কথন প্রায অসম্ভব। বস্তুত আমাদেব যাবতীয বাহ্যিক ও আভ্যন্তবীণ ব্যবহাবই সংস্কৃতি-প্রকাশক। টাইলবেব মতে, "জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, শিল্প, নীতি, আইনকানুন, প্রথা, অনুষ্ঠান, অভ্যাস ইত্যাদি যাবতীয কার্যই সমাজ-সাপেক্ষ ব্যক্তিব সংস্কৃতি-জ্ঞাপক" (*Primitive culture*, London, 1871, vol. 1. p 7)। আমেবিকান ও আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী হর্টনেব মতে, "যত কিছু আমবা সমাজ থেকে শিক্ষা কবি ও আদান-প্রদান কবি সকল প্রকাশই সংস্কৃতি" (Sociology, P B Horton & C L Hunt. U S. A, 1964, P 51)। সংস্কৃতি শব্দেব এই বিপুল অর্থ-সম্ভাব বিচাব কবতে হলে এ প্রবন্ধ অযথা দীর্ঘ ও, অনভিপ্রেত হলেও, পণ্ডিতম্মন্য প্রতিভাত হবে। মোট কথা, সংস্কৃতিব প্রকৃতি বিষযক যে কোনও প্রশ্নেব উত্তব দিতে হলে নিম্নলিখিত শর্ত দুটি অতিঅবশ্যস্মবণীয :—

(১) এক সাধারণ ঐতিহ্যের আওতায় পারস্পরিক ভাববিনিময়, ও (২) অর্জিত জ্ঞানের বিস্তার ও প্রয়োগ। অর্থাৎ নব নব ভাব ও ব্যবহার-শিক্ষা ও সমাজে অপরাপর ব্যক্তির সহিত অর্জিত ভাবের বিনিময়েই সংস্কৃতি সম্ভব ও সজীব। অতএব পারস্পরিক আদান-প্রদান বন্ধ হলে সংস্কৃতিও থাকবে না। শিক্ষা এই বিনিময়ের সহায়তা এবং উৎকর্ষ সাধন করে। ফলত কু-শিক্ষা যেখানে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা আনবে ও আদান-প্রদান ব্যাহত করবে সেখানে সংস্কৃতিতেও আসবে অনিবার্য সঙ্কট। বর্তমান ভারতের সাংস্কৃতিক সমস্যা প্রকৃতপ্রস্তাবে উপরি-উক্ত অশিক্ষা-জন্য 'সংস্কৃতি-হীনতা'। প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থাই এই দুর্যোগের জন্য দায়ী। যাই হোক, এটি সিদ্ধান্ত এবং অপরাপর প্রতিজ্ঞা-বিশ্লেষণের পর আমরা এই বক্তব্যে পৌছব। পূর্বমত স্বীকৃত হলে অর্থাৎ সংস্কৃতি যদি হয় সঞ্চার-নির্ভর, তবে ব্যক্তির সাংস্কৃতিক অধিকার অপরাপর ব্যক্তির প্রতি সঞ্চার-সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। কোনও ব্যক্তির জীবনে তদীয় সমাজের ও সংস্কৃতির প্রভাব যে কতখানি তা বলে বোঝান অসম্ভব। ধর্ম, অভিমত, আচার ব্যবহার, মূল্যায়ন, মূল্যবোধ তাবৎ সকল অভিপ্রকাশই সমাজের সংস্কৃতি নির্ধারিত। এই প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনার লোভ দুর্নিবার বোধ হচ্ছে। ইংল্যাণ্ডে আমার ল্যাণ্ডলেডির সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রাচ্য-আচারের কথা ওঠায় তিনি উদ্গারের বিরুদ্ধে সজোর অভিমত প্রকাশ করলেন। তাঁর মতে এটি একটি কদর্য ও অশ্লীল প্রথা। আমি তখন তাঁকে তাঁর দেশে প্রচলিত সশব্দে নাসিকা থেকে শ্লেষ্মা-বিমোচন প্রাচ্যের অনভ্যস্ত কর্ণে কত বিকৃত-রুচির পরিচায়ক সে কথা বোঝানোর চেষ্টা এবং বস্তুত ভিন্ন সংস্কৃতির মূল্য-পার্থক্য স্থাপিত করলাম। ক্রমান্বয়ে এক ঘণ্টা আলোচনা করার পরও তিনি অকস্মাৎ বলে উঠলেন, "উদ্গার তোলা নিশ্চিতই নাসিকা-ক্ষেপনের চেয়ে অনেক বেশি খারাপ।" এরপর অবশ্যই আলোচনা নিষ্ফল বোধে নীরব রইলাম। এমন বহু উদাহরণ পাওয়া যায় যাতে প্রমাণিত হয় সকল বিচারই, বিশেষ করে মূল্যবিচার কতখানি সংস্কৃতি-নির্ভর। 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলা এ দেশে বিজাতীয় কপি-বৃত্তি, পাশ্চাত্যে না-বলা দুঃসহ রূঢ়তা। ইত্যাদি ইত্যাদি। এক্ষেত্রে এটিও জানা প্রয়োজন যে ভাব-বিনিময় বা সঙ্কেত-সঞ্চার ভাষা-নির্ভর। অতএব কোন বিশেষ সংস্কৃতি (কাল্‌চার) সেই সমাজের প্রচলিত ভাষার উপর নির্ভরশীল

হতে বাধ্য। এ কথাব সত্যতা সহজেই স্পষ্ট হয বিদেশীভাষায বস-সঞ্চাবেব অংশ গ্রহণ কবতে গিযে—প্রাযই বিদেশীবা অজ্ঞাতসাবে 'faun pas'-ব হাস্যকব শিকাব হন। শব্দেব অর্থ মাত্র বৈযাকবণিক অতিদেশ নয, সমাজ ও পবিবেশেব উপব নির্ভবশীল। অর্থাৎ কোন ভাষা সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতিব দ্বাবা সম্পন্ন ও সেই সংস্কৃতি আবাব সংশ্লিষ্ট ভাষাব প্রতিফলন। এমতাবস্থায এটি অনস্বীকার্য যে, সংস্কৃতি ঐতিহ্য-নির্ভব। ওটি স্বাধীন কর্ম বা পুরুষকাবেব ফল নয। সমাজে আমাব জন্মেব সঙ্গে সঙ্গেই আমাব সংস্কৃতি নির্ধাবিত। অর্থাৎ কোন ভাষাব অর্থোদ্গম অন্তে সেই ভাষা-ভাষীদেব জীবন যাপনও সংস্কৃতিসাপেক্ষ। সংস্কৃতি বাদ দিযে ভাষামৃত, ভাষা বাদ দিযে সংস্কৃতি অভাবনীয। শিক্ষা সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে ভাষাব প্রভাব-বিচাবেব এই প্রাথমিক আলোচনা প্রযোজন হবে। কী অর্থে সংস্কৃতিকে ভাব-বিনিময বা সঙ্কেত-সঞ্চাবেব উপব নির্ভবশীল বলছি সেটি উপবেব আলোচনা থেকে পবিষ্কাব হবে।

২॥ সাংস্কৃতিক সঙ্কটের স্বরূপ॥

এই পর্যাযে সাংস্কৃতিক সঙ্কটেব মূল স্বরূপ আলোচনা কবা যাক। আধুনিক ভাবতে আজ যে সঙ্কট তা অপবাপব অগ্রসব প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি থেকে ভিন্নতব। এই ভিন্নতাব রূপ নির্ণয কবতে পাবলেই কাবণ অন্বেষণ অনেকটা অনাযাস হবে। "আধুনিক ভাবতেব সাংস্কৃতিক সঙ্কট" বিচাবে 'আধুনিক' শব্দটিব কিঞ্চিৎ বিশদ বিচাব অতি আবশ্যক। এ শব্দটি ব্যবহাবেব প্রলোভন অসামান্য, আব এই জন্যই যথাযথ অর্থ বিচাব না কবেই এ শব্দটি ব্যবহাব কবাব অবশ্যম্ভাবী ফল দুর্বোধ্যতা।

ইতিহাসে 'আধুনিক' শব্দটি বেশ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয, যথা· 'প্রাচীন', 'মধ্যযুগীয' ও 'আধুনিক'। এ প্রসঙ্গে 'আধুনিক' শব্দটিব প্রাচীনতা স্মবণ বাখা কর্তব্য। অথচ যখন বলছি 'আধুনিক প্রসাধন' বা 'আধুনিক মানুষ' বা 'আধুনিক সঙ্গীত', তখন এ শব্দটিব সময় প্রসাব অনেক সঙ্কীর্ণ। তদুপবি, কিংবা এই অর্থ-ব্যাপ্তিব জন্যই, 'আধুনিক' শব্দটি পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি ও প্রাচ্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম প্রকাশ কবে। বর্তমান পাশ্চাত্ত্য জগতে 'আধুনিক মানুষ' বলতে বোঝায বৈজ্ঞানিক শিল্প-পবিপুষ্ট, অনাযাসলব্ধ দৈনন্দিন জীবনযাপনেব উপকবণে লালিত উন্নতবিত্ত সম্প্রদাযেব সভ্য বিশেষ;

অথচ আমাদেব অজ্ঞাতে ভাবতবর্ষে এ শব্দটিব অর্থ-বিপর্যয ঘটে গিযে এক বিচিত্র অর্থ প্রকাশ কবে। ভাবতবর্ষে 'আধুনিক' অর্থ 'আচাবে ও ভাবে পাশ্চাত্ত্যেব অন্ধ অনুকবণ', হাস্যকবভাবে অন্তে মাত্র ইংবাজী জানা ব্যক্তি-বৃন্দকে বোঝায। যেমন যত প্রগতিশীলই হোক, মাটিতে খেলে 'প্রাচীনপন্থী'—আব যত প্রতিক্রিযাশীল ব্যক্তিই হন না কেন, টেবিল-চেযাবে খেলে 'আধুনিক'। এমন কি আজকেব দিনে এ দেশে যদি কেউ ভিক্টোবিযান ইংল্যাণ্ডেব আচবণ (যেটা আমবা প্রাযই কবি) অনুকবণও কবেন, তথাপি তিনি আধুনিক, বস্তুত পাশ্চাত্ত্যেব অনুকবণ হলেই হল। অর্থাৎ 'আধুনিক' ও 'পাশ্চাত্ত্যপন্থী' ভাবতবর্ষে প্রায সমার্থক। এ সত্য হযত রূঢ় কিন্তু অতিবঞ্জিত নয। ফলে কোন্‌টি প্রকৃত পাশ্চাত্ত্য-পন্থা এ সম্বন্ধে স্বাভাবিকভাবেই সুপবিস্ফুট জ্ঞান না থাকায আধুনিকতাব সংজ্ঞা বা পবিচয সম্বন্ধেও সার্থক পবিগ্রহেব অভাব অনিবার্য। এক্ষেত্রে এটি বলা বোধহয অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, 'আধুনিক' শব্দেব অর্থ আপেক্ষিক-প্রবহমান ঐতিহ্যেব পটভূমিতেই পদটিব যথার্থ ব্যবহাব সম্ভব। ঐতিহ্যকে অস্বীকাব কবে কোন আধুনিকতাব দাবি অর্থহীন। ফলে ভাবতবর্ষে পবিবর্তন হযেছে এটা যত সহজে স্বীকার্য—আধুনিক আবহাওযা বিবাজমান একথাটি তত নয। সে যাই হোক, 'আধুনিক' শব্দটিব এই অর্থ-জটিলতা বা অভিধা-বৈচিত্র্য আছে বলেই এব তত্ত্বগত বিচাব বাদ দিযে 'আধুনিক' শব্দটি মাত্র সমযজ্ঞাপক শব্দ হিসাবে এ প্রবন্ধে ব্যবহাব কবব। সামযিক বিস্তাব ধবব ঊনবিংশ শতাব্দীব 'হিন্দু কলেজ' পর্যায থেকে—বিশেষ কবে বিচার্য হবে স্বাধীনতা-উত্তব যুগ। কেন না তাব পব থেকেই কেবল কর্মেব দাযিত্ব পূর্ণভাবে মানা সম্ভব—এমন কি তা দুষ্কর্ম হলেও। পূর্বকৃত বিশ্লেষণেব ঈপ্সিত ইঙ্গিত থেকেই সাংস্কৃতিক-সঙ্কটেব স্বরূপটি ধবা পডে। বিশদ কবা যাক: 'আধুনিক' ও 'পাশ্চাত্ত্যপন্থী' সমার্থক বলে যে দাবি আমি কবেছি তা অনেকে অবৈধ মনে কবতে পাবেন। তাঁদেব মতে, 'আধুনিক' অর্থে প্রকৃত প্রস্তাবে 'শিক্ষিত সম্প্রদাযও' বোঝা হযে থাকে। আপত্তি কবব না, ববং এটিই আমাব বক্তব্যকে সমর্থন কববে। অর্থাৎ আধুনিকতা বা সাংস্কৃতিক প্রগতি সীমাবদ্ধ থাকল মুষ্টিমেয 'শিক্ষিত ও তথাকথিত ভদ্র' সম্প্রদাযেব মধ্যে। এবং এ কথা কে না জানে যে আমাদেব দেশে শিক্ষাব মাধ্যমেই সর্বাপেক্ষা পাশ্চাত্ত্য প্রভাব প্রবেশ কবেছে। সংস্কৃতি সাবা দেশে পবিব্যাপ্ত থাকে।

যদিও মুষ্টিমেয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দ এ সংস্কৃতি এগিয়ে নিয়ে যান—সে অগ্রগতি দেশেব সর্বত্র ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। এ পবিব্যাপ্তি-যেখানে হচ্ছে না—যেখানে সংস্কৃতি (তথাকথিত) মাত্র মুষ্টিমেয় ব্যক্তিব মধ্যে নিঃশেষিত. সেখানেই শুরু হল বিচ্ছেদ এবং আদান-প্রদানেব পবিসমাপ্তি। আব পূর্বেই বলেছি এই ভাব-বিনিময় বা আদান-প্রদান যেখানে অনুপস্থিত, সেখানে সংস্কৃতি-হীনতা আসতে বাধ্য। আব ঠিক এটিই আমাদেব সংস্কৃতিব সঙ্কট। এবং এখানে এ জাতীয় সঙ্কট শিক্ষাব্যবস্থাব সঙ্গে কার্য-কাবণ সম্পর্কে নিবদ্ধ। যেহেতু ভাবতবর্ষে শিক্ষাব্যবস্থাব মাধ্যমেই পাশ্চাত্তীকবণ দ্রুত ও প্রবলতবরূপে ছড়িয়ে পড়ল সেই-হেতু 'শিক্ষিত' ও 'আধুনিক' একার্থক মানলেও, 'পাশ্চাত্যপন্থী' দুটিবই সাধাবণ অর্থ হিসাবে বয়ে গেল। অর্থাৎ পূর্বে 'ইস্ট ইণ্ডিযা কোম্পানী'ব সঙ্গে অর্থ নৈতিক যোগে যে 'পাশ্চাত্ত্যানুকবণেব' শুরু, শিক্ষামাধ্যমে সেই অনুকবণই দ্রুততব ও দৃঢতব হল। অর্থাৎ মুচিবাম গুডেব দলেব গ্রামীণ সাহেব নযা বাংলাব (ইযং বেঙ্গল) শহুবে অভিমানী সাহেবেব কাছে হটে গেল। কলিকাতাব 'বাবু ও বেণে' সংস্কৃতিতে যে পাশ্চাত্যধাবণাব শুরু, তথাকথিত ইংবাজিনবিশ শিক্ষিত সম্প্রদাযেব অন্ধ উত্তেজনায তাবই পূর্ণ পবিণতি। অর্থাৎ বসবাব ঘবে বাণী ভিক্টোবিযা বা বিলাতী ছবিব কুৎসিত রুচি প্রকাশ না কবে, আত্মাভিমানী ডিবোজিওব শিষ্যবৃন্দ ইংবাজিতে স্বপ্ন দেখাব ফতোযা দিলেন। কিন্তু মূলত দৃষ্টিভঙ্গি অপবিবর্তিত বইল, অর্থাৎ 'আধুনিক' হওযা আব 'পাশ্চাত্যপন্থী' হওযাব মধ্যে পার্থক্য বইল না। ফলে ন্যায্যত মনে হয যে, ঊনবিংশ শতকেব বাংলা বা 'নবজাগ্রত (এ প্রবন্ধে 'তথাকথিত' শব্দটি প্রাযই ধবে নেওযা হবে বিশেষণ হিসাবে) বাংলা' এই সাংস্কৃতিক বিপর্যযেব বীজ বোপণ কবেছিল। ইংবাজি সংস্কৃতি মাত্র গৃহীত হল না, তাকে প্রায দৈব মাহাত্ম্য দেওযা হল। এ জন্য আধ্যাত্মিক জগতে, অর্থাৎ ধর্ম আন্দোলনেও দেখা দিল ব্রাহ্মধর্ম। স্বতই সৃষ্টি হল সুবিধাবাদী, সুযোগপবিপুষ্ট এক সমাজ যা নিজেকে সমগ্র ভাবতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন কবল, এবং তাবাই হল 'আধুনিক', 'প্রগতিশীল' সংস্কৃতিব ধাবক ও বাহক। ফলে এ সাংস্কৃতিক পবিবেশ কৃষি-নির্ভব যে বৃহত্তব ও প্রাকৃত ভাবতবর্ষ তাকে অস্বীকাব কবে বিচ্ছেদ সৃষ্টি কবল "হামলোগ" ও "সাহাবলোগ"-এব মধ্যে, "শিক্ষিত" ও "অশিক্ষিতে"ব মধ্যে—তাবই ন্যাযানুগ পবিণতি আজকেব সাংস্কৃতিক সঙ্কট। স্বীয স্বার্থ ও

ভিত্তিহীন, নীতিহীন নিরাপত্তার প্রলোভনে প্রমত্ত হযে বিদেশী **শাসক**কে দেখতে চাইলাম **মুক্তিদাতা**-রূপে। এ যুক্তিহীনতার প্রভাব আমাদের বুদ্ধিজীবীরা কাটিযে উঠতে পারলেন না। তাই কথায কথায শঙ্করাচার্যকে ব্রাড্‌লের সঙ্গে, বঙ্কিমচন্দ্রকে স্কটের সঙ্গে তুলনা করতে হল। ধুতি পরে আপ্রাণ চিৎকার করলাম প্রমাণ করতে যে প্যাণ্টের মত ধুতিও স্মার্ট। হিন্দুধর্ম আঁকড়ে থেকেও পৌত্তলিকতা অস্বীকার করে সন্দিগ্ধ ও উন্নাসিক শাসকের কাছে ঘোষণা করতে চাইলাম খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে সাদৃশ্য। সর্বপ্রকারে প্রমাণ করতে লেগে গেলাম যে, "আমরাও তোমাদের মত"। ব্যর্থ যোগ্যতার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায উনবিংশ শতকের বাঙালী তাই 'নবজাগরণ' আনল না, আনল অতি-অভিমানী হীনমন্যতার অকল্পনীয দুর্যোগ। এই বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায (এলিযেনেটেড এলিট) নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে বিনা দ্বিধায সমগ্র ভারতবর্ষের ভালমন্দ একাত্ম করার যে সর্বনাশা বুদ্ধির পরিচয দিল, পরবর্তী ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক সঙ্কট তারই অনিবার্য ফল। টেবিল-চেযারে খেযেই ভাবলাম ধর্মের গোঁড়ামির হাত থেকে মুক্ত হলাম। এ কথা একবারও মনে হল না যে এই টেবিল-চেযারে বসেই খাওযার প্রাক্কালে পাশ্চাত্ত্যে দৈনন্দিন রুটির জন্য ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনার অনুষ্ঠান পালন করা হয। এ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলাম এই জন্য যে, সদ্য প্রকাশিত এক সমাজতাত্ত্বিক গ্রন্থে (M. N. Srinivas, *Social Change in Modern India*) এই অসার যুক্তির অবতারণা করা হযেছে। বিদেশী শাসকের হীন দৃষ্টি নিক্ষেপের ভযে সদা সঙ্কুচিত, বিচ্ছিন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায 'জারজ-সংস্কৃতি' ব্যতিরেকে আর কিই বা দিতে পারে। এই বিচ্ছেদ এই, জারজ-সংস্কৃতি বিপন্ন করল নিজেকে—'শিক্ষা' ও 'ইংরাজি জানার" সামানাধিকরণ্য মেনে সমগ্র সমাজের সঙ্গে যোগাযোগের পথ রুদ্ধ করল। এ অর্থে তাই সাংস্কৃতিক সঙ্কটও প্রবলভাবে বিরাজমান তথাকথিত 'এলিট্'-দের মধ্যেই। এ ব্যতীত যে বিশাল ভারতবর্ষ, সেখানে দ্রুত পরিবর্তনের গোলযোগ থাকলেও এক অর্থে সাংস্কৃতিক সঙ্কট নেই। ফলে যদি এই সাংস্কৃতিক সঙ্কট চাপিযে দিই বাকি ভারতবর্ষের উপর তাহলে দ্বিতীয দফায ভুল করব। স্বীয সমাজ ও ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হযে কখনও বহিরাগত সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করা যায না, ফলে যা হল তা হল বুদ্ধিবিচারহীন অনুকরণপন্থী অস্বচ্ছলীয শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, যারা সাংস্কৃতিক জগতে ত্রিশঙ্কু হযে রইল। অথচ তারাই

ভাবতবর্ষেব প্রগতিব জিম্মাদাবি নিল—নিল শিক্ষাদানেব দাযিত্ব। আমাদেব সাংস্কৃতিক সঙ্কট যে বিচ্ছেদ-জন্য সংস্কৃতি-হীনতা তাব দৃষ্টান্ত প্রচুব—আমাদেব পবিকল্পনায, স্থাপত্যে, সাহিত্যে, সাংবাদিকতায, শিক্ষাপদ্ধতিতে। কলকাতায তাই একশো দশ ডিগ্রি তাপমাত্রাতে সার্সিবন্ধ বাস চলে। যে দেশে শতকবা সত্তব জন মহিলা অভাবেব তাডনায ঊর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত বাখতে বাধ্য হন, সে দেশেবই কাগজে বিতর্ক হয আমাদেব দেশেব মেযেবাও অধুনা পাশ্চাত্ত্যেব অনুকবণে টপ্‌লেস পববেন কিনা। লণ্ডনেব অক্সফোর্ড স্ট্রীটে বডদিনেব আলোকসজ্জাব পাতাজোডা ছবি দিযে বেব হয দৈনিক খববেব কাগজ। "আমাদেব" অসুবিধা হবে বলে ইংবাজি ছাডতে পাবছি না, অথচ এই "আমবা" যে কাবা তাব অনুসন্ধানেব কোন দাযিত্ব নিই না। এমন কি সামাজিক রূপকল্প এত ভিন্ন যে, 'অধ্যাপকে'ব যে মূর্তি আজকেব শিক্ষিত সমাজ ধাবণ কবে সমগ্র ভাবতবর্ষেব কল্পনাব সঙ্গে তাব কোন সাদৃশ্য নেই। এ সঙ্কট তাই অন্তে কল্পনাহীনতাব সঙ্কট। মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সমাজে সামগ্রিক কোন আদান-প্রদান সম্ভব নয। আব সংস্কৃতি যেহেতু বিনিময-নির্ভব, অতএব এই বিনিময যেখানে নেই সেখানে সংস্কৃতি প্রহসনমাত্র। শিক্ষাব্যবস্থা যেকোন সমাজে সবচেযে শক্তিশালী পথ এই ভাববিনিমযেব আদর্শ কাঠামো নির্মাণে ও ক্ষেত্র বিস্তাবে। শিক্ষাপদ্ধতি যদি বিচ্ছেদ আনায সহাযতা কবে তাহলে সাংস্কৃতিক সঙ্কটেব হাত থেকে মুক্ত হওযা অসম্ভব। বিচ্ছিন্নতাজন্য যে সাংস্কৃতিক সঙ্কট—যে সঙ্কটেব স্বরূপ অন্ধ ঐতিহ্যঔদাস্যে ও পাশ্চাত্ত্য অনুকবণে পর্যবসিত, আমাদেব দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা তাব জন্য প্রধানত দাযী। শিক্ষাব উদ্দেশ্য, সার্থকতা ও বাহন এই তিনটি বিচাবেব দ্বাবা আমবা সিদ্ধান্তে (অর্থাৎ বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ও সাংস্কৃতিক সঙ্কট অঙ্গাঙ্গী জডিত) উপনীত হব।

৩ ॥ বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ॥

শিক্ষাব মূল উদ্দেশ্য কী, এ নিযে প্রচুব দার্শনিক আলোচনাব অবকাশ থাকলেও তাব বাহন যে মূলত ভাষা, এটি কেউই অস্বীকাব কববেন না। যে অর্থে প্রকৃতি বা অবণ্য, নদী বা প্রস্তব শিক্ষক এবং যে অর্থে পর্বতে কন্দবে, উন্মুক্ত প্রান্তবে চঞ্চল হবিণশিশুব মত ধাবমান হওযাই শিক্ষাব উৎকর্ষ বলে ধবা হয, সে শিক্ষা যত মহৎই হোক, আপাতত তা আমাদেব আলোচ্য বিষয নয। অতএব গোডাতেই আমি ধবে নেব যে, "শিক্ষা" তাই যা সর্বজনগ্রাহ্য

প্রথায় অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় বা তৎপ্রকার সংস্থার সাহায্যে পরিবেশিত হয়। এই জাতীয় শিক্ষায়তনকে যদি কেউ আশ্রমের রূপ দিতে চান, তিনি তা করতে পারেন। কিন্তু মূলত শিক্ষার প্রকার একই রাখতে হবে। সে ক্ষেত্রে শিক্ষার বাহন অবশ্যই ভাষা। নীরব শিক্ষা যতই মধুর হোক, তা পরিবেশন করা চলে না। প্রকৃতিকে কবিতার বই বলে চালালে প্রকৃতিকেও অমর্যাদা করা হয়, বইয়েরও উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। এমতাবস্থায় শিক্ষাকে সহজ সুচারু করতে হলে প্রয়োজন শিক্ষার বাহন ভাষার উপর অধিকার বিস্তার। বস্তুত শিক্ষা তথা সংস্কৃতি অভিব্যক্তিময়। অভিব্যক্তি নীরব হতে পারে না, তা বাঙ্ময়। শিক্ষার উৎকর্ষ-সাধন করতে হলে অনিবার্যভাবে ভাষার অধিকার বিস্তৃত করতে হবে। অর্থাৎ ভাবাধার যে ভাষা তাতে স্বচ্ছন্দ শিক্ষাবিস্তারের মৌলিক প্রয়োজন। ভাষা যেমন ভাবের শরীর, তেমনই ভাবও একান্ত ভাষা-নির্ভর। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ভাষা বিষয়েই যদি গোলযোগ উপস্থিত হয় তাহলে শিক্ষার গোলযোগও অবশ্যম্ভাবী। আমাদের দেশে বিদেশী ভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে ধরে রেখে আমরা এই গোলযোগই টেনে চলেছি। শিক্ষা ও ভাষার যেরূপ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, ভাষাও সেইরূপ পরিবেশ ও বিশেষ সংস্কৃতি-সাপেক্ষ। এইরূপ ধারণা হওয়া খুবই ভ্রমাত্মক যে ভাষা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা—তা শিক্ষাপদ্ধতির উপর যথেচ্ছ চাপিয়ে দেওয়া যায়। অবশ্য 'নবজাগরণে'র নামে রামমোহন, বিদ্যাসাগর হয়ে যে সমূহ অপকর্ষ সূচিত হল, শিক্ষায় বিদেশীভাষা গ্রহণ (আধুনিকতার নামে) সেই একই চিন্তাহীনতার ফল। বিদেশের ঠাকুর ফেলে দেশের কুকুর ধরা বুদ্ধিবিনাশের সূচক সন্দেহ নেই কিন্তু দেশের ঠাকুরের অভাবও বিদেশী কুকুরের দ্বারা পূর্ণ করার প্রচেষ্টা বোধহয় অধিকতর প্রতিকারক। আর এই কারণে দেখি 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি'র ছাত্র শ্রীক্ষেত্রচন্দ্র ডিরোজিওর দ্বারা 'ডিমস্থিনিস' নামে ভূষিত হয়ে গর্বিত। ডিরোজিও প্রভাবে 'নয়া বাঙলা'র ছাত্রবৃন্দ দ্বারা প্রকাশিত "এথেনিয়ান" কাগজে মাধব মল্লিকের অন্ধ কুসংস্কার. "অন্তর থেকে যদি কিছু আমরা ঘৃণা করি তা হল হিন্দুধর্ম"। হতেই পারে, কিন্তু ধর্মসংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ এ নয়, আত্মসংহারী এ জেহাদ ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে। বিদ্যাসাগরও তাই. রামমোহনের উপযুক্ত ভাবশিষ্য হতে গিয়ে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্যালাণ্টাইনের যুক্তিযুক্ত সমন্বয়বাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে বললেন: "সাংখ্য ও

বেদান্ত যে মিথ্যাদর্শন এ বিষযে কোন মতবিবোধ নেই"। কিন্তু "কাদেব" মধ্যে মতবিবোধ নেই ? কাবা বিচাব কববে ? যেকোন দর্শনবিদ্ জানেন যে, দর্শন সত্য মিথ্যা আবিষ্কাব কবে না, বিশ্লেষণ কবে। সে ক্ষেত্রে কোন্ ন্যাযে বা চিন্তা-প্রকাবে বিদ্যাসাগব "মিলেব ভাবপ্রধান লজিকে" হুবহু সত্যেব প্রতিলিপি বোনেন, অথচ সাংখ্য বেদান্তে দেখলেন শুধু মিথ্যা। বস্তুত এ যদি তাঁব ব্যক্তিগত অভিমত হত কাবোবই কিছু বলাব থাকত না, কিন্তু এই সর্বৈব প্রমাদপূর্ণ যুক্তিব অজুহাতে সাবা ভাবতেব শিক্ষাব বনিযাদ তৈযাবি কবতে বসলেন। এ খামখেযালেব প্রশ্রয তদানীন্তন বঙ্গসন্তানবৃন্দ দিতে পাবলেন শুধু শিক্ষাব উদ্দেশ্য কী বা অংশীদাব কাবা এ বিষযে অজ্ঞতা থেকে। এটা অবশ্যই সত্য ছিল যে, গণশিক্ষাব কোন স্বীকৃত ধাবা না থাকায শিক্ষা-প্রসাব বা বিজ্ঞানশিক্ষা ভাবতবর্ষে ব্যাহত হচ্ছিল। কিন্তু সে অভাবপূবণ তো সংস্কৃতি-নিরূপিতগণকে বাদ দিযে পাশ্চাত্য ভাষা ও ভাবানুকবণ নয। ফলে বিজ্ঞানশিক্ষা তো তেমন কবে বহু বছব হলই না। উপবন্তু দেশেব জনসাধাবণ চিবকালেব মত শিক্ষাজগতে ইংবাজি-নবিশিব অভাবে হযে বইল অন্ত্যজ। আমাব অভিমত থেকে একথা যেন কেউ মনে না কবেন যে আমি সেই যুগেব প্রখ্যাত মনীষাদেব অবমাননা কবছি। আদপেই তা নয। তাঁদেব চবিত্রেব বহুতব কিন্তু অন্যতব গুণাবলী বা উৎকর্ষ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কটাক্ষও আমাব উদ্দেশ্য নয। আমাব বক্তব্য বা অভিপ্রায মাত্র এইটুকুই যে, শিক্ষা সমগ্র দেশেব জনসাধাবণেব অংশগ্রহণেব বিষয, এটি ভুলে যাওযাব জন্য 'গণশিক্ষা' থেকে 'গণ' ও 'শিক্ষা' দুটিই নির্বাসিত হল। এবং এই ধাবা অনুসবণে যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হল তথাকথিত 'ভদ্র-ইতবে'ব মধ্যে তাবই সঙ্কটময শূন্যে দোদুল্যমান থেকেও সাংস্কৃতিক জাবজ যে মধ্যবিত্ত সমাজ তাবা দেশেব জনসাধাবণকে স্বীয স্বার্থে শোষণ কবাব সহজ সনদ পেযে গেল। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীব পাশ্চাত্যপন্থী চিন্তানাযকদেব দূবদৃষ্টিব অভাব-জনিত বিচাবহীনতায যে শুধু বিচ্ছেদ (এলিযেনেশন)-জন্য সাংস্কৃতিক সঙ্কট দেখা দিল তাই নয, পববর্তী কালে আমলাতন্ত্র পবিপুষ্ট 'শিক্ষিত মধ্যবিত্ত' সমাজ এই সঙ্কটকে নিজ স্বার্থে ব্যবহাব কবল। ফলে কার্যত যা মূলে ছিল মাত্র ঐতিহাসিক প্রমাদ, তা কালক্রমে হযে উঠল মুষ্টিমেয সুবিধালোভীব আত্মবক্ষাব হাতিযাব, কখনও জ্ঞানে, কখনও বা অজ্ঞাতসাবে।

যাই হোক, আমাদেব বক্তব্য ছিল যে, শিক্ষাকে সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন কবে দেখলে তবেই যেকোন ভাষায শিক্ষাব কথা ভাবা যায। বস্তুত, ভাষা তাব মাবফৎ সমবেত সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তাব কবে। সে সংস্কৃতি ভাল কি মন্দ সেটা বিচার্য নয। সে সংস্কৃতি যদি "দেশজ" না হয তাহলে দেশবাসীব শিক্ষাব্যাপাবে তা নিবতিশয দুর্যোগেব কাবণ হতে পাবে। ভাবতবর্ষে দুর্ভাগ্যবশত তাই ঘটেছে। শিক্ষাব উদ্দেশ্য কোথাও বা কোন-কালে কতিপয পবিবাবেব সন্তানসন্ততিকে "কেবানি" বা "ভদ্রলোক" কবা নয। শিক্ষাব উদ্দেশ্য সর্বজনজন্য ভাবোৎকর্ষ বিস্তাব। শিক্ষাব মণ্ডল জনসাধাবণেব আবাসিত মণ্ডল। সযত্নে চষিত ও লালিত মোগল উদ্যান নয। ভেবে বিস্মিত হতে হয শিক্ষাদানে এই জনকল্যাণেব কথা আমবা কি কবে বিস্মৃত হযেছিলাম এবং অদ্যাবধি হচ্ছি শিক্ষায বিদেশী ভাষাব মাধ্যম মেনে। শিক্ষা মানুষেব জীবনকে দেয পবিবেশ থেকে প্রযোজনীয তথ্য আত্মসাৎ কবে আত্মনির্ধাবণেব অপবিসীম ক্ষমতা। এ ক্ষমতাব উৎকর্ষ ও আধিক্যেব উপব নির্ভব কবে শিক্ষাব সাফল্য। শিক্ষাব মান কখনই পবীক্ষায পাশ কবাব শ্রুতিধববৃত্তি মাত্র নয। এক আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেব মতে :

"ক্লাসেব বাইবে বৃহত্তব জগতে দিনযাপনেব নিযামক শিক্ষা। শিক্ষা ভাবসঞ্চাবেব ও ভাবগ্রহণেব সহাযতা কবে এবং স্বীয সামাজিক জীবনে সার্থক ও সক্রিয অংশগ্রহণেব সামর্থ্য আনে।" (G Murphy, An Introduction to Psychology, N Y. 1951, p 5ɛ9)

এই উদ্ধৃতিতে আমাদেব জাতীয অশিক্ষাব মূল কাবণ সুস্পষ্ট। শিক্ষা সাবাজীবনেব ভিত্তি অস্বীকাব কবে ফলপ্রসূ হয না। শিক্ষা ক্লাসরুমে ভানুমতীব খেলা নয যে "বেবিযে এলেই নেই"। আমবা "শিক্ষাসমস্যা"ব আওযাজ তুলে যতই উদ্বেলিত হই না কেন সে ক্রন্দন অর্থহীন, যদি না প্রচলিত শিক্ষাব এই হৃদযবিদাবক সমাজবিচ্ছেদেব দিকটা ভাবি। "শিক্ষিত ভদ্রলোক" হওযাব অর্থ ছিন্নমূল হওযা নয—একথা হৃদযঙ্গম কবা আশু প্রযোজন। বস্তুত শিক্ষাব অন্যতম উদ্দেশ্য যদি হয মৌলিক চিন্তাব প্রশ্রয—তাহলে পবিচিত পবিবেশে মূল বিস্তৃত বেখে নবতব পবিবেশকে সমস্যারূপে গ্রহণ কবাব মাধ্যমেই হয তাব সর্বাধিক প্রসাব। শিক্ষা মানুষকে অপ্রস্তুত না থাকাব ক্ষমতা প্রদান কবে থাকে। একথা যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি

একথাও ঠিক যে প্রাক্-প্রস্তুতির ভিত্তিতেই এই সর্বাঙ্গীণ সাফল্য অর্জিত হয়। এরই নাম মনোবিদ্যায় "ট্রান্সফার"। অর্থাৎ যে শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের পরিবেশের সঙ্গে পূর্ণবিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তা প্রকৃতপক্ষে অশিক্ষা।

মানসিক ক্রিয়াকলাপ যার মাধ্যমে অভিব্যক্ত, তাকেই সাধারণভাবে ভাষা বলা যেতে পারে। উদ্দেশ্য অর্থপ্রকাশ, আবশ্যক সমধর্মী সমাজবর্তিতা। ভাষাবিদ্ L. Bloomfield-এর মতে, ভাষা বহুলাংশে আবেগ ও আকুতি-নির্ধারিত। শব্দাশ্রয়ী ভাষার মূল অংশ তিনটি। যথাক্রমে—শব্দসম্ভার, ধ্বনি ও গঠনবিন্যাস। অতএব যেকোন ভাষা লিখতে হলে ঐ তিনটিকে আয়ত্ত করতে হবে। ভাষার এই তিনটি আবার পরিবর্তনশীল। অভিজ্ঞতার পরিবর্তনের পথে ভাষারও পরিবর্তন হতে থাকে—এমনকি অর্থ ও ব্যঞ্জনার রূপান্তর ঘটে। অর্থাৎ নিয়মিত ও যথাযথ পরিবেশে ব্যবহারের সুযোগ না থাকলে কোন ভাষাই প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় ও ঈপ্সিত অর্থ-সঞ্চারী হতে পারে না। মাত্র ব্যাকরণ বা বই পড়ে যে ভাষা শিক্ষা হয় তাতে কেবল (বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া) কাজ সারা চলে। আত্মপ্রকাশ করা চলে না। কোনও ভাষা যে সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত, কেবলমাত্র সেই বিশেষ সংস্কৃতি বা দেশ তার ঐতিহাসিক জনকই নয়—অর্থজনকও বটে। একটি শব্দ উচ্চারণে যে ধ্বনিতরঙ্গ ওঠে তার সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকে গোটা সংস্কৃতি—যে চিত্রকল্প আসে তা নিতান্তই ঐতিহ্যনির্ভর। এই উদ্বৃত্তটুকু বাদ দিয়ে ভাষার যে কাঠামো পড়ে থাকে, তাকে শিক্ষার মাধ্যম করা চলে না। অথচ ভাষা তো সমাজ-নিরপেক্ষ নয়, অতএব আমাদের সমাজে অনিবার্যভাবে এই অর্থবৈচিত্র্য বিনষ্ট হবে বিদেশী ভাষার। আর সেইজন্যই বিদেশী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা বাঞ্ছনীয় নয়। শিক্ষা জীবনে ব্যবহার করার জন্য—জীবনের পরিমণ্ডল থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য নয়। আমার স্বকীয় অভিজ্ঞতার উপর আমার চিন্তাজগৎ গড়তে হলে তা অভিজ্ঞতার সংবেদনেই গড়ে উঠবে। অতএব বিদেশী ভাষা ক্রমাগত প্রয়োগ করে আত্মপ্রকাশ করতে হলে তা হবে অনুবাদনির্ভর (তাও বড় জটিল), অথবা শব্দবহুল এবং চিন্তাকৃপণ। দুটির কোনটিই শিক্ষার প্রসার আনে না। এইজন্যই আমাদের দেশে শিক্ষার এই অনুর্বরতা।

বৈজ্ঞানিকভাবে বলতে গেলে শিক্ষা অভ্যাসেব সঙ্গে সম্বন্ধ হলেও নিম্নোক্ত বৃত্তিগুলি অত্যাবশ্যক ·

(১) 'মোটিভেশন' বা উদ্দেশ্যচেতনা এবং আগ্রহ,

(২) শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন স্তবেব মধ্যে সামঞ্জস্য ও সংযোগ দেখাব ক্ষমতা, এবং

(৩) অধিগত বিষয়গুলি দৈনন্দিন কর্ম ও জীবনযাপনে প্রযোগ কবা। যা শিখলাম তা যদি মাত্র পুস্তকেই বা মগজেই আটকে থাকে তাহলে শিক্ষাব ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী।

এই যে তিনটি অতিপ্রযোজনীয তথ্য, ইংবাজিতে শিক্ষা দিলে এব কোনটিই মানা সম্ভব নয। উৎসাহ, উদ্দেশ্য এবং প্রযোগ—এই তিনটি ধাবা থেকে পৃথক হয়ে যে অভিব্যক্তি কবতে শেখা তা শিক্ষাব সন্তোষ বা অনুপ্রেবণা কখনই দিতে পাবে না। আনন্দ তো নযই। অথচ এই অনুপ্রেবণাই সৃজনশীলতাব বহস্য। ক্রমাগত চাপ দেওযাব ফলে শিশুমস্তিষ্ক স্বাধীনতা হাবায—শব্দ-সংযোগ আব খেলাব পর্যাযে থাকে না। তা কডা শাসনেব দাযে আবদ্ধ হযে পডে। যেমন ধবা যাক, ফিবিঙ্গী স্কুলেব প্রতি শ্রদ্ধাব উন্মত্ততায আমবা বিস্মৃত হই যে শিশুকে যখন "হেদে গো কলমীলতা ·" ইত্যাদিব পবিবর্তে "Pussy cat Pussy cat / Where had you been ? / I had been to London / To visit the queen" ক্রমাগত মুখস্থ কবান হয, তখন শিশুজগতে যে আঘাত আনা হয তা তাকে মননেব দিক দিযে বাকি জীবন পঙ্গু কবাব পক্ষে যথেষ্ট। শব্দ সেখানে শব্দমাত্র, কোন মন-মাতান ছডাব বঙীন চিত্রবহুল ছাযাছবি নয। ফলে বলাব ইচ্ছা স্তিমিত হয এবং ক্রমশ বলতে চাওযাব অনভ্যাস বুদ্ধিজগতেব অবস্থা সঙ্কটময কবে তোলে। আত্মপ্রকাশেব ইচ্ছা প্রায প্রাকৃতিক। সেই প্রকাশ-বাসনা যদি জোব কবে রুদ্ধ কবা হয, তাহলে বিকৃতি বা / এবং অবক্ষয আসবে এ তো সহজ সত্য। উপবে আলোচিত শিক্ষাপদ্ধতি পর্যালোচনায এটুকু আশা কবি পবিষ্কাব হযেছে যে, শিক্ষাব নামে আমাদেব দেশে যে সর্ববিধ্বংসী প্রহসন চলেছে তাবই মধ্যে লালিত তথাকথিত "শিক্ষিত জীবে"ব হাতে যদি দেশেব সংস্কৃতি ধাবণেব ভাব পডে তাহলে সাংস্কৃতিক সঙ্কট অবশ্যম্ভাবী। বস্তুত প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি, যাব শুরু সেই ঊনবিংশ শতকেব মধ্যভাগেব

বাংলায়, তা যে শুধু শিক্ষার ও ব্যক্তিমানসের অপকর্ষসাধন করছে তাই নয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়িত্বও পালন করতে পারছে না— সৃষ্টি করছে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের অন্তহীন বিচ্ছেদ। কারণ, বিদেশী ভাষার মাধ্যম। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোন গ্রাম থেকে জনৈক তরুণ এল উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত হতে। সেখানে এসে তার চিন্তাধারা উদ্বুদ্ধ হল না, ক্রমাগত যেসব বিষয়ে পাঠ-গ্রহণ করল, দেখল তার সঙ্গে সমাজের বা অভিজ্ঞতার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি সকল বিষয়ই অন্য জগতের, অন্য মননের অপরিচিত উপদেশমাত্র, আর তাইই প্রকৃত শিক্ষা বলে তাকে বোঝান হচ্ছে। ফলে সে প্রথমেই মেনে নেয় যে শিক্ষা সমাজবিচ্ছিন্ন অধ্যয়ন ও অভ্যাস। ফলে প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে সে দেখল শিক্ষাপ্রাপ্ত (তথাকথিত) তার যে সত্তা তা দৈনন্দিন জীবন ও পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ-বিচ্ছিন্ন। কল্পনা বা বুদ্ধি ব্যবহার তার কাছে দাবি করা হবে না এবং হলেও সে নিরুপায়। স্বতই সে মূল্য দেবে এই প্রাণপাত করা পরিশ্রমলব্ধ "শিক্ষা"কে এবং ফলত সমাজে এই সুযোগে বঞ্চিত জনসাধারণ থেকে নিজেকে সে বিচ্ছিন্ন বোধ করবে। এর ফল হবে সমাজের অপরাপর অধিকাংশ ব্যক্তির সঙ্গে ভাব আদান-প্রদানে অসামর্থ্য ও ক্রমশ তীব্র অনিচ্ছা। এ অনন্বয়ে সংস্কৃতিহীনতা আসতে বাধ্য। এই অর্থেই আমি পূর্বে বলেছি যে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক সঙ্কট কার্যকারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ। তবে এ সম্পর্ক অবশ্য চক্রাকারে আবর্তিত। কখনও এটি, কখনও ওটি। ঐতিহ্যপ্রিয় দুই বিরাট মনীষা—রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী—তাই স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন বিদেশী ভাষায় শিক্ষার বিরুদ্ধে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধের দৃষ্টান্ত প্রমাণ করবে তাঁর দৃষ্টি কত সহজে এই সত্য অনুভব করেছিল। ফিরিঙ্গী স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্তা জনৈকা বালিকা তারই গৃহাভিমুখী আত্মীয়স্বজনকে দেখে বলে উঠল—"Look daddy, some babus are coming"। যে শিক্ষা আত্মীয়পরিজনকে "babus" বলতে প্ররোচিত করে তা যে বিচ্ছিন্নতার চূড়ান্ত পরিণাম একথা বলাই বাহুল্য। সারা সমাজের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগ হারিয়ে যে ভিত্তিহীন, ভ্রান্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তৈরি হল, তাদের ভাগ্যে বিশ্বের জ্ঞানজগতে "ধোপার কুকুরে"র লাঞ্ছনা ছাড়া আর কী প্রাপ্য হল?

অনন্তর উপসংহারে সমাধানের আলোচনা অতি সংক্ষেপেই করব—প্রথমত, দৈর্ঘ্যহ্রাসের জন্য ও দ্বিতীয়ত, উপরের বিশ্লেষণ থেকে, আশা করছি, প্রকৃত কারণ-নির্ণয় সুবোধ্য হয়েছে। অতএব, সেইগুলির উচ্ছেদই সমাধান। যেমন, প্রাথমিক কর্তব্য হবে, সারাদেশে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান। এ প্রস্তাব কার্যকারিতা বা সম্ভাব্যতা সম্পর্কে যেসব আপত্তি তোলা হয়, সেগুলি নেহাৎই সাফাই, ফলে অধিকাংশই ভুয়ো আপত্তি। অনুবাদের হাওয়া তুলে তাঁরা মূল সমস্যা এড়িয়ে যেতে চান। বস্তুত অনুবাদের তেমন কোন প্রয়োজনীয়তাই হয় না, যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য মাত্র "পাঠ্যপুস্তক" (Text Book) গলধঃকরণ না হয়। উপরন্তু শিক্ষকরা যদি তাঁদের সারা বৎসরের বক্তব্য দফায় দফায় লিখিত পেশ করেন, তাহলে এক বৎসরের মধ্যে সারা ভারতবর্ষে এত বই হবে যে অনুবাদের ব্যয়বহুল অন্যায় ও অবাস্তব দাবি বিবেচনার অবকাশ থাকবে না। এসব আলোচনা এ-প্রবন্ধের সীমানা-বহির্ভূত বলে আরও বিস্তৃততর বিচার হবে অপ্রাসঙ্গিক ও অশোভন। মোটকথা, সমস্যা থাকলে সমাধান নিশ্চিত আছে এবং সেটা অবশ্যগ্রাহ্য, যদি সমস্যা এত বিরাট ক্ষতিসাধন করে। ফলে, মাতৃভাষার মাধ্যম প্রসঙ্গে কূট বাদ-বিচার, মূলত, অপরাধীর আত্মপক্ষ সমর্থনের অসহায় প্রচেষ্টা। ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সংযোগ আগেই আলোচনা করেছি, মাতৃভাষায় শিক্ষা দিলে তবেই গণশিক্ষা ও সার্থক শিক্ষা সম্ভব এবং প্রয়োগশীলতা শিক্ষাকে দৈনন্দিন জীবন ও সমাজের সঙ্গে যুক্ত করবে নেহাৎই অধীত বিষয়ের অর্থক্রিয়াকারিত্বের দাবিতে। মাতৃভাষা ব্যবহার করা মানে, তদীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ও বিচ্ছিন্নতা-জন্য সঙ্কটমুক্তি। যেহেতু শব্দের অর্থ (আধুনিক মতে) মাত্র আভিধানিক উপদেশ নয়, সেই ভাষাভাষীদের সমাজ ও সংস্কৃতি প্রভাবিত ও উৎসারিত, অতএব মাতৃভাষায় শিক্ষা শুরু হলে বিষয়কে যতই দূরে রাখতে চাই না কেন পদার্থগ্রহণের স্বাভাবিক অভ্যাসেই সেই ভাষার সংস্কৃতিতে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার বিস্তার আরও দ্রুততর করতে হলে শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনাটিকে **খাড়াই** (Vertical) না করে (বিশেষ করে অনুন্নত ও বিপর্যস্ত দেশে) **বহরে বড়** (horizontal) করতে হবে। মোট ইউনিভার্সিটির সংখ্যা কমিয়ে, সেই অর্থে স্কুল (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) করতে হবে।

আমাদের শিক্ষিত সমাজেব স্বদেশে ও বিদেশে অবদানেব যে কণাপবিমাণ, তাব জন্য প্রত্যেক প্রদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় বাখাই যথেষ্ট উদাবতাব পবিচাযক হবে। উচ্চশিক্ষাকে খেতাবধাবী চাকুবিকামী ব্যক্তিবৃন্দেব হাত থেকে মুক্ত কবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত গবেষণাকাবীদেব গন্তব্যস্থল কবলে দেশেব প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। পৃথিবীব সর্বত্রই দেশেব বিদ্যাবত্তাব প্রযোজনেব তাগিদে গড়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয। আমাদেব দেশে নালন্দাও তাব প্রতীক। যদিও এ-প্রযোজন চিৎ-মার্গেব প্রযোজন। কিন্তু ভাবতবর্ষে যেন বিশ্ববিদ্যালয গড়ে উঠেছে কিছু উচ্চশিক্ষাব খেতাবধাবী ভদ্রজনকে আশ্রয দিতে। কিন্তু মাত্র এই কাবণেই আমাদেব মত দবিদ্র ও অনুন্নত দেশে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যযেব ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয বানানো অন্যাযভাবে স্বজনপোষণেব পাপ। যাঁবা বিশ্ববিদ্যালযে কাজ কবেন, তাঁবা সকলেই জানেন কিভাবে খাতে-দেওযা U G C-ব টাকা বৎসবান্তে খবচেব অহেতুক মহোৎসব লেগে যায। পাঠাগাবেব জন্য দেয টাকা মার্চ মাসে প্রাযই তৃতীয শ্রেণীব বইও সাত-আট কপি কিনে কোনক্রমে ভবিষ্যৎ পাওনাব পথ পবিষ্কাব বাখি। এবং একই বই হযতো এক বাংলাদেশেবই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয কযেক কুড়ি কিনে ফেলে। অনেক সময, বিশেষ কবে আমেবিকাব ছাপা হলে, একটি বইযেব যা দাম তাতে একটি অভাবগ্রস্ত পবিবাব সাবা মাস ভবণপোষণ কবতে পাবে। টাকা তাদেব সকলেব। কিন্তু আবাম ও ভোগেব অধিকাব আমাদেব। এব চেযে নিষ্ঠুব পবিহাস আব কী হতে পাবে। তবুও এমন যদি হত যে এই বিশ্ববিদ্যালযগুলি সমাজউন্নযনেব ক্ষেত্রে নিযমিত সাহায্য কবছে তাহলেও নয একটা বৈধতাব দাবি আসে। কিন্তু মাত্র বিচ্ছেদেব ন্যাযশাসিত এই বিশ্ববিদ্যালযগুলি থাকায দেশেব কী উপকাব সাধিত হচ্ছে? কেবলমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্তেব নিবাপত্তাব জন্য এই প্রভূত অর্থব্যয ও অনুর্বব শিক্ষাপদ্ধতি বজায বাখাব অসাধুতা যতশীঘ্র পবিত্যাগ কবি ততই মঙ্গল। যে-দেশে শতকবা প্রায পঞ্চাশজন উপবাসী ও শতকবা ৭৯ জন নিবক্ষব সে-দেশে এই গগনচুম্বী শিক্ষা-পবিকল্পনা অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালযেব ব্যযবহুল দাযিত্ব বহন কবা, এমনকি বাঙ্কিসনীতিতেও গর্হিত কাজ। বড়জোব প্রতি প্রদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয থাক। এবং বাকি অর্থ প্রাথমিক বিদ্যালয নির্মাণে ব্যযিত হোক। তাতে যে মাত্র বিচ্ছেদেব সোপানসংখ্যা হ্রাস পাবে তাই নয,

দেরি নেই

গোবিন্দ চক্রবর্তী

এ বকম ববব সময, ইতিহাসেব এই অবক্ষয—
থাকবে না, বেশিদিন থাকবে না।
মেঘ-কুযাশা আসে, আসে ঝটিকা-প্লাবন,
ক' অংকেব সেই মুখোশ-নাট্য ?

যুদ্ধেব শ্মশান-অনুচব আসে প্লেগ দুর্ভিক্ষও,
সে বিভীষিকাই বা ক'দিনেব।
মানুষ চিবদিন অপদস্থ হতে পাবে না—
তাবও সীমা আছে, শেষ আছে।

প্রহবী। হে কালেব বিনিদ্র প্রহবী।
আবো উর্ধ্বে তুলে ধব পতাকা,
অপবাজেয মানুষ ঈশ্ববেবও বিস্ময—
অন্তিম পংকশয্যা থেকে উঠে সে দাঁডাবেই।

আব, নবঘাতকেবা হুঁশিযাব।
জয তাব অনিবার্যই নয—চূডান্তও বটে।
বাত্রি গভীব থেকে গভীব মানেই
সূর্য-সীমান্ত বিস্তৃত হচ্ছে, সূর্যবাহিনীও প্রস্তুত।

১

দুটি কবিতা

বিনয় চক্রবর্তী

সমীক্ষা

এখানে সেখানে আত্মকেন্দ্রিকতা, বিকৃতরুচি,
শূন্য হয়ে যাওয়া মনুষ্যত্ববোধ—আমি অনুক্রম।
তারই মাঝে কুড়ি-বাইশের সুশ্রী ভদ্র
একটি মেয়ে অন্ধ কদাকার নোংরা লোকটিকে
রাস্তা পার করে দিল সযত্নে।
মনুষ্যত্ববোধে একটা খোঁচা খেলুম।
এগিয়ে গেলুম অন্ধ ব্যক্তির সন্ধানে।
শুরুতে এক পয়সা মিল্‌লে সে কামরায়
ভিক্ষে ভালই জোটে।

অন্বেষণ

অন্ধকারে ছোরা উঁচিয়ে একজন বলল—
এ বোতলে পেট্রোল আছে, আমাকে দাও।
হারাবার ভয়ে বললুম—
পেট্রোল নয়।
দেশলাই জেলে বোতলটা পরীক্ষা করতে
লাগল লোকটা। আগুন জলে উঠল।
—এ যে আগুন। দুঃখিত। লোকটা চলে গেল।

শকুনির ছবি

অজয় গুপ্ত

রেলিঙের ওপর দিয়ে আরো খানিকটা সামনে ঝুঁকে পড়ে তাপস থুঃ করে একদলা থুথু ফেলল। অল্প বাতাসে দলাটা বেঁকে ঘুরতে ঘুরতে জলের ওপর গিয়ে পড়ল।

'যখন কলেজে পড়তাম, একজন সহপাঠী ছিল এভাবে গঙ্গার জলে কিছুতেই থুথু ফেলতে দিত না। একটা সংস্কার ছিল। ওর সঙ্গে থেকে থেকে আমারও অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। ফেলতাম না।

'এখন ফেললে যে?'

তাপস জবাব দিল না। সুধা হয়ত ওর মুখের দিকে তাকিয়েই প্রশ্নটা করল। নিচে গঙ্গার রোগাটে জলধারা। এইটাই নাকি আদিগঙ্গা। হবেও বা। অনাহারক্লিষ্ট আদিবাসীর মত চেহারা। এখন ভাঁটার টান। গোটাকয়েক মোষ কাদাজলে শরীর ডুবিয়ে গা ধুচ্ছে। জলের ওপর ওদের চোখগুলো কেবল জেগে আছে।

'শ্যামলদাকে তো তুমি চেনো—ওই যে গল্পটল্প লেখে—বলত, যদি কখনও প্রেম করিস—কাদাগঙ্গার ওই মোষগুলোর মত একেবারে আপাদমস্তক প্রেমে ডুবিয়ে দিবি। কেবল চোখদুটো জাগিয়ে রাখবি যেমন ওরা রাখে।' সুধার হাসির শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। 'আশেপাশে নজর রাখতে আর কি!' এক ঝলক হাওয়া দিলে সুধার আঁচলটা তাপসের পিঠের ডানদিকটা ছুঁয়ে গেল। 'আর বলত, আমাকে মোষের মত চোখওয়ালা একটা মেয়ে খুঁজে দিবি—সব সময় মনে হবে চোখে কাজল টেনে আছে। তুমি দেখেছ কখনও?' তাপস রেলিঙ থেকে বুক তুলে সুধার দিকে ফিরল, 'খুব কাছের থেকে মোষের চোখ?'

'তোমাদেব মত আমাব মাথাব ভেতবকাব যন্ত্রপাতিগুলো ঢিলেঢালা থাকলে দেখতাম।'

তাপস মুখে হাসি সাজাল। আসলে প্রসঙ্গটা নিশ্চযই সুধাব ভালো লাগে নি। ওব চোখ তো মোটেই সুন্দব না। অনেক দিন খেলা হযেছে এমন কোনো পুতুলেব চোখেব মত চোখ দুটো সুধাব।

'তুমি কখনও চোখে কাজল টান নি, সুধা ?'

'কেন টানবো না। আমি বুঝি চিবকালই এইবকম ছিলাম ?' একটুক্ষণ সুধা চুপ কবে থাকল। তাবপব বলল, 'তোমাব শ্যামলদাব জন্য মোষেব চোখওযালা মেযে খুঁজেছিলে ?'

'শ্যামলদা আজ বৌকে নিযে অফিসে এসেছিল। বলল, কিছু টাকা দিতে পাবিস ? বিযেব দুবছবেব মধ্যে দুটো মেযে নেমে গিযেছে। বৌটা কাল বাতে খুনসুটি কবতে কবতে বলল, আবাব নাকি একটা নামতে পাবে— ওটাকে খসাতে হবে। কিছু জোগাড হযেছে—আবো লাগবে। আছে তোব কাছে টাকা ?'

'দিলে তুমি ?'

'হ্যাঁ। শ্যামলদা ফিস্ট কবতে গিযে মফস্বল থেকে মেযে বিযে কবে এনেছিল। এই সব কথা যখন বলছিল, কেমন জডসড হযে সিঁটিযে দাঁডিযেছিল। জানো সুধা, আমাব খুব খাবাপ লাগছিল—ছাত্রজীবনে শ্যামলদাব একেবাবে অন্যবকম চেহাবা ছিল—খুব হাসত হো হো কবে, আব—'

'চল না ওই গাছটাব নিচে গিযে বসি। দাঁডাতে ভালো লাগছে না। সাবাদিন অফিসেব পব—'

ব্রিজটা যেখানে শেষ—নেমে একটু বাঁ-পাশে গেলে কৃষ্ণচূডা গাছ। কিছু ডালপালা ফুলসমেত গলা বাডিযে বুডি নদীব সঙ্গে, হাওযা থাকলে, খুনসুটি কবে সময কাটায।

'খুব তো জাঁকিযে বসলে—পডাতে যাবে না ?'

'না।' হাতেব ব্যাগ পাশে বেখে শাডিব পাড পাযেব পাতা পর্যন্ত টেনে দিতে দিতে সুধা বলল, 'মেযেটা পেকে একেবাবে ঝুনো হযে গেছে। কাল পডাচ্ছি, বলল, সুধাদি আপনি কাল কিন্তু আসতে পাববেন না। বাবা মা

পার্টিতে যাচ্ছেন। আমি অনুদাকে নিযে বেড়াতে যাব। তাবপব অনুদাব লম্বা ফিবিস্তি। দুজনেই লাইফ সেভিং এসোসিযেশনে ভর্তি হযেছে—'

তাপস একটা-দুটো ঢিল ছুঁড়ছিল জলে। সুধা থেমে যাবাব পবও কোন কথা বলল না।

'একেবাবে চুপচাপ যে।'

'কি বলব—এই বকম অবসব কত অল্প পাই, তবু তুমি দুধে প্রেমেব এক গল্প ফেঁদে বসলে—বিকেল শেষ, সামনে নদী—এতগুলো দোকান চষে ফেললাম, সিগ্রেট পেলাম না—শালাব আকাল—সবি।' তাপস হঠাৎ থেমে গেল।

'টাওযাবে গিযে বেণী দুলিযে ছুটোছুটি কবা—কানামাছি খেলা—বেলফুলেব মালা—ওফ্, ভাবতে গিযেই হাঁফ ধবে গেল।' সুধা চাইছিল হাসিটা না নিবিযে ফেলতে।

অল্প দূবে ভাঁটাব টানে জেগে-ওঠা কিসেব একটা লাশ দেখা গেল। আবছাযা ডিঙিযে ডিঙিযে গোটাকযেক শকুনি এগিযে এল। আব একটা কুকুব। ওবা এখন ভোজে বসবে। পচা গন্ধ হাওযায ভেসে এলে, তাপস ভাবল, এখান থেকে উঠতে হবে।

'আসলে তোমাব সঙ্গে আলাপই তো হল আমাব আটাশেব এপাবে—বোমান্স এমনিতেই তখন হাঁটছে ক্রাচে ভব দিযে—' পবিশ্রমে এবং ক্ষুধায কণ্ঠস্বব যে বকম শ্লথ হয সুধা সেইবকম অবশ গলায বলছিল, 'তাবপবেও তো কটা বছব কেটে গেল।'

'এখানে আব বসা যাবে না, সুধা। দেখ ওদিকে শকুনগুলো পচা মাংস খাচ্ছে।'

'তবু স্বীকাব কবছি—খুব বিফ্রেশ্‌ড লেগেছিল আমাব—ধাবাযন্ত্রে স্নানেব শেষে—দূব, মনেই থাকে না কবিতা—'

ওবা উঠল। পথে দুধাবে আলো জ্বলে গেছে। এদিকে লোকজনেব যাতাযাত কম। সোজা চলে গেলে বাঁদিকে বেসকোর্স, ডানদিকে কিছুটা এগোলে ভিক্টোবিযা।

'বুকে শ্লেষ্মাব জট, সত্তব পেবিযে গেছে এখনও বাবা বিশ্বনাথেব চবণদর্শন হল না—বুড়িবা যেমন একসময ছটফট কবে উঠে লটবহব বেঁধে বেনাবস এক্সপ্রেসে চড়ে বসে—তুমি-আমি—আমবাও সেইবকম একদিন বেলা যায

দেখে, ক্যাম্প ফেললাম।' তাপস অনুভব করল, সুধার আঙুল, করতল এখনও যেন যথেষ্ট নরম। বলল, 'তারপর সারারাত দখিনা বাতাসে। আকাশের চাঁদের আলোয়। এক ঘাইহরিণীর ডাক শুনি—। কাহারে সে ডাকে।'

'পুরুষ হরিণ সব শুনিতেছে শব্দ তার।' সুধা বাতাসের মত শব্দ করল।

'আজ এই বিস্ময়ের রাতে। তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে।'

ওরা থেমে পড়েছিল। হাতের মুঠি আরও দৃঢ় হল। তাপস লক্ষ করল সুধার নীরক্ত নীরস ঠোঁট পীড়নের জন্য উদ্‌গ্রীর হয়ে উঠেছে।

'পর পর কদিন তোমাকে বাড়ি নিয়ে গেলাম—বাবা মা, মনে হল, খুব ভয় পেয়ে গেছে।'

ওরা যেখানে বসেছিল সেখানে আবছায়ায় গাছের নিচে কয়েক টুকরো চাঁদের আলো।

'আমারও তাই মনে হল।' তাপস একটুক্ষণ সুধাকে দেখল। 'কাল তোমার বাবা আমাকে বললেন, তোমার তো নানা মহলে যাতায়াত, আজকাল নাটুকে দলও হয়েছে অনেক—তাদের দেখ না জিগ্যেশ করে বয়স্ক খলচরিত্রে অভিনয় করবার লোকের দরকার আছে কিনা।'

'আমি শুনেছি।'

'আর বললেন, এখানকার পোলিও ক্লিনিকগুলোতেও শুনছি বেশ মডার্ন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে। আমাদের 'এটা'র একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পার না?—তোমার ছোট ভাইটার কথা বলছিলেন।'

'বুঝেছি।'

'ওকে দেখলে আমার মায়া হয়। কী যেন নাম? আর রাগ হয় তোমার বাবা মার ওপর। শেষ বয়সে—'

হাওয়া বইছিল। ছায়া আলো কেঁপে কেঁপে ওদের করে তুলছিল আঁকা ছবির মত।

'তোমার ছোট বোনটা তো বেশ—'

'হ্যাঁ। এরই মধ্যে একটা ছোঁড়া জুটিয়েছে।'

'তোমার বাবা বললেন, সুধা তো প্রাণপণ করছে। কিন্তু দিনকাল এত খারাপ হয়ে পড়ছে যে জীবনধারণ—'

'এসব পুরনো কথা। আমার আর শুনতে ভালো লাগছে না। তুমি চুপ কর।' সুধা ভেতরে ভেতরে কান্নায় ভিজে গিয়েছিল।

সুধা থামতে একটা পাখি ডাকল। তারপর একেবারে চুপচাপ চারপাশ। কখনও কখনও খোলামেলা জায়গাকেও মনে হয় ঘিঞ্জি গলির সিন্দুক-ঘরের মত। দম আটকে আসা আবহাওয়া। ভালো লাগে না। তাপসের মনে পড়ছিল, একদিন রাস্তায় একটা দুর্ঘটনা ঘটতে দেখেছিল সে। অক্সিজেনের সিলিণ্ডার বোঝাই একটা ভ্যান উল্টে গিয়ে সিলিণ্ডারগুলো রাস্তাময় ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেকগুলোর মুখ আলগা হয়ে সশব্দে অক্সিজেন নির্গত হচ্ছিল। তাপসের মনে পড়ল সেই একবার প্রচুর প্রাণবায়ু কলকাতার পথে খেলে বেড়িয়েছিল। নইলে সবসময় কেমন চাপ চাপ দম আটকে আসা ভাব। শহরের বাতাসে প্রয়োজনীয় প্রাণবায়ুর পরিমাণ এত অল্প।

'আমার আর একটুও ভালো লাগছে না। এই রকম জোয়াল কাঁধে করে বেড়াতে। কি যে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছি—যাচ্ছি কি, গেছিই তো একেবারে—ওরা কখনো বুঝবে না—'

যৌবন ক্ষয়ে গেলে মেয়েদের কান্না এত বিতৃষ্ণা জাগায়। তাপসের মনে হল তার পাশে একটা ব্যাঙ বসে ভিজে গলায় ডাকছে।

'তাপস তুমি বুঝতে চেষ্টা কর। ওদের হাতে এভাবে আমাকে ফেলে রাখলে—' সুধা ওর ব্যাগ থেকে রুমাল বার করছিল।

পরে সুধা এত ঘনিষ্ঠ হল—তাপস ওর ঘামে ভেজা চুলের গন্ধ পাচ্ছিল। তার আঙুলগুলো নিয়ে সে নাড়াচাড়া করছে। আর আলোর সঙ্গে রাতও পাতা চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামছিল। এবং তখন চাঁদের দিকে তাকিয়ে সুধার অবশিষ্ট সামান্য যৌবনের প্রতি অনুরক্ত থেকে তাপস শুনতে পেল, 'কালকে তুমি আমাদের বাড়ি যাবে, বলবে বাবাকে।'

সুধা চাঁদ দেখছিল না, তাপস বুঝল। বলল, 'যাব, বলব তোমার বাবাকে। একটা সার্কাসের খেলা, বুঝলে, ক-বছর ধরে চলছিল সেটাই কোনো খেলা না বদলে আবার চলতে থাকবে।'

'তুমি এভাবে বলছ যে—আমি কি তবে—' একটা পুরনো কব্জা খানিকটা শব্দ করে হঠাৎ থেমে গেল।

'তুমি ভয় পেও না। আমি তা ভাবি নি।' অবিশ্বস্ত, হবার কথা তাপস চিন্তা করে নি। 'আমার ভয় হয়—তোমার হয় না সুধা—যখন ভাবি আবার সেই একই সার্কাসের খেলা শুরু করতে হবে—সেই একই সঙ্গসান্নিধ্য দেহসুখ ভ্রূণহত্যার চেষ্টা—আজ শ্যামলদাকে দেখে—তোমার ভয় করে না সুধা।'

'করুক। তবু—তুমি যাবে তো, বলবে তো বাবাকে কাল—'

যৌবনে বাবা শকুনির ভূমিকায় অভিনয় করে যশ কুড়িয়েছিলেন। মেক-আপ সহ সেই সময়কার একটা ক্লোজ-আপ কাচে বাঁধানো আছে। বাবা মাঝে মাঝে ছবিটা নামিয়ে পরিষ্কার করেন। আজও সুধা ঘরে ঢুকে দেখল, বাবা ছবিটা নিয়ে বসেছেন। সুধাকে দেখে ছবি রেখে উঠে এলেন। তাকের ওপর থেকে একটা হরলিক্স্-এর শিশি এনে তার সামনে ধরলেন।

'মিনু আজ আমায় এনে দিয়েছে।' বাবার হাসিমুখ। সুধার চোখে বিস্ময় দেখে বললেন, 'জগদীশের সঙ্গে গিয়ে সাতখানা সিনেমার টিকিট কিনেছিল—পাঁচখানা ব্ল্যাকে বেচেছে—বাকি দুখানা নিয়ে ওরা দুজনে সিনেমায় গেছে।'

সুধা হাতের ব্যাগটা জায়গামত ঝুলিয়ে রাখল। তাপস আসবার সময় বেলের মালা কিনে দিয়েছিল। হাতে জড়ানোই ছিল। গন্ধ একেবারে ঝরে যায় নি।

'আরো পয়সা উপায় হয়েছে আজ।' দ্বিতীয়বার থ্রম্বসিস-এর পর বাবার কথা জড়িয়ে যায়। 'ওটাকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম। পথের ওপর শুইয়ে রেখে কাছেই একটা দোকানের সিঁড়িতে বসেছিলাম। তোরা বলিস মানুষের দয়া নেই—তোর মার কাছে গিয়ে দেখ্ কত পয়সা। অসময়ের-ইস্যু এত কাজ দেবে ভাবি নি।' বাবা গিয়ে আবার ছবিটা নিয়ে বসলেন।

সুধা এগিয়ে এসে ধীরে বলল, 'তোমার তো তবে সারাদিনে অনেক পরিশ্রম হয়েছে। দাও ছবিটা আমি পরিষ্কার করে রাখি।'

'তোর সঙ্গে তো তাপসের দেখা হবে। ওকে বলিস, আমার জন্য

এখন আব পার্ট খুঁজতে হবে না। ওটাকেও আব হাঁসপাতালে দেবাব দবকাব নেই।'

হবলিক্‌স-এব কাপে চামচ নাডতে-নাডতে মা দাঁডাল দবজায এসে। সদবে জগদীশেব গলা, 'মাসিমা মিন্টুকে বেখে গেলাম—কাল আবাব ওই সময পাঠিযে দেবেন।' কাচেব ভেতব থেকে শকুনিব ছবি ফুটে বেবোচ্ছিল। সামনে সত্তবে-স্থবিব বাবা দাঁডিযে। তাঁব চোখ দুটো, সুধা না তাকিযেও জানে, পথেব বুডো কুকুবেব চোখ যেমন ক্ষুধাবার্ধক্যে গলে যায।

ভূমিকম্পের সময়

জগন্নাথ চক্রবর্তী

প্রথম কযেক সেকেণ্ড
তুমি বুঝতে পাবো নি
আমিও না। কাবণ
তুমি কাঁপছিলে, এবং
আমিও। আমাব মুখ তোমাব বুকেব মধ্যে, এবং
সমস্ত ঘব আমাদেব মাথাব মধ্যে
দপদপ কবছিল,
আলমাবি, খাট, ড্রেসিং টেবিল, আমাব অবযব, সব
তোমাব তুফানেব মধ্যে
ওলটপালট, ঠিক এমনি সময

প্রথমে বেলজিযান কাচ
ঝনঝন ক'বে ভেঙে পডল
যেন মেঝেব ওপব তোমাব মুখচ্ছবিব টুকবো—
অসহায, বক্তাক্ত, শতধা। তাবপব
প্রসাধনেব কৌটো, পবচুলো-কববী এবং পাপোশ
হুমডি খেযে পডল গাযে গাযে।
এক প্রকাণ্ড কম্প এসে গ্রাস কবলো

তোমাব বুকেব মধ্যে বাখা আমাব মুখেব কাঁপুনি,
ছিটকে গডিযে পডলাম চৌকাঠে,
ছাদেব কডিবরগা, ফ্যান, এবিযেলেব তাব
গাজন শুরু কবলো আমাব মাথায ,
ডানদিকেব দেযাল হেঁটে এল বাঁদিকেব দেযালে—
নিঃশ্বাস নিঃশ্বাস নিঃশ্বাস—তাবপব
ঝুবঝুব ঝুবঝুব ক'বে সাবাবাত ধবে খসলো
বালিচুন, পংখেব পলেস্তাবা, সাতপুরুষেব মেহগনি,
লিন্টেল, গ্রীল, সিন্দুকেব ডালা, তেলবঙা প্রতিকৃতি,
মোকববী পাট্টা, কোম্পানিব কাগজ, লাইসেন্স,
কুলুঙ্গিতে সিদ্ধিদাতা গণেশ, বনেদি স্ফীত অহংকাব
সেই প্রকাণ্ড ভূমিকম্পেব শিং
তোমাকেও আছডে ছুঁডে দিল জানলায সজোবে,
তোমাব পমেটম-মুখ গডিযে পডলো নিচে
যেন একটুকবো ছোট্ট টিপ,
সাবাদেহেব মাংসপিণ্ড থবথব ক'বে কেঁপে উঠল ।
সমস্ত সংসাব তখন ঝিঁঝিঁপোকা,
এবং তোমাব কটিতট সম্পূর্ণ উলংগ—সজারু—
বোমকূপেব উদ্গত ভয সর্বাংগে ,
বেইন-পাইপেব তলায তোমাব চিবুক স্তন হাতি-শুঁড উরু,
এবং সাবাবাত ড্রেনেব জলস্রোত তোমাব মধ্য দিযে
কাদা, মাছেব আঁশ, সাতবাসি আঁস্তাকুড, নোংবা এবং

প্রথম কযেক সেকেণ্ড
তুমি বুঝতে পাবো নি,
আমিও না । কাবণ
তুমি কাঁপছিলে, এবং
আমিও ।

একটি সাক্ষাৎকার

ডক্টর সুকুমার সেন

কার্তিক লাহিড়ী

একজন অজ্ঞাত মুসলমান কবিব পদ্যাংশ (পিতামাতা জন্ম দিল, গুরু দিল গুণ / আলোনা ব্যঞ্জন যেন, তাতে দিল নুন।) আবৃত্তি কবে তিনি যে গুরুবন্দনা কবলেন—বুঝলাম তখুনি, যখন তিনি বলে উঠলেন, 'তিন নম্বব সুকিযাস বো-তে থাকতেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায। আমি প্রাযই সকালে যেতাম সেখানে।' তিনি থামলেন, কিন্তু এই যতিটুকুব মধ্যে আমাকেও যেন নিয়ে গেলেন অনেক অনেক দিন আগেব এক সকালে। সাতাশ নম্বব গোযাবাগান লেন থেকে একটি ছাত্র প্রাযই বোজ সকালে আসেন তিন নম্বব সুকিযাস বো-তে, তাঁব শিক্ষকেব কাছে, তাঁব উপদেশ নিতে, পাঁচ বকম কথা শুনতে, দু-চাব বকম লোকেব দেখা পেতেও। সেদিন সকালে সেই ছাত্রটি দেখলেন, বাস্তাব কাছে দোবগোডায সুনীতিবাবু এক ভদ্রলোকেব সঙ্গে আগ্রহসহকাবে বিদাযকালীন কথা বলছেন। অপবিচিত ভদ্রলোক, এব আগে দেখেছেন বলে মনে পডে না। যেতেই সুনীতিবাবু পবিচয কবিযে দিলেন, 'ইনি হচ্ছেন শ্রী সজনীকান্ত দাস', আব ছাত্রব দিকে ফিবে হেসে বললেন, 'শ্রী সুকুমাব সেন।'

ডক্টর সেন সেই যৌবনেব দিনগুলোব কথা স্মবণ কবতে কবতে বোধহয স্বপ্নবাজ্যে চলে গিযেছিলেন, তাই যেন অনেক দূব থেকে তাঁব কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে থাকল কাটা-কাটা টুকবো-টুকরো কথায, 'এর

আগে বাংলায় লিখেছিলুম সংস্কৃত সিন্ট্যাকস্ (Syntax)-এর উপর, তারপর নারীদের ভাষা নিয়ে, সবই সুনীতিবাবুর উৎসাহ ও আগ্রহে। সজনীবাবু বললেন, লিখুন না বাংলা গদ্য সম্বন্ধে 'বঙ্গশ্রী'তে, আমি এখন 'বঙ্গশ্রী' বার করছি। সুনীতিকুমার উৎসাহিত হয়ে বললেন, লিখুন না বাংলা গদ্য নিয়ে। লেখা শুরু হল, মাঝে মাঝে 'বঙ্গশ্রী'তে ছাপা হল, এবং শেষও হল। তখন সুনীতিবাবু বললেন এবং সজনীবাবু সোৎসাহে সমর্থন করলেন বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখে যেতে। শুরু করলুম, কিন্তু 'বঙ্গশ্রী' দু-চার মাস পর সজনীবাবু ছেড়ে গেলেন।' ডক্টর সেন একটু থেমে হেসে বললেন, 'আচার্য সুনীতিকুমারের স্নেহানুকূল্য না পেলে আমি বাংলা লেখার পথে আসতুম কিনা সন্দেহ। আমার গবেষণায় আমার রচনায় আমি সুনীতিবাবুকে পাঠক মনে করে এগিয়েছি। আমার লেখা-কাজে যদি কিছু গুণ থাকে তো তার অনেকটাই এই সূত্রে এসেছে।'

' 'বঙ্গশ্রী' উঠে গেলে আপনি কি সাহিত্যের ইতিহাস লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন,' খেই ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করি। ডক্টর সেন হাসলেন, 'প্রায় তাই। সেই সময় সুনীতিবাবু বাইরে গিয়েছিলেন, ইউনিভার্সিটিতে কাজের চাপ বাড়ল, বাংলা লেখার জন্য আর বাড়তি সময় হয় না।' একটু থামলেন তিনি, 'এই সময় একজন অনুরাগী ছাত্রের উৎসাহে আবার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—যেটুকু খশড়া ছিল—তাই ছাপাতে প্রবৃত্ত হই। বই ছাপা হতে থাকল, প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ছাপাও হয়ে গেছে। সুনীতিবাবু বললেন, একবার রবীন্দ্রনাথকে পড়ান দরকার। যতদূর ছাপা হয়েছিল, সেটুকু বাঁধিয়ে নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হল।'

'রবীন্দ্রনাথ পড়ে সুনীতিবাবুকে চিঠি দিয়েছিলেন, সেই চিঠিই বোধহয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে ছাপা হয়েছে?'

'শিরোভূষণ।' হাসলেন ড সেন, 'বইটা নিয়ে কাণ্ড-ই হয়েছিল।' শুনে আমি খাড়া হয়ে বসলাম। 'রবীন্দ্রনাথ বললেন, মংপু যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে পড়ে মতামত জানাব। মংপু গিয়ে বাক্‌শো খুলে দেখলেন, বই নেই। আর যায় কোথায়, হুলুস্থুল কাণ্ড। প্রতিমা দেবীকে লিখলেন, তোমাদের জন্য আমার মান-ইজ্জৎ রইল না। তারপর বই খুঁজে পাওয়া গেল। বই পড়ে তিনি সুনীতিকুমারকে চিঠি দিলেন।'

'প্রতিমা দেবীকে এ-বিষযে লেখা চিঠিটা বোধহয চিঠিপত্র দ্বিতীয খণ্ডে ছাপা হযেছে ?' ডক্টব সেন হাঁ-না কিছু না বলে আবাব চোখ বন্ধ কবলেন, 'পুজোব ছুটিতে সাবনাথে গিযে তৃতীয খণ্ড লেখায হাত দিই। আমি ফেবিওযালা, মূলধন জমাই আবাব সেই মূলধন খবচ কবে মূলধন বাডাই। এইভাবে আমাব লেখা চলে, নতুন নতুন তথ্য পাই, আব নিজেকেই পদে পদে খণ্ডন কবতে কবতে এগিযে চলি।'

'তাই কি বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাস প্রথম খণ্ড-কে দুভাগে বিভক্ত কবে বাব কবেছেন ? আমি প্রশ্ন কবি।

'তা-তো বটেই। তাব উপব যখন সাহিত্যেব ইতিহাসেব প্রথম খণ্ডেব দ্বিতীয সংস্কবণ শেষ হয, তখন ভাবলুম সব খণ্ডেব আযতন মোটামুটি একবকম হওযাই বাঞ্ছনীয। তাছাডা আদি ও মধ্য পর্যাযেব মধ্যে একটা ব্যবধান দেখান প্রযোজন বোধ কবলুম।' চেযাবে একটু গা এলিযে দিযে তিনি বাঁ পা তুলে আনলেন চৌকিব উপব। ফোলা পা-য হাত বুলিযে তাকালেন আমাব দিকে। আমি তাডাতাডি কাগজে কলম ঠেকিযে সভযে জিজ্ঞেস কবলাম, 'আচ্ছা স্যাব, আদি ও মধ্য পর্যাযেব মধ্যে অন্ধকাব যুগ বলে অর্থাৎ তুর্কী আক্রমণেব পব কিছুদিন যে বাংলা সাহিত্যেব বন্ধ্যাদশা গিযেছে, সেটা কি সত্যি কথা ?'

'আদি ও মধ্যযুগেব যে gap আছে, তখনও লেখা চলছিল। সাহিত্যেব ধাবা কখনও একেবাবে শুকিযে যায না, তবে ঐ সমযেব কোন লিখিত নজিব এখনও পাই নি। তবে কি লোকসাহিত্য মবে গিযেছিল বলতে চান ?' প্রশ্ন কবে নিজেই উত্তব দিলেন, 'না, ভিযেন সর্বক্ষণ চলেছে, যাব কিছু পাক হিশাবে আমবা পেযেছি পববর্তী সমযেব কবিতায পযাব ইত্যাদি ছন্দেব যুগ্মতায।'

একটু চুপ থেকে জিগগেশ কবি, 'ইতিহাস বচনা সম্পর্কে আপনি কোন্ পদ্ধতি পছন্দ কবেন ?'

'ঐ তো আপনাদেব দোষ,' হেসে উঠলেন ডক্টব সেন, 'ইতিহাস বচনা আমবা সাধাবণত নিজেব মনমতো গডতে চাই। পূর্বপবিকল্পনা অনুযাযী তথ্য সাজাতে চেষ্টা কবি, সেজন্য ব্যর্থ হই। ইতি হ আস (এই বকমই ছিল)। যে উপাদান বা তথ্য পাওযা যাবে তাবই উপব ভিত্তি কবে

সৌধ নির্মাণ কবা উচিত। আমি যা পাচ্ছি, উপাদান যেবকম বযেছে, তাবই উপব নির্ভব কবে ইতিহাস খাড়া কবতে চেষ্টা কবেছি, এজন্য আমি কোন অন্তবাযেব সম্মুখীন হই নি। ববং উপাদান সংগ্রহেব দ্বাবা আমাব সামনে নতুন নতুন দবজা খুলে যায। সে দ্বাব দিযে সত্যেব নতুন মূর্তি দেখা যায। তাই আমাব ইতিহাসে আমাবই পূর্বসিদ্ধান্ত উল্টে দিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ কবি না। সত্য অনুসন্ধান আমাব একমাত্র লক্ষ্য, ইতিহাসেব তাই-ই হওযা উচিত। সেই সত্য অনুসন্ধান নির্ভব কবে প্রাপ্ত উপাদানেব উপব। তাই কোন পূর্ব-অভিমত নিযে সত্যানুসন্ধান সাধাবণত ব্যর্থ হতে বাধ্য।'

তাবপব কিছুক্ষণ নীববতাব পব কথা তুলি, 'আপনি যে আব একটি ইতিহাস লিখবেন বলে শুনেছি, সে-বচনাটি সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ বোধ কবছি, সে-সম্পর্কে কিছু বললে আমবা অনেকেই উপকৃত হব।'

'এখনও নাম ঠিক কবি নি, এই ধরুন,' বলে তিনি চিন্তা কবলেন কযেক মুহূর্ত, 'এই ধরুন তাব নাম হবে 'সেকালেব বাঙালী'—অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই চৌহদ্দি—প্রায আড়াই হাজাব বছবেব span। প্রথম দিকেব প্রায দেড় হাজাব বছব বাঙালী বলে কোন বিশিষ্ট জাতেব অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু তখন যাঁবা ছিলেন তাঁদেবই বংশধব বাঙালী আমবা। সেজন্য তাঁদেব কথা অবশ্যই বলতে হবে, এবং তাঁদেব কথা না বললে আমাদেব বংশপবিচয সম্পূর্ণ হবে না।' একটু থেমে বললেন, 'কিন্তু যেসব কথা বলব বলে ভাবছি তাতে পেশাদাব ঐতিহাসিকবাও চমকে উঠবেন।'

'কি সব কথা?' সঙ্গে সঙ্গে জিগ্‌গেশ কবি।

তিনি গম্ভীব হযে উত্তব দিলেন, 'ক্রমশ প্রকাশ্য।' আমবা দুজনেই হেসে উঠলাম। হাসি থামতে দেখি ডক্টব সেন টেবিলেব উপব বাখা একটা ট্রে-তে সাজান কার্ড নেড়েচেড়ে দেখছেন, মনে হল কিছু খুঁজছেন, এ-বকম কার্ড আমি বড় বড় লাইব্রেবিতে দেখেছি। একটু উঁকি মেবে বুঝতে চাইলাম, তাবপব ভাবলাম—বোধহব ওঁব বাড়িব লাইব্রেবিব তালিকা। বোধহয একটু বোকামি কবলাম, 'স্যাব, ঐ কার্ডগুলো—,' আমাব কথা শেষ না হতেই ডক্টব সেন বললেন, '১৯৫৭ সাল থেকে একটানা কাজ কবে চলেছি।'

আমি খাড়া হযে বসলাম।

'ইটিমোলজিক্যাল ডিকশনারি, বিশেষ করে প্রাচীন ও মধ্য স্তরের বাংলা নিয়ে, তবে কিছু কিছু আধুনিক শব্দও থাকবে। পাণ্ডুলিপি তৈরি করছি, এখন কার্ড থেকে শ্লিপে তুলছি।'

অবাক হয়ে গেলাম, 'এই কেরানির কাজও আপনাকে করতে হচ্ছে। আপনার কি—'

'ছাই,' চটে উঠলেন ডক্টর সেন, 'কে দেবে মশাই?' ইউনিভার্সিটি একজনকে দিয়েছিলেন, তাঁর কাছ থেকে mechanical help পাই, কিন্তু ঐ সাহায্য আর কতটুকু? এখন দরকার রেফারেন্স দেখে দেবার লোক। কে দেবে? রিটায়ার করার দু-বছরের মধ্যে ইউ জি সি টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, অথচ,' আপন মনে কিছু বললেন, তারপর একটু শান্ত হয়ে বললেন, 'করে যে শেষ করতে পারব। এত সব কাজের মধ্যে এ-কাজ করতে হচ্ছে। ভীষণ পরিশ্রমের কাজ, একেবারে নতুন কাজ, কোন ভারতীয় ভাষায় হয় নি। সংস্কৃতে অবশ্য কিছু কিছু হয়েছে, তবে সুনীতিবাবুর 'অরিজিন অ্যাণ্ড ডেভেলপ্‌মেণ্ট অব্ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ'-এ এর বীজ উপ্ত আছে।' একটু থেমে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন, 'জানেন তো ও ডি বি এল-এর 'গ্লসারি' আমিই করেছিলাম।'

'আচ্ছা স্যার,' একটু ঢোঁক গিলি, এবং ইতস্তত করতে থাকি।

'বলুন, অত দীনতা প্রকাশ করার কী আছে. আমি তো দিগ্‌গজ মহাপুরুষ নই, আপনার ভয় কী?'

হেসে ফেললাম, 'ঠিক তা নয়, মানে আপনার লেখায়—'

ডক্টর সেন টক করে ধরে ফেললেন, 'রসকষ নেই কেন—এই তো?' একটু থেমে বললেন, 'আমি ফেনিয়ে লিখতে পারি না। প্রথম দিকের লেখায় সে-দোষ ছিল, তার কারণ বোধহয়,' অন্যদিকে তাকিয়ে মনে করার চেষ্টা করলেন, 'তখন মাঝে-মধ্যে রেডিও-টক দিতুম। যে 'টক' ধরুন ছ-মিনিটে শেষ হলে ভাল হত কিন্তু তা টেনেটুনে দশ মিনিট করতে হত। ফলে লেখা কেবলই ফেনাতে হত। সেই দোষ কাটাতে আমার কম সময় লেগেছে।' বলে তিনি হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন, আমি তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করে বসি, 'আজকালকার গদ্য সম্বন্ধে আপনার মত কি? মানে, কি রকম মনে হচ্ছে?'

'আজকাল,' একটু থেমে বললেন, 'গদ্য বেশ ইম্‌প্রুভ কবেছে। তবে আমি ভাষায ন্যাকামি বা ডিগবাজি পছন্দ কবি না। ভাষা বিষযে সতর্ক হওযা প্রযোজন। চলিত ভাষায লেখা শক্ত,' তিনি নিজেব মনেই যেন বলে যেতে থাকলেন, 'চলিত ভাষা এখনও ফর্মেটিভ স্তবে আছে, তাব বনিযাদ তৈবি হচ্ছে। সাধু ভাষা বহুদিন অনুশীলিত হযে এসেছে বলে ছাত্রদেব প্রথমে সেই সহজ পথে চলা—সাধু ভাষায লেখা উচিত, বিশেষ কবে পূর্ব বাংলাব ছেলেদেব পক্ষে। এখন কি জানেন, সাধু ও চলিত বাংলা ছাডা আবেক ধবনেব বাংলা চালু হযেছে, যাকে বলা যায 'বস বাংলা'। এই বস বাংলা যদি চলতে থাকে তবে বাংলা গদ্যেব ভবিষ্যৎ ভযানক অন্ধকাব।' বলে তিনি আমাব দিকে তাকালেন, ঘডিব দিকে হঠাৎ নজব পডল। বহুক্ষণ সময নিযেছি ডক্টব সেনেব। তবু উঠতে ইচ্ছে কবছিল না। অথচ উঠতেও হবে, ডক্টব সেন-কে বেশ ক্লান্ত লাগছিল, বোধহয পাযেব ব্যথা-টা বাডছিল। হট কবে বলে উঠলাম, 'আব একটা প্রশ্ন কবব?'

ডক্টব সেন হেসে উঠলেন।

'আচ্ছা, নতুন নতুন শব্দ সম্পর্কে আপনাব মত কী?'

'মোটেই আপত্তি নেই, কিন্তু শব্দ গঠন কবতে গেলে সংস্কৃত জানতে হবে। না জানলে ভীষণ মুশকিল। সহজ সবল ও হৃদযগ্রাহী কবে বলা ভালো, সহজভাবে বলাই হচ্ছে প্রাথমিক দাযিত্ব। কিন্তু আপনাবা যা কবছেন—,' বলে হাসলেন।

' 'সাহিত্যপত্রে' সে-বিষযে লিখেছেন আপনি।' হাসি আমি।

'হাঁ, সেটা টুকে দিতে পাবেন।' ডক্টব সেনেব অনুমতি পেযে কাজটা সহজ হল আমাব। তাঁব লেখা দিযে আলোচনাব যবনিকা টানি, 'ভবিষ্যৎ অমবসিংহদেব কাছে একটা সমস্যা সবচেযে কঠিন ঠেকবে। তা হল আমাদেব একশ্রেণীব লেখকদেব শব্দসৃষ্টি। সে-সৃষ্টি অনেক সমযেই অনাসৃষ্টি অর্থাৎ নিষ্প্রযোজন ও নির্ব্যুৎপত্তি। অবিজিন্যালিটিব উৎকট নেশায নব নব নির্মীযমাণ শব্দসম্ভাবেব ব্যাধিতে যাঁবা ভুগছেন তাঁবা পাঠকদেব বেশি কবে ভোগাচ্ছেন। এদেব একমাত্র সৎপথ হল নিজেদেব বচনাব শেষে শব্দকোষ সংযোজন।'

ড সেনেব বাডি থেকে বেবিযে প্রথমেই ঘডি দেখলাম, প্রায দু-ঘণ্টাব উপব সেখানে বসেছিলাম, কিন্তু কোথা দিযে যে সময গেল বুঝতেই পাবি নি। কলকাতাব বাজপথে নেমে এসে ড সেনেব বাডিব দিকে তাকাতে চাইলাম,- দেখা গেল না। শুধু মনে হল ডক্টব সেন বড্ড একা, নিঃসঙ্গ।

আব কর্নওযালিশ স্ট্রীটেব মোডে যেতে না যেতেই বৃষ্টি নামল।

বাড়িঘর সংক্রান্ত

বাসুদেব দেব

এক

তার চেয়ে কি এমন একটা বাড়ি তৈরি করবো যার ছাত যখন খুশি খুলে নিয়ে রঙিন ছাতার মত মেঘের মিনার পর্যন্ত উঁচু করে দেওয়া যায়, যার দেয়াল যখন খুশি পাখির ডানার মত মেলে রাস্তার মাঝখান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া চলে এবং যার উত্তরে ইচ্ছেমত ছোটখাট একটা পাহাড়, ঝরনাতলা কমলাবন নির্জন মন্দির সমেত বসিয়ে নেওয়া যাবে বা দক্ষিণে একটি বনে ডাকতে না জানা লাজুক নদী, নৌকা, ঝিরিঝিরি ঢেউ ভাটিয়ালির সুর আর অবিকল ভিজে উদ্ভিদের ঘ্রাণ শুদ্ধু।

দুই

শেষ পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ারদের ফুসলানিতে আমার বাড়ি বুলেট প্রুফ বাংকার হয়ে দাঁড়ায়, কোলাপসিব্‌ল গেট দেখেই দারোয়ান দাঁড়িয়ে যায় আর নতুন বাড়ির গন্ধ শুঁকে শুঁকে এলসেশিয়ান মেরুন গাড়ি নিমন্ত্রণপত্র চলে আসে। ঝুলন্ত মানি-প্ল্যান্টের পরিচর্যার জন্য শিক্ষিত মালী। আমি কখনো বেহুলার ফোঁপানি শুনে জেগে উঠি।

কোন্ ছিদ্রপথে সে ঢুকে যায়। সেই কালো ছায়া, কপালে কাটা দাগ, হাতে দস্তানা, মুখের ওপর বীভৎস মুখোশ। আমার চিৎকার পথচারীর কানে পৌঁছায় না—কেউ আছ—কেউ কোথাও আছ—মানুষ—মানুষের ঘামের গন্ধ—মানুষের বুকে প্রাচীন তালার মত নিরাপত্তা—আমি নিজের হাতে নিজেই মরতে থাকি—পুলিশ পুলিশ—ডাক্তার—আহ্

তিন

এর থেকে খোলা মাঠ ভালো ছিল, খোলা পথ এবং বাড়িহীনতা। বাইরের বিপদ এসে তাড়া করলে যেকোন দিকে দৌড়ানো চলে। তখন আমার কোন দিক নেই। আর ভিতরের বিপদটা জেগে উঠলে এই জনারণ্যই ভালো—সর্দিগর্মিতে হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়লেও কেউ না কেউ হাসপাতালে পৌঁছে দেবে। বাড়িটা কি তা হলে বেচে দেব?

আমরা দুদিকে যাব

বিজয় পাল

পাছে সে আঘাত পায়—সন্তর্পণে বিলি কাটছি চুলে
স্রোতের উপরে পাল-তোলা নৌকা—যেন করতল
খুলে স্পষ্ট দেখা যায় সুদূর অবধি। অন্ধকার
তবু কোনখানে যদি—কোনখানে থাকে ডুবজল
সব নদী সমুদ্রের, সব বৃক্ষ অরণ্যের যদি
আমরা দুদিকে যাব—দুই তীর্থে যাত্রা নিরবধি

আমরা দুদিকে যাব। পৃথিবীর নিকট যা-কিছু—
বাগান—বাগানে ফুল, পাখি কিংবা পাখির মতন
অনুভব উচ্চারণ, গোলাব সমস্ত শস্য থেকে
মুক্তি নিয়ে ফিরে যাব, আদিতম স্নেহের স্মরণ
হয়ত সহজ নয় ভুলে গিয়ে একাকী নির্জনে
আকাশ নির্মাণ। সূর্য এখন কোথায় জাগরণে।

পাছে সে হারিয়ে যায়—যদি কেউ কটু কথা বলে
ভুবনতীর্থের ঘাটে ঘাটে এই দুঃখগুলি নিয়ে
দিবস-রজনী গেল—কত শীত বসন্তের পাখি
এসেছিল একদিন—অনুৎসাহী গিয়েছে পালিয়ে
সমুদ্রের বিনিময়ে। দুজন দুদিকে যাব—তুমি
রোদ্দুরে ছড়িয়ে গেলে আমি ঘাস-লতায় আভূমি ॥
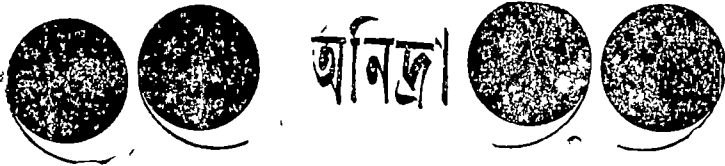
অনিদ্রা

বৈতালিক বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত্রে আমাব ঘুম হয না। অনিদ্রা বোগেব জন্য যেসব দেশীয টোট্‌কা আছে, সেগুলি প্রযোগেও সামান্যতম ফল পাওযা যায নি। নানা হিতৈষীব উপদেশ গ্রহণ কবেছি। কখনও একশো থেকে এক পর্যন্ত গুণেছি নিববচ্ছিন্ন মনোযোগে। কখনও নিশীথ শয্যায কল্পিত ভেড়াব পাল গণনায মনোনিবেশ কবেছি, কিন্তু দুঃখেব বিষয, সংখ্যা বা ভেড়াবা, কেউই ঘুমেব ব্যাপাবে আমাকে কোন সাহায্য কবতে পাবে নি।

এবপব? এবপব আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান-সম্মত ঔষধ সেবন। ডাক্তাবেব সতর্কীকবণ সত্ত্বেও বেশ কড়া ডোজে ওষুধ খেযেছি। সত্যি কথা বলতে কি, ঘুম যে একেবাবে আসে নি, তা নয। তবে সে ঘুম যেন ক্লান্তিহব সুনিদ্রা নয, খুব বেশি নেশা কবলে যেমন মাথা ঝিম্‌ঝিম্ কবা এক ধবনেব আচ্ছন্ন ভাব আসে, সেই বকম। ভেষজেব প্রতিক্রিযা বা অন্য কিছুও হতে পাবে, সেই রাত্রে অর্ধচেতন অবস্থায অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখছিলাম। ধীবে ধীবে আমি নিজেকে একটি কেঁচোতে রূপান্তবিত হযে যেতে দেখলাম। সুইফট্ বর্ণিত লিলিপুট সদৃশ কযেকজন লোক বাম পাযেব বুড়ো আঙুল দিযে ঠেলে ঠেলে আমাকে একটা কাঁচা নর্দমাব মধ্যে ফেলে দিতে চেষ্টা কবছিল। কথা, থুথু এবং কাদা শবীবে মেখে নিযে আমি ওদেব ঘৃণা উদ্রেক কবাব চেষ্টা কবলাম। ওবা প্রত্যেকে একটি কবে পাট-কাঠি হাতে তুলে নিল। সেই পাট-কাঠি দিযে খুঁচিযে খুঁচিযে আমাকে ওবা নর্দমাব কাছে নিযে গেল। আমাব অর্ধেক শবীর নর্দমাব ভিতব ঝুলে পড়ল। অসহাযভাবে আমি

আর্তনাদ করছিলাম, ওদের কাছে মিনতি জানাচ্ছিলাম। ওদের ক্ষুদ্র চোখ-গুলিতে আমাদের ফ্যাক্টরির ওয়েল্ডিং শপের তীব্র নীল আলো জ্বলে উঠল। বেশবাসের পারিপাট্য সত্ত্বেও ওদের সবাইকে আমার নিজের সমগোত্রীয় মনে হল। ওদের নাক থেকে সিকনি গড়িয়ে পড়তে দেখলাম, চোখের কোণে হলদে পিচুটি দেখলাম। আমি অতি ক্ষীণ দুর্বল কাতর স্বরে বলে উঠলাম, 'তোমরাও নেমে এস, তোমরাও নেমে এস।' ওদের মিলিত উচ্চকিত হাসির শব্দে আমার কথাগুলি চাপা পড়ে গেল। আর সেই মুহূর্তে দরজায় মেসের চাকর প্রফুল্লর গলা শুনতে পেলাম।

'দিনে দিনে এমন শুকিয়ে যাচ্ছ কেন হে?' ল্যাবোরেটরিতে ঢুকতেই চরণবাবু বললেন।

বিনাবাক্যে একটি সিগারেট বাড়িয়ে দিলাম চরণবাবুর দিকে। কারণ, আমার জানা ছিল, এইসব আমড়াগাছি আলাপ আসলে আমার কাছ থেকে সিগারেট হাতাবার ধান্ধা।

বিনয় এসে বলল, 'মুখার্জিদা, চ্যাটার্জি সাহেব আপনার উপর দারুণ রেগে আছেন। আপনাকে যে মাইল্ড-স্টীলের স্যাম্পেলটা উনি দিয়েছিলেন, তার অ্যাসে রিপোর্ট এখনও নাকি আপনি দেন নি।'

বিনয়ের কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলাম। গলার স্বর নামিয়ে বললাম, 'তাই নাকি? খুব রেগে গেছেন? কি করব বল, একদিনের মধ্যে মাইল্ড-স্টীলের কমপ্লিট অ্যানালিসিস করা সম্ভব নাকি?'

'উনি কি এসব কথা শুনবেন?'

চ্যাটার্জি সাহেবের খাস বেয়ারা এসে বলল, 'মুখার্জি বাবু, চ্যাটার্জি সাহেব ডাকছেন আপনাকে।'

আতঙ্কে আমার কণ্ঠতালু শুকিয়ে উঠল, ব্যুরেটে পারমাঙ্গানেট সলিউশন ঢালতে ঢালতে প্রকাশ বাবু রসিকতা করলেন, 'যান মশাই, সাহেবের সার্টিফিকেট নিয়ে আসুন।'

চ্যাটার্জি সাহেবের চেম্বারের স্প্রিঙের দরজা ঠেলে আস্তে, বিনীত স্বরে বললাম, 'মে আই কাম ইন্ স্যার?'

কোনও এক বিলিতি ম্যাগাজিনের বিচিত্রবর্ণ ছবিগুলি দেখছিলেন

চ্যাটার্জি সাহেব। মুখ না তুলে চাঁছা গলায টেনে টেনে বললেন, 'ই-যে-স।'

সুবৃহৎ সেক্রেটাবিযেট টেবিলেব সামনে গিযে দাঁডালাম। সাহেব অবিচলিত চিত্তে ম্যাগাজিনেব পাতা উল্টে চললেন। তাঁব চশমাব কাচে প্রতিফলিত আলো, এই ঘবেব শব্দহীন গাম্ভীর্য, নতুন বঙ কবা টেবিল-চেযাবেব গন্ধ সব মিলিযে আমাকে কেমন আচ্ছন্ন কবে ফেলছিল। এক সীমাহীন শীতল শূন্যতাব মাঝে নিববলম্ব হযে আমি ভাসতে থাকলাম। বাতাসেব মৃদু মৃদু কম্পন তোলা স্বচ্ছ জলধাবাব ভিতব বক্ষিত বাবুব মতো চ্যাটার্জি সাহেবেব মুখটা পবিবর্তনশীল বলে মনে হচ্ছিল।

'কালকেব স্যাম্পেলেব অ্যাসে বিপোর্ট কোথায?' আমাব মুখেব উপব ঠাণ্ডা দৃষ্টি মেলে ধবে নিরুত্তেজ চাঁছা গলায প্রতিটি শব্দ আলাদাভাবে উচ্চাবণ কবে বললেন চ্যাটার্জি সাহেব।

তাঁব কৌশল পুবোপুবি কাজে লাগছিল। আমি সবল হযে পডছিলাম। কোন কোন জাতেব মাকডসা যেমন নিজেব বিষ-লালা মাখিযে শিকাবকে নির্জীব কবে ফেলে, চ্যাটার্জি সাহেব সেইবকম তাঁব এই চেম্বাবেব নৈঃশব্দ্য, গাম্ভীর্য, চশমাব ভিতব দিযে ছুঁডে দেওযা ইস্পাত-কঠিন হিম দৃষ্টি দিযে শিকাবকে আচ্ছন্ন কবে ফেলেন।

'ওটা এখনও কবে উঠতে পাবি নি, স্যাব।' আমি ম্লান ধীব কণ্ঠে বললাম।'

'ফাঁকিবাজ।' হঠাৎ চিৎকাব কবে উঠলেন চ্যাটার্জি সাহেব। এই আকস্মিক ধমকেব জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। দারুণ চমকে উঠে ঝাঁকানি খেল শবীব। চ্যাটার্জি সাহেবেব কণ্ঠ আবও উঁচুতে উঠল, 'দূব কবে তাডিযে দেব সব। জোচ্চোব, ফাঁকিবাজেব দল।'

আবও কিসব বলছিলেন উনি, শুনতে পাচ্ছিলাম না, অর্থাৎ শোনাব মতো অবস্থা ছিল না আমাব। আমি নতমস্তকে অসাড দেহে দাঁডিযে থাকলাম।

'গেট আউট, গেট আউট, ক্লিযাব আউট ডার্টি ক্রিচাব।'

ঘব থেকে বেবিযে এলাম। বেযাবাটা দাঁত বাব কবে বলল, 'বাপ্‌স! সাহেব খুব বেগে গেছেন।'

প্রকাশবাবু জিজ্ঞাসা কবলেন, 'কি মশাই, এত অগ্ন্যুৎপাত কিসেব?'

'মনে হল যেন শুধু তোমাকে নয়,—তোমাব স্বর্গত পিতামাতাকেও নিচ্ছে এক হাত।' কলবিমিটারেব পাশ থেকে বেশ বসিয়ে বসিয়ে বললেন চবণবাবু।

ওদেব কথার জবাব না দিয়ে নিজেব ডেস্কে ফিবে কাজে মন দিতে চেষ্টা কবলাম।

ছুটিব কিছু আগে সেন এসে জিজ্ঞাসা কবল, 'এই মুখার্জি, ছুটির পব কোনও কাজ আছে নাকি বে তোব ?'

বাঁ হাতে ব্যােবেটেব চাবি আব ডান হাতে স্টাবিং বড নিযে খুব ব্যস্ত ছিলাম। বললাম, 'না, কাজ আব কি। বাস্তায ঘুরব-টুবব।'

'ঘুববি মানে তো ভিক্টোবিযা মেমোবিযাল কিংবা ইডেনে গিযে কপোত-কপোতীব কূজন শুনবি আব দীর্ঘশ্বাস ফেলবি। দূব শালা, ও সব দেখে শুধু মন খাবাপ কবা। এত কসবৎ কবলাম মাইবি, কিন্তু মাগী পাত্তা দিল না।'

হাসলাম। বললাম, 'কসবৎ চালিযে যা, চেষ্টায কি না হয।'

সেন বিবক্তির সঙ্গে হাত-ঝাডা দিয়ে আমাব কথাটাকে উডিযে দিল। 'দূব। বাখ তোর ওসব ছেঁদো কথা। আসলে, বুঝলি—' কি ভেবে সেন কথা অসমাপ্ত বেখে অন্য কথা পাডল, 'তাব চেযে চল বসুশ্রীতে একটা হিন্দি ছবি হচ্ছে, ওটা দেখে আসি। যা একখানা বেদিং সিন আছে না, মাথা একেবাবে ঘুবে যাবে।'

সিনেমা হাউস থেকে বেবিযে বললাম, 'চলি।'

সেন খেঁকিযে উঠল, 'চলি। চলি কি বে। এই সন্ধ্যে বাত্তিবে যাবি কোথায ? ষাঁড পুষেছিস নাকি ?'

'কোথায আব যাব ?—মেসে।'

সেন বিচিত্র মুখভঙ্গি কবে বলল, 'মেসে তোব জন্যে বৈজযন্তীমালা অপেক্ষা কবে আছে নাকি ?'

ওব বলাব ধবনে হেসে ফেললাম, বললাম, 'কোথায যেতে চাস্ তুই ?'

ও আমাব হাত ধবে টানল, 'চল্, গডিযাহাটেব মোডে যাই, বিনিপযসায ফ্যাশন প্যাবেড দেখা যাবে।'

গডিযাহাটে দাঁডিযে সেনেব সঙ্গে প্রায ঘণ্টা দেডেক ধবে বিচিত্রবেশা যুবতীদেব পোশাকেব ফাঁক দিযে উঁকিঝুঁকি মাবা দেহেব স্বাদ নিলাম চোখ দিযে, শবীবেব গন্ধ নিলাম নাক দিযে।

রাস্তাব ভিড কমলে আমবা একটা বেস্তোবাঁয ঢুকে কফি খেলাম। সেন হাই তুলে জিগ্গেস কবল, 'তুই এখন মেসে ফিবে যাবি নাকি ?'

বললাম, 'হ্যাঁ, বড ঘুম পাচ্ছে।'

চোখ মট্‌কে সেন বলল, 'ঘুম না ছাই। আসলে এইসব দেখে গবম হযে গিযেছিস, বিছানায গিযে একা হতে চাস্।'

'চলি বে, আবাব কাল ল্যাবোবেটবিতে—'

সেনেব কাছ থেকে বিদায নিযে বাসে উঠলাম।

ঘব। এই আমাব ঘব। তক্তপোশেব উপব অর্ধ-মযলা বিছানা। সকালেব খববেব কাগজেব কযেকটি পাতা মেঝেব উপব, কযেকটি বিছানায ছডানো। টেবিলেব উপব কযেকখানা ফিল্ম ম্যাগাজিন, কাঠেব ব্যাকে কিছু বই। প্রায সবগুলিই বিদেশী ক্রাইম সিবিজেব। টেবিলেব উপব প্রফুল্ল বাতেব খাবাব ঢেকে বেখে গেছে।

বড ক্লান্তি বোধ কবছিলাম। বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুযে এসে খাওযাব ব্যাপারটা চুকিযে ফেললাম। মেঝে থেকে সকালেব খববেব কাগজের পাতাগুলি গুছিযে নিযে বেশ আবাম কবে বিছানায বসা গেল।

আজ মামলাব খববগুলি বড পান্‌সে। তেমন কোন—মানে, বেশ বসালো কিছু নেই। 'জনৈকা তরুণীব প্রতি অশালীন আচবণেব জন্য পার্ক স্ট্রীটেব মোডে দু'জন যুবক গ্রেপ্তাব।' শালা।· 'বেকাব যুবকের আত্মহত্যা।' দূব, এটা একটা খবব নাকি ? মানুষ কুকুরকে কামডালে 'সুন্দবী চিত্রাভিনেত্রীব সহিত প্রখ্যাত চিত্রাভিনেতাব বিবাহ। কনেব বযস ছাব্বিশ, ববেব চুযাল্লিশ,' মাইবি। চুক্ চুক্।· 'তরুণ কবি সম্মেলন।' পাগল ভাল কব মা। ঘুম পাচ্ছে।

শালা! থাপ্পডটা গালে জ্বালা ধবিযে দিল। মশা পলাতক। বালিশে মুখ গুঁজে উপুড হযে শুলাম। উদবস্থ খাদ্যবস্তু গোলমাল শুরু কবেছে। গবব গবব, যেন এবোপ্লেন চলছে পেটেব মধ্যে।

ঘবেব কোণে গিযে কফি তৈবিতে মনোনিবেশ কবলাম। একদিন মাবব পেপাব-ওযেট ছুঁডে চ্যাটার্জিটাব মাথায। সেনটা একটা লম্পট। মেযেছেলে দেখলে মাথা খাবাপ হযে যায শালাব।. কোন্‌দিন ধোলাই খাবে।·· চবণ

-ব্যাটাকে আব সিগাবেট দেব না। চ্যাটার্জিব ঘব থেকে বেবিয়ে এলে ব্যাটা আমাকে ঠাট্টা কবছিল। বেযাবাটাব বড বাড বেডেছে। জল ফুটছে।

কফিতে চুমুক দিযে ফিল্ম ম্যাগাজিনেব পাতা উল্টোলাম।

ফিল্মে সেন্সাব হয, ফিল্ম ম্যাগাজিনেব হয না? একেকটা ছবিব মধ্যে কত মেগাটনেব বিস্ফোবকই যে ভবা আছে! বাপ্‌স! দেশটা একেবাবে জাহান্নামে গেল। বাবাব চিঠি এসেছে, সামনেব মাসে কিছু বেশি টাকা পাঠাতে হবে। মা-ব শবীব—

ইস্‌, সিগাবেটটা কখন যে শেষ হযেছে, বুঝতে পাবি নি। আঙুলটাতে জ্বালা কবছে। বিছানাব চাদবটাতেও কালো পোডা দাগ ধবে গেল।

আলো নিভিযে শয্যাশাযী হলাম।

বেযাবাটা নিশ্চয চ্যাটার্জি সাহেবেব কথাগুলো, মানে গালাগালিগুলো শুনতে পেযেছে। ও কি 'ডার্টি ক্রিচাব' শব্দ দুটিব অর্থ বুঝতে পেবেছে? ডিপার্টমেন্টেব লোকগুলো সব শালা খচ্চব। বেযাবাটাব কাছ থেকে চ্যাটার্জি সাহেবেব খাস কামবাব খবব সংগ্রহ কবে।'—দুৎ তেবি।

আলো জেলে কেট্‌লিতে জল নিযে হিটাবে চাপালাম।

কফিব কাপ, সিগাবেট, বিছানায সিগাবেটেব ছাই, ফিল্ম ম্যাগাজিন, বিদেশী থ্রিলাব, হাবামজাদা চ্যাটার্জি, অ্যাসিড ফিউম্‌স, নাইট্রাস অক্সাইডে ফুসফুস জখম, বাবাব চিঠি, সামনেব মাসে বাডিতে বেশি টাকা, গডিযাহাটেব মেযেবা · আব এক কাপ কফি। আবাব কফিব কাপ, সিগাবেট, বিছানায সিগাবেটেব ছাই

টিফিনেব সময ক্যান্টিনেব কোণে বসে চা খাচ্ছিলেন চবণবাবু। চেযাব টেনে তাঁব সামনে গিযে বসলাম।

'খবব বলুন, চবণবাবু। আজ সাবাদিন আব নিশ্বাস ফেলাব পর্যন্ত ফুবসৎ কবে উঠতে পাবি নি,' সহাস্য মুখে বললাম।

ঘাড বাঁকিযে ধাবালো দৃষ্টি দিযে বেশ কিছুক্ষণ ধবে আমাকে জবিপ কবলেন চবণবাবু, তাবপব দাঁত চেপে বললেন, 'শালা, মজা মাবতে এসেছ?'

অবাক হযে বললাম, 'কি ব্যাপাব বলুন তো, এমন বেগে যাচ্ছেন কেন?'

'কি ব্যাপার, না ? কি ব্যাপাব ! ভাগো হিঁযাসে,' উত্তেজনায দাঁড়িযে পড়লেন চবণবাবু।

মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পাবছিলাম না। দেখি, সেন আবেক টেবিল থেকে হাতছানি দিযে ডাকছে। সেনেব দিকে পিছন ফিবে থাকাব দরুন, ওব ক্রিযাকলাপ চবণবাবুব দৃষ্টিগোচব হল না।

চবণবাবুব টেবিল ছেড়ে সেনের টেবিলে গিযে বসলাম। সেন ফিস্‌ফিসিযে জিজ্ঞাসা কবল, 'তোকে কী বলছিল বে, বুড়ো ?'

'কি যে বলল ছাই। কিছুই বুঝতে পাবলাম না, জিজ্ঞাসা কবলাম খবব কি, আর তাতে চটে গেল।'

'তুই শালা কাটা ঘাযে নুনের ছিটে দিযেছিস্, তা চটবে না।'

'কেন, কী হযেছে ?'

'আজ চ্যাটার্জী সাহেব নিযেছে এক হাত বুড়োকে,' চবণবাবুব দিকে আড়চোখে তাকিযে বলল সেন।

হাসলাম, 'এই ব্যাপাব, এ তো নিত্যনৈমিত্তিক, চবণবাবুব তো বিটাযাব কবার সময হযে এল, শুনছেন তো এসব সাবাজীবন ধবে তবে আবার নতুন করে আজ মন-টন খাবাপ হওয়া, মানে ক্ষোভ হওযাব কী আছে ?'

'আবে না, চ্যাটার্জী আজ বুড়োব বাপ-চৌদ্দপুরুষ ধুবে দিযেছে।'—খিক্‌খিক্ কবে হেসে উঠল সেন।

আমিও ওব হাসিতে যোগ দিলাম।

টিফিনেব পব ফিউম চেম্বাবে হাইড্রোক্লোবিক অ্যাসিডে ডাইজেস্ট কবছিলাম একটা আযবন ওবেব স্যাম্পেল, চবণবাবু এসে বললেন, 'কি, খুব ব্যস্ত নাকি ?'

বললাম, 'হ্যাঁ, আগামীকালেব মধ্যে ওটাব বিপোর্ট দিতে হবে। আজকেব মধ্যে অন্তত আযবনটা সেপাবেট কবে যাব।'

'আচ্ছা বলতে পাব, বৈঠকখানা বাজাবে ইলিশেব কেমন আমদানি হচ্ছে ?' গুরুতব কিছু নিযে আলোচনা কবাব ভঙ্গিতে বললেন চবণবাবু।

গ্যাস্ বার্ণাবেব ফ্লেম কমাতে কমাতে বললাম, 'আমি তো মেসে থাকি, ইলিশেব আমদানিব কথা জানব কি করে ?'

'তা বটে।' চবণবাবু হাত বাড়ালেন, 'দাও দেখি একটা সিগাবেট।'

বার্ণাব থেকে সিগাবেট ধবিযে চবণবাবু খেদোক্তি কবলেন, 'বুঝলে,

ইলিশেব স্বাদ প্রায ভুলেই গিযেছি। ভাবছি, আজ শিযালদা বাজার থেকে ভুগ্‌গা বলে একটা কিনেই ফেলব। ছেলেমেযেবা প্রাযই বলে, গিন্নিবও আবাব একটু ইযে—বুঝলে না।'

আমাব তবফ থেকে বিশেষ কোনও উৎসাহ না পেযে চবণবাবু বললেন, 'চলি, কাজ কব তুমি।'

ফ্লেম সবিযে নিযে বিকাবটাকে ঠাণ্ডা হতে দিলাম। সেন এল।

'এই, মিস্ তালুকদাব চ্যাটার্জীব চেম্বাবে ঢুকল।' গলাব স্বব নামিযে বলল সেন।

'জমবে।'

'হলিউডেব লাভ সীন।'

সেনেব মুখে পিচ্ছিল স্যাঁতসেঁতে হাসি খেলা কবছিল। নিজেব মুখ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না।

সিলিণ্ডাবে মেপে পঁচিশ সিসি হাইড্রোক্লোবিক অ্যাসিড ঢাললাম বিকাবে, বিকাবটাকে স্ট্যাণ্ডে বসিযে নিচে বার্ণাব ঠেলে দিলাম।

সেন বলল, 'চ্যাটার্জিব ঘব থেকে যখন মিস্ তালুকদাব বেবিযে আসবে, দেখিস লক্ষ কবে, দেখবি মুখটা ফোলা-ফোলা, গাযেব কাপড আলুথালু। শুনেছি ডিক্‌টেশনেব নাম কবে বাডিতেও নাকি ডেকে পাঠায মাঝে মাঝে, তাও আবাব সন্ধ্যেব পব।' শেযালেব মত খ্যাঁক খ্যাঁক্ কবে হাসল সেন।

একটু পবেই মিস্ তালুকদাব চ্যাটার্জি সাহেবেব ঘব থেকে বেবিযে এলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ কবেও আমি তাঁব মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই দেখতে পেলাম না, বেশবাসও বেশ সুসংবৃতই মনে হল।

আমাদেব সামনে দিযে যাওযাব সময মিস্ তালুকদাব একটু হেসে বললেন, 'ভাল আছেন তো?' আমিও হেসে মাথা নাডলাম, সেন পা দিযে আমাব পাযে চাপ দিল।

'দেখলি?' মিস্ তালুকদাব চলে যেতেই বলে উঠল সেন।

'ভাগ্, তোব যত সব—'

'মাইবি বলছি। এই তোব গা ছুঁযে বলছি' সেন আমা্ব বুকে হাত ছোঁযাল।

এমন সময চ্যাটার্জি সাহেবের বেযাবা বিজয এসে দাঁডাল।

'সেনবাবু, সাহেবের তলব পড়েছে।'

মুহূর্তে সেনকে কুঁকড়ে যেতে দেখলাম। বিজয়কে ফিশফিশ করে জিজ্ঞাসা করল, 'ঘরে আর কে আছে?'

বিজয় হাই তুলল, 'দুজন কেমিক্যাল সাপ্লাইয়ার।'

সেন আমার দিকে একবার তাকিয়ে বিজয়ের সঙ্গে চ্যাটার্জি সাহেবের ঘরের দিকে চলে গেল।

একটু পরেই বিজয় ফিরে এসে বলল, 'আরে বাপ্‌স্‌! সেনবাবুর উপর আজ যা ঝাড়ছে না সাহেব!' ওর সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়তে দেখলাম।

চরণবাবু তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন। 'তুমি কিছু শুনলে নাকি বিজয়? সাহেব কী বলছেন?'

বিজয় হাত নেড়ে বলল, 'সেসব বাবু অনেক কিছু ইংরেজিতে। তবে ইডিয়েট, ইস্টুপিড্ এসব বেশ বুঝতে পারলাম।'

চরণবাবুকে বেশ পুলকিত মনে হল। বিজয়কে ঠেলা দিলেন, 'যাও যাও, তুমি একটু ভাল করে শুনে এসো তো।'

বিজয় চলে যাওয়ার একটু পরেই সেন বেরিয়ে এল চ্যাটার্জি সাহেবের ঘর থেকে মাথা নিচু করে, থম্‌থম্ করছিল ওর মুখ।

চরণবাবু সেনকে দেখে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়ে চোখ টিপে হাসলেন।

আমার চোখে চোখ পড়তে সেন এগিয়ে এসে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল। 'দিলাম ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করে। যেই শালা চেঁচিয়ে উঠেছে, বললাম, "বিহেভ প্রপারলি।" ব্যস্, একেবারে টাইট, আমার প্রেস্টিজের কাছে বাবা চাকরি টাকরি কিছু নয়, ওরকম ঢের ঢের চ্যাটার্জি সাহেব দেখা আছে।'

চরণবাবু আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে আমার পেটে একটা খোঁচা মেরে সেনের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'বাহাদুর ছেলে বটে তুমি। একবারে ঠাণ্ডা বানিয়ে দিলে সাহেবকে। বিজয়ও সেই রকম বলছিল।'

আমি ও চরণবাবু দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলাম। সেন দারুণ রেগে গেল। গায়ের উপর থেকে চরণবাবুর হাত ঠেলে দিয়ে বলে উঠল, 'আমার

কথা বিশ্বাস হচ্ছে না, না? সবাইকে যে নিজেদেব মত স্পাইনলেস্ ভাবেন। আমি তো আব—'

সেনেব কথাব মাঝখানে বিজয এসে দাঁড়াল, 'মুখার্জিবাবু চলুন। আপনাব ডাক পড়েছে এবাব।'

মুহূর্তেব মধ্যে সেনেব মুখে হাসি ফুটে উঠল। লক্ষ কবলাম চবণবাবু এবং সেনেব মধ্যে অর্থপূর্ণ হাসি ও দৃষ্টি বিনিময হল।

চ্যাটার্জি সাহেবেব ঘবেব দিকে আমি পা বাড়ালাম।

ছুটিব পব সেন, প্রকাশবাবু এবং আমি একসঙ্গে ল্যাবোবেটবি থেকে-বেবোলাম। বাস্তায এসেই প্রকাশবাবু বাস পেযে গেলেন।

সেন জিজ্ঞাসা কবল, 'তুই কোথায যাবি?'

বললাম, 'বিডন স্ট্রীটে।'

'ওখানে কেন?'

'একজনেব সঙ্গে দেখা কবতে।'

সেন চোখ কুঁচকে হাসল। 'কি বে, ব্যাপাব কী? তুইও শেষ পর্যন্ত জুটিযে ফেললি নাকি একটা?

হাসলাম, 'না বে, সে সব কিছু নয, এমনি এক পবিচিত ভদ্রলোকেব সঙ্গে-দেখা কবতে যাব।'

'বাড়িতে মেযে আছে নিশ্চয?'

'বাড়িতে নয, যাব চেম্বাবে। ভদ্রলোক একজন ডাক্তাব।'

'ও।' সেন সিগাবেট ধবাল। 'শালা চ্যাটার্জিটা একটা জাত হাবামি।'

'হাবামিব বাচ্চা।'

'ব্যাটা খান্‌কিব ছেলে।'

'কুকুবেব ঔবসজাত।'

'দেব একদিন মুখে এ্যাসিড ঢেলে।'

'তোব বাস এসে গেছে।'

'আচ্ছা, চলি বে।' সেন বাসেব হ্যাণ্ডেল ধবে ঝুলে পড়ল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা কবতে হল না, আমাব বাসও এসে গেল। ডাক্তাবেব চেম্বাবেব বাইবে অনেক লোক অপেক্ষা কবছিল। আমি অনিরুদ্ধ চৌধুবীব-

চিঠিটা বেয়ারার হাত দিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। একটু পরে আমার ডাক পড়ল।

প্যাডের উপর কিছু লিখছিলেন ডাক্তারবাবু। আমাকে সামনের চেয়ারটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলেন, বসলাম। লেখা শেষ করে বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে কাগজটা দিয়ে বললেন, 'বাইরে গিয়ে মহীতোষ ঘোষ যার নাম, প্রেসক্রুপশনটা তাঁকে দেবে।' বেয়ারা কাগজটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমার দিকে তাকালেন ডাক্তারবাবু।

'অনিরুদ্ধর কাছ থেকে আসছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'অনিরুদ্ধ কে হয় আপনার?'

'কেউ না, পরিচিত। উনি আমাকে খুব স্নেহ করেন।'

'হুঁ, কী হয়েছে আপনার?'

'রাতে ঘুম হয় না।'

'ঘুমের ওষুধ খেয়ে দেখেছেন?'

'বিশেষ ফল হয় নি, আরও অনেক কিছু করে দেখেছি—অনিরুদ্ধদা বললেন কোনও সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কন্সাল্ট করতে। উনিই আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন।'

'স্বপ্ন-টপ্ন দেখেন?'

'ঘুমই হয় না, তা স্বপ্ন দেখব কি করে? ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলাম যেদিন, সেইদিন, ঠিক ঘুম নয়, কেমন একধরনের নেশা মতো হয়েছিল, তখন দেখেছিলাম।'

'কী দেখেছিলেন?'

'দেখেছিলাম যে, আমি একটা কেঁচো হয়ে গিয়েছি।'

'কেঁচো!' ডাক্তারবাবুর কপালে কুঞ্চন পড়ল, 'স্ট্রেঞ্জ। বিয়ে করেছেন?'

'আজ্ঞে না।'

'ডোণ্ট মাইণ্ড, কোনও ব্যর্থ প্রেম-ট্রেম বা কোনও মেয়ের দ্বারা প্রবঞ্চিত হওয়া কিংবা তাকে প্রবঞ্চনা করা—'

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, 'না না, সে সব কিছু না, বরং ··বরং আমার মনে হয় পেটের গণ্ডগোলের জন্যেই বোধহয় এরকম হচ্ছে।'

'হতে পারে। তবে পেটের গোলমালের মূলেও তো মানসিক গোলমাল। শুয়ে পড়ুন তো ঐ বেডটায়।'

আমি শুয়ে পড়তে ঘরের উজ্জ্বল আলোটা নিভিয়ে দিয়ে অন্য একটা আলোর স্যুইচ্ টিপে দিলেন ডাক্তারবাবু। ঠিক আলো নয়, যেন নীল অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল ঘরটাতে। ডাক্তারবাবুর নির্দেশমত চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকলাম। উনি আমাকে ঘুমপাড়ানি সুরে অবিশ্রান্তভাবে প্রশ্ন করে চললেন, কোনও কিছু না ভেবেই যা মনে আসছিল আমি বলে যাচ্ছিলাম।

বোধহয় বেশ কিছুক্ষণ ধরে এই জেরার পালা চলেছিল। এক সময় ঘরের স্বাভাবিক আলোটা জ্বলে উঠল। মনে হল যেন একযুগ পার হয়ে এলাম। বেড ছেড়ে চেয়ারে গিয়ে বসলাম।

প্রেসক্রপশন লিখে আমার হাতে দিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'ওষুধ দিলাম, তবে এতে স্থায়ী কোনও ফল পাবেন না। টেম্পোরারি একটু রিলিফ পাবেন অবশ্য। আপনার আসলে দরকার'—মৃদু হাসলেন ডাক্তারবাবু—'একটি বিয়ে করা।'

ঘরে ঢুকে আলো জাললাম। বাথরুমে যেতে ইচ্ছে করল না। চেয়ার টেনে খাবারের সামনে বসে গেলাম।

খাওয়ার পর শুতে গিয়ে বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে আমার গা শিরশির করতে লাগল। আমি জানি, বিছানায় শুয়ে শুধু আমাকে এপাশ-ওপাশ করতে হবে, ঘুম আসবে না। বারবার উঠব, কফি তৈরি করব, সিগারেট ধরাব, ক্রাইম নভেলের পাতা উল্টাব, ফিল্ম ম্যাগাজিনের উত্তেজক ছবি দেখব আমার ঘুম আসবে না। পেটের মধ্যে অস্বস্তি হবে, মাথা ভার ভার লাগবে, চোখ জ্বালা করবে, আলো জ্বালব, নেভাব, বসব, শোব, আবার বসব, আবার শোব, ঘুমকে ধরার জন্য মরিয়া হয়ে উঠব··আমার ঘুম হবে না।

আমি, আমি হয়তো আর কিছুদিন পরে পাগল হয়ে যাব। দীর্ঘদিন ধরে না ঘুমোলে মানুষ তো তাই হয়।

ঈশ্বর, আমাকে একটু ঘুম দাও। ঘুমের জন্যে আমি যে কোনও মূল্য দিতে রাজি।

বিছানাটাকে আমাব একটা পাইথনেব মত মনে হচ্ছিল, সমস্ত বাত ধবে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জডিযে ধবে শুষে খাবে।

আমি পালাতে পাবি না। এই মাঝবাতে কোথায যাব আমি ? অতএব এই ঘবেব মধ্যে বক্তচোষা বিছানাটাব সাথী হযে আমাকে বাত কাটাতে হবে।

এই অন্তহীন বাত্রিতে আমাব—আমাব ভযঙ্কব, বীভৎস একটা কিছু কবতে ইচ্ছে কবছে।

হা ঈশ্বব, আমাকে একটু, অল্প একটু ঘুম দাও···একটু ঘুম দাও কযেক ঘণ্টাব জন্য আমাকে বাঁচতে দাও।

আমি দেখতে পেলাম, ওদেব চোখে ব্যঙ্গেব হাসি পিক্ পিক্ কবছে। প্রকাশবাবু সমীবেব কানে কানে কি যেন বললেন। বিজযেব পানেব ছোপধবা দাঁতগুলো কালো ঠোঁটেব উপব বক্তমাখা পোকাব মতো দেখাচ্ছে।

আমি চ্যাটার্জি সাহেবেব ঘবে ঢুকলাম।

সেই পবিচিত ঘব, হিমশীতল নৈঃশব্দ্য, চ্যাটার্জি সাহেবেব শবীব অবশ কবা দৃষ্টি। টেবিলেব উপব পেন্সিল দিযে মৃদু মৃদু আঘাত কবছিলেন চ্যাটার্জি সাহেব।

বেশ পবিষ্কাব ধীব কণ্ঠে বললেন, 'তোমাব মাথায কী আছে ? গোবব ?'

মাথা নিচু কবে জামাব বোতাম খুঁটতে লাগলাম। চ্যাটার্জি সাহেবেব মুখোমুখি চেযাবে বসে থাকা ভদ্রলোক, মনে হল, অস্বস্তিতে উশ্‌খুশ কবে উঠলেন।

আবাব চ্যাটার্জি সাহেবেব ঠাণ্ডা গলা শুনতে পেলাম, 'ডিপার্টমেণ্টে আমি কি কতকগুলো গরু-ছাগল পুষছি ?'

আমাব মুখেব ভিতবটা শুকিযে আসছিল। নাভিমূলে অদ্ভুত এক ধবনেব কম্পন অনুভব কবলাম। বলতে চেষ্টা কবলাম, 'স্যাব, আমি ঠিক—'

'শাট্ আপ।' হুঙ্কাব দিযে উঠলেন চ্যাটার্জি সাহেব। তাঁব গলাব স্বব উচ্চগ্রামে উঠল, 'কাজ কবতে ইচ্ছে না কবলে চলে গেলেই পাব, যোগ্যতা তো তোমাদেব ঘাস কাটাব। যতসব স্কাউণ্ড্রেল এসে জুটেছে এখানে, লাথি মেবে দূব—।'

'গালাগালি দেবেন না, স্যাব।' আমাব গলাব ভিতব থেকে যেন অন্য কেউ কথা বলে উঠল।

চ্যাটার্জি সাহেব থমকে গেলেন। আমাব চোখ সাহেবেব চোখেব উপব স্থিব হয়ে থাকল। আমাব ইচ্ছে কবছিল চোখ নামিযে নিতে, কিন্তু পাবছিলাম না। কে যেন কিছুতেই আমাব ঘাডটাকে নিচু কবতে দিল না।

চ্যাটার্জি সাহেব উঠে এসে আমাব মুখোমুখি দাঁডালেন। হঠাৎ খপ্ কবে আমাব কলাব চেপে ধবে চিৎকাব কবে উঠলেন, 'ইযু সোযাইন, সান অব এ বিচ্—'

দেখলাম, চকিতে আমাব ডান হাতটা সবেগে চ্যাটার্জি সাহেবেব গালে গিযে পডল। আমাকে ছেডে দিযে ছিট্‌কে পডলেন তিনি।

ঘটনাব আকস্মিকতায আমি বিমূঢ় হযে গিযেছিলাম, আমাব হাতেব তালু জ্বালা কবছিল, অত্যন্ত শান্ত নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে ঘব ছেডে বেবিযে এলাম। চ্যাটার্জি বা আব কেউ আমাকে বাধা দিল না।

ট্যাক্সি কবে বাত বাবোটাব সময মেসে ফিবলাম। টেবিলে খাবাব ঢাকা দেওযা, বিছানায খববেব কাগজ, বই, চিঠি ছডানো। হাত দিযে সেগুলিকে মেঝেয ঠেলে দিলাম।

নোংবা বিছানাব উপব শবীব ছেডে দিযে পা থেকে জুতো দুটো টেনে নিযে ছুঁডে দিলাম ঘবেব কোণে, তাবপব—তাবপব উষ্ণ নবম ঘুমেব মধ্যে আমি তলিযে গেলাম।

'ডোরাকাটার অভিসার' স্থানাভাবে এবার গেল না। আগামী সংখ্যা থেকে আবার নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

বৃষ্টিতে

মানস রায়চৌধুরী

বৃষ্টিতে সারা শহরের চেহারা এমন পাল্টিয়ে যায়।
বিরহের লেজের ঝাপটে মাঝে মাঝেই আমার শরীর
বিপর্যস্ত হতে থাকে। আর তার মধ্যে এই অসময়ের বৃষ্টি
পিওন আসে না কতকাল। গোয়ালার দুধে জলের ঔদার্য থেকে
মুক্তির উপায় মনে ভাবি।
চা-এ, সিগারেটে ক্রমাগত বৈরিতার আপাত-মলিন ছবিগুলি আর
বিরহের লেজের ঝাপট।
নানাভাবে আমার দিনের পতন ঘটে, এইমাত্র একত্রিশেই।
রৌদ্রাভাব, সম্পর্করহিত সব বিষয়ের আনাগোনা মাথার ভিতরে—
হায় স্নেহ। তুমি আহার্যে, কাঁধের স্থৈর্যে, সান্ধ্য টেবিলের
পানীয়ে, পিরিচে করো গান।

কিছু উদ্ভাবন করে নশ্বরতা কমাতে চাইনি প্রাণপণে।
শুধু বেঁচে থাকতে থাকতে শূন্যতার বিপুল মুখগহ্বরের মধ্যে
উৎসর্গ করি নি নিজেকে, আছি একই ভাবে
বৃষ্টিতে চিহ্নল এই শহরের ট্র্যাফিকের পাশে পাশে
কোলাহলে, পুজোর ছুটির লগ্নে, অর্থহীন বিরহের
লেজের ঝাপট নিয়ে—
কী ভীষণ পালটে যায় শহরের মুখ, এই শরীরটরীর
এই বিবর্তিত মানসিকতার ছায়া কতদূর প্রসারিত হতে হতে
হঠাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ঝড়ের দিনে

রমা অধিকারী

একটি বিদেশী পত্রিকাব মলাটে দেখলাম
বৃষ্টিতে ছাতাব তলে দাঁডিযে
কোনো এক সুন্দবী মুচকি হাসছে।
ছবিটা ভাল লাগল।
সকাল থেকে বৃষ্টি পডছে
টিপ্ টিপ্ ··
টিপ্ টিপ্ টিপ্ · ·
পডছে তো পডছেই,
ঝোডো হাওযাব সঙ্গে পাল্লা দিযে
ও যেন গান গাইছে—
'এস ভাই পাঞ্জা লডি, দেখি কাব জোর বেশি।'
পোডো বাডিটাব আনাচে-কানাচে নাবকেল গাছগুলো
লকলকে ছডিব মত—
ডান থেকে বাঁ দিকে, বাঁ থেকে ডানদিকে
হেলছে আব দুলছে,
ওদেব মাথাভর্তি ঝাঁকডা চুল
পাগলা হাওযায এলোমেলো।
কালো মেঘ মুডি দিযে সময পালাচ্ছে।
দশটাব ডিউটি
বেবোতেই হবে।
ছাতাটা খুলে দেখি একটা শিক ভাঙা
কাপডটা পতপত কবে উডছে
কালো নিশানেব মত—
বিশ্রী।
ছাতাব কাপড আব শিকেব সঙ্গে
কোনবকমে আপোষ ঘটিযে
অগণিত জনতাব সমুদ্রে
ঝাঁপ দিলাম।

কি জ্বালা।
এ বৃষ্টি কি থামবে না,
দেখা দেবে না ঝকঝকে নীলাকাশ
সকালের সূর্যকে বুকে নিয়ে ?
ছাতা-আছে, ছাতা-নেই
এমন বহুলোকের ভিড়ে
একটা ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে
কাঁদছে তো কাঁদছেই।
বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ ওকে দেখলাম।
ওর রুক্ষ অগোছালো চুল বেয়ে
ছেঁড়া শার্ট ময়লা প্যান্ট বেয়ে
চুঁইয়ে চুঁইয়ে-জল পড়ছে সহস্র ধারায়
ঠিক যেন গায়ে মাথায় সাবানের বিজ্ঞাপন।
বারবার শার্টের হাতায় ও মুখ মুছছে
তাতে ভেজা মুখ আরও ভিজে যাচ্ছে
চোখের জল মিশে যাচ্ছে
আকাশের জলের সঙ্গে।
কেউ ওকে দেখছে না, দিচ্ছে না আশ্রয়
বড় বড় গাড়িবারান্দার নীচেকার ভিড়।
বাস এল
আমি এগিয়ে গেলাম।
বাসের দিকে নয়, ছেলেটার দিকে।
কেউ উঠল, কেউ নামল,—বাস চলে গেল।
ছেলেটার মাথায় ছাতাটা ধরতেই
ও মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো।
আমি দেখলাম—
মেঘের আড়ালের ঝকঝকে সূর্যটা
সমস্ত নীলাকাশকে গুটিয়ে নিয়ে
সকলের চোখ এড়িয়ে
কখন টুপ করে ঢুকে পড়েছে
আমার ভাঙা ছাতাটার তলায়।

দেবেশ রায়

(শ্রাবণ সংখ্যাব পব)

এইটাই তো আমাব নিয়তি হয়ে দাঁড়ালো। পিতা নাকি নিজের ছায়ায় পুত্রকে দেখেন, যেমন ঈশ্বর নিজের প্রতিবিম্ব মানুষে। আর আমি জন্মের পর, জ্ঞান লাভের প্রথম মুহূর্ত থেকে নিজের সমস্ত জীবনের ছায়ায় গিরিজামোহনকে দেখেছি। আমার যে জীবন তৈরি-ই হয় নি, যে জীবনের সমস্ত সম্ভাবনাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, সেই জীবন সমস্ত সম্ভাবনার পরিণতি নিযে আমার সম্মুখে নিয়ত উপস্থিত—পিতা গিরিজামোহনের ব্যক্তিত্বে। গিরিজামোহন তো আমার পিতা-ই নন, আমি-ই যে গিরিজামোহন। তাই সেই জন্ম থেকেই গিরিজামোহন আমার কাছে আলাদা দেহ নয়, আলাদা মন নয়, আলাদা ব্যক্তিত্ব নয়, দেহে মনে আমি গিরিজামোহনের সঙ্গে এক। আব এইটাই তো আমার নিয়তি হয়ে দাঁড়ালো। গিরিজামোহনেব সঙ্গে এই ঐক্য বোধ কবতে পেরেছিলাম বলেই আমার অজ্ঞাত তাব অতীতকে প্রত্যক্ষ করতে পারলাম আমারই চিন্তায়, আমার অজ্ঞেয় তার ভবিষ্যৎকে দেখতে পেলাম আমারই ভাবনায়। গিরিজামোহন আমার শত্রু। নিজের শত্রুর সব কিছু জেনে ফেলতে পারায় কতো সুবিধা। আর সেই সব কিছুকে নিজেরই রক্তপ্রবাহে জেনে ফেলতে পারার কী অভিশাপ। আর গিরিজামোহন কতো নিশ্চিত ছিল। সে তো জানতো তার সঙ্গে আমি সোজাসুজি লডাইয়ে নামতে পারবো না। সে তো জানতো আমার ভেতরেই তার সঙ্গে আমাকে লডতে হচ্ছে। সে তো জানতো আমার ভেতরে থেকেই আমাকে সে সবচেয়ে জখম করতে পারবে। আর আমার ভেতরে, আমার রক্তে গিরিজামোহনকে আমি এতো যত্নে, এতো দীর্ঘদিন ধরে লালন করেছিলাম যে আমার নিজেরই ধারণা ছিল না সে কতো শক্তিশালী, কতো কঠিন।

নইলে, গিরিজামোহনের প্রতিমা তবেই তো আমার কাছে অর্থহীন, অথচ সে-প্রতিমাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে এতো দোষ। কেন সেই প্রতিমা ভাঙার শক্তি সংগ্রহ করতে অর্ধ-উন্মাদের মতো আমাকে নিজের ঘরেই বন্দীর জীবন কাটাতে হলো। কেন সেই প্রতিমাকে বাইরে থেকে আঘাতে ভেঙে দিয়েও ভেতরে ভেতরে আজও সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে পারি নি। কেন আজও গিরিজামোহনকে ভাবতে গেলে তাকে সেই পুরোনো শক্তির অনুষঙ্গেই ভেবে বসি। এই যে আজও আমি ভাবি গিরিজামোহন জানতো আমার ভেতরে যে গিরিজামোহনকে আমি বানিয়ে রেখেছি সে আসল গিরিজামোহনের চাইতে শক্ত হাতে আমার সঙ্গে লড়বে—এটা কি এতোদিনের অভিজ্ঞতার ফল? মোটেই না। গিরিজামোহনের যদি সেই কল্পনা শক্তি থাকতো, তবে শোয়ার ঘরে নিজের মিথ্যে শিকারী মূর্তি প্রতিষ্ঠা কি সে করতে পারতো? আজও, আজও, গিরিজামোহন থেকে এতোদূরে সরে এসেও, তাকে শক্তিমান ভাবার আত্মপ্রতারণা আমার গেল না। এইটাই তো আমার নিয়তি,—নিজের বানানো প্রতিমার কাছে নিজের আত্মসমর্পণ।

গাঁটকাটারও কিছু সাহস দরকার, পকেটমারের তো বটে-ই, গিরিজামোহনের সেটুকুও নেই। তার সমস্ত বীরত্ব শুধু স্বগতোক্তিতে। অপর যে-কোনো অধিকতর শক্তিমানের কাছে কেঁচো, এমন কাপুরুষ। আর এ-সব জানা সত্ত্বেও মনে মনে তার যে ব্যবহার পদ্ধতি কল্পনা করি তা ছিঁচকে চোরের নয়। হায় রে প্রতিমা নির্মাণের অভিশাপ। অথচ পৌরুষের অভিজ্ঞতাও তো আমার ছিল।

ছোটবেলায় মায়ের সঙ্গে মামাবাড়ি গেছি। তখনো গিরিজামোহন চাকরি করেন। পরে, গিরিজামোহনের আর কোনো ছেলেমেয়েই মামাবাড়ি যায় নি। গিরিজামোহন যে তাদের নিষেধ করতো তা নয়, তারাই যেতে চাইত না। আমি যখন মায়ের সঙ্গে যেতাম তখন তাঁর কোনো মৌন অসম্মতি থাকতো কিনা, জানি না। পরের অভিজ্ঞতা থেকে অনুমান করাও যায় না, কারণ গিরিজামোহনের চাকরি পর্বের মেজাজ মর্জি আমার জানা নেই। তবে মামাবাড়িতে সব সময় গিরিজামোহন সম্পর্কে একটা ভয় ও আশঙ্কা আমার অভিজ্ঞতাতেই। সেই সূত্রেই বোধহয় যে-আদর ও যত্ন আমাকে করা হতো তাতে স্বাভাবিকতার চাইতেও সতর্কতা ছিল। এমন কি আমার

দাদুর ক্ষেত্রেও। দাদু খুব একটা গল্প করতে পারতেন না। কিন্তু আমি যাবার পর থেকেই, যদি তখন বাড়ি থাকতেন, দাদু তাঁর রুটিন বদলে নিতেন। যেমন সকাল বেলায় আমাকে কোলে নিয়ে রোদে বসে থাকা। সত্যি তো, মামা বাড়ির সব স্মৃতিই আমার শীতের। গরমে কি কখনো মামা বাড়ি যাই নি? যতোক্ষণ পাড়ার আর-আর ছেলে-মেয়েরাও দুটি-একটি করে না জমতো, সত্যি তো, মামা বাড়ির পাড়ায় সবচেয়ে আগে রোদ আসতো আমাদের বাড়ির ক্যালভার্টে আর আমার বয়সীরা সেখানে এসে জমতো, ততোক্ষণ দাদুর কোলেই আমি বসে থাকতাম। আমি অন্য ছেলে-মেয়ের সঙ্গে খেলাধুলা করতাম। দাদু বসে থাকতেন। যখন খেলা আমার পছন্দ হতো না, দাদু অন্য ছেলে-মেয়েদের আমার পছন্দ মতো কোনো খেলা খেলানোর চেষ্টা করতেন। যদি ছেলে-মেয়েরা আমার পছন্দের খেলা না খেলতো, কোনোদিনও দাদু নিজে আমার সঙ্গে খেলবার চেষ্টা করেন নি। কোনো খেলায় তাঁকে আমি নিলে, যতোক্ষণ চাই, তিনি খেলে যেতেন। কিন্তু নিজে থেকে কোনো খেলায় লিপ্ত হতেন না। এখন ভাবি আমি বলেই কি দাদু এ রকম ব্যবহার করতেন—যেন কখনো ভ্রমক্রমেও আমার ইচ্ছা তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়। নাকি এটাই ছিল তাঁর ব্যবহার রীতি। সম্ভবত প্রথমটা সত্য। এবং দ্বিতীয়টা আরো সত্য।

মার কাছে গল্প শুনেছি, আমার একটা বয়স পর্যন্ত মা কেবল আমারই কাছে মামাবাড়ির গল্প করতেন, বৎসরের বেশির ভাগ সময়ই দাদু আর বড় দাদু বাইরে থাকতেন, কৃষিকাজ দেখতেন, জমি-জিরেত ছিল, সেখানে যেতেন। এবং যখন বাড়িতে থাকতেন, তখনো বাইরের কাছারি ঘর ছেড়ে ভেতরে থাকতেন না। দুই ভাই কাছারি ঘরে থাকতেন, যেন দুদিনের জন্য বেড়াতে এসেছেন। অথচ সবাইকে ব্যবহারের স্বাধীনতা দেবার এই যে রীতি তা নিজের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করার অধিকার তিনি ছাড়তেন না। নইলে যে-দাদার সঙ্গে সেই বাপ-মা-মরা শৈশব থেকে খেয়ে না-খেয়ে, সুখে-দুঃখে, একত্রে মৃত্যুর কাছাকাছি পর্যন্ত এসেছিলেন, তাকে কিনা নিজের সম্পত্তির সামান্যতম অংশের অধিকার দিতেও অস্বীকার করলেন। মা যখন সেইসব দিনের কথা বলতেন বড় দাদুর সঙ্গে দাদুর সম্পত্তির ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতেন, যেন তিনিও ওটা ঠিক বুঝতে পারেন না। যেন খানিকটা

অপছন্দও করেন। হায়রে জীবনের রসিকতা। গ্রেট স্থইণ্ডলার গিরিজা মোহনের স্ত্রীও অপছন্দ করেন যে তাঁর বাবা জ্যাঠাকে সম্পত্তির ভাগ দেন নি।

আমার যে মাঝে মাঝে মনে হয় যদি আমি মামাবাড়িতে দাত্বর কাছে থাকতে পেতাম, আমার জ্ঞান-গম্যি হওয়া পর্যন্ত তাঁকে দেখতে পেতাম তবে বুঝি বীর-পুরুষের প্রতিমাটা একটা সত্যিকারের বীর পুরুষকে-ই আশ্রয় দিতে পারতো—তা কি একমাত্র এই কারণেই যে, গল্প শোনার বয়সে মার কাছে দাত্বর গল্প-ই শুনেছি, ফলে আমার কাছে রূপকথার চরিত্রের সম্ভাবনা নিয়ে দাত্বর চরিত্র গড়ে উঠেছে। এবং যোগাযোগ কোনো সময়ই ঘনিষ্ঠ হয় নি এবং পরে অনিয়মিত যোগাযোগটাও মাত্র চিঠিপত্রের আরো অনিয়মিত স্থত্রে বাঁধা ছিল বলে রূপকথার সেই সম্ভাবনা কোনো সময়েই নষ্ট হয়ে যায় নি? কিন্তু মায়ের বলা গল্পে তো তাঁর বাবাকে খুব বীরপুরুষ হিশেবে দেখাবার চেষ্টা কোথাও ছিল না। তিনি শুধু বলতেন তাঁর বাবার চাষা-ভুষোর মতো চেহারার কথা, তাঁর বাবাকে দেখে বিয়ের রাতেই তাঁর মায়ের ভয় পাওয়ার কথা, তাঁর বাবা ও জ্যাঠা তুই ভাইয়ের মিলের কথা, কতোরকম তরি-তরকারি তাঁরা খেতেন তার কথা, তাঁর মা-জ্যাঠাইমার সংসারের কথা, তাঁদের বাড়িতে আসতো যে-সব প্রজা তাদের কথা, তাঁর মা-জ্যাঠাইমার মুখ থেকে শেখা নানারকম ছড়া—ব্রতকথা, কোন্ মাসে বৃষ্টি হলে চাষের কী হয় সেই কথা, আর অনেক-অনেক বেশি করে বলতেন তাঁর মায়ের রূপের কথা, তাঁর বাবার খারাপ চেহারার কথা আর তাঁদের আশ্চর্য স্থখী দাম্পত্য জীবনের কথা। এর মধ্যে বীরত্বের তো কোনো ব্যাপার নেই। আর এ গল্প বলা হতো ভবিষ্যতের শিল্পপতি গিরিজা মোহনের, এমন কি শিল্পপতি-হয়ে-গেছে গিরিজামোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের কাছে—গিরিজা মোহনের ভাব-সাব দেখলে যে পুত্রের নামের পাশেমাত্র Jr. লিখেই পার্থক্য নির্দেশ করার ইচ্ছে জাগে, শিল্পপতির ঐতিহ্য রক্ষায় সে-পুত্রের সম্ভাবনা এমনই উজ্জল। অর্থাৎ যে পরিবেশে দাত্বর গল্প মা আমাকে শুনিয়েছেন তাতে বড় জোর দাত্বকে একটা চাষা-ভুষো গোছের কিছু সামান্য টাকাওয়ালা লোক ভাবাই স্বাভাবিক। মনে নেই, আমি তাই ভাবতাম কিনা। যদি ভাবতাম তবে চাষা-ভুষো দাত্বর মধ্যে রূপকথার নায়ক হবার সম্ভাবনা

কখন এলো। কবে চাষাভুষোর প্রতিমা ভেঙে গেল। না প্রতিমাভঙ্গের অভিজ্ঞতা আমার একটি-ই মাত্র। যদি জানতাম-ই প্রতিমা ভাঙে, তবে তো ভাঙাটাকে খেলা ভেবেই মাততে পারতাম। তবে কি মা নিজের বাবা সম্পর্কে বলতেন বলেই তাঁকে শুধু চাষা ভূষোই বোঝাতেন না, বোঝাতেন তাঁর ব্যবহার কী-রকম, ভাইয়ের সঙ্গে, বউয়ের সঙ্গে, তিনি মানুষ কী-রকম। আর এই একটা মানুষ যে নিজে মরিচের মতো কালো হয়েও হাতির দাঁতের মতো ফর্সা বউকে ডাকতো হলুদ পাখি বলে, যে বিয়ের রাতে বরের চেহারা দেখে ভয় পাওয়া কচি বউকে পালিয়ে যেতে দেয়, যে সম্পত্তি আগলায় যক্ষের মতো—আমার মনে সব সময়ই ছিল। আর যে-মুহূর্তে বাবু গিরিজা মোহন ফটোগ্রাফার আর পেইন্টার আর কনট্রাকটর আর কোম্পানির দালালকে দিয়ে নিজের একটা উপকথা চাউড় করে দিয়েছে, ছবিতে-ছবিতে, মুখে-মুখে, পারলে গানে-গানে, নিজের নায়কত্ব জারি করে দিয়েছে, আর আমি সেই উপকথার নায়ককে আমার সম্মুখে চলতে ফিরতে দেখে ধন্য হয়েছি, তখন-ই গিরিজামোহনের—উপকথার সমান্তরালে আমার একান্ত মানুষ দাদুর কাহিনীতে রূপকথার প্রলেপ লাগছিল—আমারই অজ্ঞাতে—

(ক্রমশ)
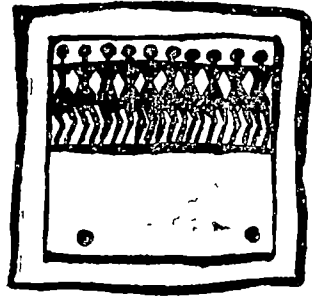
সত্যজিৎ রায়ের "চিড়িয়াখানা"

বাংলা ছবিতে খুন তার প্রাপ্য গুরুত্ব কোনকালেই পায় নি। খুনজখম বাংলা ছবিতে ঘটে যায় নেহাত ভাবাবেগের তাড়নায়, অন্তত অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা-ই ঘটে। অথচ একটি খুনের পরিকল্পনা, তার পরিবেশ-রচনা, হত্যাকারীর নৈতিক সংশয়, এবং খুনের তদন্ত—এ-সবই একজন সিনেমা-শিল্পীর পক্ষে ভালো উপকরণ। হলিউডে এই উপকরণের সম্ভাবনাকে বিকশিত করা হয়েছে বহুকাল ধরে। সমালোচক ম্যানি ফার্বার ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধে এ-ধরনের ছবির সাবলীলতা, দক্ষ ঘটনাবিন্যাস, বলিষ্ঠ চরিত্র-চিত্রণ প্রভৃতি স্মরণ করে এইসব স্বল্প-আলোচিত শিল্পীদের (হাওয়ার্ড হক্স, উইলিয়ম ওয়েলম্যান ইত্যাদি) প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। আণ্ডারগ্রাউণ্ড ফিল্ম নামটি ফার্বার-এর দেওয়া।

"চিড়িয়াখানা" নির্মাণে উদ্যোগী হয়ে শ্রীসত্যজিৎ রায় বাংলা ছবির এই অবহেলিত প্রদেশে দৃষ্টিপাত করবেন—ছবিটি মুক্তি পাওয়ার আগে এরকম আশা অনেকেই প্রকাশ করেছিলেন। আবার, "চিড়িয়াখানা" উপন্যাসটি পাঠান্তে এ-ও মনে হওয়া অসম্ভব ছিল না যে, নিছক মানব-চরিত্রের কুশলী কারিগর শ্রীসত্যজিৎ রায়কেই আবিষ্কার করা যাবে চিড়িয়াখানা ছবিতে।

ছবিটি মুক্তিলাভ করবার পর দেখা গেল দু-পক্ষই অংশত তৃপ্ত হয়েছেন এবং অংশত নিরাশ হয়েছেন।

এই আংশিক অসাফল্যের জন্য দায়ী সম্ভবত শিল্পীর দ্বিধাগ্রস্থ চিত্ত। "চিড়িয়াখানা" নির্মাণের কোনো মুহূর্তেই বোধহয় পরিচালক মনস্থির করতে পারেন নি তিনি কী ধরনের ছবি করতে চলেছেন—একটা ঝকঝকে ক্রাইম

ছবি, নাকি কতকগুলি খণ্ডিত চরিত্রের নক্‌শা। ছবিটির ট্রিটমেণ্ট-এর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলে বোধহয় আমার বক্তব্য কিছু পরিষ্কার হতে পারে।

ছবিটিতে সর্বসমেত দুটি হত্যাকাণ্ড দেখানো হয়েছে, তৃতীয় একটি হত্যাকাণ্ড, যা সাত বছর আগে সংঘটিত হয়েছিল, তারও ইঙ্গিত রয়েছে ছবিতে। এই তিনটি হত্যাকাণ্ডেরই নায়ক হচ্ছেন ডাক্তার দাশ। অথচ এইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রকে ছবিতে দেখানো হয়েছে খুবই কম সময়ে। শুধু তদন্ত এবং জিজ্ঞাসাবাদের সূত্র ধরেই তার আবির্ভাব। কি কি বিশেষ ঘটনা বা যোগাযোগ তার অপরাধ-প্রবৃত্তির মূল উৎস—এসব প্রশ্নের ভিতর পরিচালক প্রবেশ করেন নি বা করতে চান নি। অর্থাৎ, অপরাধী এবং তার পারিপার্শ্বিক নয়—নিছক অপরাধের আবহ নির্মাণেই শ্রীরায়ের উৎসাহ।

এই পটভূমিকায় বিচার করলে দেখা যাবে অন্তত খুনের আবহ-নির্মাণে শ্রীরায় আট আনা সাফল্যলাভ ক'রেছেন। বিশেষত প্রথম খুনটি ঘটবার আগে ও পরে রাত্রির বিভিন্ন শব্দ, কুকুরের ডাক, আলোছায়ার রহস্যময় মিশ্রণ, হস্তচ্যুত টেলিফোনের দোলা, এবং যেন গ্রহান্তর থেকে ভেসে আসা মালকোষের আলাপ—এ সবই যথেষ্ট শিল্পসিদ্ধির নির্দেশক। তুলনামূলকভাবে দ্বিতীয় খুনটি জোলো।

অপরাধ-চিত্রের দু-একটা প্রচলিত সিচুয়েশন এ ছবিতেও তৈরি করা হয়েছে—যেমন কাবুলিওয়ালার ছদ্মবেশে উত্তমকুমারের অনুসরণ দৃশ্যটি। এই সিকোয়েন্স রচনাকে শ্রীরায়ের শিল্পীজীবনে এক বিশেষ দুর্ঘটনা বলে অভিহিত করা চলে। ওইরকম নিষ্প্রাণ নিরুদ্বিগ্ন অনুসরণ যে কোনো সাধারণ বাংলা ছবিতেও দৃষ্টিকটু লাগে।

"চিড়িয়াখানা"-র সম্পাদনায় কিছু বিশেষত্ব আছে। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে কেটে যাওয়া হয়েছে এমনভাবে যাতে গল্পের ধারাটি অব্যাহত থাকে—এক একটা চরিত্র পরিষ্কারভাবে না ফুটে উঠলেও ক্ষতি নেই।

ধরা যাক ফ্ল্যাশব্যাক অংশটি—যেখানে বঙ্কিম ঘোষের নেপথ্যভাষণের সূত্র ধরে প্রথমে দেখানো হয়েছে একটি আদালত কক্ষের দৃশ্য, বিচারপতি নিশানাথবাবু মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছেন অপরাধী লাল সিং-এর। তারপরেই দেখানো হয়েছে নিশানাথবাবুর বাড়ি, যেখানে লাল সিং-এর স্ত্রী দময়ন্তী গেছে তাঁকে প্রলুব্ধ করতে, এবং প্রবীণ নিশানাথবাবু যে সে আকর্ষণ তুচ্ছ করতে

পাবেন নি তা অভিব্যক্ত হযেছে তাঁব মুগ্ধ ও প্রজ্বলিত দৃষ্টিব ক্লোজ আপে-(প্রসঙ্গত, ওই একটি দৃশ্যেই তিনি কালো চশমা ছাড়া)। এই সমস্ত ব্যাপাবটুকু, যা নিশানাথবাবুব ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি কবতে সবচেযে প্রযোজনীয—তাব জন্য পবিচালক মিনিট চাবেকেব বেশি ব্যয কবেন নি। ফলে, ব্যক্তিগত জীবনেব কোন্ বিশেষ শূন্যতা দমযন্তীব' প্রতি তাঁকে আকৃষ্ট কবেছিল; তিনি কি নিঃসঙ্গতাবোধে পীড়িত সাধাবণ মানুষ, নাকি নেহাতই একটা কামুক প্রকৃতিব লোক, যে জীবনেব শেষ বযসে একটা প্রলোভন জয কবতে পাবে না—এ-সব তথ্য কখনোই স্বচ্ছ হযে ওঠে না।

একই কথা বলা চলে সব কটি চবিত্র সম্পর্কেই।

যেমন বনলক্ষ্মী—যাকে দেখা গেছে মাত্র তিনটি দৃশ্যে। প্রথমবাব তাকে দিযে কোনো কথাই বলানো হয নি। দ্বিতীযবাব, সে সত্য-মিথ্যা মিশিযে ব্যোমকেশেব জেবাব উত্তব দিযেছে মাত্র। তৃতীয দফায, অর্থাৎ শেষ দুই বীলে ব্যোমকেশ যে সত্য-কে প্রায পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত কবেছে বনলক্ষ্মীব উপব তাবই প্রতিক্রিযা দেখানো হযেছে। অনেকদিন আগে গাওযা তাব নিজেবই গানেব টেপ-বেকর্ড শুনে সে নিজেকে হাবিযে ফেলে, ধবা গলায যেন নিজেকেই প্রশ্ন কবে "আচ্ছা, গানটা কি খাবাপ হযেছিল?" এবং তাবপবেই দর্শকদেব সামনে সে তাব স্বামী ভুজঙ্গধব-কে অভিযুক্ত কবে। অর্থাৎ শেষ দৃশ্যে এসে দর্শক জানতে পাবেন যে বনলক্ষ্মীব ব্যক্তিত্বে এমন একটা দিক ছিল যাব মধ্যে শিল্পীব হৃদযেব উত্তাপ ও বেদনা এক সঙ্গে অনুভব কবা যায। এইসঙ্গে তাব দাম্পত্যজীবনেব প্রবঞ্চনাটাও দর্শক বুঝতে পাবেন—অপবাধের বোঝাটাও বনলক্ষ্মীকে ছেড়ে ভুজঙ্গধবকেই আশ্রয কবে। হত্যা ছাড়া ভুজঙ্গধবেব হিসাবে বিশ্বাসঘাতকতাব অভিযোগও জমা হয়। কিন্তু বনলক্ষ্মীব দিক থেকে মোহভঙ্গটা যেন অকস্মাৎ ঘটে যায। বিশ্বাসেব ভিৎ তাব নিশ্চযই হঠাৎ আলগা হয নি—ধীবে ধীবে হযেছে। ছবিতে তাব আভাস নেই—শেষ দৃশ্যে তাব ভেঙে পড়াটা সেইজন্য খুব আকস্মিক ও প্রস্তুতিবিহীন মনে হয।

আঙ্গিকেব দিক থেকে "চিড়িযাখানা" সর্বপ্রকাব বাহুল্যবর্জিত। ক্যামেবা প্রযোজনে বহুক্ষণ থেমে থাকে, যেমন, একেবাবে শুরুতে ব্যোমকেশের ঘবে—যেখান থেকে ক্যামেবা প্রায পনেবো কুড়ি মিনিট একবাবও বাইবে যায নি। আবাব গল্পেব ধাবাকে টেনে বাখবাব প্রযোজনে অনেক সময়ে ক্যামেবা

সময়কে ডিঙিয়ে টপকিয়ে চলে গেছে। যেমন একটি দৃশ্যে ব্যোমকেশ অজিতকে অনুরোধ করে আরেক বন্ধুর মারফৎ "সিনেমা এনসাইক্লোপিডিয়া" রমেন মল্লিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে, পরের দৃশ্যেই ক্যামেরা কাট করে রমেন মল্লিকের বাড়িতে। অর্থাৎ, ক্যামেরার চলাচলকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত করেছে ঘটনার পারম্পর্য। এ ছবির বিশেষ শৈলী যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা হচ্ছে ঘটনা-নিষ্ঠ তথ্যচিত্রের শৈলী। এই অতিরিক্ত সংযম যে স্থানবিশেষে রসহানি ঘটায় নি তা বলা যায় না।

অভিনয়ের দিক থেকে ছবিটি উল্লেখযোগ্য, কিন্তু ত্রুটিমুক্ত নয়। সুশীল মজুমদার অসাধারণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয় করেছেন। প্রসঙ্গতই, মেক-আপ তাঁর অভিনয়ে একটি বিশেষ মাত্রা যোজনা করতে সক্ষম হয়েছে। উত্তমকুমারের অভিনয়ও ভালো, কিন্তু, তাঁর মুখের ডৌলের মধ্যে একটা পেলব লালিত্য আছে যা ব্যোমকেশের মতো খুব আত্মসচেতন চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। ফলে প্রায়ই তাঁর মুখের রেখা অস্পষ্ট করে ফেলতে হয়েছে বিভিন্ন কৌশলে। কখনো তাঁকে লেন্সের ফোকাস-সীমার চাইতে কাছে সরিয়ে আনা হয়েছে, কখনো তাঁকে রাখা হয়েছে দূরে—ফোকাসের বাইরে। শ্যামল ঘোষাল চিত্রনাট্যের সাহায্য পেলে হয়তো আরো ভালো অভিনয় করতে পারতেন। জহর গাঙ্গুলি স্বাভাবিক অভিনয়ে অনভ্যস্ত, তার উপর তাঁকে অভিনয় করতে হয়েছে এমন একটি ভূমিকায় যাকে একালে, এই সাতষট্টির কলকাতায় বিশ্বাসযোগ্য করে ফোটাতে হলে রীতিমত উঁচুদরের স্বাভাবিক অভিনয়-ক্ষমতা প্রয়োজন। ফলে রমেন মল্লিক তেমন বিশ্বাসযোগ্য হয় নি। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও সুবীরা রায়ের অভিনয় পীড়াদায়ক।

ব্যোমকেশের ঘরের সেটটি উপভোগ্য। সাপ নিয়ে একটু আধ-সেঁকা রকমের বাড়াবাড়ি অবশ্য করা হয়েছে। ব্যোমকেশের ঘরের অন্যান্য ছোটো-খাটো ডিটেল-এ সত্যজিৎবাবুর নিজস্ব শৈলীর ছাপ মেলে, বিশেষ করে, ক্রেডিট-টাইটল্-এর অংশে ছোটো ছোটো এবং অতিসাধারণ গৃহস্থালীর সরঞ্জামের উপর ক্যামেরা সরিয়ে পরিচালক একটি নিগূঢ় ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

ছবির সংগীতাংশ খুবই কম। অবশ্য, গল্পাংশের প্রাধান্যবশত, সংগীতের খুব একটা প্রয়োজন কখনোই অনুভূত হয় না। ছবির নাটকের প্রয়োজনে যে গানটি সত্যজিৎবাবু লিখেছেন তা অসম্ভব ভাবে সুপ্রযুক্ত ও সুগীত।

সুমিত মিত্র

"শেক্সপিয়রওয়ালা" প্রসঙ্গে

শেষ দৃশ্যে নায়িকার স্মৃতিচারণায় স্পষ্ট হয় যে, ছবির মূল থীম্ "শেক্সপিয়রওয়ালা" নয়। ফ্রেমটি হচ্ছে নায়িকা পিয়ানোয় ইংরেজি নোটেশন-এ 'ডো-রে-মি-ফা-সো-লা-টি-ডো' বাজানোর পর নায়ক এসে শেষ থেকে শুরুর দিকে ফিরে এল—তাও ভারতীয় সঙ্গীতের স্বর সঙ্কেতে 'সা-নি-ধা-পা-মা-গা-রে-সা'। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অন্তর্নিহিত মানবীয় সম্পর্কের প্রকাশ এ ছবির মূল অভিপ্রেত। নাট্যসংস্থা ও নাটকাভিনয়ের ক্ষয়িষ্ণু জনপ্রিয়তা—চলচ্চিত্রের আবেদনের কাছে তার পরাজয়—এ ছবির দ্বিতীয় সত্তা এবং সেটা বিশেষ করে ছবির পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত।

এবার মূল বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতায় আসা যাক। স্বরের আরোহণ ও অবরোহণ একটা সম্পূর্ণ গতিময়তার দ্যোতক এবং তা সুরে অর্থাৎ প্রাণের সুরে বাঁধা। প্রেমের প্রকৃতির একটা সম্পূর্ণ আসা যাওয়া নিরন্তর প্রবহমান। আরও লক্ষণীয় ইংরেজি স্বরসঙ্কেতে আরোহণ ও ভারতীয় স্বরসঙ্কেতে অবরোহণ। স্পষ্টতই দুই-এর বিবিক্ত হারমনি। যদিও মুখ্যত নোটেশনের ভাষা ভিন্ন, ভাব একই। মানুষের মৌল চেতনার রঙের কোনো তফাৎ নেই—সব ক্ষেত্রেই পান্না সবুজ হয়, চুনি রাঙা হয়ে ওঠে। এটা ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা মাত্র। বস্তুত এ রকম হওয়া উচিত ছিল, অন্তত দৃশ্যপরিকল্পনা অনুযায়ী। কিন্তু কারণ অন্য রকমও হতে পারে, কেননা যে মানবিক সম্পর্কের প্রকাশ দেখি অর্থাৎ নায়ক সঞ্জুর ও নায়িকা লিজির পারস্পরিক অনুরাগ ও প্রেম—সেখানে হৃদয়ের নিবিড় যোগটা অনুপস্থিত। অন্তত দর্শকদের উপলব্ধিতে ধৃতি বা অনুভূতিতে একাত্মতা আসে নি। উপস্থাপিত চরিত্রের মানসিকতার বিচারে এটা অস্বাভাবিক নয়। সঞ্জুর চারিত্রিক গঠন অনেকটা 'হ্যাপি গো লাকি' ধরনের—প্রেমের উপলব্ধির বদলে তার শুধুমাত্র 'লাইকনেস্'; কিন্তু লিজির মুখে শুনি 'আমি ভালোবাসি'। স্বাভাবিকভাবেই প্রেম এখানে সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে অপরূপ হয়ে ওঠে না। শেষ পর্যন্ত থেকে যায় একটি নারীর মর্মান্তিক জীবন বেদনা। নায়কের বিদায়ের দৃশ্যটি স্মরণ করুন। চারিদিকে ছড়ানো বস্তু—অর্থাৎ, প্রয়োজনীয়, মূল্যবান,

জাগতিক স্থূলতার মাঝে বসে এক রোরুদ্যমানা নারী—প্রত্যাশিত অমূল্য বস্তু হারানোর কী অপরিসীম ট্র্যাজেডি। বিললাপ বিকীর্ণ মূর্ধজা। আলো আঁধারি টোনে মুড রচনা আরও গভীর হওয়া উচিত ছিল না কি ? সুব্রত মিত্রের ফটোগ্রাফিতে এটা প্রায় সর্বত্র লক্ষ্য করা যায় যে পিক্টোরিয়াল ভিউ যতখানি সুন্দর, বিশেষ বিশেষ কয়েকটি মুড রচনার ক্ষেত্রে তা সমান উৎকর্ষ দাবি করতে পারে না। নায়ক নায়িকার প্রেমের রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীর ভূমিকা অনেকখানি। প্রাকৃতিক রম্য কমনীয়তাটুকু সুন্দরভাবে ক্যামেরায় প্রকাশ পেয়েছে। অপূর্ব সুন্দর, স্বাভাবিক, চরিত্রানুগ অভিনয় ফেলিসিটি কেণ্ডালের। মধুর জাফরেকে প্রাপ্য সম্মান জ্ঞাপন করেও বলা যায় ফেলিসিটি কেণ্ডাল শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেলে বিস্ময়ের কোনো কারণ হত না।

অথচ পরিকল্পনা অন্য রকম ছিল—অন্তত শেষ দৃশ্য উপস্থাপনের লজিক অনুযায়ী সঞ্জু, লিজির পারস্পরিক প্রণয়, হৃদয় নৈকট্য অর্থাৎ প্রেমের সার্বিক সার্থকতা দেখানোর উদ্দেশ্য না থাকলে সুপরিচিত ত্রিকোণ প্রেম রচনার প্রয়োজন কোথায়। প্রত্যাশা অনুযায়ী ত্রিভুজটি একেবারেই অ-সমবাহু এবং চিত্রাভিনেত্রী মঞ্জুলার স্থান দূরতম কৌণিক বিন্দুতে। মঞ্জুলার প্রতি সঞ্জুর আকর্ষণ মোহও ফ্রয়েডীয় দৈহিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। লিজির প্রতি মঞ্জুলার অশোভন উক্তিতে সঞ্জু নির্দ্বিধায় প্রতিবাদ করেছে, ক্রুদ্ধ হয়েছে। আসলে পরিচালকের শিল্পচেতনা বিন্যাসগত শিথিলতায় ও কিংকর্তব্য-বিমূঢ়তায় মূল ভাবকে আশ্রয় করে সম্যকভাবে পারম্পর্য রাখতে পারে নি। এই সূত্রে শিল্পগত পরিমিতিবোধের উল্লেখও প্রয়োজন। পরিবেশের বা ছবির মুডের প্রয়োজনানুযায়ী কোনো দৃশ্যে চুম্বন বা যে কোনো রকম দৈহিক বাহ্যিক প্রকাশ অনাকাঙ্ক্ষিত নয়। এ ছবিতে সে রকম প্রকাশ কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনাবশ্যক দীর্ঘ ও অমিত ব্যবহৃত।

ছবির দ্বিতীয় সত্তা—নাট্যসংস্থা ও নাট্যাভিনয় এবং অভিনেতা অভিনেত্রীদের শৈল্পিক ও ব্যবহারিক জীবন—পরিচালকের সুষ্ঠু প্রয়োগ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন করে। তাদের শিল্পের প্রতি আনুগত্য ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও জনসাধারণের অবহেলা, উপেক্ষা ও অনীহা কয়েকটি মাত্র ছোটো ছোটো দৃশ্যে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত। একটি দৃশ্য তো এ দেশীয়, বহুশ্রুত দানীবাবুর

উপাখ্যানটি মনে করিয়ে দেয়। "ওথেলো"র দৃশ্যে দর্শকদের প্রতি মি. বাকিংহামের কথাগুলি স্মরণ করুন। নাট্যসংস্থার শিল্পীদের শিল্পচেতনা ও জীবনবোধ যেন একটা সূক্ষ্ম দার্শনিক উপলব্ধির স্তরে উন্নীত। গ্রেভ-ইয়ার্ডের দৃশ্য থেকে সরাসরি কাট্ করে পরবর্তী দৃশ্যে স্টেজে চলে এল। অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মৃত্যু—সঙ্গে সঙ্গে প্রবহমান জীবন চেতনা। বের্গম্যানের 'সেভেন্থ সীল' এর কথা অকারণেই মনে আসে।

পরিশীলিত শিল্পচেতনা ছাড়া কেবলমাত্র সংগীতশাস্ত্রে অধিকার বা প্রতিভা চলচ্চিত্রে মূল রস-সঞ্চারে সক্ষম হয় না। এ দুয়ের সমন্বয়ে শব্দের সৃষ্টিশীল ব্যবহার অত্যন্ত সংকেতবহ হয়ে ওঠে। তার প্রকাশ আলোচ্য ছবিতে। আমার ধারণায় বর্তমান ভারতীয় চলচ্চিত্রে শ্রেষ্ঠ 'মিউজিক্ ডাইরেক্টর' (বাংলা সঠিক পরিভাষা বর্তমান লেখকের অজ্ঞাত)-দের মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের স্থান অনেক ওপরে। ছবির বিভিন্ন মুডের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে সুরারোপ—অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় ও শিল্পানুগ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীতের বিস্ময়কর হারমনিক্ ব্যবহার। শুধু দু একটি ক্ষেত্রে (যেমন টকিলা ব্যবহার) ধ্বনি সোচ্চার হয়ে উঠেছে ও মুডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অর্থবহ হয়ে ওঠে নি।

পরিশেষে পরিচালক জেম্স্ আইভরিকে ধন্যবাদ যে তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে নিজস্ব শৈল্পিক ধারণা অনুযায়ী এমন একটি চিত্র উপহার দিয়েছেন যা মহৎ হতে না পারলেও একটা সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইশারা দিয়েছে।

নির্মাল্য বসু

পাঠকগোষ্ঠী

জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে

মহাশয়,

শ্রাবণ সংখ্যাব পবিচযে প্রকাশিত ‘বিধুশেখব মন্ত্রী হলেন’ বসবচনাটিব তীব্র আক্রমণ কবে শ্রীমতী মন্দিবা ঘোষ একটি চিঠি লিখেছেন ভাদ্র সংখ্যাব ‘পবিচযে’। আমাব মনে হয মন্দিবা দেবী উক্ত বসবচনাটিব বক্তব্য সঠিক বুঝতে পাবেন নি এবং পাবেন নি বলেই সেটাকে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে টেনে নিযে অযথা উত্তেজিত হযেছেন।

‘বিধুশেখব মন্ত্রী হলেন’ বসবচনাটিব লেখকেব উদ্দেশ্য জন্মনিযন্ত্রণকে ব্যঙ্গ কবা নয। ব্যক্তিগতভাবে প্রযোজনবোধে যে কেউ জন্মনিযন্ত্রণ কবতে পাবেন —এ সম্বন্ধে কাবও কিছু বলবাব নেই এবং আমাব মনে হয এ বিষযে লেখকও কোন ইঙ্গিত কবেন নি। লেখকেব এবং আমাদেবও আপত্তি এখানেই যে বর্তমান ভাবত সবকার জন্মনিযন্ত্রণ কথাটাকে যেভাবে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহাব কবছেন সেখানেই।

আজকেব ভাবত সবকাব নিজেদেব সব কিছু অপদার্থতা ঢাকবাব জন্য জন্ম-সংখ্যা বৃদ্ধিব দোহাই দিচ্ছেন। খাদ্য নেই এবং সেজন্যে দেশটাকে আমেবিকাব কাছে বাঁধা দিযে খাদ্য ভিক্ষা কবতে হচ্ছে, তাব জন্যে দাযী জন্মসংখ্যা। শিক্ষা নেই, চাকবি নেই সেজন্যে দাযী জন্ম-সংখ্যা। অর্থাৎ নিজেদেব সমস্ত কিছু অপদার্থতাব জন্য দাযী জন্ম-সংখ্যা। কই অনেক বেশি জন্ম-সংখ্যা হওযা সত্ত্বেও চীনে তো জন্ম-নিযন্ত্রণেব কথা ওঠে না? সোভিযেত ইউনিযনে তো যে মা বেশি সন্তানেব জননী হতে পাবেন তাঁকে বাষ্ট্র থেকে খেতাব, পুবস্কাব দেওযা হয।

আব যদি সব কিছু অনর্থেব মূল জন্মসংখ্যাই হয তাহলে তাব নিযন্ত্রণ কি নির্লজ্জ প্রচাব আব পিতৃত্ব-মাতৃত্ব ত্যাগেব উপদেশ দিযে হয? কাবণ সবকাবেব ব্যর্থতাব সব দাযিত্ব নিজেব মাথায নিযে খুব কম লোকই প্রাযশ্চিত্ত কববাব জন্যে মাতৃত্ব বা পিতৃত্ব ত্যাগ কবতে অনুপ্রাণিত হবেন। অনুপ্রাণিত যে হবেনও না অভিজ্ঞতাই তাব প্রমাণ। এই অশিক্ষিত এবং কুসংস্কাবাচ্ছন্ন দেশে পিতৃত্ব-মাতৃত্ব ত্যাগেব উপদেশ দেওযাটা সরকাবেব নির্বুদ্ধিতা ও বাস্তববোধহীনতাবই পবিচাযক। জন্মনিযন্ত্রণ যদি কবতেই হয তাহলে শিক্ষাব

প্রসার এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সবার আগে প্রয়োজন। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যে-দেশের শিক্ষা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত সে-দেশে জন্মসংখ্যার হার বেশ কম। তার জন্যে কোটি কোটি টাকা খরচ করে প্রচারের প্রয়োজন হয় না। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আজকের জাপান।

আর আমাদের সরকার আসল কাজের কিছু না করে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের নব নব পন্থা আবিষ্কার করছেন। তাঁরা বলছেন মেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়িয়ে দাও। মেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়িয়ে দিয়ে আইন করলেও যে কিছু হবে না তার প্রমাণ পূর্ব অভিজ্ঞতাই কি যথেষ্ট নয়? এখনও তো আইন আছে ষোল বছরের আগে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া চলবে না। গ্রামের কথা বাদই দিলাম শহরেই-বা কয়জন এই আইন মেনে চলছেন? যদি মেয়েদের শিক্ষা, চাকরি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হত, তাহলে মেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়াবার জন্যে আইন করতে হত না। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা চন্দ্রশেখর দেশের অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের উপদেশ দিয়েছেন কয়েক বছর বিয়ে না করতে। এর চেয়ে হাস্যকর আর কী হতে পারে? তাঁরা ঘোষণা করেছেন পিতৃত্ব-মাতৃত্ব ত্যাগ করলে নগদ টাকা, ট্রানজিস্টার প্রভৃতি কত কিছু দেবেন। আর কয়দিন পরে হয়ত বলবেন যে একেবারে বিয়ে না করলে বা করলেও সন্তানের জনক-জননী না হলে 'ভারত-রত্ন' উপাধি দেওয়া হবে। এ যেন হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী। এবং এই গবুচন্দ্র মন্ত্রীদের ব্যঙ্গ করেই সমর রায়চৌধুরী তাঁর 'বিধুশেখর মন্ত্রী হলেন' রসরচনাটি লিখছেন। এতে মন্দিরা দেবীর ক্ষুব্ধ হওয়ার কোন কারণ নেই।

প্রবীরকুমার দত্ত

বানান বিষয়ে

মহাশয়,

শ্রাবণের পরিচয়ে বানান প্রস্তাবের উত্তরে ভাদ্রের পরিচয়ে দেবেশবাবুর প্রশ্ন ['যদি পত্রিকার বানান মেনে নিতে বলা হয় তা হলে আমার বিচার বিবেচনান্তে পছন্দের হবে কী?'] সত্যি ভাবিয়ে তুলেছে। আর এ ভাবনা সকলেরই, বানানের দুর্ভাবনা এড়াবার জন্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার বাস্তবধর্মী বটে, কিন্তু এতে বহু বিকল্প সমর্থন করায় সমস্যা থেকেই গিয়েছে।

বিকল্প বাদ দিয়ে একটিকে স্থায়ীভাবে গ্রহণ করতে গেলে 'বিচার-বিবেচনা'র দরকার তো আছেই। 'পরিচয়' লেখকদের কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ চেয়ে ভালোই করেছেন মনে হয়। দেবেশবাবুর প্রশ্ন আমাদের অনেকেরই। তবু তাঁর বক্তব্যের সমর্থন করেও 'পরিচয়ে'র প্রস্তাবকে স্বাগত জানাই। আলোচনা বাছ-বিচারের মধ্যে দিয়ে একটা আদর্শ কিছু রাখুক একটি পত্রিকা। দেখা যাক না কী দাঁড়ায়। কোন কোন বিষয়ে প্রত্যয় থাকলেও সন্দেহ-সংশয় তো আমাদের সকলেরই বহু বিষয়ে।

দেবেশবাবুর প্রশ্ন, 'আপনারা শুরু, শাদা, জিনিশ—ইত্যাদি সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত নেবেন?' এ সম্পর্কে শব্দের মূলে যাওয়াই সমীচীন মনে হয়। সাদাহ্ ফারশী শব্দ, জিন্‌স্ (জিনিশ বিপ্রকর্ষ) আরবী। প্রথমটিতে 'সোয়াদ'-বর্ণও দ্বিতীয়টা সিন্-বর্ণ ইংরেজি S-এর সমগোত্র, তাই স্ দিয়েই লেখা উচিত : সাদা, জিনিস। শরু/সরু শব্দ নিয়ে তর্ক আছে। এটা যদি তৎসম শব্দ ধরা যায় তাহলে সরু বানান লেখাই সঙ্গত: √সৃ+উ=সরু। শব্দটি বরদাপ্রসাদ বসু সম্পাদিত 'শব্দকল্পদ্রুমে' 'সূক্ষ্ম' পথে স্বীকৃত।

আর যদি শরের (শর তৃণের) মতো ক্ষীণকলেবর এই অর্থ ধরা যায় তাহলে 'শরু' লেখাই সঙ্গত। ব্যুৎপত্তি অনুসরণ করেই বানান ঠিক করা দরকার। দুঃখের বিষয় আমাদের অভিধানগুলিতে অনেক সময় মনগড়া প্রকৃতিপ্রত্যয়ে শব্দ সমাধান করা হয়, প্রশ্নচিহ্ন দিয়ে সন্দেহ প্রকাশ খুব কম ক্ষেত্রেই করা হয়।

দেবেশবাবু অতীত ক্রিয়া অন্ত্য ও-হীন করা সমর্থন করেন নি, বলছেন। 'আমার ধারণা 'বলিল'র মধ্যবর্তী 'ই' উঠে যাবার সময় অন্ত্য 'ও' হয়ে গেছে। সুতরাং বললো, হতো, যেতো—হওয়াই তো উচিত।'

আমার মনে হয় 'ই' উঠে যাবার সময় অন্ত্য ও হয় নি। ব্যাপারটা এই : বলিল < বইলল (অপিনিহিতি) < বলল (অভিশ্রুতি)। অপিনিহিত 'ই' আর ঠিক তার আগের স্বরে মিলে শুধু 'ও' স্বর। উচ্চারণে 'বোললো'। 'বলিল' ক্রিয়াপদেই আদ্য ও অন্ত্য স্বরটি উচ্চারণ 'ও' (স্বরসঙ্গতি)। 'বলিল' লিখতে উচ্চারণ অনুকরণ করে আমরা 'বোলিলো' লিখি না, তাহলে ধ্বনি পরিবর্তনের ধারায় যখন 'বলল' পেলাম তার অন্ত্য বা আদ্য স্বরে আমরা 'ও' দেবো কেন? 'হত' সম্বন্ধেও একই কথা : হইত > হ'ত হত (অভিশ্রুতি)।

পরিচয়ের প্রথম বানান প্রস্তাবটির পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন মনে করি। কোন তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে বিকল্পে হ্রস্ব ই ও দীর্ঘ ঈ-র বিধান থাকলে সব সময়ে হ্রস্ব ই-কার বানান সমর্থন করা উচিত কিনা সে বিষয়ে আমার সংশয় আছে। পরীবার, পরীহার সংস্কৃতেই ক্বচিৎ চলেছে, ও শব্দের ছবিই কারো মনে ধরা নেই, ওতো এমনিতেই অপ্রচলিত কিন্তু তরী, তন্ত্রী, শ্রেণী, পল্লী-র—এসব বহু প্রচলিত শব্দের ছবি ভেঙে তরি, তন্ত্রি, শ্রেণি, পল্লি না হয় নাই লিখলাম?

জ্যোতিভূষণ চাকী
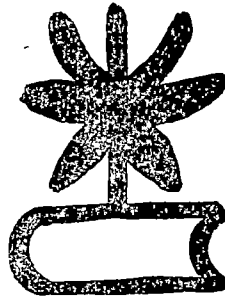
পুস্তক-পরিচয়

রুশ বিপ্লব ও বাংলার মুক্তি আন্দোলন । গৌতম চট্টোপাধ্যায় ॥ মনীষা গ্রন্থালয় প্রা. লিঃ ॥ দাম দুই টাকা ।

প্রাচীন বা মধ্যযুগেব ইতিহাস নয, এমন কি উনবিংশ শতাব্দীবও ইতিহাস নয, একেবাবে সেদিনের, আমাদেব মত অনেকেবই জীবনকালেব ইতিহাস। তবু তা আজও সুসংবদ্ধভাবে বচিত হয নি। অক্টোবব বিপ্লব আমাদেব মুক্তি-আন্দোলনে কতটা প্রভাব বিস্তাব কবেছিল, কি কবে তা আমাদেব মনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন কবেছিল তাব ধাবাবাহিক ও সুসংবদ্ধ ইতিহাস আজও বচিত হওযাব অপেক্ষায আছে। এ ইতিহাস একান্ত আধুনিককালেব বলেই লেখা শক্ত। মালমশলা বিক্ষিপ্তভাবে ছডিযে আছে, বহু দলিলপত্র নষ্ট হযে গেছে, তাব উপব এই ইতিহাসেব সঙ্গে যাঁবা প্রত্যক্ষভাবে জডিত ছিলেন বা আছেন তাঁদেব মধ্যে নানা বিষযে মতভেদ প্রকৃত তথ্য উদ্ধাবে জটিলতাব সৃষ্টি কবেছে। তবু আশাব আলো দেখতে পাচ্ছি। অক্টোবব বিপ্লবেব পঞ্চাশৎ বার্ষিকী উপলক্ষে একদল তরুণ গবেষক প্রবল উৎসাহেব সঙ্গে এই ইতিহাস উদ্ধাবেব কাজে এগিযে এসেছেন। কিছু কিছু পুস্তক-পুস্তিকা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হযেছে। এগুলিব মধ্যে অন্যতম গৌতম চট্টোপাধ্যায প্রণীত "রুশ-বিপ্লব ও বাংলাব মুক্তি-আন্দোলন" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গৌতম চট্টোপাধ্যায এবং তাঁব সহাযকদেব চেষ্টায বাংলাব মুক্তি-আন্দোলনেব উপব অক্টোবব বিপ্লবেব প্রভাবেব ইতিহাসেব একটি পবিষ্কাব রূপবেখা আমবা পেলাম। ৮৮ পৃষ্ঠাব ছোট বইটি বহু তথ্যে ঠাসা। "সূর্যোদযেব যুগ" থেকে "সব বাস্তাই চলেছে" শীর্ষক ৯টি পবিচ্ছেদ সুচিন্তিত

ভাবে বিভিন্ন বিষয় গ্রথিত কবেছে। পবিশিষ্টে আছে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

বলাবাহুল্য, লেখক প্রচলিত অর্থে নিবাসক্ত বা নিবপেক্ষ নন, দৃষ্টিভঙ্গি তাঁব মার্কসবাদী অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত। তথ্যবিচাবে তিনি নির্ভীকতাব পবিচয় দিয়েছেন। দ্বিতীয় পবিচ্ছেদে বিদেশে নির্বাসিত বা পলাতক বাঙালী বিপ্লবীদেব সম্পর্কে আলোচনা, বিশেষ কবে অবনী মুখার্জী ও বীবেন্দ্র চট্টোপাধ্যাযেব উপব নতুন আলোকপাত কবেছে।

তৃতীয় আন্তর্জাতিকেব দ্বিতীয় কংগ্রেসে আলোচনার জন্য রচিত লেনিনেব জাতীয় ও ঔপনিবেশিক সমস্যা সম্বন্ধে প্রাথমিক খসডা-নিবন্ধ এবং মানবেন্দ্র-নাথেব সংযোজন। নিবন্ধ সম্পর্কে লেনিনেব মতামত সংক্রান্ত আলোচনা ভাবতেব কমিউনিস্ট আন্দোলনেব ইতিহাস আলোচনায নতুন সূত্রের সন্ধান দিয়েছে।

অক্টোবব বিপ্লব সম্পর্কে বাংলা দেশে প্রথমদিকে যেসব বই বেবিযেছিল লেখক সেগুলিব মধ্যে অধ্যাপক অতুল সেন বচিত "বিপ্লব পথে বাশিযাব রূপান্তব" গ্রন্থেব উল্লেখ কবেছেন। বইটি তিনি দেখেছেন কিনা জানি না। আমবা সে যুগে দেখেছি, এখন দুষ্প্রাপ্য। এই বইটিব ভূমিকা লেখেন দেশবন্ধু চিত্তবঞ্জন দাশ। ১৩৩০ সালেব চৈত্র মাসেব 'প্রবাসী'তে বইটিব সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বেবিযেছিল। শ্রীসবোজ আচার্য প্রণীত পুস্তক নিযে সমীচীন ভাবেই কিছুটা বিস্তাবিত আলোচনা কবা হযেছে। বইটিব নাম "নব্য রুশিযা" নয, পুবো নাম "নব্য রুশিযা ও রুশিযাব বক্তবিপ্লব।" "লাঙল" যুগ এবং ড নবেশ সেনগুপ্ত প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদেব সম্পর্কে আবও বিস্তাবিত আলোচনাব প্রযোজন। বাংলাব জাতীযতাবাদী নেতাবা কী চোখে অক্টোবব বিপ্লবকে দেখেছিলেন তা নিযে একটা স্বতন্ত্র পবিচ্ছেদ লেখা যায। সমযটাকে আবও পিছিযে ১৯৩০-৩২ সাল পর্যন্ত মালমশলা জোগাড কবতে পাবলে বইটি সর্বাঙ্গসুন্দব হত। আশা কবি, লেখক পববর্তী সংস্কবণে হাত দেবাব সময এ সব কথা ভাববেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টায তাঁব সার্থক সূচনাব জন্য লেখককে অভিনন্দন জানাই।

সুকুমাব মিত্র

অজ্ঞাতবাসের দিনগুলি ॥ চিন্ময় গুহ ঠাকুবতা ॥ প্রকাশক-জ্যোতির্ময় গুহ ॥ তিন টাকা ॥
বিষুবে বৌদ্রেব ডালপালা ॥ তুলসী মুখোপাধ্যায় ॥ গ্রন্থ জগৎ ॥ দাম দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা ॥
লাগ্ ভেল্কি লাগ্ ॥ অমবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ প্রকাশক-অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় ॥ দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা ॥

যাঁরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কবিতাব আঙ্গিক ও দৃশ্যপটেব পবিবর্তনে বিশ্বাস কবেন, চিন্ময় গুহ ঠাকুরতা-ব 'অজ্ঞাতবাসেব দিনগুলি' তাঁদেব ভালো লাগবে না। কাবণ কবি-চবিত্রে চিন্ময স্থিব এবং গৃহী। এই গ্রন্থেব সব কবিতাতেই তাঁব সামাজিক মন কাজ কবছে। জাতীয এবং আন্তর্জাতিক সমাজ ও বাজনীতি সম্পর্কে তার ঔৎসুক্য তীব্র এবং মানবতা শব্দটি তাঁব কবিতায কোনো বিলাসসামগ্রী নয। তাঁর কবিতায যে বিক্ষোভ, বিপন্নবোধ, অভিমান ও উত্তেজনাব প্রকাশ ঘটেছে, সেই ঝোড়ো পটভূমিব কেন্দ্রে দাঁড়িযে আছে মানুষ। কাব্যিক-বিন্যাসে খুব সাহসী নন চিন্ময, খুব চতুরও নন। প্রায ক্ষেত্রেই টানা মাত্রাবৃত্তে বচিত তাঁব কবিতাব পংক্তিগুলি একটি নাগবিক যুবকেব পবিবেশ সম্পর্কিত বহুমাত্রিক অনুভবেব তীব্রতায ছুটে আসে ও আন্তবিক সততায় আমাদেব কিছু পবিমাণে অভিভূত কবে। তাঁব প্রেমেব কবিতাগুলিতেও এই আবেগবিহ্বল যৌবনেব তপ্ততাব স্পর্শ পাওযা যায। তা ছাড়া, এই সংকলনটির কযেকটি কবিতায সাম্প্রতিক বিষয়েব ওপব পুবাণ ও লোক-প্রসিদ্ধি মূলক বিভিন্ন ঘটনাকে এমন নৈপুণ্যে আবোপ কবা হযেছে, যাতে ঐ কবিতাবলী সম্পর্কে পাঠকের বাসনা ও সংস্কার বিভিন্ন অনুষঙ্গ সমেত জেগে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ কবা যেতে পাবে, 'প্রতিটি জানালা খোলা, ঝুঁকে দেখছে অগণ্য মানুষ/পূর্বপুরুষেব নৃত্যে সংক্রামিত নাগব ধূর্জটি,' বা 'আমাব আসক্তি নেই এই যুদ্ধে, অগ্রজ সঞ্জয,' অথবা 'সম্মুখ সমবে বীব সূর্যদেব মাটিতেই আজানুলম্বিত · রক্তাক্ত ছুবিকা হাতে দৌড়ে গেল সাযাহ্নেব মেঘ।'

তৎসম ও অর্ধ-তৎসম শব্দেব ব্যবহাব, আঁটসাঁট সুসংবদ্ধ পঙক্তিবিন্যাস ইত্যাদি প্রকবণগত বিষযে চিন্ময সুধীন্দ্রনাথ দত্তেব একান্ত অনুগামী। নিসর্গ-বিষযক কবিতা বচনায গতানুগতিকতাকে খুব বেশি অতিক্রম কবা কবিব পক্ষে সম্ভব হয নি। যেখানে তাঁব কবিতাব মূল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বাঁধা,

সেখানে চিন্ময় অসহায় ও অপারগ। পূর্বেই বলেছি, শাণিত বাক্-পটুত্ব কবির স্বভাবে নেই। অকপট সংবেদনায় নিহিত হওয়াই তাঁর মূল বৃত্তি।

সাম্প্রতিক তরুণ কবিদের মধ্যে 'বিষুবে রৌদ্রের ডালপালা' কাব্যগ্রন্থের লেখক তুলসী মুখোপাধ্যায় একাধিক কারণে পাঠকদের মনোযোগ দাবি করতে পারেন। প্রথমত, তাঁর কবিতা ইন্টারেস্টিং ও রীতিমতো চতুর। অথচ এই চাতুর্যের সঙ্গে আন্তরিকতার বিরোধ নেই। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায়, 'অতঃপর কুলুঙ্গির ঝাঁপি খুলে মা আমার চোখে/মেলে ধরলেন বিশ্বরূপ,/পুরানো শাড়ির ভাঁজে ন্যাপথলিন মাখানো গন্ধ/তালপাতার বাঁশি, লুডোর কোট, বাবার যুবক ছবি/আমি অঞ্জলি পেতে সেই সাম্রাজ্য /নিতে নিতে নতজানু,' অথবা, 'দে-রে আরেকটা করে কবিরাজি কাটলেট দে/বাড়িতে পোয়াতী বৌটা কী যে ছাই শাকপাতা রাঁধে' ইত্যাদি পঙক্তি। দ্বিতীয়ত, ছোটবেলার স্মৃতি নিয়ে লেখা কবিতাগুলিতে সার্থক প্রতীক ও চিত্রকল্প ব্যবহারে কবি কখনো কখনো এমন দুর্লভ আবেগ সৃষ্টি করতে সক্ষম, যা বর্তমানের চারদিক দেখে মার-খাওয়া যৌবনের চেহারাকে আরও রক্তাক্ত করে তোলে। তৃতীয়ত ঢালাওভাবে তিনি লৌকিক এমন কি অন্ত্যজ শব্দ ব্যবহার করে কবিতার পরিধিকে ব্যাপ্ত করতে প্রয়াসী হন। চতুর্থত, প্রসাধনহীন ডেলিবারেট কবিতা রচনায় তিনি কিছুটা সাফল্যও অর্জন করেছেন।

তুলসী মুখোপাধ্যায়ের কবিতার দুটি প্রধান ত্রুটি—অতিকথন ও কসরত প্রীতি। ফলে, বহুক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য দিশেহারা ও কেন্দ্র-চ্যুত হয়ে পড়ে এবং মল্লযুদ্ধের পরিশ্রমের দাগ তাঁর কবিতায় লেগে থাকে। কাব্যগ্রন্থটির বহু কবিতাতেই বড়ো বেশি আর্তনাদ শোনা যায়। কিন্তু কেন আর্তনাদ, কিসের জন্য আর্তনাদ—তা ঠাহর করার খুব বেশি সুযোগ পাওয়া সম্ভব হয় না। এ সব প্রাথমিক ত্রুটি সত্ত্বেও তুলসী মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ও আন্তরিক কবিত্বশক্তির অধিকারী। নানা নিরীক্ষায় তাঁর আগ্রহ সজাগ। পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়-অঙ্কিত প্রচ্ছদপটটি সুন্দর।

'হু-উ-শ্ করে এসে ফু-উ-শ্ করে মিলিয়ে যায়, আমাকে খুশি করে লিখিয়ে নেয় ছড়া', 'লাগ্ ভেল্‌কি লাগ্' ছড়ার বইয়ের লেখক অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এহেন ভণিতা করেছেন। হাল্কা মেজাজে ছড়াগুলি পড়তে

গণতন্ত্রের সপক্ষে

একেকটা সময় আসে যখন সবাইকে অন্য সব কাজ ফেলে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হয়। আমরা মনে করি বাংলাদেশে আজ সেই সময় এসেছে। রাজনীতিতে আমাদের যার যে মনোভাবই থাক, যখন মানবতা ও গণতন্ত্রের সমূহ বিপদ দেখা দেয়—তখন তার প্রতিরোধ না করার অর্থ নিজেদের পায়েই কুড়ুল মারা। কেন্দ্রের কুচক্রী শাসকশক্তি সংবিধানকে ধুলোয় লুটিয়ে পশ্চিমবাংলায় জনপ্রিয় যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে এমন এক বিশ্বাসহন্তা সরকার খাড়া করেছে যার অস্তিত্বের একমাত্র অবলম্বন একদিকে জেল লাঠি গুলি এবং অন্যদিকে ব্যক্তিস্বাধীনতার অপহরণ। গত একমাস ধরে রাজ্যময় হরতাল, আইন অমান্য এবং বিক্ষুব্ধ জনমতে একথা আজ দিনের আলোর মতই স্পষ্ট যে, পশ্চিমবাংলার মানুষ অবৈধ সংখ্যা-লঘুদের মন্ত্রিসভা বরদাস্ত করতে রাজি নয়। আমাদের বিশ্বাস, পায়ের নিচে মাটি নেই বলে এবং দেশের লোকের কাছে ধিক্কৃত বলেই ঘোষ মন্ত্রিসভার আজ একমাত্র নির্ভর জেল লাঠি ও গুলি। বৃটিশ রাজত্বেও শিক্ষার যে-পীঠস্থান পবিত্র বলে গণ্য করা হত, ঘোষ মন্ত্রিসভা সেখানেও পুলিশের পশুশক্তিকে নির্বিচারে ছাত্র-শিক্ষকদের রক্তপাতের ছাড়পত্র দিয়েছে। আমরা মনে করি, গণতন্ত্রকে নিধন করে এবং মানবতাবোধ ও বিবেককে বিকিয়ে দিয়ে এদেশে ফ্যাসিজমের পথ প্রশস্ত করা হচ্ছে। অঙ্কুরেই এই বিষবৃক্ষকে বিনষ্ট করতে না পারলে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি কিছুই রক্ষা পাবে না। সতীর্থ লেখক, শিল্পী, সংস্কৃতিকর্মী ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেকের কাছে আমাদের আবেদন, মানবতা ও গণতন্ত্র রক্ষার এই সংগ্রামে আসুন আমরা পরস্পরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াই।

অজিত মুখোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন্দ্রিয় পাঠক, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অমল চন্দ, অমল দাশগুপ্ত, অমলেন্দু চক্রবর্তী, অমিতাভ দাশগুপ্ত, অরবিন্দ পোদ্দার, অরুণ সেন, অশোক সেন; আবুল হুদা,

আশিস সান্যাল ; ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায , উমানাথ ভট্টাচার্য , কল্লোল মজুমদার , কৃষ্ণ চক্রবর্তী , গণেশ বসু , গীতা বন্দ্যোপাধ্যায , কানাই পাকড়াশী , গোপাল হালদার , গোলাম কুদ্দুস , গৌরাঙ্গ ভৌমিক , চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায , চিত্ত ঘোষ , চিত্তরঞ্জন ঘোষ , চিন্মোহন সেহানবীশ , জগন্নাথ চক্রবর্তী , তপনলাল ধর , তরুণ সান্যাল , ত্রিদিব লাহিড়ী , দিলীপ বসু , দিব্যেন্দু পালিত , দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায , দেবব্রত ভৌমিক , দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায . দেবেশ রায , নৃপেন্দ্র সান্যাল , নারায়ণ চৌধুরী , পার্থ রাহা , পুষ্কর দাশগুপ্ত , প্রলয সেন ; প্রসূন বসু , প্রিযতোষ মৈত্রেয , ররেন গঙ্গোপাধ্যায় , বিজয়া দাশগুপ্ত , বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায , বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য , বেদুইন চক্রবর্তী , ভাস্কর চক্রবর্তী , মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায , মতি নন্দী , মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায , মানস রাযচৌধুরী , মুকুল গুহ , মোহিত চট্টোপাধ্যায , রমানাথ রায় , রামরমণ ভট্টাচার্য , শক্তি চট্টোপাধ্যায , শচীন্দ্র ভট্টাচার্য , সজল বন্দ্যোপাধ্যায , শরৎকুমার মুখোপাধ্যায , শংকর চট্টোপাধ্যায় , শংকর রায , শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায , শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায , সত্য গুহ , সমর সেন , সাগর চক্রবর্তী , সাবিত্রী রায , সিদ্ধেশ্বর সেন , সুধীর রাযচৌধুরী , সুভাষ মুখোপাধ্যায , সৌরি ঘটক , হিরণকুমার সান্যাল ।

'সম্পাদকীয়'র পরিবর্তে

'পবিচয'-এব কার্তিক-অগ্রহাযণ সংখ্যা কিছু বিলম্বে প্রকাশিত হবে, একথা আগেই ঘোষণা কবা হযেছিল। কিন্তু এতোটা দেবি হবে সেটা আমবাও ভাবি নি। এই ক্রটিব পুবো দাযিত্ব আমাদেব হলেও অনেকগুলি পবিস্থিতি আমাদেব আয়ত্তেব বাইবে ছিল। সহৃদয পাঠক-লেখকদেব কাছে ক্ষমা প্রার্থনাব সঙ্গে সঙ্গে আগামী সংখ্যাগুলি যথাসাধ্য নিযমিতরূপে প্রকাশিত হবাব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

এই পত্রিকা আরো এক সপ্তাহ আগে প্রকাশিত হতে পাবত যদি আমাদের সম্পাদক গত ২৩ ডিসেম্বব কাবারুদ্ধ না হতেন। রুশ বিপ্লবেব পঞ্চাশ বছব পূর্তি উপলক্ষে একটি বিশেষ সম্পাদকীয বচনাব পরিকল্পনা তাঁব ছিল। কিন্তু হঠাৎ গ্রেপ্তাব হওযায তা আব সম্ভব হলো না। এক দিক দিযে তাঁব না লেখা সম্পাদকীযটি বোধহয সবচেযে সবব প্রতিবাদ। সুভাষ মুখোপাধ্যায, বীবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায প্রমুখ কবিকে কাবাগাবে বন্দী বাখাব প্রতিবাদে কোনো তথাকথিত সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাব পূজাবীকে দেখা যায নি। অবশ্য গত একমাস ধবে পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে মানবিক অধিকার ও মূল্যবোধ বিপর্যস্ত হযেছে, তাতে পূর্বোক্ত গ্রেপ্তাবেব সংবাদ কোনো খববই নয।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও তাঁব বাহিনী-বিষযে আমাদেব কোনো প্রত্যাশা নেই। তথাকথিত গান্ধীবাদী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষেব চিবকালই ভাবেব ঘবে চুরি ছিল এবং সে মুখোশ খুলে পডতেই 'ল্যাজে তোব যদি লেগেছে আগুন স্বর্ণলঙ্কা পুড়া' নীতি অনুসবণ কবেছেন। তাই হাজাব হাজাব লোককে কাবারুদ্ধ কবে, শিক্ষাযতনের পবিত্রতা নষ্ট কবে, ছাত্র-শিক্ষক-সাংবাদিক-সৎ নাগরিক সবাব ওপবে সমানভাবে সন্ত্রাসেব শাসন চালাচ্ছেন। হায বে গান্ধীবাদী। সেজন্যই কি ববীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'আমবা সবাই গান্ধীবাজেব শিষ্য / কেউ বা ধনী কেউ নিঃস্ব ?' শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষেব সমর্থনে আবেকজন গান্ধীবাদী আছেন · তিনি হলেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ। আগামী ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীব শতবর্ষ পূর্তি উৎসব হবে। ববীন্দ্রনাথেব অনুকবণে বলতে ইচ্ছে কবে, 'আজি হতে শতবর্ষ পরে, কে তুমি মারিছ লাঠি আমাবই মাথাব 'পবে, কৌতুকেব ভবে।'

'পবিচয' বাজনৈতিক পত্রিকা নয। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'পবিচয' বিশ্বাস কবে বাজনীতি কোনো গোষ্ঠী পবিচালিত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান অথবা ঠাণ্ডা ঘবেব আসবেব শৌখিন আলোচনাব বস্তু নয। এব সঙ্গে দেশেব প্রতিটি মানুষেব বেঁচে থাকাব প্রশ্ন জডিযে আছে। ফলে প্রযোজন দেখা দিলে বেঁচে থাকাব তাগিদেই লেখক থেকে কৃষক, শিক্ষক থেকে শ্রমিক, ছাত্র থেকে কেবানি সবাইকেই বাজনীতি কবতে হয। দেশেব এই দারুণ সংকটে বুদ্ধিজীবীদেব বিশিষ্ট ভূমিকাব কথা নতুন কবে স্মবণ কবিযে দেবাব প্রযোজন নেই। আনন্দেব কথা, আমাদেব দেশেব বিবেকবান বুদ্ধিজীবীবা পশ্চিম বঙ্গে অন্যায ভাবে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাব পতন ঘটানো ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষেব স্বৈরাচারী শাসনেব বিরুদ্ধে সবব প্রতিবাদ জানিযেছেন। তাঁবা শুধু প্রতিবাদেই ক্ষান্ত নন, প্রতিবোধে দৃঢ সংকল্প। গত সপ্তাহে যুক্তফ্রন্ট আহূত সত্যাগ্রহে দেখা গিযেছে সব শ্রেণীব মানুষের সমাবেশ—সব জীবিকাব মানুষ এক হযে বাস্তায নেমেছেন গণতন্ত্রেব হত্যাব প্রতিবাদে। এই সঙ্গে লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের স্বাক্ষর সংবলিত একটি প্রতিবাদপত্র প্রকাশিত হলো।

বুদ্ধিজীবীবা সতর্ক, জনসাধাবণ সচেতন—আমাদেব ভয নেই।

> আমাদেব ছাপাব কাজ যখন প্রায শেষ, তখন খবব পাওয়া গেলো অভিনেতা-নাট্যকার শ্রী উৎপল দত্ত নিবর্তনমূলক আটক আইনে গ্রেপ্তাব হযেছেন। আশা করি 'পবিচয়' পত্রিকা দপ্তরিখানা থেকে বেবোবার মধ্যে এবকম ঘটনা আবো ঘটবে। সব গ্রেপ্তাবের সংবাদ দিতে হলে 'পবিচয়' পত্রিকার দৈনিক সংস্কবণ প্রযোজন। সেটা আপাতত সম্ভব নয় বলেই শ্রী উৎপল দত্তেব গ্রেপ্তারের বাসি খবব দিযেই শেষ করছি।

সূচিপত্র

বর্ষ ৩৭ / সংখ্যা ৪-৫

নভেম্বর-ডিসেম্বর '৬৭

কার্তিক-অগ্রহায়ণ '৭৪

সম্পাদক

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদলিপি ও চিত্র: রঘুনাথ গোস্বামী

প্রতি সংখ্যা ১'০০ ॥ বার্ষিক ১০'০০ ॥
ষাণ্মাসিক ৫'৫০ টাকা।

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭ থেকে প্রকাশিত। ফোন ৩৪৬০০৩

১ ২

ানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি '৬৮ পৌষ-মাঘ '৭

মাথাধরা?
২টো অ্যানাসিন খেলেই
তাড়াতাড়ি আরাম
যেই মাথা ধরে অমনি শরীর আনচান, অবসাদ আর ক্লান্তি। মেজাজ খিটখিটে হয়ে একটুতেই রেগে যেতেও পারেন। তখুনি দুটো অ্যানাসিন খেয়ে নিন—দেখতে দেখতে ৪-ভাবে হাতে হাতে ফল পাবেন:
১) অ্যানাসিন মাথাধরার ব্যথা সারাবে তাড়াতাড়ি
২) অ্যানাসিন ক্লান্তি দূর করবে তাড়াতাড়ি
৩) অ্যানাসিন অবসাদ কাটাবে তাড়াতাড়ি
৪) অ্যানাসিন অস্বস্তি ঘোচাবে তাড়াতাড়ি
তার কারণ, চিকিৎসকের নিরাপদ ব্যবস্থাপত্রের মতই প্রতিটি অ্যানাসিনে একাধিক ভেষজ। অন্য যেকোনো ব্যথা-উপশমকের চেয়ে এদেশে তাই সবচেয়ে বেশী চলে অ্যানাসিন।
এরপর যখনই মাথা ধরবে অ্যানাসিন খাবেন। অ্যানাসিনে সর্দি আর ইনফ্লুয়েঞ্জা, দন্তশূল আর গায়ের ব্যথাও সারে। সুতরাং অ্যানাসিন কাছে রাখবেন।
সব সময় দিতে বলবেন অ্যানাসিন।
অ্যানাসিন
ঢের ভালো কারন
4 ভাবে কাজ করে
ANACIN
ANACIN
GEOFFREY MANNERS & COMPANY LIMITED

আপনার দেহলাবণ্যের
ষোলকলা পূর্ণ করবে
লাবনি
কোল্ড ও ভ্যানিশিং ক্রীম
Labonny
COLD CREAM
CALCHEMICO PRODUCT
Labonny
VANISHING CREAM
CALCHEMICO PRODUCT
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং, লিঃ
সুলেখা
ড্রইং এর
কালি
সুলেখা
প্রতিদিনের প্রয়োজনে
অ্যাডসল
অফিস
পেস্ট
ও গাম
সুলেখা
ফাউন্টেন পেন-এর
কালি
সিক্যুরিটি
সিলিং
ওয়াক্স
সুলেখা
স্ট্যাম্প প্যাড

মনীষা

সূচিপত্র

বর্ষ ৩৭ / সংখ্যা ৬-৭
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি '৬৮
পৌষ-মাঘ '৭৪

সম্পাদক

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লি.-এর পক্ষে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক মুদ্রণী, ১৩১বি বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীট, কলকাতা ১২ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭ থেকে প্রকাশিত। ফোন : ৩৪৬০০৩

'পরিচয়'-এর নিয়মাবলী

* 'পবিচয'-এব বর্ষারম্ভ শ্রাবণ মাসে ; কিন্তু যে-কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায। পত্রিকাব প্রতি সংখ্যাব দাম এক টাকা ; বার্ষিক গ্রাহকমূল্য দশ টাকা, ষাণ্মাসিক সাড়ে পাঁচ টাকা। বর্ধিত মূল্যে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যাগুলিব জন্য গ্রাহকদেব অতিবিক্ত মূল্য দিতে হয না।

* 'পবিচয' পাঁচ কপিব কম এজেন্সি দেওযা হয না। কমিশন শতকবা পঁচিশ। পত্রিকা ভি. পি যোগে প্রেবিত হয়, ডাকব্যয আমবাই বহন কবি।

* বচনাদি কাগজেব এক পৃষ্ঠায লিখিত হওযা বাঞ্ছনীয, অমনোনীত বচনা ফেবত পেতে হলে সঙ্গে ডাকটিকিট থাকা চাই।

* বচনা, টাকাকড়ি ও ব্যবসায়িক চিঠিপত্র যথাক্রমে সম্পাদক, পবিচয় বা কার্যাধ্যক্ষ, পবিচয় এই নামে ৮৯ মহাত্মা গান্ধী বোড, কলকাতা ৭ ঠিকানায প্রেবিতব্য।

কে আছো

অমিয় ধর

১

ব্যবসা তোর বেইমানির,
জম্‌ছে বেশ।
বুকের সোনা লুঠবি তুই,
আহাম্মক।
কাস্তে শান্‌ দেয়াই আছে
একটি কোপ্‌।
ঘৃণায় থুথু ছিটিয়ে দিই
বিস্ফোরক।

২

জ্বল্‌তে,
কী-ভীষণ,
জ্বল্‌তে।
রক্তে,
রোদ্দুর,
রক্তে।
কে আছো,
কে কোথায়,
কে আছো!
প্রতিরোধ,
ঝলসায়
রক্তে।

যখন রাস্তাই একমাত্র রাস্তা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আমরা ধরেই নিয়েছিলাম আমাদের বাড়ি থেকে কাউকে না কাউকে যেতেই হবে।

কে যাবে?

খেতে বসে সেই নিয়ে আমাদের যুক্তি হচ্ছিল। সুধা চলে গেলে বাড়িতে অরন্ধন। যমুনা গেছে জমির ধান তুলতে। পুপে ছোট, ওর যাওয়ার কথাই ওঠে না। পুনপুন যেতে পারে, কিন্তু সামনে পরীক্ষা। সুতরাং হাতে রইল কর্তা আর গিন্নি—গীতা আর আমি। আমার রুজি-রোজগার, কাগজ সামলানো—অনেক ভজকট। কাগজে সপ্তাহান্তিক লেখার ব্যাপার থাকলেও গীতা ররং কিছুটা ঝাড়া হাত-পা। অতএব গীতারই যাওয়া ঠিক হল।

বাধা পড়ল সত্যাগ্রহ শুরু হওয়ার ঠিক মুখে। দেখা গেল, একটা ভাঙা ইস্কুল জোড়া দেওয়ার কাজে গীতা পাকেচক্রে এমন ফেঁসে গেছে যে, এ সময়ে কিছুতেই তার যাওয়া চলে না।

সুতরাং বাড়ির কর্তাকেই যেতে হয়।

ভাববেন না, এটা বাংলাদেশের একটা বাড়িরই কাহিনী। যুক্তফ্রন্টকে ছলেবলে ভেঙে দেবার পর ঘরে ঘরে আপিশে দপ্তরে দোকানে ক্যান্টিনে শোনা গেছে এই একই গুজগুজ ফিশফাশ—কে যাবে! কে যাবে।

১৯৩০-এব দিনগুলো এখনও ছবিব মত আমাব চোখে ভাসে। বৌবাজাব স্ট্রীটেব ওপব বিপিসিসি আপিশেব সামনে বোজ ঠিক ঘড়ি ধবে লোকেব জমাযেত, হাতে হাতে ফেবা ইস্তাহাব, গলায গলা মিলিযে বন্দেমাতবম্ ধ্বনি। পুলিশেব গাড়িতে গ্রেপ্তাব ববণ কবে স্বেচ্ছাসেবকেবা যখন জেলে চলে যেত—ভাবী পাযে আমবা সব বাড়ি ফিবতাম। অন্ধকাব অন্তঃপুবেও থব থব আবেগে সেদিন শোনা যেত—আমাকেও নিযে চল, আমি যাব।

আটত্রিশ বছব পবে সেই বৌবাজাব স্ট্রীটে আমাদেব পার্টি আপিশে সেই কথাই আমি বলতে গিযেছিলাম—আমি যাব। কথাটা বলতেই সবাই লুফে নিল। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। একটু বাজাতেই বুঝলাম, তাঁদেব খুশিব কাবণ—আমি যাচ্ছি বলে নয, একজন লেখক যাচ্ছে বলে।

মনকে চোখ ঠেবে লাভ নেই। তাঁদেব এই খুশিব ভাব দেখে আমি একটু ক্ষুণ্ণই হযেছিলাম। বাজনীতিব সঙ্গে কখনই আমাব ভাসুব-ভাদ্র-বৌযেব সম্পর্ক নয, জেলে যাওযাটাও আমাব এই নতুন নয। পার্টিতে তবু ববাবব একটা জিনিশ লক্ষ কবেছি, লেখকশিল্পী হলে তাকে একটু আলাদা চোখে দেখা হয—সে দৃষ্টিতে কখনও থাকে তাচ্ছিল্য, কখনও সম্ভ্রম , কখনও কড়া শাসন, কখনও অতিবিক্ত প্রশ্রয। অথচ আমি ব্যক্তিগতভাবে ববাববই চেযে এসেছি—আব সকলেব সঙ্গে লেখকশিল্পীকে সমান কবে দেখা হোক।

বযসে ঘাঁটা পড়ে যাওযায পার্টিব এই ব্যবহাব এখন আব আমাব অবশ্য তেমন গাযে লাগে না। কিন্তু হোঁচট খেলাম পার্টি আপিশেব বাইবে। যাবা বিলক্ষণ জানে, আমি পার্টিতে বহুদিনেব একজন নাম-লেখানো লেখক —আমি সত্যাগ্রহে যাচ্ছি শুনে তাবা যত না খুশি হত, তাব চেযে ঢেব বেশি খুশি হচ্ছে একজন লেখক যাচ্ছে বলে।

সমস্ত ব্যাপাবটা আমাব কাছে জল হযে গেল সত্যাগ্রহেব নির্দিষ্ট দিনে যখন আমবা ম্যাডান স্ট্রীটেব মোড়ে হাতে ঝাণ্ডা নিযে গাড়ি থেকে লাফিযে বাস্তায নেমে দাঁড়ালাম।

হঠাৎ তাকিযে দেখি বাস্তাব দুপাশে লাইন দিযে লোক দাঁড়িযে আছে। চিত্তবঞ্জন অ্যাভিনিউযেব এই দবাজ বাস্তা দিযে সেই ছোট থেকে জীবনে অগুন্তিবাব হেঁটেছি। এ ছিল আমাব ইস্কুলে যাওযা-আসাব বাস্তা, সার্কাস

কার্নিভাল দেখার রাস্তা। একা একা হাঁটতে হাঁটতে কত গুন্ গুন্ করে বেতালে বেসুরে গান গেয়েছি, কত যে মিষ্টি মুখ মনের মধ্যে গেঁথে নিয়েছি, কত কবিতার লাইন যে মনে ঝিলিক দিয়ে গেছে। আর সেইসঙ্গে কখনও ফুটপাথ দিয়ে গল্প করতে করতে, কখনও মিছিলে স্লোগান দিতে দিতে, কখনও লাঠি গুলি টিয়ারগ্যাস এড়িয়ে যেদিকে দুচোখ যায় ছুটতে ছুটতে এ রাস্তা দিয়ে কত যে গিয়েছি এসেছি তার ইয়ত্তা নেই। ১৯৬৮ সালের ২৩শে ডিসেম্বর ঝাণ্ডা উঁচিয়ে যেতে যেতে আমি কি এসব ভাবছিলাম? মনে করতে পারছি না। আসলে তখন আমাদের এক রকমের টং অবস্থা। সামনে যত এগোচ্ছি, ভিড় তত বাড়ছে। ভিড়ের সঙ্গে একাকার হয়ে এগোচ্ছি। ধ্বনিমুখর সেই ভিড়ের মধ্যে কখন যে একমন একপ্রাণ হয়ে মিশে গিয়েছি জানি না। পুলিশের কর্ডন ভাঙবার পর গন্তব্যে পৌঁছুবার হুঁশ হল।

পুলিশ পাহারায় সরকারি বাস আমাদেরই অপেক্ষায়। উঠে ব'সে হঠাৎ বাঁদিকের জানলায় চোখ পড়ল। এমন লাল টুকটুকে আকাশ কতদিন যে দেখি নি। ঠিক আমার হাতের নিশানটার মত।

হাতে হাতে নিশান নাড়াতে নাড়াতে আমরা চললাম।

পেছনের রাস্তা তখনও লোকে লোকারণ্য। আমি আসি নি, ওরাই আমাকে পাঠিয়েছে—এই সত্যটাই ক'দিন ধরে কিছুতেই ধরতে পারছিলাম না। ওরা চাইছিল আমি আসি। পার্টির খুশির কারণটা এতক্ষণে আমার কাছে পরিষ্কার হল—লেখকশিল্পীরা লোকহৃদয়ের তাপমানযন্ত্রের মত। পার্টিতে নাম-লেখানো হলেও লেখক লেখকই।

পেছনের জানলা দিয়ে কার্জন পার্কের মাথায় এক রাশ ধোঁয়া দেখলাম। নিশ্চয় টিয়ারগ্যাস ছুঁড়েছে। এরপর লাঠিচার্জ হবে। তারপর গুলি। ঘোষ মন্ত্রিসভার আমলে কলকাতার আবার সেই পুরনো বাঁধাগৎ। চেনা অচেনা অসংখ্য মুখ মনে পড়ল, যারা আমাদের এগিয়ে দিতে এসেছিল। তারা এবার হিংস্র পুলিশের হাতে মার খাবে, হয়ত মরবেও। যে সরকারের ইজ্জতের দাম কানাকড়িও নয়, তার কাছে আর রাস্তার লোকের জীবনের দাম কী?

প্রেসিডেন্সি জেলের গেটের বাইরে উঁচু তারের বেড়ার মধ্যে খোলা

আকাশের নিচে সামযিকভাবে আমাদের খোঁযাড়ের ব্যবস্থা হযেছে। তিন শো লোক। মাটিতে কখনও উবু হযে বসছি, কখনও উঠে দাঁড়িযে পাযের ঝিঁঝি ছাড়াচ্ছি। ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াচ্ছি চেনা লোক কে কে এল। এক সমযে একসঙ্গে আড়াই বছর জেলে কাটিযেছি, সেই লোকের সঙ্গে এতদিন পর এইখানে এসে দেখা। তখন দুজনেরই ছিল কাঁচা বযেস, এখন দুজনেই আধবুড়ো। পার্টি ভাগাভাগির পর যার সঙ্গে আর মুখ দেখাদেখি ছিল না, দেখা হওয়ামাত্র সে এসে জড়িয়ে ধরল। ভিড়ের মধ্যে কেউ ব'সে, কেউ দাঁড়িযে। একজনের একটা হাত কাটা। আমি তাকে চিনি; এককালের বিখ্যাত সাঁতারু—সে সময খেলার পাতায বড বড অক্ষরে তার নাম ছাপা হত। কর্তা-গিন্নি দুই বুড়োবুড়ি এসেছেন। তাঁদের পাশে আলোযান জড়িযে একজন ব'সে, তার একটা চোখ নেই। খুঁড়িযে খুঁড়িয়ে কলে জল খেতে যাচ্ছে একজন, তার কোমরের নিচে থেকে দুটো পা-ই ধনুকের মত বাঁকা। দশ বছরের একটি ছেলের সঙ্গে কথা বলছেন আশি বছরের এক বুড়ো। একজন নাম-করা কমিউনিস্ট এসেছেন, যাঁর ভাই নাম-করা কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী—আমি জানি, তাঁদের দুজনের পথ ভিন্ন হলেও সম্পর্কটা কুরুপাণ্ডবের নয়। পুলিশের লাঠিতে ভাঙা হাত নিয়ে গাছের নিচে ঠায দাঁড়িয়ে আছেন শান্ত স্বল্পবাক সৌম্যদর্শন এক গান্ধীবাদী। এই প্রথম জেলে যাবেন বাংলাদেশের এক প্রিয কবি—চোখে তাঁর আনন্দের ঝিলিক। প্রায তিরিশ বছর পরে একজনে সঙ্গে দেখা। আমার দাদার বন্ধু। যৌবনে ছিলেন মার্ক্সবাদী এক বেআইনি দলের গোপন ছাপাখানার কর্মী। পুরনো বিশ্বাস ছেড়ে এখন নিয়েছেন গুরুর কাছে দীক্ষা। পাশে ব'সে ছিলেন তাঁর এক গুরুভাই। একজন প্রৌঢ় শিল্পী। একদল ছোকরা ব'সে এক পাশে গান জুড়েছে। স্লোগান দিযে দিযে গলা যাদের ধ'রে গিযেছিল, তারা এখন ঠাণ্ডায গা গরম করার জন্যে কুশপুত্তলিকা দাহে মেতেছে।

যখন শুনলাম অন্য সব জেল ভর্তি হযে যাওযায় আমাদের নিয়ে যাওযা হবে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে, আমার তখন খুব ফুর্তি। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কখনও থাকি নি। আমার পক্ষে নতুনত্ব হবে। কিন্তু পৌঁছুতে বেশ রাত্তির হল। খেতে খেতে রাত প্রায আড়াইটে বাজল। গরম গরম ভাত ডাল আর আলুভাজা। চন্‌চনে ক্ষিধের মুখে ভালোই লাগল।

ন-নম্ববেব একতলা দোতলা আব বাবো নম্ববেব একতলা—দুটি ওযার্ডেব-তিনটি তলাব ন-টি প্রকাণ্ড ঘবে আমাদেব থাকবাব ব্যবস্থা হল। ঘবগুলো যেমনি নোংবা, তেমনি দুর্গন্ধ। এনামেলেব কাঁধা-উঁচু শানকি, চা খাওযাব জন্যে এনামেলেব মগ ; একটি কম্বল পাতবাব, একটি গাযে দেবাব। কম জাযগা, লোক বেশি। ফলে মেঝেতে গাযে গা দেওয়া বিছানা। মশাবি নেই, কিন্তু মশাব উৎপাত আছে। আমবা ছিলাম বিচাবাধীন প্রথম শ্রেণীব কযেদি। আইনমত যা প্রাপ্য তাব অনেক কিছুই আমবা পাই নি। এত লোক হঠাৎ এসে যাওযায এমনিতেই তো জেলখানাব ফাটো-ফাটো অবস্থা।

ভেবেছিলাম ক'টা দিন চুটিযে লেখাপডা কবা যাবে। খাতা কলম বই নিযে তৈবি হযেই এসেছিলাম। সকালবেলায ঘুমও ভাঙল, ভুলও ভাঙল। শুনলাম মিটিং হবে। যা ভয় কবেছিলাম তাই।

আব মিটিং কী। ঘবেব মধ্যে পুবোদস্তুব একেবাবে জনসভা। যুক্ত-ফ্রন্টেব সব দল হাজিব। আব হাজিব বেশ কিছু, যাবা কোন দলে নেই কিন্তু যুক্তফ্রন্টে আছে। মিটিংবাজ ব'লে আমাব দুর্নাম আছে, কিন্তু আমিও একসঙ্গে এত দলেব এবং এত মতেব লোক নিযে সভা বাইবে বেশি দেখেছি ব'লে মনে পডে না। জেলখানায তো নযই। বছব কুডি আগে যখন আমবা জেলে ছিলাম, তখন আমবা অন্য দলেব লোকদেব বড একটা ছাযাও মাডাতাম না। এই পবমতঅসহিষ্ণু হামবডা ভাব অতীতে আমাদেব যে কত একচোখো কবে বেখেছিল, পবে আমবা তা হাডে হাডে টেব পেযেছি।

সব দলেব, সব মতেব লোক নিয়ে তৈবি হযে গেল জেলে আমাদেব যুক্তফ্রন্ট কমিটি। খাদ্য, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসংস্কৃতি, খেলাধুলোব জন্যে আলাদা আলাদা দপ্তব। জেলেব মধ্যে টাকাপযসার যেহেতু চল নেই, সেইজন্যে অর্থদপ্তব ব'লে কিছু থাকল না। মন্ত্রী, এম-এল-এ, কাউন্সিলাব—জেলে কিছুবই আমাদেব অভাব ছিল না। তাব ওপব ছিল লেখক শিল্পী, অভিনেতা, অধ্যাপক, শিক্ষক, উকিল, ডাক্তাব, মিস্ত্রি, দোকানদাব, ব্যবসাযী, স্কুলকলেজেব ছাত্র, ছাঁটাই মজুব, ওষুধেব ক্যানভাসাব, বীমাব দালাল, চাকুবিপ্রার্থী যুবক—এমনি বকমাবি পেশার এবং বাংলা-হিন্দী-উর্দু-মৈথিলী-নেপালী-রাজস্থানী—এমনি বকমাবি ভাষাব লোক। কেউ ঘোব নাস্তিক, কাবো বা দেবদ্বিজে অচলা ভক্তি।

লোকও সব মজার মজার। একজন স্নান করেন নি চল্লিশ বছর; বলতেন ওটা তাঁর একটা এক্সপেরিমেন্ট। বৈঠকখানার বাজারের একজনের ফুলের দোকান, আজকালকার বোমায় কেন এত ধোঁয়া হয় সে দিত তার ফিরিস্তি। ঘোরতর সংসারী একজন লোক, তিনি জেলে এসেছেন বাড়ির কাউকে না ব'লে। আজ বাদে কাল যার বিয়ে হবে, সটান সে কয়েদ-গাড়িতে উঠে চলে এসেছে ভাবী স্ত্রীর ফটো পকেটে নিয়ে। নতুন ট্রাক-লরি হিল্লি দিল্লি পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে নাম-লেখানো একজন কমিউনিস্ট, সে স্বচক্ষে দেখেছে দূর-পাল্লার এক সড়কের ধারে বিশেষ একটা গাছে থাকে চোখে চশমা-পরা এক ভূত—তাকে এক প্যাকেট সিগারেটের দাম মিটিয়ে না দিলে চলন্ত গাড়ি আপনাআপনি থেমে যায়। রাস্তার লড়াইতে যে ছেলেটা প্রাণ দিতেও পিছপা হয় নি, সে যখন রুটিতে মাখন কম হয়েছে ব'লে কুৎসিত ভাষায় গাল দেয়—তখন রাগে কার হাত না নিশপিশ করে? পান থেকে চুন খস্‌লেই কারো কুরুক্ষেত্র বাধানো স্বভাব। সিগারেটের প্যাকেট দেখলে কারো বা আত্মপর জ্ঞান থাকে না।

এমনি ভালোয় মন্দে মেশানো হরেক রকমের মানুষ নিয়ে ছিল আলিপুর জেলখানার এককোণে আমাদের জগৎ—এক ফোঁটা বাংলাদেশের এক ফোঁটা যুক্তফ্রন্ট।

যাদের বাড়ন্ত বয়েস, জেলের বাঁধাবরাদ্দ খাবারে তাদের বড়জোর আধপেটা হয়। যারা রসুইঘরের তত্ত্বতাবাশ করে, সব রাগটা গিয়ে পড়ে তাদের ওপর। রোজই একটা না একটা অশান্তি লেগেই থাকে। কখনও কখনও এমন হয় যে, এই বুঝি পাগলাঘন্টি বাজে! আমাদের সব সময় ভয়, ভেতরে কিছু একটা ঘটলে বাইরে তাই নিয়ে বগল বাজাবার লোকের অভাব হবে না। তাছাড়া আমাদের মধ্যে শত্রুপক্ষের লোক ঢুকে থাকাও তো অসম্ভব নয়।

যে ছেলেটা ছিল সবচেয়ে বেয়াড়া, পরিবেশনের ভার পাওয়ার পর দেখলাম সে অন্য মানুষ। আমাদের বেশি দিয়ে সকলের শেষে মুখ বুঁজে সে সকলের চেয়ে কম খেল। আমরা বুড়োর দল তো অবাক।

ক'দিন যেতে না যেতেই দেখলাম অনেকেরই বেশ উড়ু-উড়ু মন। কাগজে নতুন সিনেমা রিলিজ হওয়ার খবর বেরোয় আর তাদের মন ছটফট করে।

মা-র অসুখ, কলেজের পরীক্ষা, চাকরির ইণ্টারভিউ—সুতরাং দু-চারজনকে জামিন তো না নিলেই নয়। বেরিয়ে গিয়েও রোজ জেলগেটে এসে তারা ছোঁক-ছোঁক করে।

হাসপাতালের মাঠে ভলিবল পড়তেই হঠাৎ জামিন নেওয়ার হিড়িকটা কমে এল। যাদের পরীক্ষা, জেলের মধ্যে তাদের বিনা পয়সায় মাস্টার ঠিক হয়ে গেল। বেকার শিক্ষকরা পড়াবার ছাত্র পেয়ে সর্দিকাশি, মাথা ধরা, পেটের ব্যামো ভুলে গেলেন। আমরা বুড়োর দল মুখ টিপে হাসলাম।

কিন্তু বারোজনের একটি দলকে কিছুতেই বাগ মানানো যাচ্ছিল না। প্রত্যেকেই প্রায় গোঁয়ার-গোবিন্দ। সকালে মাটি মেখে তারা বারোজন কুস্তি করবে, সবার সঙ্গে না ব'সে বারোজন আলাদা বসে খাবে, বারোটা থালা একসঙ্গে পাতা এবং একসঙ্গে মাজা হবে, মিটিঙে বারোজন এক জায়গায় ব'সে সবাই ঠিক এক কথা বলবে, নিজেদের দলের নেতা ছাড়া আর কারো কথাই তারা শুনবে না, বাড়ি থেকে খাবার এলে শুধু ঐ বারোজনে ভাগ ক'রে খাবে আর সব সময় এটা কম হল ওটা কোথায় গেল—এই তাদের নালিশ।

তার ওপর সন্ধ্যে হলেই বারোজনের বারো রকমের গলায় শুরু হত তাদের থালা বাজিয়ে, কখনও কখনও বিশ্রী অঙ্গভঙ্গি ক'রে, বেসুরো বেতালা হিন্দী ফিল্মের যত সব ওঁছা গান। অপমান হওয়ার ভয়ে কেউ তাদের কিছু বলতে সাহস পেত না।

একদিন আর থাকতে না পেরে গট গট ক'রে উঠে গিয়ে ওদের সামনে দাঁড়ালাম। রাস্তায় কয়েকজন আমাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছিল, আমি শুনি নি।

ধমক দিয়ে বললাম, 'থামো।' বলতেই ওরা থেমে গেল। আমি তো অবাক। একটু ফাঁপরে প'ড়ে বললাম, 'এসব বাজে বাজে গান গাইছ কেন? ভালো গান গাইতে পারো না?'

একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'অন্য কোন গান তো জানি না।'

'আচ্ছা, কাল থেকে তোমাদের ভালো গান শেখাবার ব্যবস্থা হবে।'

আমি ওদের নাম দিয়েছিলাম 'মোট-বারো'। মোট-বারোর গান সেদিন সেইখানেই বন্ধ হল। আমাদের মধ্যে একজন ভালো গাইয়ে ছিলেন,

তাঁকে ধরলাম মোট-বাবোকে শেখাতে হবে।

ও হরি, দুতিন দিন পর দেখি মোট-বাবো আবার যে-কে সেই। সেই থালা বাজিয়ে ফিল্মি গান। উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম, ওরা শিখতে গিয়েছিল হাঁকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভদ্রলোককে গিয়ে জিগ্যেস করলাম, তিনি বললেন—মাপ করুন, ক'দিন আগে যে ভাষায় ওরা আমাকে গালাগাল দিয়েছে, তাতে আবার ওদের গান শেখাব অতটা বৈষ্ণব আমি নই।

অতএব হাল ছাড়তে হল।

কিন্তু যতদূর সম্ভব মাঝেমধ্যে সন্ধ্যেগুলো ভরাবার চেষ্টা হল যুক্তফ্রন্টের মিটিং, রাজনৈতিক বক্তৃতা, ঈদ মহফিল, বর্ষশেষ ও নববর্ষের উৎসব—এমনি রকমারিভাবে। রোজই কিছু না কিছু স্বদেশী গানের আয়োজন থাকল।

বর্ষশেষের দিনে আমাদের মন্ত্রী দেওপ্রকাশ রাইয়ের যে জন্মদিন এটা কিভাবে যেন জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। কাজেই তাঁকে না জানিয়ে ভেতরে ভেতরে ব্যবস্থা হতে লাগল। ক'দিন পরে জানা গেল, আমাদের এক তরুণ অধ্যাপকেরও ঐদিনে জন্ম। কাজেই জোড়া জন্মদিনের ব্যবস্থা হল।

জন্মদিনে মন্ত্রীমশাই সবাইকে অবাক ক'রে দিয়ে নেপালী ভাষায় নিজের লেখা তিনটি ছোট ছোট কবিতা শোনালেন। পুরো মনে নেই। অনেকটা এই রকম :

বাগান আলো ক'রে আছে ফুল। ফুল শুষছে পাতাকে ; পাতা শুষছে ডালকে ; ডাল শুষছে গুঁড়িকে ; গুঁড়ি শুষছে শেকড়কে ; শেকড় শুষছে মাটিকে।

কিংবা ঃ জগতের এককোণে দেশ। দেশের এককোণে ঘর। ঘরের এককোণে আলমারি। আলমারির এককোণে গয়না আর শাড়ি। তাকেই কি বলবে তোমার জগৎ, হে নারী।

আমরা আনিয়েছিলাম জোড়া জোড়া মালা আর ফুলের তোড়া।

আশি বছরের বৃদ্ধ সত্যাগ্রহীকে কিছু বলতে বলা হল। তিনি বললেন—ভেবেছিলাম বলব না, কিন্তু সত্যি কথাটা বলাই ভালো। একমাত্র আমি পারি জন্মদিনে এঁদের আশীর্বাদ করতে। এঁরা আমার চেয়ে একজন

টায়-টায় চল্লিশ এবং একজন টায়-টায় পঞ্চাশ বছরের ছোট। কেননা আশি বছর আগে বছরের ঠিক এই শেষ দিনটাতে আমিও জন্মেছিলাম। অবশ্য জীবনে কোনদিনই আমার কখনও জন্মদিন হয় নি।

আর কিছু বলবার আগেই সানন্দে হাততালি আর হৈ হৈ-তে সভা ভেঙে যাবার দাখিল। জন্মদিনের মালিকের সংখ্যা দুই থেকে তিনে উঠে গেল। দুজনের ফুল আর মালা তিনজনকে ভাগ ক'রে দেওয়া হল। তারপর গান, আবৃত্তি, কবিতাপাঠ, হাস্যকৌতুকে জমজমাট বছরের এই শেষ দিনটা আমাদের সকলের মনেই আমৃত্যু গাঁথা হয়ে থাকবে।

যুক্তফ্রন্টের নির্দেশমত জামিন নিয়ে জেল খালি ক'রে যেদিন আমরা চলে আসছি, সেদিন এক কাণ্ড।

জেলখানায় গড়ে-ওঠা যুক্তফ্রন্টের বিরাট যৌথ পরিবারটি ভেঙে দিয়ে আমরা যে যার ঘরে ফিরছি। ফিরছি আরও বেশি ঐক্যের সঙ্কল্প আর সম্ভাবনা নিয়ে। আমাদের জয় অনিবার্য, এ বিশ্বাসে আরও বেশি দৃঢ়তা নিয়ে। কিন্তু তাহলেও কোথায় যেন একটা ব্যথা কাঁটার মত বিঁধছে। সুখেদুঃখে সকলে একসঙ্গে মিলে জেলখানায় যুক্তফ্রন্টের সংসারে বেশ ছিলাম। এই ভাবভালবাসা বাইরেও যাতে বজায় থাকে, তার জন্যে আমাদের মধ্যে নামঠিকানা নেবার ধুম পড়ে গিয়েছিল।

মধ্যে মধ্যে এক-এক ব্যাচ নাম ডাকা হচ্ছে আর বাকি সবাই গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ঝোলাঝুলি নিয়ে অপেক্ষা করছি। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে সমস্বরে গান ভেসে এল। গলায় গলা মিলিয়ে সুন্দর সুরে স্বদেশী গান।

অচেনা গলা। কারা গাইছে দেখতে হয়। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম। ডাকঘরের বারান্দা থেকে গানটা ভেসে আসছে।

বারান্দায় পা ঝুলিয়ে ব'সে—হ্যাঁ, ওরাই তো গাইছে—মোট-বাবোর দল। নিজের চোখ এবং কান—দুটোর কোনোটাকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না।

কাছে গিয়ে দেখি ওদের খাতায় গান লেখা। খাতা দেখে দেখে গাইছে।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এসব গান পেলে কোথায়?

কেন? ক'দিন ফাংশনে এই গানগুলোই তো গাওয়া হল। শুনে শুনে আমরা শিখে নিয়েছি।

বিশ্বাস করুন, এরা সেই থালা-বাজানো ফিল্মের-গান-গাওয়া আমাদের সকলের মুখনাড়া-খাওয়া মোট-বাবোর দল।

নিজের কানে না শুনলে, নিজের চোখে না দেখলে আমারও বিশ্বাস হত না।

এইখানে এসে ফুরুল আমার রাস্তার গল্প।

'পরিচয়' পত্রিকার আগামী সংখ্যাগুলিতে ম্যাক্সিম গর্কি ও প্রমথ চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ এবং কার্ল মার্কস-এর দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে।

কান পেতে শোনো

মণীশ ঘটক

কোথায় বেখেছো শঙ্খ, আবর্জনাস্তূপে কোন ফাঁকে ?
খোঁজো, খোঁজো, আজ যে পূর্ণিমা। নিঃশব্দ নিশীথে
কান পেতে শোনো তাব কাছে গিয়ে ধ্যানমৌন চিতে
অশান্ত সাগব এক কল্লোলিয়া তোমাবেই ডাকে ॥

———

আদিগন্ত বিশাল পৃথিবী

যতীন্দ্রনাথ পাল

আদিগন্ত বিশাল পৃথিবীটা
বিশাল পৃথিবীটা
দুলতে দুলতে চলেছে
চারদিকের নক্ষত্ররাজির মধ্য দিয়ে
ঘাস, গাছ, পাহাড়পর্বত নদী, প্রান্তর নিয়ে—
উজ্জ্বলতম ইতিহাসের
অধ্যায়ের দিকে।
আদিগন্ত বিশাল পৃথিবীটা
উড়তে উড়তে সেই স্বর্ণ-শিখরের দিকে চলেছে।
ম্রিয়মাণ পাণ্ডুর ঘাস গাছ পাহাড় পর্বত নিয়ে!
পাণ্ডুর ঘাসগাছ তখন
সজীব উজ্জ্বল হয়ে উঠবে,
ম্রিয়মাণ পাহাড় পর্বত নদী তখন
সঙ্গীতমুখর হবে—
আর সংখ্যাহীন অগণিত
সোনালি শস্যের ছবি
কাঁপবে রুপালি জলের বুকে।

আদিগন্ত বিশাল পৃথিবীটা দুলতে দুলতে
আমাদের হৃদয়ের সেই
অত্যাশ্চর্য স্বপ্নের তেপান্তরে চলেছে
অগণিত কুতূহলী নক্ষত্ররাজির মধ্য দিয়ে
অন্ধকার ভেঙে
অন্ধকার ভেঙে॥

মারাঠী কবি কেশবসুতের কবিতা

উর্দুভাষীর কাছে হালী যেমন, বাঙালীর কাছে যেমন মধুসূদন দত্ত, তামিলভাষীর কাছে যেমন সুব্রহ্মণ্য ভারতী বা গুজরাতির কাছে নর্মদ, তেমনি হলেন কেশবসুত (১৮৬৬-১৯০৫ খ্রী) মারাঠীদের কাছে। উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশে যে জাতীয় জাগরণের সূচনা হয়েছিল, এই সব মহান কবিরা সেই যুগের ভারতীয় সাহিত্যে তাঁদের কালজয়ী স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

কেশবসুত যদিও একালের কবি, তাঁর জন্মদিন নিয়ে নানা মতভেদ দেখা যায়। তাঁর বিষয়ে নিশ্চিত করে যতটুকু বলা চলে তা হল এই যে তাঁর রচিত ১৩২টি কবিতার একটি ছোটো বই তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। উনিশ শতকে ভারতে যে নূতন যুগের সূচনা— রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে যুগের পরিপূর্ণ সার্থকতা আমরা দেখতে পাই, সেই যুগের তিনটি বিভিন্ন ধারা যেন কেশবসুতের কাব্যে মিলিত হয়েছে। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য হল বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিশ্বদেবতাকে প্রত্যক্ষ করার প্রয়াস, বিদেশী শাসন থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং সর্বপ্রকার সামাজিক অন্যায়ের শৃঙ্খল চূর্ণ করে মানুষকে তার আত্মমর্যদায় প্রতিষ্ঠিত করার আবেগ। মারাঠী কাব্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার স্তরে প্রকৃতিকে স্থান দিয়েছিলেন কেশবসুত। তিনিই আবার প্রকৃতিকে পৌঁছে দিয়েছিলেন অতীন্দ্রিয়তার আধ্যাত্মিক রাজ্যে। মারাঠী ভাষার প্রেমের কবিতায় কেশবসুত আর এক দিক থেকে অগ্রণী। প্রেমের বিষয়ে তাঁর মনে কোনো সঙ্কোচ ছিল না — না ভাবে না ভাষায়। নারীদেহের প্রতি পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণের কথা তিনি বেশ খোলাখুলিভাবে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। উপনিষদ্‌ ও কালিদাসের কাব্যে যে ভাবধারার সূচনা, যে ভাবসমুদ্রের ধ্রুবতারা ছিলেন ওয়ার্ডস্বার্থ, শেলি ও ব্রাউনিঙ— কেশবসুত পাড়ি দিয়েছিলেন সেই সমুদ্রে।

বন্ধুর ঘর

এইখানে ছিল বন্ধুব বাসাখানা
একদিন হেথা কত ছিল আনাগোনা
বন্ধু মোদেব সব বন্ধন ছেড়ে
স্বদেশেব তবে দিয়েছিল আপনাবে

বন্ধন ছাড়া জগতে মুক্তি নাই
বন্ধনে বাঁধা গোটা সংসাবটাই।
তাবকায দেখ, মণ্ডল ছেড়ে গেলে
পুড়ে খাক হয় শূন্য আকাশ তলে।

সূর্যেব প্রতিফলিত আলোব শশী
ঘবণীব হাতে বন্ধ অহর্নিশি।
সে-বাঁধন ছেড়ে সূর্যেব সেবা কবা
সর্বনাশেব আগুনে পুড়িযা মবা।

ধবণীবে ছেড়ে বন্ধু ছাড়িল ঘব
স্বদেশ সেবায এমনি সে তৎপব।
ঘব ছেড়ে গেছে অন্য শহবে চলে
দবজাব তাবে মস্ত কুলুপ ঝোলে।

কতদিন গেছে স্বদেশেব কথা তুলে
আহাব নিদ্রা সকলি গিযেছি ভুলে,
হাহুতাশ কত কবেছি যে অবিবল
সকলে মিলিযা ফেলেছি চোখেব জল।

কত বাত ভোব হয়েছে পাখিব ডাকে
সে সব খবব এখন কে আব বাখে,
শীতল বাতাসে উঠেছে কুসুম ফুটে
বাতেব আঁধাব প্রভাতে গিযেছে টুটে।

তখন বলেছি কবে ভোব হবে বাতি
নূতন দিনেব জ্বলিবে উজল বাতি,
রবিব কিবণে ঝলসিবে মহাকাশ
ঝটিতি টুটিবে পবাধীনতাব পাশ।

সে আলো সেদিন নাই যদি দেখি চোখে
ধিক্ এ জনম এই দাসত্বলোকে,
স্বদেশেব তবে কবিব কি প্রাণপাত—
উষাব দুয়াবে হানিব কি কবাঘাত।

কত প্রশ্নই কবেছি পবস্পবে
হর্ষবিষাদে সুখী দুখী অন্তবে—
প্রবোধ দিযেছি সকলেই সকলেবে—
'ইচ্ছা থাকিলে উপায ঠেকাবে কে বে।'

এখন বন্ধু কোথায গিযেছ চলে
হয়ত প্রেবণা দিতেছ অপব জনে
স্বদেশেব তবে আপনা বিসর্জনে।

দুযাব তোমাব বন্ধ দেখিযা খেদে
বিবহে আমাব পবাণ উঠিছে কেঁদে,
তোমা সনে দেখা হবে কি আবাব মোব
এই কথা ভেবে নযনে বহিছে লোব।

মুদিত কমলে দেখিযা ভ্রমব বলে
'মিত্র আসিযা খুলে দেবে শতদলে।'
তেমতি আমিও গুঞ্জবনবত অলি
ব্যথিত হৃদযে ঘবপানে ফিবে চলি।

ইংবেজি থেকে অনুবাদ **ক্ষিতীশ রায়**

টোটেম থেকে প্রতীক

দিবাকর রায়

'টোটেম' শব্দটি এসেছে উত্তব আমেবিকাব উপজাতিক শব্দভাণ্ডাব থেকে। গত পঞ্চাশ বছবে টোটেমেব উৎপত্তি নিয়ে বেশ কিছু অনুমান এবং তথ্য জমা হযেছে, কিন্তু কোনটাই শেষ কথা হিসাবে গণ্য হয নি। স্যর জেম্স্ ফ্রেজাবেব প্রকল্পটিই সবচেয়ে সুপবিচিত। তাঁব ধাবণায, আদিম মানবেরা গর্ভসঞ্চাবেব জৈবিক কাবণ জানত না, ভাবত তাবা যা খাবাব খায় তা থেকেই গর্ভে সন্তান আসে এবং এই বিশ্বাস নিয়ে তাবা এক শ্রেণীব গাছপালা এবং জন্তু জানোযাবেব প্রতি (যা তাদেব খাদ্য) তাদেব অনুগত্য প্রকাশ কবত। এভাবেই টোটেমিজমের সৃষ্টি (দি মেথড অব এথনলজি অ্যাণ্ড সোশাল অ্যানথ্রোপলজি, এ. আব ব্যাডক্লিভ ব্রাউন, পৃ ১৬-১৭ শ্রীনিবাস সম্পাদিত)। ববাট ব্রিফল্ট ('মাদাব', সংক্ষিপ্ত সংস্কবণ। পৃ ২৫) এবং আব. ব্রাউন, এঁদেব দুজনেবই ধাবণা, যে সব জীবজন্তুব ওপব আদিম মানুষ তাব খাদ্যের জন্য নির্ভব কবত, সে সম্পর্কে তাব মৌল কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক আব এটাই তাব টোটেম।

টোটেমেব উৎপত্তি নিয়ে আলোচনার অবসব এই প্রবন্ধে একেবাবেই নেই। বর্তমান লেখক ১৯৬০ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত (উপজাতীয) চা-বাগান শ্রমিক এবং কাছাকাছি অঞ্চলেব কযেকটি উপজাতিব মধ্যে টোটেম সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান চালান। লেখকেব অনুসন্ধানেব বিষয় ছিল প্রধানত

তিনটি : ১ কত টোটেম প্রচলিত আছে। ২. টোটেমধারীদের অর্থ নৈতিক শ্রেণীবিভাগ করা। ৩. টোটেম ও আদি প্রতীকের মধ্যে (ইমেজ বা সিম্বল) কোনো সম্পর্কে আছে কিনা নির্ণয় করা। 'পার্টিসিপ্যান্ট অবজ্ঞাবভেশন' অনুসারে এই অনুসন্ধান চালানো হয়। সংবাদ সংগ্রহ, সাক্ষাৎকার এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যাপক এবং সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।[১]

১ জরিপের এলাকা এবং জনসংখ্যা

আলিপুরদুয়ার থানা

(১৯৪১ সালের জনগণনা অনুসারে)

ইউনিয়ন। অঞ্চল	মোট উপজাতির সংখ্যা	লেখক কর্তৃক সমীক্ষিত উপজাতির সংখ্যা ও পরিবার	
১	২	৩	
		জনসংখ্যা	পরিবার
তুড়তুড়ি	২৮৩৯	১০০০	২০০
কোহিনুর	১০২৬	৭০০	১৪০
ধওলাঝোড়া	৭৩৮	৫০০	১০০
সাঁওতাল কলোনি	৩৪৪১	৩০০	৬০
	৮০৪৪	২৫০০	৫০০

১ অন্যান্য সূত্র :

১. ১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট।

২. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপজাতির গবেষণা।

কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত 'ফ্যাক্টস অ্যাণ্ড ফিগার অ্যাবাউট দি শিড্যুল্ড ট্রাইব্‌স্।' উক্ত সংস্থার অ্যা ডাইরেকটর কর্তৃক পত্র নং এম।৫১।৭৩২ সি আর আই।৫৯ তাং ২৭।৫।৫৯ দ্বারা লেখককে প্রেরিত।

৩. 'টোটমিজম ইন্ ইণ্ডিয়া', জে ভি. ফারীয়ারা (অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস)।

৪. 'প্রফাইল অব্ ট্রাইবাল কালচার ইন বিহার', সচ্চিদানন্দ।

২। সমীক্ষিত জনসংখ্যার জাতিগত বিবরণ

অঞ্চল	মদেশীয়া (ওঁরাও, খড়িয়া, মহালি, লোহার, খাসি, মালপাহাড়িয়া ভূমিজ, অখৃস্টান, সাঁওতাল)		রাভা (বাইডাক ফরেস্ট রেঞ্জ এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চল)		সাঁওতাল (খৃস্টান)	
(১)	(২)		(৩)		(৪)	
	জনসংখ্যা	পরিবার	জনসংখ্যা	পরিবার	জনসংখ্যা	পরিবার
তুড়তুড়ি	৬০০	১২০	১০০	২০	৩০০	৬০
কোহিনুর	৪০০	৮০	×	×	৩০০	৬০
ধওলাঝোড়া	৩০০	৬০	×	×	২০০	৪০
সাঁওতাল কলোনি	×	×	×	×	৩০০	৬০
	১৩০০	২৬০	১০০	২০	১১০০	২২০

সমীক্ষিত জনসংখ্যার বিশদ বিবরণ ওপরের তালিকা থেকে বোঝবার কোন অসুবিধে নেই। এবার আলোচনার মূল বিষয়ে আসা যাক।

এই আলোচনার প্রথম বিবেচ্য বিষয় কত রকম (সংখ্যাগতভাবে) টোটেম এই অনুসন্ধানের ফলে পাওয়া গেছে,—তিন নম্বর তালিকায় এ ব্যাপারে সব খবর দেওয়া হল।

৩. কত রকম প্রচলিত টোটেম

টোটেমের মুখ্য শ্রেণী বিভাগ	মুখ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সংগৃহীত টোটেমের সংখ্যা
ক পরিচিত গাছপালা।	১০০
খ জন্তুজানোয়ার, সরীসৃপ, কীটপতঙ্গ, পাখি, বিভিন্ন খাদ্যশস্য	৫০
গ. বিভিন্ন ধাতু, মাটি, অস্ত্র, কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন শস্য	২০০
ঘ. নদী, মাছ, বনজ উপদেবতা	১০
ঙ অবোধ্য কিম্ভূতকিমাকার দুর্বোধ্য টোটেম	৫০০
	৮৬০

মোট আটশো ষাটটি টোটেম এই অনুসন্ধানের ফলে সংগ্রহ করা হয়েছে। বিশদ তালিকা সংক্ষিপ্ততার জন্য বাদ দেওয়া হল এবং পাঁচটি শ্রেণীতে টোটেমের চরিত্র অনুসারে শ্রেণী-বিভাগ করা হল। এখন দেখতে হবে এই জনসংখ্যার কার কী ধরনের টোটেম এবং অর্থনৈতিক চরিত্র।

চার নম্বর তালিকায় এবং তারপরের টীকায় এ-ব্যাপারে যাবতীয় খবর দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

৪. কোন্ জাতির কত লোকের কোন্ টোটেম

উপজাতির নাম ও টোটেম অনুসারে জনসংখ্যা

টোটেমের শ্রেণী (সাঙ্কেতিক চিহ্ন)	মদেশীয়	রাভা	সাঁওতাল	মোট জনসংখ্যা
ক	১০০	×	১০০	২০০
খ	৩৮০	×	৩০	৪১০
গ	৫০	×	৩০০	৩৫০
ঘ	৭০	×	৬০০	৬৭০
ঙ	৭০০	১০০	৭০	৮৭০

মোট আড়াই হাজার মানুষের মধ্যে ৮৬০টি টোটেম কিভাবে প্রচলিত আছে, ওপরের তালিকায় তার বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে। 'ক' শ্রেণীর টোটেম সবচেয়ে কম লোক গ্রহণ করেছে এবং 'ঙ' শ্রেণীর টোটেম সবচেয়ে বেশি লোক গ্রহণ করেছে। এবার দেখানো হচ্ছে, টোটেম অনুসারে বিভাজিত জনসংখ্যার রুজি-রোজগার এবং টাকা-পয়সার অবস্থা কার কেমন :

'ক' শ্রেণীর টোটেম

(জনসংখ্যা = ২০০)

জমিতে কায়েমি স্বার্থ আছে। বাঙলায় ৩০-৬০ বছর বাস করছে।

'খ' শ্রেণীর টোটেম

(জনসংখ্যা = ৪১০)

জমির পরিমাণ অল্প, নিজের জমি অন্যকে দিয়ে চাষ করায় কিন্তু নিজে অন্যের জমিতে মজুরি নিয়ে কাজ করে। বাঙলাদেশে পুরুষানুক্রমে ৩০-৬০ বছর বাস করছে।

'গ' শ্রেণীর টোটেম

(জনসংখ্যা = ৩৫০)

হাতের কাজ করে। জমি নিজের নেই কিন্তু বন্ধকী জমি অল্প-দিনের জন্য নেয় এবং খেতমজুর দিয়ে চাষ করায়। নগদ পয়সা এদের হাতে আছে। লগ্নি কারবারও ব্যাপকভাবে করে। বাঙলাদেশে ১০-২০ বছর কাজ করছে।

'ঘ' এবং 'ঙ' শ্রেণীর টোটেম

(জনসংখ্যা = ১৫৪০)

গোপালন, মেষপালন, শূকরপালন, হাঁস মুরগির ব্যবসা, সরকারি বনবিভাগে মজুরি নিয়ে কাজ করে এবং বিচ্ছিন্নভাবে ঝুম চাষ করে। অভাবের মাসগুলোতে চা-বাগানে কিছুদিনের জন্য নানা কাজ করে। চামড়ার ব্যবসা করে, জাল দিয়ে মাছও ধরে। ৩০-৬০ বছর বাঙলা দেশে আছে।

'ক', 'খ' এবং 'গ' শ্রেণীর টোটেম যাদের মধ্যে প্রচলিত তাদের কাল-চারাল বা সংস্কৃতিগত লক্ষণ প্রায় একই প্রকার। সামান্য ইতরবিশেষ ও পার্থক্যের বিশদ আলোচনা এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তুও নয় এবং তা সম্ভবও নয়। সুতরাং উল্লিখিত তিনটি টোটেমিক গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক লক্ষণকে ব্যাপকভাবে একই প্রকার ধরা হয়েছে, যদিও গুণগত এবং মানগত পার্থক্য প্রচুর আছে।

এরা নানা ঋতু ও অনুষ্ঠানকে নাচ এবং গান দিয়ে প্রকাশ করতে চায়, পালা-পার্বণ এবং অনুষ্ঠান সৃষ্টি করে, ব্রতপূজা এবং লোকদেবতার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করে। স্ত্রীলোককে ও জমির উর্বরা শক্তিকে এরা এক করে ভাবে, যে কোন মানবিক প্রচেষ্টাকে রিচ্যুয়ালের মাধ্যমে প্রকাশ-প্রবণ। এদের বাস্তুশিল্প, ছবি, মূর্তি গঠন, অলংকার-রচনা বেশ উন্নত।

'ঘ' এবং 'ঙ' টোটেমিক গোষ্ঠীর গানে কথার ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে, গান শুধু মাত্র স্বরমাত্রিক। সাধারণত উপজাতি জগতে গান এবং নাচকে অনুষ্ঠানভিত্তিক এবং আনন্দকেন্দ্রিক এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

কিন্তু ধর্মীয় বা আনুষ্ঠানিক নাচ আলোচ্য টোটেমিক গোষ্ঠীর মধ্যে কম। এরা গান এবং নাচ শুধুমাত্র নিজেদের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যবহার করে, রিচুয়্যালের সংখ্যা খুব কম, যে রিচুয়্যালগুলি আছে সেগুলো খুব সংক্ষিপ্ত। অপদেবতার ভয় এবং সেই ভয় থেকে মুক্তি পাবার প্রবল ইচ্ছা জীবনের সর্বক্ষেত্রে অবক্ষয়রূপে প্রকাশিত। অপদেবতার নানা অদ্ভুত অবোধ্য মূর্তি প্রচলিত আছে।

এই অনুসন্ধানের তৃতীয় পর্যায়ের বিষয় আদি প্রতীক এবং টোটেমের কোন সম্পর্ক থাকলে তা নির্ণয় করার চেষ্টা করা। এই বিষয়কে তথ্য-নির্ভর ও প্রমাণযোগ্য করার জন্য আরও ব্যাপক সর্বভারতীয় সমীক্ষার প্রয়োজন। সুতরাং এটা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই যে, এই অনুসন্ধানের তৃতীয় পর্যায় কিছুটা সীমাবদ্ধভাবে করা হয়েছে।

আদিম সংস্কৃতি

উপজাতীয় (আদিম) সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির মধ্যে অনেক প্রভেদ। কৃষিব্যবস্থার একটা নির্দিষ্ট অগ্রগতি ও কায়েমি স্বার্থের পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা ও বিভাজন হলে সেই অবস্থায় লোকসংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বাঙলার মঙ্গলকাব্য, নানা ব্রতকথা। নতুন লোকদেবতা, বাউল প্রভৃতি মানবিক সহজিয়া ধর্ম, সারি-জারি গান ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু আদিম সংস্কৃতিতে গান এবং নাচ পুনরাবৃত্তিতে ভরা, একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন, অবক্ষয়িত। উপজাতি সংস্কৃতি বলতে সেই 'সভ্যতা'কেই বোঝাবে যা মূল জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে নিতান্ত সর্বহারা শ্রেণীরূপে দিন গুজরান করে। এই আলোচনার 'ক', 'খ', 'গ', টোটেমিক গোষ্ঠীকে প্রথম শ্রেণীতে এবং 'ঘ' এবং 'ঙ'-কে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ফেলা যায়। ওপরের টোটেমিক গোষ্ঠীগুলির টোটেমগুলি কি করে আদি প্রতীক হিসাবে জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে সেটা পরিষ্কার বোঝবার জন্য এই পটভূমিকার প্রয়োজন আছে। টোটেম কি করে প্রতীকে (প্রতীক এবং চিত্রকল্পকে এক ভাবা হয়েছে। পার্থক্যমাত্র এই যে প্রতীক আদিতমরূপ এবং চিত্রকল্প পরিশোধিত-রূপ) পরিণত হয় নীচে তার উদাহরণ ('ক' শ্রেণীকে অবলম্বন করে) দেওয়া হল। ক-খ-গ-ঘ-ঙ শ্রেণীর টোটেম এই পদ্ধতিতেই প্রতীকে পরিণত হয়।
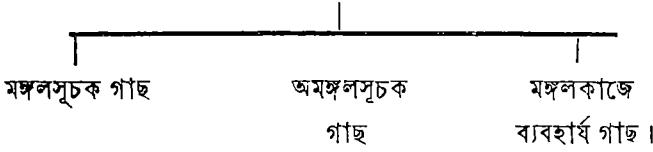
মঙ্গলসূচক, অমঙ্গলসূচক এবং মঙ্গলকাজে ব্যবহাব কবা হয এমন বৃক্ষকুলেব—তুলনামূলকভাবে অগ্রসব হিন্দু প্যানথিযনেব (বটগাছ, তুলসিগাছ, পাকুড়গাছ, নিমগাছ, তমালগাছ, যজ্ঞডুমুব গাছেব উল্লেখ কবা যেতে পাবে)—উৎপত্তি নিয়ে নানা কাহিনীব সৃষ্টি হয এবং এই কাহিনীগুলো বিচুযালের মাধ্যমে সামাজিক অনুষ্ঠানে রূপ পায এবং ব্রতপূজা ও ব্রতকথাতেও পবিণত হয়। তৎপরবর্তী পর্যায়ে নাচে, গানে, ছবিতে এমন কি বেশভূষায পর্যন্ত সেই প্রতীকেব ব্যবহাব স্পষ্ট হযে ওঠে। পববর্তীকালে টোটেমিক গোষ্ঠীব বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণী অগ্রসব সভ্যতা বা প্যানথিযনে স্বশ্রেণী খুঁজে নেয এবং তাদেব সঙ্গে মেলবাব চেষ্টা কবে। এই সমযে অগ্রসব সভ্যতা ও আদিম সংস্কৃতির প্রতীকের দেযা-নেয়াব পালা চলে। এই জন্যই হিন্দু প্যানথিয়নেব দেবদেবীর প্রত্যেকটি বাহনই টোটেমিক। শুধু তাই নয, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, উপনযন, ব্রত, পার্বণ, লোকদেবতা ও তার পূজা সব কিছুব মধ্যে টোটেমিক চিহ্ন আছেই আছে।

তাড়নামূলক প্রতীক

উপজাতি ('ঘ' এবং 'ঙ') সংস্কৃতিব প্রতীক প্রধানত তাড়নামূলক। অর্থাৎ কোন অদৃশ্য 'দেও'কে তাড়না কবার জন্য প্রতীকেব ব্যবহাব কবা হয। বিচুয়ালেব মাধ্যমে প্রতীককে কেন্দ্র কবে এই তাড়নাব কাজ চলে। কিন্তু রিচুযাল দৈহিক ভঙ্গিনির্ভব। কতকগুলি দৈহিক ভঙ্গির সহযোগে প্রতীকেব ব্যবহাবই একটা অনুষ্ঠান। উদাহবণস্বরূপ, বাভাদেব একটি অংশেব টোটেম কাষ্ঠখণ্ড বা সোজা কথায় একখণ্ড লাঠিব আকাবেব কাঠ। ঝুমচাষেব জমিতে রাভাবা যখন কোন শস্য বোনে, তাব আগে মেযেবা দুটো ছোট্ট কাঠ বাজিয়ে মাঠটি প্রদক্ষিণ করে, তাতে তাদেব ধাবণা পোকা-মাকড,

পাখি, হরিণ প্রভৃতি শস্যের ক্ষতিকর উপদ্রবগুলো কম থাকে। বর্ষাকালে কোন এক সময়ে 'ঙ' টোটেমিক গোষ্ঠীর লোকে 'দেও' পূজা করে। যাদের পাথর টোটেম তারা এই সময়ে ছোট ছোট পাথরের ঢিল নিয়ে একটা পোষা মুরগিকে জঙ্গলের দিকে তাড়িয়ে দেয়, অর্থাৎ এইভাবে যেন সব অশুভ শক্তিকে (=দেও) হটিয়ে দেওয়া হল।

১ উপজাতীয় সংস্কৃতিতে ব্রতপূজা নেই, ২. কিংবদন্তি নেই; ৩. ছবি সামান্য আছে। তবে সবই টোটেমচিহ্ন দিয়ে অশুভ শক্তিকে তাড়নার চিত্র, পরে সেই চিহ্ন দিয়ে (রক্ষাকবচ হিসাবে) নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যকে চিত্রিত করে। হিন্দু প্যানথিয়নে নারায়ণ শিলা এবং বালেশ্বর শিলা এই বিমূর্ত টোটেমের উদাহরণ। হিন্দু সমাজে ঝাঁটা, কুলো, কাঠ, কলসি, ডালাকে (গ্যাম্নি পূজো, সুবচনী পূজা, তিন্নাথের মেলা প্রভৃতি) তাড়নামূলক আধা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয়।

এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত টোটেমিক গোষ্ঠীর টোটেম কিভাবে প্রতীকে পরিণত হয়েছে এবং আদিম সমাজের নানা মানবিক সৃষ্টিতে তার প্রকাশ কিভাবে হয়েছে বর্তমান লেখক তা ব্যাপকভাবে সংগ্রহ করেছেন। পৃথকভাবে সেইসব তথ্য প্রকাশিত হলে আশা করা যায় আলোচিত তথ্যের নির্দিষ্ট প্রমাণ খুব পরিষ্কারভাবে মিলবে।

পদসঞ্চার

অশোক ভট্টাচার্য

প্রত্যেকটি লাইটপোস্ট হেলানো ছিল ,
আব প্রত্যেকটি তির্যকরশ্মিব বেখা
বিসর্পিল রাস্তার উপব পিছলে পিছলে
প্রত্যেকটি অষ্টাবক্র মানুষকে পথ দেখাচ্ছিল—
বন্ধুব এক প্রান্তর পেরিয়ে,
অসমতল এক অঙ্গনের দিকে···

ছিন্নভিন্ন তাবেব বৈদ্যুৎজটিলতায খালি একটা চন্দনা
চমকে
চমকে
চমকে উঠছিল ।

অথচ সবাব স্বপ্নে সটান সহজ ঋজু এক একটি
আলোব স্তম্ভ ছিল ;
কেননা সমস্ত ছায়াব দিগ্বলযগুলি আলোকোজ্জ্বল
অক্ষাংশে আব দ্রাঘিমায
দ্রাঘিমায আব অক্ষাংশে
আকীর্ণ বিকীর্ণ হযে ধূসবপ্রসব হযে বিস্তৃত হযে ছিল
স্বচ্ছ স্রোত ছিল,
সাবলীল স্বাভাবিক বহতা ছিল,
উত্তবঙ্গ সমস্ত উচ্ছ্বাস পেরিযে—
আদিগন্ত এক সৈকত ছিল ।

আব
আব
আব বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক
এক একটি প্রতীক্ষা ছিল ।

ভাসান

নবারুণ ভট্টাচার্য

"The time has come", the Walrus said,
"To talk of many things."
Alice in Wonderland

অভাবনীয়ভাবেই আমি লোকচক্ষুর অন্তরালে মরিলাম। রাস্তায় সে রাত্রে মহা হট্টগোল। বিজয়া দশমীতে মা তাঁহার ফ্যামিলি কন্ট্রোলের নিয়মের একটি বেশি সন্তান লইয়া, সংগ্রামী সহস্র দণ্ডায়মানকে চোখের জলে ভাসাইয়া ট্রাকে করিয়া যাইতেছিলেন। যে ট্রাকে করিয়া রাত্রির আঁধারে ভূতের ন্যায় দুর্লভ চালের বস্তারা শহর ঘুরিতে বাধ্য হয় সেই ট্রাকে। দিনের বেলায় উহারা বাহির হইতে পারে না। তাই মধ্যরাত্রই উহাদের গুদাম হইতে গুদামে চালাচালির প্রশস্ত সময়। মা-ও রাত্রিতেই চলিয়াছেন। ঢাক, ব্যাণ্ড, তাসার আওয়াজ এবং পটকার শব্দ মিলিয়া এক আশ্চর্য সিম্ফনির সৃষ্টি করিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে ঋত্বিকের দল দুর্গা মাতার জয় চারণের ন্যায় লোককর্ণে ঘোষণা করিতেছিল। আমিও মরিলাম এমনই সময়।

যে পাগলিটিকে আমি কোনদিনও ভালবাসি নাই, সে আমার পাশে বসিয়া অঝোরধারে কাঁদিতেছিল আর কী যেন গাহিতেছিল। আমি তাহার সব সঙ্গীত শুনি নাই, প্রকৃতপক্ষে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শুনিতে পারি নাই। তাহার কারণ, যে পার্কে আমি মরিতেছিলাম তাহার সামনেই রাস্তা। বড় বড় বাস, ট্রাম সব কিছুই চলে। গত যুদ্ধের সময় কনভয়ও গিয়াছিল। আমি বুড়া পাগল রাধানাথের মুখে শুনিয়াছি। রাধানাথ গত বৎসর বাস চাপা পড়িয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। রাস্তা হইতে নানাবিধ উল্লাসের ধ্বনি

আসিতেছিল। তাহাই আমার নিকট বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। পাগলিটিকে কোনদিনও আমি ভালবাসি নাই। মরিবার সময়েও নয়। তাহার জন্য আমি দুঃখবোধ করিতেছিলাম।

আমার শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল। পার্কের বাসিন্দা ডেঁও পিঁপড়ারা মহানন্দে আমার উপর নাচানাচি করিতে লাগিল। আমার তখন দিব্যকর্ণ লাভ হইয়াছে। শুনিলাম তাহারা দীর্ঘদিন মনুষ্যচক্ষু খায় নাই। "কী আনন্দ, কী আনন্দ"। তাহাদের নাচানাচির মধ্য হইতে কয়েকটি বুদ্ধিমান পিঁপড়া তাহাদের বাকি দলবলকে ডাকিতে গেল। দীর্ঘদিন পূর্বে এই মাঠেই আমি একটি মিটিং শুনিয়াছিলাম। লাল পতাকার উপর কাস্তে-হাতুড়ি আঁকা ছিল। লোকটি কী সব বলিতেছিল—সকলের খাইবার দাবি। হঠাৎ কালো গাড়ির ভিতর হইতে পুলিশ নামক জীবেরা দৌড়িয়া বাহির হইয়া মাঠ ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পর মার্ মার্ কাট্ কাট্ কাণ্ড। তাহার সমস্ত বিবরণ আমি দিব না। আমি শুধু একটি লাল পাগড়ি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। মধ্যে মধ্যে সেটি গভীর রাত্রে মাথায় পরিয়া সারা পার্ক টহল দিতাম অথবা প্রস্রাবখানার দরজার সামনে দাঁড়াইয়া থাকিতাম। গত বৎসর রাধানাথের মৃত্যুর দিন সেটি চুরি গিয়াছে। এ বৎসর দুই দল আসিয়া মিটিং করিল। দুইজনেরই পতাকার রঙ লাল। একদল কাস্তে-হাতুড়ি-তারা অঙ্কিত ফেস্টুন, অন্য দল কাস্তে-ধানের শীষ অঙ্কিত ফেস্টুন ঘাড়ে করিয়া আসিয়াছিল। একদল শুনিলাম বলিল রাস্তার ডান ধার দিয়া যাহারা চলে তাহারা শয়তান, অন্যদল বলিল বাঁ দিক দিয়া অসভ্যদেরই আনাগোনা। তাহার পর মার্ মার্ কাট্ কাট্ কাণ্ড। তাহার সমস্ত বিবরণ দিব না। এবার আমি কিছু কুড়াইয়া পাই নাই। এত কথা বলিলাম একটি কারণে। সেই প্রথমবারের লোকটির কথা এখনও আমার মনে আছে। সে থাকিলে সুখী হইত। পিঁপড়ারা অন্তত তাহার কথামতো কাজ করিতেছে।

যাহা হউক, এমন সময় রাস্তায় ব্যাণ্ডের আওয়াজ পাইলাম। কাহারা যেন ঠাকুর লইয়া যাইতেছে। পাগলিটি হঠাৎ বেশ জোরে কাঁদিয়া উঠিল, আমার নাকের নিকটে কান আনিয়া কী যেন শুনিতে চেষ্টা করিল, রাস্তায় প্রচণ্ড শব্দে একটি বোমা ফাটিল, পার্কের রেলিংগুলি থরথর করিয়া কাঁপিয়া

উঠিল, আমি মরিলাম। চোখ খুলিয়াই মরিলাম, জলতেষ্টা লইয়াই মরিলাম, সারা আকাশে তারাদের দেখিতে দেখিতেই মরিলাম। মরা চোখে দেখিতেছিলাম পৃথিবী কী সুন্দর। আমারই মতো।

ডেঁও পিঁপিড়াদের নিকট হইতে মাঠের ইঁদুরেরা জানিল, ইঁদুরদের নিকট হইতে কুকুরেরা জানিল, কুকুরদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া গুটিকয় বিড়ালও আসিল। পাগলিটি সারারাত আমাকে আগলাইয়া বসিয়াছিল। সারারাত কুকুরগুলি বিড়ালদের আমার নিকটে আসিতে দেয় নাই। পাগলিটি একটি ঠ্যাঙা হাতে করিয়া কুকুরগুলিকে গালমন্দ করিয়া ঠেকাইতে লাগিল। কুকুরগুলি অত সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়। শেষরাত্রে একচোখ কানা কালো কুকুরীটি পাগলির বাধা অতিক্রম করিয়া আমার পেটের দিকে একটি কামড় মারিল। পাগলির তাড়ায় ফিরিয়া যাইতে হইলেও সে আমার কাপড়টি ছিঁড়িয়া দিল। দিগম্বর অবস্থাতেই থাকিলাম। আমার আর কি? মরিবার পূর্ব অবধি আমি পাগল ছিলাম, মরিবার পরে আমার উন্নতি হইয়াছে। গুণগত উৎকর্ষে আমার আনন্দ হইল। আমার আর লজ্জা করিল না। মনে হইল আমি বোধহয় মুনিপ্রবর হইয়াছি। পিঁপিড়াদের ন্যায় আমিও বলিলাম, "কী আনন্দ, কী আনন্দ"। পিঁপিড়ারা তাহাদের কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। আমার ডান চক্ষু এবং বাঁ চক্ষুর মধ্যে যে একটি গোপন পথ আছে তাহা আমি জানিতাম না। ডেঁওর দল এক চোখ দিয়া ঢুকিয়া অন্য চোখ দিয়া বাহির হইতেছিল। পথটি কিছুক্ষণ বাদে পুরনো হইয়া যাওয়ায় তাহারা নাক ও কান, কান ও চোখ ইত্যাদি নূতন নূতন পথ খুঁজিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পাগলি উহাদের দেখিতে পায় নাই। পাইলে নিশ্চয়ই মারিয়া তাড়াইত। ভোরের আলো ফুটিলে পাগলি আমার মুখের কাছে মুখ আনিয়া জানিতে চাহিল আমি জল খাইব কিনা। আমি বাপু কী আর বলিব? সে আমার হাঁ-মুখ দেখিয়া ভাবিল আমি বোধহয় জল খাইতে চাহিতেছি। সে একটি টিনের কৌটা লইয়া জল আনিতে গেল।

আমি সেই সময় এক রাত্রির কথা ভাবিতেছিলাম। পাগলি ফিরিয়াই আবার ছেলেভুলানো গান আরম্ভ করিবে। একটানা সেই টানিয়া টানিয়া সুর শুনিতে শুনিতে অতীতের কোনকথাই মনে আসে না। সে অনেকদিন

পূর্বের কথা। পাগলি তখনও এ পার্কে আসে নাই। রাধানাথ তখন জীবিত। শীতের রাত্রি। আমি বসিয়াছিলাম। গরম কালেও যাহা পরি তাহা পরিয়াই। আমার ওভারকোটটি। কোথায় যেন ঐটিকে কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। কোটটিকে এখনও আমি হারাই নাই। আমার মাথার কাছেই সেটি আছে। যাহা হউক, আমি তো বসিয়া আছি। এমন সময় একটি বৃহৎ লম্বা গাড়ি আসিয়া পার্কের ধারে থামিল। গাড়িটি বড় ভালো। চলিলেও শব্দ প্রায় হয় না। দুই বাবু একটি কি পোঁটলা হাতে করিয়া নামিলেন। পার্কের বাহির হইতে পোঁটলাটা ছুঁড়িয়া ভিতরে ফেলিয়া দিয়াই তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। নিঃশব্দ গাড়ি নিমেষে উধাও হইল। আমি বেশ ভয় পাইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম উহারা এত তাড়াতাড়ি কেন করিল? কিছুক্ষণ বাদে সাহস করিয়া আগাইয়া গিয়া পোঁটলাটা খুলিয়াছিলাম। এক অতি ক্ষুদ্র শিশু। চোখ হয় নাই, নাক নাই, এইটুকু ছোট্ট আলুর ন্যায় মাথা—আমার বড় মায়া হইল। সারারাত উহার পাশে বসিয়া পাগলির মতো ঠ্যাঙা লইয়া কুকুর তাড়াইয়াছিলাম আর মনে হইয়াছিল যাহারা উহাকে ফেলিয়া গেল তাহারা যদি আবার ফিরিয়া আসে। তাহারা আসে নাই। আমার কেন জানি না মনে হইয়াছিল আমিই ঐ শিশুটির পিতা। উহাকে কুকুরের ক্ষুধা মিটাইতে দিব না। ভোরে লোক আসিয়াছিল, পুলিশ আসিয়াছিল। একটি কালো গাড়ি আসিয়াছিল। তাহার গায়ে শাদা ক্রশচিহ্ন। দুটি খাকি পোশাক পরা লোক একটি স্ট্রেচার লইয়া আসিয়াছিল। অত বড় স্ট্রেচারের মধ্যে অতটুকু শিশুটিকে বড় একলা লাগিতেছিল। আমাকে উহারা যাইতে দেয় নাই। পুলিশ আমাকে থানায় লইয়া গিয়াছিল। আমাকে কী সব জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। সব কথারই উত্তর দিয়াছিলাম। উহারা এ উহার মুখের দিকে অবাক হইয়া তাকাইয়াছিল, তাহার পর আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। আমি ঠিক পথ চিনিয়া চিনিয়া পার্কে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। হঠাৎ আমার কেন আজকে কথাটি মনে হইল বুঝিলাম না।

কিছুক্ষণ বাদে, পাগলি জল লইয়া আসিল। আমার মুখে ঢালিল, মাথায় ঢালিল। তাহার পর আঙুল দিয়া আমার চুলে বিলি কাটিয়া দিতে লাগিল। সকাল খরতর হইল। রৌদ্রতেজ বাড়িল। আমার

মুখ ও মাথাব জল শুকাইযা গেল। পাগলি গান বন্ধ কবিযা আমাব মুখেব দিকে তাকাইযা বহিল। ক্রমে একটি-দুটি করিযা লোক জড়ো হইতে লাগিল। তাহাবা চলিযা গেলে নূতন লোক আসিযা শূন্যস্থান পূবণ কবিতে লাগিল। লোক আবও বাড়িল। নানা ধবনেব লোক। একটি দাড়ি-ওযালা চশমাধাবী ছেলে শুনিলাম পাগলিকে দেখাইযা তাহার বন্ধুকে বলিতেছে, 'দেখেছিস। অ্যাবস্ট্রাক্ট বেহুলা'। বুঝিলাম না কথার মানে কি। অনেকেই আমাকে দেখিয়া মুখ হইতে কুকুব জল খাইবার সময়ে যে রূপ শব্দ কবে সেইরূপ শব্দ বাহিব কবিতেছিল। বুঝিলাম না ঐরূপ করিবাব কাবণ কি।

বেলা বাড়িল। পুলিশ আসিল। পাগলিকে কি সব জিজ্ঞাসা কবিল। পাগলি উত্তব দিল না। একদৃষ্টে আমাব মুখেব দিকে সে তাকাইয়াছিল। সেই কালো গাড়িটা আসিল। দুটি লোক একটি স্ট্রেচাব আনিল। লোক দুটিকে চিনিলাম। বুড়া হইযা গিযাছে। আমাকে তুলিতে গিযাই বিপদ হইল। পাগলি কিছুতেই আমাকে ছাড়িবে না। দুই বুড়া উত্তোলিত ঠ্যাঙা দেখিযা অগ্রসব হইতে সাহস পাইল না। এক পুলিশ পাগলিকে সবিযা যাইতে বলিল। পাগলি তাহাকে গালি দিল। পুলিশ লাঠি তুলিযা উহাকে মাবিতে গেল। পাগলি আচমকা পবনেব কাপড় উঠাইযা পুলিশকে বলিল মা দেখিতে। পুলিশটা চোখে হাত চাপা দিয়া 'বাম বাম' বলিতে বলিতে হটিযা আসিল। সমবেত লোকেবা এইবাব পাগলিকে চলিযা যাইতে বলিল। স্ট্রেচাব বাহকেবা আমাকে তুলিযা লইল। কালো গাড়িব ভিতবে আমাকে সশব্দে নামাইল। দবজা বন্ধ কবিযা দিল। চতুর্দিকে অন্ধকাব। শুনিতে পাইলাম পাগলি চিৎকাব কবিযা কাঁদিতেছে। হঠাৎ মনে হইল আমাব কোটটা তো বুড়াবা সঙ্গে আনিল না। মনে হইল থাকুক, পূজা তো হইযা গেল, শীত আসিতেছে। পাগলি গাযে দিবে।

পাগলিব কান্না এখনও শোনা যায়। গাড়িটা গব্ গব্ শব্দে কাঁপিতেছে। মনে হইল চলিলাম। আবও মনে হইল পাগলিকে আমি বড়ো ভালবাসি। কালো গাড়ি চলিতে থাকিল।

———

মানুষ ঘোড়া

"কথা নয় কাজ'—শেষেব দিকে নিখিল বিশ্বাসেব এক ছবিব মাথায় লেখা। মৃত্যুব আগে তিন চাব বছব নিখিল এক প্রেবণাতীব্র উদ্বেলতায় নিজেকে ছুঁড়ে দিয়েছেন সাদা কাগজে কালি কলম চাবকোল অয়েলেব সুতীক্ষ্ণ বৈচিত্র্যে। এই সাদা-কালোব ওপব এত ঝোঁক কেন? কেন সব ছেড়ে এই তীক্ষ্ণতায় আশ্রয়? নিখিলেব সাম্প্রতিক প্রদর্শনীতে পা দিয়েই এ প্রশ্ন মনে আসে।

প্রশ্নেব উত্তব শিল্পেব মূলকথায়। শিল্পী সাহিত্যিক এমন একটা পথ হাতড়ায় যে পথে হাঁটতে হাঁটতে এক বিস্তীর্ণ সম্ভাবনাব প্রান্তবে দাঁড়ানো যেতে পাবে যা একেবাবে নিজস্ব আবাব ঐতিহ্যে সম্পৃক্ত। আব সে যখন সেই পথেব নিশানা পায় তখন সে তাব গভীব আত্মবিশ্বাসে পাগল। নিখিল হাতড়ে হাতড়ে এক আশ্চর্য সাদা কালোব তীব্র জগতে নিজেকে আবিষ্কাব কবে। আব সে তখন নিজেকে ঢেলে দেয় কথায় নয় কাজে। এ কাজেব রূপ আমাদেব কালেব যন্ত্রণাব এক আশ্চর্য বিমূর্ত রূপ।

এ রূপ শুধু তাঁর অগ্নিময় ঘোড়ায় নয় মানুষেব ভাঙা মুখে, উত্তোলিত হাতে, দুমড়ানো মুচড়ানো দেহেব স্পন্দমান বেখায় বেখায়। তাঁর ঘোড়া শুধু শবীবতাত্ত্বিক অনুশীলন নয়। তাঁর ঘোড়াও মানুষ, মানুষও ঘোড়া। এক তীব্র বিদ্যুৎ-খচিত কালো বড় কাগজেব সাদায় ঘুবতে ঘুবতে

উঠেছে নেমেছে একক বা অনেক মুখে, পিঠে ঘাড়ে, প্রলম্বিত জানুতে, পায়ের পাতায়। মাঝে মাঝে এ ঝড় স্তব্ধ যেমন প্রবল শক্তিমান এক পেঁচার স্তম্ভিত রেখায়, পর মুহূর্তেই তরঙ্গায়িত বাইসনে। বস্তুত সমস্ত জীব জগৎই এক বিরাট যন্ত্রণাবিক্ষুব্ধ জগতের বাসিন্দায় পরিণত। খ্রীষ্টও এই আলো আঁধারের সংগ্রামে এক উজ্জ্বল চিত্রকল্প।

বিষয়-বিরহিত সৌন্দর্যচর্চায় নিখিলের অবিশ্বাস স্পষ্ট। আন্দাজ করা যায় এ ব্যাপারে তাঁর এক চাপা রাগ ছিল। গড়নের প্রথায় তিনি প্রথাসিদ্ধ হতে চান নি, গড়নের ভাঙাচোরায় বরং তাঁর ঝোঁক। কিন্তু এ চেষ্টা আল্গা হয়ে নেই, সারা ছবি জুড়ে। এ বোধ যদি আধুনিক শিল্পীদের আর একটু বেশি থাকত, তাহলে নিখিলের মতো তাঁদের শিল্প-কর্ম সম্পর্কে বোধহয় দায় বাড়ত আরও খানিকটা।

কবিতা আঁকা

প্রকাশ কর্মকারের মেজাজ অন্য। গত তিন বছরে তাঁর কাজের যে প্রদর্শনী শহরে হল, তাতে আমরা দেখলাম এক চমৎকার আধুনিক কবির দৃষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত সচেতন কুশলী শিল্পীর রঙের ব্যবহার। এই স্তিমিত তেলের রঙের ব্যবহার কখনও কখনও নীরদ মজুমদারের ক্যানভাস স্মরণে আনলেও প্রকাশের স্বকীয়তা অনস্বীকার্য। এই স্বকীয়তার প্রধান গুণ ছবির অখণ্ড কল্পনা, যার ফলে তাঁর এই ছোট প্রদর্শনীর বেশির ভাগ ছবিই এক্সপেরিমেন্ট থেকে উত্তরণ।

কোন কোন সমালোচক প্রকাশের ছবিতে বীভৎস রসের সন্ধান পেয়েছেন, কেউ টেনে এনেছেন জনৈক আমেরিকান শিল্পীর তুলনা। যেমন আমাদের কবিতা আলোচনায় খোঁজা হয় বোদেলিয়ার র‍্যাঁবো-উপন্যাসে মোরিয়াক সার্ত্-কে। এ উপমাবিলাস অবাস্তব। আমেরিকান শিল্পীর অবয়বে বিশেষ করে মুখে অস্পষ্টতার প্রবল বিকৃতি প্রকাশের প্রায় কোন ছবিতেই নেই। বীভৎস রসের সন্ধানও আমরা পাই নি, বরং প্রকাশ তুলির মারফত এক আশ্চর্য সজীব আধুনিক কবিতা এঁকে-ছেন, যার আকর্ষণ প্রবল। দীর্ঘদিন ধরে, কখনও দু তিন বছর জুড়ে এই তেলরঙের কাজে প্রচুর যত্ন ও পরিশ্রমের ছাপ। এই খয়রি ধূসর আবির-ধূসর পাটকিলে নীল হলুদের আশ্চর্য সংযত ব্যবহারে

আমাদেব চোখ শুধু টানেই না, ধবে বাখে। আমাদেব আশা, কেবল শিল্পীব আছড়ে পড়া উন্মাদনায নয এইভাবে ভেবে ঠেকে দেখে পর্বে পর্বে উত্তবণেব মাবফত প্রকাশ আবও এগিয়ে যাবে তাব সংযমে যত্নে এক সমৃদ্ধ আধুনিক মানসেব রূপাযণে। ছবিতে কতখানি সেজান্ আসছে কতখানি ঠাট আসছে এ ব্যাপাবে আমাদেব উৎসাহ সাময়িক। আমাদেব উৎসাহেব ভিত আবও পাকা হয যখন আমবা উপলব্ধি কবি এই সব সেজান্ পট ছাড়িযে কিংবা নিযেই শিল্পী আমাদেব সামনে মেলে ধবেছেন এক স্বকীয জীবন্ত জগৎ।

না-য়ের মখমলে

আমাদেব প্রায প্রত্যেকেবই প্রথম যৌবন না-বলাব গবমে গম্‌গম্। না যদি কেউ বলতে না পাবে তাহলে সে কেবল অতীতেব জোগানদাব, ব্যক্তি কিংবা শিল্পী হিশেবে কাবিগব নয। প্রত্যেক যুগে পুনবাবৃত্তিব চ্যালেঞ্জেব সামনে মানুষ দাঁড়ায না বলে যাতে পুবনোয নতুনেব বঙ ধবে, আপ্তবাক্য দাঁড়ায বাক্যে। এই ঝকঝকে শাণিত হাতিযাবে কিন্তু মবচে ধবে যেখানে না-বলা একটা ঠাট কিংবা অভ্যাস মাত্র। এই অভ্যাসেব দাস কিন্তু আমবা অনেকেই হযে পড়ি। আমাদেব মধ্যে যাঁদেব জীবনে একদা উদ্দেশ্য ছিল, যাঁবা পুবনোয নতুন বঙ ধবাতে মনস্থ কবেছিলেন, তাঁবা শেষ পর্যন্ত এই লক্ষ্যভ্রষ্ট না-য়েব মখমলে আশ্রয নেন। এ নেতিবাদ এক ধবনেব পেথিড়িন যা ব্যথাজর্জব মানসের বন্ধ্রে বন্ধ্রে ঢুকে আমাদেব বুঁদ কবে বাখে। সঙ্গে সঙ্গে আমবা এক আহাম্মুকী স্বর্গে উপনীত হই। সব কিছু নস্যাৎ কবে আমবা বলি এমন একেক-জন মধ্যযুগীয সুলতান যাঁবা অনেক কিছু কবতে পাবেন, কিন্তু কিছু কবেন না এবং শেষ পর্যন্ত কিছু কবাব প্রযোজনীযতাও অস্বীকাব কবায গৌববান্বিত হন। মজাব কথা, এই সুলতানবা শুধু অফিসে পাড়ায কফি হাউসেই আসব জাঁকিযে নেই, আমাদেব মধ্যেই এবা মাথা তোলে। আব একটু ঢিল দিলেই আমবা তখন এই সুলতানদেব ক্রীতদাস।

———

২

—ঠিক বাঙলারই—

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

এবা সব আছে বেশ।
খায-দায, ঘুবে-ও বেড়ায ;
হল্লা শুনে থেমে যায পথের কিনাবে—
পলাযন, পিঠ বাঁচাবাব প্রযোজন অত্যন্ত জরুবি।
হযতো ইংবেজি জানে, ফরাশি, জর্মানি,
কাবণ
মাঠের ঘোড়াব মত মুখে-মুখে অনর্গল ছোটায ফোয়াবা,
যদিচ সমস্ত খাঁটি দেশজ প্রতিমা নয,
হাওযা বয দুবন্ত মার্কিনী।

তবুও এদেবই ছাখো ভাঁড়ে মা ভবানী—
আত্মদান, প্রণযেব ভাষা, বীতি একই
যা ছিল
তোমাব আমাব বুড়ি ঠাকুমাব কালে—
মর্ত্যেব মন্দাকিনী চিবন্তন গতি যাব শতমুখী বাঙলাব সাযবে।

এমন কি অশ্রুব স্বাদ লবণাক্ত,
বিচ্ছেদে বিষাদ আজো অতীব প্রাকৃত,
অভিমান, বেদনাব ট্রেন ছেড়ে দূবে চলে গেলে,
কংক্রিট, পুলেব শব্দে ম্রিযমাণ
একা ঘবে ফেবাব ভঙ্গিমা অসহায, অনির্বচনীয।
বাঙলাব সূর্যাস্ত ঠিক বাঙলাবই,
যথার্থ উদয মানে মনে-মনে গড়ে ওঠা আসন্ন সকাল
অশ্বত্থেব মত ঋজু, সুকঠিন, নযনলোভন।

কেরানি বধূ

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

এ প্রতীক্ষা বাঘিনীর, ওৎ পেতে ক্ষীণকায় কোনো এক দুর্বলের ভয়—
সে হোক গৃহে বা বনে লক্ষ্মীর বিহনে কোনো হেঁসেলে বা ঝোপের আড়ালে।
নিবু নিবু দেহপ্রাণ অথবা ধৈর্যের বাঁধ খুঁটে খেতে দুহাত বাড়ালে
বাঘিনী এবং ঘরে গৃহিণীকে জীবনের ভারে বড় ক্লান্ত মনে হয়।

স্বস্তি নেই, শাবকের ঠোঁটে চাই দুবেলার অন্নজল, হাসি,
স্বস্তি নেই, পায়ে পায়ে ব্যথা আছে, আছে দুঃখ, কান্না রাশি রাশি।
স্বস্তি নেই, বেড়ালের জান নিয়ে জীবনের ছকবাঁধা জাহাজে খালাশি—
স্বস্তি নেই, চাল নেই, তেল নেই, অর্থ নেই, নেই বারো মাস-ই।

অথচ যৌবনে ছিল স্বপ্ন কোন রাজগৃহে হৃদয়ের ঘর বাঁধবার।
প্রণয়ে রাজার বউ, দয়ামায়া ঈশ্বরীর, আর সব ভস্মীভূত বাঁচার আগুনে।
যে ক্ষোভের শেষ নেই, বাঘিনীর কোপ নিয়ে তার-ই ফুঁয়ে জ্বলে বারবার
রান্নার উনোন আর অভিমান যূপকাষ্ঠে বৈশাখে বা আষাঢ়ে ফাগুনে।

য যা তি

দেবেশ রায়

(পূর্ব-প্রকাশিতেব পব)

আমি মাঝে মাঝে ভাবি, এখন আব ভাবি না, আগে ভাবতাম, একসময় তো সর্বদাই যে, কী হযেছে গিরিজামোহন একটা নচ্ছাব, জোচ্চোব, তাতে আমাব কী এসে যায, কতোজনেব বাবাই তো এ বকম, কই, তাদেব তো আমাব মতো মাটিছাডা অবস্থা হয না। ভাবতাম বটে, কিন্তু ভেবে কোনো পথ পেতাম না। ভাবতাম বটে, কিন্তু ভাবাব ফলে গিবিজামোহনেব জীবন থেকে নিজেকে সবিযে নিতে পাবতাম না, পাবতাম না গিবিজামোহন-নিবপেক্ষ আমাব নিজস্ব স্বাধীন জীবনেব পবিকল্পনা কবতে।

কাবণ গিবিজামোহন তো শুধু আমাব জন্মদাতা মাত্র নয—আমাব চেতনা যখন নির্মিত হচ্ছিল মাত্র, তখন সেই চেতনাব সঙ্গে গিবিজা-মোহন একাত্ম হযে গেছে। আমাব জীবন বলতে আমি গিবিজামোহনেব জীবনেবই দ্বিতীয সংস্কবণ বুঝেছি জেনেছি। সেই বোঝা বা জানা বাইবে থেকে আযত্ত কবা কিছু নয, আমাব ভেতব থেকে, আমাব চিন্তা ভাবনা নিবপেক্ষ শবীবান্ত্রেব মতোই কোনো স্বতন্ত্র বিশিষ্ট ধাবণা। শবীবেব অধিকাব নিযে মানুষ জন্মায়, যে-শবীবেব গঠন ব্যাপাবে তাব নিজেব কোনো মতামত ইচ্ছা অনিচ্ছা খাটে না। মনেব অধিকাবও কি মানুষের তেমনই নয, মনেব গঠনেব ওপবই কি মানুষেব নিজেব পছন্দ খাটে।

আমাব মনেব ভেতব গিবিজামোহনেব মূর্তিতে কবে ফাটল ধবলো, কবে চিড ধবলো, কবে আসনেব ওপব সে মূর্তি টলে উঠলো, মূর্তিব আসনেব সম্মুখে উপবিষ্ট আমার আসনও যে একই ভূমিব ওপব ছিল,

তাই মূর্তি নড়ে ওঠার সঙ্গে করে আমার আসনটাও টলে উঠছিল আর কবে থেকে সেই ভূমিকম্প আমাকে অস্থির করে তুলেছে যে একটা কোনো জায়গাতে দুটো পা দিয়ে আমি দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছি না—তা আমি জানি না। এতো কোন নাটক নয় যে একটা বিশেষ অঙ্কের বিশেষ অঙ্কের বিশেষ দৃশ্যে ঘটনার সূত্রপাত। এতোদিন পর সেই ধারাবাহিক আত্মহত্যার কাহিনী মনে পড়ে না। যখন আত্মহত্যার ধারাবাহিকতা চলছিল তখন আমি জানতামই না—দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে মারবার এক প্রক্রিয়ায় আমি গ্রথিত। আর যখন তা জানলাম, সে-পর্ব শেষ হয়ে গেছে।

কলকাতা আসার পর থেকেই আমার চারপাশে অবিশ্বাসের একটা গোপন পরিবেশ ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছিল। আধা শীতের কলকাতার সন্ধ্যায় বাতাসে মিশেও আটকানো ধোঁয়া যেমন চোখে জ্বালা ধরায়। বড় কাকার বাড়িতে যেতাম প্রথম প্রথম। সন্ধ্যাবেলায় গেলে বড় কাকা গল্প করতেন। সব মিলিয়ে তাতে গিরিজামোহন সম্পর্কে নিরুচ্ছ্বাস থাকতো। এখন বুঝি সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু গিরিজামোহনের সহোদর, সুতরাং আমার নিজস্ব যুক্তি অনুযায়ী, সে তো গিরিজামোহনেরই ছায়া-পালিত,—এমন কিছু কি গিরিজামোহনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে যা তার ব্যক্তিত্বের দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত নয়। কলকাতায় আসবার পর, সেই বয়সে আমার নবলব্ধ স্বাধীনতাকে আমি আস্বাদ করি নি। আমি লক্ষ করেছিলাম, লক্ষ্যও ঠিক নয়, অলক্ষ্য অনুভূতির মতো আমার গোচর হয়েছিল বড় কাকার মনে গিরিজামোহনের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। ধীরে ধীরে বড় কাকার বাড়িতে যাওয়া আমি কমিয়ে দিয়েছিলাম, গেলেও বড় কাকার সঙ্গে গল্প করতে চাইতাম না। সেই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা—গিরিজামোহনের পরিবেশে থেকেও তার প্রভাবে প্রভাবিত না হওয়া। আরো পরে তো আরো নানারকম ঘটনাই ঘটেছিল। বড় কাকা আমাকে পরিষ্কারভাবে বলেন নি বটে কিন্তু বলতে চাইছিলেন যে গিরিজামোহন পিতৃসম্পত্তি থেকে তাঁকে ঠকিয়েছে। বড় কাকার পক্ষে পরিষ্কার করে না বলার কারণ এ-নয় যে গিরিজামোহন সম্পর্কে তাঁর কোনো নরম অনুভূতি ছিল। কারণ একমাত্র এই যে তেমন নিশ্চিত তথ্য ছিল না। সম্পত্তির হিশেব করলে গিরিজামোহনের পক্ষে সহজ

উত্তব আছে—'কবে তোমবা চেযেছ কবে আমি দেই নি। এখনো তোমাদেব হিশেবেই আমি সম্পত্তিব বক্ষণাবেক্ষণ কবছি।' আব বড কাকা ঋণ হিশেবে গিবিজামোহনেব কাছ থেকে যে টাকা নিযে-ছিলেন, সে টাকা শোধ দেন নি। দেন নি একমাত্র এই কাবণেই ঋণ হিশাবে, তিনি প্রকাশ্যত নেন নি এবং গিবিজামোহনও এমনভাবে দেয নি যাতে সেটাকে পিতৃ সম্পত্তিতে বড কাকাব প্রাপ্য অংশেব দাম বলে মনে না হওয়াব উপায থাকে। অথচ দুই ভায়েব কেউ-ই অপবেব আগে সেটা মনে কবে নি। গিবিজামোহন কবে নি। বড কাকা কবতে পাবে নি। আমি কি চেয়েছিলাম? গিবিজামোহন তাব পিতৃ সম্পত্তিকে তার ভাইদেব মধ্যে বন্টন কবে দিক? তাহলে গিবিজামোহনেব মূলধন আসতো কোত্থেকে যা দিযে সে শিল্পপতি হয়েছে, শিল্পপতিই শুধু না, যা দিয়ে সে নিজেকে গডেছে? আব যদি সে-মূলধন না আসতো তবে কি গিবিজা-মোহন নেহাৎ তাব পুত্রেবই হিবো হতে পাবতো? আব যদি তা না পাবতো তবে কি আমাবই এই ধাবাবাহিক আত্মহত্যাব পথে পা বাডাতে হতো? তাব মানে নিজেকে হত্যা কববাব এই ধাবাবাহিক কঠিন প্রক্রিয়াব মধ্যে বেঁচে থাকাব বদলে আমি আমাব শাবীবিক যন্ত্রের যোগসাজশে বেঁচে থাকতাম? না, গিবিজামোহনেব মূলধনে আমাব আপত্তি নেই। তবে কি আমি চেয়েছি যে গিবিজামোহন মিথ্যা ভডং না কবে চবিত্রকে আববণহীন উন্মুক্ত কবে সবাব সম্মুখে মেলে ধবে ডাকাতেব মতো লুঠ কববে? নিজের কাজ সম্পর্কে কোনো দুই বকম ব্যাখ্যাব সুযোগ বাখবে না বা কোনো একমাত্র ব্যাখ্যাব অনিশ্চযতা? আমাব দাদুব মতো সাবাজীবনেব সঙ্গী দাদাকে বলে দেবে, না, এ সম্পত্তি আমার, কোনো ভাগ তোমাকে দেবো না? তাহলে কি আমাব ভেতবে শক্তি আব বিশ্বাসেব আব বুদ্ধিমত্তাব ঐ মূর্তি তৈবি হতে পাবতো? আর সেই মূর্তি তৈবি না হলে কি আমি শক্তি আব বিশ্বাস আব বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে কোনো ধাবণা কবতে পারতাম? আব ধাবণা কবতে না পাবলে আমাব এই যৌবনকে কি কোনো অলৌকিক সাধনায নিযোজিত কবতে পাবতাম? —নিজেব বক্ত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন কবাব এই অলৌকিক সাধনায? না, গিরিজামোহনেব মূলধনে আমাব বিবাগ নেই, মূলধন সংগ্রহেব

পদ্ধতিতেও নেই। কিন্তু সেই উৎপাটিত মূলধনেব মূল থেকে, শিকব থেকে নিশিদিন, মাস মাস, বছর বছব ঝুবঝুব ঝুবঝুব কবে মাটি ঝবে পড়েছে আমাব দেহেব ওপব, যে-দেহে আলো উষ্ণতা। উষ্ণ সেই দেহে নিবন্তব কববেব মাটি ঝবে পড়ে আমাকে ঢেকে দিতে চেযেছে। উষ্ণ দেহেব ওপব মূলধনেব উৎপাটিত মূল থেকে কী বিপুল মাটি ঝবে পড়ে কতো দীর্ঘ সমযেব ব্যাপ্তি জুড়ে। আব ধীরে ধীরে ধীবে ধীবে যেন আমাব নিশ্বাস বেধে যায, যেন মাটিব শীতলতা আমাব শবীবেব উত্তাপ গ্রাস কবে অথচ সে শবীবটা তখনো পাশ ফিবতে পাবে, আমি পাশ ফিবেছি, মাটি ঠেলে বসতে চেযেছি কবব থেকে উঠে এসেছি গিবিজা মোহনেব পিতৃ পবিচয অস্বীকাব কবেছি, নিজেব বক্ত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন কবতে চেযেছি তবু তবু সেই উৎপাটিত মূলধনেব মূলে জডিত পৃথিবীব সব মাটি ঝবে ঝবে পড়ে আমার সর্ব অঙ্গে। যেখানেই যাই এ-কববেব মাটি থেকে কি আমাব পবিত্রাণ নেই। গিবিজামোহনেব মূলধনে আমাব আপত্তি নেই, শুধু সেই মূলধনেব মূল থেকে ঝুবঝুব মাটিব নির্ঝব থেকে থেকে আমি বাঁচতে চাই।

আমি তাই পিতৃত্বেব ব্যাপাবটাকেই বাবোযাবি কবে দিতে চেযেছি। কবে জানা নেই আমি বেশ্যাবাড়ি যাতাযাত শুরু কবি। ঘটনাটা নিশ্চযই এমনভাবে ঘটে নি বা কোনো একদিন ঠাণ্ডা মাথায বসে বসে নিজেব মনে আলোচনা কবে সিদ্ধান্ত নিযে আমি সেখানে যাতাযাত শুরু কবি। কলকাতাবাসেব সেটা আমাব দ্বিতীয় বৎসব। তাব আগে থেকেই গিবিজামোহন সম্পর্কে মোহমুক্তি ঘটছিল। প্রতিমায তখন সবেমাত্র কিছু চিডমাত্র ধবেছে আব ভেতবে ভেতবে বোধহয এই নিশ্চযতা জয়লাভ কবেছে যে এ-চিড কোনোদিন জোড়া লাগবে না, প্রতিমাটিকেই খানখান কবে ভেঙে না দিযে এ-চিড মাঝপথে থাকবে না। ক্লাশে যাওযা আমি কমিযে দিযেছিলাম। যেদিন ইচ্ছে হতো খাতা-বই নিযে যেতাম, যেদিন ইচ্ছে হতো না, সকাল থেকে বিছানাই ছাড়তাম না, সাবাদিন না-খেয়ে শুযে থেকে হয়তো সন্ধ্যাব পব একটু বেবোতাম। পবে, বাড়ি ফিবে আমি যখন একটা ঘরে নিজেকে আটকে ফেলেছিলাম—চাবপাশেব সবাই আশ্চর্য হযেছে। কিন্তু কলকাতাতেই সে অভ্যাস আমাব হয়ে গিযেছিল।

হস্টেলে আমাব সেই একা একা শুযে থাকাব সময কোনো বিশেষ একটি

চিন্তা বা অনুভূতিতে যে আমি আচ্ছন্ন হয়ে থাকতাম তাও নয়। আমি ঘুমিয়ে থাকতে চাইতাম, অন্ততপক্ষে আচ্ছন্ন। হয়তো চিন্তার সঙ্গে লড়াই করার শক্তি আমার ছিল না বলেই বা চিন্তাভাবনা অনুভূতির হাত থেকে পরিত্রাণ চাইছিলাম বলেই—স্বেচ্ছাকৃত আচ্ছন্নতায় আমি মগ্ন থাকতাম। পরে এটা আমার এতো ধাতস্থ হয়ে গিয়েছিল যে আমি প্রচুর ঘুমের ওষুধও ব্যবহার করেছি। আরো পরে বাড়িতে ফিরে ঘরে নিজেকে বন্দী করলে আর ঘুমের ওষুধের প্রয়োজন হতো না। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

———

একটি সাক্ষাৎকার :

গোপাল হালদার

প্রশ্ন

আপনাব প্রধান আকর্ষণ কি ? বাজনীতি না সাহিত্য ? যদি বাজনীতি ও সাহিত্যেব মধ্যে বেছে নিতে হয আপনি কোন্‌টা বেছে নেবেন ?

উত্তর

আমি আগেও বলেছি প্রথম জীবনে আমি কোনোদিন দুটোকে আলাদা ক'বে দেখি নি—আমাব কাছে সাহিত্য 'ন্যাশনাল সেল্‌ফ এক্‌সপ্রেশন'-এব অঙ্গ ছিলো। উনিশ শতকেব নবজাগবণেব চিন্তাধাবাতে এটা দেখতে পাই। ববীন্দ্রনাথ অবশ্য দুটোব ভেদবেখা মানতেন। আমি সাহিত্য আব বাজনীতিকে এক না বল্‌লেও পবস্পববিবোধী রূপে দেখতে চাই নি। স্বাধীনতাব আগেব যুগে আমাদেব প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিলো স্বাধীনতা। আমবা তো কোনোদিন ভাবতে পাবি নি যে স্বাধীন ভাবত দেখে যাবো। ছেলেবেলাব প্রশ্ন এসেছিল স্বাধীনতার পব কী কববো ? কলেজ জীবন পর্যন্ত ধাবণা ছিলো স্বাধীনতাব পব বাজনৈতিক কাজ থেকে বিটাযাব কববো। আসলে স্বাধীন হবাব পব এই সমস্যাটি তীব্র হযেছে। ৪৭-এব পব সংকল্প হলো এই স্বাধীনতাকে 'পিপল্‌স ডেমোক্র্যাসি'-তে পৌঁছে দিতে হবে। এবকম কথা আমি ৪৭ সালেব ১৫ আগস্ট একটি সভাতে বলেও ছিলাম—সভাটিব আযোজন কবেছিল উত্তব কলকাতাব কমিউনিস্ট পার্টি। মোটেব

ওপর কখনো ভাবি নি রাজনীতির জন্য সাহিত্য ত্যাগ করার প্রয়োজন আছে। রাজনীতিকেও আমি ততো সংকীর্ণ করে দেখি না। জেলে অনেক কিছু লিখেছি—ব্যাপক সাহিত্যচর্চা যাকে বলে, অথচ রাজনীতিই ছিল তখন প্রধান আলোচ্য। জেলে বসেও আমার পরিকল্পনা ছিলো বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উত্থান-পতন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা।

প্রশ্ন

এ বিষয়ে আপনি কিছু লিখেছেন ?

উত্তর

প্রবন্ধ গ্রন্থ হিশেবে লেখার অসুবিধা ছিলো। প্রথমত জেলে ব'সে রেফারেন্সের বই সংগ্রহ করা সব সময়ে সম্ভব ছিলো না। দ্বিতীয়ত প্রবন্ধের টুকিটাকি নোট্‌স থাকলে পুলিশের সন্দেহ ও দৌরাত্ম্য বাড়তো। তাই ভাবলাম উপন্যাসের মাধ্যমে এই ইতিহাস যা বুঝেছি তা বিবৃত করা যাক—১৮৫৮ থেকে ১৯৩০ খ্রী পর্যন্ত তিন পুরুষের কাহিনী নিয়ে লিখলাম ভূমিকা, উজানগঙ্গা, জোয়ারের বেলা আর তারপর ভাঙনীকূল, নবগঙ্গা, স্রোতের দীপ। মাঝখানের দু-একটি খণ্ড (স্বদেশী যুগ) লেখা হয় নি। স্বদেশী যুগ বিষয়ে ভালো ক'রে পড়াশোনা ক'রে, রেফারেন্স সব মিলিয়ে লেখার ইচ্ছে ছিলো। জেলের মধ্যে লেখা হলো না—ভেবেছিলাম জেল থেকে বেরিয়ে লিখবো। যাই হোক রাজনীতি আর সাহিত্য বিরোধী পথ ছিলো না। তবে এখন আর তেমন সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারি না।

প্রশ্ন

আপনার কি মনে হয় না পুরো রাজনীতি ক'রে সাহিত্য করা যায় না, বা পুরো সাহিত্য ক'রে রাজনীতি সম্ভব নয় ? কোনোটাই আধা সময়ের কাজ নয় ?

উত্তর

কোনো একটা কাজে মানুষের জীবন সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মত গ্রহণীয়—পূর্ণতা (কম্‌প্লিটনেস) লক্ষ্য। আমরা কেউ কমপ্লিট নই, আমরা চেষ্টা করতে পারি মাত্র। রাজনীতিতে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা সম্ভব নয়। যেমন, আমাদের সময়ে এমন কাউকে দেখি নি যে দেশপ্রেমিক নন—স্বাধীনতা চাইতেন না এমন লোক আমি

জানি না। অবশ্য সবাই তাব জন্য দাম দিতে হয়তো প্রস্তুত ছিলেন না। অনেক মনীষী মনে কবতেন স্বাধীনতা আন্দোলনই দেশেব একমাত্র কাজ নয়, যাব জন্য এটাই সবাব প্রাথমিক কর্তব্য হবে। তাই ব'লে তাবা স্বাধীনতা চাইতেন না এমন মনে কবাও ভুল হবে। আমাব দাদাব (বঙিন হালদাব) মতে বুড়ো কজ্-এব সঙ্গে আইডেন্টিফাইড না হ'লে দৃষ্টিভঙ্গিব প্রসাবতা আসে না। তাঁব মতে বড়ো কাজ অবশ্য সমাজবাদী রূপান্তব—তাঁব ধাবণা হিস্টবিকাল মেটিবিয়ালিজম জানলে ঘটনাব গতি নির্ধাবণ সহজ হয়।

প্রশ্ন

আপনি কোনোদিন ব্যক্তিগত ভাবে বাজনীতি নিবপেক্ষ (আপলিটিকাল) হন নি?

উত্তব

সক্রিয়ভাবে সব সময়ে বাজনীতি না কবলেও কোনোদিন বাজনীতি নিবপেক্ষ ছিলাম না। হ'তে পাবলে হয়তো আপত্তি নেই।

প্রশ্ন

আপনি একটু আগে বলেছেন যে-গ্রন্থটি আপনি প্রবন্ধপুস্তক হিশেবে লিখবেন ভেবেছিলেন, সেটি উপন্যাসে রূপ দিলেন। আপনাব কি মনে হয় সাহিত্যেব মাধ্যমেব এবকম ইচ্ছামত পবিবর্তন অনায়াসে কবা যায়? না আপনি এই দুটো মাধ্যমেই খুব অভ্যস্ত?

উত্তব

দুটো মাধ্যম আলাদা—উপন্যাস জনপ্রিয়। তাব প্রভাবও বেশি, তাব প্রভাব স্থায়ীও হয় বেশি। আমি সাহিত্যে কতটা কেপেব্‌ল সে বিষয়ে আমাব সন্দেহ আছে। সাহিত্যকে একমাত্র কাজ ব'লে নিলে আমি কতটা সাহিত্য লিখতে পাবতাম সে বিষয়েও আমাব সন্দেহ আছে। পূর্ণোদ্যমে সাহিত্যে কন্‌সেনটেট কবতে পাবি নি—বাজনীতিতেও পাবি নি। আমাব কোনো কোনো বন্ধু একেবাবে বাজনীতিগত প্রাণ—বাজনীতিব বাইবে কোনো অস্তিত্ব নেই। আমি এ ধবনেব একনিষ্ঠ মানুষকে শ্রদ্ধা কবি। তবু আমাব মনে হয় এদেব কতকগুলি সীমাবদ্ধতাও আছে। আমি তো পুবো মন ঢেলে দিয়ে কোনো একটা কাজ কবতে অবসব পাই

না। বাজনীতিব ফাঁকে মনে হয স্থনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যাযেব কাছে ভাবততত্ত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা শুনে আমি, অথবা কোনো ছবিব প্রদর্শনী দেখি। কিংবা দেখি কোনো একটা নতুন জাযগা, বা পুবনো স্থাপত্য।

প্রশ্ন

আপনি কি 'প্রগতিশীল সাহিত্য' ব'লে কোনো শ্রেণীবিভাগ মানেন ?

উত্তর

শ্রেণীবিভাগ হিঁশেবে মানি। প্রত্যক্ষ বাজনীতি না কবেও প্রগতিশীল লেখক হওযা যায। ছুটো জিনিশ থাকা দবকাব: প্রথম জীবননিষ্ঠা (লযালটি টু লাইফ), দ্বিতীয পাবপাসফুলনেস। এটাকে শুধু সোশাল পাবপাস বললে সংকীর্ণ কবা হয। জীবনপ্রেম এব মূল স্থব ব'লে কোনো যন্ত্রণা বা সাফাবিংস থাকবে না তা নয। প্রতিবোধেব প্রাণশক্তিই বড়ো কথা।

প্রশ্ন

আপনাব লেখা চব্বিশ পঁচিশটি বইযেব মধ্যে বিশেষ কোনো বইযেব প্রতি আপনাব দুর্বলতা আছে ?

উত্তব

যে বইটি লেখা হয নি তাব জন্য দুর্বলতা আছে। প্রকাশিত বচনাব মধ্যে 'বাজে লেখা' ও 'একদা'ব জন্য বিশেষ মমতা অনুভব কবি। কঠিন অস্থখেব সময 'একদা' লেখা—ভেবেছিলাম ম'বে যাবাব আগে অন্তত একটি উপন্যাস লিখে যাবো। একদিনেব কাহিনী নিযে উপন্যাসেব পবিকল্পনা কবি—লিখতে লিখতে অনেক বড়ো হযে গেলো। 'একদা (১৯৩৯)'ই আমাব প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। উপন্যাসটিব একটি সুন্দব ইংবেজি অনুবাদ কবেছেন মার্টিন নামে একজন ইংবেজ সৈনিক। কলকাতায যুদ্ধেব সময় এসেছিলেন। শ্রীপবিমল চট্টোপাধ্যাযেব তর্জমার ভিত্তিতে তিনি ১৯৪৮ সালে এই অনুবাদটি পাঠান। ইংবেজি অনুবাদটি পি. পি. এইচ. থেকে প্রকাশিত হবে।

প্রশ্ন

আপনাব না লেখা বই বলতে কি বিশেষ কোনো গ্রন্থেব পবিকল্পনা আছে ?

উত্তর

দুটো বই লেখার ভীষণ ইচ্ছে। একটি হচ্ছে কোয়েশ্চেন অফ কমিউ-নিস্ট এথিক্স—বর্তমান সময়ে বাঙলা দেশে ভালো-মন্দের সংঘাত। তবে কেবলমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দ্বন্দ্ব নয়, আরো সামগ্রিক আলোচনা আমার লক্ষ্য। জীবন যে-কোনো নৈতিক মূল্যবোধের চেয়ে বড়ো,—মানবতাও তাকেই স্বীকার ক'রে মানবিক হয়ে ওঠে। আরেকটি উপন্যাস লেখারও ইচ্ছে—মোটামুটি ১৯৪৭ থেকে '৬৭ সাল এই কুড়ি বছরের বাঙলা দেশের সামাজিক পটভূমি নিয়ে। তবে লেখা হয়ে উঠবে কিনা কে জানে।

প্রশ্ন

আধুনিক বাঙলা সাহিত্য, বিশেষ ভাবে পাশ্চাত্য প্রভাবিত হবার দরুন অথবা অন্য কোনো কারণে বাঙলা সাহিত্য বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে পৌঁছোতে পারে নি। প্রগতিশীল সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। এ সম্পর্কে আপনার কী ধারণা ?

উত্তর

বাঙলা সাহিত্য বৃহত্তর পাঠক পায় না একথা সত্যি—শতকরা দশজনের মধ্যেও বাঙলা সাহিত্য পৌঁছোয় না। হয়তো পাশ্চাত্য প্রভাব কিছুটা বৃহত্তর সাধারণকে দূরে রেখেছে। আমি তা মনে করি না। যদি তাও হয়, এটাই বোধহয় একমাত্র কারণ নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা যেমন অনেকের কাছে পৌঁছেছিল। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি আমাদের বাড়িতে রজনী নামে একটি চাকর ছিলো। সে রোজ অবসর সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র পড়তো। মহৎ সাহিত্যের এরকম নির্বিশেষ পাঠক থাকে। শেক্সপিয়রের কথা চিন্তা করুন তো—একদিকে রানী এলিজাবেথ অন্যদিকে সহিস, চাষাভুষো তাঁর নাটকের দর্শক। বৃহত্তর পাঠক পেলে সাহিত্যেরও সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি হয়। আমার মনে হয় পাঠকের সমস্যা অনেকটা সামাজিক প্রগতির ওপরও নির্ভর করে। সর্বজনীন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা হ'লে এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বাড়লে জনসাধারণের মধ্যে সাহিত্য বিষয়ে আগ্রহও অনেক বাড়বে। তাছাড়া যাকে পাশ্চাত্য প্রভাব বলছি আসলে তা আধুনিক সভ্যতারই নামান্তর, সেই আধুনিক সভ্যতা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলকেই এগিয়ে নিয়ে চলেছে— কাজেই মৌলিক দূরত্ব তত দুস্তর নয়।

প্রশ্ন

ব্যক্তির মুক্তি ও স্বাধীনতার দিক দিয়ে পৃথিবীতে কোনো 'স্বর্গরাজ্যের' প্রতিষ্ঠা সম্ভব ?

উত্তর

না। ব্যক্তির কতকগুলি সমস্যা ব্যক্তিকেই সমাধান করতে হয়। কতকগুলি বাহ্যিক বন্ধন থেকে বিশেষ সমাজব্যবস্থা মুক্তি দিতে পারে। যেমন ফিউডাল সোসাইটিতে ব্যক্তির যে বন্ধন ছিলো, এখন আর তা নেই। সাম্যবাদী শাসন ব্যবস্থায় মানুষের কণ্ডিশন ফর হ্যাপিনেস বাড়বে—ঠিক মত সোশালিজম এলে হয়তো ব্যক্তির মুক্তি হ'তে পারে (এখনো পর্যন্ত অবশ্য কোনো দেশে পুরোপুরি সোশালিজম আসে নি)। সাধারণভাবে অবশ্য ব্যক্তির মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে—তাছাড়া নানা ব্যক্তি নানা টাইপ। কেউ স্বভাবে শান্ত বা মাইল্ড, কেউ বা অ্যাগ্রেসিভ, কেউ কেউ আবার আছে জন্ম দুঃখবাদী— 'আই মাস্ট বি আনহ্যাপি।' সব ব্যক্তির সব ব্যক্তিগত দুঃখের অবসান হবে এমন অবস্থা আনা মুশকিল। সমস্যা থাকবে না, বৈচিত্র্য থাকবে না, এমন 'স্বর্গরাজ্য' তো বিশ্রী ব্যবস্থা।

প্রশ্ন

আপনার ভাষাতাত্ত্বিকরূপে পরিচয় অনেকেরই অজানা। আপনি ইংরেজির ছাত্র হয়ে কী ক'রে বাঙলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় উৎসাহী হলেন সে বিষয়ে কিছু বলুন।

উত্তর

ইংরেজির ছাত্র ছিলাম সাহিত্যকে ভালোবাসি ব'লে, আর বাঙলা সাহিত্যকেও অগ্রগামী করতে চাই ব'লে। পড়তে গিয়ে ইংরেজি ভাষার ক্রমবিকাশের ইতিহাস পড়তেও খুব ভালো লাগতো। ভাষাবিকাশের ইতিহাসের মধ্যে সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব সব কিছুই জড়িয়ে আছে। তাছাড়া প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিশেষ ক'রে তার শিল্প সাহিত্য, সম্পর্কেও ছেলেবেলা থেকে আগ্রহ ছিলো। এই সময়ে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অসাধারণ গ্রন্থ 'ও ডি বি এল' প্রকাশিত হলো। ঠিক করলাম সুনীতিবাবুর অধীনে বাঙলা ভাষাতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করবো। সেটা ১৯২৬-২৭ সাল হবে; আমি তখন প্রবাসী অফিসে চাকরি করি। সুনীতিবাবুর কাছে যেতে

তিনি অনেকগুলি বিষযেব কথা বললেন, যেমন, উপভাষা, ব্রজবুলি, গ্রিযার্সনেব 'বিহাব পেজাণ্ট লাইফ'-এব ধবনে আঞ্চলিক ভাষাব শব্দ সংগ্রহ। ব্রজবুলি নিযে আমি কাজ কবি নি। সুকুমাব সেন এ বিষযে ভালো কাজ কবেছেন। আমি সুনীতিবাবুকে বললাম আমি নোযাখালি আব ঢাকা বিক্রমপুবেব উপভাষা নিযে কাজ কবতে পাবি। এ সম্পর্কে আমাব দুটো পেপাব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযে জর্নাল অফ ডিপার্টমেণ্ট অফ লেটার্স-এ প্রকাশিত হযেছিল। প্রবন্ধগুলিব নাম, 'শর্ট স্কেচ অফ দি ফোনেটিক্‌স অফ নোযাখালি ডায়ালেক্ট', 'স্কেলিটন গ্রামাব অফ দি নোযাখালি ডাযালেক্ট'। এছাড়া গোপীচন্দ্রেব গানেব ওপবেও কাজ কবেছি—সুশীলকুমাব দে, সুকুমাব সেন প্রভৃতিব লেখায তাব উল্লেখ আছে। আবেকটি পাণ্ডুলিপি আছে 'এ শর্ট স্টাডি অফ দি বিক্রমপুব ডাযালেক্ট অফ ঈস্ট বেঙ্গলি', পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৭। তবে আমাব সব থেকে বড়ো কাজ 'কম্পাবেটিভ্ গ্রামাব অফ ঈস্ট বেঙ্গলি ডাযালেক্টস্'। এ কাজেব জন্য ববিশালেব কুলকাঠি সুবজকুমাব বাযচৌধুবী (বি-এ) বঙ্কিমচন্দ্রেব 'ইন্দিবা' উপন্যাসটি ববিশালেব উপভাষায রূপান্তবিত কবেন। তা থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

পেবথোম পবিচ্ছদ

'মুই হউব বাবী যামু। অনেক দিন পব/বাদে মুই হউব বাবী যাইতে লাঁগছিলাম। মোব উনিশ বছব বযেস হইছে তমো এহোন পয্যন্ত হউবেব ঘব কবি নায। হেব কাবণ আমাব বাপ আছিলেন বড লোক। হশুব ঠাহুব আমাবে নিতে মানুষ পাডাইছিলেন। কিন্তু বাবা যাইতে দেন নায। কইলেন বেয়াইবে কইও আগে আমাব জামাই বোজগাব কবতে শিহুক—হেব পবে যেন বউ নেওয়ায়েন।'

ভাষাতত্ত্ব বিষযে আমাব বড়ো কাজটি জেলে ব'সে লেখা (১৯৩৩-৩৪ খ্রী)। 'এ গ্রামাব অফ্ দি বেঙ্গলি ডাযালেক্টস' পাঁচশো পাতাব পাণ্ডুলিপি। অনেক ধ্বনিতাত্ত্বিক চিহ্ন আছে ব'লে এখানে প্রকাশ কবা ব্যযবহুল ব্যাপাব। দেডশো পাতাব একটি সংক্ষিপ্ত সংস্কবণ 'এ ব্রিফ নোট অন ঈস্ট বেঙ্গলি ডাযালেক্ট' মস্কো থেকে প্রকাশিত হবে।

প্রশ্ন

ভাবতেব বাষ্ট্রভাষা, যোগাযোগেব ভাষা ও শিক্ষাব মাধ্যম বিষযে

আপনি অন্যত্র আলোচনা কবেছেন। তাহ'লেও এখানে সংক্ষেপে কিছু বলুন।

উত্তব

ভাবতের বিভিন্ন বাজ্যগুলিব পবস্পবেব মধ্যে এখন যেবকম বিদ্বেষ, অবিশ্বাস আব সন্দেহ, তখন আপাতত বেশ কিছুদিন পর্যন্ত সংবিধান স্বীকৃত সব কয়টি ভাষাকেই সমান মর্যাদা দেযা ভালো। কেন্দ্রেও অফিসিযাল ভাষা হিশেবে ইংবেজিকে আপাতত বেখে দিলে হিন্দি জুলুম বিষযে অহিন্দি বাজ্যদেব সন্দেহ দূব হবে।

প্রশ্ন

শেষ পর্যন্ত তাহ'লে অবস্থা কী দাঁড়াবে।

উত্তব

অবস্থা ক্রমশ অনুকূল হবে ব'লে আমাব ধাবণা। আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হলে এবং শিল্পাযন সম্পূর্ণ হ'লে হিন্দি সম্পর্কে বিরূপতা অনেক ক'মে যাবে। তবে 'পবিশিষ্ট হিন্দি' হাই হিন্দি ও ব্যাপাবে চলবে না— সহজ হিন্দুস্থানী ভাষাব সঙ্গে তাকে আপোশ কবতেই হবে। এখন হিন্দিওযালাদেব এই যে ক'বেই হোক হিন্দিকে চালাবো—এই মনোভাব ও এই চেষ্টা আমাব কাছে পণ্ডশ্রম হবে মনে হয। এখনই আইনেব পবিভাষা তৈবি কবাবই বা দবকাবই কি? আমাদেব কোনো 'সেন্স অফ প্রাযবিটি' নেই। প্রাথমিক শিক্ষাব প্রসাব অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। উচ্চশিক্ষায় কি ভাষা মাধ্যম হবে, তা সে তুলনায অপেক্ষা কবতে পাবতো। শতকবা ৭০ জন মানুষেব কাছে কী মূল্য এই ভাষাব মামলাব? অবশ্য শিক্ষাব মাধ্যম সর্বোচ্চ স্তবেও মাতৃভাষা হোক আমি চাই, কিন্তু ইংবেজি অবশ্য শিক্ষণীয দ্বিতীয ভাষারূপে বাখা এখনো প্রযোজন। ক্লাসে পডানো হবে মাতৃভাষায; কিন্তু ইংবেজি বইযেব বেফাবেন্স দিলে ছেলেবা যেন নিজেদেব চেষ্টায সে ইংবেজি বই প'ডে বুঝতে পাবে। এখন সব বিষয মাতৃভাষাব মাধ্যমে পডা সম্ভবও হবে না। যখন হবে, তখনো ইংবেজি বর্জন হবে অবাঞ্ছনীয, এবং সম্ভবত অসম্ভব।

প্রশ্ন

'পবিচয' পত্রিকাব সঙ্গে আপনি কবে থেকে যুক্ত?' আপনি কি

প্রশ্ন

স্থধীন্দ্রনাথ দত্তের সময়ে 'পরিচয়ে'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ?

উত্তর

'পরিচয়ে'র সঙ্গে আমি '৪৩ সাল থেকে যুক্ত। 'পরিচয়ে'র হাতবদলের পর আমি '৬৭ সাল পর্যন্ত অধিকাংশ সময়ে যুগ্ম সম্পাদক ছিলাম। মাঝে জেলে যাবার জন্য কয়েক বছর বাদ আছে। প্রগতিশীল লেখকদের মুখপত্র হিশেবে 'পরিচয়' পত্রিকা শ্রীহিরণকুমার সান্যাল, শ্রীস্থশোভন সরকার-এর উদ্যোগে স্থধীন্দ্রনাথ দত্তের কাছ থেকে কেনা হয়।

আমি কলেজে স্থধীন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলাম, কিছু আগের যুগের 'পরিচয়ে'র সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিলো না। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় থাকলেও তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিলো না। স্থধীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ আমি 'রূপনারায়নের কূলে'-তে বলেছি।

প্রশ্ন

'রূপনারায়ণের কূলে' কবে শেষ করবেন ?

উত্তর

দেখা যাক। ইচ্ছে তো আছে এই জীবনে অন্তত যে সব কৃতী ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলাম, যেমন স্থভাষচন্দ্র বস্থ, শরৎচন্দ্র বস্থ, স্থরেশ মজুমদার, স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্থশীলকুমার দে প্রমুখ তাঁদের স্মৃতিকথা লিখে যাবো। কিছু নতুনও তা হ'তে পারে। জেলখানার জীবনের কথা লিখতেও ইচ্ছে করে—তার মধ্যে সবগুলিই মধুর নয়, তিক্ত অভিজ্ঞতাও আছে। সংকীর্ণতা দেখেছি। সেগুলো বলা উচিত হবে কিনা মনস্থির করতে পারি নি। ওসব কতকাংশে যে জেলখানারও ধর্ম।*

* শ্রীগোপাল হালদারের সঙ্গে কথোপকথনে ছিলেন শ্রীচিত্ত ঘোষ, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুবীর রায়চৌধুরী।

প্রত্নের গভীর থেকে

অমিতাভ দাশগুপ্ত

শিকড়ে শিকড়ে দিলে টান।
স্তব্ধ বাত্রি খান খান—মশাবি রুপালি হয়ে জ্বলে ওঠে,
বিছানায় চাদবে বালিশে আগুন আগুন,
ঐ আর্য নাসা ঐ হিব্রু চিবুকেব দীপ্র দ্যুতি
অন্ধ-সূর্য দেশ থেকে হিন্দুকুশ পাহাড়েব থেকে
উজ্জ্বল ঝলক হয়ে শতকেব নিবিড় প্রতিভা
কাফ্রি ছুবিব মতো ব্যবহাব কবে
দামিনীব প্রখব অক্ষবে।

হৃদযেব বসাযন, ধাতুব মৌলিক ব্যবহাব
কতখানি তাপ দিলে পিঙ্গল লোহায ফোটে লাল সর্বনাশ
সমস্তই জেনে যাও—অস্তিত্বে জাগাও
মরুব দুবন্ত ঘূর্ণি, সমুদ্রেব বেগার্ত নীলিমা,
শ্বেত বেনেশাঁ-ব শক্তি, এশিযাব প্রবীণ গবিমা।

প্রত্নেব গভীব থেকে শাবলেব লক্ষ্যভেদী হাত
ঐ মুখ তুলে আনে, জনপদে শহবে বন্দবে
যে মুখেব আর্য নাসা, হিব্রু চিবুকেব দ্যুতি লেগে
দাউ দাউ জ্বলে ওঠে
সমষ্টিব, শতকেব অগ্নিমন্থ অমব প্রতিভা।

ডোরাকাটার অভিসারে

শের জঙ্গ

(সেপ্টেম্বব সংখ্যাব পব)

বাঘ মাবতে যাওয়া তাবই সাজে, ক. নিজেব হাতিযাবে যাব ভবসা আছে এবং খ. চলন্ত জিনিসে অভ্রান্তভাবে লক্ষ্যভেদ কবাব কাযদাকানুন যাব আযত্তে। এ দুটো গুণ যাব নেই, বাঘ শিকাব কবতে গিয়ে সে যে সম্ভবত নিজেবই বিপদ ডেকে আনবে তাই নয়, সঙ্গীসাথীদেবও সে বিপদে ফেলবে, আব তাব জন্যে মুশকিলে পডবে নিবীহ গ্রামবাসীবা—কাবণ, জঙ্গলে সে ফেলে বেখে আসবে চোট-খাওয়া বাঘ, যে বাঘ পবে হযত নিদারুণ নবখাদকে পবিণত হবে।

কখনই তাডাহুডো কবে গুলি কবা উচিত নয়। কেউ যদি তা কবে, তাহলে আজ হোক কাল হোক শিকাবেব আযু তাব হঠাৎ অকালেই ফুবিযে যাবে। এটা সব সময মনে বাখা ভালো যে, বাঘেব সঙ্গে লাগতে যাওযা মানে দুনিয়াব সবচেযে ধূর্ত, সবচেযে হিংস্র জানোযাবেব সঙ্গে পাঞ্জা লডা—যে লডাইতে আবেষ্টনী এবং আক্রমণেব আব আত্মবক্ষাব ক্ষমতাব দিক দিযে বাঘেবই ষোল আনা সুবিধে।

বাঘকে মাবতে এবং ঘাযেল করতে গেলে নিচেকাব মোক্ষম জায়গা-গুলোতে গুলি কবা দবকাব।

ক. গলা

খ. কণ্ঠা

গ. কাঁধেব ভেতব দিযে কলিজা

গ. বুকেব ভেতব দিযে কলিজা

ঘ. দুই চোখেব মাঝখান দিযে মগজ

বাঘ যদি শিকাবীব দিকে তিন-চতুর্থাংশ ফিবে থাকে, তাহলে গুলি করার সবচেযে ভালো জাযগা হল কণ্ঠা। বাঘ তাহলে সোজা ধবাশাযী হবে—কেননা তাতে গলা থেকে নামা শবীবেব শিবাগুলো যেমন ছিঁডে খুঁডে যাবে, তেমনি বুলেটটি স্নাযুকেন্দ্র ভেঙে কলিজা আব ফুস্‌ফুস্‌ ফুঁডে চলে যাবে।

বাঘ যদি পাশ ফিবে থাকে, তাহলে কলিজাই হবে নিশানা। কিন্তু বাঘকে তৎক্ষণাৎ অসাড অচল কবে দেবাব জন্যে গুলিটা চালাতে হবে কাঁধেব কেন্দ্রস্থল ভেদ কবে। অনেক সময কলিজা ফুঁডে গুলি কবলেও বাঘকে ধবাশাযী কবা যায় না এবং মৃত্যুব আগেব কযেক সেকেণ্ডে সে ঝাঁপিযে পডতে পাবে।

বাঘ যদি শিকাবীব দিকে মুখ কবে একই জমিতে সামনাসামনি দাঁডিযে থাকে, তাহলে গলাব ঠিক নিচে বুকেব ঠিক মাঝখানটায গুলি কবাই প্রশস্ত। গলা আব ঘাডেব সন্ধিস্থলে গুলি কবলেও সমান ভালো ফল পাওযা যাবে। মাথাব সামান্য ডাইনে বা বাঁযে কাঁধেব ভেতব গুলি চালাতে পাবলে বাঘকে চূডান্ত বকমেব ঘা দেওযা যায। এতে হয়ত কলিজা ফুটো হযে যাবে। অথবা সম্ভবত শিবদাঁডা ভেঙে যাবে। বুলেটটা লম্বালম্বিভাবে ঢুকে পড়ে শবীবটাকে অবশ কবে দিতে পাবে, অথবা—যেটা সবচেযে জরুবি—কাঁধেব হাড ভেঙে দেওযাব ফলে বাঘ মাবাত্মকভাবে আব ঝাঁপিযে পডতে পাববে না।

যে বাঘ সিধে চলে আসছে, বন্দুকেব ঘোডা টানাব আগে তাকে হয একটু পাশ ফেববাব, নয সামনে একটু সবে যাবাব সুযোগ দেওযা উচিত—কাবণ, বাঘদেব স্বভাব হল যেদিকে ফিবে আছে—চোট খাওযাব সঙ্গে সঙ্গে—সেইদিকে তেডে যাবাব। এমনও অনেক অবস্থা আছে, যেক্ষেত্রে বাঘেব গাযে গুলি লাগলেও তাব দিক থেকে তেডে আসবাব কোন ভয থাকে না। কিন্তু যে বাঘ আপনাকে দেখে ফেলেছে এবং দেখা সত্ত্বেও যাব নডবাব কোন লক্ষণ দেখা যায নি, তাব সম্বন্ধে খুব হুঁশিয়াব হবেন।

মগজে গুলি চালাতে পাবলে তৎক্ষণাৎ দফা বফা হয—কিন্তু কাজটা যেমন শক্ত, তেমনি যেটা ভাবা যায সেটাও নিচেব দুটো কাবণে প্রাযই শেষ পর্যন্ত ঠিক ঘটে ওঠে না। প্রথমত, বাঘেব মগজ নিশানা হিসেবে নেহাৎ ছোট্ট—আকাবে একটা আপেলেব মত, আবো বেশি ছোট দেখায় তাব হাডসর্বস্ব বিবাট মুণ্ডুটাব তুলনায, চোখেব প্রায তিন-চাব ইঞ্চি পেছনে তাব মগজেব আধাব। দ্বিতীযত বাঘেব কপাল দেখে যে-বকমটি মনে হয আসলে সে-বকমটি নয়। চোখেব ঠিক ওপবে চামডাব ভাঁজ এবং জাযগাটাব বং এমন যে, দেখে মনে হবে আমাদেবই মতো নাকেব ঠিক ওপবে চামডাব নিচে বুঝি উঁচানো হাডেব কাঠামো আছে। বাঘেব মাথাব খুলি খুঁটিযে দেখলে আশ্চর্য হবেন—যাকে আমবা কপাল বলি, বাঘেব সে জিনিস আদৌ নেই, সে জাযগায তাব একটা হাড বিষম ঢালু হযে পেছনেব দিকে নেমে গেছে—শুধু মানুষ কেন, অন্য জানোযাবদেব মতনও তাব মাথাব খুলিতে সামনেব দিকে খাডা হযে কপালেব মতো কিছু নেই।

সুতবাং, চোখেব ওপর গুলি লাগলে ভেদ কবে তো যাবেই না, ববং হাড ঘেঁষে পিছলে চলে যাবে। একমাত্র চোখেব ভেতব দিযে কিংবা নাকেব ঠিক গোডায তাক কবতে পাবলে তবেই সেই গুলি বাঘেব মগজে পৌঁছুবে।

সেইজন্যেই, আমাব মতে, বাঘেব মগজ লক্ষ কবে গুলি ছোঁডাটা ভুল। তাব চেযে গলায গুলি কবাটা সহজ এবং তাতে মগজ ফুটো কবাবই সমান ফল মেলে।

বাঘ যখন পেছন ফিবে চলে যাচ্ছে, শিকাবী যখন তাব চেযে উঁচুতে বযেছে—তখন ঘাড আব শিবদাঁডাব সন্ধিস্থলে গুলি লাগাতে পাবলে বাঘ আব নডতে পাববে না। শিকাবী যদি একই জমিতে থাকে, তাহলে নিশানা কবতে হবে ল্যাজেব ঠিক গোডায়। গুলিটা পেছন থেকে বাঘেব বুকে গিযে ঘা দেবে। তবে এটা একটা কদাকাব ব্যাপাব, পাবতপক্ষে এভাবে গুলি না কবাই ভালো।

কোন মোক্ষম জায়গায গুলি যদি না লাগে, তাহলে দেখে অবাক হবেন—গুলিব পব গুলি খেযেও বাঘ কি বকম দিব্যি হেঁটে চলে ফিরে

বেড়াবে। বাব ছযেক মাবাত্মকভাবে গুলি খাওযাব পবেও তাব দৌড় বড কম হয না এবং অতগুলো চোট নিযেও সে জান দিযে লডে যাবে।

চোট-খাওয়া বাঘ

ঘণ্টা কযেক কেটে না গেলে কখনই চোট-খাওযা বাঘেব পিছু নেওযা উচিত নয। বাঘ যদি সাংঘাতিকভাবে আহত হয, তাহলে একটা ব্যক্তিব একা থাকতে পেলে হয সে আঘাতেব দরুন মবে যাবে, নয সে এত দুর্বল হযে পডবে যে তখন কতকটা নিবাপদে তাকে সামলানো যাবে। আবাব অন্যদিকে, সময পেয়ে সে এলাকা ছেড়ে সবেও পডতে পাবে। পালাবাব মত যদি তাব ক্ষমতা থাকে, তাহলে বুঝতে হবে জখম হওযাব পরে পবেই তাকে ঘাঁটাতে গেলে ফল বিপজ্জনক হতে পারত।

চোট খাক বা না খাক, বাঘ যখন কাউকে আক্রমণ কবে, তখন খুব বেশি হলে তাব পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ গজ দূব থেকে ছুটে আসে—দূবত্বটা সাধাবণত হয তিবিশ গজ আব কচিৎ কদাচিৎ চল্লিশ গজ। চোট-খাওযা বাঘ ঐ দূবত্বেব মধ্যে তাব শিকাব আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কববে, তাবপব দু একবাব কাটা কাটা গব্‌ব্‌ গব্‌ব্‌ আওযাজ কবে প্রচণ্ড বেগে তেড়ে আসবে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেন, এই ধাঁ কবে ছুটে আসবাব সময তাদের গতিবেগ নাকি ঘণ্টায ষাট মাইল হয।

বাঘ যখন ক্ষুন্নিবৃত্তিব জন্যে জানোযাব শিকাব কবে, তখনও নাকি এই দূবত্বটাই বজায় বাখে। অনেক দূব থেকে শিকাব লক্ষ্য কবে গুটি গুটি এগিযে ঠিক তিবিশ থেকে চল্লিশ গজ দূবে এসেই বিদ্যুদ্‌বেগে গিযে ঘাড়ে পড়ে।

জুৎসই মারণাস্ত্র

বড বড বিপজ্জনক শিকাবেব ক্ষেত্রে শিকাবীদেব এখন অনেক সুবিধে। কাবণ, ইদানীং অনেক বকমেব মোক্ষম মাবণাস্ত্র বেবিযেছে। শিকাবীবা এখন সেইসব বাছা বাছা হাতিযাব ব্যবহাব কবতে পাবেন। যাঁদেব খেলোযাড়ি মনোভাবেব অভাব আছে, তাঁবা কিন্তু বড বড জানোযাব শিকাবেব ক্ষেত্রে আজকাল এই বাডতি যন্ত্রবলেব শাক দিযে নিজেদেব অক্ষমতাব মাছ ঢাকা দিচ্ছেন। এটা খুবই দুঃখেব। আমি একাধিক

লোককে জানি, শিকাবে কৃতকার্য হওযা বলতে তাঁবা বোঝেন একেবাবে হালফ্যাশানেব কলকব্জাওযালা আবো বেশি শক্তিশালী বাইফেল হাতে থাকা।

ভালো অস্ত্র এবং ভালোবকম পডাশুনো এক্ষেত্রে নিশ্চযই একান্তভাবে দবকাব। তবে সেটাই সব নয। হাতযশেব অভাব যদিও বা পূবণ হয, তাতে ক্রীডামোদীব প্রশংসা নৈব নৈব চ।

যাব যেমন অভিরুচি সে তেমন অস্ত্র বেছে নেবে। তবে কতকগুলো ব্যাপাবে অভিজ্ঞ শিকাবীবা একমত।

ক. খাঁটি ওস্তাদ শিকাবী বিপজ্জনক শিকাবেব জন্যে এমন অস্ত্রই বাছবে, যা তাব দৈহিক শক্তির দিক দিযে হবে আপেক্ষিকভাবে হালকা—যাতে সেই হাতিযাবটাকে সে অনাযাসে যথেচ্ছভাবে ঘোবাতে-ফেবাতে পাবে।

খ. 'এক্সপ্রেস' টাইপেব হাই-ভেলোসিটি বাইফেল মামুলি শিকাবেব পক্ষে সবদিক দিযেই খুব কাজেব, অনাযাসে বযে বেডানো এবং নাডাচাডা করা যায, আভ্যন্তবীণ আঘাত এবং শক্ ধবানো যায; ঠিক লাগসইভাবে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক বেঞ্জে চালাও গুলি কবা যায। বড বড বিপজ্জনক জন্তু শিকাবে পাকা হাতে আবেকটু হেভি বোবেব বাইফেল থাকলেই চলে—তাই বলে অতিবিক্ত বকমেব জোবদাব বাইফেল নয। যিনি ব্যবহাব কববেন তাঁব গায়েব জোব এবং হাতেব দৈর্ঘ্য অনুযাযী অস্ত্র ভালো কবে দেখে শুনে বেছে নিতে হবে।

এসব নিশ্চযই জরুবি ব্যাপাব, তবে সবচেয়ে জরুবি হল বন্দুকেব পিছনেব মানুষটি। বড জানোযাব শিকাবে সবচেযে বেশি দবকাব হয় সঠিক টিপ আব ঘা দেবাব মোক্ষম জাযগা সম্বন্ধে জ্ঞান; এবং সর্বোপবি শিকাবীব অচঞ্চল স্নাযু।

বন্দুক আব গুলি যতই নিখুঁত আব যতই সবেস হোক, একথা বললে মোটেই অতিশয়োক্তি হবে না যে, অস্ত্রেব চেয়ে বেশি যদি নাও হয় অন্তত সমান ফলদায়ক হল চোখ আব হাত। চোখ আব হাত হল ধীবস্থিব দক্ষ বিচাবেব বিশ্বস্ত প্রতিভূ!

বিপজ্জনক শিকাবের ক্ষেত্রে একপ্রস্থ বাঁধাধবা নিযমকানুন মানলেই যে

চলে না, এটা যত তাড়াতাড়ি হৃদয়ঙ্গম করা যাবে—ততই নিজের নিরাপত্তা বিধান এবং শিকারে সার্থকতা অর্জন করা যাবে। এখানে এটাও ব'লে রাখা ভালো যে, বইপড়া বিদ্যের চেয়ে ঢের বেশি মূল্যবান হাতে কলমের সামান্য অভিজ্ঞতা ; সুতরাং শিকার মারা পড়বার পর যখন তাকে কাটাকুটি করা হয়, তখন বিশেষভাবে তদন্ত ক'রে দেখা উচিত গুলিটা কোথায় লেগে কোথা দিয়ে যাওয়ায় কোন্ মোক্ষম জায়গায় কী দশা হয়েছে।

বিপর্জ্জনক শিকারের ক্ষেত্রে যারা নিতান্ত নতুন, তাদের সব সময় উচিত সবচেয়ে জোরদার রাইফেল ব্যবহার করা—এমন রাইফেল যা তারা সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে নাড়াচাড়া করতে পারে। চার হাজার ফুট-পাউণ্ডের কম মাজ্‌ল্ এনার্জির রাইফেল এবং তিনশো গ্রেনের কম ওজনের প্রোজেক্টাইল—যে বাঘ শিকারে যাবে তার ছোঁয়াই উচিত নয়। বাজার চলতি অনেকরকম ক্যালিভার মিলবে—'৫৭৭ থেকে '৩৭৫ ম্যাগনাম—তার যে কোন একটাকে বাঘ শিকার করা চলবে। ৫০০ ব্ল্যাক পাউডার ছাড়াও এদেশে নামকরার মধ্যে '৪৭০ বিগ্‌বি, '৪৬৫ হল্যাণ্ড অ্যাণ্ড হল্যাণ্ড, ৪৫০/৪০০ জেফরি এবং '৩৭৫ হল্যাণ্ড অ্যাণ্ড হল্যাণ্ড ম্যাগনাম।

জানোয়ার হিসেবে বাঘ এমন কিছু বিশাল নয়, এবং তার পায়ের চামড়াও 'নরমে'র কোঠাতেই পড়ে। এক ঝুনো শিকারী বলেছেন—হাল-আমলের এমন কি কিছুটা কম ক্যালিবারের রাইফেলেও বাঘ মারা যায়, অবশ্যই সে বাঘ যদি গুলির সামনে সুবোধ বালক হয়ে তার কলিজাটাকে সটান নিশানা করতে দেয়। তবে তেমন ঘটনা বড় একটা ঘটে না। তাছাড়া ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে হয়ত বন্দুক চালাতে হবে—সেক্ষেত্রে ডালপালার একটু ছোঁয়া লেগে গেলেই বেগবান হালকা বুলেট তার আসল গতিপথ থেকে নিশ্চয়ই বিচ্যুত হবে। এবং একটু বেযাড়াগোছের কোন বাঘ যদি উল্টে চড়াও হওয়ার মতলব করে, তাহলে হালকা রাইফেলে তাকে ঠেকাতে পারার ভরসা কম। মগজে গুলি করতে পারলে বাঘ তৎক্ষণাৎ পটল তুলবে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এমন কোন বাপের বেটা নেই যে বুক ঠুকে বলতে পারে যে, তেড়ে-আসা বাঘের ঠিক মগজ টিপ ক'রে সে নির্ঘাত গুলি ছুঁড়তে পারবে।

বাঘ শিকাবে সব সময ভাবী বোবেব বাইফেল নিযে যাওযা উচিত—শিকাবীব পক্ষে যতটা ভাব দুর্বহ নয ততটা—তবে কখনই তা '৩৭৫ ম্যাগনামেব চেযে হালকা হলে চলবে না। বিপজ্জনক জন্তুব পিছু ধাওযা কবতে গেলে সবচেযে প্রশস্ত হল ডবল-ব্যাবেল বাইফেল। এ ব্যাপাবে কাবো দ্বিমত নেই। ডবল বাইফেলেব ভাবসাম্য এত ভালো যে, এতে ঢেব তাড়াতাড়ি ঝাঁকি দিযে কাঁধে লাগিযে গুলি ছোঁড়া যায়। ম্যাগাজিন বাইফেলও অবশ্য অস্ত্র হিসেবে সমান ভালো, কিন্তু তাতে ডবল বাইফেলের মত অতটা সূক্ষ্মভাবে টিপ কবা যায না।

এদেশেব জঙ্গলে যেখানে ঘন আগাছাব ঝোপ আব মোটা মোটা ঘাস—সেখানে বাঘ শিকাবেব পক্ষে বিশেষ জুৎসই হল যে কোন-বাইফেল, তবে '৪৭০-'৪০০ শ্রেণীব ডবল বাইফেল হলেই ভালো। একেবাবে আলাদা জাতেব এক বাইফেল হল '৩৭৫ হল্যাণ্ড অ্যাণ্ড হল্যাণ্ড ম্যাগনাম বাইফেল। এটাই আমাব সবচেযে পছন্দসই ক্যালিবাব—অন্য কার্তুজেব চেযে এই দিযেই আমি ঢেব বেশি জানোযাব মেবেছি—জানোয়াব বলতে হাতি এবং গয়ালও।

('বাঘ' অংশ শেষ। এবপব থেকে শিকাব কাহিনী)

অনুঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায

মদন বাঘার মা ও শকুন

নীরদ ভট্টাচার্য

সমস্ত দিন বিকেল পর্যন্ত দাওযা কেটে কুকুবেব বাচ্চাব ঘব তৈবি কবলো মদন। সামনে দু-দিকে দু-টুকবো বাঁশ পুতে পুবোনো টিনেব দবজা লাগিযে স্বস্তিব নিশ্বাস ফেললো। বহুদিনকাব একটা শখ এবাব তাব মিটবে। দুলি একটা কুকুবেব বাচ্চা দেবে বলেছে। এ বিযোনে তিনটে হয়েছিলো। একটা শিযালে খেয়ে গেছে। বাকি দুটোব মধ্যে শাদাটা মদনেব। চোখেব নিচে কালো বঙ। মনে হবে যত্ন কবে কে যেন সুবমা লাগিয়ে দিযেছে। কালই বিকেলে বাচ্চাটা নিয়ে আসবে মদন। শালিকেব খাঁচাব কাছে এলো। বললো :

—তাই বুলে তয়ে কিন্তুক্ উডোযে দেবো না। তবেও খাতি দেবো।

শালিকের বাচ্চা হাঁ কবে চি চি কবতে থাকে। মুখেব মধ্যে লাল। ডিম ফুটবাব সঙ্গে সঙ্গে এই কিছুদিন আগে মিত্তিবদেব বাগানে নাবকোল গাছেব ফোকব থেকে পেডে এনেছিলো মদন। নিজেব হাতে বাঁশের শলা দিযে খাঁচা তৈবি কবেছে। ভালোভাবে ডানা গজায় নি। বযস মাত্র কুডি দিন। খাঁচাটা সব সময সঙ্গে বাখে মদন। দডি দিয়ে বাঁধা বাঁশেব চোঙ থেকে মধ্যে মধ্যে একটা ফডিং বাব কবে খেতে দেয। সকাল থেকে দুপুব পর্যন্ত মাঠে থাকে। বিকেল তিনটে নাগাদ আসাব গরু নিয়ে মাঠে আসে। সন্ধ্যেব কাছাকাছি গরুগুলোকে গোয়ালে তুলে সাজালে আগুন

লাগিয়ে মেজ মাব দেওয়া ডাল, ভাত, তবকাবি গামছায় বেঁধে বাড়ি ফেবে। ভাই বোনে মিলে খেয়ে নেয়। বাবাব ফিবতে ফিবতে অনেক বাত হয়ে যায়।

পূর্ণদাস কবাতেব কাজ কবে। ইঁযা বড বড গাছেব তক্তা বাব কবে। ছোট বোনকে কোলে নিযে মদনেব মা এ-বাড়ি সে-বাড়ি চিঁডে কোটে, ধান সেদ্ধ কবে। তিনজনেব এই সামান্য আযেই কোনক্রমে ওদেব সংসাব চলে যায। বর্ষাকালে পূর্ণদাসেব তেমন কাজ না থাকায যা একটু অসুবিধা। নচেৎ দু-বেলা দু-মুঠো জুটে যায। মেজ ঠাকুবদেব বাড়িতে মদন মাস মাইনেব বাখাল। মাসে খাওযা পবা বাদে পাঁচ টাকা মাইনে।

সকাল হতেই গরু নিযে মদন মাঠে এলো। বাঙচিতা ফণিমনসা বেডাব কোল ঘেঁশে বৃহৎ পাকুড গাছেব ছাযায বসলো। পাশে শালিকেব খাঁচা। চোঙ থেকে পব পব দুটো ফডিং বাব কবে বাচ্চাটাকে খেতে দিলো।

—আব খাতি অবে না। পবে দেবানে।

গতকাল নামাবাব সময ডকেঘুডিব কাগজ সামান্য কেটে গিয়েছিলো। ইজেব প্যান্টেব পকেট থেকে বল্লী ফল বাব কবে কাগজ দিযে সে অংশে পটি লাগালো। তাবপব টোন স্থতো দিযে ঘুডিটা আকাশে ওডালো। শূন্যে ঘুডিটা কাঁপছে, বেতেব ছিলায হাওয়া লেগে স্থব ছডাচ্ছে।

—চিলেব ডাক শুনলিই দুলি আসফেনে। চিলেব কথা কলি আইজ আমি সাফ্ সাফ্ কযে দেবো।

কুকুবেব বাচ্চা দিলে কালকেই দুলিব জন্যে ঘুডি বানিযে শেষ কববে মদন। শলা চাছাই আছে। এখন কাগজ লাগিযে গুণ দিযে দিলে হয়।

ততক্ষণে মদনেব কাছে আবও কয়েকজন এসে মিলেছে। নিমাই ফটিক আব গঙ্গাধব নিমাই মিত্তিব বাডিতে, ফটিক বায বাডি আব গঙ্গাধব দৈবঠাকুবদেব বাডি মাস মাইনেব বাখাল। সকলেবই বযস প্রায এক। গত মাসে মদন দশে পা দিয়েছে।

চৈত্রেব মাঠ খাঁ খাঁ কবছে। ফাল্গুনেব শুরুতে সব ধান কাটা শেষ। এখন নতুন কবে চাষ আবম্ভ হচ্ছে। বোশেখ মাসেব মধ্যেই আউশ ধান ফেলতে হবে। মধ্য মাঠেব বুক চিবে শিংগিমাবীব ফল আলাইপুবেব দিকে চলে গেছে। খালেব পাশেব জমিতে কচি ঘাস থাকায গরুগুলো সেখানে গিযে জডো হযেছে।

—এই মদন, আমাবে এটা চিলে বানায়ে দিলি নে?

আলেব উপব ঘাসেব মাথায একটা গঙ্গা ফড়িঙেব দিকে গুটিগুটি এগোতে এগোতে উত্তব দেয় মদন :

—তা তব কাছে তো আমি কাগজ চাইলাম। না দিলি কুআনতে বানাবো?

কাগজ জোগাড় কবতে পাবে নি গঙ্গাধব। দৈবঠাকুবেব বাড়ি খববেব কাগজ আসে না। নাবাযণ লেখাপড়া কবে। ওদেব পুবোনো খাতাব কাগজ চেয়েছিলো গঙ্গাধব। ওবা দেয় নি। শেষকালে কযেকটি খাতাব পাতা চুবি কবেছিলো। ধবা পড়ে যা মাব খেয়েছিলো।

এখন গঙ্গাধব কোন কথা বললো না। লোভীব মত উড়ন্ত ঘুড়িব দিকে তাকিয়ে থাকে।

—পাহিড়াবে কিন্তুক্ ভালো অবে কতা শিহোস্। আমাব জ্যাডা একবাব এট্টা শালিক পুশিলো, উবা ভালো কতা কয।

পাখির খাঁচাব কাছে মুখ নিয়ে ফটিক শিস দিলো। ঘুবে ঘুবে মদন ফড়িং ধবছে। আব কোমবে বাঁশেব চোঙেব মধ্যে বেখে দিচ্ছে। এক-দিনেব খাবার প্রায জোগাড় হয়ে গিয়েছে।

নিমাই বললো :

—আয আমবা গুমাই গুমাই খেলি।

এই গোবব গোবব খেলা বাখালদেব মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। একটা জমিতে আলেব উপব দাঁড়িয়ে ওবা ওদেব লাঠি ছুঁড়ে মাববে। যাব লাঠি অল্প দূবে যাবে সে হবে চোব। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জনীব মাঝখানে লাঠি বেখে দু'হাত শূন্যে তুলে সে দাঁড়াবে। অন্য একজন তাব লাঠি দিয়ে খোঁচা মেবে ওব লাঠি ফেলে দেবে। যে চোর হবে সে দৌড়ে দৌড়ে একে ওকে ছুঁয়ে দিতে চেষ্টা কববে। কিন্তু গোববে লাঠি বাখলে আব তাকে ছোঁযা যাবে না। এইভাবে চোবেব লাঠিখানি খোঁচা দিয়ে দিয়ে উল্টো দিকেব আলপাব কবতে পাবলে অবাব তাকে হাত তুলে একই নিযমে চোব হতে হবে। চোবেব লাঠিতে খোঁচা দিয়েই বলতে হবে—'এই যে গোবব'।

—তুবা গুমাই ছড়াতি লাগ, আমি আসতিছি।

শিংগিমাবীব খালেব দিকে ছুটে গেলো মদন। দুটো গরু দলছুট হয়ে উত্তব দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওদেব ফিবিয়ে দিতে হবে। নচেৎ

সন্ধ্যেব সময় হাবিয়ে গেলে বাগানে বাগানে খুঁজে বেড়াতে মদনেব ভয় করে।

নিমাই, ফটিক, গঙ্গাধব গোবব নিয়ে জমিব সর্বত্র ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিলো। মদন এলে ওবা খেলা শুরু কববে।

বালতি হাতে এসময় ঢুলিকে আসতে দেখে নিমাই ডাক দেয়ঃ

—এই ঢুলি, এহেনে আয়। অনেক গুমাই পাবিনে।

ঢুলিব বয়স এগাবো। বোগা, কালো আব বেঁটে। চোখ ঢুটো ছোট ছোট। পিট্ পিট্ কবে কথা বলে। সংসাবে শুধু বাবা আব এক বিধবা পিসি। জন্মেব সঙ্গে সঙ্গে তাব মা মাবা গেছে। পিসিই ঢুলিকে বড কবে তুলেছে। তাব আব কোন ভাই-বোন নেই। সে একা।

বালতি হাতে ঢুলি এগিয়ে গেলো। চোখ ঘুবিয়ে-ঘুবিয়ে চাবপাশ দেখলোঃ

—মিথ্যে কতা কলি কেনো? গুমাই কই?

—উই যে উহানে। দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ নে?

আঙুল তুলে একতাল গোবব দেখালো নিমাই। ফটিক বললোঃ

—তোগো এট্টা কুহুবীব বাচ্চা আমাবে দিবি?

—দেবো। তয় এ বিযোনে দিতি পাববো না। এট্টা মদনবে দেবানে। আব এট্টা আব একজনবে দিতি অবে।

—তিনডে বাচ্চা হোইলো না?

—হোইলো তো। কিন্তুব তাব এট্টাবে শিযালে খাইয়ে গেছে।

ঢুলিব শেষেব কথাটা শুনতে পেলো মদন 'শিযেলে খাইয়ে গেছে'। জিজ্ঞেস কবেঃ

—কী কলি, শিযেলে খাইয়েছে?

ঘুড়িব দিকে তাকালো ঢুলি। টোন সুতো কিছু দূব পবে বেঁকে ঝুলে পড়েছে। তাবপব আব দেখা যায় না। ঢুপুবেব তেজি সূর্যের আলোয় কেমন একাকাব হয়ে মিলিয়ে গেছে।

—এট্টাবে তো সেই কবে খাইয়ে ফেলাইছে।

—আইজ বিকেলেই আমাবডাবে আমি নিয়ে যাবানে। ঘবটব বানাইয়ে ফেলাইছি। শিযেলেব বাবাব ক্ষেমতা নেই সিয়ানতে খাইয়ে ফেলায়।

এব আগেব বাবেব দুটো বাচ্চাকেই শিয়ালে নিযে গিযেছিলো। কযেকদিন যাবৎ মদনেব মন খাবাপ হযেছিলো। বাগানে তাবপব শেযাল-মাবা ফাঁদ তৈবি কবে শেযাল মেবেছিলো। ছোট মতন একটা গর্তেব পাশে কাঁচা বাঁশেব মাথায দডির ফাঁস পবিযে বাঁশটা মাটিতে পুঁতে দিলো। গর্তেব তিনপাশে ছোট ছোট কাঠি পুঁতে ফাঁসটা গোল করে সেখানে লাগিযে নিলো। কলাপাতায় মাছ, ভাত, তবকাবিব লোভে শেয়াল গর্তেব মধ্যে মুখ দিলেই কাঠিগুলো ছিটকে গিয়ে শেযালেব গলায ফাঁস আটকে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে বাঁশ সোজা হয়ে দডিশুদ্ধ শেযালটা ঝুলতে থাকবে। গত বছব এমনি কবে গোটা দুই শেযাল মেবেছিলো মদন।

ওবা সব গোবব গোবব খেলতে শুরু কবলো। ফটিক চোব। একটু নিবীহ স্বভাবেব ফটিক। হাডসর্বস্ব চেহাবা, কব্জিতে তেমন জোবও নেই। মাটিব কলস ভাঙা চাডা নিযে পুকুবে ব্যাঙ ব্যাঙ খেলায় ববাববই ফটিক হেবে যায়। ওব চাডা দু-চাব বাব লাফিযে জলেব তলায় তলিযে যায়। অথচ মদন একদিন ঘোষালদেব ওই অত বড পুকুবেব ওপাব পর্যন্ত কলস-ভাঙা চাডাটাকে একটানা ব্যাঙেব মতো পৌঁছে দিয়েছিলো।

ওদেব খেলা বেশ জমে উঠেছে। মধ্যে মধ্যে ঝগডা হচ্ছে। ফটিক একবাব আচমকা নিমাইকে ছুঁযে দিযেছে। প্রতিবাদ কবে নিমাই ঃ

—আগেই আমি লাঠি দিযে গুমাই ছুঁইছি। হেব পবে ছুলি কী অবে?

গঙ্গাধব নিমাইকেই সমর্থন কবে। মদন ঠিক খেযাল কবেনি। মনেব মধ্যে কুকুবেব বাচ্চা কুঁই কুঁই কবে ডাকছে। আজই বাচ্চাটাকে নিযে যাবে। যত্ন কবে বাচ্চাটাকে বড কবে তুলবে। নাম বাখবে বাঘা। বাঘেব মতো সমস্ত বাত বাডিময় পাহাবা দেবে। বাঘা হবে পাডাব সবচেযে সেবা কুকুব।

তবে মদন জানে নিমাইকে ফটিক ওভাবে ছুঁতে পাবে না। নিমাই ভাবী চালাক, বুদ্ধিমান। সেবাব নষ্ট চন্দ্রাব সময শিবেব মাকে ভুলিযে ভালিযে কী ভাবে তাব উঠোনেব পবেব নাবকোল গাছ থেকে নাবকেল চুবি কবেছিলো ভাবলে গাযেব কাঁটা সোজা হযে উঠে। ওবা সকলেই ভয় পেয়ে গিযেছিলো ঃ

—যদি ধইবে ফেলে তো এহেবাবে মাইবে ফেলবে বে।

—আমি এ চুবিটুবিব মধ্যি নেই। নষ্টচন্দ্রা কবতি অয় তুমবা কাবো গে।

—তাব তে এক কাজ কবলি অয না ? শাম খুড়োব মাচাব পবে ভালো ভালো শোসা হোইছে। চল, ওই গুলোই চুরি কবি।

সাহস দিলো নিমাই :

—তোগোতো আব কিছু কবতি হবে না ? তয এতো ফেবে ফেবে কবতিছিস কেনো ? তুবা শুধু ওর সঙ্গে গল্প কবে যাবি। যা কবতি অয আমি কববানে।

নাবকেল পেড়েছিলো নিমাই। তাবপব শসা, বাতাবি লেবু পেড়ে দল বেঁধে সেই বাত্রেই খেযে নিযেছিলো। সকালে উঠে গাছেব দিকে তাকিযে শিবেব মা হা হা কবে উঠলো। তাব সমস্ত নাবকোলই কাবা যেন চুবি কবে নিয়ে গেছে। সন্দেহ কবে মদন, নিমাই, গঙ্গাধবদেব নাম বলেছিলো। কিন্তু প্রমাণ না থাকায এবং নষ্ট চন্দ্রাব সময চুবি কবলে যেহেতু কিছু বলা যায না পাড়াব লোক সে নিযে তেমন আব মাথা ঘামায নি।

সেই থেকে নিমাইকে ওবা সব চিনে নিযেছে। এতক্ষণে মদন কথা বললো :

• —আবাব গুড়াবতে খেল।

মাথাব উপর সূর্য আগুন ছড়াচ্ছে। পাকুড় পাতায শিবশিব আওযাজ। শিংগিমাবীব জল খেযে গরুগুলো উপবেব দিকে উঠে আসছে। ওবা এখন যে যাব বাড়ি ফিরবে।

কখন ঢুলি চলে গেছে। ওব জন্যে আগামীকাল নিশ্চয়ই মদন ঘুড়ি বানাবে। বলাইদা ওকে কয়েকটা খববেব কাগজ দিযেছিলো একদিন। বলাইদাব নামে বোজ কলকাতা থেকে একটা কবে কাগজ আসে। বড়্‌ঠাকুব, মেজঠাকুব, বলাইদা সন্ধ্যেব সময হ্যাবিকেন নিযে কী সব পড়েন। মদন একটা কাগজ চাইলে বলাইদা ওকে তিন তিনটে আস্ত কাগজ দিযেছিলো। এখনও তাব একটা খুব যত্ন কবে বেখে দিযেছে মদন। ঢুলিব জন্যে ডাকঘুড়ি বানাবে। ঢুলি ওকে একটা কুকুবেব বাচ্চা দিতে চেযেছে। এবং আজই দেবে।

ছাবটি গাই আব ছুটি বাছুব তাডিযে মদন বাডিব বাস্তা ধবলো। গুনগুন কবে গান গায়।

—আমি পবেব কান্না কানলাম বে চিবকাল। আমাব আয যতোদিন—ভালোবাসা ততদিন পুত্র পবিবাব·· । আমাব আয ফুবালে ভালোবাসা দূবে যাবে, (সেদিন) কেউ না দেবে অন্ন বে জল·· ।

কিবণ বাযেব বাডি ছাডিযে বাঁ পাশে দত্ত বাডি মদন এসে গকগুলোকে গোযালে বাঁধলো। স্নান খাওযা দাওযা কবে বিশ্রাম কবতে বাডি গেলো। তাবপব সময়মত বিকেলে আবাব মাঠে এলো।

সূর্য ঝুলে পডেছে পশ্চিমে। বোদ্দুবেব তেজ কম। মাঠেব মধ্যি দিয়ে মাছেব ঝাঁকা মাথায পবন সেনেব বাজাবেব দিকে ছুটছে। ইটেব পুলেব তলায বসে কালার্চাদ নিবিবিলি বাঁশি বাজাচ্ছে। ছুলিদেব বাডি ববাবব মাঠেব সামান্য অংশে ছাযা পডেছে। ছাযাটা বেডে বেডে একসময সূর্য অস্ত যাবে। সন্ধ্যে হবে। মদন বাডি ফিববাব মুখে তাব বাচ্চাটাকে নিযে যাবে। যেমন কবেই হোক বাঘেব মতো কবে তাব বাঘাকে গডে তুলবে।

সন্ধ্যেব কিছু আগেই মদন বাডি ফিবলো। বাচ্চাটাকে বুকেব কাছে চেপে হাতে শালিখেব খাঁচা গক নিযে গোযালে বেঁধে বাখলো। গলায পাডেব সুতো ঝুলিযে বাঘাকে পেটপুবে দুধভাত খাইযে দাওযা কাটা গর্তেব মধ্যে বেখে দিলো :

—ভয নেই। সমোস্তো বাইত আমি জাইগে থাক্‌পানে। শিযেল আলি খুব কবে চেঁচাবি।

পাতলা ঘুমেব মধ্যে সমস্ত বাত মদন তাব বাঘাব ডাক শুনতে পেযেছে। বাঘাটা অনেক বড হযে গেছে। বাডিময পাহাবা দিযে বেডাচ্ছে। কোথাও সামান্য শব্দ হলেই ঘেউ ঘেউ চিৎকাবে বাডি কেঁপে উঠছে। পাডাব লোক বলছে :

—কুত্তব পুষতি হোলি মদনেব মতোন কবেই পুষতি অয।

দিন পাঁচেক পবে একদিন সকাল বেলায মদন দেখলো তাব বাঘা মবে আছে টানটান। চোখ ছুটো খোলা, পেট ফুলে রযেছে। চওযাল গডিযে গেঁজলা পডছে। বিশ্রী গন্ধ। বিডবিড মাছি চলে বেডাচ্ছে। কুকুবটা কাল বাতে মাবা গেছে।

বাঘাকে মাঠে ফেলে দিয়ে মদন তাব মনিবেব বাড়ি এলো। গাই দোহা হয়ে গেলে গরু নিয়ে মাঠে গেলো। পাকুব গাছেব গুঁড়িতে চুপচাপ মদন দেখলো কয়েকটি শকুন ঠুকবে ঠুকবে তার বাঘাকে ইতিমধ্যে খেতে শুরু কবে দিযেছে। পেটেব নাড়িভুঁড়ি বাব কবে দুটো শকুন দুদিকে ধবে টানাটানি কবছে। আব সামান্য পবেই বাঘা নিশ্চিহ্ন হযে যাবে।

লম্বা নিশ্বাস পড়লো মদনেব :

—আমাব কপালে আব কুহুঁব পুষতি অবে না।

চাঁই চাঁই কবে বোদ বেড়ে উঠছে। সাবা মাঠে বোদ্দুব থৈ থৈ। ঘোষালদেব পুকুব ববাবব জমিতে পুন্টেদা চাষ দিচ্ছে। মাঠময ছড়িযে ছড়িযে গরুগুলো চড়ে বেড়াচ্ছে। শিংগিমাবীব খালে তিনজন লোক জাল দিযে মাছ মাবছে। এতদূব থেকে মদন ওদেব কাউকেও চিনতে পাবলো না। আজ আব ঘুড়ি সঙ্গে আনে নি। শালিকেব খাঁচা পাশে বেখে বাঁশেব চোঙ থেকে একটা গঙ্গা ফড়িং বাব কবে বাচ্চাটাকে খেতে দিলো। এখন ওটা সামান্য বড হযেছে, ডানা গজিযেছে। কিছুদিন পবে ওটা কথা বলবে, শিস দেবে। 'মা মা' বলতে শিখলে মদন ওকে আবও অনেক নতুন কথা শেখাবে। 'হবিবোল হবিবোল, কৃষ্ণ কথা কও, কৃষ্ণ কথা কও।' আদব কবে মদন ওব নাম বেখেছে ভক্ত।

শকুনগুলো ইতিমধ্যে প্রায় শেষ কবে এনেছে। মদন দেখলো বাঘাব মা ছুটতে ছুটতে ওদিকে যাচ্ছে। মনে মনে খানিক চঞ্চল হযে ওঠে মদন ঃ

—বেশ হোইছে। এই বাব কী খাবানে শুনি ?

কুকুবটা শাঁই শাঁই ছুটে যেতেই শকুনগুলো ভযে লাফ দিয়ে সবে গেলো। ডানা মেলে অল্প দূবে গোল হয়ে ওরা অপেক্ষা কবছে। বাঘাব মা সবে গেলে ওবা আবাব শুরু কববে।

—সেইডা আব অবে না নে। মা কালী কুহুঁবডা যেন সমোস্তো বাত উহানেই যাইয়ে যায।

বাঘাব মা ঘুবে ঘুবে বাবকতক এদিকে ওদিকে শুঁকলো। তাবপব পাঁজবটা নিযে নিবিবিলি খেতে আবম্ভ কবলো। দুটো পা সামনে ছড়িযে পাঁজব চেপে মাথাটা ঈষৎ কাৎ কবে মনেব সুখে নিজেব বাচ্চাব পাঁজব চিবোচ্ছে।

ঘেন্নায় শরীরের মধ্যে মোচর দিয়ে উঠলো। মাটিতে বারকতক থুথু ফেললো। চোখ ঘুরিয়ে শিংগিমারীর খালের কাছে তার গরুগুলোকে দেখলো। ধবলী আর কালী পাশাপাশি ঘাস খাচ্ছে। বাছুরটা আরামে লেজ তুলে ধবলীর বাঁটে মুখ লাগিয়ে দুধ খাচ্ছে। হাতে লাঠি শক্ত করে ধরে মদন ওইদিকে ছুটে গেলো।

—উলানে কইরে দুধ চুরি করে বাছুররে খাওযানো হোইচ্ছে। দাঁড়াও মজা বার্ কবতিছি।

সকালে গাই দোহার সময় ধবলী বাঁটে দুধ চুরি করেছিলো। এখন সুযোগ বুঝে তার বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে দেখে মদনের রাগ হলো। ছুটে যেতে যেতে আবার সে দেখলো আগের মতো একই কায়দায় বাঘার মা তার বাচ্চার পাঁজর চিবোচ্ছে। শকুনগুলো ডানা মেলে সাক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঘার মার খাওয়া দেখছিলো।

—ধুৎ ধুৎ, জীবোনে আমি কহোনো আর কুহুঁর পোষবো না। উ শালারা সব রাক্ষেস্।

বাড়ি গিয়ে আজই মদন তার নিজের হাতে বাঘার ঘর বন্ধ করে দেবে।

ধবলীকে লাঠিপেটা করে তারপর মদন গরু নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলো। কুকুর পুষবার কথা আর সে কখনও মনেও ভাবে নি।

———

একটি সমীক্ষা

কলকাতায় গণিকাবৃত্তি প্রসঙ্গে

দীপা সর্বাধিকারী

[পতিতাবৃত্তি নিবোধক আইন (১৯৫৬ খ্রী) পাশ হবাব পব এই সমীক্ষাটি গৃহীত হয়। মূল বিপোর্টটিব আংশিক তর্জমা 'পবিচয়ে' প্রকাশিত হবে। 'গণিকাবৃত্তি ও যৌনব্যাধি' এবং 'ভাবতেব পতিতাবৃত্তি নিবোধক আইন (১৮৬০-১৯৫৬ খ্রী)' এই দুটি অধ্যায় পববর্তী সংখ্যায প্রকাশিতব্য।]

বডবাজাবেব বতন সবকাব গার্ডেন স্ট্রীটেব নাম সকলেই জানেন। কিন্তু কে ছিলেন এই খ্যাতনামা বতন সবকাব? বতন সবকাব জাতে ধোপা ছিলেন। ভাবতে ব্রিটিশ বাজত্বেব গোড়াপত্তনেব সময তিনি মুৎসুদ্দিব কাজ ক'বে বিত্তবান ও ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাব প্রতিপত্তিব কাবণ ছিলো অন্য—তাব আসল কাজ ছিলো দালালি। সাহেবদেব দেশীয় মেয়ে জোগানোব ব্যাপাবে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বতন সবকাবেব পাপেব কথা লোকে ভুলে গেছে, কিন্তু তাব নামেব স্মৃতি আজো সেই জনবহুল বাস্তা বহন ক'বে চলেছে। পৃথিবীব আব কোথাও এই শ্রেণীব দালালেব নামে কোনো বাস্তাব নামকবণ হযেছে ব'লে আমাদেব জানা নেই।

'গণিকালযেব' আইন প্রদত্ত সংজ্ঞা আমবা পবে দেবো। আপাতত প্রচলিত অর্থে গণিকালয কথাটি এবং প্রস্টিটিউট-এব প্রতিশব্দ রূপে গণিকা, বেশ্যা, বাবাঙ্গনা, বাববনিতা, পতিতা শব্দগুলি ব্যবহৃত হযেছে।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক ডেপুটি কমিশনার (ম্যানুস্ক্রিপ্‌ট নোট্‌ অন্‌ ইম্‌মরাল ট্র্যাফিক ইন ক্যালকাটা : কে. বি. চক্রবর্তী আই. পি.) যে রিপোর্ট দাখিল করেন তা থেকে জানা যায় যে কলকাতায় বিধিবদ্ধভাবে স্বীকৃত ১৪০০ গণিকালয় আছে এবং তাতে ৬০০০ গণিকা বাস করে। পূর্বোক্ত রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে যে শহরতলি অথবা বহিরাগত গণিকাদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা অতি দুরূহ।

দু বছর পরের পুলিশ রেকর্ড অনুযায়ী কলকাতায় বিধিবদ্ধভাবে স্বীকৃত গণিকালয়ের সংখ্যা ১৫০০ এবং এসব স্থানে ৬৫০০ গণিকার বাস। একেকটি গণিকালয়ে পাঁচ জনেরও কম গণিকা বাস করে এটা অবিশ্বাস্য। অবশ্য পুলিশের মতে গোপনভাবে গণিকাবৃত্তিতে লিপ্ত মেয়ের সংখ্যা ৪১০০০। আমার মনে হয় এ সংখ্যাও অনেক কম। বস্তুত এ ব্যাপারে সঠিক সংখ্যা পাওয়া সব সময়ে দুরূহ। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বসু গণিকাবৃত্তি নিরোধক আইন (১৯৩৩)' এর ভিত্তিতে পূর্বভারতে গণিকাবৃত্তির সমস্যা বিষয়ে যে সমীক্ষা করেছিলেন তাতে দেখা যায় ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে অবৈধ গণিকালয় রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত আসামী মাত্র একজন।

কলকাতায় সব বর্ণের, সব ধর্মের, সব জাতির গণিকা লক্ষ্য করা যায়। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এমন কি ইউরোপীয় বারবনিতাও বিরল নয়। কার্‌ (Kerr) ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় ৫২৫ জন খ্রীষ্টান গণিকার কথা বলেছেন। তাঁর 'দি সোশাল ইভিল ইন ক্যালকাটা' গ্রন্থে শুধু খ্রীষ্টান গণিকাদের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, গণিকাবৃত্তির সাংগঠনিক রূপটি যদিও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মতো নয়, তবুও এই বৃত্তির সঙ্গে নানা শ্রেণীর উপজীবিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত।

গণিকালয়ের অন্তর্ভূত হলো কর্ত্রী (চলতি নাম বাড়িউলি মাসি), জমির মালিক, দালাল, কুট্‌নি। বাড়িউলির কাজ হলো নবাগতাদের জন্য আবাসের ব্যবস্থা করা, ব্যবসায়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য অগ্রিম অর্থদান, অসুস্থতার সময়ে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা ; তাছাড়া দৈনন্দিন বহু সমস্যার প্রতিবিধান তো আছেই। সাধারণ গণিকার রোজগারের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ তার প্রাপ্য। কার-এর মতে, এই বাড়িউলিরা সবাই অতীতে গণিকা ছিলো, কিন্তু রোগ-ভোগে অকালে বৃদ্ধা হবার পর তারা বাড়িউলির ভূমিকা

নেয়। এ বিষয়ে তাদের প্রাক্তন পৃষ্ঠপোষকেরা সহায়তা করে।

জমির মালিক গণিকালয়গুলির জন্য সাধারণ বসতবাড়ির তুলনায় অনেক গুণ বেশি ভাড়া আদায় ক'রে থাকে। এই বেশি অনেক সময় চার-পাঁচশো গুণ পর্যন্ত হয়। ১২ ফুট × ১০ বা ১৪ ফুট ঘরের ভাড়া দেড়শো থেকে দুশো টাকা। পায়খানা বাথরুম পৃথক নয়। বিলেতের উলফেনডেন কমিটির রিপোর্টে (১৯৫৭) সুপারিশ করা হয়েছিল যারা গণিকালয়গুলির জন্য ভাড়া এতো বেশি নেয়, তাদের গণিকাদের অর্থে প্রতিপালিত ঘোষণা করা হোক।

কুটনিদের কাজ হলো জোগানের অর্থাৎ মেয়ে সংগ্রহ। কুটনিদেরও অধিকাংশ অতীতে গণিকা ছিল – বয়েস এবং ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য এ বৃত্তি ত্যাগ করেছে।

এরপর দালাল। এদের কাজ হলো খদ্দের সংগ্রহ। সাধারণত রিক্‌শাওয়ালা, ট্যাক্সি ড্রাইভার, পানওয়ালারা এই সব কাজ ক'রে থাকে। এই সব পানের দোকানে চোলাই মদও পাওয়া যায়। গণিকাদের সঙ্গে ব্যবস্থা থাকে খদ্দের সংগ্রহের—তাদের কাছ থেকে দালালি পায় শতকরা পঁচিশ টাকা। তাছাড়া খদ্দেরদের কাছ থেকে বখ্‌শিস তো আছেই।

পাড়ার ও নিজেদের নিরাপত্তার জন্য গণিকাদের দুষ্ক্রিয়াকারী ও অন্যান্য-দের কিছু নিয়মিত অর্থ দিতে হয়। গণিকাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা খুব আড়ম্বরহীন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে খুব বেশি খরচ করে না। চাকর বাকর যৌথভাবে রাখা হয়। চাকরের মাইনে খাওয়া বাদে সাধারণত মাসিক সত্তর থেকে আশি টাকা। রাঁধুনি কদাচিৎ থাকে, যদিও বা যৌথ-ভাবে রাখা হয় তার মাসিক মাইনে তিরিশ টাকা এবং খাওয়া। গণিকা-দের আয়ের ওপর নির্ভর স্বজন-বন্ধুদের সংখ্যা কম নয়। তাছাড়া এদের অনেকেরই দু-একজন ভবঘুরে প্রেমিক থাকে, যার ভরণপোষণের দায়িত্ব তাদের। গণিকারা সময়কালে হয়তো অনেক রোজগার করে, কিন্তু টাকা বিশেষ জমাতে পারে না।

কলকাতার গণিকালয়

ইংরাজিতে বেশ্যাপাড়াকে 'রেড লাইট ডিস্ট্রিক্ট' ব'লে আলাদা করা

হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে গণিকালয় প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত অভিধা শুধু শিথিল-ভাবে প্রযুক্ত হতে পারে। কেননা পাশ্চাত্য দেশে রেড লাইট এলাকায় লাইসেন্স, নিয়মিত ডাক্তারি পরীক্ষার যে কঠোর ব্যবস্থা আছে আমাদের দেশে তা নেই।

গণিকাদের মধ্যে যেমন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব শ্রেণীর প্রতিনিধি আছে, তেমনি গণিকালয়ে গমনকারীদের মধ্যে সব স্তরের লোক আছে। জে. এন. ঘোষ তাঁর 'দি সোশাল ইভিল ইন ক্যালকাটা' গ্রন্থে বলেছেন, 'গণিকালয়ে যারা যায়, তাদের মধ্যে দিন মজুর, চাকুরে ব্যবসাদার, বড়োলোক মধ্যবিত্ত, বিবাহিত, অবিবাহিত সব ধরনের লোকই আছে। এই পাপ কাজে সমাজের সব শ্রেণীর লোকেরই অল্প-বিস্তর ভূমিকা আছে'। সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের রূপ গণিকালয়গুলির মধ্যেও প্রতিফলিত। সব শ্রেণীর লোক সব পাড়ায় যাতায়াত করে না।

গণিকাদের মধ্যে রক্ষিতাদের বিশেষ মর্যাদা আছে। কোনো ধনী লোকের রক্ষিতা হলে সে গণিকালয় ছেড়ে কোনো সম্ভ্রান্ত পল্লিতে উঠে যাবে। মানসিক এবং অর্থনৈতিক কারণে গণিকারা এক সঙ্গে এক-জনের রক্ষিতা থাকাটাই পছন্দ করে। রক্ষিতার জন্য তার প্রণয়ী মাসোহারা দেয়, আলাদা ফ্ল্যাট বা বাগান বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে, ভাগ্য 'সুপ্রসন্ন' হলে বাড়ি পর্যন্ত কিনে দেয়। অবশ্য রক্ষিতা খুব বেশিদিন 'রক্ষিত' থাকে না। দেহের আকর্ষণ কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পুনর্মূষিক হতে হয়—আবার ফিরে আসে তার বস্তিতে। রক্ষিতাদের মধ্যেও শ্রেণী বিভাগ আছে। আমরা আপাতত কলকাতার কতকগুলি প্রধান গণিকালয়ের পরিচয় দেবো।

১. **সোনাগাছি** ১৭শ শতাব্দীর মুসলমান পীর সোনা গাজীর স্মরণে যে রাস্তার নামকরণ হয়েছিল, আজ সেখানে মুসলমানের চেয়ে হিন্দুদের ভিড় অনেক বেশি। বলা বাহুল্য তারা কেউ পুণ্যার্থী নয়, পঞ্চ মকারের প্রবলতম বৃত্তির আকর্ষণে এখানে আসে। কলকাতার গণিকালয়-গুলির মধ্যে এই অঞ্চলই সবচেয়ে বিস্তৃত। উত্তর পশ্চিম কলকাতার প্রায় দু বর্গ মাইল জুড়ে এই অঞ্চল—পশ্চিমে সীমা নির্দেশ করা যায় প্রায়

গঙ্গার ধার পর্যন্ত, পূর্বে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, দক্ষিণে বিডন স্ট্রীট, উত্তরে গ্রে স্ট্রীট। উত্তর পশ্চিম সীমানায় আছে শোভাবাজার, হাটখোলা, কুমার-টুলি অঞ্চল।

কলকাতার ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা জানেন বিরাট ঐতিহ্য সমন্বিত এই অঞ্চল। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসীম। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের বহু বনেদি পরিবারের প্রাসাদোপম অট্টালিকা এই স্থানের আভিজাত্যের নিদর্শন। এখন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত কিছু নিম্ন মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তু পরিবার এ অঞ্চলে বাস করে। কিন্তু কিছুদিন আগেও চিৎপুর-বিডন স্ট্রীটের সংযোগস্থল থেকে চিৎপুর-গ্রে স্ট্রীট পর্যন্ত সব বাড়িগুলিই গণিকালয় ছিলো। কলকাতার সবচেয়ে পুরনো রাজপথ চিৎপুরের পথেই নবাব সিরাজদ্দৌলা ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর অভিযান চালিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম দখল করেছিলেন। এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও কম নয়। কলকাতার প্রাচীনতম স্কুল ওরিয়েণ্টাল অ্যাকাডেমি (রবীন্দ্রনাথ যে স্কুলের ছাত্র ছিলেন) এখানে অবস্থিত। এই অঞ্চলের আরেকটি প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সারদাচরণ এরিয়ান ইনস্টিটিউশন। পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে বটতলার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে পুস্তক ব্যবসায় কেন্দ্র কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে স্থানান্তরিত হবার আগে পর্যন্ত এই বটতলা পুস্তক ব্যবসায়ে একচেটিয়া ছিলো। এখনও বিশেষ ধরনের সুলভ বই প্রকাশে এর ভূমিকা আছে। তাছাড়া অধিকাংশ পেশাদারি যাত্রা দলের অফিসগুলি এখানে অবস্থিত।

সোনাগাছি অঞ্চলের গৌরীশঙ্কর লেন, অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রীট প্রভৃতি জায়গায় বনেদি গণিকাদের বাস। পশ্চিম প্রান্তে বৃন্দাবন বসাক স্ট্রীট, নিমু গোস্বামী লেনে বিচ্ছিন্নভাবে অনেক গণিকালয় আছে। কিন্তু গণিকালয়গুলির সঠিক সংখ্যা নির্ণয় দুরূহ, কেননা এ অঞ্চলে গণিকারা সাধারণত রাস্তায় দাঁড়ায় না। তাছাড়া এ অঞ্চলে প্রচুর 'হাফ গেরস্থ' আছে—পরিবারের ভেতর বসবাস ক'রে যারা এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত।

সোনাগাছির গণিকাদের বিশেষ আভিজাত্য আছে। বেশির ভাগ গণিকাই (শতকরা ৬০ জন বা তার বেশি) বারান্দায় অথবা দরজায় খদ্দেরের জন্য অপেক্ষা করে না। তাদের ঘর-দোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আসবাবপত্রে

সজ্জিত। অল্প বয়েসি সুশ্রী হলে প্রতি ঘণ্টার হার সাধারণত ১৫ থেকে ৫০ টাকা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘণ্টার হার আনুপাতিকভাবে কম। রাত্রি-বাসের জন্য ৪০ টাকা থেকে ১০০ টাকা। পান, সিগারেট, মদ্যপান ইত্যাদি আনুষঙ্গিক খরচ আলাদাভাবে দেয়। গান বাজনার জন্য পৃথক টাকা। তাছাড়া চাকর দারোয়ানকে বখশিস দিতে হয়। উঠতি সময়ে (এক-টানা দশ বছরের বেশি নয়) এই অঞ্চলের সফল গণিকার মাসিক রোজ-গার হাজার থেকে বারোশো টাকা।

২. **রামবাগান** গুরুত্বের দিক দিয়ে সোনাগাছির পরেই রামবাগানের স্থান। এক হিশেবে রামবাগান হলো সোনাগাছি অঞ্চলেরই সম্প্রসারণ। বিডন স্ট্রীটের দক্ষিণ সীমা হলো রামবাগান আর উত্তর সীমায় সোনাগাছি। প্রায় দেড় বর্গ মাইল বিস্তৃত এই অঞ্চলের পশ্চিম সীমা প্রায় গঙ্গার ধার পর্যন্ত (তার মধ্যে পাথুরেঘাটা ও দরমাহাটা অঞ্চলে দরিদ্র গণিকাদের বাস, সেখানে নতুন বাজারের দিন মজুর ও স্বল্পবিত্ত লোকেদের যাতায়াত) দক্ষিণে বড়বাজার, পূর্বে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। এই অঞ্চলে গণিকালয়ের সংখ্যা যেখানে সবচেয়ে বেশি, তার কাছাকাছি আছে রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্তপরিবারের (রমেশ চন্দ্র, তরু দত্ত, অরু দত্ত খ্যাত) আবাসস্থল, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি ইত্যাদি।

৩. **হাড়কাটা** উত্তরে চাঁপাতলা, দক্ষিণে বৌবাজার স্ট্রীট, পূর্বে আমহার্স্ট স্ট্রীট ও পশ্চিমে কলেজ স্ট্রীট দিয়ে ঘেরা এই অঞ্চলটি হাড়কাটা নামে পরিচিত। আমহার্স্ট স্ট্রীট ছাড়িয়েও দু-একটি গণিকালয় চোখে পড়ে। পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুদের আগমনের আগে এই অঞ্চলে দু-এক ঘর ছাড়া গৃহস্থ বাসিন্দা একেবারে ছিলো না বললেই চলে।

৪. **ভবানীপুর** ভবানীপুর সম্ভ্রান্ত এলাকা হলেও আশুতোষ মুখার্জি রোডের পূর্ব প্রান্তে কিছু গণিকালয় আছে। এরা সাধারণত রাস্তায় অথবা দরজায় দাঁড়ায় না। দালালেরা পানের দোকান অথবা সিনেমার পাশে খদ্দেরের সন্ধানে ঘোরাফেরা করে।

অন্যান্য অঞ্চল- কলকাতাব সবচেযে অভিজাত অঞ্চলেব পাশে বস্তি লক্ষ্য কবা যায। বড বাস্তাব ওপবে না থাকলে পেছনে থাকবে। কলকাতায প্রায ৬০০০ বস্তি আছে এবং খুব কম কবে হলেও এব এক তৃতীয়াংশ বস্তিতে অবাধে গণিকাবৃত্তি চলে থাকে। এই গণিকালয বস্তিব সংখ্যা ২০০০ এব কম হবে না।

অবাঙালী গণিকালয় শিয়ালদা থেকে লালবাজাব পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে (যাব মধ্যে মদন দত্ত লেন, গিবিবাবু লেন, গঙ্গাধব বাবু লেন) প্রায দুশো পশ্চিমা (উত্তব প্রদেশ, বিহাব, পাঞ্জাব ইত্যাদি বাজ্য থেকে আগত) মুসলমান গণিকা আছে। এবা সবাই খানদানি, নাচ গানেব মুজবা দিযে আসে। তাবা বেশ ঠাটে থাকে।

এদেব হাবও অনেক বেশি। তিন ঘণ্টা নাচ গানেব জন্য ৩০ থেকে ৭০ টাকা। সম্ভোগেব জন্য কম পক্ষে ৫০ টাকা।

অবশ্য এদেব অবস্থা এখন পডতিব মুখে। হিন্দুস্থানী ভাষীবা এদেব প্রধান পৃষ্ঠপোষক। হিন্দুদেব বিশেষভাবে মাডোযাবিদেব এদেব সম্পর্কে সংস্কাব আছে। বাঙালিবাও সাধাবণত এই সব স্থানে অস্বস্তিবোধ কবে। এদেব প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলো ধনী মুসলমান সম্প্রদায। তারা অধিকাংশই পাকিস্তানে চ'লে যাওয়াব এই সব গণিকাদের অবস্থা আগেব মতো নেই।

খিদিরপুর কলকাতার বন্দব এলাকাব গণিকালয়গুলির আন্তর্জাতিক চেহাবা আছে। এই অঞ্চল এক কালে আন্তর্জাতিক দাস ব্যবসায়ের (বিশেষভাবে মেয়ে ক্রয়-বিক্রয়) কেন্দ্র ছিল। তাছাডা বাজার দর ক'মে যাওয়া ইউরোপীয়, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও ভারতীয় গণিকারা এখানে ভিড করতো। বস্তুত পৃথিবীর প্রায় সব প্রান্ত থেকে এবকম গণিকাব সমাবেশ হতো। জাপানী-চীনে-তিব্বতী-নেপালী সব জাতেবই ছিলো। এমন অনেকে ছিলো যাবা কোনো ভারতীয় ভাষা পর্যন্ত জানতো না, ফলে প্রায বোবা। যুদ্ধেব সময জাপানী গণিকারা চ'লে যায়। অন্যান্য বিদেশী ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গণিকাবাও ক্রমশ উঠে যাচ্ছে। বর্তমানে মধ্যপ্রদেশ এবং আলমোবা থেকে আগত গণিকাই বেশি। মুসলমান গণিকাও লক্ষ্য কবা যায়।

ধুকুরিয়া বাগান একে কলিঙ্গ অঞ্চল বলা চলে—সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডের দক্ষিণে ওয়েলসলি স্ট্রীটের পশ্চিমে ধুকুরিয়া বাগান অবস্থিত। এটি ওড়িয়া ও তেলুগু গণিকাদের উপনিবেশ, ওড়িয়াভাষী গণিকারই সংখ্যাধিক্য। এরা অত্যন্ত দরিদ্র। খদ্দের সংগ্রহের জন্য রাস্তায় নেমে হাত ধ'রে টানাটানিও ক'রে থাকে।

বর্তমানে ধুকুরিয়া বাগানের গণিকালয়গুলি অবলুপ্ত।

চায়না টাউন কলকাতার চীনাবাজারের অধিবাসীদের অধিকাংশই চামড়া ও জুতার ব্যবসায়ে লিপ্ত। এই অঞ্চলে ভারতীয়, নেপালী, তিব্বতী বহু গণিকা দেখা যায়। এই বস্তিগুলির অবস্থা ধুকুরিয়া বাগানের বস্তিগুলির চেয়ে অনেক খারাপ। টেরিটি বাজারের পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্তে এই গণিকালয়গুলি অবস্থিত।

অ্যাংলো মুসলমান পাড়া কয়েক বছর আগে পার্ক সার্কাসের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত করেয়া অঞ্চল সবচেয়ে সমৃদ্ধ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গণিকালয় ছিলো। এখানে প্রায় ১০০টি বাঙলায় এক হাজার অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গণিকা থাকতো, তার মধ্যে কয়েকজন ইউরোপীয়। এই গণিকালয়গুলি একেবারে ইউরোপীয় কায়দার। বর্তমানে এই গণিকালয়গুলি অবলুপ্তির পথে।

অবশ্য অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গণিকা শহরের অন্যত্র দুর্লভ নয়। চৌরঙ্গি পাড়ায় (বিপন স্ট্রীট, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের দক্ষিণ প্রান্ত, চাঁদনি চক) এবং বেনেপুকুর পাড়ায় অনেকেই পুরো বা আধা সময়ে এই বৃত্তির সঙ্গে জড়িত। অ্যাংলো মুসলমান পাড়ায় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েরা প্রতিযোগিতায় মুসলমান বা অন্যান্য মেয়েদের চেয়ে এগিয়ে আছে। সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বিচার করলে দেখা যাবে একক সম্প্রদায়ের মধ্যে আনুপাতিক ভাবে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গণিকা সবচেয়ে বেশি।

এই প্রসঙ্গে আরো দু-একটি ছদ্মবেশী গণিকালয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। তার মধ্যে প্রধান: ১ ফাঁকা বাড়ি সমূহ; ২. মাসাজ ক্লিনিক ও বাথ।

১. **ফাঁকা বাড়ি** ফাঁকা বাড়িগুলি অনেকটা ব্রিটেনের কল গার্ল

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তুলনীয়। ওদেশে টেলিফোনে গণিকাকে ডেকে পাঠাবার ব্যবস্থা আছে। যুদ্ধের সময় কলকাতায় ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, রিপন স্ট্রীট, কিড স্ট্রীট, চাঁদনি চক অঞ্চলে ব্যাঙের ছাতার মতো এই ফাঁকা বাড়িগুলি গজিয়ে ওঠে। ফাঁকা বাড়ি এইরূপ নামকরণের কারণ হলো নির্দিষ্ট সময় ছাড়া এই ঘরগুলি অন্য সময়ে ফাঁকা প'ড়ে থাকে। গোপন গণিকাবৃত্তি নানা ভাবে চলে। ক. কেউ অবৈধ প্রণয়িনী বা প্রণয়ীকে নিয়ে এখানে আসে ; খ. সন্ধ্যের দিকে বহু গোপন গণিকার সমাবেশ হয়। গ. অনেক সময় গৃহকর্তা খদ্দেরের চাহিদা অনুযায়ী গণিকা সংগ্রহ করে দেয়। এই জাতীয় ব্যবসায়ে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েরাই বেশি যুক্ত। এদের মধ্যে অনেকেরই এটা আধা সময়ের উপজীবিকা। বাকি সময়ে কেউ টেলিফোন অপারেটর, নার্স বা অন্যান্য চাকরি করে। ছাত্রীদের সংখ্যাও কম নয়। 'যৌন ব্যাধি' শীর্ষক পরিচ্ছেদে দেখা যাবে যে যৌন ব্যাধিগ্রস্তদের মধ্যে ছাত্রীদের স্বতন্ত্র তালিকা ভুক্ত করা হয়েছে। এই সব স্থানে কোথা থেকে মেয়ে সংগৃহীত হয় সঠিকভাবে বলা দুরূহ। কারণ এদের সব উত্তরগুলিই নির্ভেজাল মিথ্যে। তবে আমার সমীক্ষা থেকে এটা স্পষ্ট যে পশ্চিমের মতো আমাদের দেশেও পেশাদারের চেয়ে শৌখিন গণিকার সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

মাসাজ বাথ ও ক্লিনিকগুলি প্রধানত যুদ্ধের অবদান। সেবা ও চিকিৎসালয়ের ছদ্মবেশে এই গোপন গণিকালয়গুলি বিশেষ জনপ্রিয় ছিলো। ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিকাল এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট (১৯৫০) পাশ হবার পর এগুলি বন্ধ করবার অনেক কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। অবশ্য হোটেলে রেস্তোরাঁয় গোপনে গণিকাবৃত্তি অবাধে চলছে।

পাপবোধ ও গণিকা

'সাফল্যের চেয়ে বড়ো সার্থকতা নেই' এ নীতি সর্বত্র প্রযোজ্য। গণিকারাও তার ব্যতিক্রম নয়। যারা সফল হয়, তাদের গ্লানিবোধ থাকে না। কিন্তু এই জীবিকায় সফলদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। তাছাড়া নিরাপত্তার অভাব, অনিশ্চয়তা, নৈঃসঙ্গ্যবোধ সব সময়ে পীড়িত করে। তারা জানে তাদের ভবিতব্য অকাল বার্ধক্য এবং জরা। অনেকেরই এ পথে আসার কারণ দারিদ্র্য। দারিদ্র্য সহচর হ'লে নৈতিক পদস্খলন সহজ। ফলে গণিকাদের মধ্যে যাদের মানবিক মূল্যবোধ লোপ পেয়েছে তারা ছাড়া

অনেকেই পুনর্বাসনে আগ্রহী। সমাজসেবীরা উদ্যোগী হ'লে এদেব সুস্থ জীবন যাত্রায় ফিরিযে আনা সম্ভব। অবশ্য অভ্যস্ত জীবনেব পবিবর্তন আনতে অনেক পবিশ্রম ও অধ্যবসাযেব প্রয়োজন। এই প্রবন্ধেব শেষে কযেকজন গণিকাব সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।

গণিকাদেব অধিকাংশই অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত। তার ওপব নিবাপত্তাব অভাব তো আছেই। ফলে একদিকে নানা কুসংস্কাব, অন্যদিকে দেব-দেবীতে ভক্তি দুটোই বেশি পবিমাণে দেখা যায়। তুকতাক, বশীকরণ ইত্যাদিতে তাদেব ভীষণ আস্থা। যেমন ঝাঁট দেবাব ব্যাপাবেই অনেক কাযদা কানুন আছে। ঘবদোর প্রতিদিনই ঝাঁট দেওযা হয। কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ঝাঁট দেবাব কাযদা এবং সময আলাদা। উদ্দেশ্য ভেদে ঝাঁটাও নানা ধবনের হয়ে থাকে। ব্যবসা মন্দা হ'লে মন্ত্র সহযোগে বিশেষ ঝাঁটা দিযে বিশেষ সময়ে ঝাঁট দিতে হয। কোনো অবাঞ্ছিত লোককে বা ব্যাধিগ্রস্ত আগন্তুককে তাডাবাব জন্যও মন্ত্র আছে। বশীকবণ তো আছেই।

গণিকারা প্রায সবাই ধর্মভীরু হয। যাবা একেবাবে খেতে পায না তাদেব কথা আলাদা, কিন্তু কোনো গণিকার গৃহে ঠাকুব দেবতার পট নেই এ দৃশ্য বিবল। মুসলমান গণিকাবাও ব্যতিক্রম নয। তাদের পীব দরবেশে ভক্তি লক্ষণীয। হিন্দু গৃহস্থের মতো হিন্দু গণিকাবও প্রধান উপাস্যা দেবী হলেন লক্ষ্মী। সবচেযে জনপ্রিয পার্বণ হলো কার্তিকেয বা সুব্রহ্মণাম পূজা। আশ্চর্যেব ব্যাপার সবস্বতীও এদেব প্রিয দেবী।

বৃদ্ধা বেশ্যাদেব অনেকটা সময কাটে পূজা-অর্চনায। তাদের মধ্যে শুচিবাই খুব বেশি লক্ষ্য কবা যায। মনস্তাত্ত্বিকেরা সহজেই এব মধ্যে পাপবোধেব সন্ধান পাবেন।

কয়েকজন গণিকার জবানি

(নাম ঠিকানা গোপন রাখা হলো)

১। সোনাগাছি এলাকাব জনৈকা মুখার্জি। উঁচুদবেব সুসজ্জিত একটি মাত্র ঘব, যৌথ বান্নাঘব। আদি নিবাস মাদ্রাজেব সৈদাপেট।

বয়স ২৪ বছব। ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন। কাবিগবি বা কোন বৃত্তিশিক্ষা নেই। বিবাহিত। স্বামীব নামধাম দিতে চান নি। নিঃসন্তান ও অসুখী বিবাহিত জীবন। পিতা জীবিত। পতিতাবৃত্তি বংশানুক্রমিক নয়। ৫ বছব ধবে গণিকাবৃত্তিতে নিযুক্ত। ঘণ্টা পিছু ১৫ টাকা হারে মাসিক বোজগাব ৮০০ টাকা। ঘব ভাড়া ১৫০ টাকা। দালাল নেয় ২৫%। অন্যান্য ব্যয় মাসে ৫০ টাকা। বললেন স্বামীব দুর্ব্যবহাবে নিজেই এই পথ বেছে নিযেছেন। গার্হস্থ্য জীবনে ফিবে যেতে চান। সাক্ষাৎকাবীব ধাবণা : সম্ভ্রান্ত পবিবাবজাত, এ বৃত্তিতে মোটামুটি তৃপ্ত ; আবেগ অনুভূতি-হীন , বুদ্ধিবৃত্তিতে মাঝাবি, নাচগানে কুশলী নন ; নিজেব সম্পর্কে মন খুলে বলতে চান নি ; মনে হয়, এঁব বদলানো শক্ত। বিশেষ ঘটনা : স্বামীব অত্যাচাব ও জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলা। এই বৃত্তি এঁব ভালো লাগতে শুরু হযেছে, ভবিষ্যতে আবো উন্নতিব আশা বাখেন। সুতবাং ইনি সাধাবণ ভাবেই জটিল চবিত্র।

২। সোনাগাছি এলাকাব জনৈকা ঘোষ। উঁচুদবেব সুসজ্জিত একটি ঘব, যৌথ বান্না ঘব। আদি নিবাস শ্যামনগব, ২৪ পবগনা। বয়স ২০ বছব, সাক্ষব , কাবিগবি বা বৃত্তিশিক্ষা কিছু নেই। বিবাহিতা কিন্তু নিঃসন্তান। স্বামী ও পিতাব নাম-ধাম পাওযা যায় নি। বিবাহিত জীবনে সুখেব ব'লে উক্ত। পতিতাবৃত্তি বংশানুক্রমিক নয। ৪ বছব ধ'বে এই বৃত্তিতে নিযুক্ত। ঘণ্টা পিছু ২০ টাকা হাবে মাসিক বোজগাব ৮০০ টাকা। ঘবভাড়া মাসিক ১৭০ টাকা। দালাল নেয ২৫%। অন্যান্য খবচ মাসে ৫০ টাকা। এই পেশা ভালো লাগে ব'লে এই জীবিকা বেছে নিযেছেন। বোনেব সাহায্যে এ পথে আসেন। গার্হস্থ্য জীবনে ফিরে যাবাব ইচ্ছে নেই। সাক্ষাৎকাবীব ধাবণা : মার্জিত, চালাক-চতুব, পবিতৃপ্ত কিন্তু আবেগ অনুভূতিহীন। গান জানেন। মন খুলে মোটামুটি কথা বলেছেন। বিশেষ ঘটনা : বোনও এই বৃত্তিতে নিযুক্ত। বোনেব সঙ্গে থাকেন। এই বৃত্তিতে উন্নতি কবাব ইচ্ছে আছে।

৩। সোনাগাছি এলাকাব জনৈকা সেনগুপ্ত। উঁচুদবেব সুসজ্জিত একটি ঘব। আদি নিবাস খুলনা। বযস ২২ বছব। ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন, কাবিগবি বা বৃত্তিশিক্ষা কিছু নেই। অবিবাহিত। পিতা জীবিত

কি· মৃত জানা নেই। পিতার নামধাম বলতে চান নি। পতিতাবৃত্তি বংশানুক্রমিক নয়। ২ বছর ধরে পতিতাবৃত্তিতে নিযুক্ত। ঘণ্টা পিছু ২০ টাকা হাবে মাসিক রোজগার ৮০০ টাকা। ঘরভাড়া মাসিক ১৮০ টাকা। দালালকে দেয় ২৫%। অন্যান্য খরচ মাসে ৭৫ টাকা। এই পেশার টানেই এ পথে এসেছেন। কারো মাধ্যমে নয়, সরাসরি এসেছেন ব'লে উক্ত। ঘরে ফেরার আকর্ষণ নেই। সাক্ষাৎকারীর ধারণা : বেশ সুখী চালাক-চতুর, নাচ-গান জানেন। অবস্থা প্রকাশের আগ্রহ মোটামুটি। মনে হয় জটিল চরিত্র। বিশেষ ঘটনা : বাড়িতে অনেক ভাই-বোন। বাড়িতে সুখী নয়।

৪। সোনাগাছি এলাকার জনৈকা রায়। উঁচুদরের সুসজ্জিত একটি ঘর। আদি নিবাস বাঁকুড়া, হিন্দু ব্রাহ্মণ। বয়েস ২১ বছর। সাক্ষর ; কারিগরি বা বৃত্তিশিক্ষা কিছু নেই। অবিবাহিত কিন্তু এই পেশায় যোগ দেবার পর দুটি কন্যার মাতা। পিতা মৃত। নামধাম কিছু পাওয়া যায় নি। ঘণ্টা পিছু ১৫ টাকা হাবে মাসিক রোজগার ৭০০ টাকা। ঘরভাড়া মাসিক ১৫০ টাকা। দালালি ২৫%। অন্যান্য খরচ মাসিক ৫০ টাকা। এ পথে আসার কারণ দারিদ্র্য। কারো মাধ্যমে নয়, সরাসরি এ ব্যবসায়ে এসেছেন বলে উক্ত। গার্হস্থ্য জীবনে ফিরে যেতে অভিলাষী। সাক্ষাৎকারীর ধারণা : মার্জিত ব্যবহার, মনে হয় সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে এসেছেন। চালাক-চতুর, খুব জটিল চরিত্র ব'লে মনে হয় না। বিশেষ ঘটনা : বাড়িতে সৎ মা। এই জীবিকায় ভীষণ অসুখী ব'লে মনে হয়। সন্তানদের জন্য ভীষণ উদ্বিগ্ন।

৫। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের জনৈকা· বাঈ। 'ফাঁকা বাড়ি' গুলির একটি শস্তা ঘর। মুসলমান। আদি নিবাস উত্তর প্রদেশ। বয়েস ২৫ বছর। সাক্ষর কিন্তু কারিগরি বা বৃত্তিশিক্ষা নেই। অবিবাহিত। পিতা মৃত, নামধাম কিছু পাওয়া যায় নি। আর্থিক অবস্থা খারাপ। পতিতাবৃত্তিতে নিযুক্ত ৫ বছর। ঘণ্টা পিছু ৫ টাকা হাবে মাসিক রোজগার ৩০০ টাকা। ঘরভাড়া দিতে হয় না, তবে রোজগারের এক তৃতীয়াংশ বাড়িউলিকে দেয়। রোজগারের অন্যান্য উপায় বিষয়ে সঠিক উত্তর পাওয়া যায় নি, তবে মনে হয় অন্যবিধ উপায়ও আছে। এ পথে আসার কারণ দারিদ্র্য। কারো মাধ্যমে নয়, সরাসরি এ ব্যবসায়ে এসেছেন ব'লে উক্ত। ঘরের টান নেই।

সাক্ষাৎকাবীব ধাবণা : আবেগ-অনুভূতিহীন পেশাদাব গণিকা। নাচ-গান জানেন, নিজের অবস্থা প্রকাশে বিশেষ ইচ্ছে নেই। জটিল চবিত্র। বিশেষ ঘটনা : বোনও এই জীবিকায় নিযুক্ত। এই পেশা ভালো লাগে।

৬। বিপন স্ট্রীটেব জনৈকা ভাবতীয় খৃষ্টান। বয়েস ২৮ বছব। একটি ঘর, কাঠেব পার্টিশন কবা, শস্তাব 'ফাঁকা বাড়ি'। আদি নিবাস কোথায় উত্তর পাওয়া যায় নি। ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন। কারিগরি বা বৃত্তিশিক্ষা কিছু নেই। অবিবাহিত। পিতা জীবিত, নামধাম পাওয়া যায় নি। আর্থিক অবস্থা খাবাপ। পতিতাবৃত্তিতে ৬ বছর নিযুক্ত। বংশানুক্রমিক নয়। ঘণ্টা পিছু ৫ টাকা হাবে মাসিক বোজগার ২৫০ টাকা। ঘবভাড়া দিতে হয় না। বাড়িউলিকে বোজগারের অর্ধেক দেয়। দালালি ও অন্যান্য খরচ কত দিতে হয় এ প্রশ্নেব উত্তব পাওয়া যায় নি। এ বৃত্তি নির্ধাবণেব কাবণ দাবিদ্র্য। ঘবেব টান নেই। সাক্ষাৎকাবীব ধাবণা : অনুভূতিহীন, বুদ্ধিবৃত্তি মাঝাবি। পবিবর্তন আনা দুরূহ।

৭। বিপন স্ট্রীটেব জনৈকা ভাবতীয় খৃষ্টান। শস্তা ফাঁকাবাড়ির একটি ঘব, কাঠেব পার্টিশন কবা। আদি নিবাস কোথায উত্তব পাওযা যায় নি। বয়েস ২৫ বছর। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন, কারিগবি বা বৃত্তিশিক্ষা কিছু নেই। অবিবাহিত। পিতা মৃত, নামধাম পাওযা যায নি। আর্থিক অবস্থা দবিদ্র। পতিতাবৃত্তিতে ৩ বছব নিযুক্ত। পতিতাবৃত্তি বংশানুক্রমিক নয। ঘণ্টা পিছু ৫ টাকা হাবে মাসিক বোজগাব ২০০ টাকা। ঘবভাড়া দিতে হয না। বোজগাবেব এক তৃতীয়াংশ বাড়িউলিকে দেয। দালালি ও অন্যান্য খবচ বিষয়ে উত্তব পাওয়া যায নি। এ বৃত্তি নির্ধারণেব কারণ দাবিদ্র্য। কাবো মাধ্যমে নয, সবাসবি এ ব্যবসাযে এসেছেন ব'লে উক্ত। গার্হস্থ্য জীবনে ফিবে যেতে চান না। সাক্ষাৎকাবীব ধারণা : বুদ্ধিবৃত্তি মোটামুটি। আত্মগ্লানি আছে। পবিবর্তন যোগ্য কিনা মতামত দেয়া কঠিন। বিশেষ ঘটনা . বাবা মাতাল, শৈশবে মাতৃহাবা।

———

স্বপ্নপুঞ্জ আমার

সুমিত চক্রবর্তী

অযুত স্বপ্নপুঞ্জ আমাব বাখব কোথায় ?

বুকেব দখল নিযেছে নিটোল চোখেব ছাযা
বোধেব প্রান্ত কেড়েছে দেশজ বন্ধ্যা মাটি
কণ্ঠে নেমেছে বিস্তাব লোভী আগ্নেয ক্রোধ।

(অথচ এখনও ধানেব চাবায আকাশ কাঁদে।)

অযুত স্বপ্নপুঞ্জ আমাব বাখব কোথায ?

অনিশ্চিতিব নিগড়াবদ্ধ আসন্ন দিন
প্রশ্নচিহ্ন ঘাড়ে ফেলে ধবে ঘড়িব কাঁটা—

গোধূলি বেলাব বিপন্নতায বাক্‌বোধী বাত
প্রহবচ্যুত।

অযুত স্বপ্নপুঞ্জ আমাব বাখব কোথায ?

স্থানাভাবে তাই একক মুষ্টিমুক্ত স্বপ্নপুঞ্জ আমাব
সহস্রাবিক হাতেব মুঠায
ছড়িযে দিলাম।

দুটি কবিতা

স্থপতি

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

প্রমত্ত নদীর পাড়ভাঙার কথা মনে পড়ে :
সবাই এক হয়ে যদি রুখে দাঁড়ায়,
কোমর বাঁধে—
উপনিবেশ গড়তে কতক্ষণ।
জাঁহাবাজ শয়তানদের কথা মনে পড়ে :
তাদের ভালোমানুষি—
অতর্কিত থাবায়
লক্ষ স্বপ্নের শহর জখম করে।
কোটি প্রাণ নিরাশ হয়ে ভেঙে পড়ে।
কী-আশ্বাস তবু বুক বাঁধে
তন্ময় স্থপতি যদি
মগ্ন হয় অমল নির্মাণে।

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী মা !

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী, মা !
কে আমার ক্ষুৎকাতর মুখে
ভাবি বরফখণ্ড চেপে ধরেছে।
ঘোর-লাগা চোখে
শাদা মেঘের রুটির পাহাড়—
দেখতে-দেখতে মিলিয়ে গেল
নীল আকাশের জঠরে।
শ্বেত পারাবতের সারি
খুদকুঁড়োর স্বপ্নে
গিরিচূড়ায় হিম হয়ে গেল।
অম্বরচুম্বিতভালহিমাচল
শুভ্রতুষারকিরীটিনী।
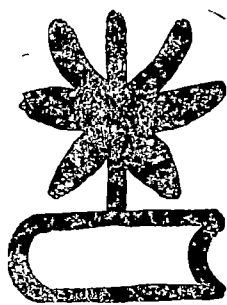
পুস্তক পরিচয়

'মরা গাঙে বান' পর্ব

The Extremist Challenge. Amales Tripathi. Orient Longmans, Rs. 18·00.

কবি যাকে 'মরা গাঙে বান' আসার সঙ্গে তুলনা করেছেন, সেই স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমি এবং তার বিশ্লেষণ ড. ত্রিপাঠীর প্রধান আলোচ্য বিষয়। ইতিপূর্বে জাতীয় আন্দোলনের এই স্মরণীয় পর্বের আলোচনা করেছেন রজনীপাম দত্ত। ধর্ম ও সামাজিক রক্ষণশীলতাকে ভিত্তি ক'রে চরমপন্থীরা যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তার কঠোর সমালোচনা সর্বপ্রথম তিনি করেছিলেন। সম্প্রতি প্রকাশিত রুশ লেখক-দের প্রবন্ধ-সংকলনে তিলকের ভূমিকা প্রগতিশীল আখ্যা পেয়েছে। ত্রিপাঠী নতুন উপাদানের সাহায্যে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর আলোচনায় এই পর্বের ভাবাদর্শগত পটভূমি, অর্থনৈতিক পটভূমি, মুসলিম রাজনীতির বিকাশ, সন্ত্রাসবাদ, সরকারি নীতি স্থান পেয়েছে। ইতিপূর্বে আর কোনো ভারতীয় লেখক এত বিপুল প্রামাণিক তথ্যের উপর ভিত্তি ক'রে এই পর্বের এত ব্যাপক আলোচনা করেন নি। অর্থনৈতিক ইতিহাসে ত্রিপাঠীর দখল আছে; তাঁর লেখায় তাই রাজনৈতিক ইতিহাস অনেক স্পষ্ট ও বোধগম্য। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির নামে শুধু পর্বতপ্রমাণ তথ্যের উদ্ধৃতি সাজিয়ে কোন কোন মহলে ইতিহাস লেখার যে চেষ্টা চলেছে তা সত্যি পণ্ডশ্রম মনে হয়। ত্রিপাঠীর লেখার বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর একটা বক্তব্য আছে, এবং তথ্যের সাহায্যে এই বক্তব্য প্রমাণ করার চেষ্টা তাঁর লেখায় বার বার চোখে পড়ে।

বিভিন্ন ভাবধাবার ঘাত-প্রতিঘাতে ভারতবাসীব মন যখন চঞ্চল, পবাধীন জীবনের অভিশাপের বিরুদ্ধে যখন সচেতন হয়ে উঠেছে শিক্ষিত মন সেই পর্ব থেকে ত্রিপাঠীর আলোচনাব শুরু। এই পর্বের নায়ক বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ। অনেক দেশী ও বিদেশী লেখক বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের ভাবধাবাকে ধর্মীয় জাতীযতাবাদ ব'লে যে মত প্রকাশ কবেছেন ত্রিপাঠী তাব বিবোধী। বঙ্কিম যুক্তিবাদী, তাঁব সাহিত্য উন্নত চিন্তা-ধাবা ও সমাজ সচেতনতার বাহন। গ্রাম-বাঙলার সমাজজীবন এবং কৃষকেব দুঃখময় জীবন ও দাবিদ্র্য তাঁব লেখায় প্রতিভাত। বঙ্কিম যে মুসলমানেব নিন্দা কবেছেন তাঁবা আওবঙ্গজেব ও কতলু খানেব মতো লোক, আকবব বা হুসেন শাহ নন। আবার তাঁব লেখায় ক্ষযিষ্ণু হিন্দু কিংবা লক্ষ্মণ সেনেব দববাবের অধঃপতনও চোখে পডে। তাঁর লেখা চরম-পন্থীদেব সাম্প্রদাযিকতা-ঘেঁষা মতবাদেব উৎস—অধ্যাপক ক্লার্কের এই উক্তি অসত্য। তেমনি বিবেকানন্দেব মধ্যে শুধু হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা সবচেয়ে বড জিনিশ নয়, এই সুপ্রাচীন দেশেব অপরাজেয় সত্তাব মহিমা প্রচাব, মানবসেবা, সমাজের নীচেব তলাব মানুষ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ, স্বদেশেব প্রতি ভালোবাসা ("ভাবতেব মৃত্তিকা আমাব স্বর্গ") বিবেকানন্দেব ভাবধারাব অঙ্গ। এই ভাবেই সেদিন মবা গাঙে বান এসেছিল। আসন্ন বিপ্লবেব পূর্বাভাস চিন্তাব জগতে গভীব পরিবর্তনেব স্রোত। স্বদেশী যুগেব আলোডনেব ভাবাদর্শগত পটভূমি সৃষ্টি কবেছিল বঙ্কিম-বিবেকানন্দের ভাবধাবা। বিবেকানন্দেব শিক্ষা যে অববিন্দ, সুভাষচন্দ্র থেকে শুরু ক'রে অসংখ্য দেশপ্রেমিককে উদ্বুদ্ধ কবেছিল তা কিছু দৈবাৎ ঘটনা নয়।

ইতিহাসেব ছাত্রদেব কাছে নবমপন্থী ও চরমপন্থীদেব ভূমিকাব মূল্যায়ন এক জটিল সমস্যা। রুশ লেখকবা এক সহজ সমাধান হাজিব কবে-ছেন. নরমপন্থীরা প্রধানত প্রতিনিধিত্ব করতেন বুর্জোযা শ্রেণীর সেই অংশেব যাবা ব্রিটিশ মূলধন এবং সামন্ততন্ত্রী জমিদাবদেব সঙ্গে যুক্ত, অপবদিকে চবমপন্থীরা প্রধানত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর প্রতিনিধি, যে বুদ্ধি-জীবী অনুপ্রেবণা লাভ কবেছিলেন সমসাময়িক কৃষক বিদ্রোহ ও শ্রমিক ধর্মঘট থেকে। কিন্তু তথ্য দিযে এই মত প্রমাণ করা কঠিন। অর্থনৈতিক

চিন্তার ক্ষেত্রে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের সঙ্গে কোন তফাৎ ছিল না। দিল্লীর অধ্যাপক বিপন চন্দ্র ইতিপূর্বে এ বিষয়ে লিখেছেন, ত্রিপাঠীও একই মত প্রকাশ করেছেন। বাঙলার চরমপন্থীদের সমর্থক ছিলেন মহারাজা শশীকান্ত আচার্য ও ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মতো বড় জমিদার। পাশ্চাত্য ভাবধারার সমর্থক নরমপন্থীরাই ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে ছিলেন; সদ্যপ্রকাশিত গোখেলের রচনাবলীতে এ বিষয়ে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। গোখেল, সুরেন্দ্রনাথ ও রমেশচন্দ্র দত্ত কি বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর প্রতিনিধি নন? সংগ্রামী রণকৌশলের প্রবক্তা হলেও চরমপন্থীরা স্বদেশী আন্দোলনকে কৃষকের খাজনা বন্ধ আন্দোলনের মধ্যে প্রসারিত করবার কোন চেষ্টা করেন নি; কোন শ্রমিক সংগঠন তাঁরা গড়ে তোলেন নি। স্বদেশী আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। আসলে কী চরমপন্থী, কী নরমপন্থী—উভয়ের চিন্তাধারা ও কাজের মধ্যে স্ববিরোধ ছিল। সম্ভবত দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের সেই স্তরে এই স্ববিরোধ অনিবার্য ছিল।

চরমপন্থীরা চিন্তায় ও কাজে সব সময় ঐক্যবদ্ধ ছিলেন মনে করলে ভুল হবে। ত্রিপাঠী অনেক তথ্য দিয়ে বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। বিপিন পাল অরবিন্দের বিপ্লবী কার্যকলাপ আদৌ সমর্থন করেন নি। 'লাল-বাল-পালের' মধ্যে লাজপৎ সবচেয়ে বেশি প্রজ্ঞা ও নমনীয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন; জাতীয় আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে তাঁর আগ্রহ ও চেষ্টা স্মরণীয়। সত্যি লাজপৎ-এর ভূমিকা ভালো করে বোঝা দরকার, আর এ বিষয়ে অনেক তথ্য (যার কিছু অংশ ত্রিপাঠী ব্যবহার করেছেন) পাওয়া যাবে ভি. সি. যোশী সম্পাদিত লাজপৎ রায়ের রচনাবলী ও বক্তৃতামালা থেকে। লাজপৎ-এর মতো আর একজন জাতীয় ঐক্যের অসীম গুরুত্ব বুঝেছিলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। সুরাট ভাঙনের তীব্র নিন্দা করে কবি বলেছিলেন: 'দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে যোগ দিয়া দেশের প্রাণকে দেশের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতেন তাহা হইলে কংগ্রেস-সভার মঞ্চ জিতিয়া লইবার চেষ্টায় (ইহারা) এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন না, কংগ্রেসে হার হইলেও দেশের মধ্যে হার হয় না।' অবশ্য রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি পেশাদার রাজনীতিকদের ভালো লাগবে না;

মঞ্চদখল বাজনীতিব অঙ্গ। সুবাট ত্রিপুবীব সূচনা।

স্বদেশী আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ঝিমিযে পডল কেন? ত্রিপাঠীব মতে আন্দোলনেব ব্যর্থতা অস্বাভাবিক নয। চবমপন্থীবা শ্রমিক ও গবিব কৃষকদেব উৎসাহিত কবতে পাবেন নি। ছাত্রেব কল্পনাবিলাস এবং হিন্দু ধর্মেব জাদু ছিল তিলক ও অববিন্দেব প্রধান ভবসা। নেতাদেব হিন্দুযানিব ফলে দেশ ঐক্যবদ্ধ হতে পাবে নি, মুসলমান সমাজ থেকে তাঁবা বিচ্ছিন্ন হযে পডেন। শাসক শ্রেণী তাব সুযোগ নিতে ছাডে নি। এই কাবণগুলি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। তবু মনে হয আব একটা কাবণ যোগ কবতে হয: সুবাটে কংগ্রেসেব ভাঙন। এই ভাঙনেব ফলে স্বদেশী যুগেব প্রথম প্রদীপ্ত অনুপ্রেবণা ব্যাহত হযেছিল, যে আন্দোলন ছিল ঐক্যবদ্ধ তাতে ফাটল ধবল। বিভক্ত জাতীয আন্দোলনকে দমন কবা অপেক্ষাকৃত সহজ।

স্বদেশী যুগেব আব একটি সম্ভাবনা বাস্তবে পবিণত হয নি। যেসব স্বদেশী শিল্প, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানি স্বদেশী মূলধনে গডে উঠেছিল, শেষ পর্যন্ত সেগুলিব বেশিব ভাগ ফেল পডে; দেশকে শিল্পাযনেব পথে এগিযে নিযে যাবাব প্রচেষ্টা সার্থক হয নি। কযেক বছব আগে বর্তমান লেখককে এই বিষযে আলোচনা কবতে হযেছিল ('বিপিন পাল শতবার্ষিকী স্মাবকগ্রন্থে' লেখকেব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য); ত্রিপাঠী প্রায একই তথ্য ব্যবহাব কবেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল: শিল্পাযনেব এই প্রচেষ্টা কেন ব্যর্থ হল? মূলধনেব অপ্রাচুর্য কি এব কাবণ? সবকাবি নীতি কি শিল্পায়নেব পথে একমাত্র বাধা ছিল? দ্রুত শিল্পাযনে বুর্জোযা শ্রেণীব অনীহাব কাবণ খুঁজে বেব কবা দবকাব।

সম্পূর্ণ প্রামাণিক তথ্যেব উপব ভিত্তি কবে ত্রিপাঠী মর্লি-মিণ্টো সংস্কাবেব ধাবাবাহিক ইতিহাস লিখেছেন। মিণ্টো ও মর্লি শেষ পর্যন্ত আগা খাঁ ও আমীব আলিব চাপেব সামনে পিছু হটেন; পৃথক নির্বাচনেব দাবি স্বীকৃত হয। যে সংস্কাবেব মূল উদ্দেশ্য ছিল নবমপন্থীদেব দলে টানা, শেষ পর্যন্ত তা কোন নবমপন্থী নেতাকেই সন্তুষ্ট কবতে পাবল না। দেশেব মধ্যে নবমপন্থীবা দুর্বল হযে পডলেন, শক্তি সঞ্চয কবতে লাগলেন চবমপন্থী ও সন্ত্রাসবাদী। ত্রিপাঠীব মতে শাসক শ্রেণী সেদিন

এক অপূর্ব সুযোগ হাবাল। জাতীয আন্দোলন গান্ধী-পর্বে যে নতুন রূপ নিল, তাব ফলে ক্ষমতাব হস্তান্তব স্বভাবতই হল 'সর্বাত্মক ও বেদনা-দাযক'। ঠিক বোঝা গেল না ক্ষমতাব হস্তান্তবকে 'বেদনাদাযক' বলা হল কেন? কাব কাছে 'বেদনাদাযক'?

সুনীল সেন

ভারতীয় লেখক পরিচিতি

Raja Rammohun Roy: Saumyendranath Tagore. *Ilango Adigal* M. Varadrajan. *Lakshminath Bezbaroa* Hem Barua. *Keshavsut:* Prabhakar Machwe. Sahitya Akademi, New Delhi.

যাঁদেব বচনা ও চিন্তা বিভিন্ন ভাবতীয় ভাষাব সাহিত্যকে স্থাযীভাবে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ কবেছে, 'ভাবতীয সাহিত্যেব সৃষ্টিকর্তা' এই গ্রন্থমালায এক-একটি ছোটো-ছোটো মনোগ্রাফেব মাধ্যমে তাঁদেব জীবনী ও সাহিত্যকর্মেব পবিচয দেবাব চেষ্টা কবাই সাহিত্য অকাদেমীব এই নতুন পবিকল্পনাব উদ্দেশ্য। বলাই বাহুল্য, এত স্বল্প পবিসবে আলোচ্য লেখকদেব কোনো পূর্ণাঙ্গ বা বিস্তাবিত পবিচয প্রকাশ কবা সম্ভব নয— সে-চেষ্টাও কোনো বইতেই কবা হয় নি। লক্ষ বাখা হযেছে যাতে কোনো বিতর্ক উত্থাপিত না-ক'বে অত্যন্ত সহজে বিভিন্ন ভাষাব মনীষীদেব সংক্ষিপ্ত পবিচয তুলে ধবা যায। ভাবতেব ভিন্ন-ভিন্ন অঞ্চলেব ভিন্ন-ভিন্ন ভাষাব মানুষ যাতে প্রতিবেশী সাহিত্য সম্বন্ধে একেবাবেই অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ না থাকেন, যাতে প্রতিবেশী সাহিত্য ও সাহিত্যিকদেব খানিকটা হদিশ পান, সেইজন্যেই এই বইগুলিব অবতাবণা। ভাবতীয সাহিত্য ও সংস্কৃতি বস্তুত বহুবিধ উপাদান ও চিন্তাব যোগফল— বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যেব মধ্যে প্রচুব পার্থক্য ও নানা বৈচিত্র্য সত্ত্বেও মৌল কতগুলি সূত্রে ভাবতচিন্তাব অখণ্ডতা লক্ষ কবা যায হযতো। সেদিক থেকে এই গ্রন্থমালা ভাবতীয সংহতিব সহাযক হবে।

বইগুলি এমনিতে সুলিখিত, কিন্তু কিছুটা হযতো যান্ত্রিক। সাহিত্যেব অলোচনায শেষ পর্যন্ত বোধহয উদ্দীপক ও স্পর্শাতুব অন্তবাখ্যানই আমাদেব কৌতূহল জাগিযে তোলে, ও উৎসুক কবে। কিন্তু প্রতিটি বইই কেবল ঘটনা ও গ্রন্থাবলিব তালিকায পর্যবসিত হযেছে। ভবদবাজন অবশ্য তাঁব বইতে প্রথম তামিল মহাকাব্যেব কাহিনীব চুম্বক দিযেছেন, আব হেম বড়ুযা লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুযাব কোনো কবিতাব টুকবো অনুবাদ কবে তুলে দিযেছেন, এমনকি প্রভাকব মাচোযে কেশবসুতেব বেশ কতগুলি কবিতাই তবজমা ক'বে দিযেছেন— তবু আলোচ্য লেখকদেব বচনা সম্বন্ধে কেবল কতগুলো মন্তব্য ছাডা বচনাব প্রত্যক্ষ নজিব বিশেষ নেই। 'প্রথম যাঁবা এই লেখকদেব সম্মুখীন হবেন, তাঁদেব পক্ষে সেইজন্যই গ্রন্থকাবদেব মন্তব্যই প্রায বেদবাক্য বলে বোধ হবে।

প্রতিটি বইযেব শেষেই ছোটো গ্রন্থপঞ্জি দেযা হযেছে, যাতে কৌতূহলী পাঠক তাঁব পববর্তী অধ্যযন চালাতে পাবেন। এই গ্রন্থপঞ্জি মোটেই পূর্ণাঙ্গ নয়—বইগুলোয যেহেতু লেখকদেব সম্বন্ধে কোনো বিস্তৃত আলোচনাব অবকাশ নেই, সেইজন্য এই গ্রন্থপঞ্জি বিশদ বা পূর্ণাঙ্গ হ'লে ভালো হ'তো—এবং কোন বইযেব মধ্যে কী আছে, বা কোন দিক থেকে আলোচনা কবা হয়েছে, তাব উল্লেখ থাকাও বাঞ্ছনীয ছিলো।

সাম্প্রতিক ভাষাবিতর্কেব পবিপ্রেক্ষিতে এই ইংবেজি বইগুলো আবেকদিক থেকেও উল্লেখযোগ্য। কাবু পক্ষেই হযতো সবগুলি ভাবতীয ভাষা ও সাহিত্যে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন সম্ভব নয— সেক্ষেত্রে এই ইংবেজি আলোচনাগুলো দ্বাবাই ভাবতেব সব ভাষাব লোকেব পক্ষে প্রতিবেশী সাহিত্য সম্বন্ধে উৎসাহ পোষণ ও কৌতূহল চবিতার্থ কবা সম্ভব হবে। এই মনোগ্রাফগুলো হিন্দিতে বেরুলে তা নিশ্চয়ই কিছুতেই সম্ভব হ'তো না।

লোকেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

চলচ্চিত্র : দেশে বিদেশে

চলচিত্র : স্মরণীয় স্রষ্টা। প্রভাতকুমার দত্ত। মণ্ডল বুক হাউস। দাম ৩'০০ টাকা।

বেশ কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে, শিল্পসাহিত্যের কারবারি বাঙলাদেশের সর্বস্তরের পত্রপত্রিকাতেই চলচ্চিত্র তার জায়গা করে নিয়েছে। রীতিমতো জাঁকিয়েই বসেছে। এবং তাতে কোনো মহল থেকেই কোনো আপত্তি উঠছে না। অর্থাৎ সভ্যসমাজের দরবারে চলচ্চিত্রকে একটি পরিপূর্ণ এবং স্বাধীন শিল্পমাধ্যম হিশেবে স্বীকৃতি দিতে এখানে কারুরই কোনো আপত্তি নেই বোঝা যাচ্ছে। আরো বোঝা যায় যখন দেখি চলচ্চিত্রের অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার নেই এমন এক শিক্ষিত শিক্ষক নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের ওপর নিজেরই একাধিক লেখা জড়ো করে বইয়ের আকারে তা প্রকাশ করবার সাহস পান। এ হেন সাহস বড়ো কম কথা নয়।

ছোট্টো বই। ছবির রাজ্যে নিত্য নতুন যে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে এসেছে, ঘটে চলেছে, তার গোটা চেহারাটাকে ধরবার পক্ষে একেবারেই যথেষ্ট নয়, তেমন করে ধরবার চেষ্টা করেছেন এমন কথাও লেখক কোথাও বড়ো গলায় বলেন নি। তবে যে বারোজন কীর্তিমান শিল্পীর কথা লেখক এই বইতে বলেছেন, যে-ভাবে চিত্রিত করেছেন এই বারোজনকে তার মধ্য দিয়ে লেখকের মানসিক গড়নের একটা পরিষ্কার আন্দাজ পাওয়া যায়। এবং তারই সঙ্গে পাওয়া যায় চলচ্চিত্র জগতের আত্মিক বিবর্তনের একটা মোটামুটি ধারণা, একটা আধা-স্পষ্ট কাঠামো।

বইয়ের বেশ কিছু অংশ বাঙলাদেশের এক বিশিষ্ট সাপ্তাহিকে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে বলেই হয়তো সামগ্রিকভাবে ধারাবাহিকতার কিছুটা অভাব থেকে গেছে। তবু বলবো, বারোজন শিল্পীর প্রত্যেককেই ধরা হয়েছে তাঁদের নিজস্ব সামাজিক পরিবেশের একেবারে মাঝখানে যেখানে শিল্পী হিশেবেই প্রতি মুহূর্তে তাঁদের দাঁড়াতে হয়েছে সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক নানা সমস্যার মুখোমুখি, শিল্পজাত নানা প্রশ্নের তাড়নায় আরো সক্রিয় হয়ে উঠতে হয়েছে যেখানে। বক্তব্য ও তার প্রকাশভঙ্গি— দুই স্তরেই শিল্পীর এই অবিরাম লড়াইয়ের কথা লেখকের প্রতিটি প্রবন্ধেই অল্পবিস্তর

বলা হয়েছে। আলোচ্য বই সম্পর্কে এইটিই বড়ো কথা।

বইয়েব শুরু আমেবিকাব মাটিতে যেখানে পঞ্চাশ বছবেবও আগে প্রচুব দর্শকেব বিবক্তিভাজন হয়েও ভবিষ্যৎ চলচ্চিত্রেব পথ বিস্তৃত কবে দিয়ে গেছেন ডেভিড ওযার্ক গ্রিফিথ। বইয়েব শেষ ভাবতবর্ষে, সত্যজিৎ বাযেব আকস্মিক আবির্ভাবেব মধ্য দিয়ে। মাঝখানে বয়েছেন চ্যাপলিন, আইজেনস্তাইন, পুদভকিন, মুবনাউ, ফ্লাহার্তি এবং যুদ্ধোত্তব যুগেব অসামান্য শক্তিধব কয়েকজন। সর্বত্র তথ্য সংগ্রহ একেবাবে নির্ভুল হয়েছে এমন কথা হলফ কবে বলা কঠিন। নানা বিষয়ে লেখকেব ব্যাখ্যা পুবোপুবি গ্রহণ কবতে পাবছি তাও নয়। এমনকি, কখনো কখনো বা অত্যন্ত সঙ্গত কাবণেই কোনো এক শিল্পীকে ঘিবে বিশেষ কোনো ধাবাব উচ্চ প্রশংসায় মুখর হতে গিয়ে পববর্তী যুগেব নতুন কোনো উন্নত আন্দোলনকে কিঞ্চিৎ ছোটো নজবেও দেখেছেন লেখক। সেই সমস্ত নিয়ে— এবং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রেব আবো কিছু প্রয়োজনীয় নামেব এবং তাঁদেব ক্রিযাকাণ্ডেব অনুপস্থিতিব দরুণ— পাঠক অবশ্যই তর্ক তুলতে পাবেন। এবং যেহেতু শিল্পসম্মত তর্ক সর্বদাই নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যকব, তাই এই বইটি যদি কোনো সচেতন পাঠককে তর্কেব আসবে টেনে আনতে সক্ষম হয় তো বলবো লেখকেব প্রচেষ্টা বীতিমতো সার্থক।

লেখকেব চিন্তায গাম্ভীর্য অর্থবহ, বিশ্লেষণে চেতনা সুস্পষ্ট। এই সম্পদেব অধিকাবী বলেই লেখককে অনুবোধ কববো, পববর্তী সংস্কবণে তিনি যেন বিস্তৃততব আলোচনায প্রবৃত্ত হন, যেন আজকেব এই ফাঁকগুলো ভবাট কবে দিতে প্রযাসী হন, চলচ্চিত্রশিল্পেব শুরু থেকে আজ পর্যন্ত নিত্য নতুন সংকট ও সম্ভাবনাগুলো এবং তাব উত্তবোত্তব সমৃদ্ধিকে যেন আবো স্পষ্ট কবে, আবো জোবালো কবে, গভীবতব প্রত্যযেব সঙ্গে এবং যথাযথ পাবম্পর্য বক্ষা কবে পাঠকসমাজে উপস্থাপিত কবতে নিজেকে নিয়োজিত কবেন। এইটুকু বইতেই লেখকেব ক্ষমতাব ও নিষ্ঠাব পবিচয পেয়েছি, বৃহত্তব ও বিদগ্ধ পাঠকসমাজে সেই গুণেব স্বীকৃতিব প্রযোজন বিশেষভাবে অনুভব কবি।

ছোট্টো একথা কথা। প্রাযই লেখক চলচ্চিত্রকে অথবা চলতি কথায ছবিকে 'বই' বলে অভিহিত কবেছেন। বাঙলাদেশে কথাটা খুবই চালু সন্দেহ নেই, কিন্তু বাঞ্ছনীয নয। ছবি ছবিই, বই নয।

মৃণাল সেন

মানব মনের নাটক

সম্রাট ও অপারেশন কাউন্টাস ।। ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ।। অধুনা ।। দাম ৪·০০ টাকা

জাতি-ব্যক্তি নব-নাবী নির্বিশেষে সমানাধিকাবেব ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠা পৃথিবীব অধুনাতম দাবি। শোষণহীন সমানাধিকাবভিত্তিক সমাজে আন্তর্জাতিক, শ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত ঈর্ষ্যা-দ্বন্দ্ব কলহেব হবে পরিসমাপ্তি। প্রচ্ছন্ন ভাববাদ যে পুবনো সমাজব্যবস্থাকে মোহাচ্ছন্ন ক'বে বেখেছে বস্তুতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞান তার অবসান ঘটাবেই। বিজ্ঞান ও টেক্‌নোলজিক উন্নতি আব যুক্তি-বুদ্ধি চেষ্টাব হাতিযাব ব্যবহাব ক'বে সৌভ্রাত্র ও মানবিকতাব ঘটবে পূর্ণ বিকাশ। 'সম্রাট' নাটকে ডা. গঙ্গোপাধ্যায সুসাহিত্যিক কৃতিত্বেব সঙ্গে সুদৃঢ় সাহসিকতায় তা দেখাতে সফল হযেছেন।

এ নাটকের নাযক 'সুবেশ্বব চৌধুবী' একজন শিল্পপতি। ডালমিযা-মুনধ্রা-বিড়লাব মানসিকতাব যেন একটি নির্যাস। ভাবতবর্ষেব পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনাব সুযোগে একচ্ছত্র পুঁজিবাদেব "সাম্রাজ্য" স্থাপন কববাব জন্যে সুবেশ্বব চৌধুবীব অবলম্বিত হীন পন্থা শেষ পর্যন্ত সাফল্য লাভ কববে না, কাবণ আধুনিকতম বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধাবাব প্রতীক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী অধ্যাপক "সদানন্দে"ব তরুণ সমাজেব উপব প্রভাব। তাই শেষ পর্যন্ত ফ্রয়েডেব তথাকথিত মনোবিজ্ঞানেব প্রভাবমুক্ত হতে হয়েছে মনস্তত্ত্ব পণ্ডিত "শিবশঙ্কব"কে। নির্জ্ঞান মনস্তত্ত্ববাদ, সহজাত প্রবৃত্তিব জৈবশক্তি ও দৈবশক্তিব চেযে যে ঢেব বেশি জোবালো জন-মানসেব শক্তি, শেষ পর্যন্ত সেকথা বুঝতেই হবে। শিবশঙ্কবেব কন্যা সীমা জন্মগত সংস্কাবকে ছাপিযে, পিতৃদত্ত শিক্ষা-দীক্ষাব আববণ ভেদ কবে শেষ পর্যন্ত জন-মানস শক্তি সৃষ্টির মহান্ আবর্তে মিশে যাবেই। আব অধ্যাপক সদানন্দেব কাছে শিবশঙ্কবেব ইডিওলজিক্যাল পবাজয়েব মূলে যে কন্যাব প্রতি বাৎসল্যেব স্নেহবস সিঞ্চন অনেকখানি কাজ কবেছে সেকথা বুঝতে পাঠকেব মনে পুলক শিহবণ জাগে বৈ কি। ঝানুমল, স্যব সূর্যনাবাযণ, পার্লামেন্টেব সদস্য সব্যসাচী শিকদাব, আধুনিক ঘটক বজ্রেশ্বব বাগচি, কবি, বিপোর্টাব প্রভৃতি সার্থক চবিত্রগুলি নাটকটিব সুপবিণতি সার্থক কবেছে। ডা. গঙ্গোপাধ্যায কবিসুলভ প্রাঞ্জল ভাষায অত্যন্ত মুনশিযানাব সঙ্গে নাটকখানি লিখেছেন। "সম্রাট" হবাব উচ্চাকাঙ্ক্ষায সুবেশ্বব নিজেব একমাত্র সন্তানকেও হত্যা কবতে কুণ্ঠিত নয়।

রোমাঞ্চ উপন্যাসের মত বইখানি শেষ পর্যন্ত পাঠকের মন ধরে রাখে। মাত্র দুটি প্রধান স্ত্রী-চরিত্র থাকায় বইখানি শখের নাট্যসংস্থায় সহজেই অভিনীত হতে পারে। মঞ্চসজ্জার প্রয়োজনও বেশি নয়।

'অপারেশন ফাউস্টাস' আজকের মানবসভ্যতার অদূর ভবিষ্যতের সমস্যার উপর লিখিত নাটক। হিরোশিমা-নাগাসাকির উপর নিক্ষিপ্ত আণবিক বোমার ধ্বংসলীলার যুগ থেকে পৃথিবী অনেক দূর এগিয়েছে। কিন্তু একচ্ছত্র পুঁজিপতি সাম্রাজ্যবাদীদের করায়ত্ত আজও অনেক প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক। স্থাবর জঙ্গম কোনও সম্পত্তি নষ্ট না ক'রে সাম্রাজ্যবাদীগণ উদ্যোগ-আয়োজন করছে কী ক'রে রাসায়নিক ও রোগজীবাণু যুদ্ধাস্ত্রের সাহায্যে শত্রুর দেশের জীব মাত্রকেই ধ্বংস করবে। তাদের রসায়নাগারের বৈজ্ঞানিকেরা অভিনব "যুদ্ধাস্ত্র" উদ্ভাবনের গবেষণায় আজ লিপ্ত। ভিয়েতনামের যুদ্ধে মার্কিন-আক্রমণকারী কর্তৃক আগুনে ঝলসানো নাপাম বোমা ও বিষ-বাষ্প ব্যবহারের কথা আজ আর কারো অবিদিত নেই। কিন্তু সাম্রাজ্য-বাদীগণ যে অত্যন্ত শস্তায় দেশ জুড়ে জীবমাত্রকেই ধ্বংস করবার কৌশল আবিষ্কারের চেষ্টা করছে আজ, সে কথা হয়তো অনেকেই জানেন না।

অপারেশন ফাউস্টাস নাটকের নায়ক জীববিজ্ঞানী জেম্‌স্‌ ব্যারী-আবিষ্কৃত র‍্যাবিস ওয়েপন—এই রকম এক কাল্পনিক অস্ত্র। অস্ত্রটির পরীক্ষার ফল জানবার পর থেকেই তার ঘুম হচ্ছে না, চোখ বুজলেই নানা দুঃস্বপ্ন দেখছে। চিকিৎসার জন্যে মনোরোগ চিকিৎসক তার বন্ধু ডা· কিউলের ক্লিনিকে তাকে রাখা হয়েছে। কিন্তু তার রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের সন্দেহ যে, সে স্নায়ুবিকারের ভান করছে এবং হয়তো বিদেশী গুপ্তচরদের কাছে এই মহাস্ত্রের গোপন তথ্য সরবরাহ করেছে। তাই জেনারেল উইল্‌সের নির্দেশে ডা· কিউল বৈজ্ঞানিক ব্যারীর মনের গোপন খবর জানবার জন্যে বিশেষ আধুনিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। তারই ফলাফল এই নাটকে।

ব্যারীর চিন্তার মাধ্যমে যারা রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হচ্ছে, তারা হল যথাক্রমে এইচ· জি· ওয়েলস, ব্যারীর বন্ধু আত্মহত্যায় মৃত উইলিয়াম অ্যাস্‌লে (বিল), এব্রাহাম লিনকন, নরম্যান মরিসন, এ্যালবার্ট আইনস্টাইন, ক্লাউস ফুক্‌স্‌। এরা কেউই জীবন্ত চরিত্র নয়। কাজেই এদের অপার্থিব চরিত্র রূপদানে বিশেষ মঞ্চকৌশলের প্রয়োজন। আলোকসম্পাত ও

বেশভূষার দ্বারা বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে হবে। তাছাড়া ব্যারীর মনোপটে তার প্রণয়িনীর ও জেনারেলের উপস্থিতিও সুকৌশলে দর্শকদের কাছে ফোটাতে হবে। বস্তুত ডা· গঙ্গোপাধ্যায়ের এ-নাটকটি একটি নতুন পর্যায়ে পড়ে। বিজ্ঞান-দর্শনের ও ধর্মীয় দর্শনের চিন্তা, যা আজকের দিনের প্রত্যেক উচ্চশিক্ষিত মানুষের মনে নানা প্রশ্ন জাগিয়েছে, নাটকটি তাই আশ্রয় করে পরিণত হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য এ-নাটক সার্থকভাবে মঞ্চস্থ করতে বেশ পারদর্শী পরিচালকের প্রয়োজন।

যাঁরা পৃথিবীতে সমানাধিকারের ভিত্তিতে সমাজ-প্রতিষ্ঠার মহান যজ্ঞে আজ নিজেদের নিযুক্ত করেছেন, তাঁদের সকলের কাছেই ডা ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাটকগুলি নিশ্চয়ই আদর পাবে।

কপিল ভট্টাচার্য

পুরনো যুগের কবিতা

আকাশ-প্রদীপ। সুখরঞ্জন রায়। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স (প্রা) লি. কলকাতা। দাম ৩·০০ টাকা।

সুখরঞ্জন রায়ের (১৮৮৯-১৯৬৪) নাম আধুনিক কাব্যপাঠকের কাছে অপরিচিত। কিন্তু সাহিত্য-সমালোচক বা ঐতিহাসিকদের কাছে তাঁর যে বিশেষ গুরুত্ব আছে তার প্রমাণ 'আকাশ-প্রদীপে'র সঙ্গে মুদ্রিত স্বনামধন্য সমালোচকদের সশ্রদ্ধ মন্তব্যগুলি। কবিতার ধারা বদলায়, কবিদের জনপ্রিয়তারও উত্থানপতন হয়। এবং সব কবিই কালজয়ী হবেন এমন আশা বৃথা। 'আকাশ-প্রদীপ' কে যদি যুগের পটভূমিতে বিচার ক'রে পড়ি তাহলে কবির বৈশিষ্ট্য স্বীকার করতেই হয়। কবি স্বয়ং 'বেকন্‌স লাইট' নামে উক্ত কাব্যগ্রন্থটির ইংরেজি তর্জমা করেছিলেন।

'আকাশ-প্রদীপ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২১ সনে। এটি কবির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। পুরনো যুগের কাব্যের সঙ্গে নতুন দিনের পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য প্রকাশক আমাদের ধন্যবাদার্হ।

অশোক দাশগুপ্ত

অকৃত্রিম কবিস্বভাব

সাত মহাল। সুনীলচন্দ্র সবকাব। প্রকাশক পুলিনবিহারী সেন। দাম ৪.০০ টাকা।

শিল্পী পেশাদাব হওযা শিল্পেব পক্ষে ভালো। কিন্তু হীন অর্থে পেশাদাবি এখনও যে বাঙলা কবিতায আবম্ভ হয নি এই ঘটনা সুখেব। কবিতা লিখে এখনও যে জীবনে সফল হওযা যাচ্ছে না এই ব্যাপাব কবিদেব পক্ষে যতোই দুর্ভাগ্যেব হোক, বাঙলা কবিতাব পক্ষে অনেকটাই সৌভাগ্যেব। বাঙলায উপন্যাস লেখা যে অর্থে অর্থকবী কাণ্ড হযে দাঁডাচ্ছে, সেই অর্থে কবিতা আজও অর্থকবী নয বলে, এই ক্ষেত্রে আন্তবিকতাব অভাব এখনও দুর্লভ। অবশ্য আন্তবিকতাই যে শিল্পেব শেষ কথা নয, তা আলোচিত কবিতাব বইটি পডলেই বোঝা যায।

বেশ কয বছব আগে সুনীলচন্দ্র সবকাব 'মিলিতা' নামে একটি ক্ষীণ কলেবব কবিতাব বই নিযে আবির্ভূত হযেছিলেন। সেই সমযেব মুগ্ধতাব কথা এখনও মনে আছে। 'জামতলা' কবিতাটি তখন মুখে মুখে ফিবেছিল, এখন এটি বাঙলা কবিতায অ্যানথলজিব অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ হযে দাঁডিযেছে। তাবপব নানা জাযগায যদিও কখনও কখনও তাঁব কবিতা চোখে পডেছে, কিন্তু অনেকদিন তাঁব কোনও সংগ্রহ বেবোয নি। কবিতাপ্রেমিকেব পক্ষে সেটি ক্ষোভেব ব্যাপাব ছিল। এতদিনে 'সাতমহালে' অনেকগুলি কবিতা পেযে পাঠক অভাবনীয সৌভাগ্যে কৃতজ্ঞ বোধ কবে। 'সাতমহালেব' প্রথম মহালে দুর্লভ 'মিলিতা' পুনর্মুদ্রিত ক'বে প্রকাশক উচিত কাজ কবেছেন।

এই দ্রুতদেশে চলতে-চলতে
কিছু কি গুছিযে পাবব বলতে ?

এক বিনীত অকৃত্রিম কবিস্বভাবেব এই জিজ্ঞাসা এবং এই যেন ক্রেডো। বিশেষ ক'বে, প্রথম দিকেব অধিকাংশ কবিতায উক্তি ও উপলব্ধিব এমন একটা সবলতা আছে, যা এখনকাব বক্রোক্তিপ্রবণ কবিতাব যুগে বিবল স্বাদে মুগ্ধ কবে। এই পর্যাযে অপবিচিত শব্দ একটিও নেই, যদিও পববর্তী মহালগুলিতে সচবাচব ব্যবহাব হয না এমন শব্দ অনেক এসেছে ঘনতব উপলব্ধি প্রকাশেব অনিবার্যতায। কিন্তু এই আপতিক

সারল্য শেষ কথা নয়। 'শীত-দুপুরের দূর উড়ন্ত চিলের' মতো এই কবিতায় একদিকে 'চলছবি খামার পগার ঝিল'; অন্যদিকে 'রোদের দ্রাবণ, নীলিমার আহ্বান'।

কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো পূর্বনির্ধারিত থিয়োরির বশীভূত আড়ষ্টতা নেই, কবিতাগুলি আপাতত সরল, কিন্তু সুনীলচন্দ্র সরকারের কবিতাকে উচ্চতম মানে বিচার করা উচিত, কারণ তিনি সম্ভবত কবিতা নামক বাণীশিল্প দিয়ে কোনো সহজ লক্ষ্যবেধে রাজি নন।

আমার মধ্যে নামে যে প্রকাশ
ধ্যানের গুহায়, প্রাচীর চিত্রে
এবার তাদের বাঁধন পরাবো
শিল্পের বেদনার
এই, কিছু নয় আর।

অন্যত্র লিখেছেন, 'সহ্য করে অচিন্ত্যের মার/দিতে চাই প্রীতি-উপহার'। এবং 'শিল্পের আসল কাজ শিল্পকে ফিরানো/পৃথিবীর সত্যনিষ্ঠ হৃদয়ের কাছে।' 'আমার পক্ষে' নামক চমৎকার কবিতাটির আরম্ভ এই

আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়,
এখন আমার নতুন প্রয়াস নতুন প্রণয়।

শেষ এই .

হয়তো ঝড়ের একটুকু এ কোমল প্রভাব
দেবে আমায় সামর্থ্য সেই গভীর স্বভাব
সাগরে যা ওতপ্রোত স্পন্দিত হয়?
দেখি বুঝে। এখন আমার আর-কিছু নয়।

এই জাতীয় লক্ষ্য সামনে থাকলে কবিতা খানিকটা ডাইডাকটিক হয়ে যাবার ভয় থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই পতন থেকে রক্ষা পান নি সুনীলচন্দ্র সরকার, যেমন 'সত্য ও সতী' কবিতায় .

অব্যাকৃত সত্যের সামনে
যে-মানুষ নগ্ন হতে জানে
মেরুদণ্ডে সত্য নামে তার
স্তরে-স্তরে পৈঠানে-পৈঠানে।

অবিভক্ত অস্তি বলাৎকারে
যে-চেতনা নয় ব্রীড়াবতী
অ-মৃতের শাশ্বত চিতায়
সেই শোরে, সেই হবে সতী।

এই জাতীয় তত্ত্বভাষণ অল্প ক্ষেত্রেই আছে। অধিকাংশ কবিতায় তত্ত্বকল্পনার দুর্লভ সমাহারে তিনি এক মৌলিক মেটাফিজিক্যাল গুণ সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছেন, যা এখনকার বাঙলা কবিতায় মেলে না। 'প্রার্থনার পাখি', 'গীতার সেই অশ্বত্থতলায়', 'অজয়তীরের বাউল', 'তৃণ', 'পালাকীর্তন', 'নটীর পূজার নটী' এই শ্রেণীর সার্থক কবিতা। এরা শুধু শিল্প নয়, কবিতা হয়েও স্থিতধী উপলব্ধির বাণীরূপ, পরিণত বয়সের ফল। এখানে বিষয় এমন যে ভাষ্যের প্রয়োজনে ভাষার বুনানি হয় ঠাসা, বিরামচিহ্ন তর্ককে গতি দেয়, ভাবকে সংহত করে, চিন্তার পেশলতা শব্দপুঞ্জের মধ্যে অনুভব করা যায়। কিন্তু এই জাতীয় কবিতাই সুনীলচন্দ্র সরকারের একমাত্র সার্থক কবিতা নয়, 'কেঁচো চেয়েছিল', 'রক্ষা তাবিজ', 'চিলঃ মেয়েঃ কবি'; 'নদীশয্যা', বিশেষ করে 'পাখির সাক্ষ্য' এবং আরো অনেক সফল কবিতা এই সংগ্রহে আছে। ছন্দ ও স্তবক নির্মাণের পরীক্ষায়, বিচিত্র মিল ('দূর হ বে সুখ-দুখের শস্য/সৌমনস্য দৌর্মনস্য' মৌতাতে/কাথে) ব্যবহারে তিনি উৎসাহী কারুকর।

সুনীলচন্দ্র সরকারের কোনো কোনো কবিতায় অমিয় চক্রবর্তীর প্রভাব চোখে পড়ে। গান্ধী-রবীন্দ্র প্রত্যয়ে দুজনেই নিষ্ঠাবান, দুজনে তাই একই পরিমণ্ডলের মানুষ। অমিয় চক্রবর্তীর 'পারাপার' গ্রন্থের 'ভারতী' অংশে দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা-পীড়িত বাঙলাদেশে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে স্মরণের সঙ্গে এই বইয়ের 'সার্বজন্য' অংশে দেশবিভাগ উদ্বাস্তু-বন্যাপীড়িত বাঙলাদেশে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণে অনেক সাদৃশ্য আছে। কোনো কোনো কবিতার নামকরণ ('নিমেষ-ছোঁয়া', 'ভিতর-এলাকা'), কোনো কোনো সমাস তৈরির ধরন বা বাক্যবন্ধ অমিয় চক্রবর্তীর রীতিকে মনে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু এই কবির আত্মপ্রত্যয় স্বকীয় কণ্ঠস্বরে এমন নিজস্ব উচ্চারণ খুঁজে পেয়েছে যে এই প্রভাব হাতড়ানোর বাড়াবাড়ি করা অন্যায় হবে। বড়ো জোর বলা যায় দুজনেই একই ঐতিহ্যের কবি।

কয়েকটি কবিতার বই

জলবায়ু রত্নেশ্বর হাজরা। বাংলা কবিতা প্রকাশনী। মূল্য ২.৫০ টাকা। নিজের মুখোমুখি গণেশ বসু। বীক্ষণ প্রকাশ ভবন। মূল্য ৩.০০ টাকা। নিজের সঙ্গে সংলাপ—সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। নান্দীমুখ সংসদ। মূল্য ২.০০ টাকা। রক্তাক্ত বেদীর পাশে–কালীকৃষ্ণ গুহ। কল্পলোক। মূল্য ৩.০০ টাকা। মনের মধ্যে বুকের মধ্যে—অধীর সরকার। এশিয়া পাবলিশিং। মূল্য ২.০০ টাকা।

'জলবায়ু' রত্নেশ্বর হাজরার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। এই অকৃত্রিম কবির এক নিজস্ব জগৎ আছে; তাঁর দ্বিতীয় বইয়ের নাম ধার করে নিয়ে বলা যায় সেই জগৎ লোকায়ত অলৌকিকের। এই কবিতাবলীর অনেক জায়গায় অনির্দেশ্য অনিশ্চয়তা আছে। এখানে যেন কারা পরস্পরকে খুঁজে বেড়ায়, যেন কারা পরস্পরকে ডেকে ফিরছে, খুব কাছ থেকে চেনা মুখকেও অচেনা বলে মনে হয়, সেদিন যারা 'অতিথি এসেছি' বলে শব্দ করে ঘর ভরে দিয়েছিল, তারাই বা কারা জানা যায় না—'কেন আমার দুয়ার পেরিয়ে হেঁটে যাও?' খানিকটা স্বপ্নের মতো, জ্যোৎস্নার অলীক আলোর মত একটা অবাস্তব বাস্তবতা এই কবিতাগুলির সর্ব শরীরে বর্তমান। যে জলবায়ু প্রকৃতি এই কবিতার বিষয় তারাও পুরোপুরি চেনা নয়—দ্রাক্ষালতায় রমণীয় উদ্যান, গিরিসংকট, জলপাইবন, উলকার আঘাতে তৈরি জলাভূমি, কুরেশিয়ো স্রোতের উষ্ণতা, সরলবর্গীয় বন, আমার সচরাচর চতুষ্পার্শ্বে দেখি না। এমন কি চেনা পৃথিবীও হঠাৎ কোনো জাদুতে যেন অপ্রাকৃত ভাষায় ভূষিত হয়। 'পালিত অরণ্য' নামে ছোটো কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি।

শব্দ হলে পাতা ঝরে পড়ে। যে কোনো বৃক্ষেই
কিছু শুকনো পাতা থাকে
যে কোনো অরণ্যে
কেউ না গেলেও শব্দ হয়—

যে কোনো বৃকের মধ্যে পালিত অবণ্য কিছু ডাল
শুকনো পাতায় ভরে বাখে
চিতা ও চিত্রল হাঁটে
শব্দ হয়
পাতা ঝবে পড়ে
সমস্ত বৃক্ষেই
কিছু শুকনো পাতা থাকে। সমস্ত বুকেব
পালিত অবণ্যে কিছু ডাল
শুকনো পাতাব।

বুকেব অবণ্যে ডালপাতার কথা শোনামাত্র প্রকৃতি আব বিশুদ্ধ থাকে না—অনাবাদী—মাঠ আব স্রোতহীন নদীব পটভূমিতে ঘুঘু ডাকলে বিকেল ও বিষাদ অনির্দেশ্যতায নিয়ে যায়।

প্রাবম্ভিক পঙক্তিনিচয সামান্য পরিবর্তিত ও নূতন তাৎপর্যে ভূষিত হযে অন্তিমে আবাব ফিবে আসে এবং দুই সীমাবেখায এই নিজস্ব জগতেব পবিধি আঁকা হযে যায়। এই পদ্ধতি তাঁর সমস্ত কবিতার সাধাবণ লক্ষণ। আর কবিতাগুলো এই বকম আপাত কামিংস-ধবনে ছাপানো, লাইন ভেঙে এখানে বিবামচিহ্নেব কাজ সাবা হয, চতুষ্পার্শ্বেব শূন্যতাব মধ্যে শব্দকে স্থাপিত করে উপেক্ষার হাত থেকে উদ্ধাব কবা হয। কিন্তু বত্নেশ্বব হাজবাব সমস্ত কবিতাই সমান সার্থক এ কথা বললে মিথ্যে বলা হবে। বিশেষত শেষ দিকেব অনেক কবিতায যেখানে তিনি নাবকীয দুঃস্বপ্নকে বধ্যভূমিতে, ভ্রূণহত্যা শিশুহত্যা আত্মহত্যায, আণবিক যুদ্ধে হত সৈনিকে সাকাব কবতে চেয়েছেন সে সব জায়গায অস্বস্তি বোধ হয—এখানে তাঁকে বড বেমানান লাগে। কিন্তু যে ভূমিতে তাঁব সত্যকাব আসন সেখানে বসে তিনি অনেক উল্লেখযোগ্য চবণ বচনা কবেন—

কোন্ পিলসুজে তুমি শিশু অন্ধকাব
হাত ধরে পাব কবো
কোন্ পাখিটাকে
সকালে উডিযে দিলে সাবাদিন অসংখ্য মৃণাল।

কিন্তু এই কবিতা অতিমসৃণতাব সম্ভাবনায দোলাযিত—এই তাব ভয়।

সবশেষে এই গ্রন্থেব সবচেয়ে উচ্চাশাযুক্ত কবিতা ‘তীর্থযাত্রা’ সম্বন্ধে নীবব থাকা অন্যায হবে। এখানে তিনি আদিম মানুষের জীবনযাত্রা ও পটভূমি যে কল্পনা-শক্তিব সাহায্যে দীর্ঘ কবিতায় রূপান্তবিত কবেছেন সেই কল্পনাশক্তিব মধ্যে অসামান্য সম্ভাবনা আছে।

গণেশ বসুব দ্বিতীয কাব্যগ্রন্থ ‘নিজেব মুখোমুখি’। এই নামেব দুটি কবিতা যদিও এই সংগ্রহে আছে, তবু গণেশ বসুব কবিতা কোনো অর্থেই নিজেকে নিযে ব্যস্ত নয। এমন কি বিশ্বপৃথিবী স্বাতন্ত্র্য হাবিযে কবিব মানসিকতায একাকাব হযে গেছে একথাও বলা চলে না। তবে ক্রমেই নিজেব দিকে ফিবে আসা আছে—‘এবাব বুঝি নিজের দিকে তাকাতে হবে ফিবে/কীর্তনিযা, শুনতে হবে স্মৃতিব পদাবলী· ·।’

এই বইটিতে প্রথমেই চোখে পড়ে ইমেজেব কোলাহলে-সংঘাতে প্রায় কোথাও অর্থেব উন্মার্গগামিতা নেই। সম্ভবত পবানুকবণ প্রবৃত্তিতে যেখানে সেই চেষ্টা আছে, যেমন শেষ পর্যাযেব কোনো কোনো কবিতায়, সেখানে ব্যাপাবটা স্বভাবসিদ্ধ মনে হয়। যেমন, এই সব লাইনে,

> এবং বুকেব মধ্যে স্মৃতিব গাঁজলা তুলে সোনালি মহিষ
> ম্লান বড়ো ম্লানতব, নিযন আলোয
> হাবিযেছি চাবকোনা সবুজ স্বচ্ছতা।

তাঁব কবিতায় ইমেজেব চেয়ে উপমা বেশি, বিমূর্ত শব্দব্যবহাবে তাঁব কুণ্ঠা নেই। অনেকাংশে বিমূর্ত শব্দবহুল বাক্যই তাঁব ভাবপ্রকাশেব বাহন। আসলে যুক্তিবাস্তবতাব মাটিতে গণেশ বসুব পা-দুটো দৃঢ়ভাবে স্থাপিত। বিচিত্র স্তবকেব নানা ব্যবহাবে তাঁব জাগ্রত শিল্পীবিবেকেব পবিচয় মেলে। দুটো উদাহবণ দিই,

(এক)

> চাবিদিকে মুমূর্ষু বাতাস
> ঘোবে ফেবে উন্মাদ স্বভাবে
> অযাচিত নীলিমাব তলে।
> আজ দেখি ঘৃণিত সন্ত্রাস
> ঘিবে থাকে তোমাব অভাবে
> দারুণ আগুন শুধু জ্বলে
> শূন্যতাব, বুকেব অতলে।

(দুই)　　বরং তুমি হারিয়ে যেয়ো অন্ধকারে
স্মৃতির ভারে
ঝাড়লণ্ঠন তেকোনা কাচ সবুজ রাতে,
যন্ত্রণাতে
আমার বুকে হাহাকারের শূন্য নদী··· ।

কিন্তু সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ 'নিজের সঙ্গে সংলাপ'-এর কবিতাগুলি অধিকাংশই নিজেকে কেন্দ্র করে, তাই অন্তর্গত কবিতাবলীর সঙ্গে নামকরণ এখানে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাইরের পৃথিবী কবির মধ্যে বিম্বিত হয়েই উন্মোচিত—বহির্জগৎ ও অন্তঃস্বভাব অনেকটাই একাকার। 'চাই না কাউকে আমি, চাহিনা কাউকে,/আমার শিল্পের ঘরে আমি থাকি স্বপ্রেমে চিহ্নিত···'। অন্যত্র 'সে তার নিজের রক্ত নিজেরই শরীরে বেঁটে নেয়।' যদিও তুলনা হিসাবে নার্সিসাসের কথা সরোজলাল নিজেই বলেছেন, কিন্তু আত্মরতির দোষ এই সংগ্রহে নেই। অসমান পয়ারে লেখা (এবং পয়ার ছন্দের প্রয়োগে শিথিলতার প্রমাণ নিতান্ত দুর্লভ নয়; এক ধরনের ঢিলেমি এই কবির স্বরে সংগতিপূর্ণ ও খানিকটা প্রার্থিত হলেও ছন্দোপতন মেনে নেওয়া যায় না) এই কবিতাগুলির অনেক কয়টিই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁর সার্থকতা যেহেতু কোনো স্মরণীয় চরণে নয়, বরং কবিতার সমগ্রতায়, সেই কারণে উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর অবিসংবাদিত কবিত্বের প্রমাণ পেশ করা কঠিন কাজ। 'যাদুকর', 'আমার ঘনিষ্ঠ পশু', 'খেলা' এই রকম কয়েকটি কবিতা। ছোট 'জলস্তুতি' কবিতাটির অনেকটা উদ্ধৃত করলাম।

তোমার ভিতরে, আহা, হাড় নেই জল,
তোমার ভিতরে নেই উর্ধ্বপ্রবণতা
গাছ বা আগুন তুমি হতে পারলে না
জল, আহা, নিরাকৃতি জল,···
তোমার ঔদ্ধত্য নেই, করুণা তোমার নাম, তুমি নিম্নমুখ,
নির্বোধ বিস্তার তুমি, ধাতু-উপাদান নেই কিছু
তীব্র ছুরিকা যাতে ফল বেঁধে রক্তপূর্ণ মাংসের স্তবক
নও গাছ নও অগ্নি হে নিরস্থি হে নিস্তাপ জল
জননী হওয়ার পরে তাপবিচ্ছুরণ কন্যা কাদা এক মুঠি

শ্রান্তি অপনোদনের জল তুমি, বিস্মৃতি ও ক্ষয়
যা সওয়ায় সইচ তাই, নির্বিকল্প শুদ্ধ মহাশয়।

এই বইয়ের দ্বিতীয় অংশে 'পশ্চাৎভূমিতে' কবির পুরোনো লেখার নিদর্শন আছে, কিন্তু তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিত্বের কোনো প্রমাণ নেই।

কালীকৃষ্ণ গুহের 'রক্তাক্ত বেদীর পাশে' শুধু নামকরণে নয়, অন্তর্ভুক্ত কবিতার সর্বাঙ্গই রক্তাক্ত। বাস্তবিক কেন এত রক্ত (দু-তিনটি কবিতা বাদ দিলে সংগ্রহে এমন কবিতা দুর্লভ যার মধ্যে রক্তের উল্লেখ নেই), এত হত্যাকাণ্ড, এত 'রক্তাক্ত শরীর' বা 'গলিত শব' তার কারণ বোঝা যায় না। কোনো মনস্তাত্ত্বিক কারণে কবি রক্তের কাছে ফিরে ফিরে আসেন, কিন্তু কবিতায় সেই কারণ কোনো রূপ বা অবয়ব পায় নি। চিৎকার, আর্তনাদ, হাহাকার, কোলাহল পাখির ডানার শব্দ ও ফুলের বাগানকে আড়াল করে; কিন্তু এই ভাষাগত চরমপন্থাকে নিতান্ত নারকীয় ব্যায়াম ছাড়া কিছুই মনে হয় না। এই মৌলিক দুর্বলতা ছাড়াও ছন্দ-মিল-ফর্মের পরীক্ষায় কালীকৃষ্ণ গুহের নিরাসক্তি অবাক করে। অথচ কিছু কিছু জায়গায় তাঁর ক্ষমতার প্রমাণও আছে :

যে পাখি উড়িয়ে দিই তার পালক ছিঁড়ে থাকে হাতে—অন্ধকার।
পালক এবং অন্ধকার, অন্ধকার এবং পালক—আমার হাতের মধ্যে।
সমস্ত পৃথিবী, পৃথিবীর মৃত কণ্ঠস্বর, তার ডানার শব্দ
সব কিছু এক সঙ্গে উড়িয়ে দিই। কিন্তু পাখি উড়ে যায় কোথায়?
যাকে উড়িয়ে দিই তার ডানার শব্দ বুকের মধ্যে শুনি।

অধীর সরকারের 'মনের মধ্যে বুকের মধ্যে' নামক কবিতাসংকলনটির সম্বন্ধে প্রধান অসুবিধা এই যে ইনি এখনও নিজস্ব স্বরের সন্ধান পান নি। বাঙলায় এখন প্রায় সমবায় প্রথায় প্রচুর পদ্য লেখা হচ্ছে; এই জাতীয় কবিতার প্রধান লক্ষণ একই সমবায়ভাণ্ডার থেকে শব্দবন্ধ, উপমা ইত্যাদি ব্যবহার করা—অন্যের বহু ব্যবহৃত শব্দমুদ্রা ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে-যাওয়া সত্ত্বেও অন্যমনস্ক অসাড়ভাবে বারবার ব্যবহৃত হয় আরো অনেকের হাতে। অধীর সরকার বর্তমানের এই দুর্গ্রহ থেকে মুক্ত এ কথা বলতে পারলে সুখী হতাম। বস্তুত নিজস্ব উপমার দেখা না পেলে আন্তরিক কবিত্বের যাচাই অসম্ভব।

তাছাড়া ইনি কাব্যিক বিষয় বেছে নিয়ে সেই সম্বন্ধে কিছু প্রথানুগত মন্তব্য দিয়ে কবিতা নির্মাণ করেন। 'মহাপৃথিবী'-তে শতবার্ষিকীর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে 'মহাপৃথিবী তুমি জ্যোতিষ্মান, নহ শুধু কবি'; 'স্টেপ-অ্যাসাইড-এ' দেশবন্ধুর শেষ নিবাস সম্বন্ধে 'একদিন অন্তিম নিঃশ্বাস/চিরশান্তি দিয়ে গেছে মৃত্যুহীন তব সাধনার'; 'হাসপাতাল', 'সন্ধ্যার ভিক্টোরিয়ায়', 'যাদুঘর', 'খোশবাগে কিছুক্ষণ', 'কফিহাউসে: সন্ধ্যায়' ('এখানে কফির কাপে সঞ্জীবিত স্বল্প অবসর'), 'কোনো এক যুদ্ধপ্রত্যাগত সৈনিকের প্রতি':

অনেক দিয়েছ তুমি; জীবনের উজ্জ্বল সময়
একে একে ধীরে ধীরে মিশে গেছে জীবনের স্রোতে
কখন অজ্ঞাতসারে; নিঃশেষে করেছ তুমি ক্ষয়
যৌবনের দিনগুলি শত্রুসৈন্য মুখোমুখি হাতে।

—সর্বত্রই পূর্বনির্বাচিত বিষয় সম্বন্ধে প্রথার অন্ধ অসাড় অনুবর্তন।

অশ্রুকুমার সিকদার
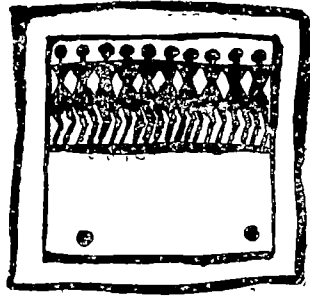
কলকাতায় উৎসবে দেখা

কয়েকটি ফরাশি চলচ্চিত্র

কলকাতায় ফবাশি চলচ্চিত্র উৎসব হযে গেল। ৩ থেকে ৯ নভেম্বব, ম্যাজেস্টিক সিনেমা হলে। কলকাতায় ফবাশি ছবি দেখানোব কযেক মাস আগে থেকেই যথেষ্ট হৈ হল্লা শুনেছি, টিকিট বণ্টনও হযে গেছে বহু আগেই ; শোনা গেছে যে কেউ কেউ নাকি দেড টাকাব টিকিট পঞ্চাশ টাকায় সংগ্রহ কবেছেন, ফলে মনে হযেছিল যে কি না জানি হতে চলেছে এই কলকাতায, অথচ ছবিগুলি দেখাব পব বলতে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না যে ফবাশি দেশে যুদ্ধোত্তব আমদানি অর্থাৎ ফবাশি ছবিতে সেই বহু আলোচিত 'নিউ ওয়েভ' আমাকে একেবাবে হতাশ কবেছে। 'দি অবিজিন অফ দি নিউ ওযেভ ইন্ দি ফ্রেঞ্চ সিনেমা ইজ কমপ্লিকেটেড, ফবাশি চলচ্চিত্র উৎসবেব পুস্তিকায কোন একটি স্বাক্ষববিহীন বচনায এমন একটি লাইন দেখলাম। সত্যিই এব কোন 'অবিজিন' আছে কিনা সন্দেহ। হঠাৎ বেশ কযেকজন তরুণ (বযসেব দিক দিযে) চিত্রপবিচালক, যাদেব মধ্যে অধিকাংশেব ছবি কবাব কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না (ইতিহাস তাই বলে), উন্মাদেব মতো উদ্ভট কিছু বিষযেব (যা আদৌ বিষয হ'তে পাবে না) ছবি তুললেন এবং যেহেতু বিশ্বেব সাংবাদিকদেব কাছে সংবাদপত্রেব পাতা ভবানো ইদানীং একটি সমস্যা, ফলে বিভিন্ন দেশে মূল বস্তু অর্থাৎ ছবি পৌছনোব আগেই সে সব নিযে বড বড বচনা পৌছে গেল। পৌছলো,

কলকাতাতেও এবং সংবাদপত্রের কৃপায় এসব বিষয়ে সবজান্তা হয়ে যাবার বহু পরে কলকাতায় মূল ছবি দেখানোর ঘোষণা নজরে পড়তেই সমঝদার চলচ্চিত্র রসিকেরা দেড় টাকার টিকিট পঞ্চাশ টাকায় সংগ্রহ ক'রে রগবগে মন নিয়ে ম্যাজেস্টিকের দিকে ছুটলেন। কলকাতায় ফরাশি চলচ্চিত্র উৎসবের মোটামুটি এইটেই চেহারা। এত পরিশ্রম ক'রে এবং এত বেশি মূল্য দিয়ে তাঁরা যেসব ছবি দেখলেন তার দুর্মূল্যতার কথা ইচ্ছে না থাকলেও প্রচার করতেই হয়, তা নাহলে ইজ্জত বাঁচে না, এবং তাঁরা তাই করলেন, ফলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল অংশগুলির আলোচনায় তাঁদেরই মুখে দেশগত সামাজিক পার্থক্যের প্রসঙ্গ এসে পড়ল, অর্থাৎ ফরাশি সমাজ আমাদের সমাজ থেকে আলাদা বলে অমুক জায়গাটা আমাদের দেশের দর্শকের ভাল লাগবে না ইত্যাদি, সত্যি বলতে কি যার বিন্দুমাত্র অসুবিধের কথা ছবিগুলি দেখে আমার মনে হয় নি। ছবিগুলি অত্যন্ত সাধারণ স্তরের, অতএব সামাজিক পার্থক্যের প্রশ্নই ওঠে না, এবং যে যে জায়গা-গুলিতে ঐসব প্রশ্ন এসে পড়েছে সেই অংশগুলিই সর্বাপেক্ষা উদ্ভট এবং অর্থহীন, যা কোনদিনই কোন দেশের সত্যিকারের সমাজের চেহারা হতে পারে না। পূর্ব উল্লিখিত স্বাক্ষরবিহীন রচনায় ফরাশি চিত্র পরিচালকদের সম্পর্কেও মন্তব্য আছে, 'সাম্ আর নোটেড্ ফর দেয়ার ফিযার্স ইন্‌ডিভি-ড্যুয়্যালিটি, আদার্স কন্‌ফর্ম টু কন্‌ভেনশন'। যাঁরা পুরনো ঐতিহ্যকেই আঁকড়ে ধ'রে রাখার চেষ্টা করছেন তাঁদের সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য নেই, পৃথিবীর সব দেশেই এবং সমস্ত শিল্পক্ষেত্রেই এমন কিছু কিছু স্রষ্টা বর্তমান। কিন্তু যাঁরা নতুন কিছু করতে চাইছেন তাঁদের ঐ 'ফিযার্স ইন্-ডিভিড্যুয়্যালিটি' বস্তুটি ফরাশি ছবিতে বড় বেশি লাগামছাড়া ভাবে এসে পড়েছে, মোটামুটি এটাই আমার প্রধান বক্তব্য। আগে কখনো দেখানো বা বলা সম্ভব হয় নি এমন কোন দৃশ্য বা ঘটনার অবতারণা যথেষ্ট সাহসের পরিচয়, কিন্তু বেশির ভাগ ফরাশি ছবিতেই মূল সমস্যা থেকে দূরে সরে গিয়ে পরিচালক নিজেই মাথা খাটিয়ে সমস্যা তৈরি করতে চেষ্টা করেছেন, যার সঙ্গে সত্যিকারের সামাজিক সমস্যার কোন মিল নেই, ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বহু দৃশ্য অবাস্তব এবং অপ্রয়োজনীয় মনে হওয়াটা যথেষ্ট স্বাভাবিক।

ও আজা বালথাজার

.এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করছি ব্রেসঁর 'ও আজা বালথাজার' ছবিটির। এ ছবির গল্প একটি খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত গাধাকে কেন্দ্র ক'রে, যার নাম বালথাজার। যদিও পরিচালক বিশেষ ক'রে উল্লেখ করেছেন যে পৌরাণিক উপাখ্যান বালথাজারের সঙ্গে এর কোনপ্রকার তুলনামূলক সাদৃশ্য খুঁজতে গেলে দর্শককে হতাশ হতে হবে। বালথাজার জ্যাক্‌স্‌ এবং মারীর খুব প্রিয়। একদিন জ্যাক্‌স্‌-এর পিতা সপরিবারে গ্রাম ছেড়ে প্যারীতে চলে যাবার সময়ে মারীর পিতাকে তাঁর খামারবাড়ির দেখা-শোনা করতে বলে গেলেন। বালথাজারও সেখানে রয়ে গেল। কিন্তু কিছুকাল পরে মারীর বাবা গাধাটিকে কাজের উপযুক্ত নয় ভেবে এক রুটিওয়ালার কাছে বেচে দিলেন। ওদিকে মারীর বয়স তখন ষোল এবং জ্যাক্‌স্‌ এসে একদিন ওকে প্রেম নিবেদন করল। কিন্তু মারীর কাছে ও প্রত্যাখ্যাত হল, কারণ মারী তখন জেরার্ড নামে পাড়ার এক বকবাজ গুণ্ডার খপ্পরে। এদিকে বালথাজারের জীবনে অভিজ্ঞতার শেষ নেই। রুটিওলার কাছ ছেড়ে এরই মধ্যে ও আর্নল্ড নামে এক মাতাল ভবঘুরের হস্তগত হয়েছে, সেখান থেকে এক সার্কাস পার্টিতে এবং আবার আর্নল্ডের কাছে। এরই মধ্যে আবার আর্নল্ড ইহলোক ত্যাগ করল এবং সেখান থেকে বালথাজারকে নিয়ে যাওয়া হল এক কৃপণ শস্যব্যবসায়ীর কাছে, যার কাছে আধপেটা খেয়ে এবং অত্যধিক পরিশ্রম করে বেচারার প্রায় আধমরা অবস্থা, ফলে পুনর্বার মারীর বাবার পুরনো ডেরায়। ওদিকে মারী আবার জেরার্ডের প্ররোচনায় ঘরবাড়ি ছেড়ে সেই শস্যব্যবসায়ীর আশ্রয়ে এবং বুড়ো লম্পটের কাছে ষোড়শী মারীর জীবনে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। সেখান থেকে আবার মারীর অন্তর্ধান এবং একটি পোড়ো বাড়িতে জেরার্ড এবং তার দলবল কর্তৃক বেচারী 'স্ট্রীপ্‌ড্‌ এণ্ড বিটন্‌' (জানি না 'রেপ্‌ড্‌' নয় কেন)। ওদিকে বালথাজারও কৌশলে জেরার্ডের হস্তগত এবং পাহাড়ের ওপারে বিনা শুল্কে চোরাই মালের চালানের কাজে লিপ্ত। সবশেষে সেখানেই শুল্ক অফিসারের গুলিতে বালথাজারের মৃত্যু।

এই হল গল্প। আগেই বলে রাখছি, কোনো বিদেশী ছবির এত দুর্বল চিত্রনাট্য আমি এর আগে কখনো দেখি নি। সম্পাদনাও যথেষ্ট নিম্ন-

মানের। প্রতিটি দৃশ্য বা ঘটনায় কোন যুক্তিগ্রাহ্য যোগসূত্র নেই, এমন কি কয়েকটি চরিত্রকেও আমার যথেষ্ট অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। শুধুমাত্র গাধাটির হাতবদলের ঘটনা দেখানোর জন্যে ছবিতে একের পর এক চরিত্র এসেছে, এসেছে সার্কাস পার্টি, এমন কি বালথাজারকে দিয়ে সার্কাসে খেলা দেখানোর সুযোগটুকুও পরিচালক হাতছাড়া করেন নি, যদিও এসব ঘটনার কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছবিতে ছিল না। আর্নল্ড, শস্যব্যবসায়ী ইত্যাদি চরিত্র ছবিতে অপ্রয়োজনীয়, ফলে জোর করে মূল গল্পের সঙ্গে এদের জুড়ে দিতে গিয়ে আগাগোড়াই খাপছাড়া। মারীর সঙ্গে শস্যব্যবসায়ীর ব্যভিচার বক্তব্যহীন, জ্যাক্‌স্‌কে ফিরিয়ে দিয়ে জেরার্ডের কাছে মারীর আত্মসমর্পণের কোনো উপযুক্ত কারণ নেই, এমনকি প্রতিবার জ্যাকসকে ফিরিয়ে দেবার সময়ে ষোড়শী মারীর মুখ দিয়ে প্রেমতত্ত্ব সম্পর্কিত পাকা-পাকা কথা বড় বেশি বেমানান, জানি না ষোল বছরেই কোনোরকম পূর্বঅভিজ্ঞতা ছাড়াই জীবন সম্পর্কে মারীর এত পরিণত ধারণা কী করে হল। জেরার্ড ছবিতে দুষ্ট চরিত্র, অথচ দলবলসহ সাইকেল নিয়ে রাস্তায় দৌড়ঝাঁপ, দু'একবার মাটিতে বুক দিয়ে সন্তর্পণে চলাফেরা এবং বারকয়েক ভুরু কুঁচকে নাটকীয় ঘাড় ঘোরানো ছাড়া তার দুষ্ট প্রকৃতি দর্শকের কাছে পরিষ্কার নয়। এমনকি তার চোরাই চালানের ঘটনাটিও ছবিতে যথেষ্ট ধোঁয়াটে, শুধুমাত্র শুল্ক অফিসারের গুলিতে বালথাজারের মৃত্যু ঘটানোর জন্যেই যেন তার ঐ মাথামুণ্ডহীন পেশা। ছবিতে একটিমাত্র নগ্ন দৃশ্য আছে। জেরার্ড এবং তার দলবল জামাকাপড় খুলে নিয়ে মারীকে মারধর করলে ঐ অবস্থাতেই পেছন ফিরে বসে (একেবারে শিল্পীর মডেলের মতো) মারীর ফুঁপিয়ে কান্না। স্পষ্ট বোঝা গেল, মারীকে একবার দর্শকদের কাছে নগ্ন অবস্থায় দেখানোই পরিচালকের উদ্দেশ্য, শুধুমাত্র ঐ ব্যবসায়িক দৃশ্যটির জন্যেই গোটা ঘটনাটির আমদানি—যার সঙ্গে মূল গল্পের কোনো যোগাযোগ নেই এবং সত্যি বলতে কি নগ্নতার এমন দুর্বল ব্যবহারও আমি এর আগে কোনো ছবিতে দেখি নি। শুধু তাই নয়, গোটা কাহিনীর সঙ্গে যোগসূত্রহীন এই নগ্ন ছবিটিকেই পরিচালক তাঁর ছবির পোস্টারেও ব্যবহার করেছেন, সিনেমা হলের বাইরে যা আমি টাঙানো দেখেছি।

এত কিছুর পরে পরিচালক ছবিটির মাধ্যমে কী বলতে চেয়েছেন জানি

না। প্রথম দিকে মনে হযেছিল মাবী এবং বালথাজারেব তুলনামূলক দুর্দশাই পবিচালকের বক্তব্য অর্থাৎ 'মাবী অ্যাক্‌ট্‌স, বালথাজাব ইজ অ্যাক্টেড আপন'। কিন্তু প্রথম দিকেব দু'একটি দৃশ্য ছাড়া বাকি ছবিটুকুতে মাবী এবং বালথাজাব সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। তবে কি পরিচালকের বক্তব্য ক্রুযেল্টি টু অ্যানিমল্‌স্‌-এব বিরুদ্ধে, অর্থাৎ চতুষ্পদ বালথাজাবেব দুর্দশা দেখিযে দর্শকেব চোখে জল আনতে চেযেছেন? তাই হবে বোধহয। কিন্তু এ সব জিনিশ তো মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রে পঞ্চাশোর্ধ প্রবীণাবা ভেবে থাকেন, ফবাশি দেশেব 'নব্যবীতি' মার্কা ছবিব মধ্যে এ সব কেন? অবশ্য পবিচালক যে একেবাবে বিফল হযেছেন এমন কথা বলতে পাবি না, অন্তত বাঙলাদেশে তো নযই। কাবণ এমন একটি দুর্বল ছবিবও বাঙলাদেশেব কাগজপত্রে সর্বাধিক প্রশংসা পডেছি অর্থাৎ বালথাজাবেব দুর্দশা দেখে সমালোচকদেব প্রাণ কেঁদে উঠেছে, যদিও বহুকাল আগেই সৃষ্ট বাংলা সাহিত্যে 'মহেশ' বা 'আদবিণী' নিয়ে এদেব কখনো মাথা ঘামাতে দেখি নি, অন্তত ছবিব আলোচনা প্রসঙ্গে তো নযই।

দি স্যুটর

দ্বিতীয ছবিব নাম 'দি স্যুটব', পবিচালক পিয়েব এত্যো। পবিচালক স্বয়ং এতে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় কবেছেন। ছবিতে এত্যো হলেন একজন পড়ুয়া যুবক, বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিযে ব্যস্ত, প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি নিযে যাঁব ভাববাব সময নেই। এমন একজন যুবককে তাব বাবা-মা বিযে কবতে বললে পবিকল্পনাটি তাব মাথায খেলে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে সে পাত্রী খুঁজতে বেবিয়ে পডল এবং প্রথমেই ইল্‌কা নামে একটি সুইডিশ মেযেকে প্রস্তাব কবল। কিন্তু যেহেতু মেযেটিব ফবাশি ভাষা জানা ছিল না, ফলে নাযকের পক্ষে খুব একটা সুবিধে দেখা গেল না। ছবিটি যদিও হাসিব, তবু এমন ছেলেমানুষি অজুহাত আমাব একেবাবে পছন্দ হয় নি এবং কেউ ভাবভঙ্গিসহ প্রেম নিবেদন করলে শুধুমাত্র ভাষাব গণ্ডিব জন্যে মেযেটির পক্ষে তা বোঝা সম্ভব হল না, এমন আজগুবি ভাঁড়ামো অন্তত কোনো পবীক্ষামূলক ছবিতে ভালো লাগাব কথাও নয। কমেডি ছবি আগেও অনেক দেখেছি, দেখেছি ফার্নান্দিজ, দেখেছি ক্যান্টিনফ্লাশ, নিদেনপক্ষে লবেল হার্ডিব ছবিও। সেখানেও আজগুবি কাণ্ডকাবখানাব অভাব থাকে না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও

বেশিব ভাগ ক্ষেত্রে কাহিনীব শক্ত বাঁধুনি লক্ষ করেছি, উপস্থাপনাব ঢঙও অনেক পাকা, যা এত্যোব ছবিতে পাওযা গেল না। এদিকে ইল্‌কাব কাছে সুবিধে কবতে না পেবে নাযক লবেন্স নামে আবেকটি মেযেব সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল এবং সেখানেও ফলাফল অনুকূল না হওয়ায সবশেষে এক জনপ্রিয গাযিকাব প্রেমে, নাম স্টেলা। টেলিভিশনে স্টেলাব গান শুনে নায়ক যাবপবনাই মুগ্ধ, তাই ঘণ্টাব পব ঘণ্টা টেলিভিশনেব সামনে বসে স্টেলাব দিকে তাকিযে থাকছে, ঘবময হাজাব স্টেলাব ছবি, টেবিলে, চেযাবে, দেযালে, পর্দায, আযনায, সর্বত্র শুধু স্টেলা আব স্টেলা। ছবিতে এই স্টেলা পর্ব অস্বাভাবিক বকমেব দীর্ঘ এবং একঘেযে। এবং সবচেযে উদ্ভট ঘটনাটি ঘটল সবচেয়ে শেষে অর্থাৎ বহু পবিশ্রমেব পব স্টেলাব সঙ্গে আলাপ কবতে গিয়ে নাযক দেখল যে স্টেলা প্রায তাব মাযেব বয়সী এবং স্টেলাব ছেলেব বযস তাব বযসেব সমান। আশ্চর্য! এমন দুর্বল অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সেব কথা আমি ভাবতেই পাবি নি। এখানেই ছবিব শেষ নয়, এব পবেও ঘটনা ঘটেছে অর্থাৎ স্টেলাকে দেখে মোহভঙ্গ হবাব পব নায়ক পুনবায ইল্‌কাব কাছে ফিবে যাচ্ছে, যখন ইল্‌কা ফবাশি ভাষা শিখে ফেলেছে এবং সুইডেনে ফিবে যাবাব জন্য তৈবি। সমালোচক টম মিল্‌নে বলেছেন যে এত্যোব ছবিতে চ্যাপলিন, ক্লেযাব এবং কীটনেব সবাসবি প্রভাব। আমাব ঐ 'প্রভাব' কথাটিতেও আপত্তি, আমাব মতে এত্যোব ছবি হল সবাসবি ওঁদেব নকল। এত্যোব ছবিব বহু দৃশ্যই চ্যাপলিনেব নির্বাক যুগেব ছবিগুলোব কথা মনে কবিযে দেয, এমনকি ছবিব লবেন্স পর্বে নাযক নাযিকাব অস্বাভাবিক লম্ফঝম্প আমাকে মাঝে-মাঝে নবম্যান উইসডমের কথাও স্মরণ কবিযে দিযেছে।

পিয়েরো, দি ফুলিশ

তৃতীয ছবিব পবিচালক গদাব, ছবিব নাম 'পিযেবো, দি ফুলিশ'। পাবীব সুন্দব ফ্ল্যাট, ধনী স্ত্রী এবং একঘেয়ে সামাজিকতাব ঠেলায নাযক ফার্দিনান্দ (নাযিকা ডাকে পিযেবো বলে) ক্লান্ত। এমন অবস্থায তাব সঙ্গে মেবিযেনেব দেখা, যাকে সে আগে থেকেই চিনত। মেবিযেনেব প্রচণ্ড উগ্র জীবনযাপন দেখে ফার্দিনান্দ নিজেও নতুন কবে বাঁচতে চাইল এবং একদিন একটি মোটবগাড়ি চুবি কবে তাবা সুখেব সন্ধানে বেবিযে পড়ল।

বহু আজগুবি দুর্ঘটনা ঘটিয়ে তারা এসে পৌঁছল সমুদ্রের ধারে একটি গাছপালাঘেরা জায়গায়। সেখানে কয়েকদিন শান্ত জীবন কাটাবার পর মেরিয়েন আবার ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং ফিরে গেল তার পুরনো তাণ্ডব-লীলায়। পরবর্তী ঘটনা আরও চাঞ্চল্যকর। বহু অপরাধমূলক ঘটনা ঘটার পর নায়কের গুলিতে নায়িকা নিহত এবং সবশেষে মাথায় ডিনামাইট লাগিয়ে নায়কের আত্মহত্যা, যদিও ফিউজে আগুন ধরাবার পর তার আরেকবার বাঁচার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ছবির মূল সমস্যা হল বোর্ডম, যার দোহাই দিয়ে নায়কের সুস্থ জীবন এবং সম্ভ্রান্ত ফরাশি সমাজকে তামাশা করেছেন পরিচালক। তামাশা করতে গিয়ে খাড়া করেছেন মেরিয়েনের মতো মোহাবিষ্ট অবাস্তব চরিত্র, যার উপযুক্ত স্থান হিশেবে আমি পাগলা-গারদ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না। যে মেরিয়েন ঠাণ্ডা মাথায় একের পর এক খুন করে, গাড়ি চুরি করে, তার হঠাৎ ভিয়েতনামের যুদ্ধে নিহতদের জন্যে এত দুঃখ কেন? বুঝলাম, মেরিয়েনের চরিত্রচিত্রণে পরিচালক শেষের দিকে খেই হারিয়েছেন, তাই উপরোক্ত প্রসঙ্গ এনে তাকে হঠাৎ সিরিয়স বানানোর চেষ্টা, যেমন নায়ক ফার্দিনান্দকে আগাগোড়া হতবাক নির্বোধ বানিয়ে রেখে শেষের দিকে মৃত্যুর হাতছানি মারফৎ তার দিব্যদৃষ্টি খোলার চেষ্টা করেছেন। গদারের কি জানা নেই যে মৃত্যুই এ-সমস্যার একমাত্র সমাধান নয়? হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে গেলে কিংবা ঘোরতর উন্মাদ বনে গেলে মস্তিষ্কে বোর্ডমের আর কোন অস্তিত্ব থাকে না। এ-সমস্যা কেবলমাত্র পরিণত সুস্থ মানুষের। আর তাছাড়া ফরাশি ছবির নায়কেরা ভ্যান গগীয় কায়দায় এমন টপাটপ আত্মহত্যা করে কেন? সম্ভবত পরিচালকেরা এখনো পর্যন্ত মৃত্যুজনিত ভাবপ্রবণতাকে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি বলে। জানি না, গদারের ছবিতে বেচারা লায়োনেল হোয়াইট কতখানি উপস্থিত।

এ টাইম টু লাভ

অথচ প্রায় একই ধরনের সমস্যা নিয়ে লুই মালের ছবি (এ টাইম টু লভ্ এণ্ড এ টাইম্ টু ডাই) আমার এ উৎসবে সর্বাধিক প্রশংসনীয় বলে মনে হয়েছে। এ-ছবি নায়কের জীবনের শেষ আটচল্লিশ ঘণ্টার কাহিনী, যার প্রধান সমস্যা হল একাকিত্ব এবং সব কিছু থাকা সত্ত্বেও যার কারুর সঙ্গে

আইডেন্‌টিফিকেশন্‌ সম্ভব হচ্ছে না। মার্কিন স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর সে লিডিয়া নাম্নী স্ত্রীর এক বান্ধবীর সঙ্গে রাত কাটাচ্ছে, কিন্তু সেখানেও শান্তি নেই, বারে-বারেই তার মনে হচ্ছে যে শেষ অবধি লিডিয়াকেও সে সুখী করতে পারবে না, তাই লিডিয়ারই সাহায্যে সে আবার ফিরে আসছে নার্সিং হোমে যেখানে সে গত ছ'মাস ধরে অত্যধিক মদ্যপানের জন্যে চিকিৎসাধীন। সেখানে ডাক্তার তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে সে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং তার এখন উচিত প্যারীতে তার স্ত্রীকে খবর দিয়ে তার কাছে চলে যাওয়া। কিন্তু নায়কের পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না, কারণ সে নিজের প্রতি আস্থা হারিয়েছে। তবু সে প্যারীতে গেল। স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ না করলেও পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করল, পুরনো মদের দোকানে গিয়ে নতুন করে মদ্যপান শুরু করার চেষ্টা করল, কিন্তু শান্তি সেখানেও নেই। বন্ধুরা তাকে বিবেকের কথা বলল। সুস্থ জীবন সম্পর্কে একগাদা সারমন দিল, এমনকি দীর্ঘকাল বাদে তার প্রিয় মদ্যপানও তাকে আরো বেশি একাকিত্বের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া ছাড়া বিশেষ কিছুই দিতে পারল না। ফলে কারুর সামনেই ব্যক্তিগত অস্তিত্বকে অনুভব করা তার পক্ষে সম্ভব হল না। অবশেষে এল সেই ভয়ংকর দিন, তেইশে জুলাই, যে তারিখটি সে ঘরের আয়নায় লিখে রেখেছিল। সে তার স্ত্রীকে টেলিগ্রাম করল, যে বইটি পড়তে শুরু করেছিল সেটি শেষ করল এবং তারপর বিছানায় অর্ধশায়িত অবস্থায় রিভলভারটি বুকের ওপর রেখে শান্তভাবে ঘোড়া টিপল। পর্দার ওপর মৃত নায়কের পলকহীন দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বহুক্ষণ দর্শকেরও চোখের পাতা পড়ল না। যদিও অন্যান্য ফরাশি ছবির নায়কের মতো এ-ছবির নায়কও শেষ অবধি আত্মহত্যাই করেছে, তবুও এ-ঘটনা দর্শকের কাছে আকস্মিকভাবে আসে নি, গোটা ছবিতে এর জন্যে যুক্তিগ্রাহ্য পূর্বপ্রস্তুতি ছিল। এ-ছবির সমস্যা আজকের মানুষের সত্যিকারের ব্যক্তির সমস্যা এবং এমন জটিল সমস্যা নিয়েও এমন নিখুঁত ছবি আমি খুব কমই দেখেছি। ছবির কোথাও এতটুকু অতিচিন্তা নেই, এক-মুহূর্তের জন্যেও কোনো দৃশ্যকে আমার একটুও অতিরঞ্জিত বা অপ্রয়োজনীয় মনে হয় নি, আগাগোড়া ছবি এগিয়ে গিয়েছে নির্ভুল স্বচ্ছন্দ গতিতে। চিত্রনাট্য এবং ক্যামেরার কাজও যথেষ্ট উন্নত ধরনের এবং সেদিক দিয়ে

লুই মাল-ই আমাব কাছে এ-উৎসবেব সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রপবিচালক, সমস্যা নিযে যাঁব মস্তিষ্কে অহেতুক উত্তেজনা নেই, যাঁব সামনে সমস্ত কিছু এসেছে শান্ত, সংযত এবং প্রকৃতিস্থভাবে। তিনিই একমাত্র বুঝেছেন যে ব্যক্তিব দৈনন্দিন সুস্থতাটুকু হাবিযে ফেললেই মস্তিষ্কে সমস্যাব আব কোনো অবযব থাকে না।

লাইফ অ্যাট এ ক্যাস্‌ল্‌

কমেডি ছবি হিশেবে এ-উৎসবেব সবচেযে ভালো ছবি হল ব্যাপেনোব 'লাইফ্‌ অ্যাট্‌ এ ক্যাস্‌ল্‌', যাব চমৎকাব চিত্রনাট্য আমাকে অত্যধিক মুগ্ধ কবেছে। শুনলাম ইনিই হলেন লুই মালেব 'এ ভেরি প্রাইভেট অ্যাফেযাব' এবং ব্রোকাব 'দ্যাট ম্যান ফ্রম্‌ বিযো' ছবিব চিত্রনাট্যকাব। ছবিব বিষযবস্তু যদিও হালকা ধবনেব তবু সামান্যতম ভাঁডামোও আমি ছবিব কোথাও লক্ষ কবি নি। ছবিব শেষে নাযিকাব স্বামীব সামান্য বীবত্ব যদিও ছবিব সিবিও-কমিক চেহাবাকে খানিকটা নষ্ট কবেছে, তা সত্ত্বেও সে-সবেব মধ্যে বিন্দুমাত্র বাচালতা দেখি নি, এমনকি ঘটনাব পেছনে যথেষ্ট যুক্তিও ছিল। ছবিব কাল ১৯৪৪, নবমাণ্ডিব উপকূলে দুর্গেব মতো এক বাগানবাডিতে চপলমতি মাবী একাকী এবং অস্থিব, কাবণ তাব চেযে বিশ বছবেব বড তাব স্বামী জেবোম সেখানে গাছপালা এবং আপেল নিযে ব্যস্ত, এমনকি তাকে অদূব ভবিষ্যতে পাবীতে ফিবিযে নিযে যাবে বলে কথা দিযেও কথা বাখছে না। ওদিকে তার স্বামীব (মাবী যাকে কাপুরুষ এবং বুল্‌হেডেড্‌ বলে) ধাবণা যে চঞ্চল মাবীকে একবাব পাবীতে নিয়ে গেলে তাকে আব সামলানো যাবে না। একটা জিনশ আমি আশ্চর্য হযে লক্ষ কবেছি যে ফবাশি দেশেব প্রায সব ছবিবই গতি শহব পাবীব দিকে, যেমন কিনা তুবস্কেব সব ছবিই ইচ্ছাকৃতভাবে ইস্তাম্বুল-কেন্দ্রিক। ছবিতে প্রধান শহবকে নিযে এত ভাবালুতা কেন? যাই হোক, মাবীব এমন অবস্থায ওখানে জুলিয়েন নামে এক ফবাশি সামবিক অফিসাবকে প্যাবাসুটেব সাহায্যে নামিয়ে দেযা হল, যাব আসল কাজ হল, ঐ দুর্গে ঘাঁটি গেডেছে এমন একজন জাবমান মেজরকে তাব দলবলসমেত ওখান থেকে সরিযে দেযা। জুলিয়েনকে মাবীব পছন্দ হয়ে গেল, কাবণ সেও তাকে পাবীতে নিয়ে যাবে বলে কথা দিয়েছে। ওদিকে জাবমান মেজবও মারীব প্রেমে পড়ে যাওযায জুলিযেন এবং মেজবের মধ্যে গণ্ডগোল, ফলে জুলিয়েনেব

কাজকর্ম লাটে উঠল এবং আসল দিনে জুলিয়েনের কাজ বীরত্ব সহকারে করে ফেলল জেরোম, এবং সে সব দেখে সবশেষে মারীর পুনর্বার জেরোমের কাছে আত্মসমর্পণ এবং প্যারীতে গমন। এ-ছবির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল গোষ্ঠীবদ্ধভাবে প্রত্যেকের চমৎকার অভিনয়। জুলিয়েন এবং মারীর ভূমিকায় যে দুজন অভিনয় করেছেন, আমার মতে এঁরা এ-উৎসবের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং অভিনেত্রী। অথচ ফরাশি দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনেতা বেলমণ্ডোর অভিনয় আমার ম্যানারিজম দোষে দুষ্ট মনে হয়েছে।

আর সবশেষে সবিনয়ে উল্লেখ না করে পারছি না যে সারা বিশ্বে সেই বহু আলোচিত এবং বহু গবেষিত ছবি 'একটি মানব এবং একটি মানবী', যাকে নিয়ে হল্লার শেষ ছিল না, তা বাঙলাদেশের বেশির ভাগ চলচ্চিত্র রসিককে হতাশ করেছে।

সমীর রায়

না দিলে

স্বদেশেব স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাব প্রিয কবি কাজী নজরুল ইসলাম যেভাবেই হোক আজও আমাদেব মধ্যে বেঁচে। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সবকাবেব আমলে সেচমন্ত্রী ভরাট-কবা লবণ হ্রদ প্রকল্পে পাশাপাশি দুটুকবো জমি কবিব বাসভবন নির্মাণকল্পে সবকাবেব পক্ষ থেকে দান কববাব বাবস্থা কবেছিলেন। জমি দানে বিভাগীয় ভাবপ্রাপ্তদেব সম্মতি এবং জমি নির্বাচনে কবিব পুত্র কাজী সব্যসাচীব অনুমোদনও পাওযা গিযেছিল। অর্থমন্ত্রী এই প্রস্তাবে সাগ্রহে অনুমতি দেওযাব পব গত বছব ২৩শে নভেম্বব মন্ত্রিসভাব পূর্বনির্ধাবিত বৈঠকে এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়াব কথা ছিল। দুঃখেব বিষয, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা হঠাৎ বেআইনিভাবে নাকচ হওযায মুখ্যমন্ত্রীব কাছ থেকে চূডান্ত অনুমোদনলাভ সম্ভব হয নি।

ঘোষ মন্ত্রিসভা তাব সুযোগ নিযে প্রাক্তন সেচমন্ত্রীব আদেশটি আটক কবে বেখেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁবা অর্থাভাবেব যে বাহানা তুলেছেন, সে সম্বন্ধে বিতর্কে প্রবৃত্ত হতেও আমবা ঘৃণা বোধ কবি।

যাঁব গান, যাঁব কবিতা মুখে নিযে আমবা বহু দুর্গম-গিবি-কান্তাব-মরু পাব হযে এসেছি এবং আবও পাব হব—তাঁব মাথা গুঁজবাব ঠাঁই কববাব জন্যে সাবা দেশেব কৃতজ্ঞতাব প্রতীক হিশেবে আমবা যদি পাযেব নীচে সামান্য একটু মাটিও দিতে না পাবি—ভবিষ্যৎ আমাদেব ধিক্কাব দেবে। এই জমিব দানপত্র ঘোষ মন্ত্রিসভাব অনিচ্ছুক হাত থেকে জনতাব বজ্রনির্ঘোষে আমাদেব ছিনিযে নিতে হবে।

গোলাম কুদ্দুস	চিত্ত ঘোষ
অরুণাচল বসু	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সিদ্ধেশ্বর সেন	শক্তি চট্টোপাধ্যায়
তরুণ সান্যাল	সুভাষ মুখোপাধ্যায়